গল্পলহরী

৫ম বর্ষ—১৩২৪।

বৈশাখ—চৈত্র

সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু

১৩২৪

মূল্য ২॥০ টাকা

বর্ষ সূচী

পৃষ্ঠা

গল্পলহরী

৫ম বর্ষ, | বৈশাখ ১৩২৪, | ১ম সংখ্যা

প্রস্তরীভূত অশ্রু

[লেখক—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ]

আমি এক দেশী কোম্পানীর ষ্টীমারে চাকুরী করি। এ লাইনে যখন প্রথম আসি, সেদিন মজিদপুরের ঘাটে প্রথম ষ্টীমার থামিতেই দেখি, ঘাট হ'তে কিছু দূরে, এক নিমগাছের তলায় মার্ব্বলের তৈরি একটি ছোট্ট সাদা মনুমেণ্ট। যেন কে তাকে এই মাত্র এখানে বসিয়ে দিয়ে গেছে।

মনটায় আমার ভারি কৌতূহল হল, ভাবলাম এখানে—এ বনের ধারে, লোকালয় হতে এত দূরে এ মনুমেণ্ট কে বসিয়ে গেল। ষ্টীমারের লোকদের জিজ্ঞাসা করলুম,তারা বল্লে "একটি মেয়ের শ্মশানের উপর তার মা কন্যার শোকস্মৃতিটি স্থায়ী করবার জন্য, পাথরের গাঁথুনি তুলে দিয়ে গেছে।

এ অসভ্য জঙ্গলী দেশের ভিতরেও এমন একটি মায়ের হৃদয় আছে, যিনি পাথর দিয়ে আপনার ঘনীভূত অশ্রুকে রূপ দিয়ে গেছেন। এত শোক যে চোখের জলে তা নির্ব্বাণ হয়নি। বুকের উপরে পাথর তুলে দিয়ে তাকে অনির্ব্বেয় করে গেছেন।

আমার যমুনার ধারের তাজমহলের কথা মনে হলো; কিন্তু এই অখ্যাত গ্রামোপকণ্ঠে, এই অখ্যাত নদীকিনারে—অখ্যাত মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহধারাটি ঘাসের উপর ভোরবেলাকার শিশিরবিন্দুটির মত অশ্রুজলে টল্ টল্ করছে। তাজমহলের চাইতে শ্রেষ্টই মনে হলো। আমি ভক্তিভরে আমার মাথা অবনত করলুম।

তারপর রোজই ঐ মনুমেণ্টের সামনে দিয়ে ষ্টীমার বেয়ে যাই। রোজই চেয়ে দেখি। কোন দিন দেখি, রাশি রাশি ফুল, ফুলের মালা দিয়ে স্তম্ভটিকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে; কোন দিন ষ্টীমার চড়ায় আট্‌কালে, আস্‌তে যখন রাত্রি হয়, দেখি সাঁজের আঁধারে একটি মৃণ্ময় প্রদীপ মিট্ মিট্ করে স্তম্ভটির ধারে জ্বল্‌ছে। বেদনাময়ী জননীর মত যেন অনিমেষ আঁখি নিয়ে সেই জনহীন নদী-কিনারে একাকী জেগে বসে আছে। যেন মনে হয় অন্ধকারের বুক বেয়ে প্রদীপের শিখা হতে একটা রোদন-সঙ্গীত উৎসারিত হয়ে যাচ্ছে।

সমস্ত ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক জান্‌বার জন্য চেষ্টা কর্‌লুম। কিন্তু মজিদপুর এমন ষ্টেশন যে সেখানে এমন একটা লোক পাইনে যাকে জিজ্ঞাসা করি। একেত লোক সেখান হতে প্রায়ই উঠে না। তার উপর ফ্লাগ ষ্টেশন বলে ষ্টেশন-মাষ্টার কি একটা ঘাট সরকারও নাই। এখান হতে লোক উঠ্‌লে ষ্টীমারের কেরাণী বাবুদেরই টিকিট দিতে হয়।

(২)

সেদিনকার দিনটা বাদলা, হাতে কাজ কর্ম্মও কিছু নাই। ষ্টীমারের কামরাটিতে অন্যমনস্ক ভাবে পড়ে আছি। আর এমন বাদলার দিনে—যাক সে কথা আর প্রকাশ করে কাজ নাই। জীবনটাকে যখন বিরহের হাতে সঁপে দিয়েছি তখন আর কি? এমন সময়ে এক বৃদ্ধা কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে বাবু টিকিট। আমি তখন বেপরোয়া বসে আছি, ষ্টীমার কোন ঘাটে লাগ্‌লো, কোন ঘাটে না লাগ্‌লো, তার কোন খোঁজই রাখিনি। বুকের উপরে বিদ্যাপতির বিরহ গাতিটাকেই খুব কসে ভেজে নিচ্ছিলুম।

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"

বুড়িকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম। কোথা হ'তে উঠ্‌লে বাছা।

সে বল্লে "ওগো, ঐ মজিদপুরের ঘাট হতে" আমি বল্লুম ঠিক বল্‌ছ ত!

বুড়ী বল্লে "বেঠিক ত জীবনে কখন বলিনি।"

"বেশ, আচ্ছা, তোমার বাড়ীই কি ঐ মজিদপুরে? ভাব্‌লাম এর কাছ হতে ঐ 'প্রস্তরীভূত অশ্রু' সম্বন্ধে সবিশেষ খবর যদি কিছু পাওয়া যায়; বল্লুম টিকিট একটু পরেই দিচ্ছি, কিন্তু হাঁ বাছা ঐ যে তোমাদের ঘাটের ধারের গাঁথনি' টুকু—ও টুকু তোমাদের গাঁয়ের কোন্ মা গড়িয়েছিল, কেন গড়িয়েছিল ব'লতে পারো?

বুড়ী খানিক চুপ করে থেকে, তারপর একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বল্লে "শুনবে মাষ্টার মশাই। আমিই সেই মা, আর আমারই মেয়ের শ্মশানের উপর! আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলুম, বুড়ী ততক্ষণে কেবিনের সামনেটায় তার ছেঁড়া কম্বলখানা বিছিয়ে নিলে, আমি কোন আপত্তিই তুল্‌লাম না, একটা খালসী এসে বুড়ীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করবার উপক্রম করলে, আমি তাকে বারণ করে দিলুম। বুড়ী বল্‌তে লাগ্‌লো। তার বলার ভঙ্গিতেও যেন এই মেঘলা দিনের জলো হাওয়ার মত একটা হু হু স্বর মেশানো ছিল।

(৩)

সে অনেকদিনের কথা মাষ্টার মশাই, যেদিন প্রথম মেয়েটিকে বুকের মধ্যে পাই, তখন আমার চাঁদের হাট। ভাবি নাই যে জীবনে আমার কোনদিন কষ্টে পড়্‌তে হবে, যদিও আমার স্বামীর অবস্থা ভাল ছিল না, তবু তিনি যা রোজগার করতেন, তাতে ভাত কাপড়ের কষ্টে কোনদিন পড়্‌বো, তা আশা করিনি। যেমনই হোক মজিদপুরের চক্রবর্ত্তীদের একটা নাম ডাকও ছিল, যেমন নাম ডাক তাদের ছিল, তেমনি আমিও নাম ডাকের বৌ হয়ে তাদের সংসারে ঢুকলুম। পড়শীরা বল্লে গ্রাম উজ্জ্বল করা বৌ, এইবার চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী এলোগো, চোখ মুখ নাকের গড়ন যেন তুলিধরা।

রূপ নিয়ে এলাম বটে, কিন্তু রূপের পিছন পিছন একটা দুষ্ট রাহুও সঙ্গ নিলে। আমার শ্বশুর শাশুড়ী, বিধবা বড়-জা সেই বছরেই মারা গেলেন। সংসারে গৃহস্থালীর কাজ দেখ্‌তে আমি হলুম একা। পাশের খুড়তুতো জেঠতুতো অনেক 'জা' ছিল বটে, তারা আমার কাজে সাহায্য করবে কেন?

দেখলাম স্বামীর মনটিতে বড় দুঃখ হচ্ছে, এমন রূপসী পত্নীটিকে তিনি কি করে সংসারের কাজে খাটাবেন। তার উপরে কোলে মেয়ে আছে। ধপ্‌ধপে পরীর মত মেয়ে, সাধ্যে কুলালো না তাঁর, তাই ঝি আর রাখ্‌তে পার্‌লেন না। আমিও বল্লুম, দরকার নাই। সংসারের ধানসিদ্ধ হ'তে রান্নাবাড়া পর্য্যন্ত একাই করতে লাগ্‌লাম। তখন বুকে এত বল, প্রাণে এত সাহস ছিল। একদিন না বল্‌তেও ইচ্ছা হয় নি, মনে হয়েছিল, নারী-জন্মের এই ত চরম সুখ—স্বামী, পুত্রের সেবা করে চলে যাওয়া। হায় রে! সে কি দিনই জীবনে গেছে। তার পর দেশে মড়ক এলো, স্বামীও এই হতভাগিনীকে অনাথিনী ক'রে সরে পড়লেন।

সংসারের হাটে দাঁড়ালুম একা, বাপের কুলেও কেউ ছিল না—যেখানে

মাথা গুঁজে দুদিনও তিষ্ঠুবো। ও বাড়ীর ভাশুরের দুয়ারে মেয়েটিকে কোলে করে নিয়ে গিয়ে কাঁদাকাটি করলুম।

তিনি তিলক, চন্দন, নামাবলী ধারণ করতেন। বল্লেন "সেকি কথা, যাদবের বৌ, আমরা যদ্দিন আছি, তদ্দিন ত দেখ্‌বো," আমাকে একেবারে যেন নিজের ভাইবৌয়ের মতই ক'রে নিলেন।

কাগজপত্র যা চাইলেন, আমি নির্ব্বিরোধে তাঁর হাতে তুলে দিলাম, বল্লুম আমি মেয়ে মানুষ, বিষয় আশয়ের কি বুঝি, দু'টো খেতে পেলেই হ'লো।

পড়সীর কানাইএর মা বল্লে,"বউ অতটা বিশ্বাস করিস্‌নে, এটা কলিকাল।"

আমি বল্লুম "না- -বিশ্বাসই করবো," জা'টিরও দেখলুম আমার পরে বড় যত্ন, মেয়েটিকে ত কথাই নাই।"

মাষ্টার মশাই হেসে না, অকূলে যে ভাসবে, তার পক্ষে এ আদরে ভোলাটা বেশী কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু বছরখানেক পরে এ আদরের কারণটী ধরা গিয়েছিল। তা পরে বল্‌ছি।

ভাশুর আমার একদিন সন্ধ্যাবেলায় মুখটা ভার করে এসে বল্লেন, "বৌ মা, যাদব এমনও ছিল, এই পাঁচ বিঘে জমির খাজনা তাও মিটিয়ে যায় নি। সামান্য ২০৲ টাকায় নিলেম হয়ে গেল। কি আর বল্‌বো আমারও হাতে টাকা নেই যে—তা দুঃখ করো না মা, থাকো আমরা যদি এক মুঠো খেতে পাই—তবে তোমারও—

ভাশুরের এই বদান্যতায় আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়েএলো। আহা কলিকালে, মানুষ ত নয়—দেবতা!

খবর পেয়ে কানাইএর মা এসে বল্লে "বৌ, হ'লো এইবার, তাইত বলি এত তিলক চন্দনের ঘটা কেন? 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।' আমি বল্লুম "না কানাইএর মা, ওঁর আর দোষ কি। উনিত নিজে—"

"তা ঠিক, উনি নিজে না নিয়ে সম্বন্ধীর নামে কিনে নিয়েছেন, এইমাত্র যা তফাৎ; তুই কি বুঝ্‌বি—এইবার তোর হাতের তলা গাছের তলা হ'লো। আমি কিছু বুঝ্‌তে না পেরে কানাইএর মা'র দিকে চেয়ে রইলুম। কানাইএর মা বল্লে বেনামী করেছে—এইবার বুঝেছিস্।"

আমি বল্লুম "তাতে কি হয়!"

কানাইএর মা আমার দিকে এক কোপ-কটাক্ষ হেনে বল্লে "তুমি মরবে; তোমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না। বলে সে চলে গেল।"

আমি অবাক হয়ে রইলুম। তখনও সংসারটিকে তত চিনতে পারিনি, তখনও ভাশুর চাল ডাল পাঠাইয়া দেন। ভাবলুম এইত খাবার দাবার পাচ্ছি, আবার মজবো কেমন করে—যাকগে বিষয়।

কিছুদিন পরে আবার একদিন সন্ধ্যাবেলায় ভাশুর মুখটা আঁধার করে এসে বল্লেন, বাড়ীখানিও নিলেম হয়ে গেল বৌ মা! এবারেও সেই ভাশুরের সম্বন্ধী—তিনিই ডেকেছেন।

আমি ঘোমটার ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "বাড়ী গেলে থাক্‌বো কোথায়! কত টাকা হ'লে ফেরৎ পাওয়া যায়।"

ভাশুর বল্লেন "নিলেম রদের মামলা করে, আর দাবীর টাকা মিটাতে যে টাকা খরচ হয়ে যাবে, তাতে এমন তিনখানা বাড়ী হয়ে যাবে।"

আসলে তাঁর বাড়ীখানি নইলে বেশ সম্পুষ্যি হইত না। একথা তখন বুঝিনি—তারপরে বুঝেছি।

এইবার বুকের ভিতরটায় আঁধার ঘনিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো এই আমার সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় সাজানো বাড়ীটুকু—এ টুকু গেলে থাকৃবে কি? কোথায় দাঁড়াব! এ যে আমার স্বামীর ভিটে—মেয়েটিকে বুকে নিয়ে কাঁদতে লাগলাম। মেয়ে তখন চার বছরের হয়েছে। আমার চোখে হাত দিয়ে বারণ করতে লাগলো, মা কাঁদিস্‌নি। তার কচি প্রাণেও চোকের জলের উপরে এতটা দরদ বেজেছিল। শুধু পাকাদেরই ওতে কিছু হয় না।

ভিটে নিলেমের পর থেকেই দেখলুম ভাশুরের ভাবের রং আলাদা রকম হয়ে যাচ্ছে। আজকাল আমার সংসারে কোন কিছু নেই বলে পাঠালে—বলে পাঠান, আমার যে চিরকাল জোগাতে হবে, এমন ত কিছু কথা নাই। আর—সে সত্বও কারও সঙ্গে ছিল না; যতদিন বিষয় ছিল, ততদিন খাইয়েছি। আমিও ছাপোষা মানুষ "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।"

কানাইএর মা বল্লে "এইবার হলো বৌ, তখন যে বড় ভাশুর ভাশুর করেছিলি, এইবার তিলক চন্দনের মাহাত্ম্য বুঝ্‌লি ত!"

আমি কানাইএর মাকে কেঁদে বল্লুম "আমায় জায়গা দেখিয়ে দাও কানাইএর মা। আর আমি চক্রবর্ত্তী পাড়ায় থাকবো না; ওঃ এরা যে দিনে ডাকাতি করে।"

কানাইএর মা একবার দেখিয়ে দিল নদীর কালো জল! তারপর

কি ভেবে খানিকক্ষণ পরে বল্লে তোর স্বামীর একবন্ধু আছেন না ও পাড়ায়? তাঁর ওখানে থাকতে পার নি? তাঁরও বাড়ীতে লোকজন কম।

আমি বল্লুম "খুব পারবো।"

কানাইএর মা বল্লে "তবে তিনি -কল্‌কাতা হতে আসুন, দাঁড়া রাজি হয়ত ভালো।"

ভিটে উচ্ছেদের নুটিশ এলো, আমি আর দেরি কর্ব্বো না। বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু ভিটে ছেড়ে যেতে বুক ভেঙ্গে যেতে লাগলো, মনে ভাবলাম বন্ধুর বাড়ী গিয়ে একবার জমিদারের ওখানে যাবো। যিনি আমার ভিটে নিলেম করিয়েছিলেন। খুব কাঁদাকাটি করবো। মেয়ের গলায় একখানি পদক ছিল, সেখানি বন্ধক দিব। সে সব তখন আমার কল্পনা মাত্র। বাস্তবের হাতে দাঁড়িয়ে দেখলুম, মেয়ে মানুষের বিষয় ঐ রকমই যায়, তাই স্বামীহারা হলে তারা অনাথা হয়!

ঘরখানিও যেন আমার দিকে চেয়ে আমার দুঃখে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। আমিও কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বিদায় নিলুম। ঘর-কন্নার জিনিষ যা, তা দুটো প্যাঁটরাতেই ধরেছিল, অপরিচিত জায়গায় গিয়ে উঠ্‌লুম। মানুষের দুয়ারে ভিখারী হয়ে দাঁড়াতে মানুষের যে কি মাথা কাটা যায়, তা আমি যেমন ভুগেছি, এমন বুঝি জগতে আর কেউ ভোগে নাই।

আমি ঠিক দাসীর মতই সে বাড়ীতে রয়ে গেলাম। একবেলা খাওয়া, তাও খোরাকি কমিয়ে দিলুম। মেয়েও আমার দেখে দেখে সইতে শিখেছিল। সেই কচি বয়সে, নেই বল্লে সে আর জেদ করতো না। আমার মুখের দিকে চেয়ে থেমে যেতো। কতদিন এমন হয়েছে। মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলেছি। ভগবান নাও—মেয়েটিকে আমার নাও। মা হ'য়ে মেয়ের একটা সাধও মিটাতে পারলুম না। পূজা আসতো, পর্ব্বো আসতো মেয়ে আমার পড়শীর ছেলে মেয়েদের রাঙা কাপড় চোপড় চেয়ে চেয়ে দেখতো, সাহস করে আমায় ত কিছু বলতে পারতো না। সেই পাঁচ বছর বয়সেই সে তার মার দুঃখ জান্তে পেরেছিল।

বন্ধুজায়া যদি কোন সময় একখানি রঙ্গীন কাপড় বাহির করিয়া দিতেন, তা তার আমোদ কত! কোথায় রাখবে তার ঠিক করতে পারতো না। গ্রামের বাড়ী বাড়ী কাপড়খানি দেখিয়ে আসতো। বন্ধুজায়া বলতেন আচ্ছা আদেখ্‌লে মেয়ে—

কিন্তু এখানেও দেখ্‌লাম, সেই রাহু এসেছেন। পূজার বন্ধে বন্ধু চাকরী স্থান হতে বাড়ী আস্‌তেই দেখ্‌লুম, তাঁর স্ত্রীর মুখখানা অন্ধকার হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। আগে যাই হোক বন্ধুজায়া একটু ভাল ব্যবহার কর্‌তেন, এখন কথার মধ্যে তাঁর একটা রাগের আভাষ পাওয়া যেতে লাগ্‌লো। ঘটি বাটি ধোয়া কি কোন একটা কাজ করতে গেলেই, ওম্নি হাঁ হাঁ করে উঠে বল্‌তে লাগ্‌লেন। থামো থামো, রূপসী পদ্মিনী তুমি! যদি তোমার হাতে বেদনা লাগে? 'বুঝ্‌লুম—আমার কথা নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা তর্ক হয়ে গেছে।

এখানেও রূপ আমার কাল হলো। এত করে আধ পেটা খাইয়েও তাকে কাহিল কর্‌তে পারলুম না। দুঃখের উত্তাপে সে যেন দ্বিগুণ হয়েই ছুটে আস্‌তে লাগলো। আমি মুস্কিলে পড়ে গেলুম। অনাথিনী দুঃখিনী নারীর এত রূপ কেন? ময়লা কাপড় দিয়েও তাকে ঢেকে রাখ্‌তে পারিনে। ঠিক করলুম রূপের প্রধান অঙ্গ চুলগুলোকে এইবার কেটে ফেলে দেব।

বড় ভাবনাতেই দিন কাটাচ্ছি। এমন সময় দেখি পাশের বাড়ীর বৈষ্টবদের গরব এক গা গহনা পরে, টাকাকড়ি নিয়ে কল্‌কাতা হ'তে বাড়ী চলে এলো। এসে ত একবারে খুব ধুম ধাম করে পাঁচ পাঁচ টাকা দক্ষিণে দিয়ে ব্রাহ্মণদের খাইয়ে দিলে। একটা যে তার বিরুদ্ধে জনরব উঠেছিল, ঐ ভোজন দক্ষিণে দিতেই সব চুকে বুকে গেল।

আমি গরবের কাছে আনাগোনা সুরু করে দিলুম। আমার তখন বাইরে একটা চাকরীর নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছিল।

আমি বল্লুম "হাঁ গরব,সত্যি ঝিগিরিতে পয়সা পাওয়া যায়" গরব প্রথম দিন কেবল বলেছিল "হাঁ। দুঃখ মেহনত করলে পাওয়া যায় বৈ কি।" তারপর একদিন বল্লে "শোন বামুন দিদি। ঝিগিরিতে আর কত রোজগার করবো—"

আমি বল্লুম তবে—কি কর্‌তে?

সে প্রথমে খানিকটা হেসে,তারপর স্বর নামিয়ে বল্লে "রূপ বিক্রি কর্‌তাম।

আমি ত অবাক. তার রূপই বা কোনখানে যে তাই বিক্রি কর্‌তো। তবু হেসে উঠলাম না। বল্লুম "আমাদের তা পারা যায় না!"

সে বলে উঠলো, "খুব! খুব নেবে!"

তারপর আবার মৃদুস্বরে বল্‌তে লাগ্‌লো, পার্‌বে দিদি; পারো যদি একবছরেই—ওর নাম কি পাঁচ হাজার টাকা! তোমার যে রকম টানা চোখ—

আমিত আর তখন অত শত বুঝিনে, রূপ বিক্রি ত রূপ বিক্রি। বল্লুম "কি কর্‌তে হবে।"

সে কি বল্‌বে তা ভেবে পায় না—খানিক চুপ করে থেকে, তারপরে হেসে বল্লে, আগে কলিকাতায় চলো, তারপর সব বুঝিয়ে দেব।

আমি বল্লুম "না গরব, আগে তুই সব কথা না বললে যেতে পার্‌বো না।"

সে কেবলি হাস্‌তে লাগলো, তারপর একটু একটু করে ভাঙতে লাগলো, আমি শিউরে উঠলুম। বল্লুম না ভাই, কাজ নাই। কিন্তু একবারেই না বল্‌তে পারলুম না। আমার শিরায় শিরায় যে অপমান আর দুর্গতির কথা ভাসছিল। সমাজ যা আর আমার মুখের দিকে চায় নাই, আমিই বা কেন সমাজের মুখের দিকে চাইব? এ লাঞ্ছনা অপমানের চাইতে ঢের ভাল! নিজের রূপ বিক্রি করে মেয়েটিকে ত দুবেলা দুমুটো খাওয়াতে পার্‌বো। সারারাত ধরে ঐ রকম চিন্তা করলাম, পাপ পুণ্যের বোধ তখন লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কাজেও গলদ হতে লাগলো। আগের দিন ঘাটে সন্ধ্যাবেলায় একটা বাটি ফেলে এসেছিলাম; বন্ধুজায়া সকাল বেলা উঠেই আমায় মার মুখো হয়ে বল্লেন, হরিমতি, তুই বেরোবি কি না বল, চুরি চামারি কি হারাণোকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না—

আমি বল্লুম "আমি কি চুরি করেছি কিছু?"

বন্ধুজায়া বল্লেন "চুরি করিস্‌নি সত্য, কিন্তু মতলব ত ছিল। নইলে দিনের আলোয় ঘাটে বাসন পড়ে থাকে কোন হিসেবে; দুটো দুটো পেট ভরাই—হুঁস নেই।

আমি আর সইতে পারলুম না। অসময়ে যে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেটাও ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে ভুলে যেতে বসেছিলুম। গর্জ্জে বলে উঠলুম, "দুটো পেট পোষ সত্যি, কিন্তু খাটুনিতে কি তার উস্থল হয়ে যায় না!"

"হয়! কিন্তু চাকরাণীতে এত কথা কয় না! এখুনি দূর হয়ে যাও।"

মেয়েটা খেলাপাতির ঘরে খেলা কচ্ছিল। তাকে সেই মুহূর্ত্তে কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে একেবারে কানাইএর মার ঘরে উঠলুম। প্যাঁটরা দুটো কানাইএর মার ঘরে নামিয়া বল্লুম,—কানাইএর মা, আমি কলকাতায় ঝিগিরি কর্‌বো। তুমি আমার মেয়েটিকে দেখো। আমি মাসে মাসে ওর খোরাকী পাঠাবো, কানাইএর মা আপত্তি তুল্লে, বল্লে "আমিত আর বামুনের মেয়ে নই, সদ্‌গোপের মেয়ে—কি করে হবে।"

আমি বল্লুম "তা হোক। তুমি ওকে চারটী ভাতই দিও, তারপর প্রাশ্চিত্তি করতে হয় করে নেবো, কিন্তু বামুনের দিকে আমি আর নাই।"

সেই দিনই গরবের কাছে গিয়ে সব ঠিক ঠাক করে এলাম, চারিদিকে ঢিঢি পড়ে গেল।

বন্ধুজায়া গ্রামের জনে জনে ডেকে বলতে লাগলেন, এখানে ভাত দিচ্ছিলাম কাপড় দিচ্ছিলাম, তা ওর পোষাল না। কলকাতায় এইবার নাম লেখাতে চললেন।

আমার কোন দিকেই কাণ ছিল না, কেবল ভাবছিলাম, একবার বেয়ে চেয়ে দেখতেই হবে। টাকা কিছু চাই। তা যে প্রকারেই হোক।

যখন এতদূর ভিতরে উন্মাদনা, যে রূপ বেচা ত তুচ্ছ, টাকার জন্য খুন ডাকাতি করতেও বোধ হয় পেচপাও হইতাম না।

গরব আমার সেতো হয়ে চল্লেন, যাবার কদিন আগে হতেই মেয়েকে আমার বুকে করে করে কেবল সারারাত কেঁদেছি। যাবার দিন আর চোখে দেখতে পাইনে—

ভোর বেলায় সে তখন ঘুমোচ্ছিল, ভাবলাম আর ডাকবো না, আমি তার যে অভাগী মা, ঘুমন্ত অবস্থাতেই একটা চুম খেয়ে উঠছি, সে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেই আমার গলাটী জড়িয়ে বলে উঠলো "মা কোথাও যেয়োনি।

অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে নিয়ে বল্লুম, "চল্লুম মা, আবার আসবো, তোমাকে ত বলেছি, তোমার খাওয়া পরার জন্যই—।"

একবার আব্দার করলে "একবার কাঁদলে তারপর বুঝে বল্লে, মা আমি একলাই থাকবো।"

আমি বল্লুম "একলা কেন মা, কানাইত্রর মা থাকলো। নাইলে পেট চলবে কোথা থেকে। আমাদের যে কিছু নেই মা।"

পাঁচ বছরের মেয়ে তবু সে আমার সব বুঝতো। মেয়ে আমার সঙ্গে ষ্টীমারের ঘাট পর্য্যন্ত এলো; তারপরে আমি যখন আর একবার শেষবার তার মুখে চুমু খেয়ে ষ্টীমারে উঠলাম, তখন সে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইলো।

বুকে আমার হাজার লাঠির আঘাত বাজতে লাগলো; আমি ডাকছেড়ে কেঁদে উঠলাম। গরব কত বোঝাতে লাগলো, ষ্টীমারেরও কতলোক আমার কাছে এসে জড় হলো, তবু আমি কান্না থামাতে পারলুম না।

মেয়ে আমার যে কোথায় মুখটি নিচু করে দাঁড়াবে, কখন কে ছুটি খেতে দেবে, তবে খেতে পাবে, খিদে পেলে মুখফুটে কাউকে কিছু বলতেও পারবে না। আমার মনে হ'তে লাগলো যেন আমার হৃদপিণ্ডটা মল্লিদপুরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। যাকে বুকের রক্ত দিয়ে পালন করে ছিলাম ওঃ—"

অনেকক্ষণ বুড়ী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো, আর কোন কথাই বলতে পা'রল না। ইতিমধ্যে আমার যে একটু কাজ বাকি ছিল, সেরে নিয়ে এসে বস্‌লুম। বুড়ী আবার বলতে লাগলো "সত্যি কথা বলবো মাষ্টার মশাই। গরব তখন আমার খুব করেছিল, নইলে আমি এমন আনাড়ী, এতদিন কোথায় কোন চা বাগানে পড়ে মরে থা'কতুম। সে যে কত হাজার রকম প্রলোভন, তার কি ব'লবো। যাক সে সব আর তোমাদের শুনিয়ে কাজ নাই। বারান্দায় সারি সারি সাজানো নরকগুলি—মাষ্টার মশাই তোমরা দেখে ভাবো বুঝি সুখের আশাতেই তারা রূপের বাতি জ্বালিয়ে বসে আছে। যদি একটু খোঁজ নিতে মাষ্টার মশাই; এই রকম আমার মতই হাজার হাজার দুঃখিনী পেটের জ্বালায় ছুটে এসেছে। দিবারাত্র তুষানলে দগ্ধ হয়ে তবু পথ ছাড়তেও পাচ্ছে না। বেঁচেত এক প্রকারে থাকতে হবে। সমাজেও ফেরবার যে উপায় নেই। তবে প্রলোভনে পড়েও অনেকে যে না এসেছে তা নয়! কিন্তু দুঃখ সবাইকারই এক।

হাজার রকম ফাঁড়া কাটিয়ে যখন এক বড় লোকের ছেলেকে গ্রেপ্তার করলুম। তখন আমার সুখের দিন ফিরলো। এত দিনের মধ্যে মাত্র দশটি টাকা কানাইএর মার নামে পাঠাতে পেরেছিলুম।

দুঃখের কথা আর কি বলবো মাষ্টার মশাই, আমার নাচ গানও শিখতে হয়েছিল। আমিও তখন এমনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, কিছুতেই পেচপাও হতেম না। হাসি-কান্নার আশ্চর্য্য অভিনয় সাধ্‌তে হয়েছিল। অবশ্য গুরুও পেয়েছিলাম। এই কাঁদছি, ঠিক পরের মুহুর্ত্তে যেই বাবু এলেন, কে বলবে কোনও কালে আমার চখে জল গড়িয়ে পড়েছিল! যেন আনন্দের ফোয়ারা আর কি! সে সব কথা খুটিয়ে বলতে এখনও হাসি পায়, লজ্জাও করে—আবার দুঃখও হয়।

একটু সুখের ঘরকন্না পাততেই পড়শীরা উপদেশ দিলে, তুমি এইবার তোমার মেয়েটিকে নিয়ে এসো, মেয়ের কথা শুনে অনেক বাড়ীওয়ালী হাতে টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজি হয়েছিল।

আমি বল্লুম ওরে বাসরে।—নিজেই ডুবেছি, সেই ভাল আবার মেয়েকে নিয়ে এনে এই নরকপুরি দেখাবো, মা হয়ে তাতো কিছুতেই পারবো না।

হাতে কিছু মোটা রকম জমলেই বেরবের মত দেশে ফিরবো। দিন গুণতে লাগলুম। কানাইএর মার নামে ঠিক টাকাও পাঠাইয়াছি, মেয়ের খবরও আসছে। কার্ত্তিক মাসের শেষে একদিন একখানা পত্র এলো, মেয়ের আমার জ্বর হয়েছে, মেয়ে আমাকে দেখতে চায়।

একবার একদিনের তরেও বাছাকে দেখে আসবো বলে যাবো যাবো করছি, এমন সময় বাবুর খেয়াল চাপলো আমাকে নিয়ে একবার ভূস্বর্গ কাশ্মীরে যাবেন, মেমের মত গাউন পরে খোলামুখ তাঁর স্ত্রী ত বেরুতে পারবেন না, আমাকেই তাঁর স্ত্রী হয়ে বেড়িয়ে আসতে হবে। উৎসন্নের পথে নেমে যাবার সময় বড় লোকের ছেলেদের এই রকম কত খেয়ালই চাপে।

দুদিনের ছুটি চাইলুম, বল্লুম যে একবার দেশ হতে ঘুরে আসতে হবে। বাবুর মত হলো না, অবশ্য আমার মেয়ে আছে একথা বাবু মহলে কেউ টের পায় নাই। তাহলে যে খেলো হতে হতো। যাক্।—

ভূস্বর্গে ত ছুটলুম। এদিকে আমার হৃদয়ের স্বর্গ যে হারাতে বসেছি তার দিকে ত চেয়ে দেখলুম না। মায়ের হৃদয়ের টানও অনেকটা কমে গিয়েছিল। অনবরত কৃত্রিমতার সঙ্গে ঘরকন্না করে, আসল জিনিষটীকে হারাতে বসেছিলুম। আমার ভিতরে যে মা, সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার অন্দরে যে একটি দিব্য প্রদীপ জ্বলছিল সেটা কে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়েছিল। নইলে আমি মা, যে মেয়ের দুঃখ দেখেই বেরিয়ে পড়েছিলুম, সেই মেয়ের অসুখ শুনেও যেতে পাল্লুম না। কেন—কি দরকার ছিল? যে টাকা হাতে জমেছিল তাতেই ত খুব চলতে পারতো, তবু হা ঈশ্বর! চিরকাল দুঃখের বোঝাই বহেছি। একটু সুখের মুখ দেখতে পেয়েছি, আর ফিরতে পারি কি?

কাশ্মীর যাবার আগে মেয়ের নামে পার্শেলে আঙ্গুর, বেদানা কিসমিস আপেল, জামা কাপড় পাঠিয়ে দিলুম।

* * * *

কাশ্মীর হতে ফিরে এসে দেখি, পার্শেল সমেত সব জিনিষ ফেরৎ এসেছে। কিছু বুঝতে বাকী রইলো না। সোনাদানা যা কিছু গায়ের গয়না ছিল, ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলুম। আমি তখন কতকটা উন্মাদিনীই হয়ে গেছি।

গরব এসে বল্লে "মেয়ের শ্মশান দেখবে, চল বাড়ী যাই।"

ভাবলাম তার দেহের পোড়া ছাইও খানিকটা সেখানে আছে, তাই বুকে মাখবো। যদি জ্বালা জুড়ায়।

এলাম শ্মশান দেখতে, কি বলবো মাষ্টার মশাই, বেশ্যার মেয়ে বলে কিনা, আলাদা এক তেপান্তর নদীর ধারে, আমার মেয়েকে ফেলে দিয়ে গেছে। বাছা একটু আগুনও পায় নাই। ঐখানেই শেয়ালে কুকুরে ছেঁড়া ছিঁড়ি করে খেয়েছে।

একটুকরো হাড় পড়েছিল। কানাইএর মাকে বল্লুম "এইখানে ঐ হাড়ের উপর আমার মেয়ের ঘর তৈরী করতে হবে।"

যত গয়না গাঁটিছিল বিক্রীকরে কলিকাতায় অর্ডার দিলুম। পাথরের ঘর এলো, আর তার উপরে এক থাম এলো। তুমি দেখছ কি মাষ্টার বাবু, সেই পাথরের ছোট ঘর টুকু, সেখানে আমার মেয়ের ঘরকন্না সাজনো আছে। ইচ্ছা হয়ত ষ্টীমার হতে নেমে একদিন দেখে এসো।"

এই পর্য্যন্ত বলে বুড়ী নেমে গেল। আমি দেখলাম ষ্টীমার কালিগঞ্জের বান্ধাঘাটে এসেছে, বুড়ীকে টিকিট খানা দিয়ে বাইরে একবার বেরিয়ে এলাম। দেখলাম মেঘ কখন কেটে গিয়ে পশ্চিমাকাশে সূর্য্যদেবও অস্ত যাবার উপক্রম কচ্ছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম "বুড়ী, তোমার মেয়ের নাম ছিল কি!"

বুড়ি বল্লে "পঞ্চাননী, পঞ্চানন ঠাকুরের দুয়ার ধরে হয়ে ছিল।"

সেদিনকার মেঘলা দিনের দিবসটা আমার চোখের উপর দিয়ে একটা স্বপ্নের ঢেউ তুলে দিয়ে সুদূর পারে মিলিয়ে গেল।

বাস্তবিক অনেকদিন বুড়ীর কথাটা মনে থাকবে।

খুড়োর উইল।

[লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি এল।]

(১)

স্যার উইলিয়ম শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি দয়া করে সত্যকথা বলুন।" ডাক্তার তাঁহার কঠিন রোগজীর্ণ মুখের দিকে মুহূর্ত্তমাত্র তাকাইয়া সত্যকথাই বলিলেন।

স্যার উইলিয়ম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া ধীরভাবে মাথা নাড়িলেন।

"মিঃ মর্টন, আপনাকে ধন্যবাদ! আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে, কিন্তু এত খারাপ হয়ে গেছে, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। মৃত্যু যে এত সন্নিকট তা জানতাম না।"

এই কথা বলিয়াই তাঁহার টুপি লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"আমি জীবনে অনেক সুখ ভোগ করেছি; পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ক্রমেই হীন অবস্থা হ'তে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছি। অনেকে মনে করেন, আমি সুখভোগের অপেক্ষা পরিশ্রম করেই জীবনের বেশীর ভাগ কাটায়েছি। কিন্তু সে কথা সত্য নয়। কাজের মধ্যে আমি কি নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করি, তাঁরা তা কিছুই অনুভব করতে পারেন না। ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার কোন কারণই নেই। আপনাকে পুনর্ব্বার ধন্যবাদ। এখন আমি আসি।"

ডাক্তার মর্টন জানালার নিকট গিয়া সেই সুগঠিত সরল মূর্ত্তির দিকে একবার তাকাইলেন। মূর্ত্তিটী রাস্তার উপর দিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন তিনি ঘাড় নাড়িয়া মনে মনে বলিলেন,—"বৃদ্ধ শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটুকুও ভীত হয় নাই।"

স্যার উইলিয়মের গাড়ী রাস্তার মোড়েই দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু তিনি গাড়োয়ানকে গাড়ী লইয়া যাইতে আদেশ করিয়া নিজে হাঁটিয়াই বাড়ী চলিলেন। ধীর-পদবিক্ষেপে সমতলভূমির উপর দিয়া "ব্রামলে হলের"

অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাস্তার অনেক লোক সসম্মানে মাথা নোয়াইল বা হস্তে টুপি স্পর্শ করিল। জনসাধারণে ধনী, সমৃদ্ধিশালী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রতি এইরূপই সম্মান দেখাইয়া থাকে।

পাহাড়ের উচ্চদেশে তাঁহার সুন্দর প্রাচীন অট্টালিকা অবস্থিত। স্যার উইলিয়ম তাঁহার বাসস্থানের দিকে পশ্চাৎ করিয়া কল-কারখানা ও গৃহ-শ্রেণীর শীর্ষদেশে, ভাসমান ধূমরাশির দিকে অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে তাকাইয়া রহিলেন। সেই কারখানার ভিতরেই তাঁহার অসীম ধনরত্ন সঞ্চিত। সুতরাং তাঁহার অন্তঃকরণও সেইখানে পড়িয়া রহিয়াছে।

তিনি শৈশবে সামান্য কর্ম্মচারীরূপে ঐ কারখানায় কাজে ঢুকিয়াছিলেন। সেইখান হইতেই তিনি এই অগাধ ধনরত্ন অর্জ্জন করিয়াছেন এবং ব্রামলে উপাধিধারী প্রাচীন উচ্চবংশের বিষয়-সম্পত্তি সব ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। বাল্যকালে "ব্রামলে হলের" দিকে তিনি কতবার লুব্ধনয়নে তাকাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ লোভই একদিন যে অধিকারে পরিণত হইবে, তাহা তিনি তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

আজ তাঁহার জীবন-নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে। দ্রুত হস্ত সঞ্চালনের দ্বারা কারখানার নিকট যেন বিদায় লইয়া তিনি এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পরে ধীরে ধীরে বাস-ভবনের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার প্রবেশের জন্য হলের দরজা অনতিবিলম্বেই উন্মুক্ত হইল। বাড়ীর চাকর বাকর প্রত্যেকেই জানিত যে, কোন কাজের জন্য, এই বৃদ্ধ প্রভুত্বপরায়ণ লোককে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইলে, দোষীর আর কিছুতেই নিস্তার নাই। স্যার উইলিয়ম বিস্তৃত হলঘরের ভিতর দিয়া তাহার প্রান্ত-ভাগে একটি ছোট কামরায় প্রবেশ করিলেন।

কামরাটি যে কেবলমাত্র ছোট তাহা নহে; ঘরের আস্‌বাবও খুব সাধাসিধে। একটি সাধারণ টেবিল, একখানি কাঠের চেয়ার ও একখানি অতি অল্পমূল্যের আরাম-কেদারা। ঘরের কোণে এক প্রকাণ্ড সিন্দুক। ঘরটি দেখিতে সামান্য আফিস ঘরেরই মতন; কোনও ধনী উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বৈঠকখানা বলিয়া মনে হয় না। শিকারের বন্দুক, মাছ ধরিবার ছিপ্‌ প্রভৃতি কোনও সখের জিনিষ ঘরের মধ্যে ছিল না। কোনপ্রকার ক্রীড়ার প্রতি তিনি আসক্ত ছিলেন না। সকল প্রকার ক্রীড়াকেই তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার ন্যায় কঠোর পরিশ্রমশীল ব্যবসায়ী লোকেরা

ক্রীড়াকৌতুকে মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে আদৌ সম্মত নহেন। ঘরের আস-বাবের মধ্যে দেওয়ালে কেবল একখানি ছবি টাঙান। তাও ছবির সম্মুখভাগ দেওয়ালের দিকে উল্টানো।

স্যার উইলিয়ম সেই শক্ত কাঠের চেয়ারের উপর বসিয়া এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঘনসন্নিবিষ্ট লোমযুক্ত ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া ও ওষ্ঠদ্বয় দন্তের দ্বারা দৃঢ়ভাবে পিশিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল তিনি সম্মুখে তাকাইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর চেয়ার হইতে উঠিয়া দেওয়ালের নিকট গিয়া ছবিখানি সোজা করিয়া দিলেন এবং অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

ছবিখানি একটি বালকের ফটো। বালকটি বেশ সুশ্রী; মুখের ভাব ভঙ্গী দেখিতে অনেকটা স্যার উইলিয়মের মতন। কিন্তু ইহার দেহের অবয়-বের গঠন তাঁহার অপেক্ষা অধিক কোমল ও সুন্দর। বালকের নয়নদ্বয়ে বালসুলভ চপলতা ও নির্ভীকতার মধ্যেও কোমলতা ও মহানুভবতা প্রতি-ফলিত হইয়া রহিয়াছে।

এই ছবিখানি স্যার উইলয়মের একমাত্র পুত্রসন্তান উইলফ্রেডের ফটো। পিতা পুত্রকে নিজের প্রাণাপেক্ষা বেশী ভাল বাসিতেন এবং তাহার সুন্দর আকৃতি, মনের তেজ, ও অসম-সাহসিকতার জন্য মনে মনে বিশেষ গর্ব্বও অনুভব করিতেন! কিন্তু অধীনস্থ অপরাপর ব্যক্তির ন্যায় পুত্রকেও তিনি কঠোর শাসনাধীনে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু উইলফ্রেডও পিতার এই উদ্ধত স্বভাব পূর্ণ মাত্রায় লাভ করায় আদৌ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে নাই।

পিতাপুত্রের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রায়ই ঝগড়া হইত। তবে ব্যাপার একদিন বিশেষ গুরুতর হওয়ায় পিতা ক্রোধে অন্ধ হইয়া পুত্রকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। উইলফ্রেড পিতাকে যথার্থই প্রাণের সহিত ভালবাসিত। বিতাড়িত হইয়াও সে প্রথম দরজার নিকট কিছুক্ষণ এই আশায় দাড়াইয়াছিল যে, পিতার রাগ পড়িয়া গেলে, তিনি পুত্রকে পুনর্ব্বার স্নেহভরে ডাকিয়া লইবেন। কিন্তু স্যার উইলিয়মের কঠিন হৃদয় কিছুতেই বিগলিত হয় নাই। তিনি পুত্রের ঔদ্ধত্য কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন নাই। এখন কিন্তু সেই অবিমৃষ্যকারিতার কথা ভাবিয়া তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

পুত্রের গৃহত্যাগের পর এই যে প্রথমবার তিনি পুত্রের বিরহে কাতর হইলেন, তাহা নহে। পিতৃস্নেহ যে পাষণের মধ্যেও প্রবাহিত হয়, তাহা তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উইলফ্রেড যে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া বসবাস করিয়াছে, অনেক অনুসন্ধানের পর এই সংবাদ পাইয়া তিনি সেখানেও তাহাঁকে বাড়ী ফিরিয়া আসিবার জন্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত পান নাই। সেই সময় হইতেই পুত্রের প্রতিকৃতিখানি দেয়ালের দিকেই মুখ করিয়া রহিয়াছে। উইলিয়ম পুত্রকে ক্ষমা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাঁকে বিফল মনোরথ হওয়ায় তাঁহার হৃদয় পুনর্ব্বার পাষাণবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে।

মৃত্যু সকল কলহের অবসান করিয়া দেয়। এখন বার্দ্ধক্যে আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় তিনি তাঁহার পুত্রের সেই কোমল অথচ তেজোদীপ্ত মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার বিরহে কাতর হইয়া পড়িলেন।

তিনি ছবি হইতে শেষে মুখ ফিরাইলেন। পরে সিন্দুক হইতে কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া সেগুলি টেবিলের উপর খুলিয়া রাখিলেন। এমন সময় ঘরের দরজায় কে ধাক্কা মারিল।

তিনি তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলি মুড়িয়া খবরের কাগজে ঢাকা দিলেন। তারপর বাহিরে দণ্ডায়মান লোকটির উদ্দেশে বলিলেন,—"ভিতরে আসতে পার।"

দরজাটি আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল। একজন যুবক ধীরপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবকটি লম্বা ও রোগা। তাঁহার আকৃতি দেখিলে তাঁহাকে উচ্চবংশজাত বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রখর বুদ্ধির ছাপ অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি স্যার উইলিয়মের কারখানর কার্য্যাধ্যক্ষ, তাঁহার একমাত্র ভ্রাতষ্পুত্র। যুবকের নাম হেসকেথ কার্টন। উইলফ্রেড অবর্ত্তমানে, তিনিই এই সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী। যুবক ঘরে ঢুকিয়া সার উইলিয়মের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"আপনার কাজে ব্যাঘাত দিলাম, ক্ষমা করবেন। কিন্তু জরুরি কাজ, আফিসের পাশবইখানি আমার দরকার।"

যুবকের কণ্ঠস্বর ধীর ও সুমিষ্ট। কিন্তু গলার স্বর শুনিয়া তাঁহাকে গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলিয়াই মনে হয়।

স্যার উইলিয়ম পাশবইখানি হাতে করিয়া বলিলেন,—"না, না, আমার

কাজে কিছুই ব্যাঘাত হয় নি। তোমাকেও আমার বিশেষ দরকার ছিল; দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এখানে এসে বস। এই বলিয়া তিনি কার্টনকে বসিবার জন্য চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। কার্টন্ দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার কৌতুহলপূর্ণ চক্ষুদ্বয় বৃদ্ধের শুষ্ক বদন-মণ্ডলে নিবিষ্ট করিয়া ধীরভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্যার উইলিয়ম বলিলেন,—"ডাক্তার মর্টন আজ আমাকে কিছু নূতন খবর দিয়েছেন। তিনি আমার হৃদযন্ত্র পরীক্ষা করে দেখে বল্লেন, আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না।

হেসকেথ অকস্মাৎ এই কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষুদ্বয় নত করিলেন; পরে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া কাতরভাবে বলিলেন,—

"এঁ্যা, এঁ্যা, আপনি,—আমার যে আর এ সংসারে আপনার বলবার কেহই নাই!"

"না না, এর জন্য দুঃখ করো না। তবে যদি তোমার নিজের কথা ধর, সে আলাদা কথা। একদিন না একদিন আমাদের সকলকেই মর্‌তে হবে। আমার কিছুরই অভাব নেই। ইচ্ছা মাত্রই পূরণ হয়েছে। অবশ্য আমার বয়স তেমন কিছু বেশী হয়নি বটে, আজকালকার দিনে আমার চেয়ে বয়সে বড় এখনও অনেক লোক বেঁচে আছে; কিন্তু যা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য দুঃখ করে কোন ফল নেই।"

হেসকেথ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি মর্টনের কথা সত্যই ফলবে? আপনি লণ্ডনের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করুন।"

স্যার উইলিয়ম মাথা নাড়িয়া এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইলেন। পরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"তার কোন দরকার নেই। আমি জানি, ডাক্তার মর্টন কখনও ভুল করেন না। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন; কিন্তু আমি তাহা আদৌ গ্রাহ্য করি নাই। কার্য্যের মধ্যেই ডুবে ছিলাম। মর্টন যাহা বলেছেন, তাহা ঠিকই ফলবে জানবে। থাক্, ওকথা ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে গোটাকতক কাজের কথা বলতে চাই।"

এমন সময় স্যার উইলিয়মের চক্ষুদ্বয় হঠাৎ ছবির প্রতি আকৃষ্ট হইল। হেসকেথও লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, ছবিখানি উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছিল,

এখন ঠিক সোজা ভাবেই ঝুলিতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার মুখের ভাব একটু বিকৃত হইল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তিনি ছবি হইতে তাঁহার দৃষ্টি সরাইয়া লইলেন।

স্যার উইলিয়ম পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—"অবশ্য, আমি উইল করিয়া বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত করেছি। সত্য কথা বলিতে গেলে, দুইখানি উইল তৈয়েরী করেছি।" এই বলিয়া তিনি দলিলের উপর হইতে সংবাদ পত্রখানি সরাইয়া লইলেন। বলিলেন,—"একখানি উইলে, হাঁ সেই কথাই তোমাকে বলবো, তোমার সে বিষয় জানাও দরকার—আমি সব বিষয় সম্পত্তি তোমাকেই দিয়ে গেছি।—"

হেসকেথের মুখ মুহূর্ত্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল। কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয় জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। স্যার উইলিয়ম কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন, উহা লক্ষ্য করেন নাই। তিনি যখন মুখ তুলিয়া হেসকথের মুখের দিকে তাকাইলেন, তখন হেসকেথ আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার মুখভাব তখন গম্ভীর ও উদ্বেগপূর্ণ।

"উইলফ্রেড চলে যাবার ও তুমি আসবার কিছুদিন পরেই আমি এই উইল লিখি। কিন্তু পুত্র-স্নেহ একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়া দেখছি অসম্ভব। সে মন্দ ব্যবহার করলেও আমার পুত্র। তুমি জান, আমি তাকে পত্র দিয়ে ছিলাম।" কণ্ঠস্বর নীচু হইয়া আসিল। হেসকেথ ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার কথায় সায় দিলেন।—"কিন্তু ফিরে আসার কথা দূরে থাক, পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেয় নাই।"

"হয়ত পত্র তাহার হস্তগত হয় নাই; কিম্বা পত্রের উত্তরেরও কোন গোলমাল হতে পারে।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"না, তা কখনই হতে পারে না। সে যে ঠিকানায় ছিল, তাহার বিশেষ সংবাদ লইয়া আমি তাকে সেখানে পত্র দিয়াছিলাম।

"আর আজকালকার দিনে পোষ্ট আফিস হইতে চিঠি মারা যায় না। থাক্ সে কথা ছেড়ে দাও। আমি তার দোষ ক্ষমা করেছি। হয়ত এ ক্ষেত্রে আমরা দুজনেই সমান দোষী। এ সব বিষয়ে কথা বলে মন খারাপ করা ভিন্ন আর কোন ফল নাই। যা'হোক্, আমি তাকে একেবারেই ত্যজ্য পুত্র করে যাই নাই, তারও একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে গেছি।"

তিনি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল দেখিয়া হেসকেথের মনে হইল তিনি বোধ হয় কোন গুরুতর বিষয় চিন্তা করিতেছেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"তুমি ক্লাইটি ব্রামলেকে চেন?" হেসকেথ মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। কৌতূহল ও উদ্বেগে তাঁহার মন একতিল স্থির ছিল না। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে বা মুখের ভাবে সেরূপ কোন চিহ্নই প্রকাশ পায় নাই।

স্যার উইলিয়ম বলিলেন,—"সেই যুবতীকে নিয়েই আমাদের মধ্যে ঝগড়া। আমি উইলফ্রেডকে বলেছিলাম, তাকে বিবাহ করতে।"

হেসকেথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন?"

বৃদ্ধ বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কামড়াইতে লাগিলেন; পরে বলিলেন "তার পিতার নিকট আমি নানাপ্রকারে ঋণী। এই বিষয় সম্পত্তি সবই তাঁর কাছ থেকেই আমার কেনা। তিনি বিপদে পড়িয়া আমার নিকট এই সম্পত্তি বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার করেছিলেন, পরে তাহা শোধ দিতে না পারিয়া এই বিষয় আমাকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। কিন্তু আমি তাঁহার এই যুবতী কন্যাকে বড়ই স্নেহ করিতাম। সেইজন্যই তাহাকে পুত্রবধূ করিয়া পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারিণী করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু উইলফ্রেড আমার কথায় সম্মত হয় নাই।"

হেসকেথ মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলেন,—"মহাশয়, উইলফ্রেড সে রমণীকে আদৌ চিনিত না;—সে ক্ষেত্রে তাকে কি রকমে সে বিবাহ করে?"

স্যার উইলিয়মের মুখ লাল হইয়া উঠিল।

"তাতে কি এসে-যায়? সে পরে তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে পারতো। এমন সুন্দরী, সম্ভ্রান্তবংশীয়া যুবতীকে বিবাহ করতে কাহারও আপত্তি থাকতে পারে না। উইলফ্রেড সব দিক ভাল করে না ভেবে এ বিবাহে অস্বীকার করলে, তাতে আমার ও ক্লাইটি দুজনেরই অপমান করা হইল। সে কথা ভাবতে ভাবতে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠে—পুরাতন সব কথা মনে পড়ে যায়। এ বিষয়ে আর আলোচনা করে কাজ নেই। আমার বিশ্বাস, এতদিনে সে তাহার নির্বুদ্ধিতা বেশ বুঝতে পেরেছে।"

হেসকেথ তাঁহার প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"তাহ'লে আপনি—"

স্যার উইলিয়ম তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ও হাতে এক খণ্ড কাগজ লইয়া বলিলেন,—"এই দেখ উইল, ইহার দ্বারা আমার বিষয় সম্পত্তি, ধনরত্ন সবই ক্লাইটি ব্রামলেকে দিয়ে গেছি।"

হেসকেথ ক্ষণিক উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই আবার দ্রুতভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। মনের ভাব এইরূপে হঠাৎ প্রকাশিত হওয়ায় রাগে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কামড়াইতে লাগিলেন।

স্যার উইলিয়ম বলিতে লাগিলেন,—

"এই সর্ত্তে দিয়ে গেছি যে, আমার মৃত্যুর পর ঠিক একবৎসর পূর্ণ হইলে উইলফ্রেড যদি তাহাকে বিবাহ করতে অসম্মত হয়, তাহ'লে এই সম্পত্তি ক্লাইটী যাবজ্জীবন ভোগ করবে ? তার মৃত্যুর পর। সম্পত্তি তোমার অধিকারে আসিবে। তবে উইলফ্রেড যদি বিবাহের প্রস্তাব করে, আর ক্লাইটি তাহাতে সম্মত না হয়, তাহলে এ বিষয় সম্পত্তি উইলফ্রেডই ভোগ করিবে।"

দুইজনেই নিস্তব্ধ। পরে হেসকেথ গাঢ়স্বরে বলিলেন,—"এ উইল আপনার টিকৃবে না।"

স্যার উইলিয়ম হাসিলেন। "তুমি কি মনে কর, আমি একটা যা তা উইল করেছি ? তা নয়। আমি অনেক এটর্ণি ব্যারিষ্টারের মত নিয়েছি। উইলের ভাষা এত সরল যে, সামান্য বালকেও তার মর্ম্ম বুঝতে পারবে। এমন কি উকিলেও এর ভেতর কোন দোষ খুঁজে পাবে না। এ উইল আদালতে নামুঞ্জর হবার কোন কারণই নাই। আর সজ্ঞানে আমি এই উইল প্রস্তুত করেছি।"

হেসকেথ চেয়ারে হেলান দিয়া তাঁহার লম্বা সরু আঙ্গুলগুলি ওষ্ঠের উপর বুলাইতে লাগিলেন ও উইলের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন।

স্যার উইলিয়ম বলিতে লাগিলেন,—"আমি নিশ্চয় জানি যে, আমার এ উদ্দেশ্য সফল হবে। উইলফ্রেড নিশ্চয়ই মিস ব্রামলেকে বিবাহ করিবে। কিন্তু তাহলেও তোমার দুঃখিত হবার কোন কারণই নেই। আমি তোমারও উপায় করে গেছি। তোমার জন্য কল কারখানা ও কুড়ি হাজার পাউণ্ড রেখে গেলাম।"

কারখানা ও কুড়ি হাজার পাউণ্ড ; বাস্তবিকই প্রচুর ধন-সম্পত্তি বলিতে হইবে। কিন্তু ব্রামলে সম্পত্তির সহিত তুলনায় ইহা কত তুচ্ছ ও অল্পমূল্য, অথচ সেই বিষয় সম্পত্তি, অগাধ ধনের এরূপ বিলি বড়ই হাস্যজনক।

হেসকেথের পাংশু মুখমণ্ডল আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার কণ্ঠ-তালু শুকাইয়া উঠিল। তিনি রুদ্ধভাবে বলিলেন,—আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম। যথার্থই অসীম! যৎসামান্য পারিতোষিক ব্যতীত এত অর্থ আমি আশা করি নাই।"

স্যার উইলিয়ম হাত নাড়িয়া বলিলেন,—"তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ দেখে, আমি বড়ই আনন্দিত। আরও দেখ, তোমাকে এই যে কারখানা ও মূলধন দিয়ে গেলাম। এই হতে তুমিও একদিন অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে। আমারও প্রথম এত বিষয় সম্পত্তি ছিল না। আমি সামান্য কর্ম্মচারীরূপে এই কারখানায় কাজে ঢুকে ছিলাম। তোমার কাছে সে সবইত পূর্ব্বে বলেছি! আমি যখন ঢুকেছিলাম তখন কারখানার অবস্থা বড় খারাপ ছিল। আমি তার অবস্থা এখন ঢের উন্নত করেছি। এ ব্যবসাও দেশের মধ্যে বড় লাভজনক। তুমি এ কাজ আরও ভাল ভাবে চালাতে পারবে। তোমার বুদ্ধি আছে। তোমার ভবিষ্যত বড়ই উজ্জ্বল!" তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন। তাঁহার মুখভঙ্গী বিকৃত হইয়া গেল। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়া বসিলেন। হেসকেথ তাঁহার নিকট গিয়া উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন,—"আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

স্যার উইলিয়ম প্রকৃতিস্থ হইয়া আরাম কেদারার হাতল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "না, না আমি একটু অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম মাত্র। এক গ্লাস জল চাই। হেসকেথ তোমাকে ধন্যবাদ! আহারের সময় উপস্থিত; সাজসজ্জা করতে হবে। ঐ শোন ঘণ্টা বাজছে।"

হেসকেথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। হলঘরের তৈলচিত্রগুলির উপর অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মি পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, চিত্রগুলি এই প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকার পূর্ব্ব-মালিক ব্রামলে বংশের ব্যক্তিগণের প্রতিকৃতি। স্যার উইলিয়ম বাড়ীখানি জিনিষপত্র সহিতই কিনিয়াছিলেন। হেসকেথ তাঁহার পোষাক পরিবার ঘরের জানালার নিকট গিয়া বাহিরে তাকাইলেন। ভেলভেটের ন্যায় কোমল তৃণাচ্ছাদিত সমতল ক্রীড়াভূমি, পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত উদ্যান. এই সব তিনি একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

এই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি এক যুবতী স্ত্রীলোক পাইবে, কিম্বা অমিতব্যয়ী পুত্র উইলফ্রেড তাহাকে বিবাহ করিলে, সেই পাইবে। আর হেসকেথ যে প্রতিদিন

নিজের মনকে প্রবোধ দিয়া আসিতেছে যে, সে বৃদ্ধের পুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাকে নিজের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতে হইবে! উইলের পূর্ব্ব সর্ত্তটি কার্য্যে পরিণত হইলে, তবে ক্লাইটির মৃত্যুর পর সে বিষয় পাইবে; আর সম্প্রতি কেবল কারখানা ও টাকা লইয়াই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অনেকে ইহা পাইলেই আপনাকে ধন্য মনে করিত, কিন্তু উচ্চাভিলাষী হেসকেথ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। কারখানার বর্ত্তমান অবস্থা বেশ আশাজনক বটে; কিন্তু এই অট্টালিকা ও বিষয় সম্পত্তির প্রতি তিনি বড়ই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সত্য বটে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে, এই লাভজনক ব্যবসা হইতে স্যার উইলিয়মের ন্যায় তিনিও বিস্তর ধন সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু এই ব্রামলে বিষয় সম্পত্তির অধিকারী ত হইতে পারিবেন না; অমিতব্যয়ী উইলফ্রেড তাহা ভোগ করিবে। এবং ব্রামলের মালিক স্যার উইলফ্রেড কার্টনের সহিত, কারখানার সত্ত্বাধিকারী উপাধিবিহীন হেসকেথ কার্টনের বিস্তর পার্থক্য রহিয়া যাইবে।

তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্যার উইলিয়মের এই খামখেয়ালী কার্য্যের বিরুদ্ধে তাঁহার মনে মনে বড়ই রাগ হইল। এই রাগ তাঁহার পাংশু গণ্ডস্থলে ও কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয়ে স্পষ্ট লক্ষিত হইল। উইলফ্রেড মারা গেলে হেসকেথ তাঁহার স্থান অধিকার করিতেন; তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত। কিন্তু উইলফ্রেড ক্লাইটিকে বিবাহ করিবে, এই ভবনে সুখে বাস করিবে, তাহাদের পুত্র জন্মাইলে সে আবার উত্তরাধিকারী সূত্রে এই বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইবে; আর সে এই সবের উন্নতি প্রয়াসে কত না কঠোর পরিশ্রম করিয়াছে, কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, বৃদ্ধের প্রাণপণ সেবা করিয়াছে, এ সবই বিফল হইল। এই চিন্তাই তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য হইল।

তিনি ধীরে ধীরে সময়োপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন। প্রশস্ত ভোজ ঘরের এক কোনে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত ছিল। স্যার উইলিয়ম আগুনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার হস্তদ্বয় গরম করিতেছিলেন। হেসকেথ ঘরের ভিতর ঢুকিলে বলিলেন, "আজ বড়ই ঠাণ্ডা বলে মনে হচ্ছে।"

পুরাতন ভাণ্ডারী টেবিলের উপর খাদ্যের ডিস সাজাইয়া দিল। তাঁহারা দুজনে আহারে বসিলেন। স্যার উইলিয়ম অতি অল্পই আহার করিলেন এবং মদও খুব কম পান করিলেন। তাঁহার আকৃতি স্বভাবতই

শান্ত ও গম্ভীর। আহারান্তে তিনি কারখানা, ব্যবসা, বিষয় সম্পত্তি, এই সব বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। হেসকেথ সাধারণতঃ মদ্য অতি অল্প পরিমাণেই পান করিতেন, কিন্তু সেদিন একটু বেশী মাত্রায় খাইলেন। স্যার উইলিয়ম চেয়ারখানি আগুনের দিকে সরাইয়া একটু কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"হেসকেথ, চাকরদের বল, টেবিল পরিস্কার করে দিক্। আমি আজ রাত্রে এইখানেই বসবো। এ ঘরটা বেশ গরম।"

চাকরেরা টেবিল পরিষ্কার করিয়া দিল। হেসকেথ একটি চুরুট ধরাইয়া দাঁড়াইয়া টানিতে লাগিলেন। দুজনেই নীরব। উইলিয়াম হঠাৎ উঠিয়া গেলেন। দু'এক মিনিট পরে হাতে দুখানি দলিল লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

হেসকেথ দলিল দুখানির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার ভয় হইল, পাছে তাঁহার মুখে এমন কোন চিহ্ন প্রকাশিত হয় বা তিনি এমন কোন বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলেন, যাহাতে তাঁহার মনের ভাব বাহির হইয়া পড়ে। তিনি বারাণ্ডার এদিক ওদিক পাইচারি করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন ধূমপান করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে ভোজ ঘরের জানালার ভিতর দিয়া উঁকি দিয়া দেখিতেছেন।

স্যার উইলিয়ম সম্মুখস্থ টেবিলের উপর খোলা দলিল দুখানি রাখিয়া চেয়ারে বসিয়াছিলেন। হেসকেথ এবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্যার উইলিয়ম নিশ্চল অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছেন!

এইদৃশ্যে হেসকেথ চমকিয়া উঠিলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন, স্যার উইলিয়ম গভীর নিদ্রিত, তখন ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধের জীর্ণ মুখমণ্ডল হইতে দলিলের প্রতি তাকাইলেন। তিনি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে টেবিলের নিকট গিয়া নত হইয়া দলিলপত্র দেখিতে লাগিলেন। একখানি দলিল স্যার উইলিয়মের হাতের ভেতর রহিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে তাঁহার অবর্ত্তমানে হেসকেথই স্যার উইলিয়মের সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইবে; অপর দলিলে তিনি সবই ক্লাইটি কিম্বা উইলফ্রেডকে দান করিয়া গিয়াছেন। হেসকেথের মনে সন্দেহ হইল, তবে কি বৃদ্ধ এখনও ইতস্ততঃ করিতেছেন?

হেসকেথ ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাগ্য এখন নিক্তির ওজনে ঝুলিতেছে!

স্যার উইলিয়ম চেয়ারে বসিয়া নড়িয়া উঠিলেন। যেন নিদ্রোত্থিত হইয়া গভীর নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। হেসকথ তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে দরজার পাশে চলিয়া গেলেন। স্যার উইলিয়ম কাঁপিতে কাঁপিতে জাগিয়া উঠিলেন এবং নিকটবর্ত্তী উইলখানি হাতে করিয়া হেলিতে হেলিতে আগুনের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আগুনের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি অস্ফুট স্বরে চেঁচাইয়া উঠিলেন এবং কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। পরে হেসকেথের নাম ধরিয়া ক্ষীণ স্বরে ডাকিলেন।

হেসকেথ এই ঘরের ভিতর প্রথম ঢুকিতেছেন, এইরূপ ভাব দেখাইয়া বৃদ্ধের সম্মুখীন হইলেন। স্যার উইলিয়ম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। হেসকেথ চাকরদের ডাকিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ঘণ্টাতে হাত রাখিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সেই নিশ্চল মূর্ত্তি হইতে চক্ষু ফিরাইয়া মেজের উপরিস্থিত দুটি উইলের প্রতি তাকাইলেন।

হেসকেথ উইল দুখানি মেজ হইতে তুলিয়া লইলেন। হাঁফাইতে হাঁফাইতে তিনি একবার বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইলেন, তারপর অগ্নিকুণ্ডের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। এমন সময় দরজায় কে ধাক্কা মারিল। হেসকেথ টেবিলের উপর উইলদুখানি রাখিয়া দরজা খুলিতে গেলেন। ভাণ্ডারী শোলস্ ঘরের ভিতর ঢুকিল।

"মহাশয়, স্যার উইলিয়মের জন্য গরমজল এনেছি।" হেসকেথ চুপি চুপি বলিলেন,—"চুপ্! স্যার উইলিয়ম ঘুমুচ্ছেন। জল আমার কাছে রেখে যাও।"

হেসকেথ জলপাত্র লইয়া গিয়া দেখিলেন, স্যার উইলিয়ম দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় হেসকেথের মুখের উপর নিবদ্ধ। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, -"মহাশয়, আপনার জল এনেছে।"

বৃদ্ধ জলপাত্র একদিকে সরাইয়া রাখিলেন। তিনি মেজ হইতে একটি উইল তুলিয়া অগ্নির দিকে স্খলিত চরণে অগ্রসর হইলেন। হেসকেথ নিমেষের মধ্যে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং উইলখানি বৃদ্ধের হাত হইতে অগ্নি কুণ্ডে পড়িবার পূর্ব্বেই তিনি ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর মাংসখণ্ড হইতে বঞ্চিত কুকুরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে দ্বিতীয় উইলখানি টেবিল হইতে টানিয়া লইয়া আগুনে নিক্ষেপ করিলেন।

স্যার উইলিয়ম রাগে চেঁচাইয়া উঠিলেন এবং হেসকেথকে সজোরে আকড়াইয়া তাঁহার হাত হইতে অপর উইলখানি কাড়িয়া লইলেন। তিনি হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিলেন,—"হেসকেথ! হেস—! চোর বদমায়েস! এখন তোমাকে বেশ চিনতে পেরেছি। অকৃতজ্ঞ! আমার পুত্রের সর্ব্বস্ব ঠকিয়ে নেবার ইচ্ছা? তা কখনই হবে না। এখনও সময় আছে। আমি তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিব।" তাঁহার স্বর বদ্ধ হইয়া গেল। তিনি পুনর্ব্বার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। শেষ উইলখানি তখনও তাঁহার হাতে জড়াইয়া রহিয়াছে।

হেসকেথ বৃদ্ধের দেহের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া আগুনের দিকে তাকাইলেন। তখনও জ্বলন্ত কয়লার উপর কতকগুলি ছিন্ন পত্রাংশ দেখা যাইতেছিল। তিনি লাঠি দিয়া কাগজগুলি আগুনের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন। সেগুলি নিমেষের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। তখন হেসকেথ পকেটে হাত পুরিয়া স্যার উইলিয়মের দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। স্যার উইলিয়মের শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, তাঁহার মাথা বক্ষের উপর নত হইয়া পড়িল; তিনি চেয়ারের উপর পড়িয়া গেলেন। তাঁহার শরীর অসাড় হিম। হেসকেথ বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধের জীবলীলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। তিনি হাসিতে লাগিলেন,—"এখনও সময় আছে, নয়? শাস্তি দিবে, কেমন?" সৌভাগ্য ক্রমে মৃত্যু তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে এই বিশাল সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছে!

হেসকেথ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মৃত ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। এমন সময় বাহিরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। তখন তিনি আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া বারাণ্ডায় চলিয়া গেলেন। মুহূর্ত্ত পরেই শোলস্ ভয় বিজড়িত স্বরে হেসকেথের নাম ধরিয়া চেঁচাইতে লাগিল। হেসকেথ তাড়াতাড়ি দরজার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"কেন, কি হয়েছে?"

শোলস্ হাঁফাইতে হাঁফাইতে উত্তর করিল,—"মশাই, সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, স্যার উইলিয়ম,—মিঃ হেসকেথ!—মনিব মারা গেছেন।"

শোলসের চীৎকারে বাড়ীর আর সকলেও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। চাকর বাকরেরা চেয়ারের চারিধারে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

শোলস্ বলিতে লাগিল,—"আর কোন আশা নাই। এ আশ্চর্য্য রকমের মৃত্যু! ওঁর হাতে কি একটা রয়েছে দেখুন দেখি?"

হেসকেথ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার মর্টন ভিড় ঠেলিয়া স্যার উইলিয়মের নিকট উপস্থিত হইলেন।

বৃদ্ধের দিকে একবার মাত্র তাকাইয়া তিনি মাথা নাড়িলেন। পরে হেসকেথকে বলিলেন,—“একে ঘরে নিয়ে যাও, আমি জানতাম যে এঁর শরীর গতিক বড়ই খারাপ। ইঁহার জন্য মন বড় উদ্বিগ্ন ছিল। তাই সংবাদ লইতে এসেছিলাম। আমার জানা ছিল, এ রকমেই এঁর মৃত্যু হবে। কি করছিলেন?

হেসকেথ মাথা নাড়িলেন। কর্কশস্বরে এলোমেলোভাবে বলিলেন,—“আমি—আমি কিছুই জানি না। আমি বাইরে চুরুট খাচ্ছিলাম, এটা দেখছি দলিল—আপনি কি এটা নেবেন?—আমি—আমার এটা হাতে করা উচিত নয়।”

ডাক্তার মর্টন অতি কষ্টে মৃতের শক্ত আঙ্গুলগুলি খুলিয়া উইলখানি বাহির করিয়া লইলেন। হেসকেথ কম্পিত স্বরে বলিলেন,—“ওটা আপনার কাছেই রেখে দিন।”

ডাক্তার মর্টন বলিলেন,—“নাঃ ইহা এটর্ণী মিঃ গ্রেঞ্জারকে পাঠাইয়া দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত।”

হেসকেথ উদাসভাবে “হুঁ।” বলিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ একজন চাকরকে উইল সমেত মিঃ গ্রেঞ্জারের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

এক ঘণ্টা পরে, সমস্ত বাড়ী গম্ভীর নিস্তব্ধতা ধারণ করিল। হেসকেথ আগুনের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ রুক্ষ ও বিবর্ণ, দেহ অবসন্ন। প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি চেয়ারের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন স্যার উইলিয়মের মৃতদেহ এখনও সেখানে বসান রহিয়াছে। তারপর আগুনের দিকে হস্ত বিস্তার করিয়া আরাম জনক এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যে উইলে তিনি ব্রামলে সম্পত্তি ও স্যার উইলিয়মের অগাধ ধনরত্নের অধিকারী, সেই উইল এখন মিঃ গ্রেঞ্জারের হাতে নিরাপদে রহিয়াছে!

* * * * *

স্যার উইলিয়মের মৃতদেহ কবরিত হইল। পুত্র উইলফ্রেড ও ভ্রাতুষ্পুত্র হেসকেথ ব্যতীত আত্মীয় বলিতে তাঁহার আর কেহই ছিল না। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ, প্রজারা, কারখানার লোকেরা সব দল বাঁধিয়া সমাধিক্ষেত্রে

তাঁহার মৃতদেহের অনুসরণ করিয়াছিল। কারণ এই সদাশয় মৃতব্যক্তি, যদিও কাজের সময় খুব কড়া লোক ছিলেন বটে, তথাপি দেশের সকল সদনুষ্ঠানেই অর্থ সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সকলে তাঁহার সদ্গুণাবলীর স্মরণ করিয়া তাঁহার জন্য যথার্থই শোক করিয়াছিল। মৃতদেহ কবরিত হইয়া গেলে, জনতা ভাঙ্গিয়া গেল। সম্ভ্রান্তব্যক্তিরা মৃত ব্যক্তির উইল শুনিবার জন্য তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে সমবেত হইলেন।

মিঃ হেসকেথের জীর্ণ ও পাংশু বদনমণ্ডল দেখিয়া উপস্থিত সবাই স্থির করিলেন, যে, খুল্লতাতের মৃত্যুতে তিনি বড়ই কাতর হইয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর, কথাবার্ত্তা ও আচার ব্যবহার দেখিয়া সকলেরই মনে হইল, তিনি যথার্থই গভীর শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন। মৃতব্যক্তির প্রতিও তিনি যথাযোগ্য সম্মান দেখাইতে লাগিলেন। তিনি মিঃ গ্রেঞ্জারের ডানপাশেই বসিয়াছিলেন। ডাক্তার মর্টন, চাকরবাকর, কারখানার লোকজন প্রভৃতি যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা কৌতুহল পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। সকলেই ভাবিতেছিলেন যে উইলে হেসকেথের কিরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বৃদ্ধ এটর্ণী মিঃ গ্রেঞ্জার শান্ত, ধীর ও স্বল্পভাষী। তিনি হেসকেথকে উইল সম্বন্ধে কেবল একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বৈঠকখানা ঘরে যাইবার পথে তিনি হেসকেথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিঃ কার্টন, আপনি কি স্যার উইলিয়মের উইলের সারমর্ম্ম কিছু জানেন?" হেসকেথ মাথা নাড়িয়া ধীর ও উদাসীন ভাবে উত্তর করিলেন,—"না; তিনি কখনও আমার নিকট ও সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না।"

মিঃ গ্রেঞ্জার তাঁহার কথা ঘাড় নাড়িয়া অনুমোদন করিলেন। তাঁহারা চেয়ারে গিয়া বসিলেন। মিঃ গ্রেঞ্জার স্বাভাবিক ধৈর্য্যের সহিত উইলখানি সর্ব্বসমক্ষে বিস্তার করিলেন এবং "ইহা স্যার উইলিয়মের উইল। আমিই ইহা লিখেছিলাম," এইরূপ সূচনা করিয়া ধীর স্পষ্টস্বরে উইলখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

হেসকেথ হাতে মাথা রাখিয়া সম্মুখে হেলিয়া বসিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় নিম্নগামী। তিনি বাহ্যিক শান্ত ও সংযত মূর্ত্তি ধারণ করিলেও তাঁহার অন্তঃকরণ দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল এবং মস্তিষ্ক গভীর চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল।

উইলে সকলকেই স্যার উইলিয়ম কিছু কিছু দিয়া গিয়াছেন। তিনি কাহাকেও বাদ দেন নাই। কারখানার বৃদ্ধ কর্ম্মচারী, বাড়ীর চাকর, ডাক্তার, এটার্ণী কাহাকেও তিনি বঞ্চিত করিয়া যান নাই। স্থানীয় দাতব্য সভা সমিতিতেও বিস্তর টাকা দি া িয়াছেন।

হেসকেথ উদ্বিগ্ন হইয়া এইসব শুনিতে লাগিলেন। কখন তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবে!

মিঃ গ্রেঞ্জার একদমে পড়িতে লাগিলেন। সমবেত লোকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দৃষ্ট হইল। সকলেই বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। হেসকেথের প্রতি তাঁহাদে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সকলেই তাহার দিকে তাকাইতে, হেস-কেথ একটু চমকিয়া উঠিল।

"নির্ব্বোধ বৃদ্ধ কি পড়িতেছে? সে উইলের আসল অংশ পড়িতেছে না কেন? যে অংশে লেখা আছে হেসকেথ বৃদ্ধের অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইবে, সেই অংশটুকু পড়িতেছে না কেন? কেন সে "ক্লাইটি ব্রামলে," "আমার পুত্র উইলফ্রেড কার্টন" এই সব বাজে নাম উচ্চারণ করিতেছে? যে স্বর এতক্ষণ হেসকেথের কর্ণকুহরে কর্কশভাবে বাজিতেছিল তাহা হঠাৎ থামিয়া গেল। গ্রেঞ্জার হেসকেথের মুখের দিকে তাকাইলেন। হেসকেথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সবাই তাঁহার প্রতি সাহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে; তিনি তাঁহার মাথা তুলিয়া আশাপূর্ণ অথচ হতভম্ব ভাবে চাহিতে লাগিলেন, যেন এটর্ণীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনি মধ্যপথে থামলেন কেন? পড়ুন।"

মিঃ গ্রেঞ্জার স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি তাকাইলেন। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আপনি উইলের মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারলেন?"

হেসকেথ কর্কশস্বরে উত্তর করিলেন "না।" তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া গমনোদ্যত ব্যক্তিগণ থামিয়া তাঁহার প্রতি তাকাইলেন।

মিঃ গ্রেঞ্জার উইল হাতে করিয়া পুনর্ব্বার আবশ্যকীয় অংশটুকু পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু পড়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেসকেথ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং এটর্ণীর প্রতি উদাসীনভাবে তাকাইয়া হাসিয়া উঠিলেন। এই অট্টহাস্য শুনিয়া সবাই চমকিত হইল। হাস্যে উন্মত্ততার চিহ্ন বর্ত্তমান! তারপর তিনি পুনর্ব্বার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না, কোন লোক বা জিনিষের

দিকে চাহিলেন না। তবে একটা বিষয় তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, ভ্রমবশতঃ প্রয়োজনীয় উইলখানিই তিনি পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

কাকা-বাবু

লেখক—শ্রীসতীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

পিতার মৃত্যুর পর রাজীব তাহার ভ্রাতা ভবানীর উপর তাঁহার সকল ভালবাসা টুকু নিঃশেষে ঢালিয়া দিল, রাজীবের পিতা বর্ত্তমানেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। পিতা মুকুন্দলালের বড় ইচ্ছা ছিল যে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র ভবানী চরণেরও বিবাহটী দেখিয়া যান। কিন্তু তাহা হইল না, বৃদ্ধ,— ভবানী চরণের বিবাহ দেখিবার বহুপূর্ব্বেই সরিয়া পড়িলেন। তখন তাহার পুত্রের বিবাহের কথা একবারও মনে হইল না। যাইবার সময় রোগ শয্যায় পড়িয়া রাজীবের হাত দুইখানি বক্ষে চাপিয়া বলিয়া গেলেন "বাবা— আমি ত তোমায় অর্থাভাবে লেখা পড়া শিখাতে পারিনি, কিন্তু দেখো বাবা তোমার ছোট ভাইটীকে তোমার আমার মত নিরক্ষর ক'রে রেখো না। আর তোমাদের তিন কুলে কেউ নাই বাবা, তুমিই ভবানীকে দেখো শুনো।" রাজীব সেই হইতেই ভ্রাতা ভবানীকে স্নেহের নিবীড় বক্ষপুটে বেষ্টন করিয়া রাখিত। যখন ধীরে ধীরে অন্ধকারের কালোছায়া তাহাদের গ্রামখানির উপর ধীরে ধীরে নামিয়া আসিত। তখন ভবানী তাহার শিশু সুলভ চাপল্য প্রকাশ করিয়া দাদার কাঁধে উঠিয়া বলিত "দাদা আমাদের বাবা কোথায় ?— রাজীব হুকায় টান দিতে দিতে আকাশের দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া বলিত "ঐখানে—স্বর্গে—।" ভবানী বিস্মিত হইয়া যাইত, তাহার শিশু মস্তিষ্কে এ সকল একটা ধাঁধার মত প্রতীয়মান হইত। তারপর সন্দিগ্ধ চিত্তে কোলে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিত "ওখান থেকে বাবা পড়ে যায় না—দাদা ? রাজীব তখন কি উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইত না। শুধু "ওখানে ঘর আছে" বলিয়া তামাকে মনঃ সংযোগ করিত। আর থাকিয়া থাকিয়া তাহার একটা অতি পুরাণো কথা মনে পড়িয়া যাইত। আর অমনই তাহার চোখ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু ভবানীর মাথায় ঝরিয়া পড়িত। ভবানী চাঁদ দেখিতে

দেখিতে চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিত "দাদা, মাথায় কিসের জল পড়ল? বোধ হয় টিকটিকি মুতে দিয়েছে—নয় দাদা?" "হুঁ" বলিয়া রাজীব চুপ করিয়া একটা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইত, আশার মৃদু গুঞ্জন শুনিতে পাইত। রাজীবের চক্ষে তাহার অলক্ষ্যে নিদ্রা জড়াইয়া আসিত। সে হুকা রাখিয়া দিয়া ঢুলিত। ভবনী বলিত "দাদা ঘুম পেয়েছে?" "হ্যাঁ ভাই। তুই তোর বউদিদির কাছে যা।" বলিয়া ভবানীকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া চাটায়ের উপর লুটাইয়া পড়িত। ভবানী রন্ধনশালায় গেলেই মেনকা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিত "কিরে তোর দাদার কাছ থেকে চলে এলি যে? সে অনুযোগের সুরে বলিত "বৌদি দাদা ঘুমিয়ে পড়েছে।" "আ মরে যাই—এই টুকু ছেলে জেগে রয়েছে, কিন্তু দেখনা—" বলিয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়া ভবানীকে বলিত "আলুভাজা খাবি?" ভবানী আলু ভাজার লোভ ত্যাগ করিতে পারিত না। সে আলুভাজা খাইতে খাইতে বৌদিদির কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। তখন তাহার বয়স মাত্র ছয় বৎসর।

(২)

ভবানীচরণ ৭ বৎসরে পড়িতেই রাজীব তাহার হাতে খড়ি দিয়া গ্রামের পাঠশালায় পাঠাইয়া দিল। ভাই মানুষ হইবে, ভাই মহকুমার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইবে, তাহা শুনিয়াও যে রাজীবের আনন্দ। সে পিতার মৃত্যুকালীন কথা রক্ষা করিবার জন্য ভ্রাতার বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বিঘা কয়েক জমি বন্ধক দিল, ভাবিল—তাহার ভাই মানুষ হইলে অমন কত বিষয় সে করিতে পারিবে। সে এখন হইতে এক আশা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিল। যখন গুরুমশাই আসিয়া বলিত "ওহে রাজীব তোমার ভায়ের শৈশব পাঠ শেষ গেছে। এখন সরল পাঠ আরম্ভ কর্ত্তে হবে।" তখন রাজীবের আনন্দে চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত। বক্ষস্থল স্ফীত হইয়া উঠিত। সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিত "সে বই খানার দাম কত? কত দিতে হবে?" গুরু মহাশয়ের মুখ দিয়া অমনি বাহির হইয়া যাইত "টাকা-খানেকেই না হয় দাও।" রাজার সেই টাকাটী যে রকমে হউক গুরু-মশাইকে আনিয়া দিত, গুরুমশাই দশ আনা নিজস্ব রাখিয়া বাকি ছয় আনা দিয়া একখানা সরল পাঠ কিনিয়া দিতেন। রাজীবের মনে তাহাতে এতটুকু সন্দেহও হইত না। সে মনে করিত তাহার ব্যয় সার্থক হইয়াছে।

কুটীরের কক্ষে বসিয়া যখন ভবানী চরণ কেরাসিনের আলোকে স্বর করিয়া পড়িত :—

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম কলি ফুটিয়া উঠিল।

তখন রাজীব হুকা হস্তে চাটায়ের উপর বসিয়া তাহা শুনিত, বুঝি বা থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে পড়িত—কখনও বুঝি ভবানী চরণের রাত্রি প্রভাত হইল পাখীর 'কাকালীতে মুখরীত হইয়া উঠিবে। বুঝি বা তখন তাহাদের সংসার কাননের কত শত কুসুম ফুটিয়া উঠিবে। হায়! সে রকম দিন কি ভবানীর হইবে? সে কি পিতৃবাক্য রক্ষা করিতে পারিবে? ভগবানই তাহা জানেন। রাজীব দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল।

এই রকম ভাবেই বৎসর কাটিয়া গেল, ভবানী চরণ নিজ অধ্যবসায় বলে তাহার অনেক সমপাঠীদিগকে ফেলিয়া উপর ক্লাশে উঠিয়া গেল। বলা বাহুল্য ভবানীচরণ মাইনর পাশ করিয়া গ্রামের ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছিল। রাজীব লোচন ভ্রাতার বিদ্যা শিক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসিয়াছিল।

ভবানী যখন রন্ধন শালায় বসিয়া ইংরাজি পড়িত তখন তাহার বৌ-দিদি ও দাদা এক রহস্য জালের মধ্যে প'ড়িয়া যাইত! মনে হইত—হায়! কবে ভবানী এই রকম করিয়া কোন সাহেব সুবোর সহিত কথা বলিবে? কবে দু পয়সা ঘরে আনিবে? কবে তাহার দাদার শ্রম সার্থক ও পিতার বাক্য সফল করিবে, এই রকম করিয়া রাজীব লোচন মনের মধ্যে এক সুখের স্বপ্ন অঙ্কিত করিত।

(৩)

যেদিন পিতৃবাক্য সফল ও দাদার শ্রম সার্থক করিয়া ভবানী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, সে দিন তাহার বৌদি আসিয়া রাজীবকে বলিল "ওগো এবার ত ঠাকুরপোর একটা বিয়ে না দিলে ভাল দেখায় না। একটী ভাল দেখে মেয়ে ঠিক কর।" রাজীব আনন্দে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "আচ্ছা দেখব।" বলিয়া হুকায় জোরে এক টান দিল।

তার দিন কয়েক পরে একদিন রাজীব আসিয়া মেনকাকে বলিল "ও মেনকা শুনেছ ও পাড়ার ভাটেদের বাড়ীতে একটী ভাল মেয়ে আছে! বলেছে কিছু দিবে খুবেও।" মেনকা আনন্দে সম্মতি জানাইল।

যেদিন রাত্রে ভবানী চরণ ফুল শয্যায়, সেই দিন মেনকা একটা পুত্র সন্তান প্রসব করিল। ভবানীর প্রাণ একবার সেই শিশুর নিকট ছুটিয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। এদিকে একটী বন্ধন তাহাকে টানিয়া রাখিল। তাহা হইলেই বা করুণা কি মনে করিবে? করুণা ভবানীর নববিবাহিতা স্ত্রী। সে যাইতে পারিল না। থাকিয়া থাকিয়া তাহার একখানি স্নেহ কোমল মুখের কথা মনে পড়িতেছিল। সে মুখখানিকে সে দৃষ্টি দানের সময় একবার মাত্র চকিতের দেখা দেখিয়াছিল। যদিও করুণার মুখখানি অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু তথাপি কি যে সে মুখের আকর্ষণী শক্তি—সেই শক্তিই তাহাকে টানিয়া রাখিয়াছিল।

(৪)

আর বছর কয়েক পরে একদিন প্রভাত হইতে না হইতেই করুণা স্বামীকে জাগাইয়া দিয়া বলিল "ওগো ওঠ না—বেলা হয়েছে।" ভবানী বিছানার উপর বসিয়া চক্ষু মর্দ্দন করিতে লাগিল। করুণা ভবানীকে একটু প্রকৃতিস্থ দেখিয়া বলিল "বলবে যে তোমার দাদাকে বলবে যে।" ভবানী কাপড় পরিতে পরিতে বলিল—"হঁা—যাই।"

রাজীব হুকা লইয়া বাহিরে বসিয়াছিল। ভবানী ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বলিল "দাদা একটা কথা আছে।" রাজীব হাসিয়া বলিল "কি কথা রে?" "দেখুন একলা আর কত পারি?" রাজীব কথাটা ভাল রকম বুঝিতে পারিল না।" ভবানীর কথাটা বলিতে অত্যন্ত ভয় করিতে-ছিল। কিন্তু মুখ দিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া গেল "আজ্ঞে, একলা আর ত সবার খাওয়া দাওয়ার ভার নিতে পারি না।"

রাজীব কথাটা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল। এই কি সেই ভাই? যে ভায়ের উপর একদিন সে কত আশা করিয়াছিল। আজ সেই ভাই তাহার সম্মুখে কি বলে? রাজীবের হৃদয় দুইখান হইতে চাহিল। কিন্তু সে সংযত হইয়া আপনমনে হুকায় মনঃসংযোগ করিল। ভবানী কিছুই না বলিয়া উঠিয়া গেল। তাহার যদিও কথাটা বলিবার আদবেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু করুণার বশ সে; সে যাহাই বলিবে ভবানীকে যে তাহাই করিতে হইবে। তাহা না হইলে যে করুণা তাহার উপর অযথা রাগ করিবে। যদিও কথাটা বলিবার সময় তাহার মনে হইয়াছিল যে সে আজ কাহার কৃপায় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া চাকুরি করিতে পাইয়াছে!

পিতার মৃত্যুর পর কে তাহাকে বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে! কিন্তু হায়, করুণার মুখ মনে করিয়া ভবানীর নিকট সকলই ভাসিয়া গেল। বলিয়া ফেলিয়া সে নিতান্ত অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেল। বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতেই করুণাকে বলিতে শুনিল "দিদি মোটে ত শুনতে ৫০৲ টাকা, কিন্তু দেখতে ত পাচ্ছ। এতে না ভিন্ন হ'লে কি করে চলে? রাগ করোনা, ঠিক কিনা ভেবে দেখ?"

ভবানী কথাটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিল। তৎক্ষণাৎ করুণাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিবে মনে করিল। কিন্তু—আহা সেই মুখখানি—সেই মুখখানিই তাহার কাল করিল। কিছু বলিতে পারিল না, বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। হৃদয়ে একরাশি বেদনা গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। মনের আবেগে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ওঃ! সে তাহার অমন দাদাকে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছে। হায়! এ পাপের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই? এমন সময় রাজীবের পুত্র মনু ডাকিল "কাকা বাবু!" কাকা বাবু তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া কহিল "কি বাবা এস—এস।" মনু তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া বলিল "এঁ্যা কাকা কাঁদছ?" "না বাবা কাঁদিনি—কোলে এস।" বলিয়া ভবানী মনুকে কোলে টানিয়া লইল, তাহাকে শত সহস্র চুম্বনে অস্থির করিয়া তুলিল।

করুণা দরজার ছিদ্র দিয়া সবই দেখিল, রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। আর আদর করিবার লোক পাইলেন না—মনাকে আদর! দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। সে দরজায় করাঘাত করিয়া ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "খোল—খোল—দরজা খোল; অত সোহাগ কর্ত্তে হবে না।" ভবানী বুঝিল করুণা সবই দেখিয়াছে। মনুকে ধীরে ধীরে কোল হইতে নামাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। করুণা কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কহিল "ঘরে দোর দিয়া কি হচ্ছে? সোহাগ কর্ত্তে আর লোক পেলে না? আ মরণ! মনার হাতে ওটা কি?" ভবানীচরণ ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বলিল "বাতাসা একখানা।" "কোথা ছিল?" "শিখায় তোলা ছিল—দিয়েছি।" "আ-মরণ! আমি পয়সা খরচ ক'রে কিনব। আর উনি পাড়ার লোক ডেকে বিলোবেন।" বলিয়া করুণা মনুর হাত হইতে অৰ্দ্ধ-ভক্ষিত বাতাসাখানা কাড়িয়া লইল। মনু 'কাকা বাবু' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাকা বাবু করুণার সম্মুখে মনুকে কোলে লইতে সাহস করিল না। "আঃ,

প্যান্ প্যান্, ঘ্যান্ ঘ্যানের জ্বালায় আর বাঁচলাম না।" বলিয়া করুণা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। ভবানী মন্নুকে তখন কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল "মন্নু তোকে এক পয়সার বাতাসা কিনে দেব'খন—বুঝলি ?" মন্নু মস্তক সঞ্চালন করিল।

(৫)

রাজীব বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল, আর সুদূর অতীতের একটা কথা তাহার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। সেই বাল্যে, যখন ভবানী তাহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিত "দাদা তুমি আমাকে খুব ভালবাস—না ?" হায়! কি করিয়া বুঝাইবে সে তাহাকে কত ভালবাসে ? যা'হোক সে এতদিন ধরিয়া হৃদয় ঢালিয়া যাহাকে ভ্রাতৃস্নেহ, ভালবাসা সবই দিয়া আসিয়াছে, সে কিনা আজ তাহাকে এমন ভাবেই ফাঁকি দিতে বসিয়াছে। তাহার হৃদয়ের একটি কোনেও কি এখন বৃদ্ধ রাজীবের এতটুকু স্থান আছে ? আছে—আছে—নিশ্চয়ই আছে। রাজীব কিছুতেই মানিতে চাহিল না যে তাহার ভবানী এতদূর নির্ম্মম—এতদূর নিষ্ঠুর। সে মনে করিত, যে করুণাকে সে নিজে তাহার গৃহে বরণ করিয়া আনিয়াছে সেই করুণাই আজ তাহাকে ভিন্ন হইতে ভবানীকে যুক্তি দিয়াছে!

* * * *

বাহিরে কতকগুলি গরুর গাড়ীতে ভবানীর জিনিষ পত্র বোঝাই হইতেছিল। আজ ভবানী তাহার নবনির্ম্মিত বাড়ীতে উঠিয়া যাইবে, রাজীবের সেই দিকে তাকাইয়া প্রাণ এক একবার কাঁদিয়া উঠিতেছিল। তাহার এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাসে যেন এক একটা বক্ষপঞ্জর চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। সে একবার নীল আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল,—এই রকমই একদিন সবই ছিল, কিন্তু সেদিন ত ভবানী এমন নিষ্ঠুর ছিল না। যদিও সে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছে—বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে, কিন্তু সেই শিক্ষার কি এই পরিণাম ? এই কি তাহার দাদার পরিশ্রমের ভালবাসার পুরস্কার! রাজীবের চক্ষু দিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া গণ্ড বহিয়া তাহারই পদতলে গড়াইয়া পড়িল। সে কাপড়ে অশ্রু মুছিল।

নূতন বাড়ীতে যাইবে বলিয়া বিদায়ের জন্য করুণা ও ভবানী কখন যে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা রাজীব জানিতে পারে নাই। ভবানী নীরবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সকলই দেখিল। তাহার প্রাণ থাকিয়া

থাকিয়া দাদার পায়ে ধরিয়া বলিতে চাহিতেছিল,—"দাদা! দাদা আমার অপরাধ হ'য়েছে, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু সে পারিল না, কেবল করুণার ভয়ে। ধীরে-ধীরে রুদ্ধ বেদনা চাপিয়া বলিল,—"দাদা এখন আসি।" বলিয়া দুইজনে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। রাজীবের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ দুই বিন্দু অশ্রু তাহাদের মস্তকের উপর গড়াইয়া পড়িল। রাজীব আর থাকিতে পারিল না। ভবানীকে কোলের নিকট টানিয়া লইয়া কহিল "দাদা আমাকে এ রকম ক'রে কাঁদিয়ে যেতে হয় নাকি রে? তোর বুড়ো দাদা কি অপরাধ কল্লে রে" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ভবানী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পিছন হইতে করুণা চুপি চুপি ডাকিল "এস বেলা হল" এমন সময় কোথা হইতে মনু ছুটিয়া আসিয়া ভবানীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডাকিল "কাকাবাবু তুমি কোথা যাচ্ছ?" ভবানী আর থাকিতে পারিল না। মনুকে কোলে তুলিয়া লইয়া দাদার পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া বলিল "দাদা আমি অনেক অপরাধ করেছি; আমি না বুঝে অনেক পাপ করেছি, আমায় ক্ষমা কর। আমি ঐ সর্ব্বনাশী করুণাকে তাড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু তোমাদের ছাড়তে পার্ব্বনা।" করুণা স্তম্ভিত হইয়া গেল, মনু কাকাবাবুর আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইল। ভবানী উচ্চৈঃস্বরে বলিল "ও গাড়োয়ান জিনিষ পত্র নামিয়ে দিয়ে তোমাদের পুরো ভাড়া নিয়ে যাও।" বলিয়া মনুকে বক্ষে চাপিয়া চুম্বন করিয়া বলিল, "বাবা তুই আমার আজ এক 'কাকাবাবু' ডাকে চোখ ফুটিয়ে দিলি।" রাজীবলোচনের চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বুঝিল এ পিতার আশীর্ব্বাদের পুরস্কার, সে ধীরে ধীরে নিভান হুকাটি লইয়া একবার টান দিয়া বলিল,—"ভগবান তুমি যখন যা কর, তা মঙ্গলের জন্য।"

সাথী

[লেখক—শ্রীপরেশনাথ সরকার]

(১)

সত্যচরণ পূজায় বসিবেন এমন সময় শ্যামাসুন্দরী আসিয়া বলিলেন-ঠাকুর পো, এর একটা কিছু বন্দোবস্ত না করলে যে আর চলেনা!

সম্মুখস্থ পুষ্পপাত্র হইতে একটি রক্তজবা তুলিতে তুলিতে সত্যচরণ বলিলেন—তুমিত যেন বলে খালাস, বউদি! সময়টা কি পড়েছে দেখেছ? এখন কার কাছে গিয়ে হাত পাতি! কে দেবে? সবারই সমান ঠেকা। সামনে চৈত্রমাস—আদায় তহশিল কিছু মাত্র নাই!

শ্যামাসুন্দরী সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, বামপদের দক্ষিণ অঙ্গুলিটি দুই হস্তে খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলেন—তা. আমি কি করব বলত? ছেলেটা মানুষ হল না। বিষয় আসয় তেমন কিছু নেই। ২।৪খানা গয়না যা ছিল, তাওত সব বন্ধক দিয়েছি! এখন ত তোমার ভাতেই পড়ে আছি।

জবা ফুলটা যথা স্থানে রক্ষা করিয়া সত্যচরণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ওকথা বলোনা বউদি! তোমাদের যে দুমুঠো দিতে পারি, এইটাই সুখের! আর এ ত তোমাদের প্রাপ্য অর্থ থেকেই দিচ্ছি।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—কথা হচ্ছে কি ঠাকুর পো, নগেন আমার বড় অভিমানি! বোকা হউক—যাই হউক, কারো কথা সহিতে পারে না! সংসারে আমার আর কে আছে? ওর চক্ষে জল আমি দেখতে পারি না! একজন জীবন ভরে উপার্জ্জন করেছেন এবং দুইহাতে অর্থ বৃষ্টি করে গেছেন, কি ফল এখন সে উপার্জ্জনের? যার কাছে যা পাওনা আছে, কেউ একটা কড়িও দিচ্ছে না। সবাই বলে নালিশ কর। তারা জানে যে আমার নালিশ করবার মত শক্তি থাকলে আর নিজের ভিটাছেড়ে এসে তোমার সংসারে হাড়ির অধিক অপমানিত হব কেন?

সত্যচরণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তুমিও দেখছি বউদি পাগল হয়েছ! ভুবন দা কি আমায় পর ভাবত? আমার সংসার ত তোমার আপনার সংসার, আর বিশেষ আমি তোমাদের ২৫০০০৲ টাকা ধারি! স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি তোমাদের কাছে "মর্টগেজ" রয়েছে! তা এক সংসারে থাকতে হলে মেয়ে মানুষে, মেয়ে মানুষে একটু কথা কাটাকাটি হয়েই থাকে, ওটা বউদি, তোমাদের স্ত্রীজাতির ধরণ। আর আমার মেজ বউদির বড় আলগা মুখ, যখন যা মুখে আসে বলে ফেলেন, তা না আছে বোঝা শোনা—কাকে কি বলা হচ্ছে! শত হলেও নগেন ত দুধের ছেলে, সেদিন তার অন্নপ্রাসনে কত ধুম ধাম করেছি, সেদিনও ত মুখে একরাশ ধুলো মেখে বুকের উপর বসে ছোট ছোট হাত দুখানি দেখিয়ে দেখিয়ে বলেছে—কাকা, আমি খেলি!

অতীতের কথা স্মরণ হওয়াতে শ্যামাসুন্দরী চক্ষের জল আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। সাত নয় পাঁচ নয়, নগেন আমার একমাত্র বংশের দুলাল, তিনি কত সাধ করেছিলেন। সুখের—সাগর কূলে তিনি মনোরম স্বপ্ন সৌধ তুলিয়াছিলেন—উন্মাদ নিয়তি তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ধুইয়া মুছিয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে। ধরা গলায় তিনি উত্তর করিলেন—তা তোমার যতখানি, তার কি ততখানি হতে পারে ঠাকুর পো! মেজ বউত যেন রাজার ঝি! গরবে পা মাটিতে ফেলেন না! গরব করবার মত কপাল করে আসতেন ত হত—এমন রাজার মত স্বামী যার মারা যায়, সেত মাটিতে বসে যাবে, তার মুখে বড় বড় কথা কি করে আসে তাই ভেবে পাই না!

সত্যচরণ বলিলেন—বউদি, তোমার বুঝি এখনো স্নান হয় নি, যাও যাও, কত বেলা হয়েছে! এত অবেলায় তোমারত কখনো স্নান আহারে অভ্যাস নাই!

একটি বিষাদের ক্ষীণ হাস্যরেখা শ্যামাসুন্দরীর মুখে ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—সেদিন আর নেই ঠাকুর পো! যে দিন শাঁখা সাড়ী, লোহা জন্মের মত ত্যাগ করেছি, সিঁথের সিন্দুর মুছে ফেলেছি, সেই দিন থেকে সে সব দূর হয়ে গেছে। স্ত্রীলোকের কপাল ভাঙ্গলে বুঝি অসুখ বিসুখও তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়—জানত আগে এমন একটা দিন ছিল না, যখন একটা কিছু রোগ আমার না হত!

সত্যচরণ বলিলেন—সে কথা ভেবনা বউদি। যাও তুমি, বেলা খুব বেশী হয়েছে। ইঃ শিবের মাথার দিকটা ত শুখিয়ে উঠ্‌ল!

তাড়াতাড়ি কোশা হইতে একটু জল লইয়া শিবের মাথায় দিয়া সত্যচরণ আবার বলিলেন—বসে থেকনা বউদি, যাও! মেজ বউদির কোন কথা ধরোনা! সে পরের মেয়ে, সে কি বুঝবে আমাদের সম্পর্ক! আর তুমিত বউদি এ গ্রামের মধ্যে সবায় চেয়ে ধৈর্য্যশীলা, তুমি এতটা অধীর হয়ে পড়েছ?

শ্যামাসুন্দরী সত্যচরণের মুখের দিকে একটু চাহিয়া বলিলেন—ঠাকুর পো, সেই আগেকার কথা আজ সবগুলি মনে করিয়ে দিচ্ছি, এমনি বসিয়ে তোমাকে কতদিন খাইয়ে সুখী হয়েছি। সে সব এখন স্বপ্ন! যাক্, আমি যাই, তুমি পূজাটা সেরে ফেল! কিন্তু তুমি একটু চেষ্টা দেখ, আমায় যদি কিছু দিতে পার! সবটা চাই না, দুটা প্রাণী কাশীগিয়ে থাকতে যা লাগে।

সত্যচরণ বলিলেন—আচ্ছা বউদি, তুমি রাগ করেছ কার উপর বলত?

আমার প্রতি তোমার যে স্নেহ ছিল, এখন আর তা নেই, নইলে মেজ বউদির সঙ্গে ঝগড়া করে তুমি কাশীবাসী হবে! আমি তোমাদের টাকা শোধ করে দিতে পারি এমন ক্ষমতা যদি এখন আমার থাকত, তবে আমিই কি তোমাদের এনে এই অশান্তির মধ্যে ফেলে রাখি? সুদেআসলে এখন প্রায় ৪০০০০৲ টাকা দাঁড়িয়েছে। সম্পত্তির মূল্য থেকে বেশী টাকা হয়ে গেছে। অন্যত্র বেচে শোধ দেব, তারও উপায় নেই! অল্প বয়সে বুড়ো হয়ে পড়েছি, খেটে শোধ দিবারও সামর্থ নাই। মনে করেছি, মেয়েটার বিয়ে দিয়ে বিষয়টা তোমাদের কওলা করে দেব। এত দিন দিতাম, কিন্তু যখন ভবি, বউদি, কুলাঙ্গার পুত্র জন্মেছিলেম, বংশের আমিই পিতৃপুরুষদের সম্পত্তি খোয়ালেম, তখন বুক ভেঙ্গে যায়। আমার মৃত্যুর পর সম্পত্তি তোমাদের হাতেই পড়বে, তবু নিজহাতে না লিখেদিয়ে মনের আগুণটাকে ছাই চাপা দিয়া রাখছি! বলিতে বলিতে সত্যচরণের নয়ন কোনে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দাড়াইল! শ্যামাসুন্দরী চাহিয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন! যে সত্যচরণ তাহার পিতৃ বিয়োগে পর্য্যন্ত এক বিন্দু অশ্রু মোচন করে নাই, এত বয়স পর্য্যন্ত তাহার চিরহাস্যময় মুখ খানিতে একটুকু বিষাদের দাগ কেহ কখনও দেখে নাই, সেই সত্যচরণের চখে জল, মুখখানি ছবির মত পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। শ্যামাসুন্দরী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—না না, ঠাকুর পো, তুমি পূজা কর! আমার কথা আর ভাবতে হবে না। আমি সব সহ্য করব! এই সংসারই আমি স্বর্গ মনে করে নিলুম।

সত্যচরণ নির্ব্বাক ভাবে আবার একটি ফুল তুলিয়া লইলেন; শ্যামাসুন্দরী একধারে সরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন!

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া সত্যচরণ বলিলেন—বউদি, এই আশীর্ব্বাদ নগেনকে দাওগে যাও। নগেন আমাদের বেঁচে থাক; তোমার দুঃখ কি! আমিই সংসারে কি দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছিলেম! শ্যামাসুন্দরী কম্পিত হস্তে আশীর্ব্বাদ লইলেন! দুই ফোটা চখের জল ফেলিয়া বলিলেন—একটা আশ্চর্য্য দেখছি ঠাকুর পো?

"কি?"

"তুমিও বিচলিত হয়ে পড়েছ।"

"কই না,"

এমন ভাবে সত্যচরণ কথাটি বলিলেন—যেন একটা হাসির মাঝখানে,

তাহার বিষাদের ভাবটা ডুবাইয়া দিবেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না, তাঁহার কম্পিত কণ্ঠ, তাঁহার দৌর্ব্বল্যের রীতিমত সাক্ষ্য দিয়া বসিল। শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—তোমার কি দুঃখ ঠাকুর পো!

কথার মাঝখানে বাধা দিয়া সত্যচরণ বলিলেন—সে কথা আর কেন বউদি! আর আমায় বিচলিত দেখবে না! ভুবন দা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সব বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি! ডানা কাটা জুটায়ুর মত পড়ে আছি—কতদিনে শেষের সাক্ষাৎ পাব!

মৃত পতির জন্য সত্যই যে কষ্ট অনুভব করে, এমন সহৃদয় ব্যাক্তির চখের জল, মুখের ম্লান ছায়া দেখিয়া শ্যামাসুন্দরীর প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—ঠাকুর পো এখনো দিন রাত হয়; তুমি ভেবনা, ভগবান আছেন!

বড় দৃঢ়তার সাহিত সত্যচরণ বলিলেন—বড় খাটি কথা বউদি, ভগবান আছেন। তাই আমার ভয় হয়, যে আমি ঋণ-পাশে বদ্ধ হয়ে, সংসার ত্যাগ করব! যাক, বউদি আমি এ মাসের মধ্যেই তোমার নগেনের নামে বিষয় আসয় সব লিখে দেব।

শ্যামসুন্দরী প্রথমটা 'হাঁ' করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—দাড়াও ঠাকুর পো, ঠিক বুঝতে দাও! পৈত্রিক সম্পত্তিটা এমন ভাবে ছেড়ে দেবে? আচ্ছা আর কি কোনও উপায় হয় না?

সত্যচরণ উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আর উপায় ভগবান! দুই-জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কেউ কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না। এমন সময় অসংযত পদ বিক্ষেপে নগেন আসিয়া ডাকিল—মা!

শ্যামাসুন্দরী উঠিয়া দাড়াইলেন, নগেনের হাতে একটা ফুলদিয়ে বলিলেন—দেত বাবা, আশীর্ব্বাদটা মাথায় দে, তোর কাকার আশীর্ব্বাদ!

নগেন হাঁ করিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সে ফুল তাহার মাথায় উঠিল না!

শ্যামাসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—কিরে অবাধ্য, আশীর্ব্বাদটা মাথায় দিলিনে?

নগেন মুখ নিচু করিয়া উত্তর করিল—ওদের কিছুই আমি নেব না মা!

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—নিবি না কেন রে? ওরা কি তোর পর! বোকা ছেলে!

নগেন তথাপি তেমনি চাহিয়া রহিল, সে হাত আর মাথায় তুলিল না!

শ্যামাসুন্দরী ফুলটা হাত হইতে লইয়া তাহার মাথায় রাখিয়া দিলেন! নগেন যে ভাবে আসিয়াছিল, সেই ভাবে চলিয়া গেল!

সত্যচরণ বলিলেন—নগেন বুঝি রাগ করেছে বউদি?

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—বোকা ছেলে, কিছু বোঝে না।

সত্যচরণ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ও তখন ছোট ছিল বউদি, বোঝেনি যে আমি ওর বাবার ভাই ছিলাম! এক মার দুধ খাইনি বটে, এক বংশে জন্মিনি বটে, তবু কেমন একমন, এক প্রাণ ছিলাম!

শ্যামাসুন্দরী সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ওঃ অনেক বেলা হয়ে গেছে, যাই আমিও স্নান পূজা করব! তা ঠাকুর পো যা করবার এত তাড়াতাড়ি কোন দরকার নেই। আমায় না জানিয়ে যেন কিছু একটা করে ফেল না!

(২)

রতন গঞ্জের ভুবনচন্দ্র মিত্র ও সত্যচরণ বসু একসঙ্গে কলিকাতায় কারবার খুলিয়া যেবার আশাতিরিক্ত লাভবান হইলেন, সেইবার সত্যচরণ বন্ধু ভুবনের নিকট হইতে হ্যাণ্ডনোটে নামমাত্র সুদে ২৫০০০৲ টাকা কর্জ্জ করিলেন। সত্যচরণ একটা ভিন্ন কারবার খুলিবেন মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রামের হরবল্লভ বসুর সঙ্গে সামান্য একখণ্ড জমি লইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে একটা বিরাট ফৌজদারি মামলা ফাঁদিয়া বসিলেন, তাহার রসদ জোগাইতে সে অর্থ যে কোথায় উড়িয়া গেল; তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না; ফলে আর কোন নূতন কারবার করা ঘটিয়া উঠিল না। বিপদ একা আসে না, মামলা হইতে কোন রকমে নিষ্কৃতি পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একমাসের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মধ্যম ভ্রাতা অরুণ রুড়কিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িত—পক্ষাঘাত হইয়া সে বাড়ী আসিল! জমিদারীর সব কাজকর্ম্ম পরিচালন ভার নিরীহ সত্যচরণের উপর পড়িল! এমন সময় একদিন সংবাদ আসিল, তাহাদের বড় সাধের সেই কারবারটি সহসা ফেল পড়িয়াছে। সেই দিনই তাহার মেজ দাদা চক্ষু মুদিলেন। সত্যচরণ চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন! সংসারে প্রবেশ পথে তিনি একসঙ্গে এতগুলি আঘাত পাইলেন। তাঁহার মনটা দমিয়া গেল! এত বড় একটা বাড়ী জনহীন অরণ্যে পরিণত হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের কাহারও কোন

সন্তান সন্ততি ছিল না! কেবল তাঁহার ৩ বছরের মেয়ে আভা এই মরুভূমির মাঝখানে একটা ফুলের মত ফুটিয়াছিল! তিনি তাহা লইয়া মনের দুঃখ হাসির আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে সঙ্কল্প করিলেন।

বন্ধু ভুবন চন্দ্র ও তিনি পাশাপাশি কলিকাতায় বাড়ী করিয়াছিলেন। ভুবনচন্দ্র বাড়ীর ভার দেওয়ানের হাতে ফেলিয়া রাখিয়া স্ত্রী কন্যা লইয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন!

বন্ধু ভুবন চন্দ্র তখন পত্নী শ্যামাসুন্দরী ও ৫ম বর্ষীয় পুত্র নগেনকে লইয়া কলিকাতায় সুখের সংসার পাতিয়া ছিলেন। তিনি অতি যত্নে সত্য-চরণকে শোক তাপের হস্ত হইতে সাবধানে রাখিতে চেষ্টা করিতেন! দুই বৎসর যাইতে না যাইতে ভুবন চন্দ্র একদিন পত্নী ও পুত্রের স্নেহপাশ কাটাইয়া অকালে ঝরিয়া পড়িলেন! এমন দুইটি সোণার সংসার দেখিতে দেখিতে শ্মশান হইয়া দাঁড়াইল! বুদ্ধিমতী শ্যামাসুন্দরী স্বামীর প্রেতকৃত্য সমাপনের পরেই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া রতন গঞ্জে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন! স্বামীর আয় ব্যয় প্রায় সমান ছিল, তাই শ্যামাসুন্দরী নগদ পয়সার মুখ বড় দেখিলেন না। তবে প্রথম প্রথম যাহাদের কাছে তাঁহার স্বামি টাকা পাইতেন, তাহারা কিছু কিছু সেই অর্থ পরিশোধ করিতে-ছিলেন, তাই বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বাকি টাকা আদায়ের পথ বন্ধ হইয়া গেল। সকলে বুঝিল টাকা ইচ্ছা করিয়া না দিলে আদায় করিয়া লইবে এমন ক্ষমতা এখন শ্যামাসুন্দরীর নাই! পুত্র নগেন লেখাপড়াও কিছু শিখিল না! নিরীহ গোবেচারী, যেন এ সংসারের কেউ নয়। এক মুঠা মুখে তুলিয়া দিলে সে খাইত। ইচ্ছা করিয়া কখনো সে কিছু চাহিত না!

গ্রামের হরবল্লভ বসু এই সময় একখানি জাল হ্যাণ্ডনোট আদালতে সত্য বলিয়া প্রমাণ করাইয়া ৩০০০০৲ হাজার টাকা ডিক্রি করিল। কলি-কাতার বাড়ী বেচিয়া শ্যামাসুন্দরী সে টাকা পরিশোধ করিলেন! তারপর নিজের গহনা তাঁর সম্বল, কয়বৎসর তাই বিক্রি করিয়া তিনি অতি কষ্টে দিন কাটাইলেন! তারপর যে দিন শ্যামাসুন্দরী দেখিলেন পুত্র বিংশ বৎসরে পদার্পণ করিলেও ৩ বৎসরের শিশুর মত এখনো তাহাকে লালন পালন করিতে হয়, সে দিন তাহার হস্তের শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে!

সত্যচরণ শ্যামাসুন্দরীর একটি বড় খাতক, বুদ্ধিমতি শ্যামাসুন্দরী কলিকাতায় চিঠি লিখিলেন! সত্যচরণ অনেক ভাবিয়া তাঁহাদিগকে নিজের পরিবার ভুক্ত করিয়া দিয়া গেলেন। কিছুদিন এমনি করিয়া কাটিয়া গেল, শ্যামাসুন্দরী আবার একটু হাঁপাবার অবকাশ পাইলেন। কিন্তু তাহা রবি করের মত ক্ষণস্থায়ী। এই দুইটি নিরীহ জীব একজনের বড় অশুভ দৃষ্টিতে পড়িল—সে মেজবউ। কেন, কে জানে তিনি কারণে অকারণে প্রথম হইতেই তাহাদের প্রতি বিরক্তি ভাব দেখাইতে লাগিলেন। যে দিন হইতে প্রকাশ্য সংগ্রামে মেজবউ প্রমাণ করিয়া দিল—দুইটা হতভাগ্য উড়ে এসে তাহার বুকের উপর জুড়ে বসেছে, সে দিন শ্যামাসুন্দরী চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া দিলেন। তারপর প্রায় সর্ব্বদা মেজ বৃউয়ের তীক্ষ্ণ বাক্য-বাণ শ্যামাসুন্দরীর হৃদয় রাজ্যটা জ্বালিয়ে দিতে লাগিল। অসহ্য হইয়া শ্যামাসুন্দরী সত্যচরণকে পত্র লিখিলেন। সত্যচরণ বাড়ী আসিলেন। কিন্তু তিনি মেজ বউদির মেজাজ বুঝিতেন। তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। তিনি কাগজ লইয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন সুদে আসলের প্রায় সমান হইয়াছে। কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না!

সত্যচরণের অশ্রুবিন্দু দেখিয়া যেদিন শ্যামাসুন্দরী স্বামীর প্রাণের বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বন্ধু সংসারের সহস্র জ্বালাতন হাস্য মুখে বরণ করিয়া লইতে স্বীকার করিলেন, সেই দিন সত্যচরণ একরূপ স্থির করিয়াছিলেন, বিষয়টা নগেনের নামে লিখিয়া দিবেন, কিন্তু শ্যামাসুন্দরী যে বলিয়াছিলেন এত তাড়াতাড়ীর দরকার নাই এই কথাটাতে তাহাকে একটু দমাইয়া দিল!

অনেক ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন তাহাদিগকে আপাতত কলিকাতায় লইয়া যাইবেন।

কথাটা একদিন তিনি এইভাবে শ্যামাসুন্দরীকে বলিলেন—কতদিন আমি ভেবেছি বউদি, কিছুদিন আমার সঙ্গে কলকাতা থেকে আসবে চল!

কলিকাতার নামে শ্যামাসুন্দরীর দুই চক্ষু ভিজিয়া উঠিল। সত্যচরণ বুঝিলেন, বউদি প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়াছে। তা পাবারই ত কথা! সবগুলি অতীতের কথা তাহার মনে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন—তাতে কি বউ দি চল। আর আভার এবার পরীক্ষার বছর, তুমি

থাকলে তার বেশ যত্ন হবে। জান ত ঘরে যে আছে তার কোন বিষয়ে খেয়াল নেই!

শ্যামাসুন্দরী একটি বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন—তুমি ঠাকুরপো, আমাকে সুখী করিতে চাও, কিন্তু সুখ কি লোকে ইচ্ছা করলেই পেতে পারে। সুখে রাখা না রাখা ভগবানের হাত। মানুষের কোন হাত নেই। আচ্ছা তুমি যখন বলছ, যাবো!

(৩)

আভা তাহার সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া পড়িতেছিল;—

ন তজ্জলং যন্ন সুচারু পঙ্কজং
ন পঙ্কজং তদ্ যদলীনষট্‌পদম্।
ন ষট্‌পদোঽসৌ ন জুগঞ্জযঃ কলং
ন গুঞ্জিতং তন্ন জহার যন্ম নঃ।

এমন সময় তাহার মা বিধুমুখী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—দেখসে আভা, কারা এসেছেন!

আভা ভট্টিখানি বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় শ্যামাসুন্দরী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

বিধুমুখী বলিলেন—তোর জেঠাইমাকে প্রণাম কর।

আভা শ্যামাসুন্দরীকে প্রণাম করিল। শ্যামাসুন্দরী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর আভাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—আভা আমাদের এত বড় হয়েছে! আমাকে এখন চেনেও না। সে আজ ৭।৮ বছরের কথা, যখন আমার হাতে ছাড়া ওর খেয়ে পেট ভরত না। কিরে আভা মনে আছে সে সব?

আভা ঘাড় হেট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শ্যামাসুন্দরাকে তাহার রীতি-মত মনে পড়িতে ছিল না!

বিধুমুখী বলিলেন—কেন রে? ঐরে তোর ও-বাড়ীর জেঠাইমা! এরি মধ্যে ভুলে গেলি! এতগুলি পড়া কি করে তৈরি করিস—তাত বুঝি না!

আভা তখন ধীরে ধীরে বলিল—হাঁ মা মনে পড়েছে এখন। নগেন দা এসেছে ত?

বিধুমুখী বলিলেন—হাঁ এসেছে, তাকে জল খেতে বসিয়ে দিয়ে এসেছি। ও তাকে ত দুধ দেইনি।

বলিয়া বিধুমুখী চলিয়া গেলেন।

আভা বলিল "এতদিনে আমাদের মনে পড়ল ?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—মনে সর্ব্বদাই পড়ত মা! কিন্তু এমন অদৃষ্ট করে আসিনি যে যখন যা মনে হবে তা করে একটা সুখের নিশ্বাস ফেল্‌তে পারব। তোদের মনে পড়বে না ত, মনে পড়বে কাকে ? তুইত আমাকে ভুলেই গেছিলি। কিন্তু আমি ত সেই যাবার সময় তুই যে বলেছিলি, যাও জেঠাইমা, আমি এখানে মরে থাকব, তুমি আমায় একটুও ভালবাস না, তাই চলে যাচ্ছ, সেই কথা এখনও ভুলতে পারিনি! মার কাছে ক'দিন শুয়েছিস্‌, একবার জিজ্ঞাসা করিস ত ? তোর এই সোণার শরীরে আমার দুধ ছাড়া তোর মার দুধ কতটুকু আছে, সে খবর রাখিস।

আভার এখন সব কথাগুলি মনে পড়িয়াছে। অতীতের সেই স্নেহ করুণার উৎস, তাহার হৃদয়-নদীটি পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সে জেঠাইমাকে জড়াইয়া ধরিল। শ্যামাসুন্দরী আভাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন—আজ আমার যে সুখ মনে হচ্ছে আভা, তার বিনিময়ে আমি জগতে অন্য কোন সুখ চাহিনা। তোকে ছেড়ে গিয়ে আমার বুকটা সব সময় কেমন খালি হ'য়ে পড়ে ছিল। আমি রাত জেগে ভেবেছি, এ খালি বুকটা কি দিয়ে ভরা যায়। আজ আর আমার প্রাণের কোন যায়গা ফাঁক নেই!

আভা কম্পিতকণ্ঠে বলিল—জেঠাইমা!

শ্যামাসুন্দরী তাহাকে বুকে আরও চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—কি মা ?

"একটা কথা বিশ্বাস করবে ?"

"সেকি—বিশ্বাস করব না কেন ?"

"আমিও বুঝি এমন সুখ আর জীবনে পাই নাই।"

শ্যামাসুন্দরীর চখের জল আভার মস্তকে গড়াইয়া পড়িল।

আভা বলিল—তোমায় কিন্তু আর ছেড়ে দেব না জেঠাইমা। তুমি কিছুতেই যেতে পাবে না।

"যাবার জন্য ত আসিনি মা।"

"সত্যি ?"

"হাঁ মা, যে কয়দিন আছি, তোদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদে কাটিয়ে দেব।"

"দেখ কিন্তু জেঠাইমা, কথা ভুলে যেও না।"

"হ্যাঁরে আভা তুই এখনো আমায় তেমনি সত্যি করাতে আরম্ভ করলি ; যেমন ছোটকালে করতিস। সেই একদিন আলিপুরের বাগান দেখতে গিয়ে, আর একদিন যাবার জন্যে কত সত্যিই না আমাকে করালি।"

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সত্যচরণ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। এই সময় তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—বেশ বউদি, আভাকে যে পর করে ফেলবার যোগাড় করে ফেলেছ!

শ্যামাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—সত্য কথা বলতে কি ঠাকুরপো, আভা তোমার কবে ছিল ? ছোটকালে একদিনও ওকে কোলে নিয়েছ, না ওর জন্য একটা ভাল জিনিষ এনে দিয়েছ ? আমার মেয়ে, আমি গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেম। এসে দাবী করে বসেছি!

হাসিমুখে সত্যচরণ বলিলেন—দেখ যেন সম্পূর্ণ দাবী করে বসনা, এতদিন খাওয়াইয়া পরাইয়া আমারও একটা মায়া জন্মে গেছে বোধ হয়!

জেঠাইমার বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া আভা পিতাকে প্রণাম করিল। আভার মাথায় স্নেহের একখানি হস্ত প্রদান করিয়া সত্যচরণ হাসিয়া বলিলেন—বউদি আভা আমার দাবিটা রাখবে বলে বোধ হচ্ছে।

আভা হাসিয়া ছুটিয়া গিয়া জেঠাইমার হাত ধরিয়া দাঁড়াইল।

বিধুমুখী আসিয়া বলিলেন—দিদি, নগেন তোমাকে ডাকছে।

শ্যামাসুন্দরী আভার হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন।

সত্যচরণ বলিলেন—আভা তোমার পর হ'ল।

বিধুমুখী হাসিয়া বলিলেন—আমি কি ওর মা, আভা তার মা পেয়েছে। সে কবে আমার ছিল ?

দুইজনে অতি তৃপ্তির হাসি হাসিতে লাগিলেন।

[ক্রমশঃ

রঙ্গ বারিধি।

প্রথম-তরঙ্গ

ঠাকুরদাদার বিয়ে!

[লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।]

(১)

"তাহ'লে কি বল দাদা, বিয়ে করাটাই বেজায় গর্হিত কার্য্য,—শিক্ষিত হয়ে এ কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার অর্থ মাথা বিকৃত ভিন্ন আর কিছুই নয়?" এই কয়টী কথা বলিয়া বৃদ্ধ দুর্গাদাস বসু প্রকাণ্ড সটকার নলটায় দুই তিনটা টান দিয়া, সেটাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া হাঁকিলেন, "বাবা পদ্মলোচন, কল্‌কেটা একবার বদ্‌লে দাওতো বাবা!"

তখন আষাঢ় মাসের শেষ বেলা,—সমস্তদিনের বিষম পরিশ্রমে সূর্য্যিমামা রক্তিম নয়নে বিষম বিরক্ত হইয়া পৃথিবীর নিকট বিদায় লইতেছিলেন,—তখনও লতায় পাতায়, প্রাসাদে কুটীরে তাঁহার রক্ত নয়নের প্রতিবিম্ব ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া ঝিক্‌মিক করিতে ছিল।

পৌত্র অনিলকুমার সম্মুখে বসিয়াছিল, সে মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "ওইতো আপনার দোষ দাদা মহাশয়! আপনি সকল কথায়ই ঠাট্টা করেন। ভেবে দেখুন দেখি যখন ঠাকুরমা জীবিত ছিলেন তখন আপনার অবস্থাটা কি ছিল? চারিদিকে বন্ধন—নড়বার চড়বার উপায় ছিল না। বিয়ে করে ছিলেন বলেই না এত শোক দুঃখ চিন্তা আপনাকে সহ্য কর্ত্তে হয়েছে। আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস দাদা মহাশয়,—বিয়ে কল্লে মানুষের আর নিজস্ব বলে কিছু থাকে না;—ঠিক চেতনও নয়, ঠিক জড়ও নয়, সে একটা কিন্তূত কিমাকার হয়ে যায়।"

ঠাকুরমার কথায় সহসা বৃদ্ধের সমস্ত দেহের হাড় ক'খানা যেন একটা অতীতের স্মৃতির সজোর আঘাতে নড়িয়া উঠিল, শুষ্ক নয়ন পল্লব ভিজিবার মত হইল,—তিনি উন্মুক্ত গবাক্ষে গ্রামের পার্শ্বে ধানক্ষেতের প্রান্ত দিয়া একবার দিক্‌সীমা পর্য্যন্ত ধূ ধূ মাঠের দিকে চাহিলেন;—একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যা বল্লে ভায়া! কিন্তু আমি ভাব্‌ছি যে, এত

জমি জমা, বিষয় সম্পত্তি, এ সব ভোগ করবে কে? আমিতো একেবারে নাগা সন্ন্যাসী,—এর উপর তুমি যদি ভায়া আবার দেব সেনাপতি হও, তবেইতো ফ্যাসাদ—"

অনিলকুমার তাহার দাদা মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"বংশের কেউ ভোগ না করলে বুঝি আর সম্পত্তির ভোগ হয় না। পৃথিবীতে এসে আমি প্রথম আপনাকেই চিনেছি,—আপনার কোলেই বড় হয়েছি,—আপনার স্নেহ ও যত্নে বি, এ, পাস করেছি; এখন আমি অনায়াসেই নিজের উদরান্ন সংস্থান করে নিতে পারবো। আপনি আপনার বিপুল সম্পত্তি কোন সৎকাজে দান করুন,—অনাথ প্রতিপালন হউক,—আপনার অতুল কৃত্তি পৃথিবী চিরদিনের জন্য বুকে ধারণ করে থাকুক।"

বৃদ্ধ কেবল মাত্র বলিলেন, "শেষ পৈত্রিক ভিটা অনাথ আশ্রম হবে?"

ঠিক সেই সময় ভৃত্য পদ্মলোচন কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সটকায় কলিকা বদলাইয়া দিয়া বলিল, "বাহিরে ওপাড়ার রসিকবাবু ও আর কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন,—তাঁরা একবার আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান।"

বৃদ্ধ সটকার নলটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "এইখানেই পাঠিয়ে দে।"

ভৃত্য চলিয়া গেল,—বৃদ্ধ সটকার নলে একটা টান দিয়া খানিকটা ধূম শূন্যে ছাড়িয়া দিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন,—ঠিক সেই সময় রসিকমোহন ও আরো কয়েকজন ভদ্রলোক গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

রসিক গ্রামের মধ্যে একজন মাতব্বর লোক;—সর্ব্বকাজেই রসিক অগ্রগামী। পরের উপকার করিতে রসিককে আজ পর্য্যন্ত কেহ কখনও পশ্চাৎপদ হইতে দেখে নাই। রসিক গৃহে প্রবেশ করিয়া ফরাসের উপর বসিতে বসিতে বলিল, "খুড়ো সর্ব্বনাশ উপস্থিত! এখন তুমি না রক্ষা কল্লে দীনু ঘোষের আর জাত থাকে না"

বৃদ্ধ একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন,—তিনি গম্ভীর ভাবে রসিকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি,—সব ভেঙ্গে বল। এমন সময় হঠাৎ অবেলায় দীনুর আবার জাত যায় কেন?" তারপর দীনবন্ধু ঘোষের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কিহে দীনু ব্যাপার কি?"

দীনবন্ধু কি বলিতে যাইতেছিল,—রসিক তাহাকে বাধা দিয়া উত্তর দিল, "খুড়ো দীনুর মেয়ের বিয়ের কথাতো তুমি শুনেছ,—তারপর আগামী সোমবার

দিনস্থির, তাওতো তোমার শোনা আছে। এখন হঠাৎ এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ছেলের বাপ খবর পাঠিয়েছে ;—আর তিনশো টাকা না দিলে সে তার ছেলের বিয়ে এ মেয়ের সঙ্গে দিতে পারে না। তুমিতো দীনুর অবস্থা ভালো রকমই জান। এই পাঁচশো টাকা তাও সমস্ত বন্ধক রেখে তোমার কাছ থেকেই কর্জ্জ নিয়েছে,—আর তিনশো টাকা তাকে কাটলেও পাবার সম্ভাবনা নেই।"

জমিদার বসু মহাশয় এতক্ষণ বেশ গম্ভীর হইয়া সটকায় টানের উপর টান দিয়া ধূমে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ করিতেছিলেন। সটকার নলটা রসিকের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই ব্যাপার! তাহ'লেতো বড় ফ্যাসদের কথা দেখছি।"

দীনবন্ধু অতি করুণকণ্ঠে বলিল, "আপনি আমাদের গাঁয়ের জমিদার,—দীনের আশ্রয়—সদাশয়! আপনি কিছু সাহায্য করলেই আমি এ দায় হ'তে উদ্ধার হতে পারি।"

তখন ডালে ডালে রাজ্যের পাখী ডাকিয়া ডাকিয়া সমস্ত আকাশ পাতাল আলুথালু করিয়া যেন পাগল করিয়া দিতে ছিল। সন্ধ্যারাণী গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝোপের ভিতর দিয়া কৃষ্ণবসনে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল। ভৃত্য কক্ষে আলো দিয়া গেল। বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "করাতো উচিত বুঝি,—কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি কিছুতেই সাহার্য্য কর্ত্তে পারি না।"

রসিক আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন--কেন খুড়ো ?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "দেখ যাদের কথার ঠিক নেই, তারাতো জোচ্চর,—আর সেই জোচ্চোরদের প্রশ্রয় দেওয়া তাদের সাহায্য করা আমি কিছুতেই ন্যায় সঙ্গত মনে করি না।"

রসিক তাড়াতাড়ি বলিল, "তবে তুমি কি খুড়ো বলতে চাও দীনুর মেয়ের বিয়ে বন্ধ থাক,—তার জাতি-পাতই হোক।"

বৃদ্ধ সেই ভাবেই বলিলেন,—"এমন কথা আমি একবারও বলিনি,—এমন কথা বলতেও চাইনি। আমি বলি অন্য এক পাত্রের সঙ্গে দীনুর মেয়ের বিয়ে স্থির কর। আমি বরং তাতে কিছু দীনুকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ পাত্রে আমি একেবারেই সাহায্য কর্ত্তে নারাজ।"

রসিক একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তুমিতো সোজা বলে দিলে, অন্য পাত্র

স্থির কর,—অন্য পাত্র মেলে কোথায়? খুড়ো পাত্রের দরের তো কোন খবর রাখ না। পাত্রের বাজার আগুণ। আর এমন পাশ করা পাত্র হাজার টাকায় যে সে লুপে নেবে;—"

বৃদ্ধ কণ্ঠ একটু উর্দ্ধে তুলিয়া বলিয়া বসিলেন, "নেয় নেবে, তাব'লে আমি জোচ্চরের ঘরে বিয়ে দিতে পরামর্শ দিতে পারিনে।"

দীনবন্ধু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। আর কোথায়ও তাহার টাকা পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, এ পাত্র হাত ছাড়া হইলে আর শীঘ্র কোন পাত্র মিলিবারও ভরসা নাই। কন্যার বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনরূপে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। এখন উপায়? সে হতাশ হইয়া বলিল, "তা হ'লে আমাকে কি কর্ত্তে বলেন? এ পাত্র হাতছাড়া হ'লে কিন্তু—"দীনবন্ধু আর বলিতে পারিল না,—তাহার নয়ন পল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিল। রসিক সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিয়া ফেলিল,—"দীনু খুড়ো তোমার পাল্টা ঘর, তুমিই না হয় তোমার নাতির সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে গরীবের জাত রক্ষা কর। দীনুর মেয়েকেতো তুমি দেখছ, অপূর্ব্ব সুন্দরী!"

রসিকের কথায় বাধা দিয়া বৃদ্ধ অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ জীহ্বা বহিস্কৃত করিয়া তাহা দন্ত দিয়া চাপিয়া বলিলেন, "ছি ছি, অমন কথা মুখেও এনো না। আমার নাতি,—সে যে চিরকুমার।" তাহার পর অনিলকুমারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"কি বল ভায়া এ কথা শুনলেও পাপ?"

অনিলকুমার কি বলিতে যাইতেছিল, বৃদ্ধ হস্তদ্বারা তাহাকে বাধাদিয়া বলিতে লাগিলেন,—"চেপে যাও দাদা,—আমরা বিশ্বের কাজে মন দিয়েছি;—এ সব পাড়াপড়সির ছোটখাটো উপকার অনুপকার নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন দেখা যায় না।"

দীনবন্ধুর আর ধৈর্য্য রহিল না,—কন্যার বিবাহের চিন্তায় তাহার মাথা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। আজ দুই বৎসর যাবৎ পাত্র অন্বেষণের পর বহু কষ্টে এই মনোমত পাত্রটী মিলিয়াছিল,—সামান্য তিনশত টাকার জন্য তাহাও হাত ছাড়া হইতে বসিয়াছে। সে একেবারে দুই হস্তে বৃদ্ধের পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিল, "আপনাকে আমায় এ দায় হতে উদ্ধার কর্ত্তেই হবে।"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "আরে কর কি—কর কি—স্থির হও। আমার নাতির সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার নাতি চিরকুমার,—সে জীবনে কখন বিয়েই করবে না। তার বিয়েতে যেরূপ বিতরাগ,—সে এ জন্মেতো বিয়ে করবেই না,—পর জন্মে যে বিয়ে করবে তাও আমার বিশ্বাস নেই। আমার একমাত্র নাতি, পৃথিবীর সম্বল; আমি তার কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখিনি। আমি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কোন কাজ কর্ত্তে রাজি নই। তবে আমার সঙ্গে যদি দীনু তার মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি থাকে আমার কোন আপত্তি নেই। নাতি যখন বিয়ে করলেই না,—ভাবছি বংশটা রাখবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো।"

বৃদ্ধের এই অপ্রত্যাশিত কথায় সকলেই একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। কাহারও মুখে বাক্য নাই। বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "কি বল দীনু রাজি আছ?"

রসিক উত্তর দিল;—বলিল, "খুড়ো তোমার মত লোকের এ অবস্থায় লোককে ঠাট্টা করা শোভা পায় না।"

বৃদ্ধ হাঁকিলেন,—"বাবা পদ্মলোচন কল্‌কেটা আর একবার পাল্‌টাও বাবা।" তারপর রসিকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ঠাট্টা! এর বিন্দু বিসর্গটী পর্য্যন্ত ঠাট্টা নয়। আমি একেবারে সম্পূর্ণ রাজি, এখন দীনু রাজি হলেই হয়।"

দীনবন্ধুর আর ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল না। কোন ক্রমে কন্যা পার হইলে হয়, সে বিষাদে বলিল, "আপনাকে কন্যা দেব সেতো আমার সৌভাগ্য।"

এতক্ষণে ভৃত্য পদ্মলোচন কলিকা বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিল, বৃদ্ধ সটকার নলটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তবে আর কি সোমবারেই দিন স্থির হ'লো; —পরশুই গায়ে হলুদ হক্‌।"

দীনবন্ধু আহ্লাদে গদগদ হইয়া, "এর চেয়ে আর সুখের কথা কি আছে!"

জগতে অর্থই পরম বস্তু,—আজ অর্থের মোহিনী শক্তি প্রভাবে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধও এক ত্রয়োদশ বর্ষিয়া বালিকাকে বিবাহ করিতে চলিল। অনিলকুমার এযাবৎ একটীও কথা বলে নাই, নীরবে বসিয়া সমস্ত কথাই

শুনিতেছিল,—তাহার সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ দাদা মহাশয়, এক ত্রয়োদশ বর্ষিয়া বালিকাকে বিবাহ করিতে উদ্যত। সে স্পষ্টই বুঝিল তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। বালিকার নিশ্চিত বৈধব্য জানিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে আর নীরব থাকিতে পারিল না, ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আপনি বিয়ে করবেন! কি বলেন্ দাদামহাশয়? সে যে আপনার চেয়ে ষাট বৎসরের ছোট।"

বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তাতে কিছু আসে যায় না,—হিন্দুশাস্ত্রে তাতে কোনরূপ বাধা নাই। তুমি চিরকুমার থাকবে বলে আমি যে বিয়ে করবো না, এমন কোন কথা নেই।"

ইহার উপরে আর কথা নাই;—অনিলকুমার নীরব হইল।

রসিক বলিল,—"একবার কন্যাটীকে দেখবে না?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"কিছু প্রয়োজন নেই;—সেদিন পুকুরথেকে জল নিয়ে যাচ্ছিল আহা ঃ—

"(কিবা) চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরাণ সহিত মোর—"

ঠিক সেই সময় দূরে ঠাকুর বাড়ীর আরতির কাসর ঘণ্টা ঝাঁঝর বাজিয়া উঠিল। আষাঢ়ের বাতাস সহসা জুঁয়ের গন্ধ বহিয়া আনিয়া সমস্ত গৃহটাকে মাতাল করিয়া দিল।

(২)

গাত্রে হরিদ্রা হইয়া গিয়াছে, আজ বিবাহ। জমিদারের বিবাহ, ধূম-ধামের বিন্দুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। কলিকাতা হইতে আলো, বরের জরীর সাজ্জা পোষাক, ইংরাজি বাজনা প্রভৃতি সকলি আসিয়াছে। সমস্ত দিন বাহিরের উঠানের মাঝখানে পুতুল নাচ হইয়াছে। বিশেষ আপত্তি থাকিলেও অনিলকুমারকে স্বয়ং সমস্তই করিতে হইয়াছে। পাছে দাদা মহাশয়ের প্রাণে কষ্ট হয়, তিনি দুঃখিত হন, পাছে তিনি ভাবেন সম্পত্তিতে অংশিদার আসিবে এই হিংসায় সে এ বিবাহে আমোদ করিতেছে না, তাই সে মনের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজের নিজস্বটুকু ভুলিয়া মহা উৎসাহে কেবল দাদা মহাশয়ের আদেশ পালন করিতেছিল। যদিও তাহার প্রাণের মাঝে সততই উদয় হইতেছিল, "ছি ছি এরূপ বিবাহে উপস্থিতি আমার কিছুতেই উচিত নয়।"

দিনের পর প্রত্যহ যেমন সূর্য্য ডুবিয়া যায় আজও সেইরূপ ডুবিয়া গেল;

সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিয়া দেখা দিল। বর বাহির হইবার আর বিলম্ব নাই। অনিলকুমার স্বহস্তে তাহার দাদা মহাশয়কে বর সাজে সজ্জিত করিয়াছে। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের অঙ্গে সাজ্জার পোষক এক অপরূপ শোভায় শোভিত হইয়াছে। বর, কন্যার বাটীতে যাইবার জন্য বাহির হইতেছিলেন, সহসা পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিলেন, "অনিল কোথায়। শীঘ্র ডাক, নিত্‌বর তো চাই। শীঘ্র তাকে সেই নীল পোষাকটা প'রে আসতে বল ?"

বৃদ্ধের আদেশ অতি শীঘ্রই অনিলকুমারের কর্ণগোচর হইল। সে তাড়িতাড়ি, বাহিরে আসিয়া তাহার দাদা মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি নিত্‌বর! চব্বিশ বৎসরের একটা ষণ্ডা পুরুষ কি কখনও নিত্‌বর হয় ? আপনার হ'লো কি ?"

বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ভায়া এ সময় আর কথা কাটাকাটি কর না, যা বলি শোন। নিত্‌বর তো একটা চাই। সত্তর বৎসর বৃদ্ধের নিত্‌বর চব্বিশের হ'লে বিশেষ কিছুই এসে যায় না। এমন সুখের দিনে তুমি আর দাদা সামান্যের জন্য অঙ্গহীন ক'রো না। ঝাঁ করে সেই নীলরংএর পোষাকটা পরে চলে এস।"

অনিলকুমার মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি বলেন যে তার কোন ভাব পাই না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ভাই, বুড়োর বিয়েতে কি আর ভাব পাবে ; এই অভাবের মধ্যেই সব সেরে নিতে হবে। তুমি আর বাদ সেধ না।"

সামান্যের জন্য আর দাদামহাশয়ের প্রাণে কষ্ট দিয়া লাভ কি। তাহার উপর দাদা মহাশয় যখন খেয়াল ধরিয়াছেন, তখন সহজে ছাড়িবেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া অনিলকুমারকে সেই নীল পোষাকটা পরিয়া আসিতে হইল ;—বিশেষ বিরক্তির সহিত গাড়ীতে উঠিয়া দাদা মহাশয়ের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। মহা ধূমধামে অসংখ্য বাজি বাজনার সহিত গাড়ী বরকে লইয়া কনের বাড়ী রওনা হইল। জমিদারের বিবাহ দেখিবার জন্য গাড়ীর পশ্চাতে গ্রাম শুদ্ধ লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল।

দীনবন্ধুর এ বিবাহে এক পয়সাও ব্যয় হয় নাই ; জমিদারের পয়সায় তাহার জীর্ণ পৈত্রিক ভদ্রাসনটুকু আজ নানা সাজে সজ্জিত হইয়াছে। দ্বারে সানাই সারা দিন তাহার মধুর রাগিনীতে কানে তালা ধরাইতেছে।

আয়োজনের কোনই ত্রুটী হয় নাই। তথাপি দীনবন্ধুর প্রাণে সুখ নাই। নিশ্চিত বৈধব্য জানিয়া প্রাণের কন্যাকে এক স্থবীর বৃদ্ধের করে অর্পণ করিয়া কাহার প্রাণে সুখ থাকে? গৃহিণী শুনিয়া অবধি নয়ন জলে বক্ষ ভাসাইতেছেন;—চিরহাস্যময়ী সরলা নির্ম্মলা কন্যার হাসি চিরদিনের মত ঘুচিয়া গিয়াছে,—আর যে কখন সে হাসি ফুটিবে সে আশাও নাই। সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "ভগবান্ এত দুঃখও অদৃষ্টে লিখেছিলে।" সহসা "বর এসেছে, বর এসেছে" শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বরকে আগাইয়া আনিবার জন্য বাটীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল সমস্ত গ্রাম আলোয় আলো করিয়া, ঘন ঘন বোমা বিদীর্ণের ও অসংখ্য ঢাকঢোলের মহা শব্দ সঙ্গে লইয়া বর আসিতেছে।

বর আসিয়া পড়িল—কোলাহল, গণ্ডগোল, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাঝখান দিয়া বর আসিয়া সভায় বসিল। অনিলকুমারও লজ্জায় অধোবদন হইয়া দাদামহাশয়ের পার্শ্বেই উপবিষ্ট হইল। বিবাহ বাড়ী, কাজেই বহু-লোকের সমাগম হইয়াছে। বর দেখিয়া নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল,—"দেখে শুনে শেষ দীনবন্ধু এই কাজ কর্‌লে? আবার কেহ কেহ বলিল, "বাবা টাকার লোভ বড় লোভ।" আবার কেহ কেহ বলিল,—"কি 'করবে অবস্থায় মানুষকে সবই কর্ত্তে হয়।"

বৃদ্ধের পার্শ্বে উপবিষ্ট অনিলকুমারকে জরীর পোষাক পরা দেখিয়া অনেকেরই হাস্য সম্বরণ করা অসাধ্য হইল। কেহ কেহ স্পষ্টই বলিল,—"বাঃ! বাঃ খাসা মানিয়েছে। যেমন কচি বর, নিত্‌বরটীও তেমনি বেশ ছোট হয়েছে।" এইরূপ আরোও নানারূপ মতামত স্পষ্ট অস্পষ্ট শ্রুত হইতেলাগিল। অনিলকুমারের মনে হইল,—"মা বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।"

আনন্দ ও নিরানন্দের মধ্য দিয়া সময় ঠিক চলিয়া যায়, সে কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। কাজেই যথা সময়ে লগ্ন উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দীনবন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আর কেন লগ্ন উপস্থিত, কন্যা পাত্রস্থ করুন।"

লগ্ন উপস্থিত শুনিয়া দীনবন্ধু সভায় আসিয়া অতি দীনভাবে জোড় হস্তে

বরের নিকটে যাইয়া বলিল, "লগ্ন উপস্থিত, এইবার একবার গাত্রোত্থান করুন।"

বৃদ্ধ বর শয্যার উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়াছিলেন,—চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "লগ্ন উপস্থিত নাকি? কন্যা আসুন আমি যাচ্ছি। সমস্ত দিন উপবাসে শরীরটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে।"

কি সর্ব্বনাশ, শরীর ঝিম্ঝিম্ করছে কি? কি যেন কিসের একটা অজানিত আশঙ্কায় দীনবন্ধুর সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল,—সে জড়িত কণ্ঠে বলিল, "বিশেষ কি কোন অসুখ করছে?"

"না এমন কিছু নয়" বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন;—পরে অনিল-কুমারের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "চল ভায়া, শেষ কাজটা সেরে নেওয়া যাক্।"

অনিলকুমার তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি কোথায় যাব?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আরে চল,—বিয়েটা দেখবে চল।"

রাগে দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায় অনিলকুমারের কথা বাহির হইতে ছিল না;—সে বিশেষ বিরক্তির সহিত বলিল, "চলুন।"

বাটীর উঠানে কন্যাদানের আয়োজন হইয়াছে;—পুরোহিত মহাশয় ব্যগ্র ভাবে বরের অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন,—এমন সময় দীনবন্ধু বরকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনিলকুমার ও প্রায় সমবেত সমস্ত লোক বিবাহ দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ আলপনাযুক্ত পীঁড়িতে বসিতে যাইয়া মস্তক নাড়িয়া কহিলেন, "না আর হওয়া অসম্ভব! এক ছিলিম তামাক না খেয়ে আমার দ্বারা আর কিছু হচ্ছে না। বাবা পদ্মলোচন—"

দীনবন্ধু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তামাক! বলেন কি? তাহ'লে যে লগ্ন ভ্রষ্ট হবে!"

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তাও তো বটে।" তার পর পার্শ্বস্থিত অনিল-কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভায়া যদি একটু উপকার কর;—আমি এক ছিলিম ঝাঁ করে তামাক খেয়ে নিই। তুমি ততক্ষণ এই কাজটা সেরে নাও। আমি তামাক খেয়েই আবার লাগ্‌ছি। তামাকের মৌতাত ধরলে এক ছিলিম না খেয়ে আমি কোন কাজই কর্‌তে পারিনে সে তো তোমার জানাই আছে ভায়া—"

অনিলকুমার বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দাদামহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া বলিল, "আমি কি উপকার করবো! তা কি হয়?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"খুব হয়! বসে আছতো না। হয় বুড়ো দাদার এই উপকারটা করলে। আমি মাত্র এক ছিলিম তামাক খেয়েই আবার লাগছি।"

অনিলকুমার কি বলিতে যাইতেছিলেন,—বৃদ্ধ তাহাকে কোন কথা বলিতে না দিয়া বলিলেন. "আর কাজ কি বসে পড়—বসে পড়। বাবা পদ্মলোচন ঝাঁ করে এক ছিলিম—"

অনিলকুমার বলিল "কি—"

বৃদ্ধ তাহাকে কোন কথা বলিতে না দিয়া জোর করিয়া পীড়িতে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "এক ছিলিম তামাক খেয়েই আবার লাগছি;—বাবা পদ্মলোচন—"

এ দিকে লগ্ন যায় দেখিয়া পুরোহিত মন্ত্র আরম্ভ করিয়া দিলেন—চারিদিকে মহা হট্টগোল পড়িয়া গেল। দীনবন্ধু কি হইল বা কি হইতেছে ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিল না। চারিদিকে গণ্ডগোল তাহারই মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি অনিলকুমারের হাতের উপর পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন এক বৈদ্যুতিক ক্রীড়া তাহার সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে বহিয়া গেল। দুইটী ভাসা ভাসা কালো চোখ অনিলকুমারের সমস্ত ভাবনার মাঝখানে তাহার আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।

বৃদ্ধ নীরবে এক পার্শ্বে বসিয়া তামাক টানিতে ছিলেন;—এক্ষণে বলিলেন, "বাস্—এতক্ষণে সুস্থ! ভরপুর তামাক খাওয়া হয়েছে। ভায়া আবার আমি লাগছি।"

একাল সেকাল

(উপন্যাস)

[লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(১)

বিমলা পরিধেয় বসনে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া শয্যার একপাশে পড়িয়াছিল, নির্ম্মল গৃহে প্রবেশ করিয়া ধরিতে যাইতেই সে জড়সড় হইয়া দু'হাত সরিয়া গেল। খোঁচা খাইয়া বেদনা-কাতর হৃদয়ে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল—"এ ভাবে আর কদ্দিন কাট্‌বে বিমল!"

বিমলা উত্তর করিল না, সে যেন লজ্জায় মরিয়া গিয়া গায়ের কাপড়টা পা পর্য্যন্ত গলাইয়া দিয়া পড়িয়া রহিল। নির্ম্মল পিপাসিতের মত আবারও তাহাকে টানিয়া আনিতে গিয়া ফিরিয়া আসিল। ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল—"না, আর ত দিন কাট্‌ছে না, পায়ে ধরে সেধে যদি একটি কথাও নাই পেলুম ত, সাজিয়ে গুজিয়ে তাকের ও'পর তুলে রেখে দেখে না হয় চোক্ জুড়াতে পারে, মন ত জুড়ায় না।"

"কিসের কথা বল্‌ছিলে!" অস্ফুটস্বরে এই একটি মাত্র কথা বলিয়া বিমলা কাপড়ের আড়ালের শঙ্কিত দৃষ্টিটা একবারের জন্য স্বামীর মুখের উপর নিঃক্ষেপ করিয়া বিদ্যুতের মত লুকাইয়া লইল।

সন্তপ্ত নির্ম্মল ব্যথাভরা কণ্ঠে উত্তর করিল—"কিসের কথা যে বল্‌ছিলেম, প্রাণ দিয়েও ত সে তোমায় বোঝাতে পার্‌ব না। ভরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রাত নেই, দুকুর নেই জল জল বলে হাহাকার করা সেত আর পুষিয়ে উঠ্‌ছে না।"

এ প্রবল পিপাসা নিবৃত্তি করিবার উপায় বিমলা খুজিয়া পাইতেছিল না। সে ত তাহার জীবন মন সমস্ত লইয়া স্বামীর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। দেবতার জন্যে ত সে তাহাকে সমর্পণ করিয়াই রাখিয়াছে। তবু যদি দেবতা তুষ্ট না হয়, তাহার নীরব সাত্ত্বিক সাধনা যদি তমোগুণের আড়ম্বর ঢাকিয়া দেয় ত সে কি করিতে পারে। তত বড় আয়োজনের শক্তি বা সামর্থ্য ত তাহার নাই, স্ত্রীসুলভ লজ্জায় বাধ ত সে

ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে না, তাহাতে যে তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে, মন বসিয়া যায়। নির্ম্মল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বলিল—"বল বিমল! কি কল্লে আমি তোমায় আমার মনের মত করে পেতে পারি। অপরাধ কিছু করেছি বলে ত মনে হয় না, যারি প্রতিকারের প্রতীক্ষায় মূকের মত পড়ে থেকে আমায় এ কষ্টটা দিচ্ছ।"

বিমলার শরীর শিহরিত হইয়া উঠিল। তাহার মুখের গোড়ায় আসিয়া বাধিয়া গেল। সে মনে মনে বলিল—"তোমার আবার অপরাধ! তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব, ইহ পরকালের দেবতা।"

নির্ম্মল ত ইহাতে আশ্বস্ত হইতে পারে না, সে যে বিমলাকে ভিতরে বাহিরে স্পষ্ট পরিস্ফুট করিয়া চাহে, মুখবদ্ধ অমৃতের ভার পিপাসাই বাড়াইয়া তোলে, সে ত তৃপ্ত করিতে পারে না। জোর করিয়া মুখের কাপড় তুলিয়া নির্ম্মল এবার আবেগভরে বিমলার গণ্ডে চুম্বন করিল। লজ্জায় ভয়ে মধুর মধুরিমায় বিমলা ঘামাইয়া উঠিল, গণ্ডস্থল লাল হইয়া গেল। পত্নীকে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিয়া দীপ্ত গ্যাসের আলোতে প্রতিমার মত মুখখানার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতেই বিমলা ঘোমটা টানিয়া দিল। দীর্ঘশ্বাসের সহিত নির্ম্মল বলিল—"তুমি, এত সুন্দর, তবুত আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। আমি যে তোমায় মানুষের মত করে চাই। নীরব দেবতার অর্চ্চনা ত প্রাণের ক্ষুধা মেটাতে পারে না।"

বিমলা স্বামীর কথার অর্থও বুঝিতে পারিল না, অব্যক্ত কুণ্ঠায় সে তাহার মুখের দিকে আর একবার চাহিয়া তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতেছিল, নির্ম্মল হাত ধরিল। বলিল—"দু'টো বছর আমাদের বে হয়েছে, এর মধ্যে ত তুমি এমন দু'টো কথাও আমায় বলনি, যাতে আমি বুঝতে পারি, স্বামীর জন্যে সত্যিকার একটা ভালবাসা তোমার মধ্যে আছে।"

হায়! বিমলার ভালবাসা যে মজাইতে জানে না, সে যে নির্ম্মল শান্ত, স্থির। ভালবাসার কুহকে স্বামীকে উন্মত্ত করিয়া তুলিবে, বাহিরের আসবাব পরিপূর্ণ সেরূপ চপলতা যে বিমলার স্বভাবসুলভ লজ্জার জড়িমা ঢাকিয়া দেয়। পল্লী-সুলভ শান্ত, কোমল প্রকৃতি যে গোলাপের মত পূজার জন্যেই হইয়াছে, বকুলের তীব্র গন্ধ ছড়াইয়া মনোহরণ করিতে ত সে জানে না। দেখাই-বার শিখাইবার কাড়িয়া লইবার মত দীপ্তি গর্ব্ব, বা উন্মাদনাত সে

আধারে ছিল না। সেখানে যে লজ্জায় ঢাকা স্নিগ্ধ প্রীতি, আড়ম্বরশূন্য শান্ত ভালবাসা নীরব কার্য্যের জন্যে জটলা পাকাইয়া অবস্থিতি করিতেছে। সে ত বসন্তের কোকিল নহে, শরতের শান্ত মধুকর, পূর্ণিমার পূর্ণ জ্যোৎস্না নহে, দ্বিতীয়ার মৃদু শশিকলা, বকুলের তীব্র বাস নহে, শিরীশের কোমল সৌন্দর্য্য, রমণীর সপ্রগল্ভ মূর্ত্তি নহে, শান্তিময়ী পুণ্যস্মৃতি, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ নহে, ধীর প্রশান্ত প্রতিকৃতি। বিমলার মন যেন ভীত হইয়া আনত মস্তকে স্বামীর পায়ের গোড়ায় লোটাইয়া পড়িতে গিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল—"ওগো, আমায় শিখিয়ে দাও তুমি, আমি ত অত জানিনে, দেব, তুমি যা কত্তে ভালবাস, তাই কত্তে আমায় শক্তি দাও, সাধনা সে ত আমাদ্বারা হবে না, হতে পারে না।"

দূর আকাশের গায়ে চাঁদ হাসিতেছিল, শিশিরের শীতল স্পর্শে শিহরিত বায়ু ফুলের গন্ধ লইয়া মৃদু মন্দ গতিতে ছাতের আলিশায় গলান কাপড়ের আচল লইয়া খেলিতেছিল। নির্ম্মল উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া ক্লিষ্টস্বরে বলিল—"দেখ ঐ সুন্দর চাঁদ পৃথিবী ভরে কেমন সুষমা বিলুচ্ছে! তুমি কি তা পার না বিমল, নিজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে ত কোন লাভ নেই, তৃপ্তিও নেই। ওযে পরের জন্যেই হয়েছে, বাঞ্ছিতের ভোগেই যে, ওর স্বার্থকতা।"

এতগুলি কথার উত্তরে কোন জবাব না পাইয়া ক্ষণিকক্ষণ মৌন চিন্তার পর সহসা নির্ম্মল বলিয়া উঠিল—"না বিমল, তোমার হৃদয় ত গল্‌বার নয়, ওযে পাষাণ দিয়ে গড়া, তবে থাক তুমি তোমায় নিয়েই। আমিও আমার পথ করে নিয়ে, যে দিকে হয় চলে যাই।"

বিমলার মন অজ্ঞাতে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—"চলে যাবে! কেন, আমায় ছেড়ে যেতে কি তোমার কষ্ট হবে না, তুমি না আমায় বড় ভালবাস।" মুখে কিন্তু তাহার একটী কথাও ফুটিল না।

(২)

"এমনি বসে বসে আর ভাল ঠেক্‌ছে না মা, কল্‌কাতা গিয়েই প্রাকৃটিস কর্‌ব।"

মাতা হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"এখনও তোর বুদ্ধি ঠিক হল নারে নির্ম্মল? এই না সেদিন দেশে এসে প্রাকৃটিস কর্‌বার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলি।"

"ভেবে দেখ্‌লুম, বিদেশ থেকে কুড়িয়ে আন্‌তে না পাল্লে, দেশের লোকের উপকার করা শক্ত হবে, দেশটা একেবারে নিঃস্ব, টাকারই ওদের বড় দরকার।"

"সে দেখা যাবেখ'ন, এখন ত দু'মাস আর কোথাও যাওয়া হচ্ছে না।"

"না মা, আমায় আর বাধা দিও না, আমি আজকেই যাব।"

ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইল, বিমলার হাত হইতে কি একটা বাসন পড়িয়া গেল। গিন্নী ডাকিয়া বলিলেন—"ও বৌমা, কিসের শব্দ হল, দেখ ত।"

বিমলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ধরা পড়িবার ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

নির্ম্মল বলিল—"তা হলে তুমি বাবাকে বলে যাওয়ার আয়োজন করে দাও।"

"নারে না, সে কি হয়, তিনি তাতে মোটেও রাজি হবেন না।"

বিমলা একটা শোয়াস্তির শ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বাহির হইয়া গেল।

পালাই পালাই করিয়াও নির্ম্মল যখন মায়ের জন্যে পালাইতে পারিল না, তখন কাজে কাজেই সে আবার বিমলার পেছনে লাগিয়া পড়িল। রাত্রিতে তাহাকে বুকে টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা বিমল, আমি চলে গেলে কি তোমার কষ্ট হবে না?"

বিমলা ভাবিল, ইহার নাকি আবার উত্তর করিতে হয়। সে লজ্জায় বালিশের নীচে মুখ লুকাইল। নির্ম্মল কাতরভাবে বলিল,—"বল্‌বে না ত আমি কালই চলে যাব বল্‌ছি।"

বালিশের নীচুতে মুখ রাখিয়াই বিমলা অতিকষ্টে উত্তর করিল—"না গো না, তুমি যেন যেয়ো না।"

জোর করিয়া বিমলার মুখ তুলিয়া ধরিয়া নির্ম্মল কষ্টের হাসি হাসিয়া বলিল—"যাব না ত থাকব কিসের আশায়, দিনের বেলা ত তোমার নেজও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, রাতে যদিও বরাত প্রসন্ন হল ত, কথাটি পাবার যো নেই।"

বিমলা ধড়্‌ফড় করিয়া নির্ম্মলের বাহুবন্ধন ছাড়িয়া উঠিতে যাইতেছিল, নির্ম্মল বিস্মিত ভাবে বলিল,—"ও কি? কোথা যাচ্ছ!"

"খোকা কাঁদ্‌ছে, ওকে ঘুম পাড়িয়ে আসি।" বলিয়া সে চৌকি হইতে নামিয়া পড়িল।

নির্ম্মল আর সাম্‌লাইতে পারিল না, ধমক দিয়া বলিল,—"দাঁড়াও বল্‌ছি।"

বিমলা এতটুকু হইয়া গেল, মুখ চূণ করিয়া একবার স্বামীর দিকে তাকাইতেই নির্ম্মল শুষ্কমুখে হাসিয়া বলিল,—ভয় নেই মার্‌ব না। খোকা ত মার কাছে রয়েছে, এত রাত্তিরে তুমি ছুটে যাচ্ছ যে!"

মাথা নামাইয়া বিমলা হাতের নখ খুটিতে খুটিতে বলিল,—"মার বড্ড কষ্ট হবে, রাত্তিরে কেঁদে উঠ্‌লেত মা ওকে রাখ্‌তে পারেন না, আমি যেয়ে তবে ঘুম পাড়াই।"

"মা'ত তোমায় ডাকেন নি।"

অন্য দিন ডাকেন, আজ যে কেন ডাকেন নাই, ভাবিয়া লজ্জায় বিমলার মুখ একেবারে লাল হইয়া গেল। দীপের আলোটা নৈশবায়ুর মৃদু আঘাতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার দীপ্তিতে বিমলার প্রদীপ্ত মুখের দিকে নিমেষহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া নির্ম্মল বলিল,—"বিমলা, তুমি এত নিষ্ঠুর, যত করুণা সবই কি তোমার পাঁচজনের জন্যে, আমি কি কেউ নই, যেয়ো না বিমল, মা না পারেন, শান্তিত রয়েছে, সেই ঘুম পাড়াবেখ'ন।"

খোকা আবার কাঁদিয়া উঠিল, শান্তি-ঝীর প্রতি মোটেই আস্থাস্থাপন করিতে না পারিয়া বিমলা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। নির্ম্মল বুকটা চাপিয়া ধরিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

(৩)

"ঠাকুরঝি!"

পিছন ফিরিয়া বিমলা স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিল,—"কে, বৌদি, এলে ভাই?"

"না এসে আর থাক্‌তে পারি, তোমার ডাক পড়্‌লে যে মনের লাগাম আট্‌কে রাখা যায় না।" বলিয়া রমা বিমলার হাত ধরিয়া আদরে সোহাগে গলিয়া গিয়া হাসিয়া বলিল,—"এত জরুরি তলব কেন বোন।"

বিমলা উত্তর করিতে পারিল না, যে বিষয়টা প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য তাহার দেহ মন উতলা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, বলিবার সময় আসিলে আজ যেন রমাকে সম্মুখে দেখিয়া কে তাহার মুখ জোর করিয়া চাপিয়া

ধরিল। লজ্জায় অভিমানে স্ত্রীজাতির একান্তই অধীন কার্য্যের অক্ষমতার গ্লানিতে সে কোন প্রকারেই সহসা তাহা বলিয়া উঠিতে পারিল না। উপযুক্ত স্থান পাইয়াও নীরবতার আশ্রয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে গিয়া বিষয়টা তাহার হৃদয়কে আরও জটিল করিয়া তুলিল। রমা আবারও জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার শরীর ভাল আছে ত ঠাকুরঝি ! বাড়ীর সবাই ভাল।"

"হাঁ বৌদি, সবাই ভাল আছেন।" বলিয়া বিমলা একটা চাপা শ্বাস ত্যাগ করিল।

"তবে ?"

তবে—তবে যে কি ; কেন তাহার এ আকুল আহ্বান, তাহা ত বিমলার অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেহ জানে না। বিমলার বিক্ষিপ্ত হৃদয় যে নিরাশ্রয়ে সান্ত্বনার অভাবে একমাত্র উপেক্ষাকেই বরণ করিয়া লইয়া ব্যর্থ সাধনার তুমুল ঝড়ে ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। রমার মনে কেমন একটা সন্দেহের খট্‌কা আঘাত করিল। সে বিমলার চিবুক ধরিয়া সন্দিগ্ধ স্বরেই জিজ্ঞাসা করিল,—"নির্ম্মলবাবু কেমন আছেন, তিনিত তোমায় অবজ্ঞা করেন না।"

আঘাত পাইয়া পাপড়ি গলাইয়া ফুলের গায়ের জলগুলি ঝরিয়া পড়িতে উদ্যত হইল, বিমলার চোক ভিজিয়া উঠিল। অবজ্ঞাকে ত সে ভয় করে না, নির্ম্মল যে তাহারই জন্য তাহারই অক্ষমতায় বাড়ী ছাড়িতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তাহা যে তাহার সহ্যের অতীত হইয়া পড়িয়াছে। বিমলা অন্যমনস্কের মত বলিয়া ফেলিল,—"তোমায় ত তিনি বড্ড ভালবাসেন বৌদি।"

"তাই কি, তোমায় বুঝি তেমন আদর যত্ন করেন না।" বলিয়া অপরিসীম অধৈর্য্যে রমা পরম স্নেহের পাত্রী বিমলার জন্যে মরিয়া হইয়া উঠিল।

বিমলা ধীরে ধীরে বলিল—"আদর যত্নের ত কোন অভাব নেই, আমি যে বৌদি তার মনের মত হয়ে চল্‌তে পারি না।"

"সে কি ?" বলিয়া রমা থামিতেই বিমলা বলিয়া উঠিল,—"তাঁর উচ্চ মন, উদার প্রবৃত্তি, প্রবল পিপাসা আমি পাড়াগাঁয়ের জঙ্গলী, আমার যত্ন পরিচর্য্যা ত তাঁর পছন্দ হয় না।"

রমা চমকিয়া উঠিল, অজ্ঞাত আশঙ্কার ভাবী ছবি তাহাকে যেন চঞ্চল করিয়া দিল। গৃহিণী পুত্রবধূকে কি বলিতে আসিয়া রমাকে দেখিয়া

আনন্দে বিস্ময়ে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"কে বৌমা, কখন এলে, আস্‌বার আগেত আমায় একটিবার সংবাদও দাওনি।"

রমা ভক্তিভরে গৃহিণীর পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিয়া শান্ত মূর্ত্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"এইত আস্‌ছি। ঠাকুরঝি আমায় বার বার আস্‌তে লিখ্‌ছিল, আজ হঠাৎ মনটাও কেমন করে উঠ্‌ল, ভাব্‌লুম, একটিবার দেখে যাই।"

"তা বেশ করেছ মা, কাল আমার নির্ম্মল কল্‌কাতা যাচ্ছে, দেখাটা হয়ে গেল, বেশ হল।" বলিয়া গৃহিণী থামিতেই রমা যেন কাঁপিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কালকেই।"

বিমলার যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, স্বামীর প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় সে আর এই মাতৃতুল্যা শ্বশ্রূর মুখের দিকে তাকাইতে পারিতেছিল না। গৃহিণী বলিলেন—"যাও বৌমা, কর্ত্তার সন্ধ্যের যায়গা করে দাও।" এস মা, ততক্ষণ হাত-পা ধুয়ে ঘরে গিয়ে বসি।"

বিমলা চাহিয়া দেখিল, ম্লান সূর্য্যের ক্ষীণ আভাটুকু পর্য্যন্ত সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, আকাশ পাতাল ছাপাইয়া মস্ত একটা জড়তা নামিয়া আসিতেছিল, সবুজবর্ণের সাড়ীতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া সুপ্ত নিদ্রিত প্রকৃতির গায়ে সন্ধ্যা কোমল হস্ত বুলাইয়া দিতেছিল। সে "যাই মা" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, রমার দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল,—"আমি আস্‌ছি বৌদি, তুমি ঘরে গে বাবাকে নমস্কার কর।"

(৪)

খোলা ট্রাঙ্কের গোড়ায় স্তব্ধের মত বসিয়া নির্ম্মল যেন চিন্তার মধ্যে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল। রমা ডাকিল—"নির্ম্মলবাবু!"

রমার স্বরে নির্ম্মল বিস্মিত হইল। "বৌদি তুমি কখন এলে?" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"সে চিন্তায় দেখ্‌ছি আপনার ঘুম হচ্ছে না। দিনভোর ত জিনিষপত্রই গোছাচ্ছেন।"

"হাঁ বৌদি, বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।" বলিয়া একটু থামিয়া যেন একটা খোচা সাম্‌লাইয়া লইয়া আবার বলিল—"কেউ যে সাহায্য কর্‌বে এমন ত নেই।"

"নাই কেন, আছে ঢের, কিন্তু আমল পেলে ত হয়।" বলিয়া একবার

হাসিয়া রহস্যচ্ছলে "রমা আবার জিজ্ঞাসা করিল—এত সাজ-গোজ করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি।"

জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া নির্ম্মল উত্তর করিল—"লেখাপড়া করে, মুখ্যুর মত দিন কাটান আর মনে ধর্‌ছে না, তাই ভেবেছি কল্‌কাতা গিয়ে প্রাক্‌টিস কর্‌ব।"

"কল্‌কাতায়!" বলিয়াই রমা থামিয়া গেল, নির্ম্মল দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"ও নামটা শুনেই যে বড় চম্‌কে উঠ্‌লে।"

রমা একমুহূর্ত্ত থামিয়া যেন কথার কি হারাইয়া ফেলিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"এ কেমন ধারা নির্ম্মলবাবু।"

"সে কি বৌদি!" বলিয়া ব্যথিত নির্ম্মল বিস্মিত জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল।

"দেখুন নির্ম্মলবাবু! রাগটা সেখানেই সাজে, যেখানে রাগের উপযুক্ত আশ্রয় পাওয়া যায়, এত তা নয়?"

নির্ম্মল উত্তর করিল না, বিমলার কুসুমসুকুমার বাহুবল্লীর লজ্জাসংবৃত অপরিস্ফুট বন্ধনও যেন তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য কঠিনভাবে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কর্ত্তব্যবিমুখ মনকে দ্বিগুণ অন্তঃসন্তাপের মধ্যে লইয়া উপস্থিত করিতেছিল। চিরপরিচিত এই পল্লীসুলভ কমনীয়তায় চিরবিতৃষ্ণ নির্ম্মলের বিলাসপুষ্ট হৃদয়ের বিতৃষ্ণা বাড়াইয়া দিয়া একটা খেয়াল যে তাহাকে বিপথের পথিক করিয়া তুলিতেছে, তাহা সেও অনেকটা না বুঝিত তাহা নহে। কিন্তু বুঝিয়াও ত সে চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছে না। প্রবল আশাও আকাঙ্ক্ষার রাশকেত সে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। সে অপরাধ কাহার, বিমলাই বা তাহার মনের মত হইতে পারে না কেন? চাঞ্চল্য-রহিতা অপরিস্ফুট প্রেমের জলন্ত মূর্ত্তি বিমলার পরিজনের মধ্যে স্থান পরিমিত ভালবাসা, অনন্ত অফুরন্ত বাসনার অধীন নির্ম্মলের চঞ্চল মনের নিত্য নূতন বৃত্তিকে ত পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। যৌবনে উন্মত্ত খর প্রবাহিত মনের বেগত সে তাহার মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারে না। এজন্যে নিজে নির্ম্মল দুঃখিত, অনুতপ্ত, তবু ত তাহার মুখ ফুটিয়া বলিবার অধিকার নাই, অবাধ্য মন যে তাহাকে স্বপ্নময় বিলাসলাস্যে আত্মসুখের ব্যগ্রতায় আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়া কোথায় টানিয়া লইতেছে। রমা আবার বলিল—"মাটির পুতুলের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নিতে হয়।"

নির্ম্মলের চমক ভাঙ্গিল, সে চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল—"আমার সে শক্তি

নেই বৌদি, হয়ত এখন আর সে সাহসও নেই, তাই তাকে ভেঙ্গে ফেলে দিতেই চেষ্টা কচ্ছি।"

রমা স্তব্ধ হইয়া গেল। নির্ম্মল বলিল—"দেখ বৌদি, জেনে শুনে তোমায় আমি কষ্ট দিচ্ছি, এ আমার কত বড় অন্যায়, সে হয়ত আমি ঠিক করে বুঝ্‌তেও পাচ্ছি না। কিন্তু তুমি বুঝ্‌বে, কি দুঃখে আমি ঘর ছেড়ে পরের দোরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।" একবার থামিয়া নির্ম্মল আবারও বলিল—"যে ধরা দেবেই না, জোর করে ধর্‌লেও ত তাকে রাখা যায় না, একলা পেলেই ছুটে পালায়। সে চায়, জলের পরিবর্ত্তে ঘোল দিয়ে আমায় পরিতৃপ্ত করে আপনাকে মুক্ত রাখ্‌তে।"

"ও কি আপনি কাঁদছেন!" বলিয়া রমা বিস্মিতের স্বরে আমায় বলিয়া উঠিল—"মেয়েমানুষ বলে আমরাই যে ভুল করে থাকি, তা নয়, ভুলটা দেখ্‌ছি সবারই মধ্যে মেশে আছে।"

"ভুল বৌদি, তুমি ত জাননা, এ ক'দুটা বছর আমি কি না করেছি।"

"জানি" বলিয়া রমা একবার থামিল, তারপর একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল —"ঐ লোকে বলে না, গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি, আপনারও দেখ্‌ছি সেই রোগ হয়েছে।"

নির্ম্মলের গায়ে বৌদির এই সাদা হাসিটাও আজ বিঁধিল। সারাপথ ঘুরিয়া কিছুই কুড়াইয়া না পাইয়া সে যখন আশাহীন হইয়া পদাঘাতে পথটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল, তখন এই বৌদিকে পাইয়া তাহার মনে একটু আশার আলো ফুটিয়া উঠিতেই হঠাৎ এই নির্ম্মম পরিহাসের ঝড়ে তাহা নিবিয়া উড়িয়া গেল। পথের মাঝে ধূলামুঠা যাহা ছিল, তাহাও যেন একটা ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে এই স্নেহময়ী বৌদিটি আজ কঠোর হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মল আবার নিজের কাজেই মন দিল, ট্রাঙ্কের মধ্য হইতে একটা জামা বাহির করিয়া ভাজ করিতে লাগিল। রমা গম্ভীর হইয়া বলিল—"রাগ কল্লেন?"

নির্ম্মল তীব্রকণ্ঠে বলিল—"না না রাগ আবার কিসের, তবে এ আমি তোমায় ঠিকই বলে রাখ্‌ছি। আরাধনা সে আর আমি কর্ত্তে পার্‌ব না। তাতে যে আমার হাড়গোড় শুদ্ধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। ফটিকজল বলে ডেকে ডেকে আমার গলা শুকিয়ে গেছে, আর ত সাড়া বেরুচ্ছে না।" বলিয়াই সে জামাটা মেঝের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া বেগে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

৫ম বর্ষ, | জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪, | ২য় সংখ্যা

গল্পলহরী

চিত্রকর

[লেখক—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী]

(১)

ইহলোক ও পরলোকের মাঝখানে এমন একটা অনির্দ্দেশ্য দুশ্ছেদ্য বন্ধন আছে যাহা—লৌহ ও চুম্বুকের মত অহোরাত্রি ধরিয়া কেবলই একটি উৎকৃষ্ট ও একটি নিকৃষ্টতর জগৎকে পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে—পরিত্যক্ত ছিন্ন বাসের মত বাসনাগুলিকেও বর্জ্জন করিয়া যাইতে না পারিলে, তাহাতে বাঁধা পড়িয়া সবাইকে ঘুরপাক খাইয়া মরিতে হয়। আমরা সে ব্যাপারটাকে সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তাই 'গাঁজাখুরি' বলিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের ন্যায় মত প্রকাশ করিয়া থাকি।

যিনি সে বন্ধন ছিঁড়িতে পারিয়াছেন তিনি মুক্ত, যিনি চেষ্টা করেন তিনিও ধন্য। কিন্তু কুমুদিনী তা পারে নাই, চেষ্টাও করে নাই। সে বালিকা; অত শত বুঝিত না। বড় বড় দিগ্‌গজ্ পণ্ডিত যা সহজে পারেন না, সে তাহা পারিবে কেমন করিয়া?

সন্ধ্যার বাতাস লাগিয়া ফুলের কুঁড়িটি যেমন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে, তেমনি কবে কোথা দিয়া, কেমন করিয়া যে তাহার সর্ব্বাঙ্গে যৌবন-চিহ্ন গুলি একে একে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তা সে মোটেই বুঝিতে পারে নাই। একদিন সকালে হঠাৎ আয়নার ভিতরে আপনাকে দেখিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল।

ছেলেবেলা থেকেই বিধবা মায়ের সঙ্গে সে জমীদার-গৃহে প্রতিপালিত হইতেছিল। মিত্র বাবুদের সঙ্গে তাহাদের দূর সম্পর্কে একটু কুটুম্বিতাও ছিল।

কুমুদিনীর মা সে বাড়ীতে রাঁধিতেন-বাড়িতেন আর জমীদার গৃহিণীর সখিত্ব করিয়া হাসি-খুসিতে দিন কাটাইতেন। সে 'অবনী দাদার' সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত থাকিত। তাঁর সঙ্গে খাইত, বেড়াইত, তাঁর কাছে পড়া শিখিত, গল্প শুনিত। আর অবনী দাদা যখন ছবি আঁকিতে বসিতেন, তখন সে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে একখানা চেয়ারে বসিয়া তাঁহার সম্মুখে 'সিটিং' দিত। অবনী-কান্ত তাহাকে চিত্রাঙ্কনের 'মডেল' করিয়া লইয়াছিলেন।

বাস্তবিক পক্ষে কুমুদিনী ছবির আদর্শ হইবার অনুপযুক্ত ছিল না—শতেকে অমন সুন্দরী মেয়ে একটা মিলে কি না সন্দেহ। গিন্নীর মনে মাঝে মাঝে সাধ হইত, তাহাকে পুত্র-বধূ করিবেন, ঘরে বাধে না, কিন্তু কর্ত্তা শুনিয়া বলিতেন—

"তাও কি হয়? শুধু রূপের রাশি আর গুণের বোঝা লইয়াই জমী-দারের একমাত্র পুত্রের বধূত্বের দাবি করা চলে না—সেই সঙ্গে ধন-জন থাকাও আবশ্যক। কালো এবং নির্গুণ হইলেও তেমন ক্ষতি দেখি না, কিন্তু ও দুটি চাই, লোকের কাছে মাথা উঁচু রাখিয়া আমাকে পরিচয় দিতে হইবে ত?"

কিন্তু বিধবার ও দুটির একটিও ছিল না, সম্বলের মধ্যে কেবল মেয়ের অসামান্য রূপ এবং বিবিধ গুণরাজি। তা জমিদারের বেহান হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও—সে গৃহে তাঁহাদের আদর যত্ন ও সম্মানের ত্রুটি ছিল না। কর্ত্তা-গিন্নী তাঁহাকে আপনার জন বলিয়াই ভাবিতেন, পুত্র অবনীকান্তও "মাসী-মা" বলিয়া ডাকিতেন। সুতরাং কুমুদিনীর ভবিষ্যতের ভার তাঁহাদের উপরে ন্যস্ত করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

একমাত্র অবনীকান্ত ভিন্ন কর্ত্তা-গৃহিণীর আর কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। কুমুদিনীকে তাঁহারা নিজের কন্যার মতই ভালবাসিতেন—সুতরাং তাঁহারা যে কুমুদের ভবিষ্যতের একটা ভালরকম হিল্লে লাগাইয়া দিবেন—এ বিশ্বাস বিধবার মনে যথেষ্টই ছিল।

(২)

সংসারে আমোদ আহ্লাদ হাসি-খুসীর ভিতরে অভিভাবকদের রঙ্গচ্ছলে দু'একটা কথায় কিম্বা আদর কালের এক আধটা অতর্কিত সম্বোধনে অনেক

সময়ে বালক বালিকাদের জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। অত্যন্ত সুস্থকায় সবল ব্যক্তির মুখের উপর কেহ যদি কোন দিন হঠাৎ বলিয়া ফেলে যে, 'তোমার কি হইয়াছে, তুমিত আর বেশীদিন বাঁচিবে না,' তাহা হইলে সেই আকস্মিক কথার খোঁচাটা তাহার প্রাণে বিদ্ধ হইয়া এমন একটা ক্ষত করিয়া দেয়, যে সে যথার্থই অচিরে বিনা কারণে পীড়িত হইয়া পড়ে। তেমনি একটা তুচ্ছ কারণে কুমুদিনীর জীবনের স্রোত ফিরিয়া গিয়াছিল।

কুমুদিনীর বয়স তখন দশ বৎসর; বৈশাখের স্নিগ্ধ প্রভাতে স্নান করিয়া ঠাকুর ঘরে মাটির শিব গড়িয়া সে পূজায় বসিয়াছিল। সারা বৈশাখ মাস ভোর্ সে প্রত্যহই এমনি পূজা করিত। মিত্র গৃহে শালগ্রাম ছিলেন, বারো মাস হিন্দুর সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইত। 'অবনী দাদার' কাছে সে শিব পূজার মন্ত্র এবং পদ্ধতি শিখিয়া লইয়াছিল।

সদ্যোস্নাতা, অম্লান শুভ্রবাস পরিহিতা, অম্লান সৌন্দর্য্যময়ী কুমারীর স্নিগ্ধ রূপের ছটায় ঠাকুরঘর যেন আলো হইয়াছিল। শিশিরসিক্ত শ্বেত পদ্মের ন্যায় পূজা-নিরতা বালিকার কমনীয় মুখমণ্ডল হইতে একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পূত প্রভা বিচ্ছুরিত হইতেছিল। বালিকা মুদিত নয়নে বক্ষ সংলগ্ন যুগল হস্তে ধ্যান মগ্না ছিল। সহসা দেখিলে মনে হইত—কে যেন সুন্দর রং ফলানো একটি নিটোল মোমের পুতুলকে ঠাকুরঘরে বসাইয়া রাখিয়াছে। গৃহিণী সেইখানে আসিয়া সেই মূর্ত্তি দেখিলেন।

বৈশাখের বিমল প্রভাত, নীলাকাশে অকলঙ্ক প্রভাতারুণের অমল কনক রশ্মি, প্রকৃতিবক্ষে প্রস্ফুট প্রসূনের ধবল হাস্যচ্ছটা, বৃক্ষশিরে পক্ষীকুলের কল গীতি,—চারিদিক হইতে পৃথিবী যেন রূপ রস গন্ধ ও গানের তরঙ্গে চিত্তহারা? প্রকৃতির সেই সুরে গৃহিণীর প্রাণের সুর মিশিয়া ক্ষণেকের জন্য তাঁহার সংসারাভিজ্ঞ গম্ভীর চিত্তকে অত্যন্ত লঘু করিয়া দিল, চকিত চপলার মত অনেক দিনের পুরাতন কাহিনী বিগত যৌবনের একটা মধুময় সুপ্ত স্মৃতি মনে জাগিয়া তাঁহাকে মাদকতাময় করিয়া তুলিল। সেইক্ষণে ধ্যানমুগ্ধ বালিকার মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে যেন স্বপ্নরাজ্যের ষড়ৈশ্বর্য্যময় সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে ফুটিয়া উঠিল। দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া তিনি ক্ষণেক অবাঙ্ নয়নে মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন।

ধ্যানান্তে প্রণাম করিয়া বালিকা যেমন উঠিল, অমনি তিনি ঘরে ঢুকিয়া

আবেগভরে তাহাকে বুকে ধরিয়া চুম্বন করিলেন, তৎপরে চিবুক ধরিয়া কহিলেন—

"তুই কি আমার ঘরের লক্ষ্মী হবি না মা? অবনী আমার যেমন সদাশিব তার যোগ্য পার্ব্বতী বটে?"

কুমদিনী প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তারপর হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুতের শিখা তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছুটিয়া গেল, মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, সে পলাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সেই হইতে কুমারীর অম্লান শুভ্র হৃদয়ে অজ্ঞাতে একটু দাগ পড়িল।

(৩)

অতি ক্ষুদ্র কুশের অঙ্কুরটি যেমন মাটির তলে কোথায় তার অস্তিত্ব লুকাইয়া রাখে, কেহ জানিতে পারে না, তার পরে সহস্র শিকড় বেষ্টনে মাটিটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া হঠাৎ একদিন মাথা তুলিয়া ফুটিয়া উঠে,—তেমনি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের কোন নিভৃত তলদেশে—অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর মত কৃষ্ণ বিন্দুটুকু পড়িয়াছিল, তা সে আদৌ টের পায় নাই। তারপর ক্রমে ক্রমে যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, সে তার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিল।

বাল্যকাল হইতে অবনীকান্তের সঙ্গে ছায়ার মত ফিরিতে দেখিয়া গৃহিণী যখন রঙ্গচ্ছলে তাহাকে কহিতেন—"অবনীকে বিয়ে করবি কুমুদ?" সে অমনি হাসিয়া কহিত "দূর, দাদার সঙ্গে কি বিয়ে হয়?" কিন্তু এখন সে বুঝিল যে এরূপ 'দাদার' সঙ্গে বিয়ে হওয়া অন্যায় বা অসঙ্গত নহে, বরং সেই কথাটা ভাবিলেই তাহার হৃদয় যেন কেমন একটা অজ্ঞাত পুলকভরে স্পন্দিত হইয়া উঠে! সেই হইতে সে অবনীকান্তকে 'দাদা' বলা ছাড়িল এবং কিছুতেই আর সে নাম মুখে আনিল না।

তাহার স্বভাবে আরো একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। সে একেলা পড়িতে লাগিল, একেলা বেড়াইতে লাগিল, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আর অবনী কান্তের সম্মুখে যাইতে চাহিত না; কেমন একটা লজ্জার ভাব। এগার বৎসর বয়স হইতেই তাহার ভিতরে একটা সঙ্কোচের কুণ্ঠা আনিয়া দিয়া গেল।

কিন্তু অবনীকান্ত না-ছোড়। কুমুদিনীকে তিনি আপনার কলা-শিল্পের আদর্শ করিয়া লইয়াছিলেন। তা ছাড়াও বহুদিন হইতে সর্ব্বদা একত্রে একত্রে থাকিয়া তাঁহার প্রতি মনের টান ও জন্মিয়াছিল। সেটা প্রণয় না হইলেও আকর্ষণটা নিতান্ত লঘু নহে। কুমুদিনীকে সম্মুখে না বসাইলে তিনি তুলি

ধরিতে পারিতেন না, কুমুদিনী ভাল না বলিলে তাঁহার ছবি আঁকা মঞ্জুর হইত না। তাই তিনি কুমুদিনীর অভাবটা বড় বেশী বোধ করিলেন এবং জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

অবনীকান্তের সঙ্গে যাইতে প্রতিপদে কুমুদিনীর পায়ে বাধিতে লাগিল, কিন্তু কি করিবে, উপায় নাই। পাছে কেউ মনের কথা টের পায়, সেই ভয়ে আপনাকে পদে পদে সামলাইয়া চলিতে লাগিল।

চিত্রগৃহে গিয়া নিভৃতে অবনীকান্তের সম্মুখে একাকী বসিয়া থাকিতে ইদানীং তাহার বুকের ভিতরটা কেমন ধড়ফড় করিতে আরম্ভ করিল। অবনীকান্ত যখন এক একবার তাহার প্রতি বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া পরক্ষণেই ক্যাম্বিশের উপর মনোযোগ সহকারে তুলি চালাইত, সে তখন পুতলটির মত অত্যন্ত নীরব, নিস্পন্দ ভাবে কাঠ হইয়া বসিয়া থাকিত।

কুমুদিনীর এই ভাবান্তর বাটীর অন্য কেহ লক্ষ্য করিতে না পারিলেও, অবনীকান্ত প্রথমে লক্ষ্য করিলেন। ইদানীং তিনি 'আদর্শের' মধ্যে একটা সজীবতার স্ফূর্তি দেখিতে পান না—যেন মৃতের ছবি আঁকিতেছেন, সুতরাং ছবি কিছুতেই মনোমত নিখুঁৎ হয় না। প্রথম তিনি কত বলিলেন, বুঝাইলেন, ধমকাইলেন, কিন্তু কিছুতেই 'মডেলের' সে দোষ সারিল না।

ভালবাসার ভিতরে এমন একটা তাড়িৎ-শক্তি সঞ্চিত আছে যে তাহা টেলিফোঁর তারের মত একপ্রান্তে ঘা দিলে অপর প্রান্তে বাজিয়া উঠে। ছবি আঁকিতে আঁকিতে একদিন অবনীকান্ত হঠাৎ কুমুদিনীর মুখের পানে চাহিয়া সেখানে কি দেখিলেন জানিনা—কিন্তু সেইক্ষণ হইতে বুঝিলেন যে, বালিকা না জানিয়া অকুলসাগরে ঝাঁপ দিয়াছে। সেই হইতে তিনি তাহাকে আর বকিতেন না।

কিন্তু ছবি-আঁকা বন্ধ রহিল না, সুতরাং কুমুদিনীরও অত্যন্ত চেষ্টায় আপনাকে সামলাইয়া 'সিটিং' দিবার জন্য আনাগোনাও বন্ধ হইল না। কুমুদিনী মনে মনে জানিত—অবনীকান্তের সহিত তাহার বিবাহ হইবে, অবনীকান্ত জানিত—বালিকার দুরাশা, তাহাদের বিবাহ হইতে পারে না।

অবনীকান্ত ভাবিয়াছিল, একদিন কথা প্রসঙ্গে কথা তুলিয়া বালিকার অন্যায় আশা—বিষম ভুলটা ভাঙ্গিয়া দিবে। কিন্তু ভালবাসা পাইবার একটা উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ গৌরব আছে, তাহা অনুভব করিয়া সে এমনি ফুলিয়া উঠিল যে বলি বলি করিয়াও আর কথাটা বলিতে পারিল না, সুতরাং

কুমুদিনীর মনে নিত্যই আশা বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এইরূপে আরো বছর খানেক কাটিল।

ইতিমধ্যে কখন যে প্রকৃতিদেবী কোথা দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে আপনার তুলি বুলাইয়া গেলেন—তা সে মোটেই জানিতে পারিল না।

(৪)

সেদিন সকালে, চিত্রশালায় 'সিটিং' দিতে আসিয়া, ভিত্তিগাত্র সংলগ্ন বৃহৎ আয়নার মধ্যে হঠাৎ আপনাকে দেখিয়া কুমুদিনী একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। ক্ষণকাল স্তম্ভিতবৎ থাকিয়া তারপরেই সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। অবনীকান্ত কত ডাকিলেন—সে আর আসিল না।

সেই হইতে কুমুদিনি 'সিটিং' দেওয়া একেবারে বন্ধ করিল। অবনীকান্ত কুমুদিনীর একখানি প্রতিকৃতি প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন সেটা আর আঁকা হইল না—অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

কুমুদিনী অবনীকান্তের সম্মুখে আর মোটেই বাহির হইত না, এমন কি তাঁহার সাড়া পাইলেই ছুটিয়া গিয়া লুকাইতে আরম্ভ করিল। এই ব্যাপার লইয়া বাড়ীতে একটা কাণা-কাণি, হাসি তামসা পড়িয়া গেল।

অবনীকান্ত বুঝিলেন ব্যাপার গুরুতর দাঁড়াইতেছে, আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে, এইবেলা একটা উপায় করিতে হয়। তিনি একদিন আহারে বসিয়া চুপি চুপি কুমুদিনীর মাতাকে বলিলেন—

"মাসীমা, কুমুদ বড় হইয়াছে, আর বিয়ে না দেওয়া ভাল দেখায় না।"

কুমুদিনীর মাতা বলিলেন—"বাবা তোমরাই আমার বল-বুদ্ধি ভরসা, তোমরা না মনোযোগ করিলে আমি কি করিব?"

অবনীকান্ত পুনশ্চ কহিলেন—

"আমার সন্ধানে একটি সুপাত্র আছে, তুমি বাবা মাকে বলিয়া সম্মত কর, আমি স্থির করিয়া দিব।"

পরদিনই কুমুদিনীর মাতা গৃহিনীকে ধরিয়া বসিলেন, গৃহিণী কর্ত্তাকে বুঝাইয়া মত করাইলেন।

তাঁহারাই কুমুদের বিবাহ দিবেন, সুতরাং বিলম্ব ঘটিল না। পাত্র দেখা হইল—পছন্দ হইল—কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল। তখন গৃহিণী আবার কহিলেন—

"কুমুদকে পরের ঘরে পাঠাইয়া দিয়া আমি থাকিতে পারিব

য়া, এই সঙ্গে আমাকেও একটি বৌ আনিয়া দেও ; দুই বিবাহ এক সঙ্গেই হউক।”

তাহাই হইল। অবনীকান্তের জন্যও একটি কন্যা মনোনীত করিয়া বিবাহের কথাবার্ত্তা ধার্য্য হইয়া গেল। পরে পরে দুই বিবাহের দিন পড়িল —অবনীকান্তের বিবাহের সপ্তাহ পরেই কুমুদিনীর বিবাহ।

জমীদার বাড়ীতে দুই বিবাহের উদ্যোগ আয়োজনের সমারোহ পড়িয়া গেল।

(৫)

যেদিন অবনীকান্তের বিবাহের পাকাদেখা হইয়া গেল, সেইদিন শেষ রাত্রি হইতেই কুমুদিনীর গা গরম হইয়া উঠিল। সকাল বেলায় ঘরের বাহিরে আসিতেই প্রথমে গৃহিণীর সম্মুখে পড়িল, হঠাৎ তাহার থম্‌থমে মুখ আর ছলছলে চক্ষু দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, বেশ গরম।

কুমুদিনীকে শুইয়া থাকিতে বলিয়া অবনীকান্তকে ডাকিয়া ডাক্তার আনিতে কহিলেন। কয়টা দিন পরে-পরেই দু'জনারই গায়ে-হলুদের দিন স্থির ছিল।

ডাক্তার আসিয়া পরিক্ষা করিয়া ঔষধ লিখিয়া দিলেন, বলিলেন—“ভয় নাই, সামান্য জ্বর—দু'একদিনেই সারিয়া যাইবে।”

কিন্তু জ্বর সারিল না, বরং বাড়িতে লাগিল। গৃহিণী কুমুদকে মেয়ের মত ভাল বাসিতেন, তিনি আপনি সর্ব্বদা কাছে বসিয়া তদ্বির ও সেবা করিতে লাগিলেন।

অবনীকান্তের গায়ে হলুদের দিন সকালে কুমুদিনীর জ্বর একটু কমিল, সে বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া বসিল এবং উৎসব দেখিল। সহস্র ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ব্যস্ত থাকিয়াও গৃহিণী একশোবার আসিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন।

আরো দুইদিন ভাল কাটিল। সেইদিন হইতে চতুর্থ দিনে অবনীকান্তের বিবাহ এবং কুমুদিনীর গাত্র-হরিদ্রার দিন ধার্য্য ছিল। ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিয়া কহিলেন।

“কালকার দিনটাও যদি এমনি ভাল কাটে, তবে পরশু ভাত দিবঁ।”

কিন্তু সেই ‘কালকার’ দিন ভাল কাটিল না। উৎসব শেষে ভোরের

দীপালোক যেমন ম্লান হইয়া আসে, অবনীকান্তের গাত্র-হরিদ্রার উৎসব শেষে অধিক রাত্রে কুমুদিনীও তেমনি বিবর্ণ হইয়া পড়িল। সারাদিবসের পরিশ্রমে গৃহিণী এবং কুমুদের মাতা উভয়েই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহারা রোগিনীর শয্যাপ্রান্তে গিয়া বসিলেন।

সেই রাত্রি শেষে কুমুদিনীর জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল—যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সকাল বেলা ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—

"যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিব এখন কিছু বলিতে পারিলাম না। অকস্মাৎ এমন রোগ বৃদ্ধির কারণ বুঝিতে পারিতেছিনা।"

সারাদিনের মধ্যে জ্বর কমিল না বরং একটু বাড়িল। পরদিনও সেই ভাবে চলিল। সুতরাং তাহার গায়ে হলুদ বন্ধ রাখিয়া পাত্রের বাটীতে সংবাদ দেওয়া হইল। কিন্তু অবনীকান্তের বিবাহ অত্যন্ত অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে—আর বন্ধ করিতে পারা গেল না, সন্ধ্যাবেলা বর বাহির হইল।

কুমুদিনীর সেই অবস্থা, গৃহিণীর সমস্ত আমোদ আহ্লাদে উৎসাহ উদ্যম নিবাইয়া দিয়াছিল, না করিলে নয় বলিয়া তিনি কোন রকমে কুলকর্ম্ম সমাধা করিলেন; বর বিদায় করিয়া আসিয়া আবার কুমুদিনীর শয্যাপ্রান্তে বসিলেন।

সে রাত্রে রোগিনীর যাতনা অতিশয় বাড়িল কিন্তু প্রভাত হইতেই সে ভাবটা কমিয়া একটা অবসন্ন আচ্ছন্নতার ভাব আসিল—কুমুদিনী অজ্ঞান, নিস্পন্দ রহিল।

সারাদিন সেই ভাবে কাটিল। বৈকালে বৌ লইয়া অবনীকান্ত যখন গৃহে আসিলেন, তখন শঙ্খরোল ও হুলুধ্বনির মধ্যে তাহার সংজ্ঞা ফিরিল। সে কহিল—

"বৌ দেখিব।"

বর-কনে বরণ করিয়া তুলিবার জন্য কুমুদিনীর মাতাকে পাঠাইয়া গৃহিণী তাহার কাছে বসিয়াছিলেন। রোগিনীর কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল, কহিলেন—

"দেখিবে বৈ কি মা, তাদের এখানে নিয়া আস্‌তে বল্‌ছি।

"না, না" বলিতে বলিতে হঠাৎ কুমুদিনী বেগে উঠিয়া বসিল—গৃহিণী তাড়াতাড়ি ধরিলেন। সে আবার কহিল—

"মাসিমা আমায় ধর, আপনি গিয়া দেখিব।"

কিন্তু দাঁড়াইতে ছিন্ন বল্লরীর মত সে টলিয়া পড়িল, গৃহিণী তাড়াতাড়ি ধরিয়া বুকের উপর তুলিয়া লইলেন, তারপর তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি সেই ভাবে কোলে করিয়া বৌ দেখাইতে লইয়া গেলেন।

বধূর মুখ দেখিয়া কুমুদিনী মুহূর্ত্তকাল এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, পরক্ষণেই তাহার চক্ষের ক্ষীণদীপ্তি টুকুও ম্লান হইয়া গেল, মুখ বিমর্ষ পাণ্ডুর বর্ণ হইয়া আসিল।" "উঃ মাঃ" বলিয়া একটু অস্ফুট চীৎকার করিয়া সে আবার সঙ্গা হারাইল।

সমস্তটা রাত্রি বড় ভয়ানক ভাবে কাটিল। অজ্ঞান অবস্থায় কেবল প্রলাপ বকিতে লাগিল। ডাক্তার সারারাত্রি শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। গৃহিণী অবিরল চক্ষের জলে ভাসিয়া ক্রমাগত ঠাকুর দেবতার উদ্দেশে মথা খুঁড়িতে লাগিলেন। তাহার মাতা আপনার সমস্ত প্রাণটা দিয়াও কন্যার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু ফিরাইতে চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না।

কিন্তু সকলের চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া প্রভাতের প্রথম আলোকের সঙ্গে সঙ্গে বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

(৬)

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—নূতন বৌ ঘর করিতে আসিয়াছে।

কুমুদিনীর সেই ছবিখানি শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে 'সিটিং' দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল, সেই হইতে অবনিকান্ত আর তুলিকা' স্পর্শ করেন নাই। সেই অসম্পূর্ণ ছবি খানি তিনি আপনার শয়ন-কক্ষে খাটের শিয়রের কাছে দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন। যে গৃহে একদিন তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু যেন সহস্ররূপে চতুর্দ্দিক সঞ্জিবিত করিয়া রাখিত, এখন সেখানে একখানা ফ্রেমে আঁটা একটুক্রা ক্যাম্বিসের উপরে রং ও তৈলের গোটা-কতক অসম্পূর্ণ আঁচড় ভিন্ন আর কোন খানে তাহার চিহ্ন নাই। হায়! মনুষ্য জীবন এমনি অসম্পূর্ণ বটে।

কুমুদিনীর মৃত্যু গৃহিণীর অন্তরে একটা গভীর ক্ষত রখিয়া গিয়াছে;—তিনি ভাবেন, তিনি বুঝি বালিকার অকাল মৃত্যুর কারণ। যতই তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করেন, ততই সে যেন চারিদিক হইতে সহস্র বাহু বিস্তার

করিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে। বধূকে সাজাইতে, আদর করিতে গিয়া মৃত্যু পাণ্ডুর কিশোর মুখখানি যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, আর তা করা হয় না, সরিয়া গিয়া লুকাইয়া চক্ষের জল মুছিতে বসেন। বৌ-মাকে ডাকিতে গিয়া অতর্কিতে 'কুমুদ' বলিয়া ডাকিয়া ফেলেন, বধূর কণ্ঠস্বরে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভাবিয়া অনমনা হইয়া যান। সর্ব্বদা মনে হয় যেন বাড়ীময় সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই রূপে সেই ক্ষুদ্র কলেবর গতায়ু প্রাণী যেন কোন চির সুসুপ্তির রাজ্য হইতে নবজীবনে জাগিয়া আসিয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে অষ্ট প্রহর বেষ্টন করিয়া ফিরিতেছে।

অবনী কান্তের মনেও প্রথম প্রথম দিন কতক অমনি হইয়াছিল, কিন্তু নবীন প্রণয়ের মাদকতায় তিনি পুরাতনকে ডুবাইয়া দিয়াছেন—তাহার কথা আর বড় একটা মনেও পড়ে না। ধূলিধুসরিত চিত্রশালা আবার পরিষ্কৃত হইয়াছে, নূতন রং এবং নূতন তুলিকা আসিয়া পুরাতনের কার্য্যভার লইয়াছে। তিনি তাঁহার প্রিয়তমার একখানি বৃহদায়তন চিত্র আঁকিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন।

চিত্রালয়ের পার্শ্বেই শয়ন কক্ষ। এক দিন প্রভাতে অবনীকান্ত ছবি আঁকিবারর জন্য রং গুলিতে ছিলেন, বধূ সিটিং দিতে যাইবার জন্য শয়নকক্ষের মধ্যে বসিয়া সাজ গোজ করিতে ছিল। উভয় কক্ষের মধ্যস্থ দ্বারের একটা কবাট উন্মুক্ত ছিল।

আচম্বিতে বধূ অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। অবনীকান্ত রং ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন—সে ঘরের এক কোনে আড়ষ্টবৎ দাঁড়াইয়া দেওয়ালে লম্বিত মৃতা কুমুদিনীর চিত্রখানির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া কাঁপিতেছে, মুখ খানি ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছে।

অবনীকান্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে ব্যাপার কি ?"

বধূ কথা কহিতে পারিল না, কেবল ছবিখানার দিকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইল।

অবনীকান্ত কিছু বুঝিতে পারিলেন না, পুনশ্চ কহিলেন—

"কি হইয়াছে—কি ওখানে ?

"ওই ছবি।"

"কি তা, হয়েছে কি ?"

"ও আমার পানে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া যেন গিলিতে আসিতে ছিল, মুখে চক্ষে একটা দারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ যেন ছুটিয়া পড়িতেছিল।' কে—'ও?"

বধূ বিবাহের সময় আসিয়া মূর্চ্ছালাঞ্ছিত বালিকার পাণ্ডুর মুখ খানি একবার মাত্র অল্পক্ষণের জন্য দেখিয়াছিল—সে আজ দুই বৎসরের কথা তাহার স্বামীও এই চিত্রখানির কথা এক দিনের জন্য তাহাকে বলেন নাই। এ ছবি দেখিয়া তাহার চিনিবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না।

বধূর কথা শুনিয়া অবনীকান্ত মুহূর্ত্তের জন্য বিমনা হইলেন, পরক্ষণেই কি ভাবিয়া কহিলেন—

"ওকে তুমি চেন না, ও আমাদের কেহ নয়—কোন সম্পর্ক নাই।"

"তবে আমার পানে অমন করিয়া চাহিতেছিল কেন?"

এবার অবনীকান্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং বধূকে বাহু-বেষ্টনে ধরিয়া ছবির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর কহিলেন—

"ভাল করিয়া দেখ, কোন্ দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, মুখ এক পাশে ফিরানো তোমার দিকে চাহিবে কেমন করিয়া?"

"এখন ত তাই দেখিতেছি, কিন্তু সত্য বলিতেছি একটু আগে আমার পানে স্পষ্টভাবে চাহিয়াছিল—আমি বেশ দেখিয়াছি।"

অবনীকান্ত কথাটা একেবারেই হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, এবং বধূর হাত ধরিয়া চিত্র-গৃহে লইয়া গেলেন।

(৭)

কথাটা অবনীকান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও বধূ তাহা পারিল না, সে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে তাহা মিথ্যা ভাবিবে কেমন করিয়া? অথচ প্রমাণ প্রয়োগে সে কাহাকেও সত্য বলিয়া বুঝাইতে পারে না। তাহার মনে একটা বিষম খট্‌কা লাগিয়া রহিল।

সেই হইতে শয়ন কক্ষে ঢুকিতে তাহার গা ছম ছম্ করিয়া উঠে, আড়ে আড়ে ছবির পানে চাহিতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দেয়, অধিকাংশ সময়েই নির্জীব চিত্র পট হইতে একটা ঘৃণাপূর্ণ জীবন্ত বিষদৃষ্টি আপনার উপর অনুভব করিয়া ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। ক্রমে এমন হইল যে তাহার স্বহস্তে সজ্জিত আনন্দময় বিরাম কুঞ্জের মত শয়ন-গৃহ খানি আতঙ্ক ও বিভীষিকার আকর রূপে তাহাকে জীবন্ত গ্রাস করিবার জন্য আকাশ পাতাল জুড়িয়া প্রকাণ্ড মুখব্যাদন করিয়া আসে।

সে পারত পক্ষে আর সে ঘরে যাইতে চাহে না, তবু লোক লজ্জা এবং স্বামীর বিরাগ উৎপত্তির আশঙ্কায় তাহাকে সমস্ত প্রাণটুকু বাহিরে রাখিয়া কলে চালিত নিতান্ত নির্জ্জীব কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত যাইতে হয়।

ছবিখানি বিদায় করিবার জন্য সে স্বামীকে বহুদিন বহুবার অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, কেবল তাহার মনরক্ষার অনুরোধে ছবিখানির উপরে এক টুকরা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু তাতে কি হয় এখনও যে বস্ত্রাবরণ ভেদ করিয়া সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি তাহাকে পোড়াইতে আসে—সে কি করিবে? মনের ভিতর দারুণ আতঙ্ক রাখিয়া বধূ দিন দিন শুকাইয়া কাঠের পুতুলটির মতই হইতে লাগিল।

তখন কথাটা আর গোপন রহিল না। বাটীর সকলেই শুনিল, গৃহিণীর এবং কুমুদিনীর মাতার কর্ণে সে কথা গেল; তাঁহারা নির্জ্জনে গিয়া কাঁদিলেন।

কর্ত্তা শুনিয়া গৃহিণীকে কহিলেন, "চুলোয় যাক, ছবিখানা দূর করিয়া দাওনা ছাই—আপদ চুকে যা'ক।

গৃহিণীর প্রাণে কথাটা বিঁধিল, দুঃখিত হইয়া কহিলেন—"তা আমি পারিব না, পুরুষ মানুষ এমনি কঠিন হৃদয়ই বটে?"

"তবে কি বৌ-টা দিবারাত্রি ভয়ে ভয়ে থাকিয়া একটা কঠিন ব্যারামে পড়িবে? ইহাই তোমার ইচ্ছা?"

"আমার ঘরে আনিয়া রাখিব।"

তখনি গৃহিণী অবনীকান্তকে ডাকিয়া কহিলেন তোমরা যদি এতই জ্বালাতন হইয়া থাক, ছবিখানা আমাদের ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়া যাও।"

অবনীকান্ত ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"আমি মোটেই ভয় পাই নাই। তা ছবিখানিতে জায়গায় জায়গায় একটু রং দিতে বাকী আছে, সেটা সারিয়া তোমার ঘরেই দিয়া যাইব।"

কিন্তু শীঘ্র সেটাতে রং দেওয়া সারা হইল না। তিনি তখন বধূর ছবি প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা উপেক্ষা করিয়া সেটাকে অগ্রে শেষ করা বিবেচনা করিলেন না, সুতরাং যেখানকার ছবি আপাততঃ সেই খানেই রহিয়া গেল।

দিন পনেরো পরে একদিন জমীদার গৃহে সখের যাত্রা হইল। আহারাদি শেষে রাত্রি দশটার সময়ে যাত্রা বসিবে। গৃহিণী সমস্ত পুরস্ত্রী এবং আমন্ত্রিত

গণের সহিত বধূকে ও । গিয়া যাত্রা শুনিতে বসিলেন। রাত্রি জাগরণ সহি-বেনা বলিয়া অবনীক শয়ন করিতে গেলেন।

ভোরের বেলা বধূ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, ক্রমাগত ঘুমে ঢুলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া গৃহিণী কহিলেন—

"এইবার তুমি গিয়া ঘুমাও।"

বধূ উঠিয়া গেল। চিত্রশালার ভিতর দিয়া শয়ন গৃহে যাইবার সোজা পথ, বধূ সেই পথে চলিল। চিত্র-গৃহে যেখানে তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইতেছিল, সেই পর্য্যন্ত আসিয়া সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই চীৎকার করিয়া উঠিল।

ভোরের দিকে ঘুম তরল হইয়া অবনীকান্ত প্রায় সজাগ হইয়াছিলেন, বধূর চীৎকারে উঠিয়া পড়িলেন এবং লাফাইয়া খাটের নীচে নামিয়া একেবারে চিত্রশালার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন বধূর মুখমণ্ডল ভয়ে পাংশু-বর্ণ ধারণ করিয়াছে, সে একটা আরাম কেদরার পিঠ ধরিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। অবনী দ্রুত গিয়া তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি হইয়াছে?"

বধূ কোন কথা না বলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে কি দেখাইয়া দিল। ঘরের ছাদ হইতে লম্বা শিকল সংলগ্ন হইয়া ফানুসের ভিতরে মিটি মিটি করিয়া আলো জ্বলিতেছিল। অবনী দেখিলেন যে কাষ্ঠ ফলকের উপরে রাখিয়া বধূর চিত্র আঁকিতে ছিলেন, সে খানি সে স্থান চ্যুত হইয়া মেঝেতে গড়াইতেছে, আর তাহার স্থান অধিকার করিয়া মৃতা কুমুদিনীর চিত্রখানি বসিয়া আছে।

হঠাৎ অবনীকান্তের মনে হইল ছবিখানি যেন সম্মুখদিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদের পানে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে। বাতির ক্ষীণালোকে সেই হাসি জীবিতার হাসির মতই বোধ হইল।

মুহূর্ত্তের জন্য অবনীকান্ত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পরক্ষণেই ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন—"এ কে করিল?"

বধূ কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"তা আমি কেমন করিয়া জানিব, মার সঙ্গে বসিয়া যাত্রা শুনিতেছিলাম, বড় ঘুম পাইতে লাগিল বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আমাকে তামাসা করিয়া ভয় দেখাইবার জন্য তুমি কর নাই ত?"

"সেকি, আমি ঠিক রাত্রি দশটার সময়ে সেই যে শুইয়াছিলাম—অঘোরে ঘুমাইয়াছি, এই মাত্র তোমার চীৎকারে উঠিলাম।

স্বামীর কথা শুনিয়া বধূর ভয় আরও বাড়িল, স্বামীর বক্ষ-লগ্না হইয়াও তাহার কম্পন থামিল না। অবনীকান্ত পুনরপি কহিলেন—

"নিশ্চয় কেহ ভয় দেখাইবার জন্য এ কাজ করিয়াছে।"

"কে করিবে বাড়ীতে তেমন কে আছে?"

হঠাৎ স্বামীর হস্তাঙ্গুলির প্রতি বধূর দৃষ্টি পড়িল, তখন সে অভিমানভরে কহিল—

"যাও, সব বুঝিয়াছি, নিজের হাতের আঙ্গুলগুলি ভাল করিয়া দেখ দেখি।"

অবনীকান্ত আপনার হস্তের অঙ্গুলির পানে চাহিয়াই চমকিয়া উঠিলেন—তাঁহার অঙ্গুলিতে কাঁচা রঙের দাগ তখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই।

অঙ্গুলির পানে চাহিয়াই চমকিয়া উঠিলেন—তাঁহার অঙ্গুলিতে কাঁচা রঙের দাগ তখনও ভাল করিয়া শুকায় নই।

তিনি ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া নির্ব্বাক রহিলেন, ব্যাপারখানা আগাগোড়া স্বপ্নময় বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে দৃঢ়স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন—"সত্য বলিতেছি ইহার বিন্দুবিসর্গ ও জানি না, কিন্তু আমারই অঙ্গুলিতে কাঁচা রঙ্গের স্পষ্ট চিহ্ন, এ কি কাণ্ড?"

হঠাৎ যেন কি একটা কথা মনে পড়িল, তখন একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—

এতক্ষণে বুঝিলাম। এ আমারই কার্য্য বটে, কিন্তু সজ্ঞানে নহে—স্বপ্ন-ঘোরে। ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে আমি ঘুমের ঘোরে উঠিয়া কাজ করিতাম-এখন মনে পড়িতেছে।"

বধূ কহিল—"আমি তোমাকে কতবার বলিয়াছি ও যেই হোক, আমাকে ঘৃণা করে—হিংসাকরে—দেখিতে পারে না। ছবির ভিতর হইতে কট্ মট্ করিয়া চাহিয়া গিলিতে আসে। মিথ্যা ভাবিও না আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি। ওর ইচ্ছা আমার ছবি ফেলিয়া পর খানি অগ্রে সম্পূর্ণ কর, তাই তোমাকে ঘুমন্ত তুলিয়া আনিয়া আঁকাইয়াছে। ও আমাকে দেখিতে পারে না। এই কতক্ষণ দেখিয়াছি, আমাদের পানে চাহিয়া স্পষ্ট হাসিতেছিল। ওটাকে বিদায় করিয়া দাও।"

অবনীকান্ত মৃতার ছবিখানা টানিয়া, লইয়া একটা প্রকাণ্ড আলমারীর

মাথার উপরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং প্রিয়তমার প্রতিকৃতি খানি কুড়াইয়া লইয়া, ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।

(৮)

ছবিখানা চক্ষের সম্মুখ হইতে দুরীভূত হওয়াতে বধূ যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ক্রমে তাহার আতঙ্ক অনেকটা কমিয়া গেল, পাণ্ডুর গণ্ডে আবার রং ফুটিল, শুষ্ক ওষ্ঠ দুখানি হাসির রেখায় পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। মাস খানেকের ভিতরে সে দিব্য সুস্থ হইয়া উঠিল, ছবির কথাটা মন হইতে প্রায় মুছিয়া গেল।

যেদিন বহু যত্নে অবনীকান্ত প্রিয়তমার প্রতিকৃতি শেষ করিলেন এবং ফেমে আঁটিয়া শয্যার শিয়রে, যেখানে ইতিপূর্ব্বে কুমুদিনীর ছবি খানি ছিল— টাঙ্গাইয়া দিলেন।

রাত্রে শয়ন করিয়া বধূ স্বামীর সঙ্গে আপনার চিত্রপট খানির অনেক দোষ গুণ বিচার করিল, তারপর, উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি শেষে সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া বধূ বিস্মিত হইল, চারি দিকে চাহিয়া দেখিল—কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে কোথায়, স্বপ্ন ভাবিয়া উত্তম রূপে চক্ষু মুছিল, আবার চারি দিকে চাহিল। সে খাটের উপরে বিছানাতে স্বামীর পার্শ্বে শুইয়া নাই—ঘরের এক প্রান্তে মেঝের উপর পড়িয়া ঘুমাইতে ছিল? একি ব্যাপার? তাড়াতাড়ি উঠিয়া খাটের নিকটে গমন করিল।

গ্রীষ্মকাল ঘরের আলো নিবিয়া গিয়াছে। উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে ঊষার অস্বচ্ছ তরল আলোক প্রবেশ করিয়া অন্ধকারকে অনেকটা পাতলা করিয়া দিয়াছে।

সেই আলোক অন্ধকারের অপূর্ব্ব মিশ্রনে ঘরের ভিতরটা না-আলো না-আঁধার—স্বপ্নময় ছায়ালোকের মত প্রতিভাত হইতে লাগিল। বধূ স্বামীর শয্যা পার্শ্বে মশারির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নেটের মশারির ভিতর দিয়া স্বামীর সুপ্ত মুখখানি চিনিতে বিলম্ব হইল।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, মুখ বিবর্ণ হইল, বাকশক্তি রোধ হইল। রুদ্ধ নিশ্বাসে স্তব্ধ হইয়া দেখিল—স্বামীর কণ্ঠ সংলগ্ন হইয়া তাহারই স্থানে—কে একজন অপরিচিতা শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

হঠাৎ সেই চিত্রপটের কথা আদ্যোপান্ত মনে পড়িয়া গেল, ত্রস্তে দুই-পদ পিছাইয়া বিষম ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া অবনীকান্ত দ্রুত উঠিয়া বসিলেন। সহসা মনে হইল—কে যেন পাশ হইতে উঠিয়া গেল। ত্বরিতে অবতরণ করিয়া দ্রুত গিয়া বধূর কম্পিত হস্ত ধরিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—তাড়াতাড়ি পলাইয়া আসিলে কেন? কি হইয়াছে?

বধূ স্তম্ভিত দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিল—

"আমিত তোমার পার্শ্বে ছিলাম না। শুইয়াছিলাম মনে আছে, কিন্তু তার পর আর তোমার কাছে ছিলাম না। অন্য কেহ শুইয়াছিল—আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি।"

তুমি কোথায় ছিলে? এই মাত্র তবে কে উঠিয়া আসিল?"

"তা আমি জানি না" বলিয়া সে আদ্যোপান্ত সকল বিবরণ বলিল।

সেই দিন সকাল হইতেই অবনীকান্ত সর্ব্বাগ্রে আলমারীর মাথার উপর হইতে মৃতার চিত্রখানি পাড়িয়া মাতার নিকটে দিতে গেলেন। রাত্রে ঘটনার কথা কিছুই প্রকাশ করিলেন না।

মাতা কহিলেন—"রং দেওয়া শেষ হইয়াছে?"

অবনীকান্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "থাক্ এখন, সে পরে দেখা যাইবে।

* * *

দুইমাস অতীত হইয়াছে, কথাটা আবার চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

সন্নিকটবর্ত্তী এক জ্ঞাতি কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গৃহিণী বধূকে এবং পৌরজন সকলকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যাকালে বিবাহ বাটীতে গমন করিলেন।

অবনীকান্ত ইতি পূর্ব্বেই বিবাহ বাটীতে গিয়াছেন, কর্ত্তাকে একাকী থাকিতে হইল। রাত্রি নয়টার সময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া অবনীকান্ত গৃহে ফিরিলেন এবং পিতাকে বিবাহ বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া শয়ন করিতে গেলেন।

শেষ রাত্রে গৃহিণী সকলকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন—বধূ আপনার শয়ন গৃহে চলিয়া গেল।

গৃহে ঢুকিতেই তাহার দক্ষিণ চক্ষু নাচিয়া উঠিল—মনটা আপনা আপনি অপ্রসন্ন হইয়া পড়িল। সে গহনা গাঁটী খুলিয়া বাক্সে বন্ধ করিল, তাহার পরে শুইতে চলিল। কিন্তু বিছানার কাছে গিয়া আর তাহার পা উঠিল না।

ঘরের ভিতরে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে স্পষ্ট

দেখিল—স্বামী পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহার সম্মুখে বক্ষ সংলগ্ন হইয়া সেই চিত্রপট খানি আসিয়া পাশাপাশি ভাবে তাঁহার দেহের সহিত লাগিয়া রহিয়াছে।

এবার সে মহাভয়ে উচ্চ চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইল।

গৃহিণী সবে মাত্র শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, হঠাৎ চীৎকার শুনিয়া বধূর শয়ন কক্ষের দিকে ছুটিলেন। বাটীর অন্যান্য সকলেও চীৎকার শুনিয়াছিল—তাহারাও দৌড়িয়া আসিল।

গৃহ মধ্যে ছিন্ন লতিকার মত বধূ অচেতন হইয়া মেঝেতে পড়িয়া ছিল, সকলে মিলিয়া বহু যত্নে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল।

বধূ প্রলাপের মত কি বলিতে বলিতে খাটের দিকে দেখাইয়া দিল। সকলে মিলিয়া সেখানে গিয়া বজ্রাহতের ন্যায় রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখিল—

মৃতা কুমুদিনীর চিত্রপটখানির ওষ্ঠে ওষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া অবনীকান্তের প্রাণশূন্য দেহ শয্যার উপরে পড়িয়া রহিয়াছে।

খুড়োর উইল

লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(২)

"ইহা অসম্ভব—অস্বাভাবিক !"

মিস ক্লাইটির এই স্পষ্ট সুমিষ্ট কথাগুলি সমস্ত ঘরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি উত্তেজিত হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার তন্বী আকৃতি—তীরের ন্যায় ঋজু হইয়া উঠিল। তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। মিঃ গ্রেঞ্জার তাঁহার প্রতি বিস্ময়ের সহিত তাকাইয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

ক্লাইটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি উইল ঠিক পড়েছেন ? এ যেন লোমহর্ষণকর উপন্যাসের ঘটনার মত বোধ হচ্ছে'। আপনি কি বলতে চান যে, স্যার উইলিয়ম আমাকে এই সর্ত্তে বিষয় দিয়ে গেছেন যে আমি—আঁমি—ওঃ ! একথা আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না।"

মিঃ গ্রেঞ্জার ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, যা বলিলাম সব সত্য। আমি আপনার মনের ভাব বুঝতে পারছি, এ ত বিস্মিত হবার কথাই! কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোন দোষ নাই। তবে উইল আমিই লিখেছিলাম। এ রকম উইল করিতে স্যার উইলিয়মকে আমি অনেক নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি শুনেন নাই। এক্ষণে ইহার বিরুদ্ধে কাজ করা আমাদের সাধ্যাতীত।"

ক্লাইটি তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"কেন, আমি এই উইলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে পারি না? সে ত আমারই ইচ্ছাধীন।

আপনাকে বোধ হয় আর বলতে হবে না যে, উইলের এই অস্বাভাবিক সর্ত্ত পালন করিতে আমি সম্পূর্ণ নারাজ।"

মিঃ গ্রেঞ্জার উইলটি আঙ্গুল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—আপনি ইহার সর্ত্ত অনুসারে কাজ করতে পারবেন না?"

ক্লাইটি দৃঢ় স্বরে উত্তর করিলেন,—"না।" তাঁহার মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিল; চক্ষুদ্বয় দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। "স্যার উইলিয়ম কার্টন খুব ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। কারখানায় সামান্য চাকুরি থেকে তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। আমাদের পৈত্রিক অট্টালিকা, বিষয় সম্পত্তি সবই একে একে তিনি কিনে নিয়েছিলেন। অর্থের দ্বারা বিষয় সম্পত্তি কিনতে পারেন বটে, কিন্তু আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কাজ করাতে পারেন না।"

মিঃ গ্রেঞ্জার উইলখানি নাড়িতে লাগিলেন। তাঁহাকে আর কিছু বলিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এ সময় মনের ভাব প্রকাশে ইহাকে বাধা দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন ক্লাইটির সুন্দর নেত্রপ্রান্তে দু' এক ফোঁটা জলও দেখা দিয়াছে। তখন ক্লাইটি কম্পিত-স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যদি আমার অবস্থায় পড়তেন তাহলে কি করতেন? পুত্রের প্রতি পিতার বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপলক্ষ হইতে আপনি ইচ্ছা করেন কি?"

মিঃ গ্রেঞ্জার কাসিতে কাসিতে বলিলেন,—"আমার মনে হয় না, স্যার উইলিয়মের এ রকম কোন উদ্দেশ্য ছিল।"

"ইচ্ছা ছিল না, তা আমরা কেমন করে বলতে পারি, তাঁর কি ইচ্ছা ছিল। তাঁর কাজ দেখে ত আমার এরূপ মনে হয়। তিনি আমাকে

এবং তাঁর পুত্রকে পরস্পরের নিকট দাসত্বে বিক্রয় করে গেছেন; মনে করেছিলেন অর্থের লোভে, মানসিক দৌর্ব্বল্য-বশতঃ আমরা এই আত্ম-বিক্রয়ে সম্মত হবো, ইহাই উইলের মর্ম্ম। "তিনি দৃঢ়ভাবে এই সব কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্য ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। "আমি উইল অনুসারে কাজ করিতে এখনই স্পষ্ট অস্বীকার করিয়াছি। আমাকে এক টুক্‌রা কাগজ ও কলম দিন; অমি সেই মর্ম্মে লিখে দিচ্ছি।"

মিঃ গ্রেঞ্জার গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—আপনার মতামতের এখন কোন প্রয়োজন নাই। উইলের নির্দ্দিষ্ট সময়ে উইলফ্রেড যদি আপনাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব উত্থাপন করে, তখন আপনি ইচ্ছা করলে, তাহাতে অস্বীকৃত হতে পারেন! তখন এ সম্পত্তিতে আপনার আর কোনও সত্ব থাকিবে না। নচেৎ ইহা এখন আপনার অধিকারে, পরেও থাকিবে। ইহাই উইলের মূল কথা।"

ক্লাইটি নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—স্যার উইলিয়ম তাহ'লে দেখছি সব বিষয়েই ভেবে উপায় ঠিক করে গেছেন। আমি যেন বিহঙ্গমের ন্যায় জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। তাঁহার পুত্র এখন কোথায়?"

"স্যার উইলফ্রেড অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত মিন্‌টোনা নামক স্থানে আছেন, সংবাদ পেয়েছিলাম; আমরাও অবশ্য তাঁকে সেখানে পত্র দিয়াছি।

তিনি এবার বোধ হয় বাড়ী ফিরে আসবেন। কত শীঘ্র আসবেন বলতে পারেন? কিন্তু তিনি যতদিন না আসেন আমি এবাড়ীতেও থাকতে পারব না।"

মিঃ গ্রেঞ্জার অসম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িলেন। তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, "আশা করি আপনি ন্যায় সঙ্গত কাজ করিবেন। তা না হলে আমার-ভার আরও গুরুতর হয়ে পড়বে। আপনিই এই সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণ করবেন।"

-"মিঃ কার্টন কোথায়?"

"কারখানা বাটীতে। স্যার উইলিয়ম এই অট্টালিকা কিনিবার পূর্ব্বে যে বাড়ীতে থাকতেন, এখন তিনি সেইখানেই আছেন।"

"তিনি কি আমাদের এ কার্য্যে সহায়তা করবেন না?"

মিঃ গ্রেঞ্জার মাথা নাড়িলেন। আমার মনে হয়, তিনি কোন সাহায্য

করবেন না। স্যার উইলিয়মের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর হইতেই তিনি অসুস্থ হন। অসুস্থতার কারণ—বোধ হয়—মানসিক উত্তেজনা ও চিন্তা। সম্প্রতি তিনি একটু সুস্থ হয়ে কারখানার কাজে মন দিয়াছেন। সেই কারখানার তিনিই এখন সত্ত্বাধিকারী। আমাকে জানাইয়াছেন, এ কাজে তিনি কোন প্রকারে হস্তাক্ষেপ করবেন না।

মিস ক্লাইটি একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"বোধ হয় উইলের মর্ম্ম অবগত হয়ে লজ্জায় ইহার সহিত তিনি কোন সম্বন্ধ রাখিতে চান না। আমাদের সাহায্য করবার আর কেহই নাই—এ কথা সত্য; কারণ আপনিও বোধহয় আমাকে এ গুরুতর বিষয় কার্য্যে সাহায্য কত্তে সম্মত নন।"

আমার কোন দোষ গ্রহণ করিবেন না। আমার যতদূর সাধ্য' আমি আপনার সাহায্য করব। কিন্তু আমি উইলের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করিতে পারিব না।

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। সতর বৎসর বয়স্কা এক বালিকা ক্লাইটির নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার সোণালী রঙ্গের কেশরাশি পৃষ্ঠের উপর বিলম্বিত। মিঃ গ্রেঞ্জারকে ঘরের ভিতর দেখিয়া সে থামিয়া গেল। পরে ঘরের এক কোন হইতে অপর কোন পর্য্যন্ত একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ক্লাইটির গলা জড়াইয়া হতভাগ্য এটর্নি দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—আপনি ক্লাইটিকে কি বলছিলেন? সে কাঁদ্‌ছে কেন? পরে দিদির দিকে করুণভাবে চাহিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল,—কি হয়েছে দিদি? ইনিই বা কে?"

বালিকা তাহার দিদির কাছে গিয়া বসিল। মিঃ গ্রেঞ্জার কাগজ পত্র সব গুছাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বলিলেন,—আমি তোমার দিদিকে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের উপায় নির্দ্দেশ করছিলাম, এই আমার দোষ।" অতঃপর মাথা নাড়িয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান দেখাইয়া তিনি সে ঘর ত্যাগ করিলেন।

মলি, তাহার দিদির মাথা নিজের বুকের উপর টানিয়া তাঁহার সুন্দর চুল গুলি আদরের সহিত নড়িতে লাগিল।

স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিল,—ঐ বুড়ো লোকটি তোমাকে কি বোলছিল? আমরা এ বাড়ীতেই বা কেন এসেছি? এসবের অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"এর মানে স্যার উইলিয়ম আমাকে তাঁহার বাড়ী, ঐশ্বর্য্য, বিষয়, সম্পত্তি সব দান করে গেছেন। মলি, মিঃ গ্রেঞ্জার আমাকে এসব গ্রহণ করতে বলছিলেন।"

মলি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দিদির রক্তাভ বদন মণ্ডল ও উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়ের প্রতি তাকাইল। পরে ধীরে ধীরে বলিল,—তাহলে মিঃ গ্রেঞ্জারের প্রতি আমি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। তুমি বোকার মত কাজ করতে উদ্যত হয়েছ, দেখছি!"

মলি, তুমি ছেলেমানুষ, ভিতরকার কথা সব বুঝতে পার না।"

মলি ক্লাইটিকে নিজের কাছে টানিয়া মাতৃসুলভ স্নেহময় কথার স্বরে উত্তর করিল,—"আমিই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, ব্যাপার কি। জিজ্ঞাসা করলাম কেন কাঁদছো, তুমি বল্‌লে স্যার উইলিয়ম তোমাকে ব্রামলের বিষয় সম্পত্তি দান কোরে গেছেন, তুমি সেই সব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। এই কথা শুনেই স্বভতঃ আমি একটু বিস্মিত ও একটু রাগান্বিত হয়েছি।"

ক্লাইটি চোখের জল মুছিয়া রুমালে মুখ ঢাকিয়া বলিলেন,—"স্যার উইলিয়ম যে কেবল বিষয় সম্পত্তি দিয়ে গেছেন তাহা নহে, আমার জন্য একটা স্বামীও নির্ব্বাচিত করে রেখে গেছেন।"

"সত্য? তুমি ঠিক জান, তিনি দুজন লোক ঠিক করে যান নি? আমার জন্য একজন? জানতে পারি, সে ভাগ্যবান যুবক কে?

"তাঁহার পুত্র উইলফ্রেড।"

"তা তুমি কাঁদছ কেন?"

"মলি, এ বড়ই লজ্জার কথা! তিনি স্যার উইলিয়মের একমাত্র পুত্র। স্যার উইলিয়ম আমার জন্য যা রেখে গেছেন তা গ্রহণ করলে তাঁহাকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য গণ্ডা হতে বঞ্চিত করা হয়। অবশ্য তিনি পৈতৃক সম্পত্তির লোভে বিবাহে সম্মত হইলেও আমি তাঁহাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করব। বিষয় সম্পত্তি তখন তাঁহার হবে, এবং গোলমালও সব মিটে যাবে।"

মলি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "সব ঠিক ঠাক হবে বটে, কিন্তু তোমার তাতে কি লাভ? আচ্ছা, স্যার উইলিয়ম এ বিষয়ে কিছু উচ্চবাচ্চ করেন নি? ধর উইলফ্রেডও হয়ত তোমাকে বিবাহ করতে-অস্বীকার করতে পারেন।"

"তিনি নিশ্চয়ই বিবাহে অসম্মত হবেন। তখন এই সম্পত্তি আমি যাবজ্জীবন ভোগ করবো।"

মলি পুনর্ব্বার মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইল। পরে আবার বলিয়া উঠিল,- "ক্লাইটি, স্যার উইলফ্রেড দেখিতে কেমন ?"

ক্লাইটি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমি জানি না, সেই ছেলেবেলায় তাঁকে দেখেছিলাম, আর দেখি নাই। তাও তখন দু'একবার মাত্র আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি বিদেশে টকুলেই পড়তেন, ছুটির সময় যখন বাড়ী আসিতেন তখন আমরা বাবার সঙ্গে এদেশ ত্যাগ কোরে—ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হইতাম। এখন তাঁকে দেখলে আমি চিনতে পারব না। মিঃ গ্রেঞ্জার বলছিলেন; তিনি এখন অষ্ট্রেলিয়ায় আছেন।"

মলি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল "তিনি দেখতে কেমন ছিলেন ?"

ক্লাইটি এই প্রশ্নে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"তা কি আমার মনে আছে ? বোধ হয় ছেলে বেলায় তিনি দেখিতে বেশ সুশ্রীই ছিলেন।"

"স্যার উইলিয়মের ঘরে একখানা ছবি দেখে এলাম; সে ছবি যদি তাঁহার হয়' তা হলে তিনি নিশ্চয়ই একজন সুপুরুষ। দিদি আমি বাড়ীর সর্ব্বত্রই ঘুরে এসেছি।"

"বড় বড় ঘর, প্রকাণ্ড হল' কত আসবাব চাকর-বাকর, কি সুখের স্থান ! এসব এক সময় আমাদেরই অধিকারে ছিল—নয় দিদি ? কেমন করে আমাদের নষ্ট হয়ে গেল ?"

"আমরা ইহা হারাই নাই, বিক্রয় করেছিলাম" ক্লাইটি অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিলেন। তিনি তখন সেই অদ্ভুত উইলের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন।

মলি জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন বিক্রয় হলো ?"

ক্লাইটি তাঁহার সুগঠিত শ্বেতহস্তে মসৃণ কেশরাশি কপোলদেশ হইতে সরাইয়া বলিলেন,—"সে অনেক দিনের কথা। ব্যবসায়ে আমাদের বড় লোকসান হয়। তাই বাবা বাধ্য হয়ে এই বিষয় সম্পত্তি স্যার উলিয়মকে বিক্রয় করেছিলেন।" এই বলিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"মলি, তুমি বুঝতে পারছো না। এ রহস্য বুঝবার তোমার এখনও বয়স হয় নি।"

মলি চেয়ার হইতে উঠিল। তাহার জামার পকেটে হাত দিয়া

স্থিরভাবে দিদির মুখের দিকে তাকাইল। তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখ দেখিয়া মলির মনে করুণার উদ্রেক হইল। তবুও সে বলিতে লাগিল,—"তুমি কি আমাকে ছেলে মানুষ ভাব? আমাদের সেই পুরাতন বাসাবাটীর অপেক্ষা এই অট্টালিকা পছন্দ করবার বুদ্ধি আমার যথেষ্ট হয়েছে। এই সামান্য পোষাক পরিচ্ছদ হইতে বহুমূল্য পোষাকের পার্থক্য আমি বেশ বুঝতে পারি। এই সুন্দর পরীরাজ্যই তোমার ন্যায় সুন্দরী যুবতীর উপযুক্ত বাসস্থান। আমি যে তোমাকে নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করতে বারণ করছি, তাতে আমার স্বার্থও পুরাদস্তুর। আমি এখানেই থাকতে ইচ্ছা করি। আর আমাদের এখানে থাকবার অধিকারও রয়েছে।"

(৩)

"মলি, আমি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি শোন। আমি সুবিধা পাইলেই যতশীঘ্র পারি উইলফ্রেডকে আনাবো, যথা সময়ে আমার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করবেন; তাঁহার কোনও ভয় নাই। আমি তখন বিবাহে অসম্মত হইব। তাহলেই সব গোল চুকে যাবে। তিনিও পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হবেন, আমিও এ বিপদ হতে মুক্ত হইব। মনে করো না, এ সম্পত্তি আমরা চির দিন সুখে ভোগ দখল করিব। যতদিন এ সুবিধা না হয়, ততদিন তাঁর হয়ে আমিই যথাসাধ্য এই বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিব। সেটাও আমার কর্ত্তব্য!"

এমন সময় হঠাৎ দরজায় কে ধাক্কা মারিল। সোলস্ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল,—"মিঃ হেসকেথ কার্টন দেখা করতে চান।"

ক্লাইটি একবার সোলসের মুখের দিকে তাকাইয়া মলির দিকে চাহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি এ সংবাদে একটু হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন। মলি স্থিরভাবে বলিল.—"মিঃ কার্টনকে সঙ্গে করে নিয়ে এস। ক্লাইটি, তুমি ভাল হয়ে বস।"

মিস ক্লাইটি চোক মুখ মুছিয়া, চুল ঠিক করিয়া লইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। হেসকেথ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শোক প্রকাশের জন্য কাল পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকায় তাঁহাকে স্বাভাবিক অপেক্ষা আরও একটু বেশী রোগা দেখাইতেছিল এবং তাঁহার পাংশুবদন আরও বিবর্ণ বোধ হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ক্লাইটির প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মুখের ভাব ও চালচলন দেখিয়া ভগ্নীদ্বয়ের মনে হইল যেন

তিনি সর্ব্বদাই সতর্ক আছেন এবং প্রত্যেক কথাবার্ত্তা অতি সাবধান হইয়া বলিতেছেন।

কার্টন বলিলেন,—"মিস ব্রামলে কোন ত্রুটি গ্রহণ করবেন না, আপনাদের অনুমতি না লয়েই আমি এখানে এসেছি। আপনারা বোধ হয় এখানে বেশী দিন আসেন নাই; কিন্তু আপনাদের সঙ্গে যতশীঘ্র সম্ভব দেখা করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। আমার শরীর অসুস্থ হয়েছিল। তা না হলে আরও পূর্ব্বে আমি আসতে পারতাম। রোগের পর আমি এই আজ প্রথম বাড়ীর বার হয়েছি।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদু ও সুশ্রাব্য। স্থান কাল ও পাত্রের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়াই মনে হইল।

ক্লাইটির কেশরাশি তাঁহার গণ্ডস্থলে উড়িয়া পড়িতেছি। তিনি কেশরাশি সংযত করিয়া বলিলেন,—আপনার অসুখের কথা শুনে আমি বড়ই দুঃখিত; আপনি দয়া করে এসেছেন, তজ্জন্য আমরা বিশেষ বাধিত।"

মলি কিছুই বলিল না। চেয়ারের উপর বসিয়া সম্মুখস্থ অগ্নিকুণ্ডে যষ্টির দ্বারা মৃদু প্রহার করিতে লাগিল।

ক্লাইটি হেসকেথকে নিকটস্থ একটি চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। হেসকেথ চেয়ারের উপর বসিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মিঃ গ্রেঞ্জার আপনাকে নিশ্চয়ই উইলের কথা সব বলেছেন। আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে আমি আপনাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করবার জন্য এসেছি। আমার মনে হয় বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করা আপনার পক্ষে একটু জটিল ও কষ্টকর বলে মনে হবে। মিস ব্রামলে, আপনার যদি কোনও সাহায্য করতে পারি, তাহলে আমি বড়ই আনন্দিত হইব। আপনি বোধ হয় জানেন যে, স্যার উইলিয়মের সঙ্গে কয়েক বৎসর একত্রে আমি কাজ করেছিলাম। বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতাও আছে।"

হেসকেথের কথা শেষ হইলে, ক্লাইটি বলিলেন,—"মিঃ কার্টন, আপনার এই সদয় ব্যবহারের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার সাহায্য পেলে আমরা বিশেষ বাধিত হব।"

হেসকেথ উঠিয়া মাথায় টুপি পরিলেন।

ক্লাইটি তখন বলিলেন,—"আপনি বসুন, একটু চা খেয়ে যান।"

"না, আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে কারখানার কাজে যেতে হবে।" তিনি একটু ক্ষীণভাবে হাসিয়া বলিলেন। "মিঃ গ্রেঞ্জার নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন যে, কলকারখানাগুলি সব এখন আমারই অধিকার ভুক্ত।"

তিনি ক্লাইটির করপল্লব স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেলেন। ক্লাইটি দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মলি তখন উঠিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল,—"আঃ গেল, বাঁচা গেল!"

ক্লাইটি তাঁহার দিকে চমকিত হইয়া চাহিলেন। তিনি একটু রাগান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"মলি, ও কথা বলছো কেন?"

মলিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,—তিনি চলে গেছেন, আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। ক্লাইটি, ও লোকটাকে আমার আদৌ পছন্দ হয় না।

ক্রমশঃ

গোড়ায় গলদ

[লেখক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু।]

রবিবার বৈকালে কয়েকজন বন্ধুতে মিলিয়া নানা বিষয় গল্প গুজব করিতে করিতে চুরির কথা উঠিল। ট্রেণে, ষ্টেসনে কিরূপে চুরি হয়, কলিকাতার বড়বাজারে কিরূপে পকেট কাটে; আজ কাল ট্রামে কিরূপ পকেট কাটার উপদ্রব হইয়াছে, সকল আলোচনাই হইতে লাগিল। শেষে একজন বন্ধু বলিলেন, আমার একবার কিরূপ বিষম চুরি হইয়াছিল শোন। সকলে কথা বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া বসিলাম। বন্ধুটী বলিতে লাগিলেন—

আট দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—শীতকাল। একদিন সকালে তাঁড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া সিমলার বাটী হইতে বাহির হইলাম। ভবানীপুর যাইতে হইবে। সঙ্গে ১০ টাকার ১০ খানি নোট ছিল, গলির মোড়ে বড় রাস্তার উপর পোদ্দারের দোকান হইতে তাহার তিন খানি ভাঙ্গাইয়া লইতে হইবে। দোকানে গিয়া পকেট হইতে নোটগুলি বাহির করিয়া তিন খানি পোদ্দারকে দিলাম, সে ৩০টা টাকা দিল। টাকাগুলি বাজাইয়া লইতেছি এমন সময় ট্রাম আসিয়া পড়িল, ৭টা টাকা না বাজাইয়া, সকল গুলি পকেটে পুরিয়া তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠিয়া পড়িলাম। ট্রাম কিছুদূর চলিয়া গেলে, পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম, একি বাকি নোট গুলি কোথায় গেল।

নিশ্চয় দোকানে ফেলিয়া আসিয়াছি। তৎক্ষণাৎ ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িয়া দোকানের দিকে ছুটিলাম। দোকানে পৌঁছিয়াই বলিলাম— বাকি নোটগুলি এখানে ফেলিয়া গিয়াছি শীঘ্র দাও, । পোদ্দার বলিল সে কি মহাশয়, বাকি নোট কি। আমি স্বর আরও চড়াইয়া বলিলাম, আমার সঙ্গে চালাকি, আমি ১০খানি নোট দিয়াছিলাম, তিনখানি ভাঙ্গাইয়া তুমি ৩০৲ টাকা দিয়াছ, বাকি ৭ খানি ট্রাম আসিয়া পড়াতে তাড়াতাড়িতে ফেলিয়া গিয়াছি। এখনি ফেরত দাও, আমার সঙ্গে জুয়াচোরী, আমি তোমার আর একটি কথাও শুনতে চাই না। চীৎকারে দোকানের সম্মুখে অনেক লোক জমিয়া গেল।

পোদ্দার বলিল "মহাশয় আপনি অন্যায় বলিতেছেন, আমি অল্পক্ষণ মাত্র দোকান খুলিয়াছি, আপনি প্রথম নোট ভাঙ্গাইয়াছেন, বাক্স খুলিয়া দেখাই-তেছি, আপনার প্রদত্ত ৩খানি নোট ভিন্ন দোকানে আর একখানিও নোট নাই।" আমার রাগ আরও বাড়িয়া গেল, বলিলাম জুয়াচোর, তোমার যে চাকর দোকান সাফ করিতেছিল সে কোথায় গেল, তুমি নিশ্চয় তাহাকে নোটগুলি দিয়া আর কোথাও পাঠাইয়াছ।" "সে একটা কাজে গেছে, আপনার নোটের বিষয় আমি কিছুই জানি না।"

"তুমি জান কি না জান, আমি এখনই তাহা দেখাইতেছি, থানায় চলিলাম" বলিয়া আমি ভিড় সরাইয়া বাহির হইয়া থানার দিকে ছুটিলাম।

থানায় পৌঁছিয়া দেখি ইনেস্পেক্টার মহাশয় সম্মুখেই বসিয়া আছেন। তাঁহাকে সকল কথা বলাতেই, তিনি বলিয়া উঠিলেন, ঐ পোদ্দারটা ভারি শয়তান, উহার নিকট হইতে অল্পদিন হইল একখানি এক শত টাকার জাল নোট বাহির হইয়াছিল, কিন্তু বিচারে সে বেকসুর খালাস পাইয়াছে। এইবার আপনার এই 'কেসে' আমি ও বেটাকে জব্দ করিয়া দিব।

আমি বলিলাম, তাহা হইলে তো সাঙ্ঘাতিক লোক। ইনেস্পেক্টার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি নোটগুলি উহার হাতে দিয়াছেন এই কথা লিখিতে হইবে। আমি বলিলাম হাতে দিই নাই একথা ঠিক, তাড়া-তাড়িতে ফেলিয়া যাওয়াই সম্ভব। হাতে দিয়াছি একথা কি করিয়া লিখিব।" ইনেস্পেক্টার বাবু একটু স্বর চড়াইয়া বলিলেন, যদি লিখিতে পারিবেন না তবে এখানে আসিয়াছেন কেন, আমরা কিছু সুবিধা করিতে পারিব না৷

বেগতিক দেখিয়া ইনেস্পক্‌টার বাবুর নির্দ্দেশ মতই লিখিয়া দিলাম। ইনেস্পেক্‌টার বাবু নিজে ঘণ্টা দুই পরে তদন্তে যাইবেন এবং আমাকেও সেই সময় উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন।

আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া চুরির কথা সকলকে শুনাইলাম। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলেই বলিলেন পোদ্দার বেটাকে সহজে ছাড়িও না, বেটা দোকান খুলিয়া দিনে ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছে।

যথাসময়ের পূর্ব্বেই দাদাকে সঙ্গে লইয়া থানায় উপস্থিত হইলাম, ইনেস্পেক্টার বাবু সাজ গোজ করিয়া সঙ্গে একজন পাহারাওয়ালা ও একজন জমাদার লইয়া আমাদের সঙ্গে বাহির হইলেন! বেটাকে এবার একবারে জব্দ করিয়া ছাড়িব, পথে একথা অনেকবারই বলিলেন। দাদাও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে ছাড়িলেন না। আমিই কেবল নীরবে সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

ইনেস্পেক্টর বাবু দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মহা চীৎকার ও ভূমিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "শালা এবার তোমায় কে রক্ষা করে দেখ্‌ব, নোট গুলা কোথায় সরাইয়াছিস্‌ শীঘ্র বল্‌।"

পোদ্দার কাঁদিতেছিল, অনেক কষ্টে অস্পষ্টস্বরে বলিল-"হুজুর আমি কিছুই জানি না হুজুর।"

"কিছুই জাননা-বেটা সাধুপুরুষ" বলিয়া ইনেস্পেক্টর বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পোদ্দারের বক্‌শক্তি একবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল।

এমন সময় পোদ্দারের বৃদ্ধ পিতা নিকটস্থ বাটী হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া একবারে ইনেস্পেক্টর বাবুর পা জড়াইয়া ধরিলেন। অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "যে তাঁহার পুত্র নির্দ্দোষ। এ দোকন ৩২ বৎসর কাল চলিতেছে—কখন ও কাহারও সহিত এক পয়সার গোল-মাল হয় নাই।"

বৃদ্ধের রোদনে ইনেস্পেক্টার বাবু অনেকটা নরম হইয়া গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন দোকানের চাকর টা কোথায়। সকলেই চাকরটার খোঁজ করিতে লাগিল, কিন্তু নিকটে কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না।

চাকর টা গোল্‌ মালের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। এবং প্রতি মুহুর্ত্তেই, পুলিস আসিয়া পড়িল এইরূপ কল্পনা করিতেছিল। যখন দেখিল দূরে ইনেস্পেক্টার ও তৎসঙ্গে লাল পাগড়ী আসিতেছে—তখন সে পলায়ন করিয়াছে।

যখন নিকটে চাকরকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, তখন বৃদ্ধ বলিল "হুজুর হয়ত সে ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে, আমি যে করিয়াই হউক আজ রাত্রের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেছি, তাহার যাইবার জায়গা কোথাও নাই। সে পিতৃ-মাতৃ হীন, শিশুকাল হইতেই আমার বাটীতে প্রতিপালিত। হুজুর আজকার মত যদি তদন্তটা বন্ধ করিয়া রাখেন তাহা হইলে সমস্ত ব্যাপারটা আমি নিজে একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখি। বলিয়াই বৃদ্ধ আবার ইনেস্পেক্টার বাবুর পা জড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইনেস্পেক্টার বাবুর কি মনে হইল, তিনি বলিলেন আচ্ছা পা ছাড়, তোমার ইচ্ছানুসারে আমি তদন্ত স্থগিত রাখিলাম। কিন্তু কাল সকালেই এ বিষয়ের একটা শেষ করিতে চাই। ইনেস্পেক্টার বাবু নমস্কার করিয়া আমাদের নিকট বিদায় চাহিলেন এবং কাল সকাল ৭ টার মধ্যেই আমরা যাহাতে থানায় উপস্থিত হই তাহার জন্য বলিয়া গেলেন।

ইনেস্পেক্টার বাবু পশ্চাৎ ফিরিতেই রাস্তার অপর পারের কয়েকটী দোকানদার আমাদের দুই জনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল মহাশয় আমি স্বচক্ষে দেখিলাম আপনি যেই ট্রামে উঠিলেন, তখনই পোদ্দারটা আপনার নোট কখানা চাকর দিয়া কোথায় পাঠাইয়া দিল। আর একজন বলিল মহাশয় ওটা বড় ভয়ানক লোক, আপনারা সহজে ছাড়িবেন না। আমরা সকলেই আপনার তরফে সাক্ষী দিতে প্রস্তুত, এরূপ লোককে শাস্তি দেওয়াই আবশ্যক। এরূপভাবে এতগুলি প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে আমরা পাইব তাহা একবারও ভাবি নাই। দাদা রাস্তায় আসিতে আসিতে বলিলেন, "পাপের প্রতিফল লোকে ভোগ করিবেই, কে জানিত যে অযাচিত ভাবে এতগুলি সাক্ষী পাওয়া যাইবে, এসব ভগবানের ইচ্ছা।"

বাটী আসিয়া দাদা আপনার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমিও কিছুক্ষণ খবর শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করিয়া নিজের ঘরে উপরে চলিয়া গেলাম।

একে অর্থ নষ্ট, তাহাতে সমস্ত দিন ছুটা-ছুটি করিয়া শরীর ও মন অত্যন্ত অবসন্ন বোধ হইতেছিল। পোষাক খুলিয়া কিছুক্ষণ ছাদে গিয়া বসিব স্থির করিলাম। নানা রূপ চিন্তা করিতে করিতে জুতা, মোজা, কোট খুলিলাম। ওয়েষ্ট কোটের গোটা-কতক বোতাম খুলিতেই ঠক্ করিয়া

মেঝেতে কি পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি তুলিয়া দেখিলাম এ কি? এই যে সেই সাত খানা নোট এক সঙ্গে মোড়া। মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষেও যেন কম দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল এ কয়খানা চুরি গিয়াছিল' ভালই হইয়াছিল, আবার কেন আসিল। এখন উপায় কি করি। মনে মনে বলিলাম বসুধা দ্বিধা হও, আমি তোমার ভিতরে প্রবেশ করি। কি করিয়া লোকের কাছে বলিব যে নোট কয়খানি আমার কাছেই ছিল' আমি বৃথা সমস্ত দিন ছুটাছুটি করিয়াছি; মিছা-মিছি একটা ভদ্র লোককে চোর সাজাইয়াছি। নোট হারাইয়া আমার যে কষ্ট হইয়াছিল এখন অন্তরে তাহার শতগুণ অধিক কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। হস্তস্থিত নোটগুলি যেন আমাকে দংশন করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম, পরে উঠিয়া আস্তে আস্তে দাদার ঘরে প্রবেশ করিলাম। দাদা আমার মুখের ভাব দেখিয়াই বলিলেন, টাকা গেছে তার জন্য আর ভাবনা কেন। আমি অপরাধীর মত অতি অস্ফুটস্বরে বলিলাম "নোটচুরি যায় নাই, আমার ওয়েষ্ট কোটের ভিতরেই ছিল, এই দেখুন।" দাদা বিছানায় শুইয়া ছিলেন, আমার কথা শুনিয়াই "এঁ্যা বলিস্ কি" বলিয়াই উঠিয়া বসিলেন। বলিলাম "বোধ হয় ট্রামে উঠিবার সময় তাড়াতাড়িতে কোটের ভিতরের পকেটে নোটগুলি না রাখিয়া ওয়েষ্ট কোটের কাটার মধ্যে পুরিয়া দিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দাদা বলিলেন, আচ্ছা তুই ঘরে যা, আমি সমস্ত ঠিক করিতেছি। সেদিন রাত্রে নাম মাত্র আহার করিয়া ৯টার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

দাদার ডাকা ডাকিতে পরদিন সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিলাম। দাদা বলিলেন শীঘ্র মুখ হাত ধুইয়া নিচে আয়। বাহিরের ঘরে দাদার সম্মুখে উপস্থিত হইতেই, তিনি বলিলেন, এখনই থানায় যা, বলিয়া আয় যে আমরা চুরির বিষয়ে আর কিছু করিতে চাই না।"

ইনস্পেক্টার বাবু নিজ কোয়াটারে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন, আমি গিয়া নমস্কার করিলাম। তিনি বলিলেন আপনার দাদা কোথায়, আমি উত্তর করিলাম "আমরা এ কেস্' আর চালাইব না," সেজন্য আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি। ইনস্পেক্টার বাবু একটু রাগত ভাবে বলিলেন, এ আপনাদের বিশেষ অন্যায়, চোরকে কিছুতেই প্রশ্রয়

দেওয়া উচিত নয়। 'দাদার আদেশ' বলিয়া নমস্কার করিয়া আমি বাটী ফিরিলাম।

বক্তব্য শেষ করিয়া বন্ধুটী বলিলেন, কেমন এরূপ চুরির কথা কখনও তোমরা শুনিয়াছ কি? আমরা সকলেই স্বীকার করিলাম—"না।"

সাথী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক—শ্রীপরেশনাথ সরকার

(৪)

একদিন কলেজ থেকে আসিয়া আভা দেখিল নগেন তাহার পড়ার ঘরে মেঝের উপর শুইয়া রহিয়াছে! মেজের উপর বিনা শয্যায় লোক ঘুমাইয়া থাকিতে পারে এ কল্পনা তাহার মথায় কোন দিনও আসে নাই। আভার খাট বিছানা ত নিকটেই রহিয়াছে, তাহাতে না শুইয়া এমন মেঝেয় পড়িয়া রহিয়াছে কেন?

সে তাড়াতাড়ি বৈ গুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া রখিয়া আসিয়া নগেনের কছে দাঁড়াইল!

একটু কাল দাঁড়াইয়া ডাকিল—"নগেন দা!" নগেন অঘোরে ঘুমাইতে ছিল! তাহার পরিধানে একখানি মলিন বসন। আর গায়ে একটা সেকেলে ধরণের পুরাতন সার্ট—সেটাকে একেবারে ফেলিয়া দিতে আভা কত দিন বলিয়াছে।

নগেন ময়লা কাপড় পরিয়া থাকিত, আভা তাহাকে পরিষ্কার কাপড় পরাইত। নগেনও আভা কলেজে গেলেই আবার ময়লা কাপড় পরিয়া বসিত। ধপ্‌ধপে কাপড় জামার দিকে চাহিয়া নগেন কি ভাবিত—তাহা সেই জানে! মা তাহাকে ময়লা কাপড় ছাড়াইতে পারেন নাই, আভা জোর করিয়া তাহাকে পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া থাকে। ভাল সার্ট-কোট নাই বলিয়া আভা দরজি ডাকিয়া নগেনের জন্য কয়েকটা সার্ট ও কোট করাইয়া আনিয়া রাখিয়াছে! তা সত্ত্বেও নগেন কেন এ সব ময়লা কাপড়-জামা পরে থাকে আভা তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

আভা আবার ডাকিল—"নগেন দা উঠ !"

নগেন এইবার চক্ষু মেলিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল—"এঁ্যা, এঁ্যা, ভুলে এই কাপড় পরেছি আভা !"

আভার হাসি পাইল। যে নগেন শক্ত অপরাধে অপরাধী হইয়াও মায়ের মুখের দিকে নির্ভয়ে চাহিয়া থাকিতে পারে, সে আভার কাছে একটি হরিণ শিশুর মত ভীত ও চঞ্চল ! এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটু আশাও হইল যে, সে নগেন দাদাকে দিন দিন মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবে। এখন ত সময় সময় বেশ পরিষ্কার কাপড় পরিয়া থাকে ! মাথায় তেল মাখে, ২।৩ দিন পরে আভা ধরিয়া বাঁধিয়া তাহার গায়ে সাবান দিয়া দেয়, তাহাতে সে বড় একটা আপত্তি করে না। হাসিয়া আভা বলিল—যাক্ আর তোমায় অতটা ব্যস্ত হতে হবে না ! আলনার উপর হইতে একখানা কুঁচান কাপড় আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল ধর, চট্‌করে ও খানা ছেড়ে ফেল। পরে জল খাবে এস।

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নগেন কাপড় ছাড়িতে লাগিল, আভা তখন একটা সার্ট হাতে করিয়া তাহার কছে দাঁড়াইল।

এমন সময় বিধুমুখী সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন "দিদি দেখবে এস, নগেনের শাস্তি আরম্ভ হয়েছে এদিকে।"

শ্যামাসুন্দরী আসিয়া বলিলেন—"কেমন, তোমাক বলেছিলেম একথা ; এখন দেখ ময়লা কাপড় কেউ ছাড়িয়ে দিতে পারে কি না !"

নগেন আভার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, সে সেই সার্টটা বদলাইয়া অন্য একটি আনিতে গিয়াছে। তখন বলিল বেশ করেছি, তুমিই ত বলে দিয়েছ !

শ্যামাসুন্দরী—আমি বলে দিয়েছি ?

মুখ ভার করিয়া নগেন বলিল—"না ?"

শ্যামাসুন্দরী—বেশ করিয়াছি—"দুষ্ট ছেলে !"

নগেন কি বলিতে যাইতেছিল, আভা আসিয়া তাহার হাতে সার্ট দিয়া বলিল ধর, নগেনের আর সে কথা বলা হইল না !

আভা বলিল "জ্যেঠাইমা দেখলেও ত পারতে, কোথায় সারাটা দিন পড়ে ঘুমল। এই ভাবে মেজেয় পড়ে ঘুমায়ে জ্বর হক—তখন !

আভা আর বলিতে পারিল না, তাহার ওষ্ঠ যুগল কাঁপিয়া উঠিল।

বিধুমুখী হাসিয়া বলিলেন—দেখলে দিদি, মেয়ে আমায় কত পর করে ফেলেছে, একটা শক্ত কথা তোমায় বলে, সেটা আজ বেশ প্রমাণ করে দিল।

শ্যামাসুন্দরী হাসিলেন, বলিলেন "সে কি ?"

বিধুমুখী— তোমায় আমার চেয়েও ভালবাসে, তাই আবদারের দৌরাত্মটা তোমার উপরেই যখন তখন করে থাকে! এমনভাবে আজ যদি আমায় বলত 'দেখলেও পারতে' "তবে আমার বুকটায় আনন্দ আর ধরত না!"

আভা সহসা বলিয়া ফেলিল—বুঝেছি মা, তোমরা সব একজোট হয়েছ। একে না মেরে আর নিশ্চিন্ত হবে না! সেই কোন সকালে দুটী খেয়েছে, এতক্ষন মেজের উপরে পড়ে ছিল, এখনও জল খাবার দিবার নামটি নাই, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসবে!

শ্যামাসুন্দরী ও বিধুমুখী আভার দিকে চাহিয়া রহিলেন।—

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন "ওমা মেয়ের হল কি!"

বিধুমুখী বলিলেন—ঐ এক ভাব!

শ্যামাসুন্দরী—একটু দেরিতে কি লোক মারা যায় মা!

আভা—তা জানি, তোমরা না মেরে ছাড়বে না!

বিধুমুখী বলিলেন—আজ বড় হয়েছেন তাই এই কথা! তোকে যে কি করে খাওয়ান হয়েছে, জিজ্ঞাসা করত তোর জ্যেঠাইমার কাছে—খেতে হলেই যেন তোর মাথায় বাজ পড়ত! এই জ্ঞানটা যদি নিজের বেলায় ছোট কালে থাকত, তবে আর তোর জ্যেঠাইমাকে সাত পৃথিবীর গল্পগুজব করে, সাধ্য সাধনা করে, একাকার করতে হত না! যে—

আভা বলিল—তবে আরও মোটা হতেম, না!—বেশ!

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—তুইও হাত মুখ-ধুসনি কখন. কলেজ থেকে এসেছিস। এখন যা হোক মুখ হাত ধুয়ে আয়!

আভা বলিল "যাচ্ছি।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—সন্তান তোরা, তোরা কি বুঝবি মা, মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্য কত কাঁদে, তাদের দৃষ্টি সন্তানকে কত সন্তর্পণে পাহারা দেয়।

আভা বলিল—তাইতে জ্যেঠাইমা, নগেন দা এইখানে পড়ে ঘুমচ্ছিল,—অসুখ হল বলে!

শ্যামাসুন্দরীর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। একগুয়ে সন্তান তাঁহার। তাই তিনি মা হইয়া লোকের কাছে বুঝাইতে পারেন না, যে তিনি মা, আর নগেন তাঁহারি ছেলে। নগেন যে মেঝেতে শুইয়া ছিল, তাহা কি তিনি দেখেন নাই, কিন্তু তিনি জানিতেন নগেনকে কিছুতেই উঠাইতে পারিবেন না, তাই তিনি কিছু বলেন নাই! কতক্ষণে আভা আসিবে। সেই সময় হইতে তিনি তাই তিন চারিবার সহিসকে বলিয়াছেন, "তোর দিদিমণিকে আনেতে যাবিনে ?"

বিধুমুখী শ্যামাসুন্দরীর ভাব লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন—বালাই অসুখ করবে কেন ? আর নগেন কি আমাদের কথা শোনে যে, তাকে আমরা উঠতে বলব! ২।৩ বার ডেকে দেখেছি, উঠেনি!

আভা বলিল "আমার কথা বল্লেও ত হত!"

কতটা দৃঢ়তার সহিত আভা কথাটা বলিল, যেন তাহার সম্পূর্ণ হৃদয়ের বল তাহার সঙ্গে জড়াইয়া দিয়াছিল।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন তা তুই যা, হাত মুখ ধোগে। তুচ্ছ কথা নিয়ে এত কেন ?

আভা চলিয়া গেল। এক জনের এমন অসুখ হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা যাহার সহিত জড়াইয়া আছে সেই সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল; এও তুচ্ছ কথা, আভা তাহার সমস্ত জ্ঞানের রাজ্য খুঁজিয়া দেখিল ইহার চেয়ে বড় কথা কোথাও নেই।

(৫)

শ্যামাসুন্দরী বাড়ী বিক্রয় করিয়া হরবল্লভ বসুর মিথ্যা 'হ্যাণ্ড নোটের টাকা শোধ করিয়া ছিলেন, সে বাড়ী হরবল্লভই নিজে বেনামিতে কিনিয়া লইয়াছিল! বাড়ী ভাড়ায় খাটিতেছে! তিন ঘর ভাড়াটীয়া সেই প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকায় রাজার হালে বাস করিতেছে! শ্যামাসুন্দরী প্রথম ২।৪ দিন সে বাড়ীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া অলক্ষ্যে অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন, একদিন আভার চক্ষে তাহা পড়িয়া গেল। আভা বলিল—জ্যেঠাইমা, শুনেছি তোমাকে ঠকিয়ে নাকি আমাদের গ্রামের হরবল্লভ বসু এই বাড়ী নিয়েছেন ?

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—সে অনেক কথা মা। সে সব তোরা শুনে কি করবি। পড়া করবি, হাসি-গল্প করবি! মাঝে মাঝে দু'একদিন রান্নাবান্না করবি!

আভা শ্যামাসুন্দরীর বুকে যে কি হইতেছিল যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইল, যদি এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি তাহার থাকিত, সে নিশ্চয় তাহলে এর প্রতিশোধ লইতে ছাড়িত না। কথাটা অন্য ভাবে লইয়া সে বলিল—জ্যেঠাইমা আমাকে রাঁধতে বল্লে, তাত আমি মোটেই জানি না!

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—সেকি, তুই একদিনও রাঁধিস নি।

আভা—না, মা আমায় ত এক দিনও সে একথা বলে নি! একদিন বামুনদিদি পাক করছিল, আমি সেখানে গিয়ে দাড়িয়ে ছিলেম, মা অমনি তেড়ে এসে, বল্লেন "ধূয়োতে চোক নষ্ট হয়ে যাবে!"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—সে কি একটা কথা হ'ল মা। মেয়ে ছেলে, রান্না করতে না জানলে চলবে কেন? পরের ঘর ত করতে হবে! পুতুল নও ত মা যে সেজে গুজে গিয়ে এক কোনে চুপ করে বসে থাকবে!

আভা বলিল—আমার খুব কষ্ট হয় জ্যেঠাইমা যে আমি কিছু জানি না; আমার সই তরু, সে কেমন সব ভাল ভাল জিনিষ রান্না করতে পারে! তা মা আমাকে কিছুতেই উনুন মুখো হ'তে দেবেন না।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—নিজের হাতে রান্না করে দশজনকে খাইয়ে যে সুখ, যে তৃপ্তি, তা একবার যে না পেয়েছে সে বুঝবে না। আর আমাদের হিন্দুর ঘরে মেয়েরা রান্না না জানলেত এক মুহূর্ত্তও চলবে না! আজকাল, লেখা পড়ার দিকে যেমন ঝোঁক পড়েছে তেমনি রান্না ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারে উঠে গিয়েছে। তা কি ভাল মা; লেখাপড়া শেখ, ঘর কন্নাও শেখ। যখন যেখানে ফেলে দেবে সেইখানে সমান ভাবে উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হবে, কেবল বইয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে ত চলবে না!

আভা বলিল—জ্যেঠাইমা তুমি আমায় শিখায়ে দেবে, আমি রান্না করা শিখব।

"নিশ্চয় দেব, তোকেত পাক শিখতে হবেই।"

এই সময় ঝি-আসিয়া বলিল দিদি কলেজ যাবেনা আজ, ১০টা বেজে গেছে, নাইবে এস!

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—হঁা মা যা—নাইতে যা, আজ শনিবার বুঝি, আজ সকাল-সকাল ছুটি-হবে!

আভা বলিল "আজ আর কলেজ যাবনা জ্যেঠাইমা, আজ কলেজ ছুটি।"

শ্যামাসুন্দরী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তা—বেশ হল, দুপর বেলাটা একটু শান্তিতে থাকা যাবে। নগেনও আর দৌরাত্ম করবে না কিছু।

শ্যামাসুন্দরী আভার প্রতি অনেকটা নির্ভর করিতে পারিয়াছিলেন। নগেন সংসারে কাহাকেও ভয় করিত না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র অভিভাবিকাটীর আদেশ হেট-মস্তকে বহন করিত। ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত অন্তরে সত্যচরণের সংসার আপনার ভাবিয়া লইলেন। কলিকাতায় আসিয়া অবধি তিনি এক দিনও ভাবিতে পারিলেন না যে, এ পরের সংসার। পৃথিবীর সবগুলি লোক যদি সত্যচরণের মত, বিধুমুখীর মত, আর আভার মত হইত! শ্যামাসুন্দরী ভাবিলেন তবে বুঝি এই পৃথিবী স্বর্গ হইত। আভা বলিল কাল নগেন দা স্বীকার করিয়াছে যে, বই পড়বে! শ্যামাসুন্দরী হর্ষে বিস্ময়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন, সেকি মা তুই কি যাদু জানিস!

আভা বলিল—মা তোমরা ওকে বোঝ না, তাই ওকে দিয়ে কিছু করাতে পার না! আমার ত কোন কথা এক দিনও ফেলে না!

চক্ষু মুছিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—নগেনকে তোর হাতে ফেলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি!

শ্যামাসুন্দরী আর দাঁড়াইলেন না! অন্য প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন, আভা তাহার নিজের ঘরে আসিয়া বসিল।

নগেন তখন বিধুমুখীর কাছে বসিয়াছিল।

বিধুমুখী তাহাকে স্নান করিতে বলিতে ছিলেন, সে জেদ্ ধরিয়াছে এখন কিছুতেই স্নান করিবে না!

বিধুমুখী বলিলেন—চলনা বাবা, আভা এখনও জানেনা তুই স্নান করিস্‌নি। জানলে আর রক্ষা থাকবে না!

নগেন বলিল—তাকে যদি বল কাকিমা, তবে—

বিধুমুখী—সে বুঝি আর দেখবে না?

নগেন বলিল; হাঁ দেখবে বইকি! সেত এখন কলেজ চলে যাবে!

এই সময় একটি যুবক বাহির হইতে ডাকিল-মাসিমা! বিধুমুখী বলিলেন কে—কিরণ, এস।

যুবক ঘরে প্রবেশ করিল। কিরণ বি,এ পড়ে, পাশের-বাড়ীর ভাড়াটে। ছেলেটি ভাল, দেখতে শুনতে বেশ! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সদালাপি, বেশ

গাহিতে পারে, সবাই তাকে ভাল বাসে! প্রায় এক বৎসর তাহার পিতা পাশের বাড়ীর ভাড়াটে হইয়াছেন, মর্চ্চেণ্ট আফিসে কি একটা মোটা মাহিনার চাকুরী করেন॥

বিধুমুখী বলিলেন—কি কিরণ ?

কিরণ বলিল "মা দশটা টাকা চেয়েছেন!"

বিধুমুখী বলিলেন—আমার ত এখন হাত জোড়া; সিন্ধুক খুলতে হবে। তা আভার কাছথেকে নিয়ে যাও!

কিরণ বলিল—আভা কলেজ গেল না ?

বিধুমুখী—না। আজ নাকি কলেজ বন্ধ!

কিরণ—ও, তাইত!

বিধুমুখী বলিল—আর ওর পড়াটা একটু দেখো। পরীক্ষাও ঘনিয়ে এল।

কিরণ বলিল "আজ কাল যেন পড়ায় তেমন মন ওর নেই। বই নিয়ে বসতে ত বড় দেখিনা। একে নিয়েইত মারামারি হুড়াহুড়ি চলছে!

বিধুমুখী বলিলেন "না, না, পড়বেনা কেন। বেশ পড়ে! তবে এরত একটু আদর যত্ন চাই, আমাদের কথা এ মোটেই শোনে না কিনা!

কিরণ কোন কথা না বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। তাহার কথাটা বিধুমুখীর ভাল লাগিল না, নগেনের একটু যত্ন করাও হবে না, এতই কি পড়তে হবে। এত কিসের পড়া! আবার ভাবলেন পরীক্ষাটা ত ঘনায়ে এসেছে; না পড়লেইবা কি করে চলবে! তিনি ভাবিলেন কথাটা একবার আভাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, যে নগেনের জন্য তাহার পড়ার ক্ষতি হয় কি না ?

কিরণ উপরে উঠিয়া আসিয়া দেখিল, আভা নগেনের একটা জামায় ব্রাস করিতেছে।

কিরণ বলিল—ওকি হচ্ছে ?

আভা বলিল, কিরণ দাদা বস!

কিরণ আভার টেবিলের কাছে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল!

আভা যেমন জামা পরিষ্কার করিতে ছিল, তেমনি করিতে লাগিল!

কিরণ বলিল—তোমার কি পড়া শুনা নেই নাকি ? এবার একজামিন দেবে না ?

আভা বলিল—কেন ?

কিরণ—সেই রকম ত দেখছি!

আভা—কেন এখন বেলা ১০।১১টার সময় পড়তে বসতে বল নাকি ?

কিরণ—এমন ১০।১১টাইত দিন রাত দেখে আসছি! এখন জঙ্গলী নিয়েইত হুড়াহুড়ী চলছে!

সহসা আভা জামাটা ফেলিয়া দিয়া বলিল—কোন কাজ না থাকলে তুমি এখন যেতে পার। আমার কর্ত্তব্য, তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী বুঝি।

কিরণ আর টাকা চাহিল না। সে ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইল! আভা বলিয়া দিল, বিনা কাজে আর তুমি আমাদের বাড়ী এস না। কিরণ চলিয়া গেল।

আভা আর একটা সার্ট আলনার উপর হইতে হাতে তুলিয়া লইল। পকেটে হাত দিয়া দেখিল, তাহার ভিতর একটি পানের খিলি! আভা চমকিয়া উঠিল, সেকি নগেন কি পান খাইতে আরম্ভ করিল নাকি ? আভার ইচ্ছা নয়, নগেন পান তামাক খায়! শেষে ও একটা নেশা হইয়া দাড়ায়। এই কলিকাতা সহরে ছেলেরা পান খাইতে শিখিয়া ক্রমে ফাজিল হইয়া পড়ে। সে গাড়ীর মধ্য হইতে দেখিয়াছে, রাস্তার পাশে পানওয়ালীগণ বসিয়া থাকে, তাহাদিগকে ঘেরিয়া ছোকরা বাবুর দল পান লইতে কেমন অশ্লীল ভাবে হাসাহাসি করে। তা কিছুতেই হইতে পারে না। এ কথাটা সে অনেক দিন ভাবিয়াছে, যাহাতে নগেনের পানের প্রতি একটা ঝোক না পড়ে। কে তাকে পান দিল। সে যেই হউক তার সঙ্গে আজ বোঝাপড়া করা চাই—ই।

সার্টটা টান মারিয়া মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া, আভা নিচের তলায় নামিয়া আসিল।

আভাকে আসিতে দেখিয়া নগেন শঙ্কিত হইয়া কহিল—চল কাকীমা নাইতে যাবে।

আভা আসিয়া বলিল — নগেন দা!

নগেনের প্রাণ উড়িয়া গেল। মাথা নিচু করিয়া রহিল!

আভা বলিলল—কথা কইচ নাযে এ কি ?

নগেন—'কি' দেখিবার জন্য একবারও মাথা উচু করিল না।

আভা বিধুবুখীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল তোনরা বুঝি পান দিয়েছ ?

বিধুমুখী বলিলেন—কই না—তুই বলেছিস পর থেকেত আমি সবাইকে বারণ করে দিয়েছি ওকে পান দিতে! তা যদি একটা আধটা মাঝে মাঝে খায়, তাতে দোষ কি ?

আভা—দোষ কি, সে আমি বুঝি! বল, কে পান দিল তোমাকে!

নিতান্ত অপরাধীর মত নগেন উত্তর করিল—কিরণ বাবু!

আভা ভুজঙ্গিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—ফের তার সঙ্গে মিশবে ত তোমার একদিন আর আমার একদিন। যাও ঘরে কাপড় কুচান রয়েছে। তেল সাবান ঠিক করে রেখে এসেছি। এত বেলা হয়েছে, নাইতে যাওনি যে, কি ভেবেছ!

নগেন মন্ত্র মুগ্ধের মত চলিয়া গেল!

বিধুমুখী বলিলেন—আচ্ছা আভা, তোর পরীক্ষার আর কদিন বাকী আছে!

আভা মাতার মুখের উপরে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—কিরণ দাদা এসেছিলে বুঝি। সে আমার নামে দেখছি খুব লাগিয়ে গেছে! কেবল পড়া, সব সময় কি পড়া যায়। আর একটা লোক অযত্নে মারা যায় তার দিকে একটু দৃষ্টি রাখতে হবে না! এমন পড়া আমা দ্বারায় হবে না।

আভা মুখ ভার করিয়া দাড়াইয়া রহিল। বিধুমুখী আসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, আমি কি তাই বলছি মা!

আভা বলিল—হা মা, তুমি তা বলো না!

শ্যামাসুন্দরী আসিয়া বলিলেন—কিরে তুই এখনো নাইতে যাসনি?

আভা বলিল—যাই, জ্যেঠাইমা।

ক্রমশঃ

একাল সেকাল

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

[লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(৫)

শ্যামল বৃক্ষপত্রের আবরণ ভেদ করিয়া ক্রমবর্দ্ধমান দিনের আলো পৃথিবীতে লোটাইয়া পড়িতেছিল। বিমলা ঠাকুর-ঘরে পূজার আয়োজন করিয়া বাহিরে পা বাড়াইতেই রমা হাত ধরিয়া বলিল—"কাজ কি আর তোমার ফুরোয় না ঠাকুরঝী, এতেই যে সব হারাতে বসেছ।"

বিমলার মনটাত ভালই ছিল না, বুকটাও কেমন ভার ভার ঠেকিতেছিল। সদা-সহাস্য মুখখানা মলিন, সে একটা চাপা শ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল—

"কাজ আর আমি কৈ করি বৌদি! ঝী-চাকর রয়েছে, তারা কি কোন কাজ কত্তে দেয়। সারাদিনে ত এই ঠাকুর-পূজোর আয়োজন।"

"তবু ত সকাল থেকে দুমিনিটের জন্যে তোমায় পাচ্ছি না। সাধ করে কি মানুষ বাড়ী ছেড়ে পালায়।"

ইঙ্গিতটা বিমলাকে কড়া রকমের আঘাত করিল। লজ্জায় ক্ষোভে মাথা যেন আপন হইতে নুইয়া পড়িতেছিল। অস্ফুটস্বরে বলিল—"তা বলে গেরস্তর ঘরেত আর বসে গল্প করে, নেচে গেয়ে বেড়িয়ে বেড়ান পুষিয়ে ওঠে না।"

প্রশংসমান দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকাইয়া রমা উত্তর করিল—"রোগ ত ঐখানে ঠাকুরঝি, বুঝে শুনে অষুধ না দিতে পাল্লেত সে সারবে না, বরং বেড়েই উঠবে।"

বিমলা উত্তর করিল না। রমা আবার বলিল—"এক জন সাজিয়ে গুজিয়ে নাচগানে দিনরাত কাটিয়ে দিতে যাচ্ছে, আর একজন সে পথ মাড়াতেও চায় না, একেবারে বিপরীত, যেন সেকেলে একটি গৃহকার্য্যরতা মেয়ে।"

বিমলা ভাবিতে লাগিল, সে তাহার স্বামীর মনোমত হইয়া চলিতে পারে না কেন? স্বভাব যে তাহাকে সে পথে যাইতে দেয় না, সেত তাহারই পূর্ব্বজন্মের ফল। মন যে অবাধ্য, সে যে খাটি মানুষটি দেখিতে চাহে। স্বামীর জন্য যে স্ত্রীর সৃষ্টি, তাহা বিমলা যত জানিত, এত ত আর কেহ জানে না। তবু পাঁচজনের মধ্য দিয়াই যে স্বামীর সাফল্য, শ্বশুরশাশুড়ী গুরু-পুরোহিত, গৃহদেবতা ইঁহাদের কার্য্যে ইঁহাদের সুখশান্তিতে, হাসিমুখ দেখিয়া যত সুখ, যত আনন্দ, সাজিয়া গুজিয়া বই পড়িয়া, কার্পেট বুনিয়া ত সে আরাম, সে সুখ, সে সাফল্য হইতে পারে না।

"কি অত ভাবছ ঠাকুর ঝী, আর ত ভাবাভাবির সময় নেই, দেখ বলে কয়ে যদি ফেরাতে পার।" বলিয়া রমা বিমলার হাত ধরিয়া নির্ম্মলের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল। বিমলা শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া শঙ্কিত স্বরে বলিল—"কি কর বৌদি, তোমার কি আর সময় অসময় জ্ঞান নেই।"

"কেন পরের ঘরে ত আর যাচ্ছ না যে, দিন ক্ষণ দেখ্‌তে হবে।" বলিয়া একটু হাসিয়া জোরে টানিয়া আনিয়া বিমলাকে একেবারে নির্ম্মলের গা ঘেঁসিয়া দাঁড় করিয়া দিল।

নির্ম্মল চমকিয়া উঠিল। সে যাত্রা করিয়া বাহির হইতে ছিল, বিমলাকে দেখিয়া তাহার হৃদয় লাফাইয়া উঠিল। ধরা গলায় বলিল—"তবে যাই বিমল, পারত এ অভাগাকে ভুলে যেও।" একমুহূর্ত্ত থামিয়া গলা ঝাড়া দিয়া আবার বলিল—"আরত এখানে থাকৃতে তোমার কোন কষ্ট হবে না, কেউ অনুযোগও কর্‌বে না। গল্প করে বই পড়ে সময় নষ্ট কত্তেও বল্‌বে না। বিগ্‌ড়ে যাবার ভয়ও তোমার আর রৈল না।"

বিমলা শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া দেখিল, রমা বাহির হইতে দোর ভেজাইয়া দিয়াছে। তবু দিনের আলোটা যেন তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। লজ্জায় সে জড়সড় হইয়া পড়িল। নির্ম্মল জোর করিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রু চাপিয়া রাখিয়া রুক্ষস্বরে বলিল—"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপ্‌ছ কেন? যাও না বেরিয়ে, আমি ত আর তোমায় ডেকে পাঠাই নি।"

"বৌদি যে জোর করে ধরে দিয়ে গেল।" বলিয়াই বিমলা অপ্রভিত হইয়া মুখ নীচু করিল। নির্ম্মলের শূন্য মনের উপর যেন একটা মহাশূন্য আসন পাতিয়া বসিল। "বৌদি যে জোর করে দিয়ে গেল।" সেত তাহা জানিত না। বিমলা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে, দেখাদিতে আসিয়াছে, এই সুখস্বপ্ন যে তাহাকে স্বপ্নময় রাজ্যের অধিবাসী করিয়া তুলিয়াছিল। একটা উত্তপ্ত বাতাস যেন তাহার সেই সুখস্বপ্নটা উড়াইয়া লইয়া গেল। অসহিষ্ণু ভাবে সে বিমলার হাতখানা জড়াইয়া ধরিতে গিয়া একেবারে বসিয়া পড়িল। বিমলা হাত টানিয়া লইয়া বলিল—"ছিঃ, কি কচ্ছ।"

নির্ম্মল যেন হাত্‌ড়াইয়া আর কিছুই পাইল না। শুষ্ককণ্ঠ যেন একেবারে জ্বলিয়া গেল। সহসা গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল—"লজ্জা নিয়েই এবার থাক বিমল, এই যে যাচ্ছি, আর ত ফির্‌বার ইচ্ছে নেই।"

অতিকষ্টে দুইপা অগ্রসর হইয়া বিমলা দেওয়ালে ভর করিয়া দাঁড়ইল। বুক্ তাহার ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, তবুত মুখ খুলিতেছে না। নির্ম্মল অতিষ্ঠ ভাবে জোর করিয়া তাহার হাত ধরিল। কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"নিষ্ঠুর

একটিবার আমায় আশা দাও, তুমি আমার মত হবে। আমি যেন এ আশাটা নিয়েও প্রবাসের দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারি।"

বিমলার স্পন্দমান হৃদয়ের গভীর স্নেহ উথলিয়া উঠিয়া চোক বাহিয়া পড়িতেছিল। তাহার মন যেন মড়াকান্না কাঁদিয়া উঠিল-"ওগো তুমি যেও না, আমিত তোমায় ছেড়ে থক্‌তে পার্‌ব না।" প্রকাশ্যে বলিল—"আমারই জন্য বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছ—কেন, আমি নয় তোমার কেউ নৈ, সুখশান্তি দিতে পারি না। তোমার বাপ-মা রয়েছে, আমায় তাড়িয়ে দাও, তুমি তাঁদের—"বাধা পাইয়া বিমলা থামিল। বাহিরের একটা অস্পষ্ট শব্দ বাক্‌রোধ করিয়া দিল।

একটা দিব্য জ্যোতি নির্ম্মলের হৃদয়টাকে আলোকিত করিয়া তুলিল। মুমূর্ষু বিষিদগ্ধ অমৃতের স্বাদে চেতনালাভ করিল। সে সজোরে বিমলাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে যাইতেই বিমলা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। লজ্জায় গোলাপি গণ্ড লাল হইয়া গেল। "বাইরে থেকে কেউ দেখে ফেল্‌বে" বলিয়া বাহুবন্ধন ছিন্ন করিয়া লইল।

নির্ম্মল ধপাস করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। শূন্যদৃষ্টিতে কড়ি-কাঠ গণিতে লাগিল। তাহার মনের ভারি বোঝার উপর কে যেন আর একটা প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ড চাপাইয়া দিল। মধুময় আশাটা যেন বাতাসের আগে উড়িয়া গেল। শ্মশানেও যে কোমলতা আছে, বিমলাতে তাহাও নাই। হতাশ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"দেখে ফেল্লেত জাত যাবে না বিমল।"

"জাত ত যাবে না, কিন্তু কি মনে কর্‌বে বলত।„

লাফাইয়া উঠিয়া নির্ম্মল বলিল—"মনে করাটা কি তোমার এতই বেশি হল।"

বিমলার ভীতদৃষ্টি কল্পনার প্রাবল্যে বাহিরে কাহার ছায়া দেখিতেছিল, গৃহপ্রবিষ্ট দিনের আলোটা যেন উপহাস করিয়া হাসিতেছিল। সে কোন উত্তর করিতে পারিল না। নির্ম্মল ক্ষিপ্তের মত আবার তাহাকে টানিয়া ধরিল। ও-ঘর হইতে গৃহিণী ডাকিলেন—"বৌমা।"

বিমলা কাঁপিয়া উঠিল। সজোরে স্বামীর হাত ছাড়াইয়া ভেজান' দোরটা খুলিয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে বাহিরে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

কলিকাতায় আসিয়া কিন্তু নির্ম্মল আরও হাপাইয়া উঠিতেছিল। মস্ত দ্বিতল বাড়ীতে ডাক্তারখানা খুলিয়া ঝী ও ঠাকুরের হেপাজতে সে আর তিষ্ঠিতে পারে না। নূতন ডাক্তার, রোগী ত ছিল না, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বেড়াইয়া বেড়ান আর চিন্তা এ দুটিই ছিল তাহার আশ্রয়। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে মুক্ত বাতাসে পথের উপরকার রোয়াকের উপর বসিয়া সে তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের ভবিষ্যৎ ভাবিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, ছ'মাস আগেকার কথা। কত আশা, কত আশ্বাস লইয়া সে পরীক্ষা দিয়াছিল, পরীক্ষার পর কি উজ্জ্বল আলো বুকে করিয়া এই কলিকাতাকে নমস্কার করিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছিল, যদিও সে পল্লী গ্রামের উপর চির কালই বীতশ্রদ্ধ, তথাপি বিমলার সেই পরিপূর্ণ অবয়বের মধুর প্রতিকৃতি তাহাকে যে ভাবে আকর্ষণ করিয়া ছিল, তাহা যে আর জীবনে হইবার নহে। ছ'মাসের মধ্যে তাহার জীবন ও মনের উপর দিয়া কি ওলট্‌পালট্‌ই হইয়া গেল। সে যে সব হারাইতে বসিয়াছে, আরত তাহার কোন আশা নাই, নৈরাশ্য যে হতাশ্বাসকে বহন করিয়া আনিয়া দিন দিনই তাহার জীবনকে ভার করিয়া দিতেছে। তাহার উৎসবের প্রচুর আয়োজন পণ্ড করিয়া বিমলার নীরিহতা যে ক্রূর সর্পের ন্যায় বিষ ঢালিয়া তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে চোখ যখন সজল হইয়া উঠিল, তখন আর সে বসিয়া থাকিতে পারিল না। নূতন বন্ধু সতীশের নিমন্ত্রণের কথা মনে করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একেবারে সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"সতীশবাবু।"

"দাদাবাবু বাইরে গেছেন।" বলিয়া সতীশের ষোড়শী ভগিনী শোভা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। একটু অপ্রস্তুতের মত অস্ফুটস্বরে নির্ম্মল বলিল—"তেমন ত কথা ছিল না।"

"কথা ত ছিল না, তবু কি জরুড়ি কাজে তাকে যেতে হয়েছে। আপনার কথা আমায় বলে গেলেন।" বলিয়া শোভা একটু থামিয়া আবার বলিল—"বাঃ, আপনি যে বড় দাঁড়িয়ে রৈলেন। বসুন না, দাদাবাবু এখুনি আস্‌বেন।" বলিয়া সে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। নির্ম্মল কিন্তু সহসা বসিতে পারিল না, এতটায় সে অভ্যস্ত ছিল না, যুবতী কুমারীর সান্নিধ্য তাহার প্রাচ্য শিক্ষার

শিক্ষিত মনের উপরও কেমন একটা সঙ্কোচের ভাব আনিয়া দিল। থতমত খাইয়া বলিল—"সতীশবাবুকে বল্‌বেন, আমি কথামতই এসেছিলাম। তিনি কিন্তু তাঁর কথা রাখ্‌তে পারেন নি।" বলিয়া বাহিরের দিকে পা বাড়াইতেই শোভা ব্যস্ত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে নির্ম্মলের হাত ধরিবার উপক্রম করিয়া বলিল—"বারে, দাদাবাবু নয় বাইরে গেছেন, আমিত রয়েছি, বসুন না, আজ না হয় নিরিবিলি দুদণ্ড আপনাদের দেশের গল্প শুনব।"

নির্ম্মল বাধ্য হইয়া বসিয়া পড়িল। বলিল—"বসুন আপনি, সেত সত্যি, আপনার দাদা বাইরে গেছেন, তাতে আর এমন কি হয়েছে, এত আর আমার পরের বাড়ী নয়।"

শোভা ইলেক্ট্রীকের কলটা টিপিয়া দিল। বেয়ারাকে ডাকিয়া বলিল—"ওরে ঠাকুরকে বল্‌ত, নির্ম্মলবাবুর জন্যে এক পেয়ালা চা করে দিয়ে যায়।" তারপর নির্ম্মলকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"আজ আপনাদের দেশের কোন গল্পটি বল্‌বেন বলুন দেখি।"

নির্ম্মলের সঙ্কোচটা ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল, স্মিত হাস্যে উত্তর করিল,—"সে আবার একটা দেশ, তার আবার গল্প, আপনার যেমন আর কোন কাজ নেই, ঐ শুনেই ভারি খুসি হন।"

"নির্ম্মলের হাসির মধ্যেও কেমন একটা কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া শোভা এবার স্বর ফিরাইয়া লইয়া বলিল—"না না সে থাক, আপনার হয়ত ওতে এখন মন নেই।"

নির্ম্মল ভাবিতে লাগিল, শোভা আর বিমলাতে কতখানি পার্থক্য, প্রভাত-শুক্ররূপিণী তেজোময়ী প্রগল্‌ভা শোভার বিদ্যুৎ-ঝল্‌কান রূপ, এবং গুণগরিমা যেন তাহাকে আজ নূতন একটা অনুভূতির অধীন করিয়া আনিতেছিল, সহসা সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, শোভা পিয়ানো লইয়া গাহিতে বসিয়াছে। এই যুবতীর সুন্দর সুধাময় মধুর স্বরে নির্ম্মল রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, স্বর সপ্তমে উঠিয়া আবার পঞ্চমে নামিল, মূর্চ্ছনার আঘাতে নির্ম্মল যেন লাফাইয়া উঠিল। সহসা গান শেষ করিয়া শোভা হাসিয়া বলিল—"আপনার ভাল লাগ্‌ছে না বুঝি, তা আমায় যাই বলে নিন্দে করুন, গানটাকে কিন্তু তা পার্‌বেন না, ও যে ডি, এল, রায়ের 'বই থেকে শিখেছি।"

নির্ম্মল শোভার ভাবভঙ্গীময় মুখের দিকেই চাহিয়াছিল, এতক্ষণ সে সত্যই বুঝিতে পারে নাই, কোনটি বেশী সুন্দর, গান কি গায়িকা, শোভার কথাটায় যেন তাহার উন্মেষ হইল, বলিল—"যা আপনি গেয়েছেন এতে ত না বলে যো নেই যে, অমন গানটিও আপনার স্বরের কাছে নুয়ে পড়েছে।"

"লৌকিকতাটা এখন নয় থাক।" বলিয়া শোভা প্রশ্ন করিয়া বসিল—"আচ্ছা আপনাদের দেশের মেয়েরা বুঝি গাইতে বাজাতে জানে না, আর যারা এম্নি গান বাজনা করে, তাদের খুব নিন্দে করে ?"

নির্ম্মল চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল—"না না, নিন্দেত কেউ করে না। আর তারা যে নিন্দে প্রশংসার বাইরে।" তার পরে একটা খোচা সাম্‌লাইয়া লইয়া স্বর খাট করিয়া বলিল—"তাতে ত তাদেরও বড় দোষ নেই, পাড়াগায়ে পুরুষগুলোই কেমন একরকমের জড়ভরত, তারাই এ সব জানে না, তা মেয়েরা আর জান্‌বে কোত্থেকে। ওরা ছোটকাল থেকে ঐ বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়াই শিখেছে, ঐ নিয়ে থাক্‌তেই ভালবাসে।" বলিয়া একটা ঢোক গিলিয়া যেন চুরি করিয়া একটী ক্ষুদ্র শ্বাস ত্যাগ করিয়া বুকের ভারটা হাল্কা করিয়া লইল।

"এতে কিন্তু আপনাদের মন দেওয়া উচিত, আপনারাইত তাদের ঝীচাকরাণীর মত করে রেখেছেন। কেন মেয়ে—বলে কি তাদের আর মানুষ হতে নেই। লেখাপড়া গান বাজনা যদি নাই শিখ্‌লে ত জীবনই বৃথা। এমন জিনিষ—এর স্বাদই যদি পেল না ত, তাদের মানুষ হয়ে লাভ!" বলিয়া শোভা থামিল।

কথাগুলি নির্ম্মলের মর্ম্মস্পর্শ করিল। এই শোভার মত শিক্ষা যদি ঘরে ঘরে থাকিত, তবে কি জানি সংসারটা স্বর্গ অপেক্ষাও সুখের হইত, তথাপি শোভার এই অনুযোগটা সে নীরবে সহ্য করিল না, ধীর স্বরে ক্ষুন্ন সম্মান বজায় রাখিবার জন্য সে বলিয়া উঠিল—"সবাই যে এক রকম, তাত নয়, পাড়াগাঁয়েও অনেক বিদুষী মহিলা আছেন।"

"আপনার স্ত্রীকে অবিশ্যি আপনি রীতিমত শিক্ষা দিয়েছেন।" বলিয়া শোভা অপাঙ্গে চাহিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নির্ম্মলের হৃদয় দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। যেন একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হইতেছিল। সে চঞ্চল ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেই ঠাকুর চায়ের পেয়ালা আনিয়া সম্মুখে

রাখিয়া দিল। নিরুপায় নির্ম্মল, আবার বসিয়া পড়িয়া চা পানে মন দিল। এই উপলক্ষ্যে এত বড় বিপৎটা কাটিয়া গেলে নির্ম্মল আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আজকে আমার এখুনি না গেলে নয়, জরুরি একটা কেশ রয়েছে, সতীশবাবুকে বল্‌বেন, কাল আমি দেখা কর্‌ব।"

শোভাও দাঁড়াইয়া উঠিল। বিনীত ভাবে বলিল—"হয়ত আমার কথাগুলো আপনার ভাল ঠেক্‌ছে না, মাপ্‌ কর্‌বেন আমায়। বসিয়ে রেখে আর কষ্ট দিতে চাইনি, তবে আসুন।"

"সে কি কথা, আপনার মত বিদুষীব সঙ্গে আলাপ কত্তে পেয়ে ভাগ্য মনে কচ্ছি।" বলিয়াই নির্ম্মল দ্রুতপদে সেই রজনীর নক্ষত্র-খচিত নগ্ন আকাশের তলে সহরের আলোকিত রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার উদ্দাম চিন্তাকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া পুষ্পসম্ভারসজ্জিত বসন্তের বায়ু কাণের কাছ দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া বহিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

রঙ্গ-বারিধি।

দ্বিতীয়-তরঙ্গ।

জামাই-ষষ্ঠি।

(লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।)

১

পরোওয়ানা, সফিনা ও ক্রোকজারী একই সঙ্গে সহসা উপস্থিত হইলে মানুষের মনের অবস্থা যেরূপ হয়,—শনিবার অপরাহ্ণে আফিস হইতে বাটী ফিরিয়া, জামাই ষষ্ঠির দিনে বাটীতে একেবারে তিন জামাতার অধিষ্ঠান দেখিয়া যদুনাথের মনের অবস্থা কতকটা সেইভাব ধারণ করিল। কোথায় সপ্তাহ পরে শনিবার একটু আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া দেহটাকে আবার এক সপ্তাহের মত চাঙ্গা করিয়া লইবেন,—তা না এ কি বিড়ম্বনা। মোটেতো বাটীতে শয়নের উপযুক্ত দুইখানি গৃহ, তাহাও আবার একখানি উপরে, একখানি নীচে,—উপরের খানি জামাতারা দখল করিয়াছেন,—কাজেই বাটীর অন্যান্য সকলে নীচের

ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। আড়ামোড়াভাঙ্গা দূরের কথা তাঁহার একটু বসিবার পর্য্যন্ত স্থানের অভাব। তাহার উপর আবার কন্যা তিনটী আজ প্রায় দুই মাস হইল শ্বশুরালয় হইতে আসিয়া যাই যাই করিয়াও অদ্যাপিও যায় নাই, কাজেই খরচও হিসাব ছাড়াইয়া অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে। মাসের শেষ, হাতে একটাও পয়সা নাই,—যদুনাথ মনে মনে বলিলেন, "ভগবানের মার সহ্য করিতেই হবে," তারপর সেই উঠান হইতেই "সুধা সুধা" করিয়া ডাক ছাড়িলেন।

পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি কন্যাই বাহির হইয়া আসিল। যদুনাথের গৃহিণী বামাসুন্দরী স্বামীর নিকটে যাইয়া এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "তুমি একবার চটকরে বাজারে যাও,—জামাইরা সব এসেছে—সকাল সকাল খাবার বন্দোবস্ত করি।"

সমস্ত দিন আফিসে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বাটীতে ঢুকিতে পত্নীর মধুর আদেশে যদুনাথের দেহ শীতল হইয়া গেল, তিনি পত্নীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"যাতো মা, আমার কাপড় খানা নিয়ে আয়তো, এইখানেই আফিসের কাপড় ছাড়ি।"

বামাসুন্দরী নথ নাড়িয়া বলিলেন—"তোমার যে সব তাতেই বাড়াবাড়ি। ঘরে চল, একটু জিরোও, একছিলিম তামাক খাও, তারপর একটু ঠাণ্ডা হয়ে বাজারে যাও।"

ততক্ষণে সুধা কাপড় লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, যদুনাথ কন্যার হস্ত হইতে কাপড়খানি লইলেন। গাত্রের চাপকানটা খুলিয়া কন্যার হস্তে দিয়া বলিলেন,—"নে মা, যেখানে হয় রেখে আয়, আমি একবার যাই, চটকরে বাজারটা করে আনি, জামাইরা খাবে, শীগ্‌গি শীগ্‌গির বন্দোবস্ত হওয়া দরকার।"

বামাসুন্দরী হাত নাড়িয়া অভিমান জড়িত সুরে বলিলেন, "কেন ঘরে ঢুকতে কি দোষ আছে, যত সব অলক্ষুণে কাণ্ড, উঠানের মাঝখানে কাপড় ছাড়া। ভীমরতী হয়েছে কি না!"

সুধা বলিল, "হাঁ বাবা! চল ঘরের মধ্যে চল। এখানে কি কাপড় ছাড়ে।

যদুনাথ একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "চল মা' কিন্তু দম থাকতে থাকতেই কাজ সেরে নেওয়া উচিত, দম ফুরায়ে গেলে আর দম না দিলে চাকা ঘুরবে না। কে জানে কল বিগড়েতে কতক্ষণ।

"যত বয়স বাড়ছে তত ঢং বাড়ছে, ওপরে জামাইরা রয়েছে তার একে-বারে খেয়ালই নাই," এই বলিয়া বামাসুন্দরী হাত দুলাইয়া নথ নাড়িয়া ফর ফর করিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। যদুনাথ কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"চ' মা শীগ্‌গির চ! ঘরের মুধ্যেই যাই। তোর মা আবার এখনি রণরঙ্গিণি-মূর্ত্তি ধারণ করবে।"

যদুনাথ একপায়ের শত ছিন্ন মোজা উঠানেই খুলিয়া ফেলিয়া ছিলেন। সেইটা এক হাতে ও অপর হাতে কন্যা প্রদত্ত কাপড়খানি লইয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন, কন্যা পিতার চাপকানটা এক হাতে ও অন্য হাতে পিতার পরিত্যক্ত একপাটি জুতা লইয়া পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই,—দিনের আলো তখন অতি মলিন ভাবে জগতের নিকট বিদায় লইতেছিল। ছাদের আলিসার উপর কা কা রবে সভাপতিকে সম্ভাষণ করিয়া বায়সকুল সান্ধ্যসভায় একে একে আসিয়া আপন আপন আসন গ্রহণ করিতেছিল। সহসা উপরের ঘর হইতে জামতাদের হাস্য কোলাহল লহরে লহরে উঠিয়া যদুনাথের ক্ষুদ্র বাটী মুখরিত করিয়া দিল। যদুনাথ তাড়াতাড়ি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

২

রাত্রি ৮টার মধ্যেই জামতাদের আহারের বন্দোবস্ত শেষ হইল। রান্না ঘরে জামতাদিগের আহারীয় দ্রব্য বাটীর পর বাটিতে সজ্জিত করিয়া, অঞ্চলে ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে বামাসুন্দরী স্বামীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগুনের তাতে তাঁহার মুখ রক্তিমাভ হইয়াছিল, মুখে যেন শত উৎসাহ উছলিয়া উঠিতেছিল। তিনি মহা ব্যস্তভাবে বলিলেন, "আর একবার যে তোমায় চট করে বাজারে যেতে হবে,—ওমা! ঘিটি আনাইতে ভুল হয়ে গেছে।

যদুনাথ আফিস হইতে ফিরিয়া পর্য্যন্ত পাঁচ ছয় বার বাজারে গিয়াছেন। এইমাত্র এখনও পাঁচ মিনিট হয় নাই, ঘৃত কম পড়িয়া যাওয়ায় তিনি ঘৃত লইয়া ফিরিয়াছেন। কেবলমাত্র এক ছিলিম তামাক খাইবার জন্য টিকা ধরাইবার আয়োজন করিতেছিলেন ; ঠিক সেই সময় বামাসুন্দরীর সুমিষ্ট সুর, "আবার একবার বাজারে যেতে হবে," কর্ণে প্রবেশ করিল। যদুনাথ টিকেটা তৎক্ষণাৎ মেজের উপর ফেলিয়া বলিলেন, "বলে ফেল— টিকে ফেলেছি।"

বামাসুন্দরীর কণ্ঠস্বর আরও একটু মোলায়েম করিয়া একেবারে কোমল পর্দ্দায় নামাইয়া বলিলেন, "তা কি করবে বল, জামাইরা তো আর রোজ আসে না, একদিন এসেছে। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তা কি আর বুঝতে পাচ্ছি না।"

যদুনাথ বামাসুন্দরীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আরে রামচন্দ্র,—কষ্ট —এতো মহা আনন্দ। আনন্দের ধূমে উনুনের আঁচে তোমার যৌবন কিরে এসেছে, আর আমি বার আষ্টেক দশ বাজারে যেতে পারবো না। চট করে বলে ফেল, বাছাদের আবার রাত হচ্ছে।"

বামাসুন্দরী এবার একেবারে করুণ সুরে বলিলেন, "তোমাকে আর বেশী দূর যেতে হবে না, কাছে যা পাও তাই নিয়ে এস। দেড়পো রাবড়ী আর আনা কতকের মিষ্টি।"

যদুনাথ হাত পাতিয়া বলিলেন, "কাছে হক্, দূরে হক্ সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই। পয়সা দাও আমি বেরিয়ে পড়ি।"

বামাসুন্দরী পয়সা দিবার জন্য অঞ্চলে হস্ত দিয়া বলিলেন, "ওমা চাবি কোথায়?" তারপর স্বর একটু উচ্চে তুলিয়া ডাকিলেন, "সুধা—সুধা।"

মায়ের ডাকে সুধা তাড়াতাড়ি রান্না ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বামাসুন্দরী বলিলেন,—"যাতো মা দেখতো চাবিটা আবার কোথায় ফেল্লুম।"

চারিদিকে চাবি খুঁজিবার ধুম পড়িয়া গেল। জননী ও তিন কন্যা চাবি খুঁজিতে সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিতে লাগিলেন। যদুনাথ আবার টিকা ধরাইতে যাইতে ছিলেন, ঠিক সেই সময় বামাসুন্দরী বলিলেন, "ওমা চাবি যে এই আমার বা হাতে রয়েছে—এমনও পোড়া মন হয়েছে!"

সুধা মায়ের নিকট হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়া সাড়ে সাত আনার পয়সা আনিল। যদুনাথ কন্যার নিকট হইতে পয়সা কয় আনা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন; কিন্তু দরজার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র ভিতর হইতে কন্যা ডাকিল, "বাবা একবার শুনে যাও।"

যদুনাথ ফিরিলেন, কয়েকপদ বাড়ীর ভিতর অগ্রসর হইবামাত্র বামাসুন্দরী ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "পান ফুরিয়ে গেছে, দু'পয়সার পান আর এক পয়সার এলাচ আনতে হবে যে!"

যদুনাথ তখন উঠানের মধ্যস্থলে উবু হইয়া বসিয়াছিলেন। বামাসুন্দরী

বলিলেন; "আবার বসলে কেন? যাও আর দেরী করো না,—বাছারা কখন খাবে,—রাত যে ঢের হ'লো।"

তথাপি যদুনাথ উঠেন না দেখিয়া বামাসুন্দরীর রাগে সমস্ত অঙ্গ জলিয়া উঠিল, স্বর একটু উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "নেশা করছ নাকি? কথা যে কানে যাচ্ছে না!"

যদুনাথ হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—একটু স্থির হয়ে সব ভেবে মনে কর। জামাইরা তো আর রোজ আসে না। শেষকালে অবার দোকান বন্ধ হযে যাবে।"

"সব সময় আমার রঙ্গ ভাল লাগে না বাপু। যাবার ইচ্ছে হয় যাও না হয় যেও না," এই বলিয়া বামাসুন্দরী রাগে ফুলিতে ফুলিতে রান্নাঘরে ঢুকিলেন। যদুনাথ কন্যাকে বলিলেন, "সুধা পয়সা তিনটে এনে দে মা—যাই দেখি আবার রাবড়ী পাই কি না?"

সুধা ছুটিয়া যাইয়া পয়সা লইয়া আসিল। যদুনাথ আর কোন কথা না বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সুধা সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

৩

আগার শেষ হইয়া গিয়াছে,—তিনি জামাতাই আবার উপরের ঘরে গিয়া উঠিলেন। ঘরটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে,—ঘরের একপার্শ্বে একখানি খাট, তাহার উপর একটী নূতন পরিস্কৃত বিছানা,—মেজের উপর গৃহের মধ্যস্থলে একটা সতরঞ্চি, তাহার উপর একখানি কারপেট পাতা হইয়াছে। গৃহের এক কোনে একটী গোল প্রস্তর টেবিলের উপর একটী ল্যাম্প জ্বলিতেছে! এলাচ লবঙ্গ পূর্ণ ডিপে ভরা পান তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত। জামাতাদিগের মধ্যে পরস্পর নাম মাত্র "হুঁ হাঁ" কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

শ্বশুরালয়ে একখানি ব্যতীত দুইখানি গৃহ পাইবার আশা নাই, তাহা তিন জামাতাই বিশেষ ভাবে অবগত আছেন। অথচ পত্নী শ্বশুরালয়ে থাকিতে আহারের পর রাত্রে সাধ করিয়া কে বাড়ী ফিরিতে চায়? কাজেই সকলের মনেই দারুণ চিন্তা কাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়। জ্যেষ্ঠ জামাতা মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—তিনি জ্যেষ্ঠ, তাহার আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, নিশ্চয়ই তাহাকে থাকিতে বলিবে। মধ্যম ভাবিতেছিলেন,—আমি বহুদিবস আসি নাই,—প্রায়ই বিদেশে থাকি, এ অবস্থায় আমায় থাকিতে না বলিয়া পারে না,—আবার কনিষ্ঠ ভাবিতেছিলেন, আমি সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ, সম্প্রতি

আমার বিবাহ হইয়াছে আমাকে থাকিতে বলিতে বাধ্য। সকলের মনেই তুমুল ঝড় বহিতেছিল,—অথচ পাছে মনের ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় পরস্পর পরস্পরের কথায় "হুঁ হাঁ না" প্রভৃতি শব্দে উত্তর দিতেও বাধ্য হইতেছিলেন। রাত্রি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, প্রাণান্তেও বাড়ী যাইবার নাম কেহই মুখে আনিতে ছিলেন না।

যদুনাথের কন্যাদের অবস্থাও তদ্রূপ। প্রথম স্বামী আগমনে প্রাণে তাহাদের ভাবের লহর ছুটিয়াছিল। কত পুরানো কথা যাহা এতদিন বলি বলি করিয়াও বলা হয় নাই, আজ নবভাবে তাহাই আবার প্রাণের মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল,—সাহসা যেন বসন্ত সমাগমে তাহাদের সমস্ত বিরহ-জ্বালায় অবসাদ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে স্বামীরা বাটী যাইবার নাম না করায় রাগে তাহাদের সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। কেমন যেন কিসের একটা সঙ্কোচ আসিয়া তাহাদেরও একেবারে জড়সড় করিয়া দিতে ছিল। তথাপি আশা কুহকিনী তাহাদেরও ছাড়ি ছাড়ি করিয়াও একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই,—তখনও সে নানা মূর্ত্তিতে নানা ভাবে সজ্জিত হইয়া আসিয়া তাহাদের প্রাণের দরজায় আঘাৎ করিতেছিল। কানের নিকট সে যেন অতি ক্ষীণ স্বরে বলিতেছিল, "ভয় কি,—লজ্জা কিসের? তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তোমারটীই থাকিবে।"

জামাতাদিগের আহার শেষ হইবার পর যদুনাথ একটু ধাতস্থ হইয়া এক ছিলিম তামাক বেশ পরিপাটীরূপে টানিতে ছিলেন। আফিস হইতে ফিরিয়া পর্য্যন্ত প্রায় চার পাঁচ ছিলিম তামাক কেবল সাজাই হইয়াছিল,--টান আর ঘটিয়া উঠে নাই,—একটার পর একটা ফরমাইসে তাঁহাকে কেবল বাজারেই ছুটিতে হইয়াছিল এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া মহাশান্তিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তামাক টানিতে ছিলেন; সহসা বামাসুন্দরীর "ওগো," শব্দে তাঁহার সমস্ত দেহটাকে কে যেন সবলে ধরিয়া নাড়িয়া দিল, তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হুকাটা তাড়াতাড়ি গৃহের এককোনে রাখিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাজারে যেতে হবেতো? বলে ফেল লজ্জা কি,—আমি হুকো রেখেছি। ঠিকে গাড়ী ঘোড়ার ভাবনা কি আছে? ভবানীপুর থেকে এই মাত্র সওয়ারী নামিয়ে ফিরেছে বলে যে দমদমার ভাড়া নেবে না, তা হতেই পারে না।"

বামাসুন্দরী বলিলেন, "তা নয়,—তা নয়।" তাহার পর পতির কর্ণের নিকট মুখ আনিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিলেন, "জামাইদের এখন শোবার বন্দোবস্ত কি করি বল দেখি ?"

যদুনাথ হুকাটা তুলিয়া লইয়া কেবল মাত্র বলিলেন, "যা হয় কর ;" তারপর গম্ভীর ভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন।

বামাসুন্দরী কিছুক্ষণ স্বামীর উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া পুনঃরায় বলিলেন, "ভড়াক ভড়াক করে ত তামাক টানতে আরম্ভ করলে,,—এর একটা ব্যবস্থা কর ?"

যদুনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন' "ঘরত আর বাজারে পাওয়া যায় না, যে আর একবার একটু কষ্ট করে যাও বলবে,—আর আমিও অমনি গণ্ডাকতক পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। জামাইরাতো আর রোজ আসে না,—এর আর একটা ব্যবস্থা করতে পারছ না।"

বামাসুন্দরী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, বলিলেন সেই কথাইতো জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। ঘরতো মোটে দুটো শোবার বন্দোবস্ত করব কি আমার মাথায়।

যদুনাথ হুকাটা ঘরের কোনে রাখিয়া ডাকিলেন, "সুধা ঘরের ভিতর থেকে একটা কলকে দিয়ে যাতো মা। তারপর পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন; "মাথায় এমন কি জায়গা আছে যে তিন জামাইয়ের শোবার বন্দোবস্ত করবে। ঘরের অভাব কি, একজনকে দাও ওপরে, একজনকে দাও নীচের ঘরে,—একজন গুগ্‌ভাড়ার ঘরে,—আর চল তুমি আর আমি শুইগে যাই রান্নাঘরে!"

সমস্ত দিন রান্নাঘরে,—উনান তাতে, একেই বামাসুন্দরীর মেজাজ উত্তপ্ত হইয়াছিল তাহাকে যদুনাথের কথা কয়টা যেন তাহাতে ইন্ধন সংযোগ করিল, —সে সপ্তমে গলা তুলিয়া বলিল, "সব সময়' নেকামী ভাল লাগে না। হাড়ে নাড়ে জলে মলুম,—মরণওতো হয় না।"

ক্রোধে বামাসুন্দরীর কণ্ঠ রোধ হইল,—চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। তিনি ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে হন হন করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় পায়ে লাগিয়া হুকাটা পড়িয়াগেল, কলিকাটা পড়িয়া দুইখান হইল। যদুনাথ তাড়াতাড়ি হুকা তুলিলেন, বলিলেন, আমাদের ঘর নেই,—তাতে হুকোটার অপরাধ কি হ'লো ?"

৪

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়া যায় তথাপি জামাতা দিগের উঠিবার নামটী নাই। কোন স্থানে অতিশয় জনতা হইলে লোকে যেমন স্থান ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় কিছুতেই স্থান ছাড়িতে চায়না। হাজার যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও স্থান টুকু আগলাইয়া থকে, জামাতারাও ঠিক সেই ভাবে পড়িয়া ছিলেন; বাটী যাইবার নাম পর্য্যন্ত কেহ মুখে আনিতে ছিলেন না। নিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল, শয্যার আশ্রয় লইতে সমস্ত দেহটা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল তথাপি শশুরালয়ের মায়া কেহই কাটাইতে পারিতে ছিলেন না।

সেই সময় হুকা টানিতে টানিতে যদুনাথ সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সহসা শ্বশুর মহাশয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিন জামাতাই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—তিন জনেই অবনত মস্তক হইয়া শ্বশুর মহাশয়ের পদ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। যদুনাথ হাত নাড়িয়া বলিলেন "থাক, থাক, হয়েছে হয়েছে, বস বস। তার পর বাড়ীর সব খবর মঙ্গলতো?"

জামাতারা আবার যে যাহার স্থানে উপবিষ্ট হইয়া, সকলেই সমস্বরে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপাতত সকলেই এক রকম আছে।"

বড় জামাতা বলিলেন আপনার শরীর এখন কেমন আছে? মাঝে শুনেছিলাম আপনার শরীর তত ভাল নেই।

যদুনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমার শরীর আপাতত মন্দ নেই, বিশেষ কোন অসুখতো টের পাই না, তবে মানুষ শান্তিতে এক মিনিটও থাকিতে পারে না। দেখনা বিড়ম্বনা সন্ধ্যে থেকে ঝি মাগীর হঠাৎ কলেরা মত হয়েছে। একেই দিন কাল যে পড়েছে তাতে বাঁচাই দুর্ঘট, তার উপর দেখনা এই বিড়ম্বনা।"

"কলেরা!" তিন জামাতাই ভীত ভাবে এই কথা বলিয়া বিস্ফারিত নয়নে কিছুক্ষণ শ্বশুর মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! কলেরা কি? কোথায়—এই বাড়ীতেই নাকি?"

যদুনাথ হুকা টানিতে টানিতে সেই ভাবেই বলিলেন, "তাইতো ভয়ের কথা! হাসপাতালে পাঠাতে চাইলুম, মাগী কেঁদেই আকুল। ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে। গরীব মানুষ এ অবস্থায় কি করে তাড়াই বল?"

কলেরার নাম শুনিয়া তিন জামাতারই মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, ছোট

জামতা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বড় জামাই উঠি উঠি করিতেছিল, মেজ জামাতা জড়ে পরিণত হইয়াছিল। যদুনাথ ছোট জামাতাকে উঠিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "এই রাত্রে কোথায় যাবে, তা কি হয়। বস বস!"

বড় জামাতা কষ্টে মুখে হাসি আনিয়া বলিল, "তুমি কোথায় যাবে? বস বস।" তার পর যদুনাথের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমি তবে এখন আসি রাত অনেক হয়েছে?"

মেজ জামাতার বক্ষ স্পন্দিত হইতেছিল, সে অতি তীক্ষ্ণস্বরে বড় জামাতার দিকে ফিরিয়া বলিল' "চলুন এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।"

মৃত্যুরূপী কলেরার নাম শুনিয়া তিন জামাতারই উদর গুলাইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মনে হইতেছিল আর এক মুহূর্ত তথায় অবস্থান করা অর্থাৎ ইচ্ছায় মৃত্যুমুখে প্রবেশ করা। আর অবস্থান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব,—কাজেই সকলেই যাইতে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যদুনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমি তোমাদের শাশুড়ী ঠাকুরুণকে ডেকে দিচ্ছি তিনি তোমাদের যেতে দেন যাও। তবে আমার বিবেচনায় এত রাত্রে আর কেন মিছে কষ্ট করে যাবে?"

জামাতারা চলিয়া যাইতেছেন সংবাদ পাইয়া বামাসুন্দরী ছুটিয়া আসিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইলেন,—"অতি চাপা গলায় বলিলেন, "সে কি হয় এত রাত্রে যাওয়া হইতে পারে না।"

জামাতারা তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"এতো ঘরের কথা আর একদিন থাকলেই হবে।"

বামাসুন্দরী আরও ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "না তা হ'তে পারে না,—প্রবোধের যাওয়া কিছুতেই হবে না।

প্রবোদ ছোট জামাতা। প্রবোধের দূর সম্পর্কীয় এক খুড়া এই ভয়াবহ রোগে সম্প্রতি জীবন দিয়াছে। তাহার যাওয়া হইবে না শুনিয়া ভয়ে তাহার চক্ষে জল আসিল। তাহার বুক ধড়াস ধড়াস করিয়া উঠিল। মনে হইল সেই মারাত্মক জীবননাশক কলেরার বীজাণু তাহার শরীরে প্রবেশ করিতেছে। সে কাতরে বলিল, "আমার থাকা অসম্ভব? ও জিনিষটায় আমার বড় ভয়। শুনেই আমার বুক কাঁপছে।"

বামাসুন্দরী যদুনাথের সহিত জামাতাদিগের কি কথা হইয়াছে তাহার কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন, প্রবোধ ছেলে মানুষ, বোধ হয়

পত্নীর কাছে শুইতে ভয় পাইতেছে, তাই মৃদু হাসিয়া বলিলেন ভয় কি? এ বাড়ীতো আর তোমার পরের বাড়ী নয়।

প্রবোধ বলিল, "আজ্ঞে না, আমি পারবো না,—আমায় মাপ করবেন।"

যদুনাথ তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "প্রবোধের যদি নিতান্ত থাকতে আপত্তি হয়,—পশুপতি তুমিই না হয় থাক। শ্বাশুড়ী ঠাকুরুণের যখন ইচ্ছা, যে হয় একজনের থাকা উচিত।"

সর্ব্বনাশ! পশুপতি মধ্যম জামাতা এই কথা শুনিবামাত্র আর কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে গৃহের বাহিরে যাইয়া জুতা পরিতে পরিতে বলিলেন, "ও জিনিষটায় ভয় করে না, এমন লোক খুবই কম আছে। তার উপর আমার কাল সকালেই বেরুতে হবে।"

বড় জামাতা নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, এ অবস্থায় লোককে পেড়াপীড়ি করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বাড়ীতে যত ভীড় কম থাকে ততই মঙ্গল।"

যদুনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ভয় কি,—সবই সেই মঙ্গলময়ের হাত একজন যে হয় থাক, যখন শ্বাশুড়ী ঠাকুরুণের নিতান্ত ইচ্ছে।"

জামাতাদিগের ভাব দেখিয়া বামাসুন্দরী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,—সহসা জামাতাদিগের এ ভাবের কারণ কি, তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। জামাতারাও আর বাক্য ব্যয় না করিয়া শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিলেন। রাস্তায় আসিয়া তাহাদের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল।

বামাসুন্দরী এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—তাঁহার মনে মনে যদুনাথের উপর মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হইতেছিল। জামাতারা বাটী পরিত্যাগ করিবামাত্র তিনি মহা তর্জ্জন করিয়া যদুনাথকে বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই বাছাদের কিছু বলেছ,—নইলে তারা এমন ভাবে চলে যায়!"

যদুনাথ তখন বিছানার উপর চৌদ্দপোয়া হইয়া ছিলেন, গম্ভীর ভাবে এক হস্ত পরিমাণ জিহ্বা বাহির করিয়া বলিলেন,—"দেখ বিড়ম্বনা, আমি কিছু বলিতে পারি? জামাই নারায়ণ!"

বামাসুন্দরী বিহ্বলের ন্যায় স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যদুনাথ উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,—"সুধা,—একটা বড় দেখে কল্কে দিয়ে যা মা!"

বিধিলিপি।

(১)

ছেরা জাতিতে বেদিয়া। নীলা নদীর মোহনার কাছে তার কুটীর খানি!

সংসারে তাহার থাকিবার মধ্যে এক দেলা! দেলা দেখিতে ঠিক বেদিয়ার ঘরের মেয়ের মত নহে। মলিন ছিন্ন বস্ত্রের ভিতর দিয়া তার যে এক অপরূপ রূপ ফুটিয়া বাহির হয়, তাহার দিকে চাহিয়া ছেরার মনে হয় যে সে যেন এমনি মধুর রূপরশ্মি একদিন প্রভাত গগনে দেখিয়াছিল ;—তখন ছেরা দেলাকে দেখেও নাই! দেলার অযত্ন শিথিল কবরীর প্রতি দৃষ্টি পড়িলে ছেরার মনে হয়, একদিন সায়াহ্ন গগনে সে এমনি একখণ্ড মসীকৃষ্ণ মেঘ ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছিল। দেলার নয়ন যুগলে এমন কি গভীর নীলিমা সে দেখিত, সে নিজেই বুঝিত না যে কেমন এ নীলিমা। যেদিন বসন্ত প্রভাতে মেঘমুক্ত আকাশের প্রতি সে দৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাও ত এত গভীর নীল নহে! ছেরা দেখিল, এক দেলাই তাহার অনন্ত,—আকাশে বাতাসে, কুঞ্জে, কাননে, প্রভাতে, প্রদোষে, ফুলে, জলে, যেখানে যা কিছু আছে, এক দেলাতে তার সব আছে। একদিন দেলা বলিল ছেরা, এ কুড়েতে আমরা এখন কি করে থাকি বল? ছেরা বড় আগ্রহে উত্তর দিল, দেলা, তুমি যে একাই আমার সব। ছেরার মুখে যে অপার্থিব আনন্দের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল তাহার প্রতি চাহিয়া হাস্যময়ী দেলা জগৎ ভুলিয়া গেল!

ছেরা সারাদিন এদিক সেদিক সাপ নাচাইয়া যখন শ্রান্ত দেহে ঘরে ফিরিয়া আসে, যখন একবার দেলার হাস্য-পুলকিত মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখে, তখন তাহার শ্রম ক্লান্তি কিছুই মনে থাকে না!

উষার আলো ভাল করিয়া না ফুটিতে ফুটিতে, কাননে বিহগকুল নিদ্রালস কণ্ঠে সুর না ধরিতে ধরিতে, দেলা ঘুম হইতে উঠিয়া ছোট কুড়ে ঘর খানিকে রোজ পরিস্কার করিয়া ফেলে! তারপর চুপ করিয়া নীলা তটে বসিয়া থাকে! নীলা কেমন কুলু কুলু করিয়া বহিয়া যায়! ছোট ছোট তরঙ্গগুলি দুরন্ত ছেলেমেয়ের মত কেমন হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়! নদীর পরপারে গাছের ছায়ায় আলোক আঁধারে কেমন জড়াজড়ি করে!

বেলা উঠিলে ছেরা ঘুম হইতে উঠে; হাত মুখ ধোয়, এক ছিলিম তামাক সাজিয়া লইয়া দেলার পার্শ্বে আসিয়া বসে! দেলা তাহাকে দেখায়, ওপারে গাছের মাথা ঠিক আগুণের মত লাল! ও কালো মেঘের মাথায় অমন সোনালি রঙ কেন? ধীরে ধীরে ও সব মেঘ কোন দেশে যায়? ঐ যে ২টা কালো পাখী উড়ে যায়, আমি বল্‌তে পারি ও কি পাখী—ও ময়না! ঐ যে হলদে পাল দিয়ে নৌকা খানি যায়, ওখানা তত বড় নয়, সেদিন যে একখানি সাদা পালের নৌকা এসে ছিল, হাঁ বড় বটে সেখানা! এইরূপ কত কি বলে! ছেরা হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কথাগুলি শুনে, আর মধ্যে মধ্যে "হাঁ না" করিয়া দু'একটা কথার জবাব দেয়, আর তামাক টানে!

বেলা ৪দণ্ড হইলে ছেরা সাপ লইয়া বাহির হয়, আর বেলা গড়িয়া গেলে অবশ দেহে আলস্যমধুর শ্রান্ত-চরণে ছেরা আসিয়া কুড়ে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পড়ে। হাস্যময়ী দেলা একছিলিম তামাক সাজিয়া লইয়া কলিকাতে ফুঁদিতে দিতে আসিয়া দাঁড়ায়। ছেরা হাঁ করিয়া দেলার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে! তারপর ছেরা স্নান করিয়া আসে, দেলা তাহাকে পাশে বসিয়া খাওয়ায়; পরে সেই পাতে নিজে বসিয়া খায়! ছেরা ততক্ষণ একছিলিম তাম্রকূটের সৎগতি করিতে থাকে!

ছেরা একটী মাদুর বাহিরে গাছের তলে বিছাইয়া লইয়া শুইয়া পড়ে, আহারান্তে কাজ কর্ম্ম সারিয়া দেলা আসিয়া নিদ্রিত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া থাকে! স্তিমিত তপন যখন তাহাদের কুড়ে ঘরখানির পশ্চাতে রক্তরাঙ্গা গগনে ঢলিয়া পরে, তখন ছেরা নিদ্রালস নয়ন যুগল মেলিয়া দেখে—দেলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে! ছেরা চক্ষু চাহিতেই, দেলা উঠিয়া যায়, একসিলিম তামাক সাজিয়া আনে; তারপর দুইজনে হাসি গল্প করিতে থাকে। সে গল্পের অনেকটা এই গোছের! দেলা বলে—আজ কোন পাড়ায় সাপ নাচাইতে গিয়াছিলে? ছেরা বলে—সেই উত্তর পাড়া! আজ যে সে একটা কাণ্ড হ'ল দেলা, কি আর বলব। ছোটবাবুর বাড়ীতে সাপ নাচান আরম্ভ হ'ল, আমার সে "চন্দ্রমণি" যখন ফণা ধ'রে ফোঁস করে উঠল, তখন এক বেটী বুড়ী ত একেবারে অজ্ঞান!

দেলা বড় সহানুভূতিতে বলে, আহা সে ভবে ভাল হয়েছে?

ছেরা বলে—সে অত খবর কে রাখে? আচ্ছা ওবেলা কি রাঁধবে দেলা?

দেলা বলে—এবেলার ডুগাছি শাক আছে, শুধু চারটি ভাত রাঁধব আর কি!

তারপর তখন সন্ধ্যার ধূসর ছায়াটা নীলার বুকের উপর দিয়া আসিয়া তাহাদের কুড়ে ঘর খানিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন দেলা উঠিয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া যায়! ছেরা বসিয়া গান ধরে।

আহারের পরে গভীর রাত্রে ছেরা বাঁশের বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করে। কি মধুর সে বাঁশীর স্বর—দেলার ক্ষুদ্র বুকখানি যেন একেবারে কানায় কানায় ভরিয়া উঠে! সে বাঁশী শুনিতে শুনিতে আবেশে বিভোর হইয়া কখন যে সুখের কোলে গা ঢালিয়া দেয় তাহার বিন্দু বিসর্গও সে জানিতে পারে না। তখন ছেরা বাঁশী রাখিয়া বড় আদরে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লয়।

এই ভাবে সুখী দম্পতির দিন যায়!

(২)

সে দিন তুমুল ঝড় উঠিয়াছে। ভীম তরঙ্গমালা নীলার বক্ষখানিকে বড়ই চঞ্চল করিয়া দিয়াছে। দেলা কুড়ে ঘর খানিতে বসিয়া রহিয়াছে—একা! বেলা ডুপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে—ছেরা তখনও ফেরে নাই! দেলার স্বভাব সুন্দর মুখখানিতে একটা মলিনতার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে! একে ভীষণ ঝড়, বাতাসের কি ভয়ঙ্কর শব্দ, কুড়ে ঘরখানি পতনোন্মুখ গাছের মত ডুলিতেছে, তার উপর ছেরা কোথায়? এই ঝড়ে সে যদি পথে কোথাও থাকে! দেলার ইচ্ছা হইল সে ছুটিয়া গিয়া ছেরার তালাস করিয়া আসে! কিন্তু তাইবা কি করিয়া হয়, বাহিরে যে ভয়ানক ঝড়—বৃষ্টি! ভয়ে দেলা চক্ষু মুদিল। এমন সময়ে দরজায় কাহার করাঘাত হইল। দেলা ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, ভাবিল ছেরা আসিয়াছে; কিন্তু খুলিতেই কে একজন ঘরে প্রবেশ করিল। দেলা দেখিল—এ ছেরা নহে!

যে আসিল তাহাকে বড় বিপন্ন বলিয়াই বোধ হইল, তাহার সামান্য পরিধান বস্ত্রখানি সম্পূর্ণ সিক্ত এবং স্থানে স্থানে ছিড়িয়া গিয়াছে; 'সে বলিল —ঝড়ে আমার নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে, ঝড় থামিলেই আমি যাইব, মা!

মা এই একটি কথার মধ্যে দেলার মাতৃত্ব ফুটিয়া উঠিল। তাহার বড় ডুঃখ হইল! তাহার আরও মনে হ'ল হয়ত ছেরা এখন কোথাও বৃক্ষতলে বসিয়া ভিজিতেছে হয়ত! যতই সে ভাবিতে লাগিল, আগন্তুকের প্রতি সহানুভূতি তাহার ততই যেন বেশী বাড়িয়া যাইতে লাগিল! দেলা একখানি কাপড় সেদিন ক্ষার দিয়া পরিষ্কার করিয়া ছিল, ভিজা কাপড় দেখিয়া সে সেইখানি বাহির করিয়া দিল!

আগন্তুক কাপড়খানি পরিয়া বলিল—মা তুমি রক্ষা করলে, তোমার মঙ্গল হউক!

বাহিরে কড় কড় শব্দে কয়েকটা বাজ পড়িল। দেলা চমকিয়া উঠিল হায় হায় যদি ছেরা এখন বাহিরে থাকে!

বাদলের দারুণ শীতের মধ্যেও দেলা কপালের ঘাম মুছিল!

(৩)

ঝটিকার গতি আরও বাড়িয়া চলিল; দেলার প্রাণ ক্রমেই আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল! ছেরা এখন কোথায়? এই ঝড়, বৃষ্টি, দেলাইত আজ তাহাকে জোর করিয়া পাঠাইয়াছে, আজ ত ছেরা বাড়ী হইতে যাইতে চাহিয়াছিল না। দেলা ভাবিল হায়! কেন আমি তাহাকে আজ সাপ নাচাইতে এমন জোর করিয়া পাঠাইলাম! না হয় এক দিন উপোস করিতাম!

এমন সময় আবার দুয়ারে করাঘাত হইল, বাহির হইতে ডাকিল দেলা!

দেলার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এ যে ছেরার কণ্ঠ। তারই ছেরা আসিয়াছে। দেলা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল, ছেরা ঘরে প্রবেশ করিতেই সে ছুটিয়া ঘরের এক কোণে গিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই ছেরা দেখিল কে একজন অপরিচিত লোক তাহারই ঘরখানি জুড়িয়া বসিয়াছে। একেত সারাটা পথ ঝঞ্জা বিদ্যুৎ মাথায় করিয়া ভিজিতে ভিজিতে আসিয়াছে; তাহার উপর সারা দিনের উপবাস, ছেরার মাথা আর ঠিক রহিল না; তাহার মনে বড় সন্দেহ হইল—সে এক ভীষণ সন্দেহ, প্রসাদীফুলের মত দেলার পবিত্র অমল চরিত্রের উপর সে এক বড় দারুণ সন্দেহ করিয়া বসিল। সে ভাবিল দেলার মুখখানিতে ঠিক পূর্ণিমার ভরা চাঁদ, এ লোকটাও দেখতে বেশ! তার পরিধানে তারই দেওয়া দেলার বড় সাধের কাপড় খানি! সন্দেহ যখন একবার বুকে স্থান জুড়িয়া লয়, তখন সকল বিষয়ে একটা না একটা কিছু সন্দেহের আবছায়া আসিয়া উপনীত হয়, ছেরা ভাবিল, এইজন্যই দেলা আমাকে এত জেদ করিয়া আজ ঘরের বাহির করিয়া ছিল, আর আমি আসিয়া পড়িয়াছি, সে ধরা পড়িল, তাই আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া সে ঘরের কোণে স্থান লইল! সে আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিল না, দরজার পার্শ্বে একটি চুল্লি! এক খানি অর্দ্ধ দগ্ধ কাষ্ঠ সেখানে পড়িয়াছিল। ছেরা সাপের ঝাপিটা মাটিতে ফেলিয়া দিল, সেই কাঠখানি তুলিয়া লইল। দুই হাতে ধরিয়া সে আগন্তুকের মাথায় গায়ের সবটুকু শক্তির সহিত একটি ঘা বসাইয়া দিল। একটা বিকট চীৎকার করিয়া লোকটা মেজের উপর পড়িয়া গেল! রক্তে ঘর ভাসিয়া গেল। দেলা ছুটিয়া আসিয়া বলিল—একি ছেরা—একি।

উন্মাদিনীর মত দেলা লোকটিকে ধরিয়া বসিল। ছেরার মাথার ভিতর দিয়া আগুন যেন দ্বিগুণভাবে জ্বলিয়া উঠিল। গম্ভীর কণ্ঠে কহিল দেলা, সরে আয়! দেলা ভীত চকিত ভাবে উঠিয়া আসিল, সমস্ত শরীরও মনের বল যেন তাহার কোথায় চলিয়া গেল।

বাহিরে অবিশ্রান্ত ঝড়ের গতি যেন আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ছেরা সেই রক্ত রঞ্জিত চৈতন্যহীন দেহটি টানিয়া লইয়া নীলার জলে ভাসাইয়া দিল। তারপর ছুটিয়া ঘরে আসিয়া বলিল—কুলটা!

এতক্ষণ দেলা কি ভাবিতেছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতে ছিল না। ছেরা যখন বলিল 'কুলটা' তখন তাহার বুকটা দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দলিতা ফনিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল ছি ছেরা—চুপ!

ছেরার প্রাণে বিষের প্রবাহ, সে বলিল কি—কুলটা!

দেলা করুণ নয়নে ছেরার দিকে চাহিয়া "বলিল আমায় অন্যায় সন্দেহ করো না, ছেরা!

বাহিরের বজ্রনাদের চেয়ে কর্কশ কণ্ঠে ছেরা বলিল "চুপ!" ছেরার নয়নে বিদ্যুতের মত তেজ, দেলা সে দিকে আর চাহিতে পারিল না। তাহার দেহ অবশ হইয়া আসিতে ছিল; ছেরা আবার যখন ডাকিল 'কুলটা,' তখন দেলা আর কিছুই শুনিতে পাইল না, মেজের উপর পড়িয়া গেল। ছেরা সে দিকে দৃকপাতও করিল না।

(৪)

দেলা চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সে সেই মেজের উপর পড়িয়া রহিয়াছে; ধীরে ধীরে সে উঠিয়া বসিল। তাহার প্রাণে আর সুখ কোথায়? ছেরা তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছে যে ছেরাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে; যাকে ছাড়া সে কিছুই জানে না, সেই ছেরা তাহাকে অবিশ্বাস করিল! সে কাঁদিয়া ফেলিল।

মেজের উপর একটা মাদুর পাতিয়া ছেরা শুইয়াছিল, দেলা ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল! তখন ঝড় থামিয়া গিয়াছে, ভাঙ্গা বেড়ার ভিতর দিয়া বাহিরের অপর্য্যাপ্ত জোছনার আলো বেশ উপলব্ধি করা যায়! দেলা চাহিয়া দেখিল, সেই চিরপ্রিয় বাঁশের বাঁশীটি ছেরার পায়ের চাপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দেলা অতি সন্তর্পণে ছেরার পায়ের তল হইতে সেই বাঁশীটি তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল!

অনেকক্ষণ ছেরার পায়ের কাছে বসিয়া রহিল; পর্ব্বত-বাহিনী তটিনীর মত খরস্রোতে তাহার দুনয়নে অশ্রুধারা বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। তারপর সে তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল! ঝটিকার পর নীলা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, দেলা একেবারে নদীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার শুধু তাহার বড়প্রিয় কুটীর খানির দিকে চাহিয়া লইল—একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস বক্ষপিঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। তার-পর উন্মাদিনীর মত নীলার জলে ঝম্প-প্রদান করিল। জলটা একটু আলোড়িত-হইয়া আবার শান্তভাব ধারণ করিল।

*　　*　　*　　*

পরদিন প্রভাতে সূর্য্যের কিরণ যখন কুটীরখানিকে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে, তখন ছেরা বাহিরে আসিয়া দেখিল নদীর পরপারে দেলার মৃতদেহ

চড়ায় ঠেকিয়া রহিয়াছে ! ছেরা কুটির খানিতে আগুন ধরাইয়া। তারপর. পরপারের দিকে চাহিয়া ডাকিল—দেলা !

আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনি-কাঁদিয়া-গাহিল—দেলা !

মনের মুখোস।

[লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল]

(১)

মোক্ষদার রঙ্গিলা স্বরে ভরাট তর্ক জমাট বাঁধিবার মুখেই বন্ধ হইয়া গেল। পালতোলা নৌকা ভরা গাঙ্গে তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছিল হঠাৎ যেন চড়ায় ধাক্কা খাইয়া একেবারে বালির ভিতর বসিয়া গেল। পলকে পাঁচ ছয় জোড়া বিস্ময়মাখা আঁখির চখের কালো কালো তারা মোক্ষদার দিকে ঠিকরাইয়া গিয়া যেন কৌতূহলে দুলিতে লাগিল। বেঁটে ঘোষ একেবারে লাফাইয়া উঠিযাছিল ; সেই সর্ব্বাগ্রে মোক্ষদাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, "এ আকাশের সুখতারা ছাদের ওপর কেন বাবা, এটীকে আবার কোত্থেকে নিয়ে এলে মোক্ষদা ?"

বেঁটে ঘোষের কথায় মোক্ষদার দেহটা যেন ভাবে রাঙ্গিয়া দুলিয়া উঠিল। তাহার অনেক দিনের শিক্ষিত আঁখি একবার বেশ রকমফের নাচ দেখাইয়া দিল। মোক্ষদা মেসের ঝি,—তাহার বয়স যতই বাড়ুক ; কিন্তু চটক কিছুতেই কমিতে পারে না। সে পরিত—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কস্তা পেড়ে শাড়ী, তাহার নীচে-হাতের রৌপ্য নির্ম্মিত সরু সরু চুড়িগুলি একটা বেশ ভাবের সুরে সর্ব্বদাই ঠুন্ ঠুন করিয়া বাজিত. তাহার উপর হাতের নিরেট গিনি সোণার পাঁচ ভরিয় তাগা সমস্ত দেহটাকে গরবে ফুলাইয়া মাটিতে পা ফেলিতে দিত না। তাহার কেশের বাহারও বড় কম ছিল না। সে প্রত্যহই নূতন নূতন রকম খোপা বাঁধিত। কিন্তু তাহার সেই চটকদার খোপা দেখিত যে কে, তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। মেসের বাবুদের তাহার সেই বাহারদার খোঁপা দেখাইবার জন্য তাহার চেষ্টার কোনরূপ গাফিলি ছিল না। বাবুদের সম্মুখে আসিলে প্রায়ই তাহার মাথার কাপড় সরিয়া যাইত, ঘোমটাটা যে আবার টানিয়া মাথার উপর দিতে হইবে. সে বিষয় বড় একটা তাহার স্মরণ থাকিত না। মোক্ষদার মুখে হাসি ছাড়া কথা ছিল না. সে নিজেও যেমন হাসিতে ভালবাসিত ; তেমনি অপরের হাসির কদর, বুঝিত। বেঁটে ঘোষের কথায় মোক্ষদার রঙ্গিন স্বর একেবারে রঙে গাঢ় হইয়া বাহির হইয়া আসিল, "বাবু আমরা গরীব বলে কি অমন তামাসা কর্ত্তে আছে। দেশে খাওয়া পরার কষ্ট, তাই এখানে নিয়ে এসেছি।"

যাহার আগমনে ভরাট তর্ক জমাট বাঁধিবার মুখেই বন্ধ হইয়াছিল সেটী

একটী বালিকা। মোক্ষদা তাহাকে কোথা হইতে লইয়া আসিল, মোক্ষদার সে কে, ভরা সন্ধ্যায় মেসের বাড়ীতে এমন সুন্দর অপরূপ বালিকা কেন আসিল প্রভৃতি জানিবার জন্য কৌতূহল মেসের এই বিখ্যাত মাতব্বরগণের মনে এমনি একটা বিভ্রাট বাধাইয়া দিয়াছিল যে অমন তর্ক ছাড়িয়া সকলকে নীরব হইতে হইয়াছিল। বেঁটে ঘোষ মোক্ষদার কথা শেষ করিতে দিল না, অর্দ্ধ পথেই তাহাকে বাধা দিয়া একবার মাত্র তীব্র দৃষ্টিতে বালিকার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিল। বালিকার পরিধানে একখানি অর্দ্ধ মলিন ডুরে কাপড়; কিন্তু সেই মলিন কাপড় তাহার রূপের জ্যোতি ঢাকিতে পারে নাই। সে রূপ চাপা থাকিবার নয়, তাহা বালিকার সমস্ত অঙ্গ হইতে বাহির হইয়া জগতের সমস্ত চক্ষুর সম্মুখে যেন ছড়াইয়া পড়িতেছে। যে রূপ পুণ্যের দীপ্ত লইয়া ফুটিয়া পড়িয়াছে, তাহা কি আর চাপা থাকে? তাহার সরল মুখখানিতে ভাসা ভাসা কালো চক্ষু দুইটী যেন শান্ত স্নিগ্ধ গভীর ঝরণার ভিতর ডুবিয়া রহিয়াছে। মস্তকোপরি কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশি তৈল বিহনে জট নামাইয়া আলুথালু ভাবে পৃষ্ঠে গণ্ডে লুটোপুটি খাইতেছে। বিস্ময়ের তাড়নায় ঘোষ আর একটু হইলেই মোক্ষদার হাত ধরিয়া ফেলিয়াছিল আর কি, কিন্তু খুব সামলাইয়া লইল; তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "মোক্ষদা আমি তোমার গা ছুয়ে বলছি, এর ভেতর তামাসার "তা" পর্যান্ত নেই—যা একেবারে পাকা খাটী কথা, তাই বলছি। এ যদি তোমার সত্যি ভাই ঝি হয়, তা'হলে তোমার ভাই ঝি সত্যই পরমাসুন্দরী।

মোক্ষদা গালে হাত দিয়া বেশ একটু নাকি সুরে আরম্ভ করিল, "ওমা ঘোষ বাবু বলেন কি গো! বাবুরা, আমি কি আপনাদের সামনে মিছে কথা কইতে পারি? এই তো এতদিন আপনাদের এখানে কাজ কর্চ্ছি ও কলঙ্ক আমাকে কেউ দিতে পারে না! কারুর সাধ্যি নেই যে বলে মোক্ষদা মিথ্যেবাদী। অদৃষ্টে ছিল তাই স্বোয়ামী মরে গেল, নইলে আমার অভাব কি? দেশে আমার মা বাপ, ভাই, ভায়েরবৌ, ভাইপো ভাইঝি এক ঘর লোক। বরাতে ছিল, তাই পোড়া পেটের দায়ে দশ জনের সক্‌ড়ি মুক্ত কর্ত্তে হচ্ছে?"

ভোলানাথ খুড়ো সকলেরই খুড়ো। এই ছোকরাদিগের মেসের ভিতর তিনি তাঁহার পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর বয়স লইয়াও বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকের চুল অর্দ্ধেকের উপর পাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত রসের কিছুমাত্র কম নাই। জারক নেবুটির মত তিনি যেন সমস্ত মেসবাসীর অরুচির রুচির মত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এতক্ষণ তিনি এক পার্শ্বে বসিয়া একট আবলুসের নলেতে সংযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ অতি সুশ্রী হুকায় তাম্রকুটে মন মজাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে মুখ হইতে ধোঁয়া ছাড়িতেছিলেন। আর মাঝে মাঝে ভরাট তর্কের ফাঁকে ফাঁকে এক একটা খাটী পুরাতন পাকা বোল ছাড়িয়া হাসির রোলে সমস্ত দেহটাকে বেশ সরগরম করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তিনিও হাতের হুকা হাতে ধরিয়া হা করিয়া মোক্ষদার কথা গুলো শুনিতে ছিলেন। মোক্ষদা নীরব হইবামাত্র তিনি মোক্ষদার মুখের দিকে চাহিয়া মাথাটা বার দুই নাড়িয়া বেশ একটু মোলায়েম স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোর ভাই ঝি,—অ্যাঁ—সর্ব্বনাশ! তা হলে এত সকাল সকাল কল্‌কাতায় আন্‌লি কেন? দেখো গেরো—এটিকে একেবারে গৌরীদান কর্‌বি মনস্থ করে, তাই এই ছোড়াগুলোর মাথা খেতে এই বাসায় এনে হাজির করেছিস্ বুঝি!"

মোক্ষদা মুখটা সিট্‌কাইয়া একেবারে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "খুড়ো মশায়ের কোন ঢাক্ ঢাক্ নাই। কি যে বলেন তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। গরীব বলেই কি যা তা বল্‌তে হয়! আয়রে খুঁদি, আমরা নীচে যাই?"

খুঁদি তাহার সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক পিসির অঞ্চল ধরিয়া হেট মুণ্ডে দাঁড়াইয়াছিল, পিসির কথায় সে একবার মাত্র চকিতে পিসির মুখের দিকে মুখ তুলিয়া আবার মুখখানি নীচু করিল। শরৎ-সন্ধ্যাকাশের নির্ম্মল চাঁদের মৃদু হাসি চকিতে সে মুখখানির উপর একটা নূতন খেলা খেলিয়া সমস্ত ছাদটায় যেন একটা মায়া বিস্তার করিয়া দিল। হরিশ একেবারে কশাহত তাজা ঘোড়ার মত লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "একথা বলা খুড়োর একেবারেই অন্যায়। মেসে ঝিগিরি কচ্ছে বলেই যে তাকে চরিত্রহীনা হতে হবে, এ হতেই পারে না—এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। ওর ভাইঝি সম্বন্ধে কোন কথা বলাই আমাদের ঘোরতর বেয়াদবী! স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা আমরা বুঝিনি, রাখিনি, জানিনি তাই আজ আমাদের এত অধঃপতন? ঝি-এর ভাইঝি যখন, তখন সে আর একটা মানুষই নয়—সে একেবারে দশ জনের খেলার পুতুল। খুড়ো তোমার আমারও যে ভগবান ওই কালো ডুরে কাপড় পরা মেয়েটারও আত্মায় সেই ভগবানই আছেন। ভক্তি না কর তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু তা বলে তুমি তাকে অশ্রদ্ধা কর্ত্তে পারো না। অদৃষ্টের কথা কেউ বলতে পারে না; হয়ত ওর সঙ্গে একজন রাজার ছেলের বিয়ে হতে পারে।

দম দেওয়া ফনোগ্রাফের মত চড় চড় করিয়া এই লম্বা বক্তৃতা দিয়া হরিশ যেন হাঁপাইতে লাগিল। হরিশের গর্জ্জনে খুড়ো একেবারে থ হইয়া গিয়াছিলেন, এতক্ষণে একটু ফুরসুত পাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাবা হরিশ, তুমি বাবা একটু থামো।"

তাহার পর মোক্ষদার দিকে ফিরিয়া ঘাড়টা তুলিয়া বলিলেন, "মোক্ষদা, আমার মাথা খাবি, আমার মরা মুখ দেখবি, যদি আমার ওপর রাগ করিস। বুড়ো সুড়ো মানুষ, বেফাস কথা দুই একটা বেরিয়ে যেতে পারে; তা'বলে কি তুই রাগ করবি! মোক্ষদা সবই ত জানিস? বল্, কার ভরসায় এই বুড়ো বয়সে এই মেসে পড়ে রইছি! তুই রাগ কল্লে কি আর আমি এখানে এক তিল তিষ্ঠুতে পারবো।

খুড়োর কথায় মোক্ষদা রংএর হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, "সে কি কথা,

আপনি হলেন খুড়ো, আপনার উপর কি রাগ হয়? আপনি শুধু শুধু মাথা খাওয়ালেন, মরা মুখ দেখালেন?"

খুড়ো হুকাটায় কয়েকটা টান দিয়া বলিলেন, "মাথা খাইয়েছি না হয় সন্দেশ খাওয়াচ্ছি, মরা মুখ দেখিয়েছি না হয় সুন্দর মুখ দেখাচ্ছি; মোক্ষদা তোকে বল্‌বার কিছুই নেই; শুধু তুমি একটু সদয় থেকো?"

ঘোষ দাঁড়াইয়াই ছিল সে খুড়োর দিকে হাত দুইটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "চুপ, খুড়ো চুপ! গ্রন্থকার কবি মশাই আসছেন।"

ঘোষের কথায় সকলেরই দৃষ্টি ছাদের সিঁড়ির দিকে পতিত হইল। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "এস, এস, বিনয় চন্দ্র এসো, আধ আচরে বসো।"

যাহাকে একেবারে সকলে মিলিয়া সমস্বরে সম্ভাষণ করিয়া উঠিল, সেও একটী যুবক। বয়স চব্বিশ পঁচিশের উর্দ্ধে কোন মতেই নহে। সবে মাত্র গোঁপের রেখা দিয়াছে! তাহার দেহের লাবণ্য নম্র অথচ উজ্জ্বল। স্বভাবের সুকৌমার্য্য ও বুদ্ধির প্রখরতা তাহার মুখশ্রীতে বেশ একটা বিশিষ্টতা প্রদান করিতেছে। বিনয় তখন তাহাদের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। ঘোষ হাতটা বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, গ্রন্থকার এইবার একটা খাটি সত্যকথা শুনতে চাই, এটি হলেন আমাদের মোক্ষদার ভাইঝি, দেখ দেখি একবার বেশ ভাল করে, এই মেয়েটার ভেতর কোন কবিত্ব আছে কি না।"

বিনয় চন্দ্রের দৃষ্টি এক্ষণে মোক্ষদা ও তাহার ভাইঝির উপর পতিত হইল। বালিকার মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহার মনে হইল বালিকার শিশু মুখের কালো চক্ষের পল্লব-ছায়াতে পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন এক অপরূপ নির্ম্মলতা লইয়া একেবারে কেমন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার অপরূপ রূপ, রূপ-সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িবার জন্য তাহার সমস্ত অঙ্গ ব্যাপিয়া উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র হাত দুইখানিতে কি যেন এক করুণা জড়িত, তাহা যেন পথ চলিতে অপরের হাত ধরিতে চায়, তাহার সেই কচি অঙ্গুলি গুলি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কাহারও মুটোর মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে। বিনয় বালিকার মুখের উপর যে একটী সৌন্দর্য্য দেখিল তাহা রংএর সৌন্দর্য্য নহে, গড়নের সৌন্দর্য্য নহে, তাহা অন্তরের গভীর সৌন্দর্য্য। বিনয় উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মোক্ষদা বিনয়ের উপর একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তবু ভালো যে বিনয় বাবুর ঘুম ভাঙ্গলো! বিনয় বাবু আমাদের কি ঘুমই ঘুমুতে পারেন। আমিত আপনার জন্য খাবার নিয়ে আপনাকে কত ডাকাডাকি করে ফিরে এলুম। অপনার না আজকে দেশে যাবার কথা?"

বালিকার রূপ-সমুদ্রে বিনয় চন্দ্র হাবুডুবু খাইতে ছিলেন, বেশ একটু গম্ভীর স্বরে মোক্ষদার কথার উত্তর দিলেন, "কথা তো দুশো রকম হয়, কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজ কি সব হয়? বাড়ী যাবার কথা হইয়াছিল বটে কিন্তু

সেটা ভাগ্যে আর ঘটল কই? এই সময় জিনিষটা, বুঝলে মোক্ষদা, এমনি বেয়াড়া যে কখন কি ভাবে চলে যায় মানুষের সাধ্যি কি যে বুঝে ওঠে!

মেসের অন্যান্য সকলের অপেক্ষা মোক্ষদা বিনয়কে একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিত,—কেন সে কথা মোক্ষদার অন্তরাত্মাই বলিতে পারেন। বিনয়ের কথায় সে যেন একটু মিহি স্বরে বলিল, তা যাই বলুন বাবু আপনি বড় কুড়ে। বাবা! এত ঘুম'ও মানুষে ঘুমুতে পারে? এখন চলুন নীচে, আমি আর আপনার জল খাবার কাহাতক আগ্‌লে আগ্‌লে রাখি?

মোক্ষদার কথার মধ্য-পথে ঘোষ আবার বাধা দিল, উচ্চৈস্বরে কহিল, "নাও—রাখ তোমার জল খাবার, দাঁড়াও আগে আমার কথাটার মীমাংসা হয়ে যাক। হরিশ যে লম্বা বক্তিতা করেছে, তাতে আমার খুব সম্ভব হরিশের প্রাণে একটু প্রেম এসে গেছে!"

হরিশের মুখখানা একেবারে লাল হইয়া গেল, সে ঘোষের দিকে একবার বিকট ভাবে চাহিয়া তীব্র স্বরে বলিল, "লেখা পড়া শিখে মানুষ যে এমন চাষার মত নীচ হয়ে যায় তা আমার কোন দিনও ধারণা ছিল না।"

হরিশের কথায় ঘোষ হা হা করিয়া একটা বিভৎস্য হাসি হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে হরিশের প্রাণের ভিতরটা কে যেন হামানদিস্তায় পিষিয়া দিল। ক্রোধে হরিশের বাক্য রোধ হইয়া গেল। সে মুখ খানা রীতিমত গম্ভীর করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। উত্তর দিল বিনয়, "প্রেম আশাটা যে খুব একটা বিচিত্র ব্যাপার তা নয়। প্রেম যখন আসে, সে ঠিক এই রকম এলো মেলো ভাবেই আসে, কবিতার মত সে কোন দিনই ছন্দের ভিতর দিয়ে, জ্যোতির ভিতর দিয়ে, হিসেব নিকেস করে আসে না। তাই কবি বলেছেন, 'প্রেম স্বভাব বিরাগী, সে যে পথের ধারে ধূলোর পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়, সেত বৈঠকখানার টীনের টবে আপনার ঐশ্বর্য্য মেলতে পারে না'।"

খুড়ো মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "যা বল্লে ভায়া বিনয়? কবি না হলে কি আর যে সে লোকে ও সব বোঝে! এই দেখ না, এত থাকতে আমার প্রেম এলো কি না শেষ মোক্ষদার ওপর?"

মোক্ষদা চোখ ঘুরাইয়া মুখ বাঁকাইয়া কেবল মাত্র বলিল, "মরণ আর কি! গা জ্বলে যায়!"

ক্রমশঃ।

গল্পলহরী

৫ম বর্ষ, | আষাঢ়, ১৩২৪ | ৩য় সংখ্যা।

ভাঙ্গা ও গড়া

(লেখক—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।)

(১)

বিনয়ের চাল-চলন, ধরণ-ধারণ সেকেলে রকমের হইলেও, লোক-টিকে সেকেলে বলা চলিতেই পারে না। একে ত তাহার বয়স তেইশের বেশী নয়, তার উপর মনের ভিতরটি এমন একটি নবীন-পল্লব-বর্ণে রঞ্জিত. যে তাহাকে কাঁচা বলাই অধিক সঙ্গত। সে চারিটি পাশ করিয়া ফেলিয়াছে, গাদা গাদা বই পড়িয়াছে, লোকে তাহা জানিত—শুধু সে কথা সেই জানিত না। সে ছোট একটি ছেলের কাছে বসিয়াও নানা গল্প শুনিত; বৃদ্ধা ঠান্-দিদিকে রূপকথার জন্য জ্বালাতন করিয়া মারিত—এমনভাবে লোকের সঙ্গে মিশিয়া যাইত যে, সে লোক যখন শুনিত, সেই সরল যুবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পাশ করা, তখন সে পুনরালাপের জন্য আদৌ ইচ্ছা করিত না, কিন্তু বিনয় তাহাকে ঠিক ধরিয়া বসিত।

বিনয়ের পিতা গৌরমোহন রায় সম্প্রতি রাশি রাশি কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া অন্য কোন লোকে প্রস্থান করিয়াছেন। বিনয় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, কনিষ্ঠ—সুজয়! সুজয় এফ, এ ক্লাসে পড়ে।

বিনয়ের মা বলিতেন—বিনয়ের শরীর ভালো নয়, তাহাকে কোন কাজ কর্ম্ম করিতেই দিবন না। কিন্তু বিনয় কাজের লোক হইয়াই জন্মগ্রহণ

করিয়াছিল, সে মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া পারিল না,—হঠাৎ সে গভর্ণমেণ্টে কাজ লইয়া বসিল—ডেপুটীগিরী।

মাতা কিছুমাত্র জানিতেন না, সংবাদ বহিয়া বিনয় হাসিমুখে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—তরলা তাহার মাতার নিকট বসিয়া আছে। বিনয় কোন কথা বলিবার আগেই তরলা বলিয়া উঠিল—"কিগো, নতুন খবর কিছু আছে না কি ?"

"আছে বৈকি" বলিয়া বিনয় অল্প একটু হাসিল। তাহার সুমুখে একখানা আয়না থাকিলে সে বুঝিত, তাহার সুন্দর মুখে হাসিটা কি বিশ্রী বেমানানই দেখাইল।

মা হাসিয়া বলিলেন—কি বল্‌বি বল্‌ না !

বিনয় অনুচ্চস্বরে বলিল—চাকরি কর্‌তে যাচ্ছি যে—মা !

কথাটা অবিশ্বাস্য আদৌ নয়, বিনয় বলিতেছে বলিয়া ! অন্য কেহ বলিলে বিশ্বাস হইত না। "অ্যাঁ" বলিয়া মা ছেলের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

তরলা আভাষেই বুঝিতে পারিয়াছিল, উঠিয়া বিনয়ের কাছে গিয়া বলিল—কি ক্ষেপামো করছ ! তুমি চাকরি নিতে গেলে কি দুঃখে ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বিনয়ের বিলম্ব হইল ; সে অবনতমুখে কহিল—কি দুঃখে নিলুম, তা জানি না। তবে নিয়েছি, এই দেখ—বলিয়া সে নিয়োগ-পত্রখানি তরলার সম্মুখে ধরিল। সেখানি নমিনেশন-পত্র। তরলা জিজ্ঞাসিল—কত মাইনে হল ?

"দু'শো।"

তরলা হাসিয়া বলিল—তোমার এ দুশো টাকায় সংসারের অনেক দুঃখ ঘুচবে—কি বল ?

বিনয় মার পানে চাহিয়া বলিল—মা, গভর্ণমেণ্টের কাজ নিয়ে আমি ফরিদপুর যাচ্ছি।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কাজ কি ?

বিনয় বলিল—ডেপুটিগিরী।

মা বলিলেন—কবে যেতে হবে ?

বিনয় বলিল—ও মাসের ১ লা।

তরলা দিন গনিয়া বলিল—আর দশদিন পরেই ?

"হুঁ, তাই"—বলিয়া বিনয় বাহির হইয়া গেল।

(২)

বিনয়ের মাতা যে এত সহজে পুত্রের বিদেশ গমনে কিরূপে সম্মত হইলেন, তরলা কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিল না। যে বিনয়ের শুধু কোম্পানীর কাগজের সুদ চারিহাজার টাকা মাসে মাসে আসে, দু'শো টাকা মাহিনায় বিদেশে তাহাকে যাইতে দিতে মা রাজী শুনিয়া তরলা একদিন তাঁহাকে বলিল—মা, বিনয় দা তবে যাচ্ছে ?

"যাচ্ছে বৈকি মা !"—আর কিছু বলিলেন না। চলিয়া গেলেন।

তরলাকে তাহার ছোট ভাই কমল ডাকিতে আসিয়াছিল, "দিদি বাবা ডাক্‌ছেন।"

তরলা তাহাকে বলিয়া দিল—"যা যাচ্ছি।"

বিনয়দের পাশেই তাহাদের বাড়ী। তরলার পিতা হেমবাবু সঙ্গতিপন্ন। উভয় পরিবারে খুবই ঘনিষ্ঠতা। দুইটি বাড়ীর বিভাগপ্রাচীরে একটি দ্বার আছে, সেই পথেই আনাগোনা চলে।

তরলা বিনয়ের ঘরে বসিয়া একখানা মাসিকপত্র উল্টাইতেছিল, হঠাৎ বিনয় আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। আস্তে আস্তে বাহির হইতে উদ্যত হইলে, বিনয় বলিল—একটু দাঁড়াও।

তরলা দাঁড়াইল। বিনয় বলিল—কোন কাজ আছে কি ?

"না।"

"তবে বস একটু—অনেক কথা বলবার আছে।"

তরলা না বসিয়াই বলিল—বল, আমি শুন্‌ছি।

"আমি যাচ্ছি তা শুনেছ, বিশ্বাস করেছ কি ?"

"করেছি।"

বিনয় কহিল—কেন যাচ্ছি, তার কারণ বোধ করি, আমি না বল্লেও বুঝেছ।

তরলা চুপ করিয়া রহিল। বিনয় বলিল—তুমি যদি আমার কাছে থাক্‌তে চাও, বল, তোমার বাবার মত আমি নিতে পারি।

তরলা নীরব। বিনয় বলিল—যাবে, তরলা ? আমার কাছে থাক্‌বে।

তরলা কথা কহিল, বলিল—তোমার কছে ? কেন ?—না! একটু থামিয়া আবার বলিল—না।

বিনয় ক্লিষ্টস্বরে বলিল—বেশ আর একটা কথার উত্তর চাই।

তরলা সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বিনয় কহিল—তরলা, আমার এমন কি দোষ পেয়েছ, যাতে তুমি ঠিক আমার সঙ্গে বিচারক আর অপরাধীর সম্বন্ধ দাঁড় করিয়েছ। এই দু'তিন মাস হ'তে আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি যেন আমাকে ছেঁটে বাদ দিতে চাও।

"বাদ দিতে চাই ?"

"তুমি যেন ঠিক ক'রে ফেলেছ, আমার সঙ্গে মেশা তোমার উচিতই নয়।"

"সেটা ত অন্যায় করিনি—"বলিতে বলিতে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বিনয় চুপ্ করিয়া একখানা সোফায় বসিয়া পড়িয়া চোখ বুঝিয়া রহিল। মনের ভিতরটি এমন অন্ধকার হইয়া আছে, যে বাহিরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকটাকেও যেন বেমানান দেখাইতেছিল বলিয়া সে চক্ষু বুজিল।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিলে পর, বিনয় উঠিয়া দ্বারের পর্দা সরাইয়া দাঁড়াইল। বারান্দা দিয়া সুজয় চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিল—তরলাকে ডাকতে পাঠিয়ে দেত রে! এসে একবার—

সুজয় বলিল—সে যে এখানে শুয়ে রয়েছে দাদা।

বিনয় বলিল—কোথায় রে ?

"এই যে—"বলিয়া সুজয় তাহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল। চটিজুতাটি পায়ে দিয়া বিনয় বারান্দায় আসিয়া দেখিল তরলা বারান্দায় খাটের উপর শুইয়া আছে। সে ডাকিল "তরলা!"

"বিরক্ত করো না, আমার অসুখ করছে।"

"কি অসুখ ?"

"জানি না।"

বিনয় চলিয়া গেল।

(৩)

বিনয় যেদিন ফরিদপুর যাত্রা করিল, ষ্টেশনে বাড়ীর সকলেই তাহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। বিনয়ের মা তরলাকেও ডাকিয়াছিলেন, সে আসে নাই, বলিয়াছিল, এ সব সাহেবী কায়দা সে মোটেই পছন্দ করে না। তাহার এই স্বাধীন মত শুনিয়া বিনয় এত বিহ্বল হইয়াছিল যে, সে অনিচ্ছা-স্বত্ত্বেও কয়েকবিন্দু অশ্রুত্যাগ না করিয়া পারে নাই। ট্রেন ছাড়িবার সময় তাহার জীর্ণ পাণ্ডুর মুখ দেখিয়া, মা বলিলেন—বিনু আমাকেও নিয়ে চল্ না বাবা, তোর কাছে থাক্‌ব।

বিনয় বলিল—সুজয়ের—

বাধা দিয়া মাতা বলিল—এখানে ত সবাই রইল, ও থাকবে'খন। আমায় নিয়ে যাবি?

বিনয় বলিল—বেশ, সেখানে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে আসি। আসচে মাসে নিয়ে যাব।

বাড়ী ফিরিয়া মা বিষন্নমুখে বিনয়ের ঘরে আসিয়া বসিলেন। কোন এক পুরাঙ্গনাকে ডাকিয়া তাঁহার সান্ধ্যাহ্নিকের আসন এইখানেই করিয়া দিতে বলিলেন। বাহির হইতে তরলা ডাকিল—মা কি ঘরে আছ।

"ভিতরে আয় তরলা!"

"আমার এখন যাবার যো নেই মা। রাত্রে আসব, কোন ঘরে শোবে?

"কেন—আমার ঘরে।"

"আমি তোমার কাছে শোব।" আর কিছু না বলিয়া সে চলিয়া গেল।

রাত্রে শয়নের পর বিনয়ের মা বলিলেন—হ্যারে তরলা, তোর বাবা ত খোকাকে নিয়ে মুস্কিলে পড়বে না? সে ত তোর কাছেই শোয়!

"না—মুস্কিল আর কি? সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিনয়ের মা তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তরলা নিঃশব্দে শুইয়া রহিল। মা ঘুমাইয়া পড়িলেন, তরলার ঘুম হইল না। সে কেবল ছট্‌ফট্‌ করিয়া পাশ ফিরিতে লাগিল।

তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—আজ সে কি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে! বিনয়কে এমন করিয়া আঘাত না করিলেও চলিত। সে ত কোন অপরাধ করে নাই। বিনা কারণে তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া ত কষ্ট সে নিজেই বেশী অনুভব করিতেছে, তবে কেন তাহার সহিত এমন নির্ম্মম ব্যবহার সে করিল।

বিনয় তাহাকে আজন্ম যে প্রীতির চক্ষে দেখিত, আজও তেমনই দেখে, একটু কম বা বেশী কখনো হয় নাই। নূতন করিয়া কোন কথাই বিনয় বলে নাই।

তাহার মনে পড়িল, সেই সাত বছরের ছোট মেয়েটি যেদিন এই বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিয়াছিল, করপুট পুরিয়া লজেঞ্জুস দিয়া বিনয় যেমন তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তেমনই সরল, তেমনই অপকট চিত্ত বিনয় তেমনই আছে। তাহার এতটুকু পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। তথাপি কেন তাহাকে সে এমন দূরে সরাইয়া দিতে চাহে!

বুকের মধ্যে স্পন্দন যেন সুর করিয়া বলিল—সে যে বিধবা! হিন্দু বিধবা!

তৃষ্ণায় ছাতি শুকাইতেছিল, একবিন্দু জলের আশায় প্রভাতের আগমন প্রতীক্ষায় সে দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে যাপন করিল।

(৪)

রৌদ্রে চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া, তরলা একখানি গীতা পড়িতেছিল। অর্জ্জুনের বিরুদ্ধমতকে শ্রীকৃষ্ণ মধুর তর্কে খণ্ডন করিতেছেন, পড়িতে পড়িতে তাহার মনে হইল, তাহার চিত্তের বিরোধিতা নষ্ট করিতে পারে, এমন তর্ক নাই কি? এমন লোক নাই কি?

তরলার বাবা আফিসে গিয়াছেন, তাঁহার নিজের একটী আফিস আছে, তাহার ছোট ভাই দুটিও সঙ্গে গিয়াছে, তরলা বাড়ীতে একেলা। ও বাড়ীতে আজ সে তিন দিন যায় নাই, একমাস পরে বিনয় পরশু বাড়ী আসিয়াছে।

এই বিনয়ের সঙ্গে একদিন তাহার এমন সম্পর্ক হইয়াছিল যে, স্রোতস্বতী নদীর মধ্যস্থলে বাঁধ বাঁধিলে সে যেমন কল্লোল কলরব তুলে; তাহাদের নৈকট্যে বাধা পড়াতে অন্তর যেন সেইরূপ গর্জ্জন করিতেছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীতে সেই সুখী, সময় যাহার শীঘ্র কাটে। আর দুঃখী সে, যে সময়ের ভারে পীড়িত হইয়া পড়ে।

তরলার মধ্যাহ্ন আর কাটিতেছিল না। গীতা বন্ধ করিয়া সে আলসে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক চলাচল দেখিতে লাগিল।

এমন সময় সুজয় আসিয়া ডাকিল—তরলা!

চকিতে তরলা ফিরিয়া বলিল—কেন?

দাদা তোমায় ডাকছেন।

কেন?

তা কিছু বলেন নি।

জিজ্ঞেস করে এস, কি দরকার!

আচ্ছা—

না, সুজয়, বলগে আমি যাচ্ছি।

সুজয় চলিয়া গেলে কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া তরলা কি ভাবিল, পরে গীতাখানি হাতে লইয়া ও বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

বিনয়ের ঘরের দ্বার মুক্ত ছিল, বিনয় সে দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, পথে তরলাকে দেখিবামাত্র দাঁড়াইল।

বলিল—এস তরলা।

তরলা ভাবিয়া আসিয়াছিল প্রফুল্লভাবেই সে বিনয়ের সমক্ষে আপনাকে খাড়া করিবে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বিনয়কে দেখিল, প্রফুল্লতা কোথায় চলিয়া গেল। রৌদ্র দীপ্ত আকাশটিকে যেন ধোঁয়াটে মেঘে ঢাকিয়া দিল। তরলা নতমুখে দাঁড়াইল।

(৫)

উত্তর দাও, তরলা!

কি?

যদি অপরাধই করে থাকি, বিবেচনা কর—ক্ষমা কর। সাজা দেওয়াই সরলতার লক্ষণ নয়—

ক্ষমা করা আরো দুর্ব্বলতার পরিচায়ক।

সকলের নয়। যার শাস্তি দেবার ক্ষমতা আছে তার পক্ষে হতে পারে।

কিন্তু—

আবার কিন্তু কেন, যা হয় শেষ করে দাও। আমি ইচ্ছা করি না যে, এমন করে' দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করি।

আমি ত যুক্তি তর্ক চাচ্ছি না। শুদ্ধ আমি জানতে চাই—

জেনে লাভ?

শুধু লাভালাভ ভেবেই কি দুনিয়া চলে?

যার না চলে সে দুনিয়া ছাড়া। হয় পাগল, নয়ত্ সে—তরলা একটু ইতঃস্তত করিয়া বলিল—নয়ত মূর্খ!

তর্ক আমি কচ্ছি না?

আমি!

ঠিক্।

তরলা হাসিয়া বলিল—আমি ত আর লজিকও পড়িনি; আর—

যেতে দাও, বস না—

বলিয়া বিনয় বসিল। তরলাও দ্বিধা না করিয়া বসিল।

বলিল—কতদিন থাকবে?

বিনয় বলিল—তোমার লাভ কি, তা জেনে?

ও ঠিক! তরলা গম্ভীর হইয়া রহিল।

বিনয় বলিল—মা আমার সঙ্গে যাবেন, তুমি যাবে তরলা? আর একবার নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম—

ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়। তোমাকে ভিক্ষা করা শোভা পায় না।

আমি প্রজা, রাজদ্বারে ভিক্ষায় সম্মান হানি হয় না।

তোমার নামটা রাখা ঠিকই হয়েছিল দেখ্‌ছি। অসময়ে ভিক্ষা চাইলে রাজারও ধৈর্য্যহানি ঘটে!

তবে সে রাজা নয়। তাঁর কার্য্য প্রজারঞ্জন করা—তবে সে রাজা। যাক্‌, যাবে তরলা? মা যাচ্ছেন।

মা যাচ্ছেন তোমার সম্পর্কে, আমি যাব —?

তুমি, তরলা, তুমি—

বাধা দিয়া তরলা বলিল—না, যাব না, শুধু তাই নয়, তোমার সঙ্গে এ জীবনে এই শেষ দেখা। শেষ কথা! সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

বিনয়ের মাতা ছাদে বড়ি তুলিতেছিলেন, বলিলেন কি তরলা, বিণুর সঙ্গে ঝগড়া করে এলি? আমার হ'য়ে একটু বল্‌ ত মা, কি দরকার বাপু, তোর দুশো টাকায়!

'তুমি বলগে—বলিয়া তরলা নিজেদের বাড়ীর দরজা বন্ধ করিল।

(৬)

মানুষ সব ঢাকিতে পারে, কিন্তু সময় সময় আপনাকে ঢাকিতে সক্ষম হয় না। তরলা আপনাকে দমন করিতে গিয়া এমন ধ্বংসের মূর্ত্তিতে নিজের ছায়া দেখিল যে তাহার মনে হইল, ধ্বংসের আর দেরী নাই। বহুদিন হইতে অসংস্কারে যে গৃহটী ভগ্নোন্মুখ হইয়া আছে, তাহার কড়ি কাঠগুলি খুলিয়া লইলে যেমন হয়, তরলাকেও ঠিক সেই রকম দেখাইল। কত বৎসরের ঝড় বৃষ্টি, বজ্র হানিয়া আকাশ সে গৃহের উপর দিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার যে ধ্বংস না হইয়াছিল, এই কড়ি কাঠগুলি খুলিতেই যেন সে জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল, তরলার ঠিক সেই অবস্থা। তাহার কড়ি কাঠগুলি যেন কে খুলিয়া লইয়াছে! অথচ সেগুলি কি এবং কে লইল তাহার কথা সেই জানে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা তাহার ভায়েরা গল্প শুনিতে চাহিল, ইহা তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্য, তরলা মাতৃহীন বালকদ্বয়কে জড়াইয়া কত গল্প বলিত। সে-সন্ধ্যায় আর পারিল না, বলিল ভাই, "বড় অসুখ করছে, কাল বলব।"

তরলা অশ্রুনিষিক্তস্বরে বলিল—তোমার দাদা—

সুজয় বলিল—তাঁরও যে আমারই মত হয়েছে, তরলা।

তরলা স্থিরকণ্ঠে বলিল—আমাকে নিয়ে যাবে, সুজয় ?

সুজয় বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

তরলা বলিল—বল ত, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

সুজয় বলিল—তুমি কি যাবে তরলা ?

"যাব—"বলিয়া সে উঠিল; যাইবার সময় বলিয়া গেল—আমি বাবার মত করছি, তুমি আজই যাবার যোগাড় কর।

তরলার পিতা সম্মত হইলেন, ছোট খোকা তরলার সঙ্গে চলিল।

ষ্টেশনে বিনয় নিজে দাঁড়াইয়াছিল; সে একটা মহকুমার কর্ত্তা—ষ্টেশনে সে পায়চারী করিতেছিল, অন্য যাত্রিগণ একটু দূরে দূরে বেড়াইতেছিল।

গাড়ী হইতে নামিবামাত্র বিনয় সুজয়ের হাত ধরিল। সমদুঃখী দুইটি হৃদয় একই বেদনায় অভিভূত, কেহ কোন কথা কহিল না।

বিনয় একটি ক্ষুদ্র সম্ভাষণও তরলাকে করিল না। তরলা তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু 'হয়ত বিনয়ের মনের অবস্থা সম্ভাষণ করার মত নাই—ভাবিয়া সে নিজেই এটা সারিয়া লইল। সে বাড়ীতে গিয়া প্রথমেই বিনয়কে বলিল কাচা নিয়েছ, আফিস আদালত করা চল্‌ছে ?

হাঁ—বলিয়া বিনয় অন্যত্র চলিয়া গেল।

তারপর, দশদিন কাটিয়া গেল, তরলা যে পথে চলিত, বহুক্ষণ বিনয়ের সে পথে পদস্পৃষ্ঠ হইত না। তরলার পক্ষে তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল, সে যখনই বিনয়ের কাছাকাছি পৌঁছিত, দেখিত বিনয় অতিক্রত কোথায় চলিয়া গেছে।

* * * *

বিনয় আদালত হইতে আসিবামাত্র তরলা তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—রাত্রের গাড়ীতে আমি বাড়ী যাব, গাড়ী—

বিনয় বলিল—আচ্ছা।

তরলা নড়িল না, বিনয় বলিল—চাপরাশীকে বলে দেব, সব ঠিক করে দিতে! বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সুজয় বলিল—তরলা তুমি আজই যাবে ?

হ্যাঁ।

কেন ?

তরলা একটু ভাবিয়া বলিল। খোকা কাঁদছে যে !

সুজয় চলিয়া গেল, তরলা খোকাকে কোলে লইয়া বাঙ্গলোর সম্মুখের বাগানে গেল। হঠাৎ শুনিল, বিনয় তাহাকে ডাকিতেছে।

সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

বিনয় আসিয়া বলিল—তোমার বাবাকে একখানা চিঠি লিখে রেখেছি চাপরাশী দেবে'খন, তাঁকে দিও, আর বলো যে যত শীঘ্র বাড়ীটার খদ্দের ঠিক হয় ততই মঙ্গল ; আর দরদামের কথার ভার তাঁর উপরেই দিয়েছি।

চিঠিতে লিখে দাও নি ?

দিয়েছি।—আর একটা কথা বলব কি ?

কি ?

এখানে থাকবার তোমার ইচ্ছা আছে ?

—না।

কেন ?

(৮)

তরলার পিতা অনেক কাগজ পত্র দেখিতে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার আস্তায় তরলা সম্মুখে বসিয়া আছে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

পিতা বলিলেন—তরল, একটা কথা অনেক দিন থেকে বল্‌ব বল্‌ব করছি—বলতে পারি নি ; আর না বল্‌লে চলে না।

তরলা বলিল—কিসের কথা বাবা ? আমার বিষয়ে কিছু ?

পিতা বলিলেন—হ্যাঁ তোমারই কথা।

তরলা বলিল—আমার আবার কথা কি বাবা !

"না, মা। অনেক কথাই আছে। গোপন করবার সময় উত্তীর্ণ হয়েছে, আর দরকার নেই। তুমি মন দিয়ে শোন—

"তুমি আমার কন্যা নহ, পালিতা—

"বাধা !"

"শোন, তোমার বাবা পশ্চিমে ছিলেন, কমিসেরয়িটে কর্ম্ম করে অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন, সেবার কলিকাতা এসে যখন তাঁর মৃত্যু হয়,

বড় ভাইটি কহিল—"কি অসুখ কচ্ছে দিদি ?"

তরলা তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া কহিল কি জানি ভাই, কি অসুখ, বড্ড মাথা কেমন করছে।

ভাই কহিল—"একটু টিপে দেব দিদি ?"

না মাণিক আমার! অমনি সেরে যাবে। তোমরা শুয়ে থাক—বলিয়া সে ভাই দুটিকে বাহুদ্বারা আগুলিয়া শয়ন করিল।

রাত্রে তরলার বাবা আসিয়া আহারে বসিলেন, তরলা প্রত্যহ সম্মুখে বসিয়া বাতাস করিত, আজ সে ছিল না—কোনমতে আহার শেষ করিয়া তিনি তরলার শয়ন কক্ষে গিয়া তরলাকে তুলিলেন।

তরলা কহিল, বড় অসুখ হয়েছে বাবা।

পিতা ব্যাকুল ভাবে কহিলেন—কি অসুখ, মা ?

জানিনে, বাবা। তোমার খাওয়া হ'য়েছে কি ? আজ আর তোমার খাওয়ার কাছে বসতে পারি নি—

'তা হোক্ গে, মা ; আমি খেয়েছি। ডাক্তার আনতে পাঠাব কি ?

দরকার নেই, বাবা। তুমি শোও গে যাও।

তিনবৎসরে মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছে, তদবধি তরলার পিতাই সব। মাতার যতখানি অভাব সংসারে হইয়া থাকে, পিতার দ্বারা তরলা সবটাই পূরণ করিয়া লইয়াছিল। তিন বৎসরের মধ্যে এমন একটি দিনও যায় নাই, যেদিন না সে পিতার সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াছে, আজ ব্যঘাত ঘটিয়াছে—ক্রন্দনবেগ সংবরণ করা তরলার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

(৬)

প্রাতঃকাল—ভৃত্য আসিয়া একখানি খামের চিঠি তরলার হাতে দিল। তরলার সেই সুপরিচিত হস্তাক্ষর, প্রিয় হস্তাক্ষর, একদিন যে হাতের লেখা পাইবার জন্য তাহার কত না উৎকণ্ঠা ছিল, আজ সে লেখা চিনিবামাত্র ভৃত্যের হস্তে ফেরৎ দিয়া বলিল—বাবাকে দিগে যা।

অল্পক্ষণ পরে বাবা অন্দরে আসিয়া বলিলেন—তরল, বিনয়ের মা আটদিন হল মারা গেছেন। বিনয় দুঃখ করে আমায় একখানা চিঠি লিখেছে।

তোমায় ?

এই দেখ—বলিয়া তিনি পত্র খানা তরলার হাতে দিলেন, শিরোনামা

তাঁহারই। তরলা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না, যে তাহার পত্রে কি লিখিয়াছে।

সে পিতার বহিকক্ষে গিয়ে দেখিল, টেবিলের উপর নির্ম্মুক্ত পত্র খানা পড়িয়া আছে, ভৃত্য যখন পত্র রাখিয়া যায় তখন তিনি সেখানে ছিলেন না। তরলা পত্র খানা খুলিয়া পড়িল। কয়েকবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া তাহার শ্বেত কপোলকে আরো শ্বেত করিয়া ফেলিল।

পত্রে লেখা ছিল—

কল্যাণীয়াষু,

আমার দুঃখে না হোক, তুমি আমার মাতৃবিয়োগে নিশ্চয়ই দুঃখানুভব করিবে, কেননা তুমি আমাদের দু'ভায়ের মতই মাতার স্নেহ-ভাগিনী ছিলে। মা মৃত্যুকালে অন্তরে বাহিরে তোমার কথা স্মরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তোমার বেদনা যে কিরূপ হইবে, আমি ভুক্তভোগী, বেশ বুঝিতেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তোমাকে তিনি সান্ত্বনা দিন।

মার সঙ্গে যখন সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে, তখন কলিকাতার সহিত আমার আর সম্পর্ক নাই, তুমিও নিঃসম্পর্ক।

শেষবার যখন তোমার দেখা পাই, সে সাক্ষাৎ বড় সুখের হয় নাই; আমি বুঝিয়াছি, তোমায় আমায় স্নেহ-সম্বন্ধ না থাকাই শ্রেয়ঃ। আমি তাহা ছিন্ন করিয়াছি, তুমিও করিও। তাহাতে কাহারো দুঃখ নাই।

একটা কথা, সুজয়কে যদি পার সান্ত্বনা দিও, ছেলে মানুষ সে। তাহাকে এখানে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছি।

প্রথম নয়, এ জীবনে আমার এই শেষ পত্র। কোন সম্ভাষণ করিবার অধিকার আমার নাই। ইতি

বিনয়।

তরলা চেয়ারের হাতল চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল! বক্ষস্থল মথিত করিয়া হাহারব উঠিতে লাগিল।

বাস্তবিক সে নিঃসম্পর্ক, সে কথা ভাবিতে তবে এত কষ্ট হয় কেন? বিনয় নিঃসম্পর্কীয়, বিনয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ সে ছিন্ন করিয়াছে—তবে একি ব্যথা!

(৭)

সুজয় কাঁদিয়া বলিল, আর সেখানে কি করতে যাব, তরলা। মা যে আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেছেন।

যখন বিরক্তি বোধ করিতে লাগিল, তরলা বলিল—তুমি আমাকে ডেকেছ কেন? কথাবর্ত্তা বাড়ীর সম্বন্ধে, বাবার সঙ্গে কইলেই ভাল হয়।

বিনয় বলিল—তা জানি!

তরলা বলিল—তবে!

বিনয় বলিল—আমার কিছু বক্তব্য আছে।

বল—বলিয়া তরলা বসিল—কি বলতে ইতস্ততঃ করছ কেন? ডেপুটি-গিরি না কি?

না, বলিয়া বিনয় হাসিল।

পরে বলিল—তরলা!

কি?—আমি নিষ্কর্ম্মা নই, বাড়ীতে অনেক কাজ আছে, যদি কিছু বলার না থাকে—

বলবার আছে, কিন্তু—

ভূমিকা কেন? বলনা! ভয় কি?

শুনবে? বল, মন দিয়ে শুনবে!

যদি না শুনি!

শুনতেই হবে। জীবনে একবার, আজ তোমার অবাধ্য হ'ব। তোমায় শুন্‌তে আজি বাধ্য করব।

তরলা হাসিয়া বলিল—এত জোর কেন?

বিনয় গম্ভীর ভাবেই বলিল—নইলে দেখলাম, অধিকার পাই না।

"অধিকার!"

রূঢ় বোধ করছ! বেশ ফিরিয়ে নিচ্ছি। সুযোগ বল্‌লেই যথেষ্ট হবে বোধ করি।

এখানে আমার একটা কিন্তু আছে যে।

কি? বল।

কিন্তু তোমায় একদিন বলেছি না, যে তোমার অবাধ্যতায় দূরে থাকাই শোভা পায়।

তখন আর এখন!

মানুষের মন একবার যা বলে—

একবার যা বলে ফিরিয়ে নিতেও পারে। যে মন গড়তে পারে সে আবার ভাঙ্গতেও পারে।

মন মাটির পুতুল নয়। গড়া ভাঙ্গা এত সহজ নয়।

শক্ত কাজ করতেও অনেকে অশক্ত নয়, তরলা। তুমি না পার, সে ভার আমার পরে দাও—তোমার ভাঙ্গা আমি গড়তে পারব। আমার পরে এ বিশ্বাস টুকু নিশ্চিন্তে ছেড়ে দাও। কি বল?

তরলা আপনাকে চেতাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। বিনয়ের উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত প্রত্যেক কথা এমন সজীব ভাবে তাহাকে নাড়া দিতেছিল যে সে নীরব না হইয়া পারিল না।

অসহিষ্ণু বিনয় উঠিয়া তরলার হাত ধরিল—বল তরলা, তরলা অমার পরে তোমার বিশ্বাস আছে,—উত্তর দাও?

বিনয়ের অধৈর্য্যভাব দেখিয়া তরলা হাসিল—বলিল তোমার কি মনে হয়?

সে আমি বলতে পারব না। ভাঙ্গাকে গড়তে পারি—সারাজীবন গড়তে এবং ভাঙ্গতে পারব না। তাতে আমার উদ্যমও নষ্ট হবে। সফলতার আশাও কম।

বেশ তোমার উদ্যম যাতে নষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা আমি করছি—বলিয়া তরলা ক্ষিপ্রগতিতে বাহির হইয়া গেল।

বিনয় অনুসরণ করিলে, হাসিয়া মধুরভাষিণী কহিল—পিছু নিলে যে-- ছিঃ!!

সমাপ্ত।

খুড়োর উইল।

লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(৪)

সন্ধ্যা আগত প্রায়। একজন যুবক অষ্ট্রেলিয়ার এক উপত্যকা মধ্যস্থ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল।

সবুজবর্ণ পত্র-পল্লব-শোভিত বৃক্ষ বেষ্টিত উপত্যকাভূমি একটু গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পর্ব্বত শ্রেণীর শৃঙ্গদেশ মেঘমুক্ত অস্তগমনোন্মুখ

মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আমার হাতে তোমাকে সমর্পণ করে বলেন, এটি তোমারই কন্যা হোল।

"আমার সমস্ত টাকা এর। তবে সতের বছরের আগে নয়।' বলে তিনি এক অদ্ভুত গল্প বল্লেন—'তরলার জন্মাইবার এক বছর আগে তাঁর একটি ছেলে মারা যায়; স্বপ্নে তাঁর স্ত্রী দৈব-বাণী শোনেন যে, সেই পুত্রই কন্যা হ'য়ে, জন্মগ্রহণ করছে। তাকে পুত্রের মত পালন ক'রবে, কোন বিষয়ে তা'কে পুরুষের অধিকার থেকে ক্ষুণ্ণ করবে না। আর—"

"তারপর?"

"বলছি মা। তোমার মা সূতিকাগৃহেই প্রাণত্যাগ করেন। আর স্বপ্নে দেখেন যে, ষোল বছরের পর তার বিবাহ—"

"সে আদেশ তাঁরা পালন করেন নাই কেন?"

"করেছিলেন। পাছে তুমি পুরুষোচিত শিক্ষা-প্রাপ্ত না হও, সেজন্য আমি অনুরুদ্ধ ছিলাম, তোমার কাছে, ইতিহাস গোপন ও বিকৃত করতে। তোমার বাবা তোমার জন্য একটি লক্ষ টাকা নগদ রেখে যান; আর—"

"আর?"

"বলে যান, সতের বৎসর বয়সে, আমার মনোমত পাত্রে তোমাকে অর্পণ করবার জন্যে।"

"বিধবার—"

"তরলা, তুমি অনূঢ়া!"

তরলা বেগে কক্ষ হইতে চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—এতদিন এ সকল কথা বলনি কেন?

ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া তিনি বলিলেন—তোমার পিতার অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করিতে! তাহা কি অন্যায় হয়েছে, মা!

"যতটুকু ন্যায় হয়েছে, তার বেশী অনেক অন্যায় করেছ!"

বলিতে বলিতে তরলা চলিয়া গেল। হায়! এত বিলম্বে। সে যে দেবতার মন্দির সব ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে! আজ যে সে বড়ই দীন, বড়ই নিরুপায়!!

তরলাকে যিনি পালন করিয়াছিলেন—নিশানাথ বিনয়ের বাটীটি তরলার নামে খরিদ করিতে ইচ্ছা করিয়া তরলাকে ঐ সব কথা বলিতেছিলেন। হঠাৎ তরলা যে কেন এত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, তিনি কিছুতেই বুঝিতে

পারিলেন না। কেবল কেশ-বিরল মস্তকের অগ্রভাগে হাত বুলাইতে বুলাইতে, তিনি মূঢ়ের মত বসিয়া রহিলেন।

তরলা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, বলিল—বাবা পায়ে ধরছি মাপ করো। চিরদিন ক্ষমা করেছ—

তাহাকে তুলিয়া লইয়া নিশানাথ বলিলেন—আমি ত তোমার উপর রাগ করি নাই, মা!

তরলা বলিল—না, বাবা, বড় দোষ করেছি, মাপ করো, বাবা।

কি বলছিস্ তরল? তের বছরের আমার মেয়ে তুই, রক্তের টানের চেয়েও যে তোর উপর টান বেশী হয়েছে মা! রাগ করব কেমন করে?

কর নি?

না মা। তা'কি পারি!

পা'র ধূলো দাও।

যাস্-নে, তরল। সব কথা শেষ হয় নি।

আর কি!

বিনয় বাড়ী বিক্রী করবে, তোর নামে আমি ঐ বাড়ী কিনব।

না—বাবা, তা হবে না, বিনয় বিক্রি করতে চায়—অন্য খদ্দের দেখ, আমার নামে কেনা হ'বে না

কেন? সে বিক্রী করবে, তোর টাকা। আমার ইচ্ছে কি, যত দিন বেঁচে থাকি, তোরা পাশের ঐ বাড়ীতেই থাকবি—

সে বাড়ী না কিনলেও হতে পারবে!

তা আর কেমন করে হবে! আমি ত আর দেখে শুনে ঘর জামাই করব না। সে কোথায় তোকে নিয়ে যাবে—

কোথাও যাবে না, বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

কি বলছিস্ তরল? হেঁয়ালি, ধাঁধা, বুড়ো বয়সে সে সব বুঝতে পারি না আর।

কিছু বুঝতে হবেনা, শুধু একটুকু জেনে রাখ যে, তুমি তাড়িয়ে দিলেও আমি যাব না, এ ঘরের ইটসুরকীর মত আমি চিরকাল স্থায়ী।

১০

বিনয় সম্মুখীন হইলে তরলা সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল। এক বৎসরের পরে উভয়ের এই সাক্ষাৎ, কেহ কোন কথা বলিতে পারিতেছিল না। দাঁড়াইয়া

সূর্য্যের শেষ রশ্মিপাতে সুবর্ণ প্রভায় রঞ্জিত। পথিক কিন্তু প্রভাবের সেই চারুশোভা নিরীক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিল না। অনাহারে জঠোর জ্বালা সহ্য করিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিত হওয়া সম্ভবপর নহে। যুবক যে কেবল ক্ষুধার্ত্ত তাহা নহে, সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াও পড়িয়াছিল। এবং আজ যে সে কি আহার করিবে বা কোথায় আশ্রয় লইবে, তাহারও কিছুই স্থিরতা নাই।

যুবক দেখিতে বেশ সুশ্রী; দেহ সুগঠিত, স্কন্ধদ্বয় বিশাল। যদিও তত বলিষ্ঠ নহে, তথাপি তাহার আকৃতিতে সাহস ও দৃঢ়তা, ক্ষিপ্রতা ও কমনীয়তা মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ক্লান্তচরণে সে অতিকষ্টে সে বন্ধুর পথ দিয়া হাঁটিতেছে। সত্যই সে আজ আশ্রয়হীন ভিখারী, কিন্তু তাহার আকৃতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়, সে একজন সাধারণ ভিক্ষুক দলভুক্ত নহে।

তাহার মুখের শ্রী বেশ সুন্দর। চক্ষুতে দৃঢ়তা মাখান রহিয়াছে। যুবকের আকৃতিতে এমন একটা ভাব রহিয়াছে যে, রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবার সময়, সকলের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

তাহার সাদা সিদে মোটাসোটা কাপড় চোপড়ে ঝড় বৃষ্টি ও কাটা-ছেঁড়ার চিহ্ন রহিয়াছে। যুবক তাহার স্কন্ধের উপর ছড়ির প্রান্তে আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র বাঁধিয়া নলে ধূম পান করিতে করিতে চলিয়াছে। প্রাতেই গত রাত্রের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিবার পর হইতে সমস্তদিন সে কিছুই খায় নাই। এরূপ অবস্থাপন্ন লোকের নিকট ধূমপানই পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তানদাতা ও বন্ধু। এরূপ অবস্থায় মানুষ সাধারণতঃ একটু অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু এই যুবকের বদনমণ্ডল প্রফুল্ল। তাহার মনেও বিপুল সাহস ও অদম্য তেজ ছিল। রাস্তার মোড় ঘুরিয়া সম্মুখে সে এক স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইল।

স্ত্রীলোকটী তাহার অপেক্ষা আরও ধীরে ধীরে চলিতেছিল। তাহার গতি দেখিলে মনে হয় যে, সে বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে। তাহার পশমীবস্ত্রাচ্ছাদিত মস্তক নত হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীলোকটী হাতে কিছু ধরিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল। তাহার মূর্ত্তিতে কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব জড়িত রহিয়াছে। ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত পথ ধরিয়া ক্লান্ত চরণে সে চলিয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন, গাছের কৃষ্ণ ছায়াগুলি তাহার দুঃখের পরিমাণ আরও বাড়াইয়া

দিতেছে। একাকী পথভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের নাগাল ধরিবার জন্য যুবক জোরে চলিতে লাগিল। কিন্তু স্ত্রীলোকটী রাস্তার অপর মোড় ভাঙ্গিল। যুবক তাড়াতাড়ি সেখানে উপনীত হইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল, স্ত্রীলোকটী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

সম্মুখে কোন মনুষ্য বসতি নাই। অথচ স্ত্রীলোকটি কোথায় গেল, ইহা ভাবিয়া যুবক বড়ই বিস্মিত হইল। সে দ্রুত চলিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়াই দেখিল, স্ত্রীলোকটি পথি পার্শ্বে গাছপালার মধ্যে এক বৃক্ষের তলায় শুইয়া রহিয়াছে। যুবক তাহার বোঝা নামাইয়া তাহার কাছে গেল। স্ত্রীলোকটির মাথা হইতে শীত বস্ত্র খসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়া যুবক অনুমান করিল স্ত্রীলোকটি সম্প্রতি কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। বাল্যে সে নিশ্চয়ই বেশ সুন্দরী ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাহার মুখে যন্ত্রণা ও ধ্বংসের স্পষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তাহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া যুবক বুঝিতে পারিল, স্ত্রীলোকটি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পাংশুবদন ও জীর্ণ হস্তের দ্বারা বুকের উপর সে যে ভার ধরিয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে বিচার করিয়া যুবক তাহার মূর্চ্ছা যাইবার কারণ বুঝিতে পারিল। অষ্ট্রেলিয়ার জনশূন্য অরণ্যের মধ্য দিয়া ভ্রমণের সময় ক্ষুধার তাড়নায় ও প্রবল ঠাণ্ডালাগায় সে যে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে যুবকের বিলম্ব হইল না। যুবক পথের পার্শ্বেই জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ঝরণা দেখিয়া আসিয়াছিল; সেখানে দৌড়িয়া গিয়া টুপি করিয়া জল তুলিয়া আনিয়া স্ত্রীলোকের মুখে ও ঠোঁটে ঝাপটা দিতে লাগিল।

এইরূপ করায় স্ত্রীলোকটি একটু সুস্থ হইল, তাহার জীর্ণ হস্ত বক্ষস্থ শিশুকে আর ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। যুবক তখন হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহার নিকট হইতে শিশুটি লইল। মৃত্যুর তুষার-শীতল-হস্ত স্পর্শে বিবর্ণ শিশুর মুখমণ্ডল দেখিয়া যুবক তাহার ঠোঁট কামড়াইতে লাগিল। মনোমধ্যে উদিত নানা প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে সে স্ত্রীলোকটির পার্শ্বেই ভূমির উপর মৃত শিশুটিকে রাখিল। স্ত্রীলোকটি প্রথম চক্ষু খুলিয়াই শিশুর দিকে তাকাইয়া অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—

"শেষ হয়ে গেছে?"

যুবক কিছু উত্তর না দিয়া শিশুটিকে তাহার বক্ষে তুলিয়া দিল। রমণীর

শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। সেই অশ্রুজল তাহার গণ্ডস্থল বাহিয়া বক্ষস্থ শিশুর মুখমণ্ডলে পড়িল। তারপর হঠাৎ চোখের জল মুছিয়া যুবকের গম্ভীর করুণাবিগলিত চক্ষুর দিকে তাকাইয়া মৃদু-স্বরে বলিল,—

"মারা গেছে দেখে আমি বড়ই আনন্দিত। জন্মাবধি যন্ত্রণা ভোগ করেছে। এর মরাই ভাল। ইহার মৃত্যুর কারণ কিছু ভেবে ঠিক করতে পার? ক্ষুধার জ্বালাই একমাত্র কারণ। কয়েক দিন ধরে কিছু খেতে পায় নি। মা হয়েও আমি মনে মনে ইহার মৃত্যুকামনা করে এসেছি, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছি—"

তাহার কণ্ঠস্বর আবার রুদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু দুটি পুনর্ব্বার বর্ষণোন্মুখ হইল; কিন্তু সে অশ্রুপ্রবাহে বাধা দিয়া গলায় হাত দিয়া উদাস-ভাবে সম্মুখে তাকাইয়া রহিল।

যুবক একটি গাছে হেলান দিয়া কম্পিতহস্তে নলে ধূমপান করিতে লাগিল। ভাবিল, এ অবস্থায় কিছুক্ষণ সন্তানহারা জননীকে শোক করিতে দেওয়া উচিত। অনুকম্পা ব্যতীত অপর কারণেও সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এই স্ত্রীলোকের অঙ্গুলে বিবাহের অঙ্গুরী সে দেখিতে পাইল না। বিবাহের অঙ্গুরী স্ত্রীলোকেরা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোন কারণেই ত্যাগ করে না। যুবকের মনে সন্দেহ হইল, কেহ এই স্ত্রীলোকের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে।

যুবক তখন স্ত্রীসুলভ কোমল কণ্ঠে তাহাকে বলিল, "তুমি কি আর একটু পথ হাঁটিতে পারিবে বলে মনে কর? আধ ক্রোশ পরে এক মনুষ্য-বসতি আছে। আমি সেখানে যাচ্ছি, তোমাকেও সেখানে নিয়ে যেতে পারি।"

স্ত্রীলোকটি উন্নত দৃষ্টিতে যুবকের পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর উঠিবার চেষ্টা করিল। যুবক তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া মৃত শিশুটিকে নিজে বহন করিতে হস্ত প্রসারণ করিল।

কিন্তু সে তাহার মাথা নাড়িয়া যুবকের প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইল। এবং শিশুটিকে আরও তাহার বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল। স্ত্রীলোকটি তাহার বলবান সঙ্গীর সাহায্যে অনেক কষ্টে একটু অগ্রসর হইল। তারপর ভারবহনে অসমর্থ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত শিশুটিকে যুবকের হাতে দিল। যুবক সে ভার ধীরে ধীরে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিল।

এই রকমে নিঃশব্দে মন্দগতিতে তাহারা কিছুদূর চলিয়া এক গোলাবাড়ী দেখিতে পাইল।

স্থানটি বেশ আরামপ্রদ ও সমৃদ্ধিশালী। সম্মুখের বাগানে নানা রকম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বাড়ীর গায়ে লতাগাছ জড়াইয়া রহিয়াছে। দরজায় একজন স্থূলকায় পুরুষমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল। এই পথিক দুজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ ফটকের নিকট আসিল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,-"এই বাড়ীর নামই কি "পারালুনা"? আমি শুনেছিলাম আপনাদের একজন লোকের দরকার। আপনার নামই কি মিঃ জ্যারো?"

মিঃ জ্যারো ঘাড় নাড়িলেন। পরে তাঁহার টুপি খুলিয়া মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে একবার যুবকের দিকে, একবার যুবতীর দিকে তাকাইল। যুবতী তখন ফটকের খুঁটিতে হেলান দিয়া অর্দ্ধনিমীলিতনয়নে দাঁড়াইয়া। তাহার ঘন ঘন শ্বাস পড়িতেছে।

মিঃ জ্যারো ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,-"হাঁ, আমাদের লোকের দরকার বটে, কিন্তু আমরা কেবল একজন অবিবাহিতা লোকই চাই।"

যুবকের মুখ একটু আরক্ত হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল,-"এই স্ত্রীলোকটি আমার স্ত্রী নহে।"

মিঃ জ্যারো পুনর্ব্বার যুবকের প্রতি তাকাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল,-"কি করব? আমরা কেবল একজন পুরুষ মানুষই চাই। স্ত্রীলোকে আমাদের দরকার নেই।"

যুবক তখন তাহার ওষ্ঠদ্বয় দাঁতে কামড়াইতে লাগিল। পরে একবার মূর্চ্ছিত-প্রায় যুবতীর দিকে, একবার জ্যারোর উদ্বেগপূর্ণ চিন্তাযুক্ত মুখের প্রতি তাকাইয়া যুবতী না শুনিতে পায় এরূপ মৃদুভাবে বলিল,—

"এই স্ত্রীলোকটিকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখি। বড়ই অসুস্থ, মর-মর। আপনি নিজে দেখতে পারেন। অনুগ্রহ করে একে কি বাড়ীতে একটু স্থান দিবেন?"

যুবতীর রুগ্নদেহ দেখিয়া ও যুবকের অনুনয় বিনয়ে তাহার মন বিকলিত হইল বটে, কিন্তু মিঃ জ্যারো তবুও ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক দরজার নিকট আসিল এবং বাগানের মধ্যস্থ পথ ধরিয়া তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

"জেমস্, ব্যাপার কি? এই লোকটিই বা কে?"

"একজন নিরাশ্রয় ব্যক্তি, কাজের জন্য এসেছে। তার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক। সে বলছে যে, এ স্ত্রীলোকটি তাহার স্ত্রী নহে।" এই বলিয়া জ্যারো চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। তাহার স্ত্রী যুবতীর অঙ্গুরিশূন্য আঙ্গুল ও তাহার পংশুবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—

"স্ত্রীলোকটিকে বাড়ীর ভিতর আন।"

যুবক, যুবতীর বাহু নিজের বাহুর মধ্যে ধরিয়া মিসেস জ্যারোর পিছুপিছু বাড়ীর ভিতর চলিল। জ্যারো তখন তাহার অনাবৃত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে তাহাদের পিছু পিছু চলিল।

তাহারা একটি রান্নাঘরের ভিতর ঢুকিল। যুবক স্ত্রীলোকটিকে একটি চেয়ারের উপর বসাইয়া দিল। চেয়ারের উপর যুবতী মৃতপ্রায় হইয়া বসিয়া পড়িল। মিসেস জ্যারো দ্রুতপদে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ খানিকটা দুধ লইয়া ফিরিয়া আসিল। এবং সেই দুধ টুকু মদ মিশাইয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল—স্ত্রীলোকটিকে খেতে দাও।" পরে যুবকের সম্মুখে তাহার বাহু বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"শিশুটিকে আমার কাছে দাও।" যুবক শিশুকে তাহার হস্তে দিবার পূর্ব্বে মৃত শিশুর মুখ হইতে আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিল। সন্তানবৎসলা মিসেস জ্যারো সেই ভার গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং অস্ফুট সহানুভূতিসূচক কথায় সান্ত্বনা দিয়া যুবতীকে চেয়ার হইতে টানিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া গেলেন।

যুবককেও কিছু খাইতে দেওয়া হইল। যুবক খাইতেছে এমন সময় মিসেস জ্যারো উপর হইতে নামিয়া চা লইয়া তাহার পাত্র পূর্ণ করিয়া দিলেন। এবং তাহার দিকে তীক্ষ্ণ অথচ করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—স্ত্রীলোক টি এখন এত দুর্ব্বল ও অসুস্থ যে, প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ। সে অনেক কষ্টে তাহার নামটি বলেছে,—মেরী সিটন। তোমার নাম কি?"

যুবক উত্তর করিল,—"জন ডগলস, ডাক নাম—জ্যাক।"

"তাহ'লে তোমরা দুজনে স্বামী-স্ত্রী নহ।"

জ্যাক ডগলস পুনর্ব্বার বলিল যে, সে যুবতীকে রাস্তার ধারে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছে। মিসেস জ্যারো তাহার প্রতি একবার স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাথা নাড়লেন।

"তোমার কথায় অবিশ্বাস করার কারণ নাই, তোমার মুখের ভাব স্পষ্ট ও সরল। তুমি কোথা হতে আসছ ?"

"মিনটোনা ষ্টেসন হইতে।"

চা পানের পর জেমস তাহাকে তামাকের কৌটা এগুইয়া দিয়া বলিলেন, "আমাদের একজন লোকের দরকার; তা তোমাকেই সে কাজে নিযুক্ত করতে আমরা স্থির করেছি। সপ্তাহে এক পাউণ্ড হিসাবে তুমি বেতন পাবে। আশা করি, এতে তোমার কোন আপত্তি নাই, আর আবশ্যক মত তুমি সব কাজ করতে সম্মত আছ ত ?"

সপ্তাহে এক পাউণ্ড হলে আমার বেশ চলবে। আর কাজের কথা যা বল্লেন, দেখবেন, আমি সাধ্যমত কোন কাজ করতে অসম্মত হব না।"

* * * *

মিঃ জ্যারো অতি অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে জ্যাক ডগলাস এক রত্ন বিশেষ। ইতিমধ্যেই গোলাবাড়ীর সব কাজ সে বেশ বুঝিয়া লইয়াছে। সে এত কর্ম্মঠ ও বলবান যে, কাজ করিয়া কখনও তাহাকে ক্লান্ত হইতে দেখা যায় নাই। সকল প্রকার কাজেই সে হাসিমুখে অগ্রসর হইত।

কয়েক দিন মধ্যেই গোলাবাড়ীর সকলের সঙ্গেই তাহার বন্ধুত্ব হইল।

জ্যাকের কার্য্য প্রণালী খুব সরল, অথচ ফলপ্রদ। যখন কোন কাজ করাই-বার দরকার হইত, সে প্রথম অধীনস্থ লোকদের তাহা করিবার জন্য হাসিমুখে আদেশ করিত এবং কার্য্য সম্পন্ন হইলে প্রফুল্লবদনে তাহার অনুমোদন করিত। যদি কেহ তাহার আদেশ পালনে বিমুখ হইত, সে পূর্ব্বের ন্যায় শান্তভাবেই তাহাকে সেই কাজ করিবার জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করিত। কিন্তু সেবারকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কেহ আর তাহার কথা অমান্য করিতে সাহস করিত না।

মেরী সিটন, যাহার সে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তখনও শয্যাগত। কিন্তু মিসেস জ্যারোর নিকট জ্যাক প্রত্যহই সংবাদ পাইত যে যুবতী ক্রমেই আরোগ্যলাভ করিতেছে। বাড়ীর পশ্চাতে একটি ঝোপের মধ্যেই তাহারা তাহার শিশুর কবর দিয়াছে।

একবার কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া জ্যাক আস্তাবলে ঘোড়া রাখিতে যাইতেছে। এমন সময় দেখিল মেরী সিটন বাহুর উপর জল-ধৌত পোষাক

পরিচ্ছদ লইয়া গোলাবাড়ীর প্রাঙ্গন পার হইতেছে। তাহার মুখ তখনও পাংশুবর্ণ। তথাপি রাস্তার ধারে জ্যাক তাহাকে প্রথম যে অবস্থায় দেখিয়াছিল, তাহা হইতে অনেক ভাল। কিন্তু মুখে ও চক্ষে যেন তাহার করুণ জীবন-নাট্যের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার মুখ দেখিলে মনে হয় যেন জীবনে সে কখনও হাঁসে নাই। জ্যাককে ঘোড়া হইতে নামিতে দেখিয়া সে থামিল এবং উদাস নয়নে তাহার দিকে তাকাইল। তাহার মুখের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল যেন সে হতভম্ব হইয়া অতীত কোন ঘটনা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার চোখের ভাব বলিয়া দিল যেন সে জ্যাককে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক। সে চুপ করিয়া রহিল; কোন কথা কহিল না। জ্যাক হাসিমুখে মস্তক সঞ্চালনের দ্বারা তাহার প্রতি সম্মান দেখাইয়া বলিল,—

"তুমি শয্যা ত্যাগ করেছ দেখে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হ'লাম। আশা করি, এখন বেশ আরোগ্যলাভ করেছ।"

যুবতীর চক্ষুদ্বয় জ্যাকের মুখের উপর নিবদ্ধ। সে যেন একটু চিন্তিত ও উদাসীন হইয়া তাহার কথা মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তির ন্যায় মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—

"এখন ভালই আছি। মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ।"

সৌম্যমূর্ত্তি জ্যাক বিশ্রামান্তে স্নান করিয়া ভোজ-ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। খাইতে খাইতে সে জ্যারো-দম্পতীকে তাহার কার্য্যের বিবরণী দিল। মিঃ জ্যারো তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"তুমি অনেক কাজ করে এসেছ। আমি নিজে এর চেয়ে বেশী কাজ করতে পারতাম না।"

জ্যাক জিজ্ঞাসা করিল,—"নূতন কোন সংবাদ আছে?"

জ্যারো তামাকের নলে অগ্নি সংযোগ করিয়া ধুমপান করিতে করিতে বলিলেন,—"না, নূতন সংবাদ কিছুই নাই।" মিসেস জ্যারো বলিলেন,—"মেরী সিটন, বেশ সুস্থ হয়েছে। এখন ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে।"

জ্যাক তোয়ালে মুখ মুছিয়া বলিল,—"তাহা হ'লে দেখছি আপনারা তাকে এখনও বাড়ীতে রেখেছেন।"

মিসেস জ্যারো ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"নিশ্চয়ই; তার কাছ থেকে আমরা অনেক কাজ পাই।"

জ্যাক চিন্তিতভাবে টেবিলের দিকে একবার তাকাইয়া বলিল,—"আপনারা তাহলে তাহার পরিচয় জানতে পারেন নাই,সেও এখন কিছু বলে নাই।"

মিসেস জ্যারো উত্তর করিলেন,—"না, সে নিজেও ইচ্ছা করে কোন কথা বলে নাই, আমিও তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। ও নিয়ে আমাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই। বেচারী নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট পেয়েছে। আমি আর সে সকল স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে যন্ত্রণা দিতে ইচ্ছা করি না।"

জ্যাক মাথা নাড়িয়া তাহার প্রতি সম্মান দেখাইল। বলিল,—"মহাশয়, আপনি যথার্থই বড় উদার।"

জ্যাকের এই উক্তি শুনিয়া মিসেস জ্যারো মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

গোলাবাড়ীতে কিছু কাজ ছিল। জ্যাক আহারান্তে স্বাভাবিক তৎপরতা ও দক্ষতার সহিত কাজে লাগিয়া গেল। তাহার আকৃতিতে কি যাদুমাখান আছে বলিতে পারি না, কিন্তু সে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেই সবাই উৎসাহের সহিত কাজ করিতে লাগিল।

এমন সময় এক অধীনস্থ শ্রমজীবি দৌড়াইয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল,—"মিঃ জ্যাক, বনের ভিতর একজন লোক এসেছে—মেরী—

সে নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য থামিল। তাহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত চক্ষুদ্বয় যেন কোঠর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তখন অদূরে স্ত্রীলোকের চীৎকার ধ্বনি বাতাসে শুনিতে পাওয়া গেল, জ্যাক আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই চীৎকার ধ্বনীর উদ্দেশে ছুটিয়া গেল। মেরী একটি গাছে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া—এক হোঁতকা ভীষণাকৃতি লোকের সহিত ঝাপটা ঝাপটি করিতেছে। তাহার মুখ মৃত্যুর ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। কিন্তু জ্যাককে দেখিতে পাইয়াই তাহার চীৎকার থামিয়া গেল। সেই লোকটা তখন তাহাকে ছাড়িয়া জ্যাকের দিকে অগ্রসর হইল।

জ্যাক এক লম্ফে লোকটাকে সাপটাইয়া ধরিল। দুজনে তখন পরস্পরের আলিঙ্গন বদ্ধ হইল। লোকটা জ্যাকের অপেক্ষা ভারী ছিল, কিন্তু জ্যাকের দেহে বল বেশী। সে শীঘ্রই লোকটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকের উপর হাঁটু রাখিয়া বসিল। লোকটা মাটির উপর হাত ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। মাটিতে শুইতেই তাহার হাতে এক পাথর খণ্ড লাগিল। জ্যাকের মাথায় ছুটিয়া মারিল।

জ্যাকের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহার মনে হইল যেন গাছগুলি সূর্য্য-কিরণে নাচিতেছে। সে আর লোকটাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে মৃতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া মটির উপর সটান পড়িয়া গেল।

লোকটা তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। জ্যাকের শায়িত দেহে পদাঘাত করিয়া, মেরীকে ভয় দেখাইয়া বনের মধ্যে চলিয়া গেল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই অদৃশ্য হইল।

মেরী জ্যাকের দেহের উপর অবনত হইয়া পড়িল। তাহার মুখ একেবারে সাদা। অতীব যন্ত্রণার সহিত সে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। কিন্তু সে নিজের শরীরের দিকে দৃকপাত না করিয়া জ্যাকের সার্টজামার কলার ছিঁড়িয়া তাহার মাথা নিজের জানুর উপর টানিয়া লইল। জ্যাকের আঘাত তেমন গুরুতর হয় নাই; অল্পক্ষণ পরেই তাহার একটু জ্ঞান হইল।

তাহাকে চোখ মেলিতে দেখিয়া মেরী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। পরে তাহার ওষ্ঠদ্বয় জ্যাকের কানের কাছে লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল,—'মিঃ উইলফ্রেড, মিঃ উইলফ্রেড কার্টন!

জ্যাক সে কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া গেল।

"কি বলছো? কে—কি?"

সে আবার চক্ষু বুজিল। মেরী বুঝিল জ্যাক শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবে। সেইজন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। জ্যাক অল্পক্ষণ পরেই আপনাকে সুস্থ বোধ করিল ও মেরীর হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

জ্যাক তাহার মুখ হইতে রক্তের দাগ মুছিয়া উদ্বিগ্নভাবে মেরীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি আহত হয়েছ?"

মেরী মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না; তুমি যথাসময়ে এসে আমাকে রক্ষা করেছ।"

জ্যাক সন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"তবে আর ভাবনা কি?" তারপর তার দিকে তাকাইয়া নৈরাশ্য-সহকারে বলিল,—"দুর্ব্বৃত্ত নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে। মিনটোনাতে এই লোকটার সঙ্গেই একটা কুকুরকে মারার জন্য আমার ঝগড়া হয়েছিল। বড়ই দুঃখ হচ্ছে যে, তাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারলাম না।" এই বলিয়া সে হতভম্ব হইয়া সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিছু-পরে বলিল,—"অসময়ে আমি আহত হয়ে পড়লাম। মনে হল যেন কি

একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। তুমি কি এইমাত্র আমাকে কিছু বলছিলে? আমার নাম ধরে ডেকেছিলে?"

সে বলিল,—"না।"

জ্যাক ভ্রূকুটি করিল। বলিল,—"এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! মনে হল যেন তুমি কি একটা নাম ধরে ডাকলে। আমি বোধহয় একেবারে সজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলাম। বাড়ী চল। তুমি নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছ। আমার-কাঁধে ভর দিয়ে এস।"

জ্যাক তাহার কম্পিত বাহু প্রসার করিয়া দিল। কিন্তু মেরী তাহা নিজের হাতের ভিতর টানিয়া লইল। শান্তভাবে অথচ কম্পিত স্বরে বলিল,-"না, মিঃ জ্যাক, আমি অবসন্ন হয়ে পড়ি নাই, এবার তোমাকেই আমার উপর ভর দিয়া চল্‌তে হবে।

(৫)

হেসকেথ কার্টন ক্লাইটির সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর মুখাকৃতি গম্ভীর করিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিলেন। পাছে ভগ্নিদ্বয় জানালা হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখে। কিন্তু বাড়ী পার হইয়া আসিবার পরই তাঁহার আকৃতির গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া গেল, তাঁহার মাথা নত হইয়া পড়িল এবং তাঁহার মুখে নৈরাশ্য ও অবসাদের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

কারখানার সহিত সংলগ্ন তাঁহার বসতবাটী ক্ষুদ্র ও অন্ধকারময়। কারখানা হইতে তাঁহার বৈঠকখানা ও আফিসঘরে যাতায়াত করা যায়। যাতায়াতের পথে টুপিটি রাখিয়া তিনি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিলেন। চেয়ারের উপর বসিয়া মাথা পশ্চাতে হেলাইয়া দিয়া কপালদেশ হইতে স্বেদবিন্দু মুছিয়া ফেলিলেন।

তিনি অসুস্থ। তাঁহার দেহের স্নায়ুমণ্ডলী শিথিল হইয়া গিয়াছিল। অত বড় একটা গর্হিত কাজ করিলে, একটা উইল নষ্ট করিয়া বিষয় সম্পত্তি চুরি করিতে গেলে এবং নিজের দোষে নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিলে কিরূপ গুরুতর মানসিক উদ্বেগ সহ্য করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী কার্টন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে! কারখানার ঘূর্ণীয়মান কলের শব্দে ছোট বাড়ীটি স্পন্দিত হইতেছে। তাঁহার মনে হইল যে সেই শব্দের সহিত মৃত বৃদ্ধের প্রেতাত্মার রুক্ষ কণ্ঠস্বর মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

হেসকেথ চক্ষু বুজিলেন। সে রাত্রের সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁহার চোখের সম্মুখে উদিত হইল। তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়াছে। আর কি তাহা সংশোধন করা যায় না? তিনি সোজা হইয়া বসিয়া সম্মুখস্থ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মানসিক চিন্তার বেগে তাঁহার চক্ষু ও ঠোঁটের ভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে। নিজের নির্বুদ্ধিতার দোষে তিনি যে অমূল্যরত্ন হারাইয়াছেন, তাহা কি ফিরিয়া পাইবার আর কোন উপায় নাই? তবে কি তাঁহাকে এই প্রকাণ্ড বাড়ী, বিষয় সম্পত্তির আশা সব ছাড়িতে হইবে? কেবল মাত্র এই সামান্য কারখানার সত্বাধিকারী হইয়া কি তাঁহাকে আজীবন কষ্টভোগ করিতে হইবে?

'এই হাস্যোদ্দীপক উইল আইনে বোধ হয় নিশ্চয়ই টিকিবে! ইহার বিষয়ে কি কেহই আপত্তি তুলিবে না? তাঁহার একমাত্র উপায় ক্লাইটিকে বিবাহ করিতে উইলফ্রেডের অসম্মতি এবং পরে ক্লাইটির অপরের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু। এই দুই ঘটনা না ঘটাইতে পারিলে, তাঁহার নিজের লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অবশ্য এ আশা মনের মধ্যে পোষণ করাই বৃথা। কারণ উইলফ্রেড কি এত নির্ব্বোধ হইবে, যে ক্লাইটিকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়া সে এই সম্পত্তি হারাইবে। যদিই বা সে অস্বীকার করে, তা'হলেও এই যুবতী রমণী বেশ বলিষ্ঠা ও সুস্থ; ইহার শীঘ্রই মরিবার কোন সম্ভবনা নাই।

উইলফ্রেডই বা বিবাহে অস্বীকার করিবে কেন? ক্লাইটি সুন্দর যুবতী, ও নানা সদ্‌গুণে বিভূষিতা। কার্টন নিজেই যদি আজ এই বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইত, তাহলে সেই ক্লাইটিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিত।

তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার জীর্ণ হস্তদ্বয় অসুখের জন্য আরও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি হস্তদুটি পশ্চাত দিকে রাখিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন, এক তেজীয়ান ব্যাঘ্র, নিজের নির্বুদ্ধিতা বশতঃ জালে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য ছট ফট করিতেছে।

হঠাৎ ঘরের দরজায় কে ধাক্কা মারিল। তখন তিনি মন হইতে এই চিন্তা দুর করিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। দেখিলেন, মেরিল, যাহাকে তিনি সম্প্রতি কারখানার কার্য্যাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, দ্বারদেশে উপনীত।

সে ঘরে ঢুকিয়াই বলিল,—"আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি, ক্ষমা

করবেন, আপনি বলেছিলেন কাগজপত্র লেখা হয়ে গেলেই নিয়ে আসতে, তাই এনেছি।”

“তা, বেশ করেছ।”

এই কথা বলিয়া তিনি আফিস ঘরে গিয়া তাঁহার চেয়ারে বসিলেন। সম্মুখস্থ টেবিলে মেরিল কাগজপত্র রাখিল। টেবিলটি হিসাবের খাতা ও নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে পরিপূর্ণ। হেসকেথ কাগজপত্র গুলির উপর চোখ বুলাইয়া গেলেন।

“এ সব ঠিক হয়েছে।”

মেরিল তাঁহার হাত হইতে সেগুলি লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হেসকেথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মেরিল, আর কিছু দরকার আছে?”

মেরিল অনিচ্ছা সহকারে উত্তর করিল,—“আঁজ্ঞে, মহাশয়, আমার মনে হয়, ষ্টিফেন রডনের ব্যবহার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু জানান উচিত।”

হেসকেথ একটুকরা কাগজ লইয়া তাহাতে কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। কলম থামাইয়া উদাসীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তার কি হয়েছে?”

মহাশয় সে আবার অতিরিক্ত মদ্যপান করতে আরম্ভ করেছে। প্রায় এক সপ্তাহ কাজে আসে নাই। আজ এসেছে, কিন্তু মাতাল অবস্থায়। তাকে ভরসা করে কলের কোন কাজই করতে দিতে পারা যায় না। আমিও তাকে বলেছি, আপনাকে একথা বলব। আমার মনে হয় এ বিষয় আপনাকে জনান আমার কর্ত্তব্য। কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে বিশেষতঃ রডনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আমি বিশেষ দুঃখিত। সে আমাদের একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিল। সম্প্রতি মেরী সিটন নামে একজন যুবতি কারখানা হতে চলে যাবার পর থেকে, তার প্রায়ই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে। আপনি তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন, তার অনেক দোষ ক্ষমা করেছেন, কিন্তু কিছুতেই তার শিক্ষা হয় নাই। মদ খেয়ে রাস্তায় হাল্লা ও মারামারি করার জন্য অনেক কষ্টে পুলিসের হাত এড়িয়ে আফিসে এসেছে। তাকে আর কাজে রাখা উচিত নয়।”

হেসকেথ আবার পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পরে ধীরভাবে বলিলেন,—“মেরিল, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।”

মেরিল চলিয়া গেলে হেসকেথ্‌ লেখা বন্ধ করিলেন, এবং মাথা না তুলিয়াই চিন্তিতভাবে কাগজখানি দেখিতে লাগিলেন। যেন কোন একটা বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। তারপর মাথা নাড়িয়া আবার লিখিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন লোকের দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল এবং দরজায় ধাক্কা পড়িল। হেসকেথ স্থিরচিত্তে "ভিতরে এস" এই কথা বলিতেই, লোকটি ঘরের ভিতর ঢুকিল।

লোকটি সুশ্রী, সুগঠিত, বলবান্ যুবক। অতিরিক্ত মদ্যপানে তাহার মুখে ধ্বংসের রেখা স্পষ্ট টানিয়া দিলেও, সে দেখিতে সুন্দর। তাহার একটা চোখ ফুলিয়া গিয়াছে, ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছে, গণ্ডস্থল ও কপোলে গুরুতর আঘাতের দাগ রহিয়াছে, তাহার সুন্দর কেশরাশি বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পোষাকপরিচ্ছদ ছিন্ন ও ধূলিধূসরিত। সংক্ষেপে, তাহার আকৃতি দেখিলে মনে হয় যেন এইমাত্র সে অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া রাস্তায় মারা-মারি করিয়া আসিতেছে।

লোকটি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া হাতে একটা ছেঁড়া কর্দ্দমাক্ত টুপি চঞ্চলভাবে ঘুরাইতে লাগিল। হেসকেথ কিছুক্ষণ তাহার সহিত কথা কহিলেন না। নির্ব্বাক তিরস্কারের প্রভাব কিরূপ তাহা তিনি বেশ জানিতেন, পরে পত্র হইতে মুখ তুলিয়া স্থিরচিত্তে বলিলেন ;—"রডন, তুমি আবার অতিরিক্ত মদ্যপান কর্‌তে আরম্ভ করেছ ?"

রডন একবার গম্ভীরভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইল। কিন্তু কিছু বলিল না।

হেসকেথ পুনর্ব্বার বলিলেন,—"মেরিল বলিল, তুমি প্রায় এক সপ্তাহ কাজে আস নাই। বোধ হয় কদিন খুব মদ খাচ্ছিলে ?"

রডন সাহস সহকারে বলিল,—"আঁজ্ঞে হাঁ, সে কথা সত্য। আমি মদ্য পানই করছিলাম।"

"মারামারিও করেছিলে বোধ হয় ? এ সবের জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

"যখন নেশা ছুটে যায়, জ্ঞান ফিরে আসে, তখন আমার লজ্জা হয়।" রডন অনুতপ্ত ভাবে এ কথাগুলি বলিল।

হেসকেথ চেয়ারে ঠেস দিলেন। বলিলেন,—"এক সময়, তুমি আমাদের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলে।"

রডন ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"এক সময় ছিলাম বটে, মিঃ হেসকেথ! কিন্তু সে অনেক দিন পূর্ব্বে। তখন মদ্যপানে সংযত ছিলাম, কার্য্যে একটা উৎসাহ ছিল, প্রাণ ধারণ কর্‌বার ইচ্ছা ছিল। এ রকম অবস্থায় সকলেই মন দিয়ে কাজ করতে পারে। কিন্তু যখন আমার যথাসর্ব্বস্ব হৃত হইল, তখন মনে হইল—"তাহার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে টুপিটি জোর করিয়া ধরিয়া বলিল—"যেন পৃথিবী অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে গেছে, জীবনের সব সুখ শেষ হয়ে গেছে; তখন আর নিজের মান সম্ভ্রম বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে ইচ্ছা করে না। অতীতের স্মৃতি ভুল্‌তে ইচ্ছা করে, কিন্তু এ কষ্ট, যন্ত্রণা, মদ্যপান না কর্‌লে ভুল্‌তে পারাযায় না! সেইজন্যই আমি মদ খাই, মারামারি করি। আপনিই বিচার করে দেখুন! আমার মতন অবস্থায় পড়্‌লে আপনিই বা কি কর্‌তেন?" এই বলিয়া সে করুণভাবে টুপির সহিত নিজের হাত প্রসারিত করিয়া দিল,—"আপনি যদি আপনার প্রাণয়িণীকে এভাবে হারাতেন, যে বালিকাকে আপনি আপনার প্রাণের অপেক্ষা বেশী ভালবাসতেন, যে আপনার স্ত্রী হবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেই বালিকাকে যদি কেহ আপনার নিকট থেকে কেড়ে লয়; তাহলে আমিও বেশ বল্‌তে পারি, আপনিও নিশ্চয়ই মদ্যপানে আমার ন্যায় অভ্যস্ত হতেন।"

হেসকেথ গম্ভীর ভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আমার তা মনে হয় না, এরূপ স্ত্রীলোকের জন্য এত কষ্ট ভোগ করা উচিত নয়। পৃথিবীতে সে ছাড়া আরও অনেক স্ত্রীলোক আছে। এই মনে করে নিজকে সান্ত্বনা দেওয়া তোমার উচিত। তার নাম কি?"

"মেরী—মেরী মিটন," রডন উত্তর করিল। যেন সেই নাম উচ্চারণ করিতে তাহার অন্তঃকরণে আঘাত লাগিতেছে।

"হাঁ, তার নাম মনে পড়েছে বটে। আচ্ছা, রডন, তাকে ভুলে যাও; আমি তোমাকে এই পরামর্শ দিচ্ছি।"

রডন উচ্চৈস্বরে বলিল,—"আপনি কি মনে করেন, আমি তাকে ভুল্‌বার চেষ্টা করি নি। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভুল্‌তে পারি নি।" সে মরিয়া হইয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল,—"সেদিন রাত্রিতেও সে আমার সঙ্গে ছিল! মারা গেলে, সে কষ্ট আমি সহ্য করতে পার্‌তাম। তার উপর আমার বিন্দুমাত্র রাগ থাকৃত না, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব আশায় অপেক্ষা করতাম। তখনও সে আমারই থাকৃত। কিন্তু এ রব

করে আমাকে প্রতারণা করা, বিবাহের দুসপ্তাহ পূর্ব্বে চলে যাওয়া! ইহাই আমার জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। এ আমি জীবনেও ভুল্‌তে পারব না। অবশ্য যে লোকটা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে, তার উপরই আমার বেশী রাগ, সেই লোকটা মাঝখানে না আসা অবধি সে খুব সৎ ও সরল ছিল।"

হেসকেথ শান্তদৃষ্টিতে সম্মুখে তাকাইলেন। এই লোকের দুঃখের কথা শুনা এবং সম্ভবপর হইলে তাহাকে সাহায্য করা, তাঁহার কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তিনি কতকটা অনিচ্ছার সহিত ও ধৈর্য্যসহকারে তাহার কথা শুনিতে ছিলেন।

হেসকেথ নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, বরং রডনের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য যেন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি সেই লোকটাকে খুঁজে বার করতে পারো নাই? সে কে, তাও জানতে পার নাই?"

"আঁজ্ঞে না, আমি তার কোনও সংবাদ পাই নি। কোথায় যে তার অন্বেষণ করব, তাও বুঝ্‌তে পারি না। আপনি বুঝতে পারছেন, আমার মনে আদৌ সন্দেহ ছিল না। সে শেষ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এমন চতুরভাবে প্রতারণা করে এসেছে। অপর কোন লোককে তার প্রতি ভালবাসা জানাতে আমি কখনও দেখি নি। সবাই জানত আমরা পরস্পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হব।" এই বলিয়া সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল এবং তাহার বিশাল বক্ষঃস্থল বিস্তার করিয়া দিল। "না; এমন কোন চিহ্ন নাই, যা ধরে আমি অন্বেষণ করি। যে রাত্রে সে চোরের ন্যায় পালিয়ে গেছে সে রাত্রেও নিয়মিত ভাবে সে আমাকে চুম্বন করেছিল।"

তাহার গলার স্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। তাহার হাঁতে সে তখনও সেই মলিন টুপিটি ধরিয়াছিল। সে টুপিটা মাথার উপর ছুঁড়িয়া দিয়া দাঁত কিড়মিড় করিতে করিতে বলিল,—"কিন্তু আমি এখনও তার অন্বেষণ করছি। কোন না কোন দিন নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে পাব। খুঁজে পেলে, একবার তাকে খুঁজে পেলে—" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল; তাকে কষ্ট করিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে হইল—"মিঃ হেসকেথ, তার সঙ্গে আমার বোঝা পড়া। তাকে এমন শিক্ষা দিব যে, তার গর্ভধারিণী মাও তার নাম ভুলে যাবে।"

হেসকেথ সম্মুখে একটু হেলান দিয়া বসিলেন। হাতে কলম লইয়া বলিলেন,—"থাক্, রডন, ও সব পাগলামি, বাজে কথা ছেড়ে দাও। পূর্ব্বে তোমাকে আমি যেমন জানতাম, তাতে আমার বিশ্বাস যে, তোমার ন্যায় একজন বুদ্ধিমান্ লোক, তোমার স্ত্রী হবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এই যুবতীর প্রতারণায় ও অসৎপথ অবলম্বনে, ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হবে না। অবশ্য তোমার ভালমন্দ তুমি বুঝবে; তবে তোমার কষ্টের কথা শুনে আমি বড়ই দুঃখিত। এবং সম্ভব হলে তোমার কষ্ট দূর করবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তুমিও বেশ বুঝতে পারছ যে, এষা ব্যাপার, তাতে তোমাকে কাহারও সাহায্য করা অসম্ভব। আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম, বলবার জন্য, তোমার ব্যাবহার অসহ্য হয়ে পড়েছে। ইহাতে যদি আমরা চুপ করে থাকি, তাহলে এটা একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ থেকে যাবে। আর ভবিষ্যতে তার বড় কুফল ফলবে। তোমাকে যদি আমি মদ্যপান করিয়া কাজ করতে বা অভদ্রব্যবহার করতে অনুমতি দিই, তাহলে কার-খানার অপর কোন কর্ম্মচারী এই পথ অবলম্বন করলে তাকেও অনুমতি দিতে হবে। সত্য কথা বলতে কি, রডন, তোমার ন্যায় একজন দক্ষ কর্ম্ম-চারী গেলে, আমরা দুঃখিত হব বটে, কিন্তু কি করি, তোমাকে ছাড়াতে আমরা বাধ্য হয়েছি।"

রডনের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে রুক্ষস্বরে বলিল,—"মহাশয়, আমি পূর্ব্বেই জানতে পেরেছিলাম, আপনি আমাকে এ কথা বলবেন। আমি তা শুনবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। আমার ইহা উপযুক্ত বটে; কিন্তু আমাকে কর্ম্মচ্যুত করা মানে আমার সর্ব্বনাশ করা। এই কাজ গেলে, আমার আর কোন স্থানেই কাজ জুটবে না। সংসারে একলা হলে, আমি ইহা আদৌ গ্রাহ্য করতাম না। পথের কুকুরের ন্যায় নর্দ্দমায় শুয়ে এই জীবন কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু আপনি জানেন, আমার মা এখনও জীবিত আছেন। কাজ গেলে, সংসার কেমন করে চলবে তা জানি না। তাঁর কষ্টের সীমা থাকবে না। মহাশয়, এবারও আমার দোষ ক্ষমা করুন; আমাকে আর একবার দেখুন।" সে করুণস্বরে হেসকেথের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

হেসকেথ তখন তাড়াতাড়ি পত্র লিখিতে ছিলেন। এই সব শুনিয়া তিনি তাহার প্রতি একবার তাকাইলেন। কি উত্তর দিবেন, প্রথম স্থির করিতে

পারিলেন না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"রডন, তোমার মায়ের খাতিরে, এবারও তোমার দোষ ক্ষমা করলাম। তুমি যখন বালক, তখন থেকে এই কারখানার কাজে ঢুকেছ। এই ঘটনা ঘটবার আগে পর্য্যন্ত তুমি বেশ মনোযোগের সহিত কাজ করে এসেছ। সৎপথে আসবার আর একটা অবসর তোমাকে দিলাম। কাজে যাইবার পূর্ব্বে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যাও যে, তুমি নিজেকে সংশোধন করে পূর্ব্বের ন্যায় ভদ্র ব্যবহার করবে।"

রডন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে কৃতজ্ঞতা সহকারে হেসকেথের দিকে তাকাইল।

"মহাশয়, আপনার দয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছেন। এতটার আমি উপযুক্ত নহি। আমি নূতনভাবে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করব—এ সব ভুলে যেতে চেষ্টা করব—"

হেসকেথ শান্তভাবে বলিলেন,—"হাঁ, ভুলে যেতে চেষ্টা কর। এই উপদেশই আমি তোমাকে দিচ্ছি। ইহাই সব চেয়ে ভাল প্রতিজ্ঞা। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পার।"

হেসকেথ মুখ না তুলিয়াই লিখিতে লাগিলেন। অনুতপ্ত রডন দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। হেসকেথ তখন কলম ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণদৃষ্টিতে একবার তাকাইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বেশ মনে হইল পত্র লিখিতে তিনি কোন গোলযোগে পড়িয়াছেন। শেষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের বৈঠকখানা ঘরে গেলেন। পরে গেলাসে একটু মদ ঢালিয়া পান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু গেলাস ওষ্ঠস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তিনি পাত্রস্থিত মদ্য অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। এবং অবজ্ঞাভরে ঈষৎ হাসিয়া বিড় বিড় করিয়া বলিলেন,—"তাহলে আমার অবস্থাও পরে ঐ নির্ব্বোধ রডনের অবস্থার মতন দাঁড়াবে।" এই বলিয়া তিনি আফিস ঘরে ফিরিয়া গেলেন ও পুনর্ব্বার নিজের কার্য্যসাধনে রত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

চাষার—প্রাণ

(লেখিকা—শ্রীমতি——)

(১)

পল্লীগ্রামবাসী 'সরলহৃদয় নিতান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির কাছে 'রেলওয়ে-এঞ্জিন' খানার গতিবিধির ব্যাপার যেমন অত্যন্ত জটীল, এই বিশ্ববিধানের ব্যাপারটা মহা পণ্ডিতের কাছেও তেমনি দুর্জ্ঞেয় রহস্যজালে আবৃত। ভাগ্যবন্তকে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী জীবিতকালে জয়মাল্যে সাজাইয়া তাহার জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া, কোন পথ দিয়া যে আবার হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যান—তা নিরাকরণ করিতে মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য হার মানে।

গদাধর চাটুর্য্যে যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, বেশ দব্‌দবার সহিত খুব স্বচ্ছন্দেই তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। স্ত্রী এবং কন্যা অন্নপূর্ণা ছাড়া নিতান্ত আপনার জন আর কেউ না থাকিলেও, তখন অনেকগুলি সম্পর্কীয় বে-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব আপনার হইতেও আপনার হইয়া—আগাছার মত জড়াইয়া চাটুয্যে মহাশয়ের মজ্জা শোষণ করতঃ তাঁহার কল্যাণ কামনা করিত। খোদ কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই মনে করিত যে এতগুলি লোক যখন তাঁর পায়ে কাঁটাটি ফুটিলে দাঁত দিয়া তুলিয়া দিতে প্রস্তুত—তখন তাঁর অবর্ত্তমানে গৃহিণী ও অন্নপূর্ণা অভিভাবকহীন হইয়া আথান্তরে পড়িবেন না।

কেবল তাঁহার বহুকালের বুড়া প্রজা পাঁচু সেখ সেই সকল আলোচনা শুনিয়া মনে মনে হাসিত এবং পুত্র 'ফকিরকে' গোপনে বলিল—"তুই দেখিস্ বাপ্‌জান্, এরা সব লক্ষ্মীর বরযাত্তর। খোদা না করুন—কিন্তু কর্ত্তা চক্ষু বুজলে এদের একজনও গিন্নী মা কি অন্নদিদির পানে ফিরেও চাবে না। কিন্তু বাপ তুই খাঁটি থাকিস্, মনে জানিস—ওনারাই মোদের বাপ-মা।"

পাঁচু সেখ পুরুষানুক্রমে চাটুয্যে পরিবারের অনুগত প্রজা, তাঁহার জমী ভাগে চাষ করিত এবং বেতনভোগী ভৃত্যের মত হামে-হাল বাড়ীতে হাজির থাকিয়া ফাই-ফরমাইস খাটিত।

অবশেষে পাঁচুসেখের কথাই ফলিল। বছর কতক পরেই কর্ত্তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—বাসন্তী প্রভাতের সুখস্বপ্নের মত গৃহিণীর সংসারের সমস্ত আশা

ভরসা ভাঙ্গিয়া গেল। যাহারা এতদিন নিতান্ত আত্মীয় হইয়া গদাধর চাটুয্যের অন্ন-ধ্বংস করিয়া আসিতেছিল, তাহারাই ছলে কৌশলে বিধবার টাকা কড়ি, জমি জমা সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া একে একে গা ঢাকা দিল এবং সমাজে নিতান্ত বিজ্ঞের ন্যায় মত প্রকাশ করিল,—"যার লক্ষ্মী তার সঙ্গে চলে গেছে, কে আটকে রাখতে পারে?"

অনূঢ়া কন্যাটিকে লইয়া বিধবা যথার্থই অথান্তরে পড়িলেন। তখন কেবল মাত্র পাঁচু সেখ প্রাণ দিয়া অতিকষ্টে কোনমতে তাঁহাদের দুইটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে লাগিল!

কিন্তু অভাগিনীদের কপালে সে সুখটুকুও বেশীদিন সহিল না, বছর খানেকের মধ্যে প্রভুভক্ত বৃদ্ধ পাঁচুও চক্ষু বুজিল! যুবক ফকির একা আর কত সামলাইবে—চাটুয্যেদের জমীজমার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। সে উপায়ান্তর না দেখিয়া দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় পাটের কলে চাকরি করিতে গেল।

এইবারে গদাধর চাটুয্যের অনাথা স্ত্রী-কন্যার প্রকৃত অন্নকষ্ট আরম্ভ হইল।

(২)

নদীর জল যেমন কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনে বহিয়া যায়, তেমনি তুমি মর আর বাঁচ প্রকৃতি নিতান্ত নিরপেক্ষ ভাবে আপনার কায করিয়া যাইতে বিস্মৃত হয় না। চাটুয্যে গৃহিণীর সংসার অচল হইলেও মায়েঝিয়ে মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন দাঁতে দাঁত দিয়া পড়িয়া থাকিলেও, প্রকৃতি মেয়ের সর্ব্বাঙ্গে আপনার মন্ত্রঃপূত রঙ্গের তুলিটি বুলাইতে ছাড়িল না। তেরো ছাড়াইয়া চৌদ্দতে পা দিতে না দিতেই অন্নপূর্ণার দেহে নিখিলের যৌবন-শ্রী আপনার ষড়ৈশ্বর্য্যের গৌরবে স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিল। পড়া-পড়সী কানাঘুষা করিতে লাগিল—ভাত অভাবে যার আঁত শুকাইয়া গিয়াছে, সে কোন্ কুহক বলে সহসা এত সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হইল?

তা রূপের মূল্য পুস্তকের পৃষ্ঠায় অথবা প্রেমিকের মনে যতই বেশী হউক—সমাজে অর্থ না থাকিলে মেয়ের বিবাহ হওয়া ভার। অনাথা বিধবা পৈতা কাটিয়া দুঃখ-ধান্ধা করিয়া সকলদিন অন্নই জুটাইতে পারিতেন না, তা কন্যার বিবাহের অর্থ সংগ্রহ করিবেন কেমন করিয়া?

তিনি, আত্মীয় স্বজন সকলের কাছেই, যাতায়াত করিয়াছেন, যাহার ছায়া মাড়াইতে ঘৃণা বোধ করিতেন—তাহার হাতে ধরিয়াছেন, যে কখনও তাঁর প

দেখে নাই—তাহার কাছে মুখ তুলিয়া পাগলের মত কাঁদিয়াছেন, যে একদিন তাঁহার দ্বারে একমুষ্টি অন্নপ্রার্থী ছিল—তাহার কাছে সকাতরে করযোড়ে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই অন্নপূর্ণার বিবাহের জন্য পাত্র দেখিয়া দেয় নাই। সকলেই তাঁহাকে নিরাশ করিয়া একবাক্যে বলিয়াছে—অন্ততঃ তিনটি হাজার ভিন্ন আজ কালকার বাজারে একটা যেমন তেমন পাত্রও মিলিবে না।

গ্রামের কালী মুখুয্যের পরোপকারী বলিয়া একটা সুনাম আছে—লোকের দায়-দফায় বুক দিয়া করিয়া থাকেন। তিনি বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ, পয়সা কড়ি জমী জমাও আছে। গদাধর চাটুয্যের সম্পত্তি নিলামে উঠিলে তিনি তাহার ভাল ভাল গুলি জোগাড় করিয়া নকড়া ছকড়ায় কিনিয়া লইয়াছিলেন, লোকের কাছে বলিয়াছিলেন—"হাজার হোক 'গদাদার' অনেক খেয়েছি পরেছি, বড়ই বন্ধুত্ব ছিল, কত মানা করেছি শুনলেন না। বুদ্ধির দোষে সর্ব্বস্ব খুইয়ে মাগ মেয়েকে পথে বসিয়ে গেলেন। তা বলে তাঁর সোণার রাজ্যিপাট পরে দখল করবে, সেটা কেমন করে হয়? তাই বিস্তর লোকসান করেও কিনতে হল! সময়ে অসময়ে বিধবা আর মেয়েটা এসে দাঁড়ালে ত আর তাড়িয়ে দিতে পারবো না।"

লোকে শুনিয়া, 'ধন্য, ধন্য' করিয়াছিল। কিন্তু গরীব দুঃখী, চাষা ভূষো মহলে গোপনে একটা আতঙ্কের কাণাকাণি চলিয়াছিল, সকলেই আপন আপন যুবতী স্ত্রী-কন্যা সামলাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

লক্ষ্মীর মত—ষষ্ঠীদেবীর কৃপাও কালী মুখুয্যে মহাশয়ের উপর অযাচিত ধারে বর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার চারিটি কন্যা ও তিনটি পুত্র সন্তান। কন্যাগুলির বিবাহে অনেক খরচ করিতে হইয়াছিল। দেয়ালে গাঁথা গুল বসানো সিন্দুকটার গহ্বর অনেকখানি খালি হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি ঠিক করিয়াছিলেন যে বংশোজ্জ্বল পুত্র তিনটীর দ্বারা তাহার দশ গুণ উসুল করিয়া লইবেন। সুতরাং তাহাদিগকে তিনখানি স্বর্ণপ্রসূ তালুক স্থানে তিনি মনে মনে অত্যন্ত স্ফীত হইয়া আকাশ কুসুমের কল্পনা করিতেছিলেন।

অন্নপূর্ণার মাতা আত্মীয়-বন্ধু জ্ঞাতি কুটুম্বদের কাছে নিরাশ হইয়া একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কালী মুখুয্যের স্বভাব তিনি উত্তমরূপে জানিতেন সুতরাং সে দিকে চেষ্টা করিবার আশা এবং দুরাকাঙ্ক্ষা মনে স্থান দিতেও পারেন নাই।

কিন্তু আর যে চলে না। পেট তবু শুনে, উপোসেও দিন কাটে, কিন্তু সমাজ যে শুনে না—মর আর বাঁচ মেয়ের বিয়ে দিতেই হইবে, তাতে আবার দু'দিন দেরী হইবারও তবু সহিবে না। জাতি, কুল, মান, সম্ভ্রম সমস্তই যাইবে। অন্নপূর্ণার বয়সও চৌদ্দ বৎসর যায় যায় হইয়াছে, আর কয়টা মাস পরে পনেরোয় পড়িবে। সুতরাং বিধবা চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। এতদিন তাঁহার এক ভাবনা ছিল, এক্ষণে অন্ন-সঙ্কটের উপরে জাতি-সঙ্কট উপস্থিত হইল।

তিনি আর সম্ভব অসম্ভব ভাবিলেন না, শক্তি সামর্থ্য বুঝিলেন না, মান অপমান মানিলেন না, একদিন দুপুর বেলা—উপবাস-ক্লিন্ন শ্লথ পদদ্বয়কে কোনমতে টানিয়া লইয়া—একেবারে কালী মুখুয্যের বাড়ীতে গিয়া পাগলিনীর মত তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অনেক কান্নাকাটি, অনুনয় বিনয়ের পর মুখুয্যে মশায়ের মন একটু টলিল, চিন্তা করিয়া শেষে তিনি বলিলেন—

"তা দেখ অন্যের কথা আলাদা, তোমার সঙ্গে ত আর সে রকমটা করতে পারি না। তা যাও—তোমার যে সব গহনাপত্র ছিল সেইগুলি দাও গিয়ে, আর নগদ—বেশী নয়—দুটি হাজার মাত্র ছাড়। মরুকগে আমার নয় কিছু লোকসান হল—তুমি বন্ধু-পত্নী অনাথা—সে দিকটা দেখাও ত আমার কর্ত্তব্য, নইলে নগদ পাঁচ হাজার আর চুড়ি সুটের গয়না—এ আমি দর পেয়েছি। তারাপদের মত ছেলে এ অঞ্চলে আর কোন্ ব্যাটার ঘরে আছে—সেটাও তুমি জান। শুধু তোমার খাতিরে আধাকড়ির চেয়েও কমে রাজি হলুম। আর কথা কয়োনা, যাও জোগাড় করগে—এই মাসের ২৭শে তারিখেই শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করে দেব! আচ্ছা! একলা বিধবা মানুষ—বড়ই জড়ায়ে পড়েছ বটে ?"

হরি হরি! স্রোতের মুখে শেষ অবলম্বন কুটা গাছটিও ছিঁড়িয়া তল হইয়া গেল! বিধবা, মুখুয্যে মশায়ের পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছে—মুখে আর কথাটি নাই, যন্ত্র চালিত পুত্তলিকার মত—একপা একপা করিয়া ধীরে ধীরে আপনার জীর্ণ কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।

সেইদিন রাত্রে তাঁহার জ্বর হইল। জ্বর ঘোরে কেবল 'দু হাজার দাও, 'দু-হাজার দাও' বলিয়া ভুল বকিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা বড় কাঁপরে

পড়িল, সোমত্ত মেয়ে—একেলা রুগ্ন মাতাকে লইয়া নির্জ্জন কুটীরে রাত্রিবাস করিতে সাহস করিল না। ফকিরের বৌ লক্ষ্মী আসিয়া মেঝেতে শুইল।

সকালে চাউল অভাবে ভাত চড়ে নাই—মা ও মেয়ে উঠানের একটা মানকচু তুলিয়া তাই সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছিল। পরদিন আবার একাদশী। শেষরাত্রে বিধবার জ্বর ছাড়িয়া অত্যন্ত ক্ষুধা পাইল, তিনি বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণার দুই চক্ষে শত ধারা বহিল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া লক্ষ্মী রোগীনীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া—কথায় কথায়—সব কথা শুনিয়া লইল এবং অন্নপূর্ণাকে স্নেহের তিরস্কার পূর্ব্বক কহিল—

"হ্যালা ছুড়ি, তোর আক্কেল খানা কি? তোর দাদা বাড়ী নেই বলে কি আমিও মরেছি, না মোছল্‌মান্ বলে ধর্ম্ম কর্ম্ম খুইয়েছি? সারাদিনটা হাঁড়ী চড়েনি তা আমাকে একবার বল্‌তে হয়না কি? রাত পোহালেইত একাদশী, মাসীমা জলরত্তি ছোবে না। শেষে কি ওনাকে শুকিয়ে ডাং করে মারবি?"

অন্নপূর্ণা অপ্রতিভ হইল। এই দরিদ্র মুসলমান কন্যার হৃদয়ের করুণার ধারায় তাহার মনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে তার গলা জড়াইয়া ছল ছল চক্ষে বাধ বাধ স্বরে কহিল—

"ফকির দাদা দীর্ঘজীবি হোক—তুমি পাকা মাথায় সিঁদুর পর দিদি। হামেহাল তোমাদের খেয়েইত বেঁচে রয়েছি, আর কত ভার দেব?"

"নে থাম—ঢের হয়েছে, বে হলে বরের কাছে ওই রকম জ্যাঠামি করিস। এখন একটু সাহস করে একলা থাকতে পারবি? আমি ধা করে ঘরে গিয়ে গাইটা দুয়ে খানিকটা দুধ আনি—মাসী মা খিদেয় ছটফট্ কচ্ছে। রাত পোহালে—একাদশী—আর দাঁতে কুটোটি কাটবে না।"

অন্নপূর্ণা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা না শুনিয়াই লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি কেরোসিনের ডিপেটা জ্বালিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীর সামনে গিয়া লক্ষ্মী যেমন সদরের চাবিটা খুলিতে যাইবে, হঠাৎ একটা লোক অন্ধকারে গাছের তলা হইতে বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া পিছন হইতে তাহার আঁচল টানিয়া ধরিল এবং হাসিতে হাসিতে কহিল—

"কি গো সতী-লক্ষ্মী কোন্ ভাগ্যিমানের কুঞ্জে নিশি যাপন করে ফেরা হ'চ্ছে ?"

সর্পস্পৃষ্টবৎ লক্ষ্মী প্রথমটা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই হস্তস্থিত ডিপের আলোকে মুখ চিনিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং রহস্যের স্বরে কহিল—

"আঃ কপাল—মুখুয্যে মশাই ! তবু ভাল, আমি ভেবেছিলুম—ডাকাত পড়লো বুঝি ?"

"তা যে রত্ন নিয়ে একলা ঘরে রয়েছ, দিন দুপুরেও লুট তরাজের ভয় আছে—রাত্রের কথা কি ! বলি কোন ভাগ্যিবানের বরাত খুলেছে যে ঘরে বসে লক্ষ্মীলাভ করলে ? বলই না শুনি ?"

লক্ষ্মীর ইচ্ছা হইল যে জলন্ত ডিপেটা মুখুয্যে মহাশয়ের মুখের উপর ছুড়িয়া দিয়া মুখখানা জন্মের মত পুড়াইয়া দেয়। কিন্তু কি ভাবিয়া সে ইচ্ছা দমন করিল এবং পূর্ব্ববৎ রহস্যের স্বরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—

"ভাগ্যিমান আর কোথায় পাব বাবু ? গরীব চাষা ভূষো আমরা বরাতে তেমনিই জোটে ! তোমরা গাঁয়ের জমিদার—আমরা কি তোমাদের ছাঁচ্ মাড়াবার যুগ্যি !

মুখুয্যে মহাশয় গলিয়া গেলেন, অত্যন্ত উৎসাহে কহিলেন—

"ছাঁচ্ কি বলছো, তুমি দয়া করলে বুক পেতে দিতে পারি।"

"জাতের ভয় নেই ? আমরা যে মোছলমান।

"কুস্থানাদপি কাঞ্চনং।"

মহাপণ্ডিতের মত জবাবটা করিয়াছেন ভাবিয়া মুখুয্যে মহাশয় অত্যন্ত গর্ব্বভরে একবার পাকা গোঁফে তা দিয়া লইলেন।

"তা তুমি যদি সাহস দাও—বেশীরাত্রে চুপি চুপি এসে—"

গোয়ালের গরুটা হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল। মুখুয্যে মহাশয়ের কথা শেষ হইল না, সভয়ে একবার চারিদিকে চাহিয়া, অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিলেন—

"পাড়ার লোকজন কেউ উঠলো না কি ?"

এদিকে রাত্রিও পোহাইয়া আসিতেছিল, লক্ষ্মী ভাবিল—আর বৃথা এই লম্পটার সঙ্গে কথা বাড়াইয়া সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। চুপে চুপে কহিল—

"ও বাড়ীর জ্যাঠ্‌শ্বশুর খুব ভোরে উঠেন, আমি এখন চল্লুম।" লক্ষ্মী চাবি খুলিয়া পা বাড়াইল।

"তা হলে লক্ষ্মী—" যুবতীর আঁচল ছাড়িয়া মুখুয্যে মহাশয় পলাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

"পরে বলে পাঠাব।"

লক্ষ্মী ভিতরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া খুব একচোট হাসিয়া লইল. তারপর গাই দুইতে গেল।

কালী মুখুয্যে মহাশয় ততক্ষণে মুসলমান পাড়া ছাড়াইয়া মাঠে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। সেখান হইতে নদীর ধারে গিয়া প্রাতর্ভ্রমণ করিতে করিতে আশার সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

তখনো উষার অল্প দেরী ছিল। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি দুধ লইয়া গিয়া উপস্থিত হইল। অন্নপূর্ণা তখনিই গরম করিয়া মাতাকে খাওয়াইয়াছিল।

তারপরে লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার খোপা ধরিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল, এবং কালী মুখুয্যে ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা বিষাদের স্বরে কহিল—"না দিদি, সাপ নিয়ে খেলানো ভাল নয়।"

"দূর মড়া—আমি যে বিষদাঁত ভাঙ্গতে জানি, ভয় কি? দাঁড়ানা, তোর দাদা এবার ঘরে এলে যে হয়—তখন মজাটা দেখেনিস্।"

লক্ষ্মী ভারি আনন্দিত মনে কি একটা মতলব আঁটিতে আঁটিতে গৃহে চলিয়া গেল।

৪

উষাকালে চাকর যথারীতি তৈল কাপড় ও গামছা লইয়া ঘাটে আসিল। মুখুয্যে মহাশয় অকারণ তাহাকে কহিলেন—

"পাঁচ মিনিট হ'য়নি আমি আস্‌ছি, এত শীগ্‌গির যে ঘুম ভেঙ্গে উঠে আসতে পারবি তা ভাবিনি। আমি ভারি খুসী হলুম।

সেই রাত্রে ফকির কলিকাতা হইতে গৃহে আসিল।

"মাসীমা, কেমন আছগো—প্রণাম হই।" সকালবেলা ফকিরচাঁদ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল।

অন্নপূর্ণার মাতার সেদিন আর জ্বর ছিল না, কিন্তু পূর্ব্ব দুইদিনের জ্বরে এবং উপবাসে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শুষ্ক হইয়াছিলেন।

"এস বাবা, কেমন আছ—শরীর গতিক সব ভাল? কখন বাড়ী এলে?"

ফকিরকে বসিবার জন্য পিঁড়ি দিতে যাইতেছিলেন, ফকির তাড়াতাড়ি

বাধা দিয়া চালের উপর হইতে এক টুকরা ভাঙ্গা দরমা পাড়িয়া লইয়া বসিল। বলিল—

"আজ্ঞে কাল রেতে এসেছি, তোমার আশীর্ব্বাদে সব ভাল। শুনলুম পরশু থেকে তোমার খুব জ্বর হয়েছিল—তাই সকালেই দেখতে এলুম। আজ ভাল আছ মাসীমা ?"

"আর বাবা, তোমাদের রেখে যেতে পারলেই এখন ভাল। জ্বরটা আর রাত থেকে আসেনি। আজ আর বৌ-মাকে দুধ নিয়ে আসতে মানা ক'র। বেটি দু'দিন ধরে গতর পিষে কি করনটাই না আমাদের করেছে! আহা বেঁচে থাক্; বাড়বাড়ন্ত হোক, পাকা মাথায় সিঁন্দুর পরুক্। তোমার সংসার দিনের দিন উথ্‌লে উঠুক ?"

"তোমার আশীর্ব্বাদ 'নয়' হবে না মাসী। তা'বলে অত করে বলোনা— সে আর তোমাদের এমনই বা কি করেছে ? আর লোকে বেটার বিয়ে দিয়ে বৌ আন্‌তে চায় কেন—অসময়ে করবার জন্যই তো। আমি তো তোমার ছেলে বটে—সে তো বউ বটে !"

"তার আর সন্দ কি বাবা ? তোদের জন্যে আজও মা-বেটী খেয়ে বেঁচে আছি—এ ঋণ কি জন্মে শুধ্‌তে পারবো ?"

বিধবার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

ফকির অত্যন্ত অপ্রতিভ এবং সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, কথাটা চাপা দিবার জন্য ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিল। এমন সময়ে পুকুর ঘাট হইতে মৃৎ-কলসে জল লইয়া অন্নপূর্ণা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ফকির যেন রক্ষা পাইল, তাড়াতাড়ি বলিল—"এই যে দিদি, কেমন আছ ? সব খবর ভাল ?"

ফকিরকে দেখিয়াই অন্নপূর্ণা আনন্দে একগাল হাসিয়া ফেলিল কিন্তু তাহার প্রশ্নে হঠাৎ সে হাসি নিবিয়া গেল। যাদের হাঁড়ি চড়েনা তাহাদের আর ভাল কোথায় ? অন্নপূর্ণা কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না—ডাগর ডাগর চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল, ঘাড় নীচু করিয়া অত্যন্ত নীরবে চুপি চুপি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

ফকির তাহার মনের ভাব বুঝিল, বুঝিয়া আবার অপ্রস্তত হইল। প্রসঙ্গটা ফিরাইবার জন্য কহিল—

"মাসিমা অন্নদিদির বিয়ে না দিলে ত আর চলে না—কি ঠিক করলে ?"

অন্নপূর্ণা লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। মাতা কহিলেন—

"আর কি বলবো বাবা—মেয়ে মানুষের কলাগাছের বাড়, দেখতে দেখতে পনেরোয় পা দিলে। এইবার আমার জাত, কুল, মান সব গেল।"

বিধবা অত্যন্ত কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া ফকিরেরও চক্ষু শুষ্ক রহিল না।

"এই জন্যে, এই সব দেখে আমাদের জাত হিঁদুদের ওপর চটে। এ গাঁয়ের কোন্ ব্যাটা না তোমার খেয়ে মানুষ হয়েছে—কোন্ ব্যাটা না তোমার নিয়ে জায়গা-জমি করেছে, তোমার অসময়ে কেউ দেখলে না? আমরা বুঝি—জাতের যদি এক জনের নিন্দা হয়, সেটা সকলের নিন্দা। মেয়ের বিয়ে দেবেন তাতে আবার 'দুহাজার' টাকা দিতে হবে? কেন, অমন সুন্দর বৌ গাঁয়ে কার ঘরে আছে? অন্নদিদি যার ঘরে যাবে—তার ভাগ্যি না? আর আপনিই বা অত টাকা পাবেন কোথা? হিঁদুরা নিজের জাতের দুর্দ্দশা দেখতে বড় ভালবাসে—ছিঃ! এখন চল্লুম মাসি—ওবেলা আবার আসবো, এ সম্বন্ধে একটা পরামর্শ আছে। এখন এই দুটো টাকা রাখুন—অন্নদিদিকে সন্দেশ কিনে দেবেন, আমি হাতে করে আনলে তো আপনারা ছোঁবেন না।"

অন্নপূর্ণার মাতা বাধা দিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সময় পাইলেন না, ফকির টাকা দুটি তাঁহার পদতলে রাখিয়া অত্যন্ত তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

তাঁহার দুই চক্ষু জলে আবার ভরিয়া উঠিল। নিজের স্বজাতি, জ্ঞাতি, কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব কেহ ফিরিয়া চাহে না—মরিলেও মুখের কথা জিজ্ঞাসা করে না! আর এই দরিদ্র মুসলমান যুবক,—কবে, কোন কালে বাপ-পিতামহ একদিন উপকার পাইয়াছিল বলিয়া—এখনও নানা ছল'ছুতায় যখন তখন অর্থ দিয়া, সামর্থ দিয়া কায়মনোপ্রাণে সাহায্য করে! যে সংসারে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধবদের মত নির্দ্দয়-হৃদয়, কৃতঘ্ন মানুষের বাস—সেই সংসারে ফকিরের মত উচ্চ প্রাণ, মহৎ চরিত্র দেবতাও আসিয়া থাকেন।

যুক্তকরে, সজল ঊর্দ্ধ-নয়নে তিনি দেবতাদের উদ্দেশে দারিদ্র ফকিরের সর্ব্বাঙ্গীন শুভ কামনা করিলেন।

অন্নপূর্ণাদের কুটীরের পরেই একটা পুষ্করণী, তারপরে বিঘাকতক ধানজমি আর তার পরেই মুসলমান পাড়া। সেই মুসলমান পাড়ার প্রবেশ-পথে প্রথমেই ফকির চাঁদের গোলপাতার বাড়ী।

গদাধর চাটুয্যে যখন জীবিত ছিলেন' তখন এই কুটীরে মাঠ হইতে আনিয়া প্রথমে সাজার ধান রাখা হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর বিষয় সম্পত্তি ঘর বাড়ী নীলাম হইয়া গেলে—ফকিরের পিতা পাঁচুসেখ বিস্তর চেষ্টা করিয়া এই কুটীরখানি নিজে রাখিয়াছিল। তারপর মা-মেয়ে যখন নিরাশ্রয় হইয়া পথে দাঁড়াল, তখন সে বহুযত্নে তাঁহাদিগকে আনিয়া সেই কুটীরে রাখিল, এবং আরও দুইখানি ছোট ছোট পাতার ঘর তুলিয়া—চারিদিক বেড়া দিয়া ঘিরিয়া তাঁহাদের বাসের মত করিয়া দিল। সেখান হইতে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়া পাঁচুর গৃহ দেখা যাইত—দূরও বেশী নয়, সুতরাং সে সর্ব্বদাই খোঁজ খবর লইতে পারিত।

পাঁচুর মৃত্যুর পরে এক্ষণে বাড়ীতে ফকিরের যুবতী-স্ত্রী লক্ষ্মী এবং এক বৃদ্ধা দাদী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক ছিল না, সুতরাং ফকির কলিকাতায় চাকরি করিতে গেলে, সেই দুই মুসলমান স্ত্রীলোক দুটী হিন্দু অনাথা মা-মেয়েকে নিতান্ত আপনার জনের মত ভাবিয়া সর্ব্বদা তাহাদের বাড়ীতে যাতায়াত এবং দেখা শুনা করিত।

লক্ষ্মী নামেও যেমন—স্বভাবেও তেমনি, তাহার গুণে সেই ক্ষুদ্র গোল-পাতার বাড়ীখানি সর্ব্বদাই ঝক্ ঝক্ করিত। এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, এমন বিলি-বন্দেজ ধনীর অট্টালিকাতেও দেখা যায় না। তার উপর লক্ষ্মীর সুন্দর রূপ এবং মধুর আচার ব্যবহার সে গৃহে প্রকৃতই লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছিল। লক্ষ্মীর গুণে পাড়ার বৌ-ঝিরা সকলেই তাহাকে ভালবাসিত এবং দরিদ্র মুসলমান চাষার ঘরে যে এমন কুল-লক্ষ্মী থাকিতে পারে তাহা ভাবিয়া সকলেই অবাক হইত।

তবে লক্ষ্মীর একটা দোষ—সে চটুলপ্রকৃতি। কখনও গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারিত না—সর্ব্বদাই রঙ্গরহস্য, হাস্য-কৌতুকে মগ্ন রহিত। একটু কিছু হাস্যের গন্ধ পাইলে আর রক্ষা থাকিত না, বিনাকারণেও—অনেক সময় রহস্যের অবতারণা করিয়া—হাসিয়া আকুল হইত। এইজন্য দাদীর কাছে সে বকুনি কম খায় নাই, তবু তার সে স্বভাব যাইত না।

ইহাতে কিন্তু একটা বিপত্তি ঘটিয়াছিল। নিষ্কর্ম্মা গ্রাম্য যুবকের দলে

তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সর্ব্বদাই আলোচনা হইত, এবং অনেক ভ্রষ্ট-চরিত্র লম্পটকে প্রয়ই তাহাদের বাড়ীর আশে-পাশে শীস্ দিয়া ঘুরিতে দেখা য়াইত। কিন্তু তাহা লইয়াও লক্ষ্মী রঙ্গ করিবার প্রলোভন টুকু সম্বরণ করিতে পারে নাই। ইহার প্রমাণ পাঠক ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

এদিকে লক্ষ্মী নিতান্ত পতিব্রতা। ফকির যতদিন কলিকাতায় থাকিত, সে প্রতিদিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনাটি—ডায়েরি লেখার মত—মনের ভিতর লিখিয়া রাখিত। তারপর স্বমী বাড়ী আসিলে নির্জ্জন গৃহে সকল বিবরণ শুনাইয়া হাসিয়া লুটোপুটী খাইত। সেই জন্য ফকিরের ও স্ত্রীর উপর অগাধ বিশ্বাস,—অটুট ভালবাসা ছিল।

অন্নপূর্ণাদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া—আহারাদির পরে—ফকির দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের জন্য যখন ঘরে গিয়া শুইল, লক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে স্বামীর কাছে গিয়া এক এক করিয়া কালীমুখুয্যে সংক্রান্ত সকল কথা কহিল।

ফকিরের মুখ প্রথমটা গম্ভীর হইল, তার পরেই কি ভাবিয়া—হঠৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন স্বামী-স্ত্রীতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপি চুপি কি পরামর্শ আঁটিল, পরামর্শ শেষ হইলে লক্ষ্মী আবার হাসিয়া লুটো-পুটি খাইল।

বৈকালে ঘরের বাহিরে আসিয়া ফকির দাদীর ঘরে ঢুকিল এবং তাহাকে গোপনে অনেকগুলি কথা বলিয়া, অন্নপূর্ণাদের বাড়ীতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার বাতি জ্বালিয়া দিয়াই দাদী বুড়ীও কালী মুখুয্যের গৃহাভিমুখে গমন করিল।

ফকির আসিয়া প্রণাম করিয়া একেবারেই অন্নপূর্ণার বিয়ের কথা পাড়িয়া বসিল—

"মাসি-মা এই ২৭ শেই অন্নদিদির বে দিতে হবে।"

অন্নপূর্ণার মাতা আকাশ হইতে পড়িলেন, কহিলেন—

"সে কি বাবা, কোথায়—কেমন করে ?"

"কেন, কালী মুখুয্যের ছেলে তারাপদ বাবুর সঙ্গে। শুনেছি—ছেলেটি ভাল, বেশ পড়া শুনা করছে—স্বভাব-চরিত্র বাপের মত নয়। দেখতে শুনতেও দিদির সঙ্গে মানাবে ভাল।"

বিধবা অত্যন্ত বিষদে নিশ্বাস ফেলিলেন—"তাতো বুঝলুম বাপ্ সব-

দিকেই ভাল, কিন্তু আমার যে পোড়া কপাল। মেয়েটাও নেহাৎ পোড়া-কপালী—নইলে এমন মায়ের পেটে এসে জন্মাবে কেন? তাঁহার চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

ফকির সে কথায় কান দিল না, তার মনে কি একটা কথা উঠিতেছিল, সে অতি কষ্টে হাসি সম্বরণ করিল।

"বলি; গয়না-গাঁটি ছাড়া দু'হাজার নগদ চায় তো! বলে পাঠাও যে —দেবো, এই ২৭ শেই বিয়ে হওয়া চাই। নইলে আমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে-এবার গেলে আর শীগ্‌গির আসতে পারবো না।"

বিধবা গম্ভীর হইলেন।

"তুমি বলছো কি ফকির—ক্ষেপলে নাকি?"

"আমি ক্ষেপিনি —ঠিক বলছি। গয়না ছাড়া দু'হাজার নগদ দেওয়া যাবে—তুমি বলে পাঠাও তারা উয্যুগ করুক।"

ফকিরের কথা শুনিয়া বিধবার কাছে যেন স্বপ্ন-দৃশ্যের মত বোধ হইতে লাগিল।—ফকিরের কি হঠাৎ মাথা খারাপ হইয়া গেছে? ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ফকির তাঁহার মনের ভাব বুঝিল।

"বিশ্বাস করছো না বুঝি? যদি ছেলে বলে আমাকে ভাব, তা হলে একটা ভার আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হওনা।"

তারপর তাহার চক্ষুও জলে টল্‌টল্‌ করিতে লাগিল।

"জন্মে অবধি মা দেখিনি, তোমাকেই মাসি-মা বলে কলজেটা ঠাণ্ডা করি। বাপের হুকুম প্রাণ দিয়ে তোমাদের সেবা করবো, একদিনের জন্যে প্রাণভরে তা পেরে উঠিনি। যদি আমাদের জাত হতে তোমাদের মাথায় করে রাখতুম—দোহাই আল্লার, মিছে বলিনি, কি করবো আমার নসীব। অন্নদিদির মুখের পানে চাওয়া যায়না। অমত করোনা মাসিমা, যোড় হাত করে বলছি, আমায় একটা কায করতে দাও, দিদির বিয়ে দিয়ে তোমাদের সমাজে একবার পয়জার মেরে জাতের ধর্ম্মটা শিখিয়ে দিই।"

চক্ষের জল আর বাধা মানিল না—ফকির মুখ ফিরাইয়া ছুটিয়া পালাইল।

এর উপর আর কথা চলে না, সুতরাং অন্নপূর্ণার মাতা ফকিরের কথা মতই কার্য্য করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনটা একটা দারুণ সংশয় ও উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া রহিল।

(৫)

সন্ধ্যার পর মুখুয্যে মহাশয় আহ্নিক সারিয়া সবেমাত্র বাহিরের উঠানে পা দিয়াছেন—ফকিরের বৃদ্ধা দাদী তাঁহার পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িল।

"দোহাই কর্ত্তাবাবু রক্ষা কর আমার সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ ?"

মুখুয্যে মহাশয়ের মনটাও সহসা দারুণ সন্দেহে ও আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তড়াতাড়ি বৃদ্ধাকে একটা নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গিয়া, ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলেন।

বুড়ী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"ফকির আমার জন্মের মত চলে গেছে, আজ সকালে খবর এসেছে।"

"এ্যাঁ, বল কি—কি হয়েছিল ?

"তা জানিনি বাবু, শুনেই ভিরমী গিয়েছিলুম। তারপর দেখি বৌ ছুঁড়ি সমস্ত গয়না গাঁটি বেঁধে নিয়ে ঘর বাড়ী ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছে। বলে দোসরা নিকে করবো, আমার তো একজন দেখবার শোনবার মানুষ চাই ?"

কি একটা কথা মনে পড়িয়া মুখুয্যে মহাশয়ের মনটা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, একটা অভাবনীয় সুপ্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা বুকের ভিতরে তরঙ্গ তুলিয়া ওতঃপ্রোত ভাবে রহিল, অতিকষ্টে অধরের স্মিত হাস্য লুকাইয়া বাহিক সহানুভূতির ভান করিলেন।

"বরাবর জানি ও ছুঁড়ীর ধরণ-ধারণ ভাল নয়—কবে কি করে বস্‌বে ? পাড়ার লোকেরাও নানা রকম কানা কানি করে। এখন দেখছি—সেইটেই সত্য হ'ল। তা সোমত্ত বউ একলা ঘরে ফেলে রাখার দোষই ওই। আহা ফকির আমার বড় অনুগত ছিল, বিদেশে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত কষ্টেই ওই যাহোক দুখানা সোনাদানা করেছিল। আহা তার সর্ব্বস্ব ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে ? তা ভয় নেই, আমি থাকতে সেটি হচ্ছে না—নিজে গিয়ে সব হেপাজত করছি। তুমি এগোও, যেমন করে পার ঘরে চাবি দিয়ে রাখগে—আমি এলেম বলে। কি জান সমাজের ভয়ওতো আছে, পাড়াটা একটু নিঝুম হলেই আমি গিয়ে হাজির হচ্ছি।"

বৃদ্ধা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা ভরে আল্লার কাছে কর্ত্তার মঙ্গল কামনা করিয়া প্রস্থান করিল।

ফকিরের মনেও যে একটু উদ্বেগ-একটু আতঙ্কের ছায়াপাত না হইয়াছিল —তা নয়,কিন্তু সে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া মহৎ উদ্দেশ্যেই কার্য্য করিতেছিল, সুতরাং তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে খোদা বিমুখ হইবেন না।

সন্ধ্যার পরে লক্ষ্মী বেশ করিয়া গা হাত ধুইয়া আসিল, সবচেয়ে ভাল যে কাপড় খানি ছিল—সেই খানি উত্তমরূপে কোঁচাইয়া পরিল, তারপর বাক্স খুলিয়া—যে কয়খানি অলঙ্কার ছিল—সব ক'খানি যথাস্থানে পরিল। ফকির ততক্ষণ দাদীর ঘরে তাহার সহিত পরামর্শে ব্যস্ত ছিল।

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। ফকির নিঃশব্দে আপন কক্ষে ঢুকিয়া দেখিল ভুবন মোহিনী বেশে সাজিয়া লক্ষ্মী একখানি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া কেবলই মুখ দেখিতেছে আর—ফুলটির মত—আপনি হাসিয়া আপনিই বিভোর হইতেছে। সে একটা বড় রকম তামাসা করিতে যাইতেছিল—হঠাৎ সদরে মৃদু মৃদু ঘা পড়িল।

ফকির তাড়াতাড়ি দাদীর ঘরে পলাইল, লক্ষ্মী বেশ করিয়া গুছাইয়া দাঁড়াইল, দাদী গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। পরমুহূর্ত্তেই কালী মুখুয্যে মহাশয় অতি সন্তর্পণে চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া লক্ষ্মীর গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মী একবার মাত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াই বুঝিল যে তাঁহার অন্তরে একটা তুমুল তুফান ছুটিয়াছে, তাহাতে—দৈত্যের হাসির মত—সে হাসি অত্যন্ত বেখাপ্পা দেখাইতেছে।

সে মনে মনে, একটা বড় রকম রঙ্গের আশায়, এতক্ষণ ভারি উৎসাহিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন সে উৎসাহ হঠাৎ নিবিয়া গেল, মন অত্যন্ত দমিয়া পড়িল, বুকের ভিতর দুরু দুরু করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি বসিবার আসন দিয়া একেবারেই বলিল—

"আমাদের ঝগড়ার মীমাংসা করিবার জন্য দাদী বুঝি আপনাকে ডেকে এনেছে?"

লক্ষ্মী নতমুখে কিঞ্চিৎ তফাতে সরিয়া গিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল।

মুখুয্যে মহাশয় প্রথমে দু'একটা ঢোক গিলিলেন—দু'বার একবার আমৃতা-আমৃতা করিলেন। ততক্ষণে সাহস ফিরিয়া আসিল, পরিষ্কার কণ্ঠে কহিলেন—

"তুমি নাকি টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি নিয়ে দোসরা খসম্ করবার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছ?"

"কি করবো বাবু—একজন ত অভিভাবক চাই? আপনারা হিন্দু মানুষ, বড় লোক আপনারা নিত্যি আমার বাড়ী এসে ত আর খবরদারি করতে পারবেন না?"

মুখুয্যে মহাশয়ের সাহস আরো বাড়িল, কহিলেন—"লক্ষ্মী! তুমি যদি আসতে বল আমি রোজ আসতে পারি। তবে গোপনে, রাত্রে—গাঁয়ের কেউ না টের পায়, জাতকুটুম না জান্‌তে পারে!"

লক্ষ্মীর মনের ভয় অনেকটা দূর হইয়াছিল, সে আর চাপিয়া থাকিতে পারিল না—একগাল হাসিয়া—একটা বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল—

"তা হলে আমার আর ভাবনা কি, দোস্‌রা খসম করতে যাব কেন? তবে এই সব গয়নাগাঁটি আর টাকাকড়ি যা আছে সে সব আপনার কাছে হেপাজত করে রাখতে হবে—দাদীকে মোটেই বিশ্বাস নেই।"

মুখুয্যে মহাশয় একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, সমস্ত সম্ভ্রম-সঙ্কোচ—উদ্বেগ দূর হইল। আনন্দে অধীর হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া লক্ষ্মীর হাত ধরিতে গেলেন।

"আমি কি তোমার পর লক্ষ্মী?—"

মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, হঠাৎ পিছন হইতে কে একজন আসিয়া অসুর বলে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল। মুখুয্যে মহাশয় পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইলেন, চক্ষু কপালে উঠিল, দম বন্ধ হইয়া আসিল—সভয়ে দেখিলেন—রুদ্র মূর্ত্তিতে ফকিরচাঁদ একখানি বড় শাণিত ছুরিকা তাঁহার চক্ষের সাম্‌নে নাচাইতেছে।

"কি বাবু, হিঁদুর চাঁই হয়ে সমাজের মাথা হয়ে—গাঁয়ের জমীদার হয়ে মুসলমানের ঘরে জাত খেতে ঢুকেছেন! এখন কি হয়? এই ছোরায় তলায় যাবেন না জাত-কুটুমের সাম্‌নে মুখখানায় চুণ কালি মেখে একঘরে হবেন? যা বলেন—আমি দুয়েতেই রাজি। পরশু না ব্যাটার বে? কর-করে দুহাজার টাকার তোড়াটা কোন্ সিন্দুকে তুলবেন?"

সেই রাত্রে মুখুয্যে মহাশয় অনেক করিয়া ফকির চাষার হাতে পায়ে ধরিয়া মার্জ্জনা চাহিয়া এবং জরুরী কার্য্যের ভানে পত্র লিখিয়া বাড়ী হইতে নগদ আড়াই হাজার টাকা আনাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। শেষ রাত্রে বাটী যাইবার সময়ে আবার ফকিরের দুটি হাত ধরিয়া বিস্তর মিনতি পূর্ব্বক কহিয়া গেলেন—"কথাটা যেন কাক-পক্ষীতে না টের পায়।"

বলা বাহুল্য সেই ২০শে তারিখেই তারাপদ বাবুর সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ হইয়া গেল। বৌকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া মুখুয্যে মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে—তার সর্ব্বাঙ্গে লক্ষ্মীর গহনাগুলি ঝল্‌মল্ করিতেছে।

একাল সেকাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(৭)

গৃহের জমাটপাকান স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল রমা। বিমলা একটা কলম লইয়া হাতের অক্ষর পাকাইবার জন্যে দীর্ঘ ও বক্র ছাঁচে 'ক অ' লিখিয়া যাইতেছিল, রমা তাহাকে চমকিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"শীতের সন্ধ্যায় তোমার আজ একি আয়োজন ঠাকুর ঝী।"

লজ্জায় বিমলা ঘামাইয়া উঠিল, সাদা ফেকাসে মুখের উপর একটা কালীর পোচ অনুভব করিয়া নিজের মনেই বলিতে লাগিল—"তাইত, সারা বসন্তটা উত্‌রিয়ে দিয়ে শীতের সন্ধ্যায় ফুলের সাজে সাজ্‌তে বসেছি। যা খোষামুদ করে হাতে ধরে করাতে পারে নি, আজ তাই কর্চ্ছি। এ যে পূজো ফুরিয়ে কীর্ত্তন। কার জন্যে কর্চ্ছি. কে দেখ্‌বে, দেখে যে সুখী হবে? সে কি আর আস্‌বে! যদি নাই আসে—একটিবারমাত্র আমায় এ কর্ম্মে দেখ্‌লে যে হাসি মুখে মাথায় করে নিত, বুকে ধর্ত্ত, সেই যদি না এল ত আমার এ ব্যর্থ সাধনায় লাভ।"

গোড়ায় কিন্তু লাভালাভটা সে এত ভাবিয়া দেখে নাই, হিসাবনিকাশের ধার বিমলা বড় ধারিত না, তাহার সাদা মন সাদা কথাই বুঝিত, তাই সে খতিয়ানের তালাস না করিয়া স্বামী চলিয়া গেলে মনের ছট্‌ফটানিটা মনেই চাপিয়া রাখিয়া এই চির-অনভ্যস্ত কার্য্যে হাত দিয়াছিল। আশা যেন আকাঙ্ক্ষার ভারে নুইয়া পড়িয়া তাহাকে বলিয়া দিতেছিল—"স্বামীর মনোমত হতে পাল্লে সে আবার আস্‌বে, আবার হাসিমুখে "বিমল" বলে তাকে বুকে তুলে নেবে।" বিঘ্ন ঘটাইল রমার কথাটা, এই একটা কথায় বিমলার চিন্তার স্রোতটা যেন আঁকাবাঁকা সমস্ত পথ ত্যাগ করিয়া বিপরীত দিকে সোজা বহিয়া চলিল। বিমলার মন যেন আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছিল—"শীত কেটে আর কি বসন্ত এসে জুট্‌বে না।" আসন্নপ্রায় গ্রীষ্মবর্ষা পর্য্যায়ক্রমে তাহার বুক চাপিয়া ভার হইয়া বসিল। সে আর মৌন থাকিতে পারিল না,

জিজ্ঞাসুনেত্রে শুষ্কমুখে প্রশ্ন করিল—"হ্যা বৌদি, সত্যি কি আমায় একেবারে ত্যাগ করে গেল ?"

"সে কি কথা ঠাকুর ঝী" বলিয়া রমা থামিল, থামিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"তোমার ও চাঁদপানা মুখ কি কারু ভুলে থাক্‌বার যো আছে, সে আস্‌বে, আবার তোমার জন্যে কাঁদ্‌বে, তুমি ভাই তার মনমত হতে চেষ্টা কর।"

বুকটা কেমন ধক্ করিয়া উঠিল, মনের গোছান ভাবটা আপনা হইতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, গ্রীষ্মের দীপ্ত সূর্য্যের আভাটা যেন বাহির হইতে গ্রাস করিয়া ধরিতেছিল, বিমলার মুখ দিয়া অতর্কিতে বাহির হইয়া পড়িল—"আর যদি নাই আসে, দেখে শুনে মনের মতই একটা কাউকে বুকে করে নেয়"—সবখানি সে বলিতে পারিল না, তাহার ভীতিকণ্টকিত মন যেন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বলিতেছিল—"নাই যদি আসে, তোমায়ও মড়্‌তে হবে, সে যে তোমায় রসনিগ্‌ড়ান আঁকের মত একেবারে সারহীন করে রেখে গেছে।"

রমা অন্য কথা পারিল, বলিল—"দেখিনা ঠাকুর ঝী, নির্ম্মলবাবু তোমার জন্যে কি কি বই এনেছিলেন।"

কম্পিতহস্তে আলমারির ডালাটা ধরিতেই গৃহিণীর সারা পাইল, তিনি ডাকিয়া বলিলেন—"ও বৌ-মা, তোমার বৌদিকে নিয়ে খাবে এস।"

বিমলা তাড়াতাড়ি বলিল—"মা ডাক্‌ছেন, যাও বৌদি, খাওগে, আমি ত এখন খাব না।" "এখন খাবে নাত আবার খাবে কখন।" রমা বিষণ্ণদৃষ্টিতে তাকাইতেই বিমলা সুর খাট করিয়া বলিল—"সে হবেখ'ন, তুমি যাও বৌ-দি, নয়ত মা আবার এসে পড়্‌বেন।" "কেন তোমার কি খাবার বেলা হয় নি ?" "ওর ত কোন ধরা বাঁধা সময় নেই, কত লোকের যে সারাদিনেও কিছু জুট্‌বে না।" "সে আবার কি ঠাকুর ঝি, তোমার যেন সৃষ্টিছাড়া কথা।" "ধর এই যারা পথে রয়েছে।" বলিতেই বিমলার মুখ ঘামাইয়া উঠিল, পাণ্ডুর মুখের উপর হিমকণার মত ঘামের ক্ষুদ্র বিন্দুগুলি জল্‌-জল্ করিতে লাগিল, যেন প্রভাত-পদ্মের উপর গলিত চন্দ্রকান্ত মণি,। চোখ বাহিয়া টপ করিয়া এক ফোটা জল পড়িয়া গেল, রমা হাত ধরিল, ক্লিষ্ট স্বরে বলিল—"ও কি কচ্ছ ঠাকুরঝি, ওতে যে অকল্যাণ হবে "

বিমলার বুক্‌টা আবার কাঁপিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি কাপড়ের্ আচলে

চোখ পুছিয়া মনে মনে বলিল—"না ঠাকুর, অমঙ্গল যেন তাঁর কিছু ক'র না, আমায় ছেড়ে যদি তিনি ভাল থাকেন, সুখে থাকেন, আমার সেই ভাল, কিন্তু তাঁর কোন অমঙ্গল সেত আমি সইতে পার্‌ব না।"

রমা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"আচ্ছা ঠাকুরঝি, মানুষ কি আর বাড়ী ছেড়ে বিদেশ যায় না, না এই নির্ম্মলবাবুই নতুন বিদেশ গিয়েছেন।"

যাতায়াতটা নূতন নহে, মানুষের পক্ষে তাহা চিরপুরাতন, তবু কিন্তু আজ সেটা কেমন নূতনত্বের দাবী লইয়া বিমলার চোখের উপর প্রকট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিমলা শান্ত অথচ উদ্বেল স্বরে বলিল—"বিদেশে সবাই যায়, সে যাওয়া আর এ যাওয়াতে যে অনেক তফাৎ।"

"অত সত ত আমি বুঝি না ভাই, এর মধ্যে আবার এস সে।" বলিয়াই রমা থামিয়া গেল। গৃহিণী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"ওমা তোমরা এখনও খেতে যাও নি, ভাত যে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল।"

"যাই মা" বলিয়া বিমলা সন্ত্রস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, রমার হাত ধরিয়া বলিল—"চল বৌদি।" তাহার প্রাণের ভিতরটা যেন দ্রুতবেগে কাঁপিতেছিল, সে ত খাইতে যাইতেছে, কিন্তু তাহার স্বামী যে পথে উপবাসী। বিমলার কাণের গোড়ায় ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হইতেছিল।

(৮)

দিন তিনেক পরে রমা সেদিন বিমলাকে একান্তে লইয়া বলিল—"আর ত বাড়ী না গেলে নয় ঠাকুরঝি, আমাকে কালই যেতে হচ্ছে।"

বিমলা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিল, মনে মনে বলিল—"আমায় আগ্‌লে কেই বা চিরদিন বসে থাক্‌বে, আমার দিন যে এম্নি গুমরে-মরেই কাট্‌বে।" প্রকাশ্যে বলিল—"না বৌদি, তোমায় ত আর বসিয়ে রাখ্‌তে পারি না, দাদা একা রয়েছেন, তার হয়ত কত কষ্ট হচ্ছে।" বলিয়া একটা ঢোক গিলিল।

"তুমিও চল ভাই, কটা দিন সেখানেই থাক্‌বে, মনটা একটু নরম হলে তখন ফিরে এস।"

ছাই নরম, বিমলার দীর্ঘ আশার নদী যে গ্রীষ্মের ডোবার মতই নৈরাশ্য-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সে যেন লজ্জা-সরম ভুলিয়া গিয়া কথায় মুখে বলিয়া উঠিল—"মন কি সেখানে গেলেই নরম হবে, সেত হয় না, ঘোলে ত জলের আশা মিটাতে পারে না।"

রমা থমকিয়া গেল, এমন একটা উত্তর সে আশাই করিতে পারে নাই, জিজ্ঞাসা করিল—"তবে যাবে না।"

লজ্জায় মরিয়া গিয়া বিমলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বিনয়-নম্র স্বরে বলিল—"না বৌদি, সে কি করে হয়, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী রয়েছেন, এদের ফেলে গেলে এরা যে আরও কষ্ট পাবেন, আমার জন্যই এদের যত কষ্ট, আর ঐ ছোড়াটা, জানত ওকে ফেলে এক পা বেরোবার যো নেই।"

রমা চলিয়া গেল, যে আলোটুকু লইয়া সে আসিয়াছিল, যাইবার সময় অন্ধকার দিয়া গেল তাহার দ্বিগুণেরও বেশী, অনেক অনুরোধ উপরোধেও বিমলা যাইতে স্বীকৃতা হইল না, শুষ্ক সারহীন বৃক্ষকেও লতা যেমন জড়াইয়া থাকে, সেও তেমনই এই পরিবারটিকে জড়াইয়া পড়িয়া রহিল। রমার আগ্রহে তাহার শ্বাশুড়ীও অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন—"রমা এত করে বল্‌ছে যাও বৌমা, দশ পাঁচ দিন পরেই আমি আবার নিয়ে আস্‌ব।"

বিমলা বিপরীত বুঝিল, সে কাঁদিয়া ফেলিয়া শাশুড়ীকে উত্তর করিল—"মা তোমাদের সেবা থেকেও আমায় বঞ্চিত কর্ত্তে চাচ্ছ।"

শ্বাশুড়ী এতটুকু হইয়া গেলেন, রমাও আর কোন কথা বলিল না, যাইবার কালে প্রাণাধিকা ননন্দার চিবুক ধরিয়া বলিয়া গেল—"অত ভেবনা ভাই, শরীরটা যেন নষ্ট না হয়, দুদিন পরে দেখ্‌বে সবই ঠিক হবে।"

বিমলা উত্তর করিতে পারিল না, আচলে চোখ ঢাকিয়া পাল্কী পর্য্যন্ত গিয়া রমাকে বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল, সমস্ত বাড়ীটা যেন, তাহার নিকট একটা বিরাট বিদ্রোহের মত বোধ হইতেছিল, ইহার উপর আবার এতদিনের মধ্যে নির্ম্মলের পৌঁছ খবর পর্য্যন্ত না পাইয়া সে অসামাল হইয়া পড়িল। সহসা কর্ত্তার স্তবপাঠের শব্দ তাহার কাণে আসিল। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া ওঘরে গিয়া দেখিল, তখনও শ্বশুরের খাওয়ার যায়গা হয় নাই। নিজেই ছুটিয়া পিড়ী আনিতে যাইতেছিল, হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শান্তি ঝী পিড়ী লইয়া আসিতেছিল, বিমলা তাহার হাত হইতে পিড়ী কাড়িয়া লইল, ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"কোন চুলোয় গিয়েছিলি তোরা; এখনও যায়গা কত্তে পারিস নি।"

শান্তি অনেক দিনের পুরণো ঝী, এতটুকু বধূর এতবড় কথাটা সে হজম করিতে পারিল না, কড়া করিয়া বলিল—"দেখ বৌদি, গরিব দুঃখি

বলে যা মুখে আসে তাই যেন বল না, গতর খাটিয়ে খাব, যেখানে হয় এক মুঠা জুটবেই।"

বিমলা উত্তর করিল না, শান্তি এবার একটু সরস হাসি হাসিয়া বলিল —"পোড়া কপাল, মানুষ যেন আর বিদেশ যায় না, যার জন্যে এত অনাছিষ্টি ঢলাঢলি হচ্ছে।"

বিমলার গায়ের উপর যেন কে সজোরে লগুড়াঘাত করিল, তবু কিন্তু ইহার মধ্যে একটা স্নিগ্ধ প্রলেপের রস অনুভব করিয়া বাহিরে সে গরম হইয়াই বলিল—"দেখ শান্তি, বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে তোর, যত বড় মুখ নয়,তত বড় কথা, আমি আজ্ ই মাকে বলে তোকে বিদায় করব।"

"মাকে তোমার বল্‌তে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি।"

"তাই যা, আর যেন এমুখো হস না।" বলিয়া বিমলা উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

কর্ত্তা আহারে বসিলে বিমলা বাতাস করিতেছিল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৌমা, তোমার চোখমুখ এমন বসে গেছে কেন? কোন অসুখ করে নি ত।"

বিমলার মুখ এতটুকু হইয়া গেল, "না মা কোন অসুখ ত করে নি।" বলিতেই তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল, পাখা ফেলিয়া উঠিয়া একটু দূরে গিয়া গৃহিণীকে ডাকিয়া মিনতি করিয়া বলিল—"মা বড্ড অন্যায় করেছি, শান্তিকে সুধু সুধু গাল দিয়েছি, বৌদি চলে যেতে আমার যেন কেমন ঠেকছে।

"তোমায় পাঠিয়ে দোব রমার কাছে।"

"না না, সেখানে ত আমি তিষ্ঠাতে পারব না।" বলিয়া দ্বিগুণ বেগে কাঁদিয়া ফেলিয়া আবার বলিল—"তুমি যদি শান্তিকে বুঝিয়ে বল।" বলিয়া সে আবারও থামিল, থামিয়া কি ভাবিয়া আবারও বলিল—"তাতে কাজ নেই, আমিই বল্‌ছি, সেত আমায় বড় ভাল বাসে।"

শান্তি মুখ ভার করিয়া গুমট পাকাইয়া বসিয়াছিল, বিমলা দৌড়িয়া গিয়া তাহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া কাতরভাবে বলিল—"আমায় মাপ কর শান্তি!"

শান্তি জবাব করিল না, বিমলা ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—"দেখ শান্তি, তুইত আমায় বড় ভালবাসিস, আমার মা বাপ কেউ নেই, তুই আমার মার মত, একটা অন্যায় করেছি, তাকি সহ্য করে নিতে হয় না।"

বেলা পড়িয়া আসিলে গৃহিণী শান্তিকে ধমকাইয়া বলিলেন—"শান্তি, তোদের কি আক্কেলও নেই, বৌমার চুলটা না বেধে উব্‌ড়ো খুব্‌ড়ো হয়ে গেছে, কদিন ও চুল বাধে না, তোদের যেন সে খোজও নেই।"

শান্তি অবাক হইয়া গিয়া বলিল—"ওমা, সে কি আর চুল বাধ্‌তে চায়।" আর বলিতে পারিল না, ও-ঘরে গিয়া বিমলাকে ধরিয়া বসিল—"চল বৌদি তোমার চুল বেধে দি।"

"সে হবেখ'ন, আগে বাবার জলখাবার দিয়ে আসি।" বলিয়া বিমলা পলাইয়া গেল।

শান্তি পেছন ছাড়িল না, বিমলা জলখাবার দিয়া আসিতেই মুখ ভার করিয়া বলিল—"তোমার জন্মে যে আমরা পাঁচ কথা শুন্‌ব সে ত হবে না, চুল তোমার বাঁধ্‌তেই হবে।"

বিমলার মন নরম হইল, কিন্তু সাজিয়া গুজিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি হইল না, বলিল—"কেন মাকে তোরা বল্‌তে পারিস না যে, আমার মাথায় বেদনা হয়েছে, ওতে চিরুনি সেধোবার যো নেই।"

শান্তি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—"ওমা, এমন মিথ্যে কথা, আবার মাকে বল্‌তে পারি, আর তোমারইবা এ কেমন ধারা, দাদাবাবু গিয়ে থেকে মাথায় তেল টুকু দেবে না।"

"আবার" "না বলেই বা কি করি।" বলিয়া শান্তি গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইল, "কেন তোর মুখে কি আর কোন কথা নেই, রোজই যে চুল বাঁধ্‌তে হবে, তার মানে। "মানে আমি জানিনি, কিন্তু আগুতে ত বাধ্‌তে।" "সে আমার ইচ্ছে, তোর কি লা পোড়ার মুখী।"

শান্তি আবার গম্ভীর হইয়া পড়িল, বিমলা "খোকা কাঁদ্‌ছে" বলিয়া ঘুমন্ত দেবরকে কোলে তুলিয়া লইয়া সটান ছাদে গিয়া উঠিল।

(৯)

পরদিন সতীশের নাম ধরিয়া ডাকিতেই শোভা নীচে নামিয়া আসিয়া দোরের একপাশ ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এই যে নির্ম্মলবাবু, আসুন, আমি আরো ভেবে ছিলুম, কাল হয়ত আপনি আমার ওপর বিরক্ত হয়ে গেছেন, আজ আর আস্‌বেন না।"

কথাগুলি নির্ম্মলের কাণেও গেল না, সে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া শোভার দিকে লুব্ধের মত নিমেষহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল, সমস্ত ঘরময় ইলেক্-

টি্কের দীপ্ত রশ্মি বিজয় গর্ব্বে বিজলি খেলিতেছিল, শোঁ। শোঁ। করিয়া উপরে পাখা চলিতেছিল, আর বাহিরের মন্দবায়ু গোল দীঘীতে স্নান করিয়া শোভার চূর্ণকুন্তলের সুবাস লইয়া একবারের মত যেন এই ঘরের মধ্যেও উঁকি মারিতেছিল, পায়ের উপর পা রাখিয়া শোভা দাড়াইয়া ঠিক যেন সৌন্দর্য্যের রাণী,তাহার এলাইত বক্র অলকগুচ্ছ জানু পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, শিরীষ-কোমল একখানা হাত কপাটের একটা দিক ধরিয়া ছিল, নীল নয়নের কৃষ্ণ তারকাটি যেন পরিপূর্ণ আগ্রহ লইয়া নির্ম্মলকে সাদর আহ্বানে আপ্যায়িত করিতেছিল। নির্ম্মল মুগ্ধ বিস্মিত, যেন আরাধনারত মৌন পুরোহিত, সহসা শোভা নড়িয়া উঠিল, নির্ম্মলের মনও যেন তালে তালে নাচিয়া উঠিল, চমক ভাঙ্গিল,—"কি অত দেখ্ছেন। স্মিতহাস্যে শোভা জিজ্ঞাসা করিতেই লজ্জি-তের মত নির্ম্মল বলিল—"সতীশবাবু কি আজও বাড়ীতে নেই।" "না তিনি ষ্টেশনে গেছেন, দেশ থেকে আমার পিসীমা আস্ছেন, তাকেই নিয়ে আস্তে।" "আজকেও তাঁর সঙ্গে দেখা হল না।" "বসুন না আপনি আজ তিনি ঠিক এসে উপস্থিত হবেন, একটু অপেক্ষা কল্লেই দেখা হবেখন, কাল দেখা কত্তে না পেড়ে তিনি বড়ই দুঃখ করেছেন।"

নির্ম্মল বসিল, শোভাও একটা ইজি চেয়ায়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"অবকাশ থাকতে, ঠাকুরকে বলি চা দিয়ে যেতে।"

নির্ম্মল স্বচ্ছন্দ চিত্তে উত্তর করিল—"আপনার আতিথ্য ফেলে যাবার মত কাজ ত আমার নেই।"

ঠাকুরকে ডাকিয়া চায়ের হুকুম করিয়া শোভা অন্য কথা উঠাইতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"আচ্ছা পাড়াগায়ে মেয়েদের বেতে হয়ত এত টাকা খরচ কত্তে হয় না?"

"টাকা খরচ যে না কত্তে হয়, তা নয়, তবে এখানে নানা ভাবে নানা কাজে টাকাটা বেরিয়ে যায়, ততটা সেখানে যায় না, তার মানে পাড়াগায়ে অত জোটেও না, পাড়গাঁয়ের লোকগুলি অত চায়ও না।"

"কিন্তু কি যুগটাই পড়েছে, মেয়ের বিয়েতে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত না হয়ে আর কারুর উপায় নেই, যেন টাকাই পরমার্থ।"

নির্ম্মল উত্তর করিল না, শোভা আবার বলিল—"আচ্ছা আপনারা মেয়ে মানুষকে অত নীচ ভাবেন কেন, হিঁদুর ঘরে ত তারা দাসী, টাকা না হলে তাদের সে অধিকারটুকুও আপনারা দিতে চান না।"

ব্যঙ্গটা নির্ম্মলের বিঁধিল, আহত হইয়া সে বলিয়া উঠিল,—"সবাই তা ভাবেও না, সে ব্যবহার করেও না, আর মেয়ে হলেইত হল না।"

"কৈ এমন ত মোটেও দেখ্‌ছি না, যে টাকার কথা ভুলে মেয়েটাকে আদর করে ঘরে নেয়।"

"ঢের হচ্ছে, এই ধরুন না।" বলিয়া নির্ম্মলের কথা আট্‌কাইয়া গেল, শোভা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"বলুন না, বল্‌তে বল্‌তে এমন থম্‌কে গেলেন যে?"

নির্ম্মল ঘামিয়া উঠিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"আপনাকে ঘরের লক্ষ্মী করা যাদের ভাগ্যে ঘট্‌বে, তারা কি আর টাকার কথা ভাব্‌বে, না সে ভাবনা তাদের আস্‌তে পারে, গুণ যে সবাইকে ছাপিয়ে উঠে।" বলিয়া সে মুখ নীচু করিল।

শোভাও মুচকি হাসিল, ঠাকুর চা লইয়া আসিতে বলিল—"আগে চা খান, তারপর তর্ক কর্ব্ব।"

চায়ের পেয়ালা ঠোঁটের গোড়ায় ধরিয়া নির্ম্মল গম্ভীর হইয়া বলিল—"এতে আর ত তর্ক নেই, এযে খাটি সত্য।"

"খাটির দিন উত্‌রে গেছে, বাজারে মেকিও চলে, যদি তার পাছে, রাশ থাকে।" বলিয়া পুরুষজাতির প্রতি ঘৃণিত কটাক্ষে শোভা তন্ময় হইয়া উঠিল।

খানিকক্ষণ থামিয়া সে আবার বলিল—"এর চেয়ে আর এক কাজ করুন না, মেয়ে যদি এমনি নাই বিকুয় ত এগুলোকে গলা টিপে মেরে ফেলুন, নয়ত বে না দিয়ে সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে বের করে দিন।"

নির্ম্মল হতভম্ব হইয়া পড়িল—এ তিরস্কারটা শোভা কেন যে করিতেছে, সে তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না, বলিল—"সে কথা আপনার মিথ্যে নয়, যদি টাকারই রাজত্ব হয়, গুণগরিমা কেউ নাই বোঝে, তবে তাদের মত পশুর হাতে এ রত্নগুলো তুলে না দিয়ে, স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, এরাও ভগবানের জীব, ভগবান্‌ই এদের পথ করে দেবেন।"

"ঐ দাদাবাবু এসেছেন" বলিয়া শোভা উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার সজ্জিত অবয়বের সুন্দর ছবি প্রতিকৃতির মত নাচিয়া উঠিল, গোলাপী রঙ্গের কাপড়-খানা ভেদ করিয়া যেন যুবতীর যৌবনশ্রী ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, বীণার ঝঙ্কার বা কোকিলের কুহুতানের মত তাহার স্বরে নির্ম্মল বাস্তব জগৎ ত্যাগ

করিয়া যেন স্বর্লোকের সুখ ও আনন্দ লাভ করিতেছিল, বৃদ্ধা পিসীকে সঙ্গে করিয়া সতীশ আসিয়া গৃহে ঢুকিয়া হাসিমুখে বলিল—"কে নির্ম্মলবাবু, আপনি দুদিন থেকে আমার জন্যে বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন, এজন্য আমি অনুতপ্ত, মাপ চাচ্ছি।"

বৈঠকখানা ঘরে পা দিতেই বর্ষীয়সী পিসীর চোখ জ্বালা করিয়া উঠিল, কুরুচিপূর্ণ আসবাবের বাহার দেখিয়া মুখ যেন আপনা হইতে বিকৃত হইয়া গেল, বিশেষ করিয়া এই যুবকের সহিত অবিবাহিতা যুবতী শোভার একত্রাবস্থিতিতে তিনি যেন কেমন হইয়া পড়িলেন, এক মুহূর্ত্ত তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না, যখন তাহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল, তখন শোভা আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়াছিল, তিনি রুক্ষকণ্ঠেই বলিলেন—"আয় শোভা, আমরা উপরে যাই।" (ক্রমশঃ)

মনের মুখোস।

লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(২)

অনাহার প্রপীড়িত বালিকার দুঃখের ইতিহাস মোক্ষদার মুখে বিস্তৃত ভাবে শুনিয়া বাসার সমস্ত যুবকগণের মনে বেশ একটু করুণার সঞ্চার হইল—হইবারই কথা, কারণ মেসের সকলেই যুবক,—সংসার-জাঁতায় পেষিত হইয়া আজও তাহাদের প্রাণ পাষাণ হয় নাই। তাহা ছাড়া বালিকার রূপও যে সে বিষয়ে তাহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল একথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। মোক্ষদার দুর্ভাবনা ঘুচিল। মেসের প্রত্যেক যুবকই, এমন কি ভোলানাথ খুড়ো পর্য্যন্ত মোক্ষদার ভাইঝির ভরণ-পোষণের ভার লইতে একবাক্যে স্বীকৃত হইলেন। মেস বাটীর ত্রিতলের ছাদের উপর একটী ক্ষুদ্র ঘর ছিল, ঘরখানা নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া এপর্য্যন্ত সেখানা বরাবরই খালিই পড়িয়া ছিল। সেই ঘর খানিতেই মোক্ষদার ভাইঝির বাসের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মোক্ষদা এ যাবত মেসের কাজ

কর্ম্ম সারিয়া রাত্রে তাহার নিজের বাসায় শুইতে যাইত, কিন্তু তাহার ভাইঝি যে দিন হইতে মেসে বাস করিতে লাগিল সেই দিন হইতে তাহাকেও তাহার বাসা ছাড়িয়া দিতে হইল। ছোট ভাইঝিকে কিছুতেই সে একাকী রাখিতে পারে না,—কাজে-কাজেই তাহাকেও আসিয়া মেসবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্র, কলিকাতা মহানগরীর উপর আগুনের হলকা ছড়াইয়া দিয়া চারি দিকে যেন আগুন বৃষ্টি করিতেছিল। সেই অসহ্য তাপ সহ্য করিয়া বাটী হইতে বাহির হয় কাহার সাধ্য! রাজপথে লোক চলাচল নাই বলিলেই হয়। যাহাদের কাজে বাহির হইতে হইবে তাহারা বহুক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছে,—আর যাহাদের বাহির হইতে হইবে না—তাহারা গৃহের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আহারের পর বিছানায় পড়িয়া নানা সুখ-স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ঘামিয়া ভিজিয়া একেবারে ঢোল হইয়া উঠিতে ছিল। মেসের অধিকাংশ গৃহেই তালা বন্ধ,—প্রায় সকল যুবকই যাহার যাহার কাজে বহুক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছে। মোক্ষদা রন্ধন গৃহের কাজ সারিয়া উঠিল, বাসনগুলা উঠানের মাঝখানে জড় করিয়া,—কলের সম্মুখে হেটমুণ্ডে হাতমুখ ধুইয়া লইল। তাহার পর হেলিতে দুলিতে সিড়ি দিয়া উপরে উঠিল। উপরে এ ঘর সে ঘর উঁকি দিয়া বেশ একটু গজেন্দ্র গমনে ঘোষ বাবুর গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল।

বেঁটে ঘোষ শয্যার উপর পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিয়া সবে মাত্র বিছানা ছাড়িবার আয়োজন করিতেছিল। সে বহু রাত্রে আসিয়া শুইয়াছে, বহু ডাকাডাকি হাকাহাকি সত্বেও এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারে নাই। মোক্ষদা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটা বক্র দৃষ্টি ঘোষের উপর নিক্ষেপ করিয়া বেশ একটু চড়া সুরে আরম্ভ করিল, "বলি ঘোষ বাবুর ঘুম কি আজ আর ভাঙ্গবে না। আজ বুঝি আর নাইবার খাবার দরকার নেই। ঠাকুর আর কতক্ষণ আপনার অপেক্ষায় হাঁড়ী আগ্‌লে বসে থাকবে? বলি আপনার কি একটুও বুদ্ধি বিবেচনা নেই, আমরা গরীব, আমাদেরও তো দুটো ভাত মুখে দিতে হবে। আপনারা বড় লোক, আপনাদের ক্ষিদে তেষ্টা না থাকৃতে পারে, তা বলে গরীব দুঃখীকে কি এমনি করে কষ্ট দিতে হয়।"

ঘোষের নিদ্রাটা বহুক্ষণই ভাঙ্গিয়া ছিল, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমেজটা

কাটে নাই। মোক্ষদার কথায় সে একটা প্রকাণ্ড রকম হাই তুলিয়া একেবারে শয্যার উপর ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। দুই হস্তে চক্ষু দুইটি রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, "এখন বেলা ক'টা মোক্ষদা ?"

মোক্ষদা বিরক্তি পূর্ণ স্বরে বলিল, "বেলা কি আর আছে বাবু। কলে আবার জল আসবার সময় হ'লো ?"

একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় মোক্ষদার কথায় ঘোষের মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল। সে বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কলে জল আস্‌বার সময় হ'লো কি গো! আমার সকাল নটার সময় যে একটা মস্ত কাজ ছিল।"

মোক্ষদা বিদ্রূপ-স্বরে উত্তর দিল, "এয়ারকি দেবার সময় তো আপনাদের মনে থাকে না, যে কাজ কর্ম্ম আছে। সে যাক্ এখন উঠুন, নেয়ে খেয়ে আমাদের মাথা রক্ষা কর্ব্বেন চলুন। আমাকে আবার খুদিকে সকাল সকাল রেখে আস্‌তে হবে।"

ঘোষের বিস্ময়ের মাত্রাটা আরো একটু চড়িয়া উঠিল, সে বাম চোখটা ঈষৎ একটু মুদ্রিত করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল। "রেখে আস্‌বে আবার কোথায় গো, দেশে নাকি ?"

মোক্ষদা মুখখানা ভার করিয়া নাকি সুরে বলিল, "দেশে যদি দু'মুটো খেতে পেত, তাহ'লে কি আর কল্‌কাতায় নিয়ে আসি। খুদির একটা ভালো কাজ হয়েছে। সেখানে তাকে রেখে আস্‌তে যাব।"

"খুদির কাজ হয়েছে! খুদি কাজ কর্ব্বে কি গো।" কথাটা ঘোষ বিশ্বাস করিতে পারিল না। এ কথা একেবারে বিশ্বাসের যোগ্য নয় ভাবিয়া হা হা শব্দে মোক্ষদার মুখের সম্মুখে বিকটভাবে হাসিয়া উঠিল।

ঘোষের হাসির ধমকে মুখ চোখের ভাবে মোক্ষদাও আর একটু হইলেই হাসিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু নিজেকে খুব সামলাইয়া লইয়া বেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "ঘোষ বাবু বিশ্বাস কচ্ছেন না, এতে হাসবার কি আছে। সত্যিই খুদির কাজ হ'য়েছে। হরিশবাবু করে দিয়েছেন, তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে ?"

হরিশের নামে ঘোষকে মুহূর্ত্তে গম্ভীর করিয়া দিল,—সে বেশ একটু উদ্‌গ্রীবভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হরিশবাবুর বন্ধু! সেটী আবার কে ?".

মোক্ষদা মাথাটা নাড়িয়া উত্তর দিল, তাঁর নাম শুনে আর কি কর্ব্বেন বলুন? বেলা ঢের হয়েছে, যান স্নান করুন গে। আমি যাই বিনয় বাবুরী বিছানা গুলো আবার রোদে দিতে হবে।"

কথাটা শেষ করিয়াই গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য মোক্ষদা ফিরিয়াছিল কিন্তু ঘোষের বাজখাঁই আওয়াজে তাহাকে আবার ফিরিতে হইল। ঘোষ একেবারে ভরাট গলায় বলিয়া উঠিল, "সেটা হচ্ছে না চাঁদ, নামটি না জেনে ছাড়ছিনে, তোমার ভাইঝি তো এখানে মোটে পনর ষোল দিন এসেছে, এর ভেতর দেখছি হরিশ অনেক কাজ করে বসেছে। এ যে দেখছি মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশী হলো! না বাবা, বন্ধুটির নাম শোনা ভয়ঙ্কর দরকার হয়ে উঠেছে?"

মোক্ষদা মিহিস্বরে বলিল, "নাম শুনে আর কি কর্ব্বেন বলুন! তাঁর বন্ধুটি হচ্ছেন একটী স্ত্রীলোক?"

"স্ত্রীলোক বন্ধু! এ যে ক্রমে গোলক ধাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।" ঘোষ তক্তপোষের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহা ব্যস্তভাবে বলিল, "বল বল শিগ্গীর—নামটাই শুনি? এমন বন্ধুর নাম না শুনে থাকা যায়!"

মোক্ষদা বেশ একটু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল "ঘোষ বাবু, আপনি বড় নাছোড়বন্ধা, তার নাম না শুনলে আপনার যেন আর ভাত হজম হবে না। তার নাম হচ্ছে অনুশীলা?"

"অনুশীলা! সেই বাণী থিয়েটারের অনী।" উৎকণ্ঠিত সংশয়ে মোক্ষদার কথায় একেবারে উগ্রভাবে বাহির হইয়া আসিল। ঘোষ দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রাগিয়া উঠিল, "খুদি কাজ কর্ব্বে অনীর বাড়ীতে! হরিশের আস্পর্দ্ধা ত কম নয়!"

মোক্ষদা ঘোষের কথায় বাধা দিয়া মুখখানা কালো করিয়া বলিল, "কাঙ্গাল গরীবের উপকার করেছেন, এতে আস্পর্দ্ধার কাজ কি হলো? কাজ খুব কম, অথচ মাহিনে ঢের বেশী। গরীব দুঃখীর মেয়ে, খেটে খাবে তাতে আবার দোষ কি?"

"দোষ কি! হরিশে আসুক, আজ চাবুকের মুখে বুঝিয়ে দেব দোষ কি? আবার বক্তিমা দেওয়া হয়; স্ত্রীজাতির সম্মান না করেই আমাদের এত অধঃপতন।' অথচ ভেতরে ভেতরে রীতিমত মতলব চ'লছে। আমি যাচ্ছি বিনয়ের কাছে, রইলো তোমার খাওয়া দাওয়া। আমি এর একটা রীতিমত বিহিত না করে ছাড়ছিনি।" ঘোষ তক্তাপোষ খানার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। মোক্ষদাকে আর দ্বিরুক্তি করিতে দিল না। কাছাটাকে হাতে গুজিতে গুজিতে একেবারে বিনয়ের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র বিস্ময়ে তাহার চোখ দুইটা যেন একেবারে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল। এ কি ব্যাপার!

বিনয় রীতিমত আরাম করিয়া তাহার তক্তাপোষের উপরিস্থিত রাজ-হংসের পালকের মত সাদা ধপধপে বিছানায় চৌদ্দ পোয়া হইয়াছে। আর খুদি একখানা তালপত্রের পাখা লইয়া তাহার শিওরের নিকট দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ব্যজন করিতেছে। যদিও বিনয়ের দুইটী চক্ষুই মুদ্রিত ছিল তথাপি তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিধি ঘোষকে যেন হলফ করিয়া বলিয়া দিল যে সে কিছুতেই নিদ্রিত হয় নাই। বিস্ময়ের ধমকটাকে একটু সামলাইয়া লইয়া ঘোষ একেবারে রীতিমত চড়া পর্দ্দায় খুদিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল, 'খুদি তুই যে বড় এখানে একলাটি চুপটী করে দাঁড়িয়ে বিনয়কে বাতাস কচ্ছিস্। এক রত্তি মেয়ে—ও বাবা তোমার পেটে পেটে এত বিদ্যে!"

ঘোষ বাবুর স্বরে খুদির মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রাজ্যের লজ্জা যেন একেবারে চারিপাশ হইতে আসিয়া তাহাকে মাটির সহিত মিসাইয়া দেবার চেষ্টা করিল। লজ্জার তাড়নায় তাহার ভাসা ভাসা সেই কালো চক্ষু দুইটী হইতে দু এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সে আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কাঁদ কাঁদ স্বরে উত্তর দিল, "বিনয় বাবু যে বল্লেন?"

সহসা খুদির নয়নে জল দেখিয়া ঘোষ বেশ একটু ঘাবড়াইয়া পড়িল। যে খুদিকে রীতিমত শাসন করিয়া দিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু এক ফোঁটা চোখের জলে তাহার প্রাণের ভিতরে সমস্ত কল্‌কবজা একেবারে ওলোট পালোট হইয়া গেল। সে ব্যাপারটাকে হালকা করিয়া ফেলিবার জন্য খুদির মুখের দিকে চাহিয়া হা হা করিয়া একটা বিরাট হাসির হররা তুলিল। সে হাসির ধমকে বিনয়ের সুখ নিদ্রা একেবারে মাথায় যাইয়া উঠিল, তাহার দেহটাকে মুহূর্ত্তে যেন একটা বৈদ্যুতিক কলে একেবারে খাড়া করিয়া শয্যার উপর বসাইয়া দিল। সে কিছুক্ষণ ঘোষের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, 'কি সর্ব্বনাশ! হাসির এমন অপমান, এমন বিশ্রী রকম চেহারা এ কেবল তোমার কাছেই সম্ভব। হাস্যমাখা মুখ মনে হলেই এক সুশ্রী জিনিষেরই ছবি প্রাণের ভিতর জেগে উঠে। তোমার হাসি যদি কোন কবি দেখতো তা হলে হাসিকে আর সুন্দর বলে বর্ণনা ক'ত্তনা। ভাই আজি তোমার দুটা চরণে ধচ্ছি, তুমি যা হচ্ছে হয় কর—শুধু হেস না।"

ঘোষ তখন তক্তপোষের উপর আসিয়া বসিয়াছিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি করবো বল ভাই, ব্যাপার দেখে আমি না হেসে থাকতে পাচ্ছি কই। এমন ব্যাপারে যদি আমি হাসি চেপে রাখতে যাই তাহ'লে নিশ্চয় তোমায় বলছি পেট ফুলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। এদিকে পাখা চলছে, ওদিকে চাকরীর জোগাড় লেগেছে এতেও যদি কেহ না হাসে সে নিশ্চয়ই মানুষ নয়।"

বিনয় গম্ভীর ভাবে বলিল, "একটু শুধু আরাম পাবার জন্যই দিন রাত মানুষ মাথা ফাটাফাটি করছে, তুমি কি আমায় এমনি নির্ব্বোধ ভাবো যে বিধিদত্ত আরাম যা আমার হাতের কাছে ভগবান ধরে দিয়েছেন তা আমি হেলায় হারাব—পাগল"! ঘোষ গম্ভীর ভাবে মাথাটা নাড়িল। সে বিনয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সে যা হক্, হরিশের আক্কেলের কথা শুনেছ! তিনি খুদির চাকরী জোগাড় করে দিয়েছেন, বাণী থিয়েটারের অনুশীলার বাড়ী?"

ঘোষের কথায় বিনয়ের বিশেষ কোন চাঞ্চল্য লক্ষ্য হইল না, সে শান্ত স্বরেই উত্তর দিল, "বাণী থিয়েটারের অনুশীলা, যিনি অভিনেত্রী কুলরাণী, সুন্দরী শিরোমণি—

"তাই নাকি, তা হলেতো লাটখানাকে দেখতে হচ্ছে। থিয়েটারে সুশ্রী স্ত্রীলোক! কি বল্‌ছো হে বিনয়। আমার তো ধারণা ছিল থিয়েটারটা একটা কুশ্রীর আড্ডা—"ঘোষ একেবারে তক্তপোষ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু কথাটা শেষ করিতে পারিল না। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল মোক্ষদা। সে বিনয়ের দিকে ফিরিয়া মুখখানা ভার করিয়া বলিল, "দেখুন দেখি বিনয় বাবু, ঘোষবাবুর আক্কেলের কথা। হরিশবাবু খুদির একটা চাকরী করে দিয়েছেন, তাই ঘোষবাবু তাঁকে চাপ্‌কাতে চান। ওঁর এত গায়ের জ্বালা কেন বলুনতো?"

ঘোষ মোক্ষদার মুখের নিকট হাতখানা নাড়িয়া তাড়াতাড়ি বলিল, মোক্ষদা, জ্বালা একেবারে প্রলেপ খেয়ে জল হয়ে গেছে। আমি নিজে নিয়ে তোমার ভাইঝিকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ছি। আগে একটু বলে দিতে হয় যে খুদি যার কাছে চাক্‌রী কত্তে যাচ্ছে তিনি একটা বেশ সুশ্রী জিনিষ। মোক্ষদা আমার এই কান দুটো মলে দাও, এমন ভুল, বোকাম কথা কখনও না আর মুখ দিয়ে বেরোয়।"

মোক্ষদা মুখটা সিটকাইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "সব কথায় ঘোষ বাবুর ঢং। ভাল লাগে না, গা জ্বলে যায় ?"

মোক্ষদার কথার উত্তরে বিনয় কি বলিতে যাইতে ছিল কিন্তু বিশ্বনাথবাবুকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে চাহিয়া বলিল, "আরে এস, এস বিশ্বনাথ বাবু এস।"

তাহার পর ঘোষের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি বোধ হয় একে চেন না ঘোষ, ইনি হলেন বিশ্বনাথ বাবু ; বাণী থিয়েটারের মালিক অর্থাৎ এরই হ'লো বাণী থিয়েটার।"

বিশ্বনাথকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া, মোক্ষদা তাড়াতাড়ি একটু আড়ঘোমটা টানিয়া বেশ একটু সঙ্কোচিত ভাবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বিশ্বনাথ বিনয়কে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে ?"

ঘোষ তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "উনি বড় ইনি নন, উনি হচ্ছেন এই মেসের ঝি ; ভগবানের কি বিচিত্র সৃষ্টি, ওদিকে মন দেবার কোন দরকার করে না। আপনি মশাই বসুন আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে।"

ঘোষ হাত ধরিয়া বিশ্বনাথকে তক্তপোষের উপর বসাইয়া দিয়া পুনরায় বলিল, "এতেও বলে কিনা ভগবান করুণাময় নয়, শুধু একটা ফেকড়ার কথা হয়েছে। দেখ ভগবানের দয়া—অমনি একেবারে শুঁড়িতে টান ধরেছে। সে যাক মশাই, আমায় একটু অনুগ্রহ কর্ত্তে হবে। আপনাদের অভিনেত্রী-শিরোমণি অনুশীলার সঙ্গে যদি দয়া করে আমার আলাপটা করিয়ে দেন।"

বিশ্বনাথের দেহটা বেশ সুগোল, মস্তকের চুলগুলি কুঞ্চিত। নাকে সোনার চসমা, গায়ে পাঞ্জাবী। বিশ্বনাথ ঘোষের কথায় হাসিতে হাসিতে বলিল, "এতে আবার অনুগ্রহ কি ! এতো এমন বিশেষ কোন শক্ত কাজ নয়। চলুন না, আপনার যখন ইচ্ছে আলাপ করিয়ে দেব।"

বিনয় মুখখানা যেন গম্ভীর করিয়া বলিল, "ঘোষ বল্‌ছো কি ? একটা বেশ্যার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে—?"

ঘোষ মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "তুমি বই লেখ, গ্রন্থকার, আর এটুকু জ্ঞান না—তোমার দ্বারা কিছু হবে না ; বেদান্তে স্পষ্ট লেখা আছে কি জ্ঞান—"বেশ্যার বাড়ী গেলে নষ্ট হয় না, যদি স্বপ্নের মত ভোলা যায়।"

ঘোষের এই সুন্দর উত্তরে বিনয় ও বিশ্বনাথ কেহই আর না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

(৩)

"হ্যাগা, তুমি কি ভেবেছ! ঠাকুরপোর বিয়ে কি আর দেবে না!" বলিতে বলিতে সরোজিনী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সরোজিনীর বয়স বিংশের উর্দ্ধে নহে, দেহের গড়নটি বড় সুন্দর। বর্ণ শ্যাম কিন্তু উজ্জ্বল। মুখখানিতে লক্ষ্মীর শ্রীর কোনই অভাব নাই। এক অপূর্ব্ব সুন্দর স্বর্গের হাসিতে তাহার মুখখানি সদাই হাস্যময়ী। অনুনয় তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র গৌরচাঁদের সহিত ভূত প্রেতের গল্পে ভারগ্রস্থ সময়টা ধ্বংশ করিতে ছিলেন, পত্নীর স্বরে মাথাটা তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বিয়ে দিতে হবে বই কি ?"

সরোজিনী তখন স্বামীর সম্মুখে আসিয়া বসিয়া ছিল, মৃদু হাসিয়া বলিল, "বেশতো নিশ্চিন্ত ভাবে বল্‌লে, বিয়ে দিতে হবে বইকি, বিয়ে দিতে হবে বই কি বল্লেই বুঝি বিয়ে দেওয়া হলো। কি করে বল, কথার কোন ছিরি ছাঁদ নেই। বিয়ে দেব বল্লেইতো আর বিয়ে দেওয়া হয় না, তারতো একটা চেষ্টা-চুষ্টি করা চাই। দশ জায়গায় দেখা শুনো কর্ত্তে হবে, দশ জনকে বল্‌তে হবে, অমনি তো আর বিয়ে হবে না। আর কনে অমনি এসেও তোমার ভাইটির পায়ে জড়িয়ে পড়বে না।"

গৌরচাঁদ তাহার জননীর পৃষ্ঠের উপর পড়িয়া, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুইখানি দিয়া গলা জড়াইয়া জননীর মুখের নিকট মুখ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা কবে বিয়ে হবে, বেশ হবে কাকা বাবুর বে ?"

সরোজিনী পুত্রের গণ্ডে চুম্বন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোর বাবাকে জিজ্ঞাসা কর না, দেখছিস্‌নে কেমন মানুষ সব বিষয়ে নিশ্চিন্তি। এদিকে দশজনে যে দশ কথা বলে তার কি কোন হুস্ আছে। না, আমি আর কোন কথা শুনতে চাইনি. আমায় একেবারে ঠিক করে বলে দাও কবে কোন তারিখে ঠাকুরপোর বিয়ে দেবে ?"

অনুনয় একটা তাকিয়ায় অর্দ্ধশয়িত হইয়া পার্শ্বস্থিত একখানা খবরের কাগজে মনোসন্নিবেশ করিয়াছিলেন, পত্নীর কথায় খবরের কাগজ হইতে চোখটা তুলিয়া একবার পত্নীর আপাদ মস্তক একটু বিস্মিতের ন্যায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বিয়ে হ'লো প্রজাপতির হাত, বিয়ে বল্লেই কি বিয়ে

দেওয়া যায়। তুমি হিন্দু-কুল-ললনা হয়ে ফস্ করে কি করে বলে ফেল্লে বল দেখি, যে বিয়ের একবারে ঠিক তরিখ বলে দাও। আমি কি প্রজাপতি, না বিধাতা।"

সরোজিনী মুখখানি ভার করিয়া বলিল, "আমার সব সময় ত ঢং ভালো লাগে না। সংসারে কখন কি মানুষ একা একা থাকতে পারে। আমি তো কারুর কথা শুন্‌বো না,—আমি এই মাসের মধ্যেই ঠাকুরপোর বিয়ে দেবই—"

অনুনয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, তাহ'লেতো যত গোল মিটেই গেছে,—তখন এত কথাই বা কেন, আর মুখ ভারই বা কিসের জন্য। তবে কথাটা হচ্ছে এই—যার বিয়ে তার খোঁজ নেই পাড়া পড়শির ঘুম নেই। বিয়ের বিষয়ে বিনুর ত কোন চাড় নেই, তোমার দেখছি তার চেয়ে ঢের বেশী।"

সরোজিনী তাহার স্বামীর কথার মাঝখানেই বাধা দিল, বলিল, "না সে তো আর তোমার মত পাগল নয়—যে বড় ভায়ের গলা ধরে কেঁদে কেঁদে বলবে, দাদা আমার বিয়ে দাও—দাদা আমার বিয়ে দাও। নিজে ভায়ের বিয়ে দিতে পাচ্ছ না তাই বল। আমিতো জানি তুমি যে অশেষ কুঁড়ে। তোমার কোন্ যোগ্যতাটা আছে বল?"

পত্নীর কথায় অনুনয়ের ভিতরের চাপা হাসিটা মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে সত্যি কথা শুন্‌বে,—বিয়ের যে কত সুখ আমি তো তা বেশ টের পাচ্ছি, তাই সাধ করে আর ভায়ের গলায়—এ বোঝা আর ঝোলাতে চাইনি। বিনুর যদি ইচ্ছে হয়—তাহলে তো সে নিজেই সে কাজ কর্ত্তে পারে। তার বিয়ের জন্য তোমারই বা কি, আমারই বা কি?"

সরোজিনী মাথাটা নাড়িয়া বেশ একটু ক্রুদ্ধ স্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, না,—তোমার ও ঠাট্টার কথা আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি এবার আর তোমার কোন কথা শুনব না,—আমি ঠাকুর পোর জন্যে এই মাত্র একটী মেয়ে ঠিক করে এলুম,—ওই যে শম্ভুসিংহ যিনি জজের আদালতে ওকালতী করেন তাঁর স্ত্রীর বোনঝি—। যেমন দেখতে,—তেমনি লেখা পড়া জানা। মাসীর বাড়ীতে এসেছে। আজি সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ী তাকে—

সরোজিনী কথাটা শেষ করিতে পারিল না, ঝি আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।। ঝি-এর পদশব্দে উভয়েরই দৃষ্টি দরজার দিকে পতিত হইল

সরোজিনী পরিচারীকার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে পুঁটের মা ?"

পুটের মা এক গাল হাসিয়া উত্তর দিল, "কারা সব এসেছেন,—আপনাকে ডাকৃছেন।"

পরিচারিকার কথা শেষ হইতে না হইতেই সরোজিনী উঠিয়া দাঁড়াইল, সে স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "এইমাত্তর তোমায় যাদের কথা বল্লুম, বোধ হয় তাঁরাই এসেছেন। সেই মেয়েটীকে একবার তোমাকে দেখাব বলে, সন্ধ্যার আগে একবার আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে বলে এসেছিলুম। নিশ্চয় তাঁরা এসেছেন। বোস, যেন কোথাও বেরিয়ে যেও না, আমি এখনি সেই মেয়েটীকে এনে তোমায় দেখেছি।"

অনুনয়ের কোন উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই সরোজিনী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। গৌরচাঁদও নূতন লোক দেখিবার কৌতুক বোধ হয় দমন করিতে পারিল না; কাকাবাবুর বৌ এসেছে, কাকাবাবুর বৌ এসেছে বলিতে বলিতে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল? অনুনয় আবার খবরের কাগজ খানা তুলিয়া লইলেন।

অনুনয় ও বিনয়ের পিতা পার্ব্বতীবাবু যখন মারা যান তখন তিনি তাঁহার পুত্রদিগের জন্য বেশ মোটা রকমই সংস্থান করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ও একটী কন্যা। কন্যার বিবাহ তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি জীবনটা মহা আনন্দেই কটাইয়া গিয়াছিলেন, মৃত্যুতে কাহাকেও নিরানন্দ করেন নাই। পুত্রদিগের উপর কোন ঝোকিই রাখিয়া যান নাই। বরং যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাই নাড়িয়া চাড়িয়া বুঝিয়া চলিলে, অন্য কোন কাজ কর্ম্ম ব্যতীতই আভাব-শূন্য অবস্থায় মহা সুখেই পুত্রদিগের জীবন কাটিতে পারে। অনুনয় দেশে থাকিয়া পিতার সঞ্চিত অর্থ নাড়িয়া চাড়িয়া বৃদ্ধি করিতে ছিলেন আর বিনয় কলিকাতায় মেসে থাকিয়া, সাহিত্যের খেয়াল লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে জীবনটাকে বেশ কাটাইয়া দিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অনুনয়ের বিবাহের অল্পদিন পরেই পার্ব্বতী-বাবুর মৃত্যু হওয়ায় বিনয়ের বিবাহটা এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। বিবাহে বিনয়ের বিশেষ কোন চাড় নাই দেখিয়া অনুনয় সে বিষয়ে মোটেই মাথা ঘামান নাই। বিনয়ের যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই সে বিবাহ করিতে পারিবে

জিনী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার ঠাকুরপোর বিবাহের জন্য মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন,—তাঁহার সহিত যাহারই দেখা হইত, তাহাকেই তাঁহার ঠাকুরপোর জন্য একটী ফুট ফুটে সুন্দরী পাত্রীর কথা বলিতে ছাড়িতেন না। সরোজিনীর যত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও এ যাবৎ সুবিধা গোছের পাত্রি জুটিয়া উঠে নাই।

অনুনয় খবরের কাগজ খানা নাড়িয়া চাড়িয়া সময়টা কাটাইতে অক্ষম হওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গৃহের ভিতর ধীরে ধীরে আসিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিতে ছিল। ভৃত্য গৃহে আলো দিতে আসিল। অনুনয় ভৃত্যের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা কি কচ্ছে রে?"

ভৃত্য আলোটা একটা টিবলের উপর রাখিতে রাখিতে উত্তর দিল 'শম্ভু-বাবুর বাড়ীর মেয়েরা সব এসেছেন,—মা তাঁদের সঙ্গে গল্প কচ্ছেন।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। অনুনয়ও গৃহ হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন,—সেই সময় সরোজিনী একটী বার তের বছরের বালিকার হাত ধরিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। স্বামীর মুখের দিকে মুখ তুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ দেখি কেমন মেয়েটী,—আমি এই মেয়েটীর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে দেব।"

পত্নীর কথায় বিনয়ের দৃষ্টি লতিমার উপর পতিত হইল। বালিকার সাজ গোজ বিলাতী ধরণের। পায়ে উচু হীলের জুতা,—অঙ্গে কুঞ্চিত সাড়ী সেপ্‌টিপিনের সাহায্যে সমস্ত অঙ্গটা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। খুব টাইট চিকনের জ্যাকেট, উপর অঙ্গটা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মুখখানিতে পাউডার ভরা,—তাহার উপর পা দুইটিতেও রং মাখাইয়া গোলাপি করা হইয়াছে। ভগবানের সৃষ্টির উপর আগা গোড়াই রং করা। বালিকা সুন্দরী কি কুৎসিতা বুঝিবার কোন উপাই নাই। অনুনয় বালিকার উপর একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া,—পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বেশ?"

সরোজিনী মুখখানা ভার করিয়া বলিলেন, "শুধু বেশ বল্লেই বুঝি হ'লো? মেয়েটি কেমন দেখলে, পছন্দ হ'লো কি না বলো,—আমার এখনি তাদের পাকা কথা দিতে হবেতো। দু একটা কথা জিজ্ঞাসা কর, মেয়েটী যেমন লেখা পড়া জানে তেমনি গান বাজনা জানে। সংসারের কাজ কর্ম্মও সব শিখেছে?"

আমার কি আর একটা সতন্ত্র পছন্দ আছে—? তোমার ঠাকুরপোর সঙ্গে আগে বিয়ে দাও, তারপর একদিন নিশ্চিন্তে গান বাজনা শোনা যাবে ?"

সরোজিনী একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোমার সব কথায় ঠাট্টা, তুমি যাই বল,—আমি এই মেয়েটীর সঙ্গে—"

সরোজিনী কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না। বিস্মিতের ন্যায় গৃহের দরজার দিকে চাহিলেন। দরজার সম্মুখে বিনয়। গৌরচাঁদ তাহার কাকা-বাবুর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে একেবারে গৃহের ভিতর আনিয়া হাজির করিল। সরোজিনী বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হঁ্যা ঠাকুরপো; তুমি কখন এলে ?"

বিনয় তখন গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার বৌদিদির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল. হাসিতে হাসিতে বলিল, "বৌদিদি তোমার জন্যে মনটা হঠাৎ খারাপ হওয়ায় চারটের এক্সপ্রেসে চলে এলুম।

অনুনয় গৃহ হইতে বাহির হইতে ছিলেন, ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার বৌদিদি এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন। দেখ পছন্দ হয় কিনা ?"

তাহার পর পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এই নাও তোমার ঠাকুরপো এসেছে,—এইবার তার সঙ্গে বোঝা পড়া কর, আমি চল্লুম।"

অনুনয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সরোজিনী একগাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ দেখি ঠাকুরপো মেয়েটীকে পছন্দ হয় কিনা ? আমি এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। তোমার দাদার যা যোগ্যতা আমি তা বুঝেছি।"

বিনয় একবার বঙ্কিম ভাবে বালিকার দিকে চাহিল, হাসিতে হাসিতে তাহার বৌদিদির কথার উত্তরে বলিল, "খুব পছন্দ! তবে কি জান বৌদি সত্য কথা বল্‌তে হ'লে, মেয়েটীকে যেন পাটের বস্তার মত কলে চেপে এটে বাঁধা হয়েছে। ওর ভেতরে কি আছে, পচা কি ভাল, তা পাটের মহাজন যারা তারাই বল্‌তে পারে ? আমি ও বিষয়ে একেবারেই অর্ব্বাচীন,—কাজেই অক্ষম।"

বিনয়ের কথায় বালিকা লজ্জায় মৃদু হাসিয়া মাথাটী নীচ করিল।

(ক্রমশঃ)

গল্পলহরী

৫ম বর্ষ, } শ্রাবণ, ১৩২৪ ৪র্থ, সংখ্যা।

স্নেহের বাঁধন।

(শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী লিখিত)

ন'বছর আগে, একদিনের বন্যা জগন্নাথের সাতপুরুষের বাস্তভিটার চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়া যখন তাহার স্ত্রী এবং একমাত্র বুকের ধন শিশু কন্যাটিকে জন্মের মত কাড়িয়া লইয়াছিল, তখন সে স্বপ্নেও জানিত না যে ইহ জীবনে আবার তাহাকে নূতন করিয়া বাসা বাঁধিতে হইবে। কিন্তু বছর ফিরিতে না ফিরিতে সে, সেই কাজটায় হাত না দিয়া থাকিতে পারিল না।

সকালবেলা রাস্তার ধারের বৈঠকখানার বারাণ্ডায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া নবগোপাল মিত্র চা খাইতে খাইতে খবরের কাগজে জলপ্লাবনের সংবাদ পড়িতেছিলেন, চার বছরের মেয়ে 'তারা' পাশে বসিয়া মুড়ির ধামীটাতে চা ঢালিয়া মাখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে তিনদিনের অনাহারে ও পরিশ্রমে মড়ার মত হইয়া, অত্যন্ত কষ্টে কোনমতে দেহটাকে টানিয়া লইয়া, জগন্নাথ টলিতে টলিতে আসিয়া ধুপ্ করিয়া বারাণ্ডার উপর বসিয়া পড়িল।

সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক—রুক্ষ,—ধুলিমলিন পরণের কাপড়খানা ব্যবহারের অনুপযুক্ত, খালি গায়ে, একখানা গামছা পর্য্যন্ত দোছোট নাই—টাক্‌পড়া মাথাটার স্থানে স্থানে কাদার দাগ, চোখ দুটো অত্যন্ত বসিয়া গিয়াছে। এত হাঁপাইতে ছিল

যে, দেখিয়াই নবগোপালবাবু চমকিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন লোকটা বুঝি এখনি মরিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি খবরের কাগজখানা ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে তুমি—এখানে কি চাও ?"

"দয়া—দয়া করে—এ—এক-টু—জ—জল—দিন—আগে।"

অতিকষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কথা ক'টা বলিতেই যেন তার সমস্ত প্রাণটা বাহির হইয়া গেল, জগন্নাথ দেয়ালে ঠেস্ দিয়া অবশের মত হইয়া পড়িল। ভয়ে ব্যস্ত হইয়া নবগোপাল তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে উঠিয়া গেলেন, মেয়েকে তুলিয়া লইয়া যাইতে মনে রহিল না।

দুই তিন মিনিটের মধ্যে চারখানা বাতাসা ও একঘটী জল হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, তারা ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলটা গালে পুরিয়া দিয়া অবাক হইয়া লোকটার পানে চাহিয়া আছে, আর সে ব্যক্তিও সেই ভাবে থাকিয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছে—কোটরগত চোখ দুটি হইতে প্রবলবেগে জলের স্রোত বাহিয়া বুক ভাসাইয়া দিতেছে।

বাতাসা চারখানি ও জল খাইয়া জগন্নাথের দেহে যেন নব জীবন ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তখনো ভাল করিয়া কথা কহিবার মত বল পায় নাই, সেই অবস্থাতে থাকিয়াই কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আস্তে আস্তে কহিল—

"প্রাণ দিলেন—বাবু, আর—জন্মে আমার—বাপ—ছিলেন। বানে—সব—খেয়েছে, তিনদিন—অনা—হার।"

জগন্নাথ আর বলিতে পারিল না, আবার হাঁপাইতে লাগিল। তখন ব্যাপারটা বুঝিতে নবগোপালের আর একটুও বাকী রহিল না, কহিলেন—

"বুঝতে পেরেছি, আর বেশী কথা ক'য়ো না, ক্ষাণিকক্ষণ চুপ করিয়া জিরোও।"

তিনি তৎক্ষণাৎ আবার বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। একটুখানি পরে একবাটী গরম চা করিয়া লইয়া যখন আবার বাহিরে আসিলেন, তখন তারা একটু একটু করিয়া প্রায় তাহার কোলের উপর গিয়া পড়িয়াছে। জগন্নাথ একটু সোজা হইয়া বসিয়া দুই হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া প্রবলবেগে অশ্রু বর্ষণ করিতেছিল।

নবগোপাল চাটুকু জগন্নাথকে খাওয়াইলেন। গরম জলটুকু পেটে গিয়া বল আনিয়া দিল। তারপর তিনি একে একে প্রশ্ন করিয়া জগন্নাথের কাছ

হইতে সকল কথা আগাগোড়া শুনিয়া লইলেন, সে বিবরণ শুনিতে শুনিতে তাঁহার চোখ দুটিও জলে ভরিয়া উঠিল।

চারদিন পরে বিকালে সদর দোরের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ তারাকে কোলে লইয়া রাস্তার লোকজন, গাড়ি, ঘোড়া দেখাইতেছিল। তারা এক প্রশ্ন একশোবার জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে নাকাল করিয়া তুলিতেছিল। প্রথমদিন হইতেই সে এই বুকভাঙ্গা বুড়ো মানুষটিকে এমন একটি অপূর্ব্ব খেলার জিনিস ভাবিয়া দখল করিয়া লইয়াছিল যে, একদণ্ড কাছছাড়া করিতে চাহে নাই। আপিস হইতে আসিয়া বাড়ী ঢুকিতে নবগোপাল কন্যাকে জগন্নাথের কোলে দেখিয়া হাত বাড়াইয়া লইতে গেলেন, কিন্তু তারা কিছুতেই গেল না, কিক্ করিয়া হাসিয়া জগন্নাথের গলা জড়াইয়া ধরিল। নবগোপাল হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রাত্রে আহারের পর বৈঠকখানা-ঘরে বাবুকে তামাক সাজিয়া দিয়া জগন্নাথ যখন পায়ের গোড়ায় আসিয়া চুপটি করিয়া বসিল, তখন এই প্রকৃতির অত্যাচার পীড়িত, গৃহহীন, আশ্রয়হীন, নিতান্ত নিঃসম্বল, সংসারে নিতান্ত নিঃসঙ্গ লোকটির দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া নবগোপালের মনে মনে অত্যন্ত সহানুভূতির সঞ্চার হইল, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন—

"আচ্ছা জগন্নাথ, এইবারে গায়ে একটু বল পেয়েছ বোধ হয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার আর বৌমার দয়ায় এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেছি—কাহিল সেরে গেছে। কত লোকের দোরে ফিরেছি, কেউ একটু বস্‌বার জায়গাও দেয়নি; চোর ভিখিরী মনে করে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেছে। আপনারা আর জন্মের মা-বাপ ছিলেন।"

"তোমার আর কে কোথায় আছে?

"কেউ কোথাও নেই—এক এক করে সব খেয়েছি।"

"তা হ'লে এখন কি করবে—কোথায় যাবে ঠাওরাচ্ছ?"

"যাবার জায়গা সেই এক বই আর নেই; সবাই গেল, কেবল আমি পারলুম না।"

জগন্নাথ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, নবগোপাল তাহার মনে আঘাত করিলেন ভাবিয়া অত্যন্ত দুঃখিত এবং অপ্রস্তুত হইলেন—কি বলিয়া শুধ্‌রাইয়া লইবেন ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ চোখের জল মুছিয়া জগন্নাথ কহিল—

"আমি ত এখনো শক্ত মক্ত আছি—কাযকর্ম্ম করতে পারবো, আপনার বাড়ীতে—।"

"কিন্তু জগন্নাথ, আমি যে গরীব—ছা-পোষা গেরস্ত, সামান্য মাইনে পাই, ঝি চাকর রাখবার ক্ষমতা কই ?"

নবগোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হুঁকা রাখিলেন।

জগন্নাথ সহসা নবগোপালের পা দুটো জড়াইয়া ধরিয়া কাতরভাবে বলিয়া উঠিল—"তোমরা মা-বাপ, পায়ে ধরছি, বাবু আমাকে খেদিও না, আমি মাইনে চাইনি, তারা দিদিকে ছেড়ে কোথাও যাব না। আমার সে হতভাগীটাও ঠিক ওই রকম ছিল যে গো।"

সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

২

সেই হইতে দিনের দিন একটি সম্পূর্ণ অজানা শৈশব হৃদয়ের সঙ্গে এই কঠোর সংসার অভিজ্ঞ মানুষটির এমনি জানাশুনা হইয়া গেল যে, তাহাদের পরিচয়ের ভিতরে কোথাও একটুমাত্র ফাক থাকিল না। আর্শীতে নিজের ছবিটা যেমন সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে, তেমনি তাহারা পরস্পরের হৃদয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়া দুজনায় দুজনের প্রতি আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

তারা বড় দুরন্ত মেয়ে—তার জ্বালায় বাপ-মা অস্থির, কেবল জগন্নাথের সাড়া পাইলে অমনি যেন তার স্বভাব বদ্‌লাইয়া যায়। দুধ খাইতে তার যত বাধা, যত আপত্তি—এমন আর কিছুতে দেখা যায় না, সেই সময়টা উপস্থিত হইলে বাড়ীতে যেন রাম-রাবণের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। কিন্তু জগন্নাথ কাছে থাকিলে সে আর একটুও আপত্তি করে না—দুধ যেন তাহার কতই প্রিয় বস্তু—এমনি ভাবে নিঃশব্দে এক চুমুকে শেষ করিয়া ফেলে।

বায়না নিলে তারাকে থামাইবার জো নাই। ঘরের জিনিষগুলো—যা সামনে পাইবে ভাঙ্গিবে চুরিবে, ছড়াইবে, বিছানা মাদুর টানিয়া ফেলিয়া তচ্‌নচ্‌ করিবে, মায়ের চুল বাঁধিবার চিরুণী কাঁটা, ফিতে দড়ি—বাপের দোয়াত কলম পেন্‌সিল—যা কিছু নাগাল পাইবে, অমনি জানালা দিয়া বাহিরের রাস্তায় ছুড়িয়া ফেলিবে; তাড়া করিলে হাসিয়া কুরকুটি হইয়া ঘরময় ধুপ্‌ধুপ্‌ করিয়া দৌড়িয়া বেড়াইবে। কিন্তু জগন্নাথ সাম্‌নে পড়িলে সে সব ব্যাপারের দিকে আর ফিরিয়াও তাকাইবে না—কোলে চড়িয়া রাস্তায় লইয়া যাইবার জন্য সেই দিক্‌পানে ক্রমাগত হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিবে।

অত দুরন্তপনা—তাহার কোলে চড়িলেই—ভোজবাজীর মত মিলিয়ে উড়িয়া যাইবে। অত্যন্ত বিজ্ঞের মত হাজার রকমের কথা কহিয়া তাহাকে মগ্ন করিয়া ফেলিবে। এই সব কারণে তারা তার কোলে কোলে সর্ব্বদাই থাকিতে পাইত, গৃহিণীও নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহকর্ম্মে মন দিতেন।

এই রকমে বাপ-মায়ের চেয়ে তারা জগন্নাথের বেশী ন্যাওটো হইয়া পড়িল। জগন্নাথও নূতন স্নেহ-জালে রোজ রোজ একটু একটু করিয়া জড়াইয়া পড়িতে পড়িতে শেষে একবারে বাঁধা পড়িয়া গেল। তখন আর তাহার দুঃখময় পূর্ব্বজীবনের কথা মনে রহিল না—এই নূতন মায়ার মাদকতার মধ্যে—নিদাঘ নিশীথের দুঃস্বপ্নের মত সেগুলার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিল। তখন তাহার মুখে আবার হাসি ফুটিল—সংসারে মায়া বসিল—আপনার মধ্যে একটা নূতন রকমের জীবনীশক্তির সাড়া পাইয়া নূতন জীবনে নূতন করিয়া নূতন সংসার পাতিয়া বসিল।

চার বছর কাটিয়া গিয়াছে। নবগোপালের চেয়ে জগন্নাথের বয়স ঢের বেশী, তাহাদের মধ্যে চাকর মনিবের সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে, সে এখন বাড়ীর অভিভাবকের মত সকল কাজেই কর্ত্তা গিন্নির উপরে প্রভুত্ব খাটাইয়া চলে। তাহার নিঃস্বার্থ আত্মদানের কাছে তাঁহারাও আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন, এমন একজন হিতৈষী দেখিবার শুনিবার অভিজ্ঞ বন্ধু সংসারের সকল ভার তার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আগে যা খরচ হইয়াও সংসারের শৃঙ্খলা থাকিত না, প্রতি মাসেই কিছু না কিছু ধার হইত, জগন্নাথের হাতে পড়িয়া তার চেয়ে কম খরচে সংসারের ভাল রকম বন্দেজ হইয়াছে, আর ধারত কোন মাসেই হয় না; বরং কিছু কিছু বাঁচিয়া যায়।

জগন্নাথ আপনি গিয়া হাট বাজার করে, রোজ ভোরে উঠিয়া আগে গয়লাবাড়ী গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাঁটি দুধটুকু দোহাইয়া আনে, কর্ত্তার তামাক সাজে, বৈঠকখানা সাফ করে, কাপড় কাচিয়া শুকাইয়া কোঁচাইয়া রাখে, আর নিজের এঁটো বাসন মাজিয়া দেয়। তা ছাড়া আরকোন কাজ করিতে হয় না, সারাদিন তারাকে গলার পদকের মত বুকে বুকে লইয়া বেড়ায়।

সে একটি করিয়া পয়সা রোজ জল খাইতে পাইত, তার ভিতর হইতে একটি করিয়া আধলা জমাইয়া আধ পয়সার ফুটকড়াই কিনিয়া দুটো চারটে গালে দিয়া জল খাইত, তারা নিত্য সেই ফুট্‌কড়াইয়ের ভাগ লইত। যতই

পেট ভরা থাকুক—যতই যা থাক না কেন জগু জ্যাঠার কাছে রোজ সেই ফুট্ কড়াই না খাইলে এক দিনও তার পেট ভরিত না, সেই সময়ে কেহ সন্দেশ দিলেও তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া জ্যাঠার হাতের একটি একটি করিয়া বাছা ফুট্ কড়াই খাইতে ছুটিত।

এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে, জগন্নাথ স্নান করিয়া উঠিয়া দুটো কড়াই গালে ফেলিতেছিল—কোথা হইতে তারা ছুটিয়া আসিয়া, খুব রাগ করিয়া কহিল—

"লুকিয়ে লুকিয়ে ফাঁকি দিয়ে খাওয়া হচ্ছে বুঝি, আমার ফুট্ কড়াই?"

জগন্নাথ আর চিবাইবার সময় পাইল না, তাড়াতাড়ি কোঁৎ কোঁৎ করিয়া আস্ত কড়াই কটা গিলিয়া, বাকিগুলো কাপড়ের খুঁটে লুকাইতে লুকাইতে কহিল—

"না দিদি, আজ তো ফুট্ কড়াই ভাজে নি!"

না ভাজে নি বৈকি—এ তবে কোত্থেকে এ'ল? আমায় দাও।"

তারাকে দেখিয়া কাপড়ের খুঁটে তাড়াতাড়ি লুকাইতে গিয়া দু'চারটে কড়াই পড়িয়া গিয়াছিল, তাই দেখিতে পাইয়া সে কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

"না দিদি, এ কড়াই খেতে নেই, এঁটো হয়ে গেছে।"

"হোক্ এঁটো, আমি খাব, দাওনা জ্যেঠা।"

"লক্ষ্মী দিদি আমার, আজ কড়াই খায় না, অত পেটের অসুখ করেছে। কাল আবার খেও।"

"না আমি খাব।" তারা কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

"চল তোমায় বেলের মোরব্বা কিনে দিইগে—এগুলো কালুকে দেবো!"

"কই দেও আগে দেখি।"

জগন্নাথ কড়াই কয়টা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে যাইবে, তারা ধাঁ করিয়া ছোঁ মারিয়া গোটা কতক কড়াই একেবারে গালে পুরিয়া দিল।

"লক্ষ্মী দিদি খেওনা খেওনা, ফেলে দাও" বলিতে বলিতে বাকী কড়াই-গুলো সে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তারা ততক্ষণ মুখের গুলো গিলিয়া ফেলিয়া ছিল, কহিল—বেলের মোরব্বা দাও।"

চল বলিয়া জগন্নাথ একটা পুঁটলি খুলিল—তার ভিতরে পাঁচ ছয়টা আধলা জমিয়াছিল। তারা সব কটা তুলিয়া লইয়া জগু জ্যেঠার কোলে উঠিল। খাবারের পয়সাটি হইতে রোজ রোজ সেই একটি করিয়া আধলা তুলিয়া যা জমিত, তাই দিয়া জগন্নাথ প্রায়ই তারাকে কোন দিন খাবার, কোন দিন পুতুল কিনিয়া দিত।

পরদিন হইতে তারার পেটের অসুখ খুব বাড়িল। তাহাকে খাইতে দিতে পারিবে না বলিয়া জগন্নাথ জল খাওয়া বন্ধ করিল। বিছানায় শুইয়া তারা কহিল—"কালকে আমাকে কুট্‌কড়াই দাও নি, ফাঁকি দিয়েছ, এখুনি দাও।"

"আমিও তো কালথেকে খাইনি দিদি। আগে সেরে ওঠ, আবার দু'জনে এক সঙ্গে কিনে খাব।"

বাড়ীর সাম্‌নের রাস্তার ওপারে দুই তিনখানি বাড়ীর পরেই মেয়ে-স্কুল, তারা সেইখানে পড়িত। জগন্নাথ খাইয়া উঠিয়া তাহার বাহিরের রোয়াকে গিয়া বসিয়া থাকিত। প্রায় সকল মেয়েদের বাড়ী হইতেই ঝি চাকর খাবার আনিয়া খাওয়াইয়া যাইত, সে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। নবগোপালের তেমন সঙ্গতি ছিল না যে, সে রোজ রোজ ভাল খাবার কিনিয়া দেয়। কোন দিন চারটিখানি মুড়ী, কোন দিন বা ছোট একখানি পাঁউরুটি—কোন দিন বা তেলে ভাজা কিছু, অন্য সকলের ভাল খাবারের সামনে তারার মুখে ধরিতে জগন্নাথের বুক ফাটিয়া যাইত।

মাস তিনেক পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন তারা কতকগুলো লিচু কোঁচড়ে করিয়া খাইতে খাইতে বিকালে স্কুল হইতে বাড়ী আসিল। মা দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অত লিচু কোথায় পেলিরে তারা?"

"কেন, জগু জ্যাঠা দেছে।"

"ভাহ্‌রে দেছে—সে কোথায় পেলে?"

"কেন, সে তো রোজ রোজ আমাকে কিনে দেয়। আঁম, লিচু, সন্দেশ, রসগোল্লা কত কি?"

"রোজ রোজ কিনে দেয়?" গৃহিণী অবাক্ হইয়া গেলেন।

"কোথায় পায় সে?"

"তা বুঝি তুমি জান না, সে যে স্কুলের রকে বসে দোকান করে।"

"দোকান করে কি?"

"হ্যাঁ সত্যি বলছি—পেন্‌সিল কাগজ, জলছবি; খাতা কত কি সব বিক্রী করে, কত মেয়েরা সব কেনে।"

আমার বইয়ে কত সব জলছবি মেরে দেছে দেখ্‌বে ?"

তারা বই খুলিয়া এক এক করিয়া দেখাইতে লাগিল।

মাস কতক পূর্ব্বে সেই পাড়ার এক ঘর বড় মানুষ প্রতিবেশীর বাড়ীর তত্ত্ব লইয়া গিয়া জগন্নাথ দুটি টাকা পাইয়াছিল, সে টাকা বৌমার কাছেই গচ্ছিত রাখিয়াছিল। এখন গৃহিণী বুঝিলেন যে, সে টাকা দুটি মাস তিনেক আগে এক দিন হঠাৎ ভারি দরকার পড়িয়াছে বলিয়া জগন্নাথ চাহিয়া লইয়া গিয়াছিল কেন ? মেয়েকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বাড়ী থেকে রোজ যে খাবার পাঠিয়ে দিই তা কি হয় ?

"সেই মুড়ি ফুলুরি বাতাসা ? মাগো সে সব বুঝি খেতে আছে, তাতে অসুখ করে ! যে সব মেয়েরা গরীব মানুষ; তাদের তো বাড়ী থেকে খাবার আনে না, তাদের সব দিই।"

গৃহিণী রাগ করিয়া কহিলেন "তবেরে পোড়ার মুখী, জ্যাঠার কুটকড়াই খেলে বুঝি অসুখ করে না, যত অসুখ ওর বেলায় ? রোসো কাল থেকে আর কিছু দেব না।"

"বয়ে গেল—জগু জ্যাঠা সন্দেশ কিনে দেবে।" তারা ছুটিয়া খেলিতে চলিয়া গেল।

বোসেদের শান্তিলতা সেদিন দুইহাত ভরা কচি কলাপাতা রঙ্গের রেশমী চুড়ী পরিয়া স্কুলে আসিয়াছিল, তাইতে সব মেয়েদেরই রেশমী চুড়ী পরিতে সখ হইয়াছিল, তারা বাড়ী গিয়া মায়ের কাছে বায়না ধরিল—"আমায় চুড়ী কিনে দাও।"

তখন মাসকাবারের সময়, সংসারের টানাটানির অবস্থা। গৃহিণী কহিলেন—

"এ মাসে নয় মা, বাবু মাইনে পেলে আস্‌ছে মাসে কিনে দেব।"

"না আমাকে আজই কিনে দিতে হবে।"

তারা মায়ের আঁচল ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

"মাসকাবারের সময় এখন কি হাতে পয়সা থাকে, লক্ষ্মী মা আমার আঁচল ছাড়, উনুনের জ্বাল বয়ে যাচ্ছে।"

তারা কিছুতেই আঁচল ছাড়িল না, ভারি বিরক্ত করিয়া তুলিল। গৃহিণী জ্বালাতন হইয়া কহিলেন—

"ভাশুরের নাই পেয়ে দিন দিন ধিঙ্গি হয়ে উঠেছেন, বুড়ো মেয়ে একটু বোঝেনা গা! ছাড় বল্‌ছি, কেন মার খেয়ে মর্‌বি?" গৃহিণী জোর করিয়া আঁচল টানিয়া লইলেন।

তারা আবার গিয়া জোরে আঁচল টানিয়া ধরিল, তিনি যেমন ছাড়াইতে যাইবেন, সে তাঁহার হাতে কামড়াইয়া দিল, তখন তিনি মেয়েকে একটা চড় মারিয়া জোর করিয়া আবার ছাড়াইয়া লইলেন। টানাটানিতে কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। গৃহিণী রাগিয়া মেয়ের পিঠে আরো গোটা দুই চড় বসাইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। তারা চড় খাইয়া একটুক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল, তারপরে দৌড়িয়া রান্নাঘরে গিয়া থালাশুদ্ধ কুটনোগুলো উঠানে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

এবার গৃহিণী আর রাগ সামলাইতে পারিলেন না। ঘা কতক খুব কিল চড় মারিয়া বকিতে বকিতে সে গুলো কুড়াইতে লাগিলেন। তাঁরা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

দশটার সময় স্কুলের ঝি তারাকে লইতে আসিয়া বাড়ীময় কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। সে গৃহিণীর কাছে নালিশ করিয়া গেল—"তোমার মেয়ে আজকাল বড় অশান্ত হয়ে উঠেছে বাপু, কারুর কথা গেরাজ্যি করে না, মাষ্টারদের ভয় করে না, মুখের উপর ক্যাট্ ক্যাট্ করে যা তা শুনিয়ে দেয়। সকলের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া মারামারি নিয়েই আছে, কারুর একটু কিছু বলবার যো নেই। সেদিন মুখুয্যেদের তন্বীকে চুলের মুঠো ধরে ঘুরিয়ে ফেলে দিছ্‌লো।"

গৃহিণী স্তব্ধ হইয়া সকল কথা শুনিলেন, কোন জবাব করিলেন না।

বেলা প্রায় বারোটার সময় তারা জগন্নাথের কাঁধে চড়িয়া দু'হাত ভরা রেশমী চুড়ি পরিয়া আমোদে আটখানা হইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গিয়া হাত নাড়িয়া চুড়ী দেখাইয়া কহিল—

"নাই দিলে তুমি বয়ে গেল—এই দেখ জগু জ্যাঠা দোকানে কোলে করে নিয়ে গিয়ে বেছে বেছে কত ভাল ভাল চুড়ী কিনে দেছে।' আরো এই কেমন 'মেম-পুতুল' দেখ—এমন তর কখনো দেখেছ?"

গৃহিণী সকাল হইতেই মেয়ের উপর চটিয়া ছিলেন, তার উপর স্কুলের ঝিয়ের কথাগুলো তাঁহার মনে বিঁধিতে ছিল। তারপর ভাত কোলে করিয়া অত বেলা পর্য্যন্ত তাহাদের দু'জনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে

ভারি ব্যাজার হইয়া উঠিয়াছিলেন। মেয়ের কথাগুলো শুনিয়া তিনি আর রাগ বরদাস্ত করিতে পারিলেন'না। খুব জোরে চিপ্ চিপ্ করিয়া ঘা কতক বসাইয়া দিলেন।

জগন্নাথ তারাকে নামাইয়া দিয়াই স্নান করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া কাপড়ের খুঁটে ফুটকড়াই লইয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল।

"কই মা তারা, ফুটকড়াই খেলিনে?"

হঠাৎ তারার উচ্চ ক্রন্দনের রোল কাণে আসিল। "কি হয়েছে রে"—বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি উঠানে আসিয়াই দেখিল যে, বালিকা মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিতেছে, তাহার বড় আদরের মেম্ পুতুলটা একধারে পড়িয়া রহিয়াছে।

"কি হয়েছে মা—দুপুর বেলা এমন করে ভূঁয়ে পড়ে কাঁদ্তে আছে কি?"

জগন্নাথ তারাকে বুকে তুলিয়া লইল। গায়ে হাত বুলাইতে গিয়া হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল, কহিল—

"বৌমা, এসব কি ব্যাপার, আহা বাছার পিঠে পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ বসে গেছে যে।"

তারা কাঁদিতে কাঁদিতে ফোপাইতে ফোপাইতে কহিল—"আমি কিচ্ছু করিনি জ্যাঠা, সবে পুতুল আর চুড়ি দেখাচ্ছিলুম!"

গৃহিণী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—

"এখুনি হয়েছে কি, আজ পিঠের ছাল চাম্‌ড়া তুলবো।"

জগন্নাথ বিরক্ত হইয়া কহিল—

"কেন বল দেখি—ও করেছে কি?"

"করেছে কি? স্কুলের ঝি মাগীকে জিজ্ঞেস ক'র, বেলা তিনপোর উৎরে গেল, টিকির নাগাল নেই। স্কুল কামাই হ'ল— হেঁসেল আগ্‌লে হাত গুটিয়ে বসে রয়েছি। দিন্‌কে দিন ধিঙ্গি হয়ে উঠ্‌ছেন, আস্কারায় মাথায় চড়ে বস্‌ছেন।"

জগন্নাথও তেমনি রাগিয়া কহিল—"তিনপোর ধরে হেঁসেল আগ্‌লে বসে রয়েছ, সেটাত ওর দোষ নয় বাছা, আমিই ওকে বড়বাজারে নিয়েগেছ্‌লুম। সে ঝালটা প'ড়ল গিয়ে বুঝি ওই একরত্তি দুধের বাছার ওপর?"

গৃহিণী জগন্নাথের জন্য ভাত বাড়িতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই ততোধিক গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

"দুধের বাছা! স্কুলে গিয়ে যে কাণ্ড করতে সুরু করেছে, ঝি মাগী দুশো কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল। কই, আগেতো এমনতর কখনো শুনিনি।" বলিয়া জগন্নাথের জন্য বাড়া ভাতের থালাটা রান্নাঘরের বারাণ্ডায় ঝনাৎ করিয়া রাখিয়া দিয়া গেলেন। জগন্নাথ সে দিকে ফিরিয়াও চাহিল না, তারাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি হয়েছিল মা ইস্কুলে?"

তারা আস্তে আস্তে কহিল—"ওরা বলেছিলো তোর জগা জ্যাঠা চোর, আধ পয়সার পেন্‌সিলটা দু'পয়সায় বেচে, আরো কত কি। তাই তার চুল ধরে ঘুরিয়ে দিয়েছিলুম।"

জগন্নাথ একেবারে সপ্তমে গর্জ্জিয়া উঠিল—

"বেশ করেছিলি, তার চুল ধরে হিঁচ্‌ড়ে আমার কাছে টেনে আন্‌তে পারিস্‌নি—দেখতুম তার কোন মাষ্টারনি এসে রাখতে পারে? আমার মেয়ের মুখের ওপর এত বড় কথা বলে! আসুক তো কাল সে ঝি মাগী বাড়ীতে, বুঝবো তার তেজ—সেই তুচ্ছ কথা একশোখানা ক'রে লাগাতে এসেছে—বটে! আর তুমিও বাছা কেমন মা, সেই নচ্ছার বেটীর কথা শুনে এখনো বাছাকে খেতে দিলে না—তার উপর এই ঠিক দুপুর বেলাতে মেরে পিঠ ফুলিয়ে দেছ? অমন রাক্ষসী মায়ের হাতের জল জগন্নাথ গ্রহণ করে না—রেখে দাও তোমার বাড়া ভাত তুলে, ও যদি খাই তো আমি চণ্ডাল! চল্ মা তারা দেখি কে তোর গায়ে হাত তোলে!"

(৪)

চার বছর পরের কথা। তারা বারোয় পড়িয়াছে, স্কুল ছাড়িয়াছে, তাহার রূপের সুখ্যাতি পাড়ায় শত মুখে আর ধরে না। রোজ রোজ ঘটকীদের আনাগোনা পড়িয়া গিয়াছে।

রাত্রে ছেলে দেখিয়া আসিয়া নবগোপাল রান্নাঘরের ভিতরে ছিলেন, গৃহিণী পাখা লইয়া বাতাস করিতেছিলেন। বারাণ্ডায় খোলা দরজার সামনে বসিয়া জগন্নাথ তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। তারা ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেমন দেখ্‌লে ?"

"ছেলেটী মন্দ নয়, বি, এ, পড়ছে, কিন্তু দু'হাজার দিতে হবে।"

"এ যে সকলেরই এক ধরা দেখ্‌ছি, তাই যদি হয়, তবে শশী ঘোষের ছেলেই ভাল। মস্ত বড় মানুষ, অগাধ বিষয়, তিন পুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে খেতে পারবে, মেয়ে রাণীর হালে থাক্‌বে।"

"তা বটে, সেখানেও ওই দু'হাজার হলেই হয়, হয়তো তেমন করে ধর্‌তে পারলে দু'একশো কমতেও পারে—মেয়ে তাদের ভারি পছন্দ।"

জগন্নাথ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া শুনিয়া যাইতেছিল—কোন কথা বলে নাই, এক্ষণে আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, একগাল হাসিয়া অত্যন্ত গর্ব্বভরে কহিল—

"তা ঠিক কথা বাবু, হাজার হোক আমীরী লোক, তোমাদের পছন্দ যাবে কোথায়। তারা আমার রাজরাণী বল্লেই হয়—রাজা রাজারাজড়ার ঘরেও অমন রূপ মেলে না। এই তো পাড়ায় পাড়ায় শতেক বড় ঘরের মেয়ে দেখ্‌ছি—তা কেউ কি ওর নখের যুগ্যি ?"

তারার রূপের কথায় জগন্নাথের সমালোচনা শুনিয়া কর্ত্তা গিন্নি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। তারপরে কর্ত্তা কহিলেন—

"কিন্তু ছেলে যে তেমন নয়, মোটে একটা পাশ করে বাপের পাটের, কারবারে ঢুকেছে।"

"তা এ ছেলেই বা এমন কি ? না হয় দুটো পাশ করেছে, আর পাশ করতে পারবে কি না কে জানে ? আর করলেই বা কি—বি, এ, এম, এ, পাশ করে গেরস্তর ছেলে তো আর জজিয়তি পাবে না—সেই চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার কেরানীগিরি করে কলম পিষে জীবন কাটাতে হবে। তার চেয়ে মেয়ে বড় মানুষের বউ হয়ে রাজরাণী হয়—তা কি তোমার ইচ্ছা নয় ?"

"সেটা কার না ইচ্ছে বল ? তবে ভাব্‌ছি কি জান, শুনেছি—মাগী বড় দেমাকে। এখন এই বেতে যেমন করে হোক সবশুদ্ধ তিন হাজার পড়বে, ভরসার মধ্যে বাড়ীখানি।"

"তা যেখানেই দেওনা কেন—ও বই তো গতি নেই, বাড়ী বাঁধা দিতেই হবে। তখন বড় ঘরে দেওয়াই ভাল, আমাদের যা হয় হবে, মেয়েটাতো সুখে থাক্‌বে।

"সেটা কিসে বুঝলে ? বাড়ী বাঁধা দিয়ে না হয় বে দিলে, কিন্তু এরপর

যে তেমন তত্ত্ব তাবাস্ করে উঠ্‌তে পারবো তা ভেব না। তখন যদি আর মেয়েকে না পাঠায় ?"

"বাপ্‌রে অমন কথা বলোনা বাবু। মেয়ে পাঠাবে না—অমন চাঁড়ালের ঘরে আমার তারাকে দেব না।"

জগন্নাথ অত্যন্ত ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, মুখখানি শুকাইয়া গেল।

"তাই বলছিলুম সমান্ সমান্ ঘরেই দেওয়া ভাল নয় কি ?"

গৃহিণী অগ্রাহের ভাবে কহিলেন—"এও কি একটা কথা মেয়ে পাঠাবে না ? নাইবা করতে পারলুম তত্ত্ব তাবাস্ ? আর ওই শ্বশুর শাশুড়ী কি চিরদিন বেঁচে থাকবে, এরপর বড় হলে মেয়েই যে গিন্নী হবে, তখন আর পর করবে কে ? তুমি সে ভয় করোনা, এমন সম্বন্ধ হাত ছাড়া করলে আর পাবে না, জেনে রেখো।"

কর্ত্তা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—

"বড় মানুষের ঘর শুনে ভারি ঝুঁকে পড়েছ দেখছি। ভাল—তারা তো আর আমাদের একলার নয়—জগুদাদারও সমান ভাগ। কি বল দাদা, তোমার ইচ্ছে কি ওই ঘরেই করা ?"

জগন্নাথ চিন্তা করিয়া কহিল—"মেয়ে পাঠাবে না শুনে ভয় লাগে বাবু, কিন্তু তারা আমার রাজরাণী হবে—এ লোভটাও যে সাম্‌লাতে পারছিনি। তুমি ও কথাটা ভাল করে একবার বোঝা পড়া করে নিয়ে, তবে পাকাপাকি করে ফেল। কি বল মা-লক্ষ্মী ?"

"আমিও তাই বলি, বেয়াইয়ের সঙ্গে মেয়ে পাঠানোর কথাটা বেশ করে বাঁধাবাঁধি করে নিয়ে, বে দাও।"

কর্ত্তারও মনের অভিপ্রায়টা মেয়ে বড়ঘরে পড়ে, সুতরাং আর বেশী তর্ক উঠিল না। পাটের কারবারে হালি বড়মানুষ শশীঘোষেরও নিতান্ত ইচ্ছা যে বৌটী খুব সুন্দরী হয়। যে কয়টা সম্বন্ধ আসিয়াছিল—তার একটি মেয়েও তারার সমযোগ্যা নয়, সুতরাং মেয়ে পাঠাইবার কথায় তিনি কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। এবং দেনা-পাওনার সম্বন্ধেও টানাটানি না করিয়া বরং কতকটা উদারতাই দেখাইলেন। সুতরাং নবগোপালের মনের সামান্য দ্বিধা ঘুচিয়া গেল।

শেষে নবগোপাল বাড়ীখানি তিন হাজার টাকায় বাঁধা দিয়া শশীঘোষর সঙ্গেই কুটুম্বিতা করিয়া বিবাহের রাত্রে ভারি একটা গর্ব্ব অনুভব করিলেন।

জগন্নাথ তাহার 'কাগজ-পেন্সিল-জলছবির ক্ষুদ্র কারবার তুলিয়া দিয়া সমস্ত বেচিয়া কিনিয়া নয়টি টাকা পাইল, তার সেই পুঁজির সর্ব্বস্ব দিয়া একখানি ঢাকাই শাড়ী কিনিয়া, গায়ে হলুদের দিনে নিজের হাতে তারাকে পরাইয়া দিয়া বাপ-মায়ের চেয়ে ঢের বেশী গর্ব্ব ও আনন্দ লাভ করিল। তারারও বাপ মায়ের এবং শ্বশুরবাড়ীর দেওয়া বারানসীর চেয়ে সেই ঢাকাই-খানি অধিক প্রিয় হইয়া পড়িল।

কিন্তু কন্যা-পক্ষীয়ের এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। ফুলশয্যার তত্ত্ব করিয়া ফিরিয়া আসিয়া রাত্রে জগন্নাথ একেবারে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর ভিতরে গিয়া কর্ত্তা-গিন্নীর সামনে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

"হায় হায় মা কি সর্ব্বনাশই কল্লেম, কর্ত্তাবাবু গো. শেষ তোমার কথাই যে ফল্‌লো দেখছি গো। হায় হায় মাকে আমার হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিলুম গো ?"

বিবাহের দানসামগ্রীর সব জিনিষগুলো তারার শাশুড়ীর মনোমত হয় নাই, এবং মেয়ের বাপ কড়ার মত সব গহনা দিলেও সে গুলো নাকি সেকেলে ধাঁজের, একটাতেও পাথর বসানো ছিল না এবং তাঁরা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বরের আংটীটার হীরাখানাকে কাচ ভিন্ন অন্য কিছু বলা যাইতে পারে না, সেই জন্য বৌ ঘরে তুলিয়া অবধি তিনি সেই অদেখলা ছোটলোকের ঘরে ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য—অশেষ প্রকারে অনুতাপ করিয়া সকলের সামনে কর্ত্তাকে নিতান্ত আক্কেলখেকো নির্ব্বোধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ছিলেন, এবং বৌয়ের গঠন-পেটনের হাজার রকম খুঁৎ বাহির করিয়া তাঁহার চালুশে ধরা চোখে চশমা না লওয়ার জন্য গঞ্জনা দিতেছিলেন।

তার উপর যখন চল্লিশজন লোক এক একখানি সাজানো থালা হাতে না লইয়া কেবল মাত্র আটজন লোক ভারে বোঝাই করিয়া এবং দুইজন মেয়ে-মানুষ মাথায় ধামা করিয়া ফুলশয্যার তত্ত্ব লইয়া পৌঁছিল, তখন তিনি আর কিছুতেই রাগ বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। পা দিয়া সেগুলো ছুড়িয়া ফেলিয়া, কোমর বাঁধিয়া রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে তাহাদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

জগন্নাথ সে অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে পারিল না, নব-গোপালের উদ্দেশে বর্ষিত প্রত্যেক কথাটি তীক্ষ্ণ শেলের মত তাহার বুকে

গিয়া বিঁধিতে লাগিল। বেচারা আপনাকে অতিকষ্টে সংযত করিয়া দুটো মিষ্ট কথায় প্রতিবাদ করিতে গিয়া এই পুরস্কার পাইল যে, তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব তারার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত হইল না। অসহ্য মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়া যখন সে একটিবার তাহাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল, তখন কর্ত্রীর হুকুমে দারোয়ানের সুমিষ্ট কুটুম্বিতার সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া বহিষ্কৃত হইল।

৫

সেই অবধি—দু'বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—বিয়ের ক'নেকে সেই যে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছিল—তাহারা আর বাপের বাড়ীতে পাঠায় নাই। নব-গোপাল অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিয়াও মেয়েকে একবেলার জন্যও আনিতে পারেন নাই। অনেক অনুনয় বিনয় এবং হাতে পায়ে ধরার ফলে তিনি গিয়া মাঝে মাঝে মেয়েকে দেখিয়া আসিবার অধিকারটুকু লাভ করিয়াছিলেন মাত্র।

কিন্তু হতভাগা জগন্নাথের বরাতে সে সৌভাগ্যটুকুও ঘটে নাই। ফুল-শয্যার দিনের সেই ঘটনা হইতে সে গৃহের দ্বার জগন্নাথের কাছে চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাহার এবং তারার মায়েব চোখের জল ভিন্ন মেয়ের জন্য অন্য কিছু সম্বল ছিল না।

তবুও মানুষের আশা যায় না। মরিতে বসিয়াও লোকে ভাবে সে এই বারকার টাল্‌টা সাম্‌লাইতে পারিলে বাঁচিয়া যাইবে। যদি বেহানের মন নরম হয়, যদি কখনও সদয় হইয়া তারাকে পাঠাইয়া দেন, সেই আশায় গৃহিণী এবং জগন্নাথের পীড়াপীড়িতে নবগোপাল যথারীতি এই দুই বৎসর ধরিয়া তত্ত্বতাল্লাস করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে দারুণ ক্ষয়রোগের মত একটু একটু করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব শেষ করিয়া দিয়াছিল।

মর্টগেজের উপরে মর্টগেজ পড়িয়া বাড়ীখানি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, তিনি পত্নী ও জগন্নাথকে লইয়া একখানি সামান্য খোলার বাড়ীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবুও সকল দেনা পরিশোধ হয় নাই—পাওনা-দারেরা নালিশ করিয়া মাহিনার অর্দ্ধেক টাকা মাস মাস কিস্তিবন্দীতে আদায় করিয়া লইতেছিল। এখন কোনমতে সকলদিন তিনটি প্রাণীর দুই বেলা পেট ভরিয়া অন্নের সংস্থান করাও ভার হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং দুঃখ-কষ্টের অবধি ছিল না।

দশবছর আগে বন্যায় সর্ব্বস্বান্ত ও মৃতকল্প হইয়া জগন্নাথ সর্ব্বপ্রথম যেদিন এই গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল, সেদিনও তাহার বুকের মধ্যে যে জীবনী শক্তিটুকু অতি ক্ষীণভাবে ধুক্ ধুক্ করিয়া সঞ্চালিত হইতেছিল—এখন সেটুকুরও অভাব হইয়াছিল, তবু কর্ত্তাবাবু ও বৌ-মার জন্য সে ভাঙ্গা হাড় ক'খানাকে কোনরকমে জোড়াতাড়া দিয়া যন্ত্রচালিত পুতুলের মত বাক্‌হীন হইয়া কেবল কোন রকমে প্রাণপণে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে শেষের দিনটার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

জগন্নাথ জাতিতে গোয়ালা—সকালে বিকালে কয়েক বাড়ীতে গরু দুহিয়া মাসে মাসে পাঁচ ছয়টি টাকা পাইত—সেই টাকা কয়টির উপরে নবগোপালের সংসার অনেকটা নির্ভর করিত। কিন্তু যখনই সে সেই কটা টাকা হাতে করিয়া বৌমাকে দিতে যাইত, তখনি তার প্রাণের মধ্যে তারার জন্য কোন কিছু কিনিয়া পাঠাইয়া দিবার জন্য একটা আকুল বাসনা জাগিত, তাড়াতাড়ি ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিত। গৃহিণী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিতেন, সে কটা টাকা কুড়াইয়া হাতে লইতে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত হাত পুড়িয়া যাইত, তিনিও মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যাইতেন।

পূজা কাছে আসিয়াছিল। রাত্রি আটটার পর নবগোপাল আফিস হইতে নিতান্ত নির্জ্জীবের মত হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাড়ী আসিয়া ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরের উপর শুইয়া পড়িলেন। গৃহিণী কাছে বসিয়া নীরবে বাতাস করিতে লাগিলেন, জগন্নাথ তামাক সাজিয়া গড়গড়ার উপরে বসাইয়া দিয়া পায়ের কাছে চুপটি করিয়া বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ তিনজনের কেউ কোন কথা কহিল না, শেষে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ভয়ে ভয়ে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁগা কি হ'ল ?"

হঠাৎ অত্যন্ত রুক্ষস্বরে নবগোপাল উত্তর দিলেন—"মরুক্—মরুক্, মনে কর আমাদের মেয়ে নেই, তারা মরেছে।"

"বালাই—ষাট্ ষাট্ !" গৃহিণী ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। জগন্নাথ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নবগোপাল তাহাকে একটা ধমক দিয়া থামাইলেন।

খানিক পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"আর ভাবছো কি, মেয়ের সম্পর্ক একেবারে উঠ্‌লো। উঃ কি অপমান! আর তার নামও মুখে

এনোনা। রথের তত্ত্ব হয়নি ব'লে, মেয়েটার সঙ্গে একবার দেখা পর্য্যন্ত কর্‌তে দিলে না। বাড়ী ঢুকতেই তো বেয়াই কাজের ছুতো করে বেরিয়ে গেলেন। তীর্থের কাকের মত বৈঠকখানায় একলাটি হাঁ করে বসে রইলুম; চাকর বেটারা তামাক সেজে সাম্‌নে বসে খেতে লাগলো—কোন ব্যাটা এক-বার একটা কথা পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস কর্‌লে না।

"বল কি কর্ত্তাবাবু—চামারে ঘরের সবাই কি চামার? ভদ্দর লোক কুটুম—"

জগন্নাথের কথায় বাধা দিয়া নবগোপাল কহিলেন—"আর ভদ্দর লোক কুটুম, আমরা তাদের চাকরের চাকরেরও যুগ্যি নই।"

গৃহিণী নীরবে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন, সেটা জগন্নাথের বুকে বিঁধিয়া আবার তার চোখে জল টানিয়া আনিল।

"বাতি জ্বালার পর ভেতর বাড়ী থেকে বেয়ান ঠাকরুণ আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চাকরদের উদ্দেশ করে বল্লেন—'এটাতো ডোম্ ডোক্‌লা ছোট লোকের বাড়ী নয় যে, সাঁজ সকালে যখন তখন ছোট লোক ভিখিরী নাগারী এসে হুট্ হুট্ করে ঢুকবে! বৈঠকখানাতে চাবি দে, অনেক দামী দামী জিনিষ পত্তর ছড়াছড়ি রয়েছে—'চুরি গেলে সবাইকে ঘানি টানিয়ে ছাড়বো। ক্যাওরা হাড়ীরও ইজ্জত আছে—লজ্জাভয়ও আছে,—"এ কিরে বাপু, এমন নিপিত্তে নির্ঘিন্নে—বেহায়া ছোট লোক তো বাপের বয়সে দেখিনি। পাল-পার্ব্বণেও মেয়ে জামায়ের খোঁজটি করে না—খেঙ্‌রে বিদেয় কর!"

গৃহিণী স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হঠাৎ জগন্নাথ, অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"খুন করবো, খুন করে ফাঁসী যাবো সে ভাল—দেখি বেটী কত বড় মানুষ।"

নবগোপাল ধমক দিয়া কহিলেন—"চুপ কর জগন্নাথ, মনে কর তারা মরেছে। আমার সামনে বারদিগর যে তার নাম মুখে আন্‌বে আমি আর তার মুখ দর্শন করবো না।"

(৬)

সে বছর পূজায় নবগোপাল আর তত্ত্ব করিতে পারিলেন না। তত্ত্ব করিবার ত ক্ষমতা তাঁহার ছিলই না, তার উপর সে দিনকার সেই কাণ্ডের

পর হইতে গৃহিণী কি জগন্নাথ কেহই আর তাঁহার কাছে তারার নাম করিয়া কোন কিছু বলিতে সাহস করিল না। সকলেই মনের জ্বালায় মনে মনে নীরবে দগ্ধ হইতে লাগিল।

জগন্নাথের মনটা বড়ই পুঁড়িতেছিল, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া সপ্তমীর দিন সকালবেলায় কোন রকমে চেষ্টা করিয়া গুছাইয়া কথাটা পাড়িবার জন্য নবগোপালের কাছে গিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া সাহসে কুলাইল না, অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে গৃহিণীর কাছে উঠিয়া গিয়া বলিল—

"বৌমা, সত্যিই কি এবারে বাছার আমার খোঁজ খবরটা নেওয়া হবে না? আমি যে আর তাকে একটিবার না দেখে থাকতে পারছিনি।"

বৃদ্ধ হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

গৃহিণী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

"কি করবো বাবা, সবাই তো জান। এর পরে ওঁকে আর কোনও কথা মুখ ফুটে বল্‌তে ভরসা হয় না।"

জগন্নাথ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিল, তারপরে হঠাৎ কহিল—

"এবারে যে ছুধরের তত্ত্ব নিয়ে গিয়ে দুটো টাকা পাওয়া গিছলো তা কি খরচ হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ বাবা, চাল বাড়ন্ত—"

"থাক্ মা বুঝেছি।"

জগন্নাথ আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল, খানিক দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া চুপে চুপে কহিল—

"তোমরা মা আজ আর আমার জন্যে ভাত নিয়ে বসে থেক না, খাওয়া দাওয়া ক'রো।"

"সে কি বাবা, কোথায় যাচ্ছ?"

"দেখি মা একবার চেষ্টা বেষ্টা করে হতভাগীটাকে একবার না দেখতে পেলে আর বাঁচবো না মা।"

জগন্নাথ চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। গৃহিণী রান্নাঘরে ঢুকিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

সারাদিনের পর বিকালবেলা জগন্নাথ চোরের মত ভয়ে ভয়ে চারিদিকে

চাহিতে চাহিতে যখন বাড়ী ঢুকিল কর্ত্তা তখন বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। আস্তে আস্তে ভিতরে আসিয়া গৃহিণীর হাতে একটি টাকা দিয়া কহিল —

"এটা আর খরচ করো না—রেখে দাও মা, কাল আবার দেখবো।"

গৃহিণী আশ্চার্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এ টাকাটা কোথায় পেলে বাবা ?"

"সে আর এখন শুনে কাজ নেই। বড় পেট জ্বলেছে—এক মুঠো পিণ্ডি টিণ্ডি দিতে পারিস মা ?"

বলিয়া কথাটা চাপা দিল। গৃহিণীও আর সে কথার উল্লেখ করিবার সময় পাইলেন না, তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িতে চলিয়া গেলেন।

পরদিনও ঠিক সেই রকম সময়ে সেই রকম করিয়া জগন্নাথ গৃহিণীর কাছে আর একটি টাকা আনিয়া জমা রাখিল।

সেইদিন রাত ন'টা দশটার সময়ে জগন্নাথ তাদের বাহিরের রোয়াকটায় বসিয়া তিন চার জন গোয়ালার সঙ্গে তামাক খাইতেছিল। তাহাদের বড় বড় দুধের কারবার ছিল—জগন্নাথ ইদানীং সেইখানে রোজ দুধ দুইতে যাইত।

নবগোপাল প্রতিবেশীর এক পূজা বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, তখনো ফিরেন নাই। গৃহিণী দাওয়ায় বসিয়া মেয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে চোখের জল ফেলিতেছিলেন।

হঠাৎ তাঁহার কাণে গেল—বাহির হইতে কে জগন্নাথকে খুব রাগিয়া বলিতেছে—"এ তোর ভারি অন্যায় জগা, অধমোণ দুধে একেবারে আট সের জল ঢেলে বড় বাড়ীতে দিয়ে এলি ? একটু ভয় ডর নেই ?"

জগন্নাথ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া মিনতির স্বরে তাড়াতাড়ি কহিল—"চুপ কর দাদা, যা করে ফেলেছি তার চারা কি, একটু আস্তে আস্তে কথা বল।"

সে ব্যক্তি আরো রাগিয়া কহিল—

"চুপ্ করবো কি, আসুক তো কর্ত্তাবাবু বাড়ীতে, এর যা হয় একটা কিনারা না করে আজ উঠ্‌ছিনি। গরীব ব'লে সবাই ভালবাসি বলে, বিশ্বাস করে তোকে চাকরি দিছি—নইলে কি আর গোয়াল মেলে না। তা মনিবের এই সর্ব্বনাশ করা। দু'দুদিন সেই এক কাণ্ড।"

"ঘাট হয়েছে ভাই মাপ্ কর—একটু আস্তে কথা ক, আর কক্ষণো এমন তর হবে না।"

জগন্নাথ অত্যন্ত কাতর হইয়া মিনতি করিতে লাগিল।

"আর কথনো কোথাও কি তোকে এক ছটাক দুধ দিতে পাঠাব ভেবেছিস্? এতই পয়সার খাঁক্তি হয়েছিল তো নয় সয়ে সাম্‌লে কর। তা না উপরি উপরি দুদিন একমোন দুধে একেবারে ষোলসের জল ঢেলে পুকুর চুরি—একেবারে দু'টাকা আড়াই টাকা সাফ্? এ কি ধরা পড়তে বাকী থাকে?"

জগন্নাথ একেবারে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া অত্যন্ত কাতরভাবে কহিল—

"তোর পায়ে ধরছি দাদা, এই বারটা মাপ্ কর, ভারি দরকারে পড়েছিলুম, দু'দিনে বাজারে সেই দুধটা বেচে দুটো টাকা নিয়েছি—আর কথনো করবো না।"

"তুই তো পায়ে ধরে খালাস কিন্তু এই যে আজ মহাষ্টমীর দিনে বড় কর্ত্তা ডেকে যাচ্ছে তাই বল্লে, সেটা কার দোষে? আমরা কি তার বাড়ীতে পুজোয় জলো দুধ পাঠিয়েছিলুম? এই যদি দাম কেটে নেয় তা কি করতে পারি তার? এমনি করে মনিবের সর্ব্বনাশ করা?"

"না ভাই, বড় মানুষ তাঁরা, পুজো এনেছেন—কক্ষনো গয়লার দুধের দাম কাটবেন না, আর ভাই আবার আমি তোর পায়ে পড়ছি, ঘাট মানছি—এবারটা আমায় মাপ কর। আমি দুধে জল ঢেলে বাড়িয়ে দু'টাকা যেমন চুরি করেছি তেমনি একমাস আমায় মাইনে দিস্‌নি, তার তিন ডবল উস্থল হয়ে যাবে। তোর পায়ে পড়ি ভাই, ও কথা নিয়ে বচ্ছরকার দিনটায় আজ আর রাগারাগি করিস্‌নি।"

জগন্নাথ যে উপর্য্যুপরি দুইদিন না খাইয়া সারাদিনটা কেন বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া আসিয়াছিল, এবং কোথা হইতে যে দুইদিনে দুইটি টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছিল গৃহিণীর তা বুঝিতে আর একটুও বাকী রহিল না। তখন তিনি তাঁহার কন্যা ও প্রায় নিঃসম্পর্কীয় এই বৃদ্ধের মঙ্গল কামনায় একমনে 'জগদীশ্বরে কাছে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন।

আর জগন্নাথ?" চোর বদনাম লইয়া সকলের কাছে কটূক্তি এবং লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া, নিজে সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া সে একটুও কাতর হইল না। দু'বছর পরে সে যে তার বুকের ধন তারাকে দেখিতে যাইবে সেই উল্লাসে একটিবারও সে রাত্রে চোখের পাতা বুজিতে পারিল না।

নবমীর দিন সকালে উঠিয়া জগন্নাথ নবগোপালকে না জনাইয়া, চুপি

চুপি গৃহিণীর কাছ হইতে টাকা দুইটি লইয়া বাজরে চলিয়া গেল। দেড় টাকা দিয়া একখানি ডুরে কাপড় কিনিয়া চার আনার মিঠাই কিনিল, তার পরে দু'পয়সার ফুট্ কড়াই কিনিয়া, সে গুলি অত্যন্ত সাবধানে লুকাইয়া লইয়া বাড়ীতে গৃহিণীর কাছে চুপি চুপি আসিয়া দেখাইল।

আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন বাছাকে দেখে আসতে পারি। বলিয়া গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া, সে গুলি গুছাইয়া লইয়া আবার চুপি চুপি বাহির হইয়া গেল। গৃহিণী খাইয়া যাইতে বলিলেন, সে কথা সে কানেই তুলিল না।

সন্ধ্যাবেলায় নবগোপল বাহির হইয়া গিয়াছেন, জগন্নাথ খালি হাতে শুষ্ক মুখে মড়ার মত হইয়া চুপি চুপি বাড়ী ঢুকিয়া একেবারে গৃহিণীর পায়ের কছে গিয়া ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া তিনি সাহস করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, কিন্তু মন উতলা হইয়া উঠিল। বুঝিতে পারিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া জগন্নাথ কহিল—

"না মা কিছুতেই দেখা হইল না, দরোয়ান বেটারা দোরের ভিতর ঢুকতেই দিল না, হাত থেকে সে গুলো কেড়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে 'ভাগো' বলে ঘাড়ধাক্কা দিতে দিতে আমাকেও ফেলে দিলে।"

বলিতে বলিতে জগন্নাথ কাঁদিয়া ফেলিল। গৃহিণী খানিক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তার পরে তাঁহার চক্ষু দুটিও জলে ভরিয়া উঠিল, মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিলেন —

"জিনিষগুলো কি হ'ল বাবা?"

জগন্নাথ হঠাৎ অত্যন্ত উল্লাসের সহিত কহিল "পাঠিয়েছি।"

"কি করে আবার পাঠালে?" গৃহিণী আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরে আসছি, দেখি যে 'পদ্ম নাপতিনী' কাদের তত্ত্ব দিয়ে ফিরছে। খুঁটে আমার বাকী চোদ্দটা পয়সা বাঁধা ছিল, তার তিন আনা দিয়ে, বলে কয়ে সেই থালাতে সাজিয়েই ধুকে পোষ ঢেকে তার হাতে করে পাঠিয়েছি। এবার দরোয়ান বেটাদের চোখে ধুলো দিছি মা।"

বলিয়া হাসিতে হাসিতে জগন্নাথ বাহির হইয়া গেল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই নাপতিনীর সঙ্গে আবার কথা কহিতে কহিতে বাড়ীর ভিতরে, ফিরিয়া আসিল।

"বল না দিদি তারা মা আমার আর কি বল্লে?"

"এই যে এক কথা একশো বার বল্লুম, আর বকতে পারিনি বাপু।"

"রাগ করিসনি দিদি, অনেক দিন দেখি নি, আচ্ছা এত বড় হয়েছে, না এতবড় ?" জগন্নাথ হাত দিয়া দেখাইয়া প্রশ্ন করিল।

নাপ্তিনী একটু হাসিয়া উত্তর করিল—"তুই যত বড় ভাবছিস ঠিক তত বড়।"

"আচ্ছা বেশ মোটা সোটা না মাঝা মাঝি ?"

"মরণ! বুড়োর কি ভিমরতি ধরেছে গা ?"

হাজার বার ওই এক কথার জবাব দিয়ে আসছি।

"আহা রাগ করোনা বাছা" বলিতে বলিতে গৃহিণী আসিয়া বসিলেন। তখন নাপ্তিনী, তারার শাশুড়ী কেমন করিয়া কাপড় খানা দুই হাতে করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, কেমন করিয়া মেঠাই গুলো মাটিতে ফেলিয়া পায়ে থেঁৎলাইয়াছে, কেমন করিয়া তারা মাঝে পড়িয়া তাহাকে নিজের ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া দোর দিয়াছে, তার পর কত কান্না কাঁদিয়া লুকাইয়া দুটি টাকা দিয়া বিদায় করিয়াছে, সে সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া শেষে কহিল—

"এমন কষাই চাগারের বাড়ীতেও মেয়ে দিতে হয় মা ? খাওয়া পরার দুঃখ নাই বটে, গয়না গাঁটিও পরছে, কিন্তু বাছার মনে এক তিলও সোয়াস্তি নেই, তোমাদের জন্য ছট্ ফট্ করছে, এক কথা হাজার বার, আর এই বুড়োকে দেখবার জন্য পাগল।"

কথাটা জগন্নাথের মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল।

নাপ্তিনী উঠিয়া গেলে জগন্নাথ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়া তারার শ্বশুর বাড়ীর কোন দিকে ক'টা দোর, ঘরের কটা জানালা, পাঁচীলটা কত উঁচু, কোথায় কেমন গাছ পালা আছে প্রভৃতি নানা সংবাদ খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইল।

রাত্রে আহার করিতে বসিয়া সে মোটেই খাইতে পারিল না, অনেক দিনের পরে তারার সম্বন্ধে অনেক কথা একেবারে শুনিয়া সেগুলা তার বুকের ভিতরে তোলা পাড় করিতেছিল, হঠাৎ গৃহিণীকে কহিল—

"মাগো, কাল না বিজয়া দশমী ?"

"হ্যাঁ বাবা—কেন ?"

"কাল আমার তারা মাকে দেখে আসবো।"

"না বাবা, তোমার আর সে বাড়ীমুখো হয়ে কাজ নেই।"

"না মা, তাকে একটিবার না দেখে আর আমি কিছুতেই থাকতে পারছি নি, কাল বিজয়া দশমী, কারুর কিছু বলবার যো থাকবে না।"

"বিশ্বাস নেই বাবা তাদের।"

"হোক মা, আমি এক ফিকির ঠাউরেছি, কাল মাকে আমার দেখবোই দেখবো।"

দশমীর সন্ধ্যার পরেই জগন্নাথ আসিয়া ঢিপ্ করিয়া নবগোপালকে প্রণাম করিয়া কহিল—

"বাবুগো, আশীর্ব্বাদ কর, আজ যেন মনবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।"

নবগোপাল তাহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিতে করিতে কহিল—"কি দাদা?"

"অনেক দিনের পর ডাক পড়েছে, আমি মনে মনে টের পাচ্ছি, আজ বাছাকে আমার দেখে আসব।"

"সে কি জগন্নাথ আজকের দিনটায় কেন সাধ করে অপমান কিনতে যাবে?"

না বাবু আজ আর কোন কথা মানবো না, মা আমার নিশ্চয় ডাকছে, নৈলে আমার মন এমন তর হ'ত না, আজ আর তাকে না দেখে থাকতে পারবো না। আশীর্ব্বাদ কর আজ বিজয়া দশমী, আজ বাছাকে নিশ্চয় দেখে আসবো।

তার পর বাড়ীর ভিতর গিয়া গিন্নিকে প্রণাম করিয়া কহিল—

মা লক্ষ্মী, চল্লুম তবে আশীর্ব্বাদ কর মা, আজ যেন তারা মার মুখ খানি দেখতে পাই।

"নেহাতই যাবে বাবা?"

হ্যাঁ নেহাতই যাব, ডাক পড়েছে আর থাকতে পারছি নে মা!"

বলিয়া পায়ের ধূলা লইয়া জগন্নাথ গামছা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ দেখা যায় গৃহিণী পলকহীন চক্ষে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তারপর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন,—

"হে মা জগদম্বা! এই সহায়হীন অনাথ পাগলটার মনের বাসনা পূর্ণ করো মা। এবার নিরাশ হলে, বেচারা আর প্রাণে বাঁচবে না।"

তারার শ্বশুর বাড়ীর পিছনদিকটায় একটা গলি রাস্তা। সেইখানটায় পাঁচিলের ভিতরদিকে মস্তবড় একটা ঝাঁকড়া নিমগাছ অন্ধকার করিয়া

তারার দ্বিতল শয়ন কক্ষের জানালার ধার পর্য্যন্ত গিয়াছিল, তার একটা ডাল পাঁচিলের উপর দিয়া রাস্তার উপরে অনেকখানি ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীর দরোয়ানেরা দাঁতন সংগ্রহ করিতে করিতে সেটাকে প্রায় মুড়ো করিয়া ফেলিয়াছিল।

রাত্রি দশটার সময় বৈঠকখানায় গান বাজনা এবং বিজয়া সম্মিলনের ধুম চলিয়াছিল দেউড়ীতে দরোয়ানেরাও 'ভাঙ্গের' মহোৎসব চালাইয়াছিল। বাটীর মধ্যে গৃহিণীর ঘরের বারাণ্ডায় প্রকাণ্ড কার্পেটের উপরে মেয়ে মজলিস বসিয়া গিয়াছিল। কেবল তারার মন বাপ মা ও জগু জ্যাঠার জন্য অত্যন্ত অস্থির হইয়াছিল। সে প্রণামের ব্যাপারটা সংক্ষেপে সারিয়া নিজের ঘরে সেই জানালার ধারে চুপটী করিয়া বসিয়া বাপের বাড়ীর কথা ভাবিতেছিল। যতই সেসব কথা মনে পড়িতেছিল, ততই একটিবার তাঁহাদের সবাইকে দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছিল, আর ততই দুই চক্ষে শ্রাবণের ধারা বহিয়া অনবরতঃ বুক ভাসাইয়া দিতেছিল।

সেই গলি রাস্তাটা সে পাড়ার লোকের গঙ্গাস্নানে যাইবার সোজা পথ। সেই পথে ভাসান দেখিয়া একদল ছেলে ঘরে ফিরিতেছিল। হঠাৎ সামনের নিমগাছটা নড়িয়া উঠিল, তাহারা চমকিয়া চাহিল, বেশ বোধ হইল— একটা লোক ডাল বাহিয়া বাড়ীর ভিতর দিকে গেল। অমনি তাহারা ভয়ে "চোর" 'চোর' করিয়া অত্যন্ত গোলমাল করিয়া উঠিল।

সেই গোলমাল শুনিয়া দরোয়ানদের ভাঙ্গের নেশা ছুটিয়া গেল— তাহারা যে যা সামনে পাইল, লইয়া গলির দিকে চোর ধরিতে ছুটিল।

সেই চীৎকার বৈঠকখানা ঘরে গিয়া মজলিস ভাঙ্গিয়া দিল; বাড়ীর বাবুরা শশব্যস্তে যেমন বাহিরের উঠানে নামিলেন অমনি দেখিলেন জন দুই তিন দরোয়ান "শালা ভিতর ঘুসা" বলিতে বলিতে বাড়ীর ভিতরের দিকে ছুটিয়াছে। তাঁহারাও অমনি "ধর ধর করিতে করিতে তাহাদের পিছনে পিছনে ছুটিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে উৎসবের আনন্দ-কল্লোল রণক্ষেত্রের মত—বিবাদ কোলাহলে ডুবিয়া গেল।

তখনও নিমগাছের দুই একটা ডাল নড়িয়া উঠিতেছিল এবং তারার ঘরের জানালার সামনে ডালটা বেশী রকম দুলিতেছিল। বাহিরের লোক গুলা "ওই ওখানে—ওই যায়" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। ততক্ষণে ভিতরে যে দরোয়ানেরা আসিয়াছিল—তাহারা নিমগাছের তলায় উপস্থিত

হইয়া তাহা দেখিয়া ফেলিল, এবং জন দুই গাছে চড়িতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর বাবুদের কেহ কেহ সেইখানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, অন্য সকলে তারার ঘরের দিকে ছুটিলেন।

গোলমাল শুনিয়া তারা প্রথমটা গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু হৈ হৈ যখন খুব বাড়িল তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে ছেলেবেলা হইতেই ডাকাবুকো, ভয় কাহাকে বলে জানিত না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া নিমগাছের পানে চাহিল। তাহারও বেশ বোধ হইল যেন একটা লোক খুব সন্তর্পণে তাহার ঘরের দিকেই আসিতেছে।

"সরে দাঁড়াও—সরে যাও—চোর চোর বলিতে বলিতে বাবুরা যেমন ঘরে ঢুকিলেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই চোর ডালটা ধরিয়া ঝুলিয়া দোল খাইয়া একেবারে ঘরের ভিতরে লাফাইয়া পড়িল।

"ধর শালাকে—মার শালাকে" বলিতে বলিতে বাবুরা সকলেই যম দুতের মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া কিল, ঘুষা, জুতা, লাথি প্রভৃতি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, চাকর বাকরেরাও ততক্ষণে আসিয়া যোগ দিল। তারা একপাশে নীরবে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল।

বেদম প্রহারে মৃতকল্প হইয়া চোর আর দাঁড়াইতে পারিল না। মুখ দিয়া খুব এক ঝলক রক্ত উঠিল, "উঃ মাগো, তারা যাই মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া মেঝেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল।

সেই আর্ত্তনাদ তারার কাণে বজ্রের মত বাজিল, সে স্থান কাল ভুলিল, আপন পর ভুলিল, শ্বশুর ভাসুর ভুলিল, লজ্জা সরম ভুলিল, সকল ভুলিয়া গিয়া পাগলের মত হইয়া "খুন করলে খুন করলে" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। সেই চীৎকারে হঠাৎ সকলে মার ধর বন্ধ করিয়া বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিল। সেই মুহূর্ত্তে তারা পাগলিনীর মত—শ্বশুর-ভাসুর-চাকর-বাকর সকলকে ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রলয়ের ঝড়ের মত চোরের উপরে আসিয়া পড়িল। ঘরের উজ্জ্বল আলোকে মেঝের রক্ত জ্বলিতেছিল। তাড়াতাড়ি চোরের মুখখানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিল। আলোক শিখা চোরের মুখে পড়িয়া সদ্য রক্তের দাগ আরো উজ্জ্বল করিয়া দিল।

তারার মুখ শুকাইল, বুক শুকাইল, অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—

"আমার জগু-জ্যাঠাকে খুন করে ফেল্লে গো!"

জগন্নাথ একটু একটু করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, অত্যন্ত কষ্টে আস্তে আস্তে কহিল—

"অনেক—কাল—দেখিনি—মা, তবু—তো—তো—তোকে—দেখলুম, ফুট্—কড়াই—কটা—এনেছি, খুঁটে—বাঁধা—আছে—খাস—মা।"

জগন্নাথ তারার কোলে মূর্চ্ছিত হইল।

সমাপ্ত।

খুড়োর উইল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লেখক অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল,

(৬)

"এই দেখ; এই বৎসরের প্রথম ষ্ট্রবেরী ফল!" মলি চেঁচাইতে চেঁচাইতে বৈঠকখানা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। যখনই সে আসিত, তাহার পিছু পিছু যেন হাসির ও আনন্দের একটা ঝড় বহিয়া যাইত। ক্লাইটি এক পুরাতন ডাকওয়ালা ডেকসের উপর কাগজ ফেলিয়া লিখিতে ছিলেন। সে ডেকসটী দেখিলে লোভে বিশ্বনিন্দুকেরও মুখ দিয়া জল পড়ে।" "আমি এগুলি নিজের হাতে কুড়িয়ে এনেছি" এই বলিয়া সে তাহার গোলাপী হাতের চেটো বাড়াইয়া দিল। তার উপর দুটি ফল; ফল দুটির রংও হাতের চেটোর অপেক্ষা বেশী গোলাপী নহে "প্রধান মালী ফল দুটি কুড়ুতে বারণ করেছিল। তা সত্বেও আমি এনেছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এই সব নিয়ে তার সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে প্রায়ই খুটি নাটি চলবে। তার এক পেধান দোষ, সে মনে করে, এই বাগান, ফলফুলের গাছ সবই তার। এইখানেই তার সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ। এ সব যে তোমার, আমি সেকথা বেশ মিষ্টি ভাষায় তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। সে বলে যে, এই ফলগুলি এখন জড় করে রাখছে, পরে অনেকগুলি একত্র হলে একদিন খাবার সময় দেবে, আমি তাকে ভদ্র-ভাবে বল্লাম, আমরা এগুলি পৃথক ভাবে খেতেই ভালবাসি। ফলে, সে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিষন্নমুখে চলে গেল। আমিও যুদ্ধ জয় করে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের

অর্দ্ধেক তোমাকে ভাগ দেবার জন্য এসেছি। ক্লাইটি, বড়টা তুমি নাও, ছোটটা আমার জন্য রেখ। তুমি নেবে না? তাহলে আমি দুটোই খেয়ে ফেলি।"

ক্লাইটি হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি চেয়ারে ঠেস্ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

মলি জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি হয়েছে? রাজকন্যার মুখে চিন্তার রেখা কেন?"

ক্লাইটি তাঁহার কপোল হইতে কেশরাশি সরাইয়া, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি। নানা লোক আমাকে পত্র লিখ্‌ছে। সে সব পত্রের কি উত্তর দেব, তা জানি না।"

মলি তাহার পোষাকে একটি ফুল গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল,—"উত্তর দিও না। একজন বড় লোক বলে গেছেন, পত্রের উত্তর না দিলে, তারা নিজেদের উত্তর নিজেরাই দেবে।"

"এ কথা যুক্তি সঙ্গত বটে। কিন্তু কাজের চিঠির, বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত পত্রের উত্তর নিশ্চয়ই দিতে হবে। আজ সকালে মিঃ গ্রেঞ্জার এক তাড়া চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি কি বলি? আমি বলতে পারি না যে, আমি এখানকার প্রকৃত অধিকারিণী নহি, স্যার উইলফ্রেড না আসা পর্য্যন্ত আমি ইহার রক্ষক বা অভিভাবক মাত্র।"

মলি একটা বিড়াল ছানা হাতে তুলিয়া ধরিয়া, তাহাকে তাহার সোণালী রংয়ের চুলের লোভ দেখাইতে দেখাইতে বলিল,—"সেই দুর্ব্বোধ যুবকের কাছ থেকে কোন সংবাদ আসে নাই বোধ হয়।"

ক্লাইটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"না, কোন সংবাদই আসে নি। মিঃ গ্রেঞ্জারও তাঁকে পত্র লিখেছিলেন, তারও কোন উত্তর নেই। কোনও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না।"

মলি পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লতা সহকারেই উত্তর করিল,—"হয়ত তিনি মারা গেছেন।"

"কেন, মারাই বা যাবেন কেন?"

"তা বলতে পারি না। তবে তুমিই বা কেমন করে জানলে যে, তিনি বেঁচে আছেন? মানুষের স্বভাবই মরা। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, তা নিয়ে

তোমার এত মাথা ঘামাবার দরকার কি ? আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিষয় সম্পত্তি পুনর্ব্বার দখল করেছি।—গাড়ী, ঘোঁড়া, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, আসবাব বিলাসের সামগ্রী, প্রচুর অর্থ—কিসের অভাব ?"

"মলি ! চুপ কর। বাজে কথা কি বলছ ?"

"তুমি রাগ করে থাকত, ক্ষমা কর। কিন্তু আমার উপদেশ শোনো, এস, আমরা আমোদ আহ্লাদ করে দিন কাটাই। তুমি এতে আনন্দ উপভোগ করতে পারছ না কেন ? আমি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট হলেও, জ্ঞানে বড়। আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। আমি দিবসের প্রতি ঘণ্টাই আমোদ উপভোগ করছি ; কিন্তু তুমি খালি মুখ ভার করে বসে আছ, প্রতি কাজে বিরক্ত হচ্ছো, যেন জীবনটা তোমার কাছে এক মস্তবড় ভার ! তুমি দেখছি আবার আমাদের সেই পুরাতন বসতবাটীতে ফিরে যেতে চাও !"

ক্লাইটি ডেস্কের উপরিস্থিত পত্র রাশির প্রতি হতাশভাবে তাকাইয়া বলিলেন,—"যথার্থই আমি তাই ইচ্ছা করি। সেই জীবন যাপনই বড় সুখের ছিল ; তখন আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে চলে ফিরে বেড়াতুম, এমন ছায়াকৃতির মত বাতাসের ভরে এদিক ওদিক উড়ে বেড়াতে হয় না।"

মলি বিড়ালের গায়ে মুখ রাখিয়া বলিল,—"এই ছায়াকৃতির ন্যায় ভেসে বেড়ানই ভাল। তুমি যদি দিন রাত এইরকম মুখ ভার করে বসে থাক, তা হলে দুদিনে মিঃ হেসকেথ কার্টনের ন্যায় রুগ্ন ও জীর্ণ হয়ে পড়বে। হাঁ, ভাল কথা, তিনি কি আজ এখানে এসেছিলেন ?"

"হাঁ, বিষয় সংক্রান্ত কোন কাজ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমাকে বিষয় কর্ম্মে সাহায্য করতে, তিনি সদাই প্রস্তুত। আমাদের ন্যায় দুজন নিরুপায় পিতৃ মাতৃ হীন বালিকার জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার করা, তাঁহার দয়া ও মহত্ত্বের পরিচয়।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখি ; তিনি এই সপ্তাহের প্রতিদিনই এইখানে আসছেন, সত্য নয় কি ?"

ক্লাইটি অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলেন "হাঁ—না ; আমার ঠিক মনে নাই।"

"এটা মনে না থাকা অকৃতজ্ঞের কাজ।" তার পর বিড়ালছানার দিকে তাকাইয়া বলিল,—"পুসু, মিঃ হেসকেথ কার্টনের ন্যায় তোর থাবাগুলো ভেতরে লুকিয়ে রেখে দে।"

ক্লাইটি তিরস্কারপূর্ণ নয়নে তাহার প্রতি তাকাইলেন।

"মলি, এ সব কথা ঠাট্টা করেও তোমার বলা উচিত নয়।"

মলি ক্লাইটির চিন্তাপূর্ণ মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"তুমি কি রকম করে জানলে যে আমি ঠাট্টা করে বলছি?"

"মলি! এ ব্যবহার ভদ্রতা সঙ্গত নহে। তাঁর সহৃদয়তার জন্য তাঁর প্রশংসা করা উচিত।"

"সহৃদয়তা কথাটা খুব লম্বা চওড়া বটে।"

"দেখ, স্যার উইলিয়মের পুত্র পিতাকে ত্যাগ করবার পর—"

"ওঃ! আমি মনে করেছিলাম, বাপে ছেলে ঝগড়া হয়েছিল এবং স্যার উইলিয়াম সেই জন্য ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যাহোক তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি বলে যান; ন্যায়পরায়ণ বিচারক মহাশয়, বলুন।"

"যাহোক, মিঃ হেসকেথ কার্টন স্যার উইলিয়ামের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি সব কাজে খুড়োকে সাহায্য করতেন। তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন বল্লেই হয়। এক কথায় তিনি নিজের অশেষগুণে তাঁর পুত্রের স্থানই অধিকার করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোন কথাও বলতে পারে নাই। সকলেই মনে করেছিল, স্যার উইলিয়াম তাঁকেই ব্রামলে সম্পত্তি ও নগদ টাকা কড়ি সব দিয়ে যাবেন। লেডী উইঙ্কফিল্ড কাল এখানে এসেছিলেন, বল্লেন তাঁরাও মনে করে ছিলেন হেসকেথই বৃদ্ধের বিষয় সম্পত্তি সব পাইবেন। কিন্তু কার্য্যে সেরূপ না হওয়ায় তাঁরা বড়ই বিস্মিত হইয়াছেন।"

মলি ধীর ভাবে তাহার মন্তব্য প্রকাশ করিল,—"লেডী উইঙ্কফিল্ড সম্বন্ধে আমার ধারণা কিন্তু ভাল নহে। যত বুড়ো পরনিন্দুক আছে, তাদের মধ্যে তিনি একজন পাণ্ডা।"

"তাঁকে বিষয় সম্পত্তি ও টাকা কড়ি কিছু না দিয়ে, স্যার উইলিয়াম কেবল কারখানাটাই দিয়ে গেছেন।"

"তা'হলে বল্‌তে হবে অতি ভাল জিনিষই দান করে গেছেন। আমি শুনেছি, স্যার উইলিয়াম ঐ কারখানা থেকেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি অর্জ্জন করেছেন।"

ক্লাইটি অধীরভাবে নড়িয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"তুমি তা'হলে পাড়াপড়সির সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করে বেড়াচ্ছ?"

"বুদ্ধিমান লোকে সব শুনেই বেড়ায়, কথা কয় না। আমাদের বন্ধুরা দিন রাতই আমাদের বিষয় আলোচনা করছে। আমি ত আর কালা নই। আমি সব শুনি, তাদেরই কথা থেকে অনেক নূতন জিনিষ শিক্ষা করি এবং মনে মনে সেগুলি পরিপাক করি। তুমি যদি আমার মতামত চাও তা'হলে—"

ক্লাইটি হাসিয়া বলিলেন,—"আমার দরকার না হ'লেও, বাধ্য হয়ে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে!"

মলিও প্রফুল্লবদনে উত্তর করিল,—

"আমার মনে হয়, আমার পরামর্শ গ্রহণ করা তোমার দরকার হয়ে পড়েছে। আমি আমার মনের ভাব স্পষ্টই প্রকাশ করব, কারো ভাল লাগুক, আর নাই লাগুক। আমার মতে মিঃ হেসকেথ কার্টনের প্রতি খুব ভাল ব্যবহারই করা হয়েছে। আমার এই অযাচিত অতৃপ্তিকর মত প্রকাশ করেই, আমি ঘোড়ায় চড়তে যাচ্ছি। বোকা সহিস আমার জন্য একটা ছোট ঘোড়া এনেছে। কিন্তু আমার একটা তেজিয়ান ঘোড়া হলেই ভাল হত। রমণী বল, ঘোড়া বল, তেজীয়ানই আমি পছন্দ করি।"

"মলি, তুমি বুঝ্‌তে পারছ না যে, আমাদের এই সুখসমৃদ্ধি ক্ষণস্থায়ী; শীঘ্রই এর অন্ত হবে।"

মলিও হাস্যমুখে বলিল—"হ্যাঁ; তা বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু তুমি বুঝে যেমন গম্ভীর হয়ে বসে আছ, মুখে হাসি নাই, খেলায় আমোদ নাই, তা আমি পারি না। যতক্ষণ সূর্য্য কিরণ দেয়, প্রজাপতির ন্যায় আমিও আনন্দ উপভোগ করতে ইচ্ছা করি। তুমিও আমার সঙ্গে এস না। সেদিন আস্তাবলে তোমাকে যে ঘোটকীটা দেখিয়েছিলাম, সেটা খুব শান্ত, তোমার চড়বার বেশ উপযুক্ত।

ক্লাইটি মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলেন। পরে উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে উৎসুক নেত্রে তাকাইয়া বলিলেন,—"আমার সময় নেই। আমাকে এখন কাজ করতে হবে, এতগুলি পত্রের উত্তর দিতে হবে।"

"বিষয়ের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য জ্ঞান তোমাকে আনন্দ উপভোগ করতে বাধা দিচ্ছে। তোমার অল্প বয়স এবং অল্প বয়স্কদের একটা প্রধান দোষ তাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান বড় বেশী। কিন্তু এ দোষ তোমার শীঘ্রই কেটে যাবে। তুমি যখন আমার মতন বুড়ো হবে—"

মলি লিখিবার ডেস্কে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্ল ।হতটার সেইটা

প্রফুল্ল সরল মুখখানি নিকটে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন। চুম্বন করিবার সময় মলির একগুচ্ছ চুল তাঁহার চোখে পড়িয়া যন্ত্রণা দিতে লাগিল।

"মলি, তুমি বড় অপরিপাটী!"

মলি লজ্জিত হইয়া বলিল,—"সে কথা সত্য বটে। আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য আমার বড় বোনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করা; তার ঠিক উল্টা গাওয়া। তুমি সুন্দরী, রমণীয়, আমি দেখতে সাদাসিধে। তুমি সভ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আমি অভদ্র ও অশিষ্ট; তুমি সকল গুণের আধার—স্বার্থহীন কর্ত্তব্যপরায়ণ, উচ্চমনা, স্ত্রীজনোচিত সকল গুণে ভূষিতা, আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা; মস্ত বড় স্বার্থপর প্রাণী। তোমার সম্মুখে উচ্চ আদর্শ, আমার কোন আদর্শ নাই। সত্যের পূজা করিতে গিয়া তুমি সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব ত্যাগ করতে পার, এই অগাধ বিষয় সম্পত্তিও ছাড়তে পার—"এই বলিয়া সে একবার মহামূল্য সুন্দর আসবাব পরিপূর্ণ ঘরের দিকে তাকাইল, —"প্রয়োজন হইলে তৃণশয্যায় শয়ন করতে পার; আমি বিলাসিতা সাগরে ডুবে রয়েছি, অতীব তৃপ্তির সহিত রাজভোগ আহার করছি, এই গাড়ী ঘোঁড়া আমার খুব ভাল লাগছে। বাস্তবিকই আমি পার্থিব সুখ সম্পদে বিভোর হয়ে রয়েছি, সংসারের সুখের মোহে মুগ্ধ হয়ে গেছি। ক্লাইটি, তুমি আমার মস্তকের উপরিস্থিত আকাশে ভেসে বেড়াও; স্বর্গীয় দূতীর ন্যায় নন্দনকাননই তোমার উপযুক্ত স্থান, এই পাপতাপপূর্ণ সংসার তোমার ন্যায় রমণীর উপযুক্ত আবাস স্থল নহে।"

ক্লাইটি হাসিয়া তাহাকে সরাইয়া দিলেন। মলি তাহার সরু ক্ষুদ্র বাহুদুটির দ্বারা দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

"যাও, ঘোঁড়ায় চড় গে, কথায় তোমার সঙ্গে কেউ পেরে উঠবে না!"

"এখানে আসা অবধি, এই আজ তোমাকে প্রথম বুদ্ধিমানের ন্যায় কথা বলতে শুনলাম। দেখ, যেন এ বুদ্ধিটুকু আর নষ্ট না হয়। নাও, মলির প্রস্থান ও যবনিকা পতন।"

মলি বিড়ালছানা এবং কথার ঝড় লইয়া চলিয়া গেল। ক্লাইটি নিজের কাজে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার মনে হইল যেন পৃথিবীর সমস্ত ভার তাঁহার মস্তকে চাপিয়াছে। তাঁহার আদৌ ধারণা ছিল না যে, ব্রামলে সম্পত্তি এত বিস্তৃত এবং একজন অস্থায়ী মালিকেরও এ সংক্রান্ত এত বেশী কাজ। অস্থায়ী মালিক! এই চিন্তাই ত কষ্ট দায়ক! তাঁহার হিতকারী বন্ধুরা তাঁহার এই

সৌভাগ্য দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাকে ইহার স্থায়ী মালিক থাকিতে জিদ করিয়াছেন। তাঁহারা সবাই স্থির করিয়াছিলেন যে স্যার উইলিয়ামের পুত্র স্যার উইল্‌ফ্রেড ও পুরাতন ব্রামলে বংশের বর্ত্তমান প্রতিনিধি মিস ক্লাইটি পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এই বিষয় সম্পত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইবেন এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট কৃষক, শ্রমজীবী ও অপরাপর অসংখ্য লোকের ভাগ্য নির্ণয় করিবেন।

এই ধারণা তাঁহাদের মনে এত বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে স্থির সেই মীমাংসার বিরুদ্ধে কিছু বলা ক্লাইটির পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কেবল যে গ্রামের লোকেরা বা ক্লাইটির বন্ধুরা এরূপ ভাবিত, তাহা নহে, এমন কি বাড়ীর দাস দাসীরাও তাঁহাকে এরূপ সম্মান দেখাইত যেন, ব্রামলে বংশীয় একজনই তাঁহার পুরাতন সম্পত্তি ফিরাইয়া পাইয়াছেন। স্যার উইলিয়াম অবশ্য লোক খুব ভাল ছিলেন। তবুও তাঁহাকে ইহারা অনধিকার প্রবেশকারীর ন্যায় মনে করিত,—যেন একজন ধনী লোক কেবল অর্থের বলে এই প্রাচীনবংশকে বাসচ্যুত করিয়াছেন! স্যার উইলিয়ামও একজন সদাশয় জমিদার ও সহৃদয় মনিব ছিলেন, সময়ে সময়ে তিনি লোকজনকে অর্থও দান করিতেন, তবুও তিনি প্রজাগণের মন জয় করিতে পারেন নাই। তাহাদের মন সেই পুরাতন প্রভুবংশের প্রতিই বিশ্বস্তভাবে অনুগত ছিল।

যখনই ক্লাইটি তাহাদের সহিত দেখা করিতে যাইতেন, তাহারা অনান্দের সহিত হাসিমুখে তাঁহার অভ্যর্থনা করিত। এবং যদিও তিনি জনকতক পুরাতন প্রজাকে বলিয়াছিলেন যে এ সম্পত্তির তিনি অস্থায়ী মালিক মাত্র, তাহারা হাসিয়া এই গুরুতর কথাটা উড়াইয়া দিয়াছে এবং কিছুতেই ইহা স্বীকার করিতে রাজি হয় নাই।

বৃদ্ধ কৃষক বাটলে অনেক পুরুষ ধরিয়া ব্রামলে বংশের জমি চাষ করিয়া আসিতেছে। সে বলিল,—"আপনি এখানে এসে যদি আবার স্বেচ্ছায় চলে যান, তাহলে আপনার পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা, ইহাতে আপনার পাপ স্পর্শাবে।" ক্লাইটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িয়া তাহার সহিত এ বিষয়ে তর্ক করিবার অনেক চেষ্টা করিলেও এই বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ভদ্র অথচ দৃঢ়ভাবে তাঁহার সেই প্রতিবাদ গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিয়াছিল।

বৃদ্ধ বাটলের কথাই তাঁহার কানে তখনও বাজিতেছিল। ক্লাইটি সেই কথাই ভাবিতে ছিলেন এবং পত্র লেখা অসম্ভব দেখিয়া তিনি উঠিয়া খোলা

বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখান হইতে উদ্যান ও দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীর সুন্দর ও বিস্তৃত দৃশ্য তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিতে ছিলেন যে, বাল্যকালে যে ভাবে তিনি এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, দিনদিন তদপেক্ষা আরও দৃঢ়ভাবে এবার তিনি ইহার প্রতি আসক্ত হইতেছেন। ইহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান। তিনি এই স্থানের সকল প্রজাকেই ভাল বাসেন। তিনিও মনে মনে বেশ বুঝিতে পারেন যে, প্রজারাও তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত; তাহারা তাঁহার নিকট অকপটে তাহাদের দৈনিক জীবনের হাসিকান্না ও সুখদুঃখের কথা প্রকাশ করিত, এমন কি তাহাদের সুখদুঃখে তাঁহার নিকট সহানুভূতি লাভেরও আশা তাহারা হৃদয়ে পোষণ করিত।

প্রত্যেক গোলাবাড়ী ও পর্ণ কুটীরের দ্বার ক্লাইটি ও মলিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। তাহারা নিজ নিজ বাটীতে ভগ্নীদ্বয়কে সাদর সম্ভাষণ করিত ও তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য তাহাদের রসনা তৃপ্তি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। সরল প্রকৃতি প্রজাগণ মনে মনে এরূপও ভাবিত যে ব্রামলে বংশ যখন তাহাদের স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তখন তাহারাও তাহাদের আপদ বিপদের সময় সেই বাড়ীতে নিশ্চয়ই একটু আশ্রয় ভিক্ষা পাইবে। ক্লাইটি এ বাড়ীতে আসিতে না আসিতেই প্রত্যহই দু'একজন প্রজা তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছে, এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ বিনাবাক্যব্যয়ে যথাসাধ্য তাহাদের সাহায্য করিয়াছেন। সাহায্য প্রার্থিগণ সফল-মনোরথ হইয়া কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে। কেবল যে অর্থ, খাদ্য বা পোষাক পরিচ্ছদ পাইয়া তাহাদের অভাব পূরণ হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদের সহিত সদয় ও মিষ্ট কথা কহিয়া, তাহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া, ক্লাইটি যে গভীর সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জন্যই তাঁহার নিকট তাহারা বেশী কৃতজ্ঞ।

তাঁহার অধীনস্থ লোকদের দুঃখ ভাবিয়া ক্লাইটি যে দুঃখিত হইবেন, তাহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি? কয়েক মাস পরেই তাঁহাকে এই প্রিয়স্থান ও লোকজন ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে স্যার উইলফ্রেড কার্টন ইহাদের উপর শাসন দণ্ড চালাইবেন। তিনি কি রকমের লোক? ক্লাইটি মনে মনে আপনাকে এই প্রশ্ন প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন। অবশ্য ব্রামলে বংশেও অনেক অসচ্চরিত্র, অকর্ম্মণ্য, অসংযতচিত্ত, ব্যসনরত উড়োনচণ্ডি

ছিল, প্রজাগণের সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন, যাহারা নিজেদের ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকাংশ বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করিয়া গিয়াছে। স্যার উইলফ্রেডও কি তাহাদের মত একজন হইবেন? তিনিও ত তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল ভ্রমণশীল জীবনে, অপরাপর সমাজচ্যুত অসচ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি যে এই লোকদের সুশাসনে রাখিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

তিনি আছেনই বা কোথায়? তিনি বাড়ী আসিয়া কেন তাঁহার উদ্বেগের নিরাকারণ করিতেছেন না? মিঃ গ্রেঞ্জারের পত্রের উত্তর স্বরূপ এতদিনে তাঁহার স্বয়ং এখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়া উচিৎ ছিল!

ক্লাইটির মনে যখন এইসব গোলমেলে চিন্তা উদিত হইতেছিল, সেই সময় মলি ঘোঁড়ায় চাপিয়া তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার চুল বাতাসে উড়িতেছে, কোমল মুখ রক্তাভ, ঘোঁড়াটাকে বশে আনিতে তাহাকে বিশেষ একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। ঘোঁড়াটা মাথা নাড়িয়া মাঝে মাঝে ভয় দেখাইতেছিল, যেন সে বিদ্রোহী হইবে। কিন্তু মলি তাহাতে আদৌ ভীত হয় নাই। সে এক হস্ত রাশ হইতে মুক্ত করিয়া ক্লাইটিকে হাতছিনি দিয়া ডাকিল। তাহার বাল্যসুলভ কোমলস্বরে বলিল, "তুমি এস না? সত্যি তোমাকে একখানি চিত্রিত ছবির মতন সুন্দর দেখাচ্ছে।—তাহ'লে আমি আসি!"

বালিকা ঘোড়ায় চাপিয়া বাহির হইল। তাহার কথা ভাবিয়া ক্লাইটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভাবিলেন, মলিকে যখন এই বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তখন না জানি তাহার কত কষ্টই হইবে! হয়ত বা এখানে চিরকাল থাকিবার জন্য সে জিদ করিয়া বসিবে।

হায়, স্যার উইলফ্রেড কেন আসিলেন না!

* * * * * * *

স্যার উইলফ্রেডের না আসিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। কারণ তাঁহার পিতার পত্র তাঁহার হস্তগত হয় নাই। হেস্‌কেথ কার্টন বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে সে পত্র উইলফেডের নিকট না পৌছায়। স্যার উইলিয়মের মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে হেস্‌কেথের নিকটই চিঠির বাক্সের চাবি থাকিত, এবং চিঠি সব ডাকে দিবার পূর্ব্বে তিনি প্রত্যেক চিঠি হইতে পত্রগুলি যত্নে বাহির করিয়া মনোযোগের সহিত পড়িতেন। মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার

বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সেই জন্যই পাছে স্যার উইলিয়াম, মৃত্যুর পূর্ব্বে এক-মাত্র সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাহাকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লেখেন, এ বিষয়ে তিনি খুব সতর্ক ছিলেন। তাঁহার এই ধারণা কাজেও ফলিয়া গেল। স্যার উইলিয়াম পুত্রকে বাড়ী ফিরিবার জন্য পত্র লিখিলেন। হেসকেথ চিঠির বাকস হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া, পড়িয়া তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

মিঃ গ্রেঞ্জারের পত্র উইলফ্রেড মিনটোলা পরিত্যাগ করিবার পরই সেখানে পৌঁছায়। অতএব তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর কথা বা উইলের বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। তখন তিনি জ্যাক ডগলাস নাম গ্রহণ করিয়া জ্যারোদম্পতীর অধীনে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছিলেন। দিন দিন সেখানকার লোকদের ভালবাসা ও সম্মানের মাত্রা তিনি বেশী লাভ করিতে লাগিলেন। দিন, সপ্তাহ, মাস প্রায় অলক্ষিতেই কাটিয়া যায়। কখনও কখনও তিনি স্থানান্তরে কাজ দেখিতে যাইতেছেন, কখনও বা গোলাবাড়ীর কাজই করিতেন। যে কাজেই হাত দিতেন, এরূপ নির্দ্দোষভাবে তিনি তাহা সম্পন্ন করিতেন যে জ্যারোদম্পতী তাঁহার কাজে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইতেন। অনুগত ভৃত্যেরাও প্রভুর কার্য্যকুশলতা দেখিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া থাকিত, এবং মনে মনে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত।

জ্যাকের একজন বিশেষ বিশ্বস্ত ভক্ত ছিল,—মেরী সিটন। কিন্তু জ্যাক তাহা জানিত না। মেরী কদাচিৎ তাহার সহিত কথা কহিত বা তাহার কার্য্যাবলি বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিত। কিন্তু জ্যাক যখন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, মেরীর দিকে লক্ষ্যও করিত না, মেরী তখন একদৃষ্টে তাহার প্রতি তাকাইয়া থাকিত এবং তাহার সুখবিধানের জন্য মিসেস জ্যারোকে প্রাণপণ সাহায্য করিত। জ্যাক যখন কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিত, দেখিত, তাহার অপরিষ্কার টেবিলের উপর ফুল রহিয়াছে, তাহার পোষাক পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত রহিয়াছে এবং সান্ধ্য ভোজনের সময় নানাপ্রকার রুচিকর খাদ্যদ্রব্য আসিয়া হাজির হইত।

জ্যাক এইসব আদর যত্নের জন্য মিসেস জ্যারোর নিকটই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। কিন্তু মেরী সিটনই যে টেবিলে ফুল রাখিয়া যাইত, পোষাক পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দিত, তাহার রুচিকর খাদ্য হয় সে স্বহস্তে পাক করিত, কিম্বা তাহা পাক করিবার জন্য মিসেস জ্যারোকে বলিয়া দিত; জ্যাক

তাহা ঘুণাক্ষরেও টের পাইত না। জ্যাক খাইবার সময় মিসেস জ্যারোর দয়ার বা গুণের প্রশংসা করিলে, মেরী মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইত। এবং একদৃষ্টে জ্যাককে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে লক্ষ্য করিত।

স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় ও পুষ্টিকর খাদ্যের গুণে মেরীর স্বাস্থ্য পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিল। তাহার শরীর এখন একটু হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল দেখাইতেছে। তবুও মধ্যে মধ্যে অতীত দুঃখকষ্টের একটা কৃষ্ণ ছায়া কোথা হইতে আসিয়া তাহার উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিত। সেই অতীত দিনের কথা সে কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। সে কথাই খুব অল্প কহিত, নিঃশব্দে নিজের কাজ করিয়া যাইত। সেইজন্য মিসেস জ্যারো প্রায়ই তাহার স্বামীর কাছে বলিত,—"জ্যাক যে নিজেই এক রত্ন বিশেষ তাহা নহে, সে তাহার সঙ্গেও এক রত্নখণ্ড আনিয়াছে।"

মিঃ জ্যারোর—"পারাসুলা" হইতে চল্লিশ মাইল দূরে "সিলভার রিজ" নামে আর একটি গোলাবাড়ী ছিল। জ্যাক গতবার কার্য্য পরিদর্শন করিতে গিয়া সেইটি বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে। জমিটি চাষের বেশ উপযুক্ত। জ্যারো দম্পতী "পারাসুলা" লইয়াই এত ব্যস্ত যে ঐ গোলাবাড়ী দেখিবার তাঁহাদের আদৌ সময় ছিল না। সেখানকার ঘর বাড়ী সব প্রায়ই পড়িয়া গিয়াছে, চারদিকের বেড়াগুলি সবই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জ্যাক্ এই স্থানটি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পরিদর্শন করিয়া এই জমির অবস্থা সম্যক লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে; এস্থানে আবাদ করিলে ফসল যে বিশেষ লাভজনক হইবে, সে বিষয়ে তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। পারাসুলায় ফিরিয়া আসিবার পর সে এই সকল কথা জ্যারোদম্পতীকে জানাইল। মিঃ জ্যারো ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"অনেক দূর। এই একটারই সুবন্দোবস্ত করতে সব সময় চলে যায়। কিন্তু জ্যাক, তুমি যদি সে গোলা-বাড়ীটার সম্বন্ধে এত আশা করে থাক, তাহলে তুমি যদি ওটা চালাইতে পার, আধাআধি লাভে আমি রাজি আছি। মিসেস, তুমি কি বল?"

মিসেস জ্যারো ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া হাসিল। বলিল,—তোমার কথাতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

জ্যাকও তাহাদের এই অমায়িক প্রস্তাবে ধন্যবাদ জানাইয়া সরলভাবে উত্তর করিল,—"বেশ, আমিও রাজি আছি। ঐ গোলাবাড়ীর ভার আমি

নিজস্কন্ধে লইব। আমার সঙ্গে দু'একজন লোক দিন, দেখি, কতদূর কি করিতে পারি। আমার বিশ্বাস, এ কাজও বেশ লাভজনক হবে।"

জ্যাক ধূমপান করিতে করিতে নিজের কাজে চলিয়া গেল। পরদিন সে তিনজন লোক লইয়া "সিলভার রিজ" যাত্রা করিল।

যাইবার সময় মেরী সিটন হঠাৎ প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জ্যাকের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে তাকাইল। জ্যাক সেই দৃষ্টির মর্ম্ম সম্যক অনুভব করিল। বলিল,—"মেরী, তোমার শরীর বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে।"

মেরী মৃদুস্বরে বলিল,—"হাঁ।"

মেরী সেখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। একবার তাহার পোষাকের পকেটে হাত দিয়া কি যেন একটা জিনিষ বাহির করিতে গেল। কিন্তু দু'এক মুহূর্ত্ত পরে, সে আর কিছু না বলিয়া গোশালার দিকে প্রস্থান করিল।

জ্যাককে সিলভার রিজে প্রায় তিন সপ্তাহ থাকিতে হইয়াছিল। এই তিন সপ্তাহ অধীনস্থ লোকেরা কঠোর পরিশ্রম করিয়া ঘরবাড়ী সব মেরামত করিয়া তুলিল; বেড়া উঁচু করিয়া দিয়া যথাস্থানে গোশালা নির্ম্মাণ করিল। জমির অবস্থা দেখিয়া তাহাদের মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, এখানে পরিশ্রম করিয়া চাষ করিতে পারিলে, তাহাদের পরিশ্রম নিশ্চই ব্যর্থ হইবে না। জ্যাক জ্যারো দম্পতীকে এই সুসংবাদ দিবার জন্য "পয়ামুলায়" চলিল।

জ্যাক আস্তাবলে গিয়া ঘোড়া হইতে নামিতেই মেরী তাহার নিকট অগ্রসর হইল। তাহার হাতে একখানি সংবাদ পত্র।

"এই কাগজখানি তোমাকে দিতে চাই। তুমি এখান থেকে যাবার পূর্ব্বে একজন লোক এখানে এটা ফেলে গেছে। তুমি ইচ্ছা করলে পড়তে পার।"

"মেরী, ইহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এ তোমার বিশেষ দয়ার পরিচয়! এখানে সংবাদ পত্র পড়বার সুবিধা বড় পাওয়া যায় না।" এই বলিয়া জ্যাক সংবাদ পত্রখানি জামার পকেটে গুঁজিয়া রাখিল এবং জামা বদলাইবার সময় ভ্রমক্রমে উহা জামার পকেটেই রহিয়া গেল।

জ্যারো দম্পতী সিলভার রিজের বর্ত্তমান উন্নতি ও ভবিষ্যত আশায়

সম্ভাবনা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। জ্যারো বলিল,—"এ থেকে তোমার ভবিষ্যতও বেশ উজ্জ্বল হবে।"

জ্যাক সংবাদপত্রের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। আহারের পর ঘরে শুইতে গিয়া দেখে সংবাদ-পত্রখানি ছাড়া জামার পকেট হইতে একটু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তখন কাগজ খানির কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে কাগজখানি খুলিয়া বাতির আলোতে পড়িতে লাগিল। জ্যারো দম্পতী তখনও বিছানায় শয়ন করেন নাই। হঠাৎ একটা তীব্র আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাঁহারা চমকিয়া উঠিলেন। দু'এক মুহূর্ত্ত পরেই জ্যাক সেই কাগজ খানি হাতে মুড়িয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। তাহার মুখ বিবর্ণ, নেত্রদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত।

"আমাকে বাড়ী যেতে হবে। আমি কাগজে এই মাত্র এক অশুভসংবাদ পড়েছি। আমাকে কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডে ফিরে যেতেই হবে।"

ক্রমশঃ

নকলে আসল।

[লেখক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু]

সে আজ অনেকদিনের কথা—তখন আমরা আমেদপুরে থাকিতাম। আমার বয়স তখন ১৭ কি ১৮। সে সময় খুব আমোদেই দিন কাটিত। এখন সে সব দিনের কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। সেখানে আমাদের একটী জিমনাষ্টি-কের দল ছিল, গ্রামের সকল ছেলেরাই সেই দলভুক্ত না হইয়া থাকিবার আর উপায় ছিল না। গ্রামে দুই চারিজন বৃদ্ধ ব্যতীত অপর সকল বয়স্থ ভদ্র লোকই অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে সহরে থাকিতেন। আমরাই গ্রামের সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলাম। জিমনাষ্টিক দলের বিরুদ্ধে ভয়ে কেহ কথাটি পর্য্যন্ত কহিতে পারিত না। আমাদের বিরুদ্ধচারণ করিতে পারে জগতে এমন লোক কেহই নাই, ইহাই আমাদের ধারণা। আমাদের মধ্যে নারাণ সকলের অপেক্ষা ভাল জিমনাষ্টিক করিতে পারিত। জাতিতে সে তাঁতী হইলেও দলের সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। আমরা অনেক সময় নারাণের কথা মতই চলিতাম। নারাণের সংসারে কেহ ছিল না। পিতা মাতা উভয়েই তাহাকে পাঁচ বৎ-সরের শিশু রাখিয়া পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছিলেন। দূর সম্পর্কের এক বৃদ্ধা পিসির নিকটে সে থাকিত। পিসি অতি কষ্টে নিজের ও নারাণের জন্য

রন্ধন করিতেন। নারাণ খুব ভাল তাঁতের কাজ জানিত, মন দিয়া কাজ করিলে সে দিন ১৷০ হইতে ১৷৷০ রোজগার করিতে পারিত। কিন্তু নারাণ কখনও কাজের দিকে, রোজগারের দিকে বেশী মন দিত না। জিমনাষ্টিক লইয়াই সময় কাটাইয়া দিত।

হঠাৎ একদিন বিসূচিকায় বৃদ্ধার মৃত্যু হইল। নারাণের সংসারে আর কোন অবলম্বন রহিল না। কিন্তু নারাণের কোনই অসুবিধা বা কষ্টের ভাব দেখা গেল না। সে নিজেই রন্ধনাদি করিত, আবার ঠিক সময়ে আমাদের দলে আসিয়া যোগ দিতে লাগিল। তাহার যে কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে, তাহা কাহাকেও বুঝিতে দিত না। তাঁতের কাজ, রন্ধনাদি ও জিমনাষ্টিক এক সঙ্গেই চলিতে লাগিল।

নারাণের বয়স একুশ কি বাইস বৎসর হইয়াছিল। এ বয়সে অনেকেরই বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও নারাণের জন্য একটি পাত্রী যোগাড় করিতে পারিলাম না। নারাণ দেখিতে সুশ্রী ও উপার্জ্জনক্ষম হইলেও অভিভাবকহীন বলিয়া তাহাকে সহজে কেহ কন্যা দিতে রাজি হইল না। আমরা কিন্তু আশা ছাড়িলাম না, কিরূপে নারাণের বিবাহ দেওয়া যায় সে জন্য দলের সকলেই চেষ্টিত রহিলাম।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী চার পাঁচখানি গ্রামের তাঁতীরা সভা করিয়া স্থির করিয়াছিল যে বিবাহে পণ গ্রহণ বন্ধ করিতে হইবে, কেবল মান্য হিসাবে বর পক্ষ ২৫৲ টাকা কন্যাপক্ষকে দিবে। বাহিরে এইরূপ নিয়ম থাকিলেও ভিতরে ভিতরে কন্যাপক্ষ বরপক্ষের নিকট ১০০ হইতে ২০০।২৫০ টাকা পর্য্যন্ত আদায় করিত। আমরাও অধিক টাকা দিয়া কন্যাপক্ষকে রাজি করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সুবিধা হইয়া উঠিল না।

আমেদপুরের পশ্চিমে কালী নদী, সে নদীতে বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে এক বিন্দুও জল থাকিত না। নদীর উপরেই রূপগঞ্জ গ্রাম। রূপগঞ্জে অনেক তাঁতির বাস। একদিন আমরা খাওয়ার পর দুপুরে আখ্ড়ায় বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিলাম, দলের দুইজন রূপগঞ্জ ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ অনেক তাঁতীবাড়ী বিয়ে, কেবল আমাদের নারাণের বিয়ে হ'ল না। কি জানি সে সময় আমাদের এক খেয়ালের উদয় হইল। আমরা সকলে মিলিয়া এক মজার পরামর্শ আঁটিয়া ফেলিলাম।

সন্ধ্যাবেলা আমরা সকলে নদীর তীরে আসিয়া জমা হইলাম। পূর্ব্বেকার

ব্যবস্থা মত ঢুলি ও পাল্কি উপস্থিত রহিয়াছে দেখিলাম। নারাণকে চেলী পরাইয়া, চন্দন লাগাইয়া পাল্কিতে তুলিয়া দেওয়া হইল। বরযাত্রী হইলাম জিমনাষ্টিক দলের আমরা ২৩ জন। পাল্কিতে উঠিয়া নারাণ আমার হাতে কতকগুলি নোট দিল, বলিল "রাখ যদি কাযে লাগে।" গণিয়া দেখিলাম চল্লিশখানি, মোট চারিশত টাকা। নকল বর, বরযাত্রী, বাদ্যকর সকলে রূপগঞ্জের দিকে রওনা হইলাম।

নদী পার হইয়া রূপগঞ্জে পৌঁছিয়াই ঢুলিরা বাজ্‌না আরম্ভ করিয়া দিল। চারিদিক হইতে সাড়া পড়িয়া গেল, যে বর আসিতেছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে একটি বিবাহ বাটী হইতে শঙ্খধ্বনী হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বর আসিয়াছে বর আসিয়াছে চীৎকার। আমরা পাল্কি নামাইতে বলিলাম। ঢুলি আরও জোরেই বাজাইতে লাগিল। কন্যা কর্ত্তারা শশব্যস্ত, কেহ বলিল দত্ত মহাশয় কোথা, কেহ বলিল জ্ঞান মহাশয়, দে মহাশয় কোথা, আমরা সকলকেই উত্তর দিলাম আসিতেছেন।

নানা গোলমালে বর নামাইতে দেরী হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বাদ্য ভাণ্ড সমেত আর এক বর সেই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয় দলে ভীষণ ঝগড়া বাধিয়া গেল। আমাদের জানাই ছিল যে, আজ বিশেষ একটা কিছু ঘটিবে, পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যেকে এক একখানি লাঠি সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলাম। শেষোক্তদল বলিল, তোমরা বর লইয়া যাও, আমাদের পাত্রেরই এই বাটীতে বিবাহের স্থির হইয়াছে। আমরা লাঠি উঠাইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম তাহা কখনই হইতে পারে না, আমরা এইখানেই বিবাহ দিব, তোমরা বর লইয়া সরিয়া পড়। কন্যাপক্ষরা আমাদের দলের রুদ্রমূর্ত্তী দেখিয়া কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেল। কিন্তু আসল বর পক্ষের লোকেরা ক্রমশঃই অধিক উত্তেজিত হইতে লাগিল। একবার নারাণের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে পাল্কির মধ্যে বসিয়া কেবল হাসিতেছে, আর যাহাতে ঝগড়াটা জাঁকিয়া উঠে তাহার জন্য আমাদিগকে ইসারা করিতেছে। আসল বরপক্ষ কিছুতেই সুবিধা হইতেছেনা দেখিয়া কন্যাপক্ষকে বলিল আমাদের ১০০৲ শত টাকা দিবার কথা ছিল, আমরা আরও ২৫৲ টাকা দিব, আমাদের পাত্রের সহিতই বিবাহ দিতে হইবে। আমাদের যদি ফিরিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে লোক সমাজে মুখ দেখান ভার হইবে। আমরা বলিলাম ১৫০৲ টাকা দিব, আমাদের পাত্রের সহিতই বিবাহ দিতে হইবে। এইরূপে কথা কাটাকাটি ও টাকার

পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। আসল বরপক্ষ ১০।১৫ টাকা করিয়া বাড়িতে বাড়িতে ২৫০ শতে আসিয়া থামিয়া গেল। আমরা বলিলাম, ৩০০ শত টাকা দিব, বিবাহ আরম্ভ হউক। ৩০০ শত টাকা শুনিয়া, একজন বলিল আপনার যখন এত টাকা খরচ করিবেন, তখন এখানে নিকটেই আমি ভাল কনে ঠিক করিয়া দিতেছি। আমরা তিন,চার জনে গিয়া কনে দেখিয়া আসিলাম; পছন্দ হইল। তখন বর উঠাইয়া বাদ্যসমেত নির্দ্দিষ্ট কনের বাটীর দিকে রওনা হইলাম। তখন আমাদের আনন্দ দেখে কে, যুদ্ধ জয় করিলেও বোধ হয় সেনাপতির এত আনন্দ হয় না। আমাদের সঙ্গে টোপর হাতে করিয়া নাপিত আসিয়াছিল, কিন্তু পুরোহিত আসেন নাই। কারণ নকল বরের সঙ্গে যাইবার জন্য পুরোহিত রাজি করা সহজ নয়। এক্ষণে পাল্কি পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি পুরোহিত মহাশয়কে আনাইয়া লওয়া হইলে, যথাসময়ে শুভ কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়াগেল। হইল না কেবল বরযাত্রীদের ভোজন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমরা সকলে গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন যথাসময়ে সকলে মিলিয়া ঢুলির সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া যখন বর কনে লইয়া গ্রামে ফিরিলাম, তখন সমস্ত গ্রামময় আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। কন্যকার নকল বর যে আজ সত্য সত্যই আসল বর হইয়া ক'নে সঙ্গে গ্রামে ফিরিল, ইহাতে আমাদের আনন্দই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। প্রতিবেশী মহিলারা বর কনে বরণ করিয়া মৃত বৃদ্ধার ঘরে তুলিয়া লইলেন। আমরা প্রাতেই ঘরটা যথাসম্ভব সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। এতদিনে যে নারাণ সংসারী হইল, ইহাতে সকলেরই আনন্দ। দুইদিন আমোদ গোলমালেই কাটিয়া গেল। ফুলশয্যার পরদিন নারাণকে আখড়ায় আনিবার জন্য ডাকিতে গেলাম, নারাণ বলিল, আর আমি জিম্ন্যাষ্টিক করিব না। আমরা বলিলাম সে কি তুমি না গেলে যে আখড়া উঠিয়া যাইবে। নারাণ বলিল কি করিব, উপায় নাই। আমাদের মধ্যে একজন বলিল, কেন তোমার বৌ বুঝি বারণ করেছে। নারাণ কোন উত্তর দিল না।

একমাসের মধ্যেই আখড়া উঠিয়া গেল। আমিও তিন মাস পরে পড়িবার জন্য সহরে চলিয়া আসিলাম।

চার বৎসর পরে একদিনের জন্য আমোদপুরে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম আখড়ার জমিতে কড়াইক্ষেত হইয়াছে। নারাণের বাটীর দিকে গেলাম

তাহার সহিত দেখা হইল না। উঠানে একটি শিশু খেলা করিতেছিল, ধরিতে গেলাম, ছুটিয়া মায়ের নিকট পলাইয়া গেল। ছেলেটীর অবিকল নারাণের মুখের মত মুখ।

একাল সেকাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৯

অতিবড় একটি উপদ্রবের মত পিসী আসিয়া এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্বাধীনা শোভার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে একথা সেকথা বলিয়া দুই দিনেই তিনি তাহার চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িলেন। নিজের খুটিনাটি বাচবিচারের জ্বালায় চাকর দাসী পর্য্যন্ত শশব্যস্ত। আপদ বালাই বিদায় হইলে হাড় জুড়াইয়া বাচে।

শোভা শোফার উপর উপুড় হইয়া বুকের নীচে বালিশ রাখিয়া একখানা ইংরাজি পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছিল, সতীশ চেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছিল, সম্মুখের টেবিলে টাইমপিসটি টক্‌টক করিয়া মিনিটের পর মিনিট গণনা করিতেছিল। পিসী জপের মালা হাতে দোরের আড়ালে দাঁড়াইয়া হাকিলেন—"হ্যারে সতীশ, শোভার বের কি এখনও সময় হয় নি ?"

শোভা মুখ তুলিয়া বক্র কটাক্ষ করিল, পিসীর দিকে তাকাইয়া উত্তর দিল—"ওরত সময় অসময় নেই পিসী, সুবিধে হয়ত হবে। এতে এমন কোন জোরজুলুমও নেই, যারি জন্যে কাচা গলায় নিয়ে দোরে দোরে ফিরতে হবে।"

সতীশ শান্ত স্বরে বলিল—"ঘরে এস না পিসীমা, বসে যা হ'ক পরামর্শ করব।"

শোভার উত্তরটা পিসীকে এতই বিধিয়াছিল যে, তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে মুহূর্ত্ত স্তব্ধের মত থাকিয়া সতীশের কথার জবাবের জন্য হা করিতেই

শোভা সমস্ত জিহ্বায় বিষ মাখাইয়া আবারও বলিয়া উঠিল—"না না, সে কি করে হবে। এ ঘরে ঢুক্‌লে যে ওর জাত যাবে। আমরা সব ত জাত খুইয়ে বসেছি।"

পিসী বজ্রাহত, কথার জটলাটা যেন তাঁহার মুখের গোড়ায় আসিয়া অগ্রপশ্চাৎ ভুলিয়া ফিরিয়া গেল, সতীশ বলিল—"থাম শোভা, কি যে বক্‌ছিস, তার ঠিক নেই. আচ্ছা পিসীমা, এ ঘরে ঢুক্‌তে তোমারইবা এত কিন্তু কেন? কৈ এর আগেত কেউ কোন কথা বলেনি।"

পিসীকে অবকাশ না দিয়াই শোভা উত্তর করিল—"এসব কুশিক্ষার ফল দাদাবাবু, জানত এরা মালাজপার নামে কত কি কর্ত্তে পারে। ওদের যত ধর্ম্ম ঐ মালা নাড়া আর নাক সিট্‌কানর মধ্যে, আমরা সব খুইয়েছি, বামন চাকর আর চেয়ার টেবিলে।"

সতীশ সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, স্নেহময়ী পিসীর প্রতি শোভার এত হঠাৎ এমনতর বিরাগের কারণ অনুমান করিতে না পারিয়া বলিল—"চল শোভা, ছাদে যাই, সেখানেই পিসীমার সঙ্গে কথা কইব।"

পিসী হাপ্‌ ছাড়িয়া বাচিল, শোয়াস্তির দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"শোভা এখানেই থাকুক, সতীশ তুই চল, যা কথা থাকে, আমাকেই বল্‌বি।"

"সে কি করে হয় পিসীমা।" বলিয়া ক্ষাণিক চিন্তার পর আবার বলিল—"বের কথাত শোভার সাম্‌নেই হওয়া উচিত। অন্ততঃ আমিত তাই মনে করি। ওর মত নিয়ে মনোমত ছেলের কাছেই ওকে দিতে হবে।"

শোভা বুক উচু করিয়া নির্ব্বন্ধের সহিত বলিল—"আমি এখানেই বেশ আছি দাদাবাবু, ও সকল বাজে কথা আমি পছন্দও করি না, শুন্‌বার ইচ্ছাও আমার নেই। যা বল্‌বার থাকে ওকেই বলগে। গোড়াগুড়িইত তোমায় বলে রেখেছি, আমি ও বেচাকিনির মধ্যে নেই, আর কারু কথায় থাক্‌তেও পার্‌ব না।"

অর্দ্ধোত্থিতা শোভার পরিপূর্ণ অবয়বের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় পিসী যেন বার দুই কাঁপিয়া উঠিলেন। মমতা ও ভবিষ্যচ্চিন্তা শোভার রূঢ় ব্যবহারের কথা ভুলাইয়া দিল, স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন—"শোভা তোকে ত আমি সন্তানের

মত পালন করেছি, আমার কথা রাখ্ মা, সতীশ যা কর্‌বে তাতে কথা কস্‌নি।"

শোভা মুখ নামাইল, তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিল—"পালন করেছ, বেশত, তারি জন্যে যদি তোমার কোন দাবী থাকে, সে না হয় আমি যে করে পারি শোধ কর্‌ব। তা বলে জীবন ভোর কষ্ট পেতে একটা কষায়ের হাতে ত আপনাকে সপে দিতে পার্‌ব না।"

লজ্জায় ক্ষোভে পিসী মাটির ভিতর মুখ লুকাইতে পারিলে বাচিয়া যাইতেন। সতীশ ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল—বলিল—"চল পিসীমা ছাদেই যাই।"

ছাদে উঠিতে গিয়াই পিসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যারে ঐ নির্ম্মল-বাবুটি কে?

"উনি একজন ডাক্তার, দেশ থেকে এখানে প্রাকৃটিস কর্ত্তে এসেছেন।"

"তোদের সঙ্গে সম্বন্ধ।"

"সম্বন্ধ আবার কি? লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ভদ্রলোক, ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় থাকাই যে ভাগ্যের কথা।" বলিয়া শোভা আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইল।

বৃদ্ধা পিসীর পাংশুমুখ অপরিসীম লজ্জায় ও আশঙ্কায় একেবারে কুঞ্চিত হইয়া আসিয়াছিল। তিনি স্বর খাট করিয়া বলিলেন—"শোভা আমার কথা রাখ মা, আর যাই করিস, এসব বাইরের লোকের সঙ্গে মিস্‌তে যাস্‌নি।"

শোভা ঝঙ্কার দিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল—"থাম পিসী, সমঝ্‌দারি তোমার আর কর্ত্তে হবে না।" বলিয়া ফোটা যুঁইফুলের থোপাকে থোপা ছিঁড়িয়া নাকের গোড়ায় ধরিল।

সতীশ যেন একটা পথ পাইয়াও চাপিয়া গিয়া বলিল—"শোভার বের জন্যে চেষ্টা, সেত আর আমি কম কর্চ্ছি না। আমাদের রূপপয়সা রয়েছে, তাইত কেউ অমনি স্বীকার কর্ত্তে চায় না, মৌচাকের গন্ধ পেলে আর কি রক্ষা আছে, একেবারে রস নিংড়ে নিবে তবেইত শোয়াস্তি। মুঠাভরে দিলে তবেই বে'টা হতে পারে।"

"তাতে তোর এমন কি এল গেল রে" বলিয়া পিসী নিমেষে শোভার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া একেবারে কাল হইয়া গেলেন। সতীশ বলিল—

"যা সঙ্গতি বাবা রেখে গেছেন, তাতেত একটি বোনের বেতে দশ বিশ হাজার খরচ কর্ত্তে আমার কোন কষ্ট নেই, আর আমি তাতে নারাজও নই।"

মাসী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে।"

"শোভা যে তাতে মোটেই রাজি নয় পিসীমা।"

শোভা এক দৃষ্টিতে সান্ধ্য আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। শ্রাবণের মেঘমুক্ত আকাশ শিশুর মত সরল হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে, পিসী সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন—"ওর কথা আবার কেন তুই কাণে তুলিস্, তুই বড় ভাই, যা কর্‌বি, মুখে যাই বলুক, তা ওকে স্বীকার করে নিতেই হবে।"

আকাশ হইতে দৃষ্টি না নামাইয়াই শোভা বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া উঠিল—"সেকাল আর নেই পিসী, সে গানত গেয়ে শেষ করে দিয়েছি। ধরেবেধে ছুড়ে ফেলে দিবে, সে বাধ যে আমরা কাটিয়ে ফেলেছি। আর দাদাবাবুকেও তুমি তেমনটি পাওনি যে, পরামর্শ দিয়ে যা নয় তাই করাবে। মানুষ সবাই, মেয়ে বলে যে, তারা নিজের সুখ দুঃখ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যও ভাব্‌তে পার্‌বে না, এমন ত হয় না।"

"আমিও পিসীমা, ঐ কথাই ভাল বুঝি, মেয়েদের মত নেওয়া আগে দরকার। আর আমাদের ত বাপমা কেউ নেই, শোভাকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করেছি, ভালমন্দ বোঝ্‌বার মত শক্তি ওর হয়েছে, যা কর্ত্তে চায়, তাই করুক।"

"ওঃ হরি" বলিয়া পিসী থামিলেন। তার পরে নিতান্ত নিরুপায়ের মত নৈরাশ্যপরিপূর্ণ অথচ উদ্বিগ্ন স্বরে বলিলেন—"তবে দেখ, কাউকে ধরে টরে যদি পারিস।"

"এ ত ধরাধরির কাজ নয় পিসীমা, এযে মনের কাজ, ধরে পরে জোর জুলুম করে হলে হয়ত হতেও পারে। তা আমি করব না। আর তেমন লোকও বড় দেখ্‌তে পাই না, যাদের একটা বিবেক আছে, মেয়ে যে দাসী করে নিতে হবে এ ধারণা নেই, এতে কিন্তু এই নির্ম্মল বেশ খাটি।"

শোভা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সতীশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সহসা উদ্ভূত এই দীর্ঘশ্বাসের কারণটা সতীশ বা পিসী কেহই অনুমানে জানিতে পারিল না। আশা পাইয়া আনন্দিত কণ্ঠে পিসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওর সঙ্গে কি হতে পারে না রে?"

"নির্ম্মলবাবু যে বে করেছেন" বলিয়া সতীশ থামিতেই শোভা বুকের উপর একটা কিসের বেদনা অনুভব করিয়া একপা সরিয়া দাঁড়াইল। পিসীর আনন্দদীপও যেন হঠাৎ নিবিয়া গেল। নীচ হইতে নির্ম্মল ডাকিল—"সতীশবাবু।"

শোভা তাড়াতাড়ি নীচে যাইতেছিল, পিসী তাহার হাত ধরিলেন, মালা জপার কথাটা তখন তাহার মনেই ছিল না, বলিলেন—"শোভা তুই যাস্‌নি মা।"

বিরক্তিতে ক্রোধে শোভার রাঙ্গা ঠোঁট ফুলিয়া দ্বিগুণ লাল হইয়া উঠিল। নির্ম্মলের সাড়া পাইয়া তাহার মনটা যেন দেহ ছাড়িয়া উধাও হইয়া নীচে নামিয়া পড়িতেছিল। শতীশ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদুস্বরে বলিল—"পিসীমা বারণ কর্চ্ছেন, তুই আজ নেইবা গেলি শোভা।"

সজোড়ে পিসীর হাত হইতে হাত টানিয়া লইয়া শোভা ধরাস করিয়া ছাদের উপর বসিয়া পড়িল। "নাই বা গেলুম, কিন্তু এসব কুরুচির প্রশ্রয় দিতে তোমার কি লজ্জাও হয় না। আর এও আমি তোমায় বলে রাখ্‌ছি, এত বাধাবাধিতে আমি বাচ্‌ব না।" বলিয়াই হন্‌ হন্‌ করিয়া দোতালার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া শোভা শুইয়া পড়িল। পিসী নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় জড়ের মত শোভার কথাগুলিই বারদুই মনে মনে আবৃত্তি করিয়া চাহিয়া দেখিল, সেখানে শোভাও নাই. সতীশও নাই। আছে কেবল সন্ধ্যা-বধূর নিবীর কোলে সান্ধ্য মলয়ের স্নিগ্ধ সুরভি মৃদু মন্দ শিহরণ, আর টবের ফুলগুলির মনোহর গন্ধ।

(১০)

সতীশ নীচে নামিয়া আসিতেই নির্ম্মলের মুখ লাল হইয়া উঠিল, আজ আর কৌতুহলটাকে ঢাকা রাখিতে না পারিয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"কদিন যে শোভাকে দেখ্‌ছি না সতীশবাবু।"

"বসুন" বলিয়া কথাটার উত্তর দিতে গিয়া সতীশ কেমন হইয়া গেল। নির্ম্মল নিমেষহীন দৃষ্টিতে এমনই ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়াছিল, যাহা দেখিয়া সে এই নূতন বন্ধুটির অবস্থাশঙ্কট মনে করিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, একটা ভবিষ্যৎ আশঙ্কাও তাহাকে কাতর করিয়া তুলিল। নির্ম্মল আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তারত কোন অসুখ করে নি।"

"না" বলিয়া শতীশ আবারও হাসিল। নির্ম্মলের যেন চমক ভাঙ্গিল, কতবড় মূঢ়ের মত লজ্জা ভয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া সে এই নিঃসম্পর্কীয়ার

বিষয়টাকে কি ভাবে পুনঃ পুনঃ ঘাটাইয়া তুলিতেছিল! এই অনধিকার চর্চ্চাটা কয়দিন যাবৎ নির্ম্মলের মনের উপর যে একটা ধিক্কার জাগ্রত করিয়া দিতেছিল, তাহা আজ যেন আরও স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া দাঁড়াইল। সতীশ গম্ভীর হইয়া উত্তর করিল—"পিসীমা এসেছেন, বুড়ো মানুষ, একেবারে সেকেলে লোক, তাঁরা এসব পছন্দ করেন না।"

"কি সব" প্রশ্ন করিয়াই যেন নির্ম্মল আবারও একটা মস্ত লজ্জা ও সঙ্কোচে জড়াইয়া পড়িল। অযথা কৌতূহলের বিরুদ্ধে তাহার মন আজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে না উঠিতেই যেন মনে হইতেছিল, সে তাহার বিবেকের উপর আঘাত করিয়া নিজের শিক্ষা দীক্ষা ও সৌজন্য নষ্ট করিতেছে। যদিও তাহার মনে কোন পাপ ছিল না, তবু যেন এই দুর্ব্বলতাটা তাহাকে শোয়াস্তি দিতে চাহিল না, বীণার তারের উপর যেন মৃদু মৃদু টিপ পড়িতে লাগিল। এই সতীশ তাহার দুদিনের বন্ধু, পূর্ব্বে চিনাও ছিল না, পরিচয়ও ছিল না, এবারে কলিকাতায় আসিয়াই প্রথম সাক্ষাৎ, অথচ অন্য সমস্ত বন্ধু বান্ধবের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করিয়াও তাহার যে ইহার সহিত দেখা করাটা নিত্যকার্য্যের মধ্যে পরিণত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের সহিত বিশেষ করিয়া শোভার সহিত আলাপ করিয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া তাহার মন শোয়াস্তি পায়, সে জন্যে কিছু সে মনকে দোষ দিতে পারে না, কিন্তু ধরিতে গেলে ত ইহারা তাহার কেহই নহে, হয়ত দুদিন পরে সতীশের এ সৌখ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে. শোভা সতীশের ভগিনী, অকারণ পুনঃ পুনঃ যাতায়াতেই ত তাহার সহিত নির্ম্মলের এত ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়া উঠিয়াছে। এই ত কদিন শোভার সহিত তাহার দেখাও হয় নাই আর হয়ত জীবনে দেখা হইবেও না, অবিবাহিতা যুবতী কন্যা যদিচ দোষগুণ ভুলিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়াছে, আলাপপরিচয়ে তাহাকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, লজ্জা সরম ভুলিয়া পিয়ানো বাজাইয়া গান করিয়া তাহার চিত্ত চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে, তবুত শিক্ষিত পুরুষ নির্ম্মলের সে বিষয়ে আসক্ত হওয়া ন্যায্য হয় নাই, বরং এই কৌতূহল দমন করিয়া তাহার এ সংশ্রব ত্যাগ করাই সঙ্গত ছিল। এ অযথা আগ্রহ, অকারণ তৃষা, অনির্দ্দেশ্য মৈত্রী, কিসের, কত দিনের! নির্ম্মল লজ্জিত হইল, ততোঽধিক অনুতপ্ত হইয়া আপন মনে আপনি জ্বলিয়া উঠিয়া বলিয়া ফেলিল—"বুড়গুলোই এ দেশটাকে উচ্ছন্নে দেবে।"

সতীশ চমৎকৃত হইল, নির্ম্মলের এই অনধিকারচর্চ্চায় মুখ টিপিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। নির্ম্মল আবারও বলিল—"এদের না আছে শিক্ষা, না আছে কোন জ্ঞান, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী, ওতে আবদ্ধ থাক্‌তে নিজেরাও যেমন ভালবাসে, পরকেও তেমনি রেহাই দিতে চায় না।"

সতীশ নম্রস্বরে উত্তর করিল—"দেখুন নির্ম্মলবাবু, দোষ আমি কাউকেও দিতে পারি না। কারণ কি যে ভাল সেত এতদিনেও ঠিক ঠাউরে উঠ্‌তে পারি নি।"

সহসা নির্ম্মল বসিয়া পড়িল, তাহার বিক্ষিপ্ত মনের উপর সতীশের কথাটা শূচিবেধের মত বিধিতে ছিল, দোষই হউক, গুণই হউক, একটা ভদ্র পরিবারের বিষয়ে এমন কঠোর সমালোচনার অধিকার তাহার কি আছে। সে অসংযত স্বরেই বলিল—"এসকল কুসংস্কার কি আপনি এখনও ছাড়্‌তে পারেনি।

"কৈ আর পেরেছি, সত্য কথা বল্‌তে কি ধরে রাখ্‌তেও ত কোন দিন আমায় চেষ্টা কর্ত্তে হয় নি,কেননা কি যে কু কি যে সু,সে হয়ত আপনারা শিক্ষিত লোক ঠিক করে নিয়েছেন, আমিত আজও পারিনি।"

"কিন্তু আপনার কার্য্য কলাপ দেখেত কোন সন্দেহ কর্ত্তে ইচ্ছা যায় না।"

"সে কথা হয়ত সত্যি, তা বলে গুরুজনকে নিন্দা করব কোন্ সাহসে, যার ভালমন্দ বুঝিনা, তেমন কাজ খেয়ালে কর্ত্তে পারি, কিন্তু যারা করবে না। তাদের পেছনে লাগ্‌ব, এমন সাহস আমার আজও হয় নি।"

"এতে আবার সাহসের কথা কি আছে দাদাবাবু। সত্যকে যে স্বীকার না করেই উপায় নেই, সে যে আপনার দাবী আপনি কেড়ে নেবে, কেউ রোখেত সেই পেছনে পড়ে থাক্‌বে, অঘোরে প্রাণ হারাবে তাতেও বড় আশ্চর্য্য নেই।" বলিয়া শোভা আসিয়া পাশের দোড় ধরিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মলের মুখ লাল হইয়া ঘামাইয়া উঠিল। সতীশ কোমল স্বরে বলিল—"শোভা তুমি এখানে কেন বোন।"

শোভা উত্তর করিল না, সতীশ নির্ম্মলের দিকে মুখ করিয়া বলিল—"এমনও অনেক কাজ আছে, যা মানুষকে বাধ্য হয়ে ঠেকেও কর্ত্তে হয়।"

"তার মানে।" বলিয়া নির্ম্মল সতীশের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

সতীশ বলিল—"এই ধরুন না, আপনি যেমন ইচ্ছা করে বাড়ী ছেড়ে আসেন নি।"

সহসা নির্ম্মল লাল হইয়া উঠিয়াই আবার যেন নুইয়া পড়িল,—ছোট কথায় বলিল—"আমার বাড়ী সম্বন্ধে আপনার এই প্রকার মত প্রকাশ খুব বাহাদুরি বটে।"

"রাগ কর্‌বেন না নির্ম্মলবাবু, অনধিকারচর্চ্চা বলে আপনি হয়ত রাগ কর্চ্ছেন, আমি কিন্তু তা করি নি, কেননা, সে স্বভাবই আমার নয়। আর যার তার একটা কথায় রাগ করা বা খুসি হওয়া, সে যে পুষিয়েই ওঠে না।" বলিয়া সতীশ থামিল। এমন একটা আঘাতের পর নির্ম্মলের নিস্ফল আক্রোশ অপমানের বোঝা বহিয়া লইয়া ঘাড় নীচু করিয়াই রহিল, কথাটি বলিতে দিল না। সতীশ ঢিলা স্বরে বলিল—"কিছু মনে কর্‌বেন না, হয়ত কি বল্‌তে কি বলে ফেলেছি। গোড়ায় যা বল্‌ছিলাম, তাই এবার শুনুন, একত বাপের টাকা থাক্‌লে সদ্ভাবে নাহ'ক অসদ্ভাবে তা ব্যয় না কল্লে শোয়াস্তিই পাওয়া যায় না,তার ও'পর ছোটকাল থেকে যাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, তারা সব হাল ফ্যাসানের, যেমন আপনি।" বলিয়া সতীশ কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। শোভা এবার আর সহ্য করিতে পারিল না, জোর দিয়া বলিল—"দাদাবাবু, ডেকে এনে অপমান কর্ত্তে যাচ্ছ, এটাই কোন সৎসাহস, উনি কিছু সেধে তোমার বাড়ী আসেন নি। রোজ আস্‌তে বল, তাইত এসে থাকেন।"

সতীশ নির্ম্মলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"শোভার কথার জবাব না হয় অবসর মত দেব, তার আগে আপনার কথাটার উত্তরই আমার শেষ করা উচিত। এই বোনটিকে লেখাপড়া জানা ছেলের হাতে দেব, এ সঙ্কল্প আমার গোড়াগুড়িই ছিল, এ ছাড়াত আমার আর কেউ নেই। যে কাল পড়েছে, ইচ্ছা না থাক্‌লেও এম, এ, বি, এর হাতে মেয়ে দিতে হ'লে মেয়েটিকে যে মেম সাজাতেই হবে। কার্পেটবোনা, পিয়ান বাজানো, বই পড়া, সভাসমিতিতে যোগ দেওয়া এসব না হ'লে আপনারা যে তাকে পছন্দই করেন না।"

নির্ম্মল গুরু আঘাতে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, সতীশ তাহার মনের কথাটা কেবল যে নিঃসন্দেহে টের পাইয়াছে, তাহাত নহে, এম্‌, এ, বি এর প্রসঙ্গে মুখের উপর বলিয়া তবে ছাড়িল, তবু যেন সে হাল ছাড়িতে পারিল না, নিজের কথায় জোর দিয়া বলিল—"ওতে যদি দোষই মনে করেন ত, এমন লৌকিকতা ছেড়ে আপনারও নিজের ও'পরই নির্ভর করা উচিত। কারণ মানুষ বলে পরিচয় দিতে হলে আপন মতকেই সর্ব্বাগ্রে দাঁড় করিয়ে

নিতে হয়।" বলিয়াই নির্ম্মল আপন মনে আপনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কতটুকু বলিতে গিয়া কেমন করিয়া যে তাহার মুখ দিয়া এতবড় কথাটা বাহির হইয়া পড়িল, তাহা ভাবিতে না পারিয়া লজ্জার আর সীমা রহিল না।

শোভাও সায় দিয়া বলিল—"সে ত সত্যি কথা, নিজের মতেরই যার ঠিক নেই, তার ত অস্তিত্বের ও'পরও আস্থা স্থাপনের যো থাকে না।"

সতীশের বিস্ময় ক্রমেই সীমা অতিক্রম করিতেছিল, মানুষ উত্তেজনার মুখে যে এত বড় বর্ব্বর হইতে পারে, তাহা আজই সে প্রথম অনুভব করিয়া লইয়া এই নির্ম্মলের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতার জন্য লজ্জিত হইয়া পড়িল। শোভাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"শোভা যাত বোন্, গোটা কত পান নিয়ে আয়, নির্ম্মলবাবুকেত আজ চাও দেওয়া হয়নি, দেখুন নির্ম্মলবাবু মানুষ যদি সব কাজেই আপনার মত ভাব্তে শিখ্ত,তবে তার সাতন্ত্র্যটা এমনই মাথা ছেড়ে উঁচু হয়ে দাঁড়াত যে, তাকে আর মানুষ বলে স্বীকার কর্ত্তে পারা যেত না।"

নির্ম্মলের মন এই যথার্থ কথাটায় একেবারেই বসিয়া পড়িল, এতক্ষণ সে এমন করিয়া একবারও বুঝিতে চেষ্টা করে নাই যে, উত্তেজনার বশে এই মুখের কথার বন্ধুটির সহিত কি জঘন্য ভাবেই তর্ক করিতেছিল। মনে মনে মরিয়া গিয়াও সে নিজের মতপোষণের জন্য বলিল—"যতই বলুন আপনি, ভেবে দেখ্লে আপনাকে স্বীকার কর্ত্তেই হবে, স্ত্রীশিক্ষা বা স্ত্রী স্বাধীনতা এ কালের জন্য না হলে চল্তে পারে না।"

"দুখের বিষয়,আপনার সহিত একমত হতে পার্লুম না, শিক্ষাটা সবারই দরকার হলেও স্বাধীনতাটায় আমার কেমন খট্‌কা আছে, আর চলাচল, সেত কোনদিন বন্ধ হয়নি।" বলিয়া সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

শোভা এতক্ষণ এক পাও নড়ে নাই, সতীশের ভাব দেখিয়া কেমন একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, এবার তাহার মুখে হাসি দেখিয়া সাহস টানিয়া আনিয়া বলিল—"দাদাবাবুর এ সব কথা আপনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নেবেন না, কাল যে তার দাবী আপন থেকে কেড়ে নেবে, সেত কেউ ঠেলিয়ে রাখ্তে পার্‌বে না, যারা এখনও সেকালের নাম করে বৃথা ভাব্তে বস্‌বে, তারা যে ফলের আশা ছেড়ে শুধু বোঁটাই আঁকড়ে থাক্‌বে।"

সতীশ ক্রমে ধৈর্য্যহারা হইয়া উঠিতেছিল, এবার সে অসহিষ্ণুভাবে বলিল—"আমি এখন অন্য কাজে যাচ্ছি বেশী কথা বলি সে অবকাশও

আমার নাই, বৃথা তর্ক কর্‌বার ইচ্ছাও আমি রাখি না। তবে এটাই আপনাকে বলে রাখ্‌ছি, যে হঠাৎ কাউকেই ছাড়া বা বেড়া সহজ হবে না, কালের দোহাই যারা দেয়, আমার ত মনে হয়, তারা কোন কাজই কর্ত্তে পারে না, পুরুষ যারা, তারা বিবেককে সম্মুখে দাঁড় করেই কাজ করে।" বলিয়াই সে উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল। নির্ম্মল মনে মনে স্বপ্রদত্ত আঘাতটা সতীশ দ্বিগুণেরও অধিক করিয়া কি ভাবে ফিরাইয়া দিয়া গেল, তাহা ভাবিয়া আর একবার শোভার মুখের দিকেও তাকাইতে না পারিয়া একেবারে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

সাথী।

[লেখক—শ্রীপরেশনাথ সরকার]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

শ্যামাসুন্দরীর কলিকাতা আসিবার এক মাস পরে একদিন সত্যচরণ বাড়ীর পত্রে জানিলেন যে মেজ বউদির অসুখ হইয়া পড়িয়াছে সত্যচরণের ইচ্ছা ছিল দেশেই ডাক্তার পাঠাইয়া চিকিৎসা করান! শ্যামাসুন্দরী জেদ করিয়া তাহাকে কলিকাতায় আনাইলেন।

কিন্তু মেজবউ চন্দ্রা আসিয়াই দেখিলেন, স্রোতের ফুল ভাসিয়া আসিয়া কেমন ভাবে চড়ায় ঠেকিয়া পড়িয়াছে। তিনি ভাবিলেন ফুল আবার স্রোতে ভাসাইয়া দিবেন। অনন্ত কাল সাগরের বুকে ভাসিতে ভাসিতে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক; কিন্তু প্রথমটা তিনি কোনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না—যে কি প্রকারে তাহার সূচনা করা যায়!

একদিন কিরণ আসিয়া বলিল—মাসীমা আমার এক বন্ধু এসেছে, ফটো তুলতে পারে!

বিধুমুখী বলিলেন—এখন ফটো তুলিবার কি দরকার!

চন্দ্রা বলিলেন—আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি বউ, ও তুলতে আমাদের সখ আছে!

অগত্যা বিধুমুখীকে স্বীকার পাইতে হইল! বিধুমুখী লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিরণের সঙ্গে মিশামিশিটা আভার একেবারেই পছন্দ নয়। সেদিন আভা স্পষ্ট নগেনকে বারণ করিয়াছিল। এই ব্যাপারে তাহার অভিমানিনী আভা একটা কিছু কাণ্ড করিয়া না বসে। বিধুমুখী এক একবার ভাবিতে লাগিলন কাজটা ভাল হইতেছে না।

নগেন বলিয়া গিয়াছে, বৈকালে ফটো তোলা হবে।

বিধুমুখী একবার চন্দ্রাকে বলিলেন—দিদি, ফটো তুলবে ত অন্য একটি ফটোগ্রাফার আনাই!

চন্দ্রা বলিলেন—কেন? কিরণের বন্ধু, ও সখ করে তুলবে বলেছে!

বিধুমুখী আর কোনও কথা বলিলেন না! কিন্তু তাঁহার মনে একটা বিষম খটকা লাগিয়া রহিল, আভা কলেজ থেকে আসিয়া কি বলে! আভা বই হাতে ঘরে ঢুকিতেছিল এমন সময় চন্দ্রা বলিলেন—আজ আমরা ফটো তুলবো আভা।

আভা বলিল—বেশ ত জ্যেঠাইমা, আমি বাবাকে বলি। তিনি ফটোগ্রাফার নিয়ে আসবেন।

চন্দ্রা বলিলেন—সে ঠিক আছে, ও বাড়ীর কিরণের বন্ধু এসেছে, সে ভাল ফটো তুলতে পারে।

আভা বলিল—সে আবার কি ফটো তুলবে? না না তার চেয়ে বাবাকে বলি সবার চেয়ে ভাল ফটোগ্রাফার নিয়ে আসবেন এখন!

চন্দ্রা বলিলেন—না মা, কিরণ এসেছিল, সখ করেছে,—সেই বেশ!

আভা বলিল—আচ্ছা তুলবে তোল!

চন্দ্রা তাহার কথার ভঙ্গি দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—তুই তুলবি না?

আভা বলিল—আমিও তুলব। বলিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল।

চেয়ার টেবিলের কাছে টানিয়া লইয়া নগেন একখানি বোধোদয় পড়িতে বসিয়াছিল। তাহার এক বর্ণও তাহার মাথায় যাইতেছিল না, ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল এমন সময় আভা ঘরে প্রবেশ করিল। নগেন একটু ভাল হইয়া বসিল, যেন কত মনোযোগ!

আভা হাসিয়া বলিল—ইঃ কত মনোযোগ!

নগেন উদাস ভাবে আভার মুখের দিকে চাহিল, আভা তাহার প্রতি

শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া তাহার প্রাণটা যেন একটু স্থির হইয়া গিয়াছিল!

আভা ধীরে ধীরে সম্মুখ হইতে বইখানি সরাইয়া লইল; তারপরে বলিল দাঁড়াও!

নগেন উঠিয়া দাঁড়াইল।

আভা আলনার উপর হইতে বাছিয়া একখানি কাপড় লইয়া দেখিল, সে খানা মনোমত হইল না,—রাখিয়া দিল। পোর্টম্যান খুলিয়া অন্য একখানা বাহির করিল, সে খানার পাড় পছন্দ হইল না। তারপর এক একখানা করিয়া প্রায় পঁচিশখানি কাপড় বাছিয়া ফেলিল; কোন খানাই তাহার মনোমত হইল না। আভা ঝিকে ডাকিয়া একখানি ১০৲ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল—খুব পছন্দ সই একখানা কাপড় নিয়ে আসবে, যা লাগে।

মেঝের উপর একরাশ কাপড় স্তুপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া ঝি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—এত কাপড় দিয়া কি হবে দিদিমণি!

আভা বলিল—আমার মাথা হবে!

ঝি আর দাড়াইল না। সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বিধুমুখী ঘরে আসিয়া বুঝিলেন আজ একটা ভীষণ কাণ্ড যে হবে এই তার পূর্ব্বাভাস। তিনি ঘরে আসিতেই আভা বলিল—মা আমার এমন একখানা কাপড় নেই যে একটু পছন্দ হয়।

বিধুমুখী বলিলেন—কেন এ সবগুলি কাপড়ই ত তুই পছন্দ করে কিনেছিস্।

আভা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—কি যে ছাই পছন্দ করেছিলেম, বুঝি না।

বিধুমুখী বলিলেন—কলেজ থেকে এসেই কাপড় নিয়ে বসলি। মুখ হাত ধুবি নে?

আভা বলিল—ঝি কাপড় নিয়ে আসুক, তার আগে আমি কিছুই করব না।

সত্যচরণ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—একি—আভা বুঝি আজ ফটো তুলবি, এ সব তার বন্দোবস্ত।

বিধুমুখী বলিলেন—মেয়ের যে কাপড়ই পছন্দ হয় না।

সত্যচরণ সেই ধপধবে সুন্দর কাপড় গুলির দিকে চাহিয়া বলিলেন—এও তোর পছন্দ হল না মা।

কিছুক্ষণ পরে ঝি একখানি ধোলাই শাড়ী লইয়া আসিল। আভা ঝির হাত হইতে কাপড় লইয়া, মেঝের উপর টান মারিয়া ফেলিয়া দিল।

সত্যচরণ বলিলেন—আজ সমস্ত সহরের কাপড়ও ওর পছন্দ হবে না।

বিধুমুখী বলিলেন—তুমি নিজে ওকে নিয়ে গিয়ে একখানা পছন্দ করে নিয়ে এস। এ কাপড় যার পছন্দ হয় না।

শোভা বলিল—আমি কি শাড়ী আনতে বলেছিলেম!

অনেক কালের পুরাণ ঝি, আভাকে সে বেশ চিনিত, চুপ করিয়া একদিকে দাঁড়াইয়াছিল! সে বলিল—তুমি ত ধুতি আনতেও বলোনি দিদিমণি!

আভা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বুদ্ধি করে নিয়ে এলেও ত হত! কাপড় কি এখন আমি পরব?

ঝি কাপড় লইয়া উপরে আসিতে সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রাও উপরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিলেন, এখন ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—তা বাছা ঝির দোষ কি, বলেদিলেই হত শাড়ী নয়—ধুতি! তুমি যে বাছা মেয়ে হয়ে শাড়ী ছাড়া ধুতি পছন্দ করবে, সে ত আর ও বোঝেনি! আভা একবার নত মুখখানি উত্তোলন করিয়া চন্দ্রার দিকে চাহিল! তারপর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিধুমুখী ও সত্যচরণ ভাবিয়াছিলেন, চির অভিমানিনী কন্যা তাঁহাদের, এত বড় একটা মুখে মুখে কথার জবাবে নিশ্চয় একটা তোলপাড় করিয়া তুলিবে। কিন্তু যখন দেখিলেন, আভা চুপ করিয়া রহিল, তখন আর তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না! চন্দ্রা ঘরে প্রবেশ করিতেই বিধুমুখী মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া ঝির কাছে গিয়া দাড়াইয়াছিলেন। ঝি অস্ফুটস্বরে বলিল—একি! দিদিমণি এমন কথাটা আজ সহজে হজম করে ফেললে? আমার ত বিশ্বাস হয়েছিল আজ একটা কাণ্ড বাধাবে নিশ্চয়।

বিধুমুখী বলিলেন—তাইত!

এমন সময়ে শ্যামাসুন্দরী আসিয়া বলিলেন—এ কি?

সত্যচরণ বলিলেন—দেখ বউদি তোমার মেয়ের কাণ্ডখানা!

আভা ছুটিয়া আসিয়া শ্যামাসুন্দরীর বুকের উপরে কাঁদিয়া পড়িল, কোন কথা বলিতে পারিল না।

বিধুমুখী একটু নিশ্চিন্ত হইলেন; আভার মনের নিরুদ্ধ প্রবাহ চখের জলের সঙ্গে বাহির হইয়া যাইবার সুযোগ পাইয়াছে!

শ্যামাসুন্দরী ব্যাপারখানা ভাল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে মা?

চন্দ্রা বলিলেন—কি আর হবে, তোমার ছেলের সাজ্‌বার মত কাপড় ভুভারতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কথাটার সঙ্গে যেন বিষ মাখান ছিল। সত্যচরণ মাথা নিচু করিলেন, বিধুমুখী বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দাড়াইলেন। ঝির কানেও যেন কথাটা কেমন বেমানানই লাগিল। শ্যামাসুন্দরীর বুকের মধ্যে কে যেন একখানি ধারাল ছুরি বসাইয়া দিল। আভা শুধু চন্দ্রার মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল—জ্যেঠাই মা।

চন্দ্রা তাহার জলভরা নয়নযুগলের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—কি মেরে ফেলবি নাকি? তা তোরা পারিস। অত তেজ ভাল নয় বাছা। আমি ত আর বাড়ীর দাসী বাঁদী নই যে তাড়িয়ে দেবে, এখানে আমার অধিকার তোর চেয়ে একটুও কম নয়;

সত্যচরণ বলিলেন—মেজ বউদি, দুধের মেয়ে—ওকে মাফ কর।

চন্দ্রা—আহ্লাদ দিয়ে মেয়েটাকে নষ্ট করে ফেল্‌চ। এত বড় মেয়ে, দিনরাত খেয়াল নিয়ে আছেন!

বিধুমুখী দেখিলেন কথাটা ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে. আভা যদি এর পর আরম্ভ করে, তবে আজকার বিবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কে বল্‌তে পারে। তিনি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া বলিলেন—দিদি ও দোষ করেছে, ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি, আজকের মত ওকে ক্ষমা কর।

চন্দ্রা রাগের সহিত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন—সবই বাড়াবাড়ী, মেয়ে যেন কারু হয় না? দেখেছি অমন কত পাশ করা মেয়ে, বাপের বাড়ীর দেশে।

সত্যচরণ কোন কথা না বলিয়া সে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন, এমন অপমান আভা আজ কি করিয়া বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিল।

শ্যামাসুন্দরীর বুকের মাঝখানে আভা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। শ্যামসুন্দরী বুঝিলেন মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গিনীর মত আজ আভা নিজের বিষে নিজে জলিয়া মরিতেছে; এবং কেন যে এভাবে আজ তাহাকে অপমানিত

হইতে হইল, তাহাও তিনি না বুঝিয়াছেন এমন নহে। আজকার ঘটনায় তাঁহার প্রণটা বড়ই আকুল করিয়া তুলিল! নগেনকে চন্দ্রা কতদিন কত কটু কথা বলিয়াছে, তাহাতেও তাঁহার এত বেশী লাগে নাই ত। তিনি সমস্ত গায়ের শক্তিতে আভাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলেন—আভা!

আভা সজল নীল নয়ন যুগল শ্যামাসুন্দরীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া কহিল—জ্যেঠাই মা! সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর নিশ্বাস তাহার বুকের মধ্য হইতে বাহির গেল। নগেন সেই যে টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়াছিল, সেই খানে সেই ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিল। তাহার গম্ভীর মুখখানি তেমনি গম্ভীর। কিযে হইল তাহা যেন সে আদৌ বুঝিতে পারে নাই। সহসা আভা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—হা করে দাঁড়িয়ে আছ কি, কাপড় একটা পরে ফেল!

শ্যামাসুন্দরী বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন—তুইত কাপড় পছন্দই করে দিতে পাল্লি না।

নগেন সেই স্তূপীকৃত কাপড় রাশির মধ্য হইতে একখানি তুলিয়া লইল।

শ্যামসুন্দরী চাহিয়া দেখিলেন, তার চেয়ে খারাপ কাপড় আর একখানাও তথায় ছিল না।

আভা হা করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল!

শ্যামাসুন্দরী বুঝিলেন, বলিলেন—অন্য একখানা পরনা!

আভা বাধাদিয়া বলিল—না ঐ খানাই পরতে হবে। পর! সে দিন ঠিক সন্ধ্যার পুর্ব্বে ফটো তোলা হইল! আভা কোনও কথা না বলিয়া গিয়া জ্যেঠাইমার পাশে বসিয়াছিল। নগেন সেই কাপড়খানি পরিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিল, বিধুমুখী ও শ্যামাসুন্দরীও দাঁড়াইয়াছিলেন! কিরণের বন্ধু বিনোদ ফটোগ্রাফ উঠাইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সবাইর ফটো লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আভা নগেনের হাত ধরিয়া একটা টান মারিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া বলিল—একটা জামাও গায়ে দিতে পারনি। তা বেশ হয়েছে! চল এখন ফুলের টবে জল দিতে হবে!

বিধুমুখী বুঝিলেন কন্যা আর ফটো তুলিতে চায় না। তিনি বলিলেন—না বাছা, আর কি দরকার! আচ্ছা তবে, তোমার এই মাসীমার একখানা তুলতে পার!

চন্দ্রা বলিয়া উঠিলেন—নে আর অত গর্ব্ব করিসনে, পাড়াগায়ে থাকি বলে কি, তোদের চেয়ে কম শিখেছি, না দেখেছি! মেয়ে ত কথা শুনেই চলে গেল, যেন তার গ্রাহ্যই নাই কাউকে। তুমিও দেখছি বলে বসলে, "কি দরকার! তবে দরকার কি কেবল আমার! না বাছা আমার আর দরকার নাই!"

বিধুমুখী দেখিলেন চন্দ্রার কেবল বিবাদ বাধাইবার ইচ্ছা, তিনি চুপ করিয়া সহ্য করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা দিদি আমিও তুলব।"

বিনোদ ফটো ক্যামেরাটা নাড়িয়া চাড়িয়া কহিল—"না আজ আর ভাল উঠবে না।"

বিধুমুখী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

[৭]

একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে কিরণ ও বিনোদ গঙ্গার ধারে আসিয়া বসিল, দূর হইতে তাহাদের এক বন্ধু ভূপেন তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনোদ বলিল—ভূপেন যে। এস, বস!

ভূপেন বসিয়া পড়িল।

কিরণ বলিল—কোথা থেকে?

ভূপেন হাসিয়া বলিল—সটান বাসা থেকে! আমাদের ত আর বাবা সখের প্রাণ নয়, যে কাব্যের খাতা নিয়ে এ বাড়ী সে বাড়ী করে বেড়াব।

কিরণ হাসিল, বিনোদ বলিল-সত্যি ভাই কিরণ, আচ্ছা তোর পছন্দ বটে! এমনটি হলে আমিত লুফে নিতুম।

কিরণ বলিল—সে অর্থাৎ মানস প্রতিমা।

ভূপেন বলিল—তোর সবটার ভিতর একটা কিছু রকমারি থাকা চাই!

কিরণ হাসিতে হাসিতে বলিল—"সাধনা চাই হে, সাধনা চাই, মনের ছবি ঠিক খুজে নিতে হলে—"

ভূপেন বাধা দিয়া বলিল—বাড়ী বাড়ী কবিতার বই হাতে করে খুঁজে বেড়াতে হয়—না?

কিরণ হাসিয়া বলিল—তাও অনেক সময় হয় বটে!

বিনোদ একখানি ফটো সার্টের পকেট হইতে টানিয়া বাহির করিয়া বলিল। দেখ দেখি পছন্দ হয় কিনা?

সেদিনের সেই ফটোখানির এক কপি বিনোদ ভূপেনকে দেখাইল! ভূপেন ফটোর উপরে দৃষ্টি করিয়া বলিল—এ যে আমাদের তরুর সই!

কিরণের মুখখানি রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল! সে তাহা চাপিয়া বলিল, সে যাক্, তুমি তা হলে এ বন্ধে বাড়ী যাচ্ছ?

ভূপেন সে কথায় লক্ষ্য না করিয়া কহিল—এ ফটো তুমি পেলে কোথায় হে ? বিনোদ বলিল—আমারি তোলা !

ভূপেন হাসিতে হাসিতে বলিল—যা হোক ভায়া, তুমি আবার ফটোগ্রাফার হলে কবে ?

বিনোদ বলিল—হ'তে হয়, সময় বিশেষে !

কিরণ, বিনোদ ও ভূপেনের নিকট অনেকদিন হইতে গল্প করিত সে একটী বালিকে ভালবাসে। তাহার সবগুলি কবিতা সেই চির স্বভাব সুন্দরীর রূপের অলঙ্কার পরিয়া মুঞ্জরিয়া উঠে ; তাহার ভাষার ছন্দও সেই আরাধ্য দেবীর কণ্ঠ-মাধুরীর ছন্দ অনুপাতে ও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছিল। সে একদিনের গল্প নয়, প্রত্যহ গল্পের আয়াতন বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি কিরণ বুকে ভাদ্রমাসের গঙ্গার মত প্রবল আবেগ লইয়া তাহার বন্ধুদ্বয়ের নিকট তাহার মানস প্রতিমার কাহিনী বলিয়া আসিতেছে ! বিনোদ একদিন ধরিয়া বসিল, তাকে দেখাইতে হইবে !

সেইদিন দুজনে সেই ফটো তুলিবার বন্দোবস্ত করিয়া বসিল ! বিনোদ ভাবিয়াছিল, আভার একখানি ভিন্ন ফটো তুলিয়া আনিবে, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না !

দুইজনে পরামর্শ করিয়া ছিল, ভূপেনকে এই ফটোখানি দেখাইয়া বাহবা লইবে।

কিন্তু ভূপেন যে এমন ভাবে কত চেনা লোকের মত বলিয়া বসিবে—এত আমাদের তরুর সই, এ কথা কেউ ভাবিতেও পারে নাই।

বিনোদ বলিল—তবে একে তুমি দেখেছ, তাই বল।

ভূপেন সে কথার কোনও উত্তর দিল না। সে ফটো দেখিতেছিল, তাহাই দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ভূপেন হাসিমুখে কিরণকে বলিল—এই পাশের ছোকরাটি কে হে ?

ভূপেন হাসিতে হাসিতে বলিল—এই ছোকরা বোধ হয় তাহার ভালবাসার পাত্র।

কিরণ চুপ করিয়া রহিল। সম্মুখে গঙ্গা কলকলনাদে বহিয়া যাইতেছিল, তাহার বুকের উপরে চঞ্চল তরঙ্গগুলি মথিত করিয়া জোরে ষ্টীমার খানা ছুটিতেছিল। ভূপেনের কথাগুলিও তাহার চঞ্চল চিন্তা-তরঙ্গ রাশি মথিত করিয়া দিল।

সে যা হক ভায়া, কিরণ পাকা ছেলে ! মাসখানেকের মধ্যে সব গুছিয়ে নেবে !

ভূপেন বলিল—সেকি ! কিরণ আবার বিয়ে করবে নাকি ?

বিনোদ বলিল—দোষ কি ? যাকে ভাল বাসে, তাকে বিয়ে করবে—সেইত আমি জানি।

ভূপেন বলিল—আমি কিন্তু জানি এমন ধরণের প্রেমে পড়ার ভালবাসা নাম মাত্র। তবে মোহটা ষোল আনা!

বিনোদ—তবে কি তুমি বলতে চাও, সুন্দর ফুল দেখলে তা কেউ ভাল বাসবে না।

ভূপেন—হাঁ বাসবে বইকি! কিন্তু দূরে থেকে, কাছে গিয়ে ছিড়ে ফেলে দিয়ে শেষে দেখবে ৯২টা অসুন্দর হয়ে গেছে!

কিরণ বলিল—সে হয় যাদের হৃদয় নেই। যাদের কাছে প্রেমের নামে নেশা চলে—তাদের।

ভূপেন হাসিয়া বলিল—প্রায় পোনে ষোল আনার এই দশা। কিরণ কি বলিতে যাইতেছিল, ভূপেন তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—একটা কথা রাখবে কিরণ!

কি—বল না।

আমার সঙ্গে এক যায়গায় যাবে।

কিরণ বলিল—বেশ মজা দেখছি।

ভূপেন বলিল—তবে আর তোমার আপত্তি কি বল।

বিনোদবলিল—বেশত তুমি ভূপেন, একসঙ্গে এলেম দুজনে, তুমি কোথা থেকে উড়ে এসে সঙ্গীকে ছো মেরে নিয়ে চলে যাচ্ছ।

ভূপেন বলিল—এমনি ধারা পৃথিবী, এর আর নূতনত্ব কি!

কিরণ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা চল দেখা যাক আজকার যাত্রায় কি ফল দাঁড়ায়।

ভূপেন ও কিরণ দুইজনে চলিয়া গেল। বিনোদ সেইখানে বসিয়া রহিল!

এ গলি সে গলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভূপেন আসিয়া একখানি বাড়ির দ্বারে কড়া নাড়িল। ঝি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ভূপেন ও কিরণ উপরে উঠিয়া গেল। একটি প্রকোষ্ঠের ভিতর কিরণকে বসাইয়া রাখিয়া ভূপেন অন্য একটি প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে ভূপেন আসিয়া বলিল—আমি চলিলাম; আমার কাজ হইয়া গিয়াছে;—তোমার কর্ত্তব্য তুমি কিরূপ করিলে কাল এসে শুনব। এই ঘরে বসে থাক। কিরণ কথা বলিতে না বলিতে ভূপেন সে গৃহ ত্যাগ করিল; এবং সেই সময় একটি সুন্দরী যুবতী, বামক্রোড়ে শিশুপুত্র ও দক্ষিণ হস্তে একথালা মিষ্টান্ন লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। কিরণের সর্ব্বাঙ্গে তড়িত প্রবাহ বহিয়া গেল, কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ বিন্দু দেখা দিল। ধরা ধরা কণ্ঠে বলিল—একি—তরু!

(ক্রমশঃ)

মনের মুখোস

[লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গৌরচাঁদের ডাকাডাকি ঠেলাঠেলির চোটে বিনয়চন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। তখন আষাঢ় মাসের সুদীর্ঘ বেলটা একেবারেই শেষ হইয়া আসিয়াছিল। প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে ম্লান হইয়া কেবল গাছের মাথায় চিকৃ[illegible]তছিল। বিনয় মধ্যাহ্নে আহারের পর কোনক্রমে বৌদিদির নিকট অব্যা[illegible] পাইয়া [illegible] সটান চোদ্দপোয়া হইয়াছিল, আর একেবারে বেলা অবসান করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া একটা বিকট রকম হাই তুলিল। গৌরচাঁদ দাঁড়াইয়াছিল, সে তাহার কাকাবাবুকে বিছানার উপর উঠিয়া বসিতে দেখিয়া হাতখানা ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, কাকাবাবু, কাকাবাবু শিগ্‌গির বাহিরে দেখবে চল, কল্‌কাতা থেকে দুজন লোক এসেছে, তোমাকে খুঁজছে—"

বিনয় বিস্ময়মাখা চোখ দুইটাকে বেশ রীতিমত বড় করিয়া বলিয়া উঠিল। কল্‌কাতা থেকে লোক ?"

গৌরচাঁদ মুখখানা ভারিক্কের মত করিয়া বলিল, "হুঁ কাকাবাবু তারা ভদ্রলোক। কেমন ভালো কাপড় জামা, জুতো পোরে এসেছ, দেখবে চল ?"

"ভালো কাপড় জামা জুতো যখন পরে এসেছে, তখন তো তারা নিশ্চয়ই ভদ্রলোক। বিনয় বাহিরে গমনের জন্য বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সরোজিনী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার গতিরোধ করিলেন। তিনি তাঁহার চির মধুর হাসিতে সমস্ত ঘরখানা বিভাসিত করিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, "না ঠাকুর পো, এইবার তুমি একটা পাকা কথা দিয়ে যাও। আমাকে এখনি তাদের খবর দিতে হবে। সন্ধ্যের পর কলিকাতা থেকে কারা আবার মেয়েটিকে দেখ্‌তে আসবে, তাদের সঙ্গে একটা যদি কিছু পাকাপাকি হয়ে যায়, তখন আবার মুস্কিলে পড়তে হবে। কেন ঠাকুরপো ভোগাচ্ছ,—দিব্বি মেয়ে তো,—না ভাই আমাকে একটা পাকা কথা দিয়ে যাও।"

বিনয় তাহার বৌদিদির কথার মাঝখানে একটু ফাঁক খুজিতেছিল, একটু ফাঁক পাইবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, বৌদিদি এখানে বড় সুবিধে হবে বলে বোধ হচ্ছে না। এই কন্যা লাভের আশায় দেখছো না দেশ দেশান্তর থেকে রাজপুত্তর সব ছুটে আসছে। এখানে কি আমাদের পাত্তা মেলে।"

সরোজিনী মুখখানি গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে মুখতো

গম্ভীর হইবার নয়, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পাত্তা মেলে কি না মেলে সে আমি বুঝবো,—তুমি কেন বল না ভাই আমার পছন্দ হয়েছে।"

বিনয় চন্দ্র উত্তর দিল, "তুমি যখন বৌদিদি বলছো, তখন আমি বলতে বাধ্য,—পছন্দ হয়েছে?"

সরোজিনীর সমস্ত হৃদয়টা যেন দেবরের, এই কথাটুকুতে একেবারে আবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তাহ'লে দেখ ঠাকুর পো আমি পাকা কথা দিই।"

বিনয় মাথাটা নাড়িয়া বলিল. "কাজেই?"

গৌরচাঁদের বহুক্ষণই ধৈর্য্যচ্যুতি ধরিয়া ছিল, কেবল জননীর তাড়নার ভয়ে এতক্ষণ কোনক্রমে স্থির হইয়াছিল, কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে তাহার কাকাবাবুর হাতখানায় একটা ঝাঁকি দিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা কাকাবাবু, তুমি আর কখন যাবে। তারা যে তোমার জন্য কতক্ষণ থেকে বোসে আছে। চল না।"

সরোজিনী মহা বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "এই ছেলেটার জন্যে যদি একটু কাজের কথা কওয়া যায়! মানুষকে বড় বিরক্ত করে। তাহ'লে ঠাকুরপো আমি পাকা কথা দিইগে।"

বিনয় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। সরোজিনী কথাটা একেবারে পাকা করিয়া ফেলিবার জন্য আর কোনরূপ কথা না কহিয়া তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কলিকাতার আগন্তুকদ্বয়কে দেখিতে বিনয়ও গৌরচাঁদের সহিত বাহিরের দিকে রওনা হইলেন।

বিনয় বাহিরে বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিয়া যাহাদের দেখিলেন, তাহাদের দেখিবার জন্য তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। বৈঠকখানা ঘরের দুইখানা চেয়ার দখল করিয়া উপবিষ্ট ঘোষ ও হরিশচন্দ্র। উভয়েরই কাপড় পরিচর্য্যা আজ যেন কিছু জমকালো রকমের। বৈঠকখানা গৃহে তাহাদের দেখিয়া বিনয় একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল, মহা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? কলিকাতা অন্ধকার করে অকস্মাৎ এখানে উদয়?

বিনয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়াই, ঘোষ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াছিল, পকেট হইতে গন্ধযুক্ত রুমালখানা বাহির করিয়া সেখানাকে বিনয়ের মুখের সম্মুখে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, বল থ্রি চিয়ার্স ফর হরিশচন্দ্র! ব্যাপার একেবারে বেজায় গুরুতর—হরিশের বিয়ে। কন্যা দেখবার জন্যে স্বয়ং বর ও তার বন্ধু এই শ্রীমান্ বিশেষ অনুরোধে পড়ে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে।"

বিনয়ের কৌতূহলটা নিদ্রা হইতে একেবারে যেন সহসা ধাক্কা খাইয়া হাই তুলিয়া জাগিয়া উঠিল। একে হরিশের বিবাহ, তাহার উপর আবার হরিশ আসিয়াছে তাহাদের দেশে কন্যা দেখিতে, মেয়েটি কাহার, কি বৃত্তান্ত, সমস্ত

সবিস্তারে জানিবার জন্য বিনয় একেবারে মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি আবার প্রশ্ন করিল, "এখানে মেয়ে দেখ্‌তে, কার মেয়ে, কি বিত্তান্ত একবার ভেঙ্গে চুরে সব বলো। শুনে তবু কতকটা নিশ্চিন্ত হই।"

ঘোষ তাড়াতাড়ি উত্তর দিল,—"আরে ছাই বলই না কেন ভেঙ্গে চুরে। এই যে এখানে জম্বু সিংহি না কে, জজের আদালতে ওকালতি করে, তার স্ত্রীর ভগিনীর মেয়ে।"

বিনয়, হরিশ ও ঘোষের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ!"

ঘোষ মাথাটা নাড়িয়া বলিয়া ফেলিল, "বা বেশ আছ! এর ভেতর সর্ব্বনাশ কোন খানটায় দেখ্‌লে। বিয়েটা তো চিরকালই আনন্দেরই জানি—হঠাৎ এর ভেতর সর্ব্বনাশ এলো কোত্থেকে বলতো। কাব্য হিসেবে বিয়েটা কি আজকাল সর্ব্বনাশের দিকে নাকি?"

বিনয় মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "আরে তা নয়, তা নয়, এর ভেতর বেশ একটু মজা আছে। শুন্‌লে তোমাকে বলতে বাধ্য হতে হবে—সর্ব্বনাশ।

কন্যা দেখিবার নির্দ্ধারিত সময়টা একেবারে মাথার উপর আসিয়া পড়ায় হরিশ একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার এক্ষণে এ সকল তর্ক বিতর্ক ভালো লাগিবে কেন? বিবাহের আশার বাতাস তখন তাহার হৃদয়ে ভাবের লহর তুলিতেছিল। সে মহা বিরক্ত ভাবে বলিল, "এইটাই তোমার সব চেয়ে মহৎ দোষ—কি যে তর্ক কর তার কোন অর্থ নেই। একজন ভদ্রলোককে কথা দেওয়া হয়েছে,—অথচ সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, সে দিকে তো তোমার খেয়ালই নেই। এইটাই হ'লো আমাদের জাতিগত দুর্ব্বলতা, যে কোন কাজ আমরা ঠিক সময়ে কর্ব্বো না।"

ঘোষ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বিনয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল,— "বিনয় আর নয়, হরিশ এবার চটে উঠেছে, যাও—চটকরে জামা কাপড়টা বদ্‌লে এসো। হরিশ কি আর স্থির থাক্‌তে পারে, পাত্রী দেখার কৌতূহল কোলা ব্যাঙের মত ওর প্রাণের ভেতর হবা হবা কচ্ছে। হরিশ! আমার ভাই কোন অপরাধ নেই, আমি একেবারে প্রস্তুত, এই দেখ উঠে দাঁড়িয়েছি। এখন বিনয়ের সঙ্গে বোঝা পড়া কর।

জামা কাপড় বদলে এস—সে কি! বিনয় মাথাটা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "ওখানে যেতে আমার আপত্তি আছে।"

"তাতো আপত্তি থাকবেই!" ঘোষ হরিশের দিকে ফিরিয়া বলিল, শুন্‌ছো হরিশ, বিনয়ের কথাটা। আমার মত তুমি দিলখোলা সরল প্রাণ আর কোথায় পাবে বলতো। পরের জন্যই আমার সব। কিন্তু বিনয়ের আক্কেলটা শুন্‌লে তো, তোমার আনন্দ কাজেই ওর আপত্তি। তিনি কি তা চোখ্ কিঁরে দেখ্‌তে পারেন। কি বল হরিশ, এটাও বাঙ্গালীর একটা জাতিগত দুর্ব্বলতা। বিনয়ের অপরাধ কি?"

হরিশ বেশ একটা কিছু বলিবার জন্য মনে মনে গুছাইয়া লইয়া ছিল, কিন্তু বিনয় তাহাকে সে ফাঁকটুকু না দিয়াই বলিয়া উঠিল, আরে তা নয় তা নয়। একটা কেন,—বললা আমি হরিশের জন্য এক ডজন পাত্রী দেখে আস্‌ছি। এখানেও যেতে আমার কোন আপত্তি ছিল না—তবে কথা হচ্ছে এই যে, এই পাত্রীটীর সহিত আমারও সম্বন্ধ হচ্ছে।"

ঘোষ হা করিয়া বিনয়ের কথাগুলা শুনিতেছিল, বিনয় নীরব হইবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, "তাতো হবেই, তুমি কি কখনও কারুর ভাল দেখ্‌তে পারো। ঐটুকুই যে তোমার বিশেষত্ব। হরিশ তখনই তোমায় বলে ছিনুম আর দরকার নেই বিনয়কে, চল সরাসর একেবারে পাত্রীর বাড়ী গিয়ে উঠা যাক্। তুমি যে একেবারে বিনয় বিনয় করে হেদিয়ে পড়লে, এখন নাও বিনয়ের ঠেলাটা।"

বিনয়ের কথায় হরিশের প্রাণের আশাটা যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া মাটির নীচে দশ হাত বসিয়া গিয়াছিল। সে প্রাণের ভিতর যে সোণার অট্টালিকা গড়িয়া তুলিয়া ছিল, তাহা যেন তাসের ঘরের মত আর হাওয়ার ভর সহিতে পারিল না। সে একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই পাত্রীটির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি একেবারে পাকা হয়ে গেছে। কিন্তু তা যদি হয়, তা হ'লে আমায় এমন মিথ্যে কষ্ট দেবার তাদের প্রয়োজন ছিল কি!

আশাভঙ্গের ব্যথাটা হরিশের মুখে চোখে যে কালি ছড়াইয়া দিয়াছিল, তাহা বিনয়ের দৃষ্টি এড়াইল না। বিনয় মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "তাদের কোন অপরাধ নেই। সম্বন্ধ একেবারে যে পাকা হয়েছে তাও নয়, তবে একটু আগে সম্বন্ধটা কতকটা পাকা হবার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি যদি তাকে বিয়ে কর্ত্তে চাও, আমার তাতে কোন আপত্তিই নেই।"

ঘোষ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "আপত্তি না থাকে যদি—চল। আত্মত্যাগের একটা মস্ত উদাহরণ দেখাও। আর কেউ না করুক হরিশ নিশ্চয়ই তোমার ঋুশোবার ধন্য ধন্য করবে।"

বিনয় আবার কি একটা বলিতে যাইতে ছিল, কিন্তু ঘোষ হাত নাড়িয়া বাধা দিল, বলিল, ভাই আর ঘুরিয়ে নাঁচ দেখিও না, বাঙ্গালায় বল যা সবাই বুঝবে।"

"বোস, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।" বিনয় আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বৈঠকখানা গৃহ হইতে চলিয়া [illegible] হইতে বাহির হইয়া যাইবামাত্র ঘোষ হরি[illegible] বক্তা চলিতে পারে; কার্য্যে[illegible] হরিশ বাঙ্গালীর অধঃপতনটা কার্য্যের কেহ প্রশংসা করিত না, অধিকন্তু সে সব ব্যক্তিতাগুলো [illegible]র একটা ছেলে, তার জন্য যা করেছ,—অনেক। বক্তিতা করি বল?" [illegible]কছু কর; কিছুদিন বিশ্রাম কর।—নবীন হরিশ কোন উ[illegible] [illegible]নে মনে বলিত—"পরের জন্য তোমাদের এত

মাথা ঘামানো কেন বাপু ?" সংসারে এই দলের উপদেষ্টাগণই পরশ্রীকাতর বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

নবীন যখন পরলোকে চলিয়া গেল, সংসারের সমস্ত কাজের ভার পড়িল—নারাণের উপর। নারাণ তার বাপের সঙ্গে মাঠের চাষ-বাস, ঘরের কাজ কর্ম্ম করিয়া দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। তার বাপের সঞ্চয় বিদ্যারও উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। কয়েকমাস ঠিক নবীনেরই পথে নারাণ চলিতে লাগিল।

সংসারে মা, স্ত্রী, একটি মেয়ে ও দুটি ভগিনী ও রাখাল এবং মাহিনা করা চারিজন চাষী থাকিত।

২

নবীন বিষহরি ঠাকুরের জন্য কেবল একটি পাকা ঘর করিয়া দিয়াছিল আপনারা খোড়ো ঘরেই বাস করিত। নারাণ বিষহরির ঘর দ্বিতল ও নিজেদের বাসের জন্য একতল কয়েকটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল। ঠাকুরের সঙ্গে সংসারের লোকের এই পার্থক্য রক্ষিত হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ ধন্য ধন্য এবং গ্রামবাসীগণ তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল।

নবীন ছিল অতি শান্ত প্রকৃতির লোক, আর নারাণ ঠিক তাহার উল্টা। জমির আইল লইয়া পাশের গ্রামের একজন চাষীর সঙ্গে বচসা হইতেই নারাণ সেই চাষীকে মারিয়া যখম করিয়া ফেলিল ; গ্রামের চৌকিদার শান্তিরক্ষা করিতে আসিলে তাহার পিঠে পাঁচন-বাড়ীর একটি গভীর রেখা-পাত করিয়া দিল—আবার শান্তিরক্ষা করিতে সে নিজেই দারোগা সলিম সাহেবকে 'হাতে' রাখিয়া দিল। এ সব কারণে তাহাকে দোষ দিলে চলিবে কেন ? তাহার বয়স যে ত্রিশের অনেক কম।

এতবড় একটা বীরপুরুষ গৃহে আসিলেই অতি শীতল শিশুর মত। পদ্মমণির শাসন কিছুমাত্র না থাকিলেও নারাণ তাহার দর্শনেই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিত। অনেকদিন আগে একবার পদ্মমণি পদ্মহস্ত বুলাইয়া সামান্য একটু কোন্দল করিয়া রাতারাতি দুর্গাপুর পিত্রালয়ে প্রয়াণ করিয়াছিল। তখন নবীন জীবিত ছিল। গ্রামের জমিদার পুত্র সেজোবাবু কবিতা লিখিতেন, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রাখতেন, তিনি পরামর্শ দিলেন লভ্ না করিয়া বিবাহের এই ফল। নারাণ স্থির করিল এবার আর পদ্মমণিকে আনিবে না। লভ করিয়া আর একটি বিবাহ করিবে। সেজোবাবুর

বৈঠকখানায় সম্মতি দান করিয়া ফিরিয়া আসিবার একদিন পরে দাঁতে কুটা লইয়া সুপুত্র হইয়া নারাণ পিতৃ আজ্ঞায় দুর্গাপুরে গেল। এবং পরদিন পদ্মমণিকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে আসিল। পদ্মমণি মোড়ল বৌয়ের নিকার গল্প করিয়াছিল, তাহার মান ভাঙ্গাইতে নারাণকে অনেক দূষ্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

৩

মহাজনী নৌকা পটলের বস্তায় বোঝাই হইয়া নারাণ কলিকাতা চলিয়াছে। পদ্মমণি একখানা কালো পাথরের থালাতে ভাত, কিছু তরকারী ও খানিকটা নূন—একখানি নেকড়ায় বাঁধিয়া দিয়াছে, আর বলিয়া দিয়াছে খুকীর জন্যে এক পাথর খাবার আনিও।

এই প্রথমবার সে কলিকাতা চলিয়াছে। কবিতা লেখক সেজোবাবু বলিয়া দিয়াছেন—নারাণ যেন কলিকাতাটা বেশ করিয়া বেড়াইয়া আসে। সেজোবাবু কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, নারাণ তাহা জানে না, কিন্তু না বলিলেও চলিত। ছেলে বেলা হইতেই নারাণ কলিকাতার সৌন্দর্য্য গর্ব্বের কথা শুনিয়াছিল, অনেক দিনের বাসনা পূরণ না করিয়া সে কি থাকিতে পারে?

পোস্তার ঘাটে নৌকা লাগাইয়া বিক্রেতার হস্তে মাল পৌঁছাইয়া দিয়াই নারাণ একটী লোককে অভিভাবক করিয়া কলিকাতা দর্শনে বাহির হইল।

এই অভিভাবকটি জীবতত্ত্বের ইতিহাসে একটি অপূর্ব্ব চরিত্র। চরিত্রও অদ্ভুত, চেহারাটিও ততোধিক। সে অনেকানেক লোককে সপ্তস্বর্গ ও চতুর্দ্দশভুবন দেখাইছে বলিয়া তাহার একটি বিশেষ গর্ব্ব ছিল। তাহার জীবনের ইতিহাস সে সকলকে এমন করিয়া বলিত, যে ভাবাবেশে শ্রোতাকে কখনও হর্ষ কখনো বিষাদ সাগরে মগ্ন হইতে হইত। আরো সে বলিত, তাহার পূর্ব্ব-পুরুষ রাজ সম্মানে দেশের ও দশের মাথা ছিলেন। এমন কি বাল্যকালে তাহাকে টাকা লইয়া ছিনি-মিনি খেলিতে না দেখিয়াছে, তখনকার কালে এমন লোক ছিল না বলিলে একটুও মিথ্যা বলা হয় না। দেশের রাজা রাজড়া ও বড় লোক তাহার একচেটিয়া বন্ধু. একথা বলিতে বলিতে অকারণ বিকশিত হাস্যে তাহার মুখ ভরিয়া যাইত। এই অভিভাবকের কয়েকটি বিবাহ-বয়সোত্তীর্ণা কন্যা ছিল, তাহাদের রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা করিতে সে পঞ্চমুখ

ছিল। এই কন্যাগুলি যেমন প্রত্যক্ষ ছিল, রূপ-লাবণ্যের প্রত্যক্ষতা তেমন ছিল না। লোকটি অনেককে তাহার গৃহে আহ্বান করিত, এমনও আশা করিত, স্বেচ্ছায়, বিনাপণে কেহ গন্ধর্ব্ব বিবাহ করিয়া লইয়া যাইতে পারে—কিন্তু এ আশা কোন ফল প্রসব করে নাই। গন্ধর্ব্ব বিবাহের আশায় নিরাশ হইয়া সে স্থির করিত, এখন হইতে পয়সা জমাইয়া, মেয়েদের বিবাহ দিবে, কিন্তু পয়সা হাতে পড়িলে দু'দণ্ডের বেশী থাকিতে চাহিত না। সেগুলির পক্ষোদ্ভেদ হওয়াতে তাহারা পলাইয়া যাইত, কিন্তু সে শূন্যতা অনুভব করিবার মত শক্তি অনেকক্ষণ তাহার থাকিত না।

বাহিরে যতখানি আমোদ সে বহন করিয়া আসিত, ঘরে তাহার অনেক বেশী মাত্রায় চক্রবৃদ্ধি সুদ, তাহাকে বহন করিতে হইত।

এই স্বেচ্ছাকৃত অভিভাবকের কবলমুক্ত হইয়া যেদিন নারাণ গৃহে ফিরিবার জন্য নৌকায় উঠিল, তাহার মুখের উপর চোখ দুইটা অসম্ভব রকম লুকাইবার চেষ্টা করিয়াছে; নাকটি অস্বাভাবিক দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে—যেন ডালপালা ভাঙ্গা-চোরা একটা দেবদারু গাছ শুধু শীর্ষপত্র শীরে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

৪

সিদ্ধির ঝোঁক যেমন নেশার পরেও কাটে না, অভিভাবকের প্রভাবও নারাণের উপর হইতে শীঘ্র কাটিল না। তবে এ ক্ষেত্রে কথা এই সিদ্ধির ঝোঁক বড় জোর দু'চারদিন থাকে, কিন্তু নারাণের উপর কলিকাতার সেই অদ্ভুত জীবটির প্রভাব অল্পস্থায়ী হইল না!

সে একদিন পদ্মমণিকে বলিল—দেখ্, একতালা ঘরে আর শোওয়া চল্‌চে না; ওতে দেহ ভাল থাকে না—জ্বরজারি হয়।

পদ্মর মুখ বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে গ্রামে একমাত্র পালেরা দোতলা বাড়ী তুলিয়া গর্ব্বে মাটিতে পা দিয়া চলে না। প্রফুল্ল হইলেও পদ্ম পাকা গৃহিণী, সে বলিল অনেক টাকা লাগবে যে!

নারাণ বলিল—লাগলেই বা।

আর একদিন বলিল—এবার পূজার সময় কলকাতা থেকে বাই নাচ আন্‌তে হবে। সে যদি দেখিস্ তোর মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

"ও মা! বলিয়া পদ্ম অবাক হইয়া চুপ করিল।

নারাণ মাকে বলিল—দেখ মা, তুমি যে ঐ মাদুর টাদুর গুলো নিয়ে নদীতে কাচতে যাও সে ভালো দেখায় না—একটা লোক রেখে দাও।

মা বলিল—সে কিরে নারাণ! আজন্মকাল এই কাজ করে আসছি, ভালো দেখিয়েছে, এখন দেখাবে না কেন?

নারাণ বলিল—সে তুমি ত বুঝবে না মা। মানসম্ভ্রম বজায় রেখে চল্‌তে হবে ত! আর তাও বলছি মা, পদ্ম যে রান্নাবাড়া করবে, আর বাসন মাজা নিয়ে থাকবে, তা আমি দেখতে পারব না। ওসব ছাড়তে হবে।

মা আরো আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কেন, ভালো দেখাবে না কেন? ওঃ—কি আমার ভালো দেখা রে?

নারাণ একটু গরম হইয়া বলিল—না, না, ওসব চলবে না, ছাড়তে হবে?

মা বলিল—ছাড়তে হবে? বল্লেই হল? তুইও হাল-চাষ ছাড়বি নাকি?

নারাণ বলিল—ছাড়ব কেন, লোকজন রেখে দেব, তারাই করবে!

"উচ্ছন্ন যাবার আর দেরী নাই—" বলিয়া মা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, নারাণ বলিল—শোন মা, আমি লোকজনের কথা বলে দিয়েছি, সেজেবাবুর বাড়ীর ভোলা আনিয়ে দেবে, তারা এলে—

ফিরিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মা কহিল—এলে ঝেঁটিয়ে সব দূর করে দেব।

"আচ্ছা সে দেখা যাবে"—নারাণ বাহির হইয়া গেল।

৫

কথাটা পদ্মমণির মনেই বেশী লাগিয়াছিল। চাষার ঘরে নিষ্কর্ম্মা ও কুড়ের মত থাকে এমন বৌ-ঝি পদ্ম দেখে নাই। তাহার মনে বড় ভয় হইতে লাগিল, এত বড় দিনটা চুপ করিয়া বসিয়া, শুইয়া কাটিবে কি করিয়া? না, না তাহা হইলে সে মরিয়া যাইবে। কাজ না থাকিলে কি মানুষ বাঁচে?

নারাণ নাকি ভারি জেদী লোক, তাই সে ভাবিতে লাগিল, ও যখন বলিয়াছে, করিবেই! আবার মাকে খুব কড়া কড়া কথা বলিয়াছে! পদ্ম ভাবিয়া রাখিল—আজ রাত্রে দু'টা কথা বলিতে হইবে।

নারাণের মা এ সন্দেহ করে নাই যে, এ সমস্ত পদ্মমণির চক্রান্ত! সে পদ্মকে বলিল—বৌমা, এসব নারাণের কি মতিবুদ্ধি বল দেখি।

পদ্ম বলিল—তাই ত দেখ্‌ছি মা।

মা বলিল—ভালো কথা নয় মা, একটু বুঝিয়ে বোলো।

পদ্ম কহিল—তুমি বল্লে না কেন মা?

মা বলিল—আমি বল্লে ঝাঁজ আরো বেড়ে যাবে। তুমি বুঝিয়ে বোলো।

নারাণের মা অশিক্ষিতা ও নেহাইত গ্রাম্যনারী হইলেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল, একালের ছেলেরা কুকুর, আর বৌয়েরাই তাহাদের আসল মুগুর!

পদ্ম বলিল—বল্‌ব মা!

কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই পদ্ম নারাণকে বলিল—"দেখ, মা বলছিলেন—"

"কি বল্‌ছিলেন?"

"তুমি—নাকি---"

"হুঁ"

"তুমি নাকি বড় খারাপ কাজ করতে যাচ্ছ?"

কে বলে? বলিয়া এমন একটা হিংস্রদৃষ্টিতে পদ্মর পানে চাহিল যে, পদ্মর কথা কহিবার শক্তিও কিছুক্ষণের জন্য লুপ্ত হইল। তবে, আজ সে মন বাঁধিয়া আসিয়াছে—তাহার শাশুড়ী তাহাকে ভার দিয়াছেন।

"দেখ, রাগারাগির কথা নয়। মা যা বলেন, মেনে চলতে—"

"আর সেজো বাবু, তিনি হল বিদ্বান লোক, ছাপার কেতাবে কত নাম আছে, তার উপর তিনি হল গিয়ে আমার বন্ধু, সে যা বলবে, তা ঠেল্‌তে হ'বে!"

"সেজো বাবু কি বলেন?"

"বলবে আর কি! পাকা ঘর দোর করতে, লোক জন রেখে কাজ করতে,—"

"তবে আমরা আছি কি করতে? কেবল ঘরে শুয়ে ঘুমুতে, না—"

"সেজো বাবুর ঘরে কি বৌ নেই, তারা কি করে? তারা পিয়ে—"

"ওরা ভদ্দরলোক, ওদের কথা ছেড়েই দাও।"

"ভদ্দরলোক কি গায়ে লেখা থাকে।"

"তক্‌রার করতে পারব না আমি তোমার সঙ্গে,—"

"হ্যাঁ—তক্‌রার করা আমি ভাল বলি না—বলিয়া নারাণ পদ্মকে ধরিয়া নিকটে টানিয়া লইল।"

৬

প্রভাতে নারাণের মা বধূকে বলিলেন—"বৌমা, বলে দেখবে ?"

অবনতমুখে বধূ উত্তর দিল—"হুঁ।"

শ্বাশুড়ী অপ্রসন্নমুখে চলিয়া গেলেন।

কক্ষে কলস লইয়া পদ্ম নদীতে স্নান করিতে গেল। শ্বাশুড়ীর বিরক্ত দৃষ্টি ও অপ্রসন্ন মুখভাব কোমল করতলে কাঁটার মত ফুটিয়া বেদনা দিতে লাগিল। অন্য দিন সে জলে কলস ভাসাইয়া কতক্ষণ ধরিয়া পাত্রমার্জ্জনা করে; তামাকের গুল্ দিয়া দাঁত মাজিতে ঘণ্টা ভোর করিয়া দেয়; সমবয়স্কারা জল ছোড়াছুড়ি করে, সে সকল রঙ্গ ক্রীড়াতেও পদ্ম যোগ দেয়, আজ সে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া উঠিতে উদ্যত হইল। একটি রমণী বলিল—"কি বৌ—"

অপরা তীরের পানে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল—"সেজো বাবু যে!"

অন্য একটি রঙ্গিনী বলিল—বৌয়ের কর্ত্তাও আছেন।

রমণীরা গাত্রবসন সংযত করিতে লাগিল। পদ্ম তীরের উপর উঠিয়া দেখিল, সুসজ্জিত এক ব্যক্তি ইতঃস্তত পদচারণা করিতেছে। কয়েক-মুহূর্ত্ত সে আপনমনে কি ভাবিল, পরে কলস নামাইয়া রাখিয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইল!

চলৎ-শক্তি ক্রমেই লুপ্ত হইতেছিল, অথচ শরীরের যতখানি শক্তি পদ্ম সেখানেই নিয়োজিত করিতে চাহে! এমন সময়ে সেজো বাবু ফিরিলেন। পদ্ম আপনাকে দৃঢ় করিয়া লইল, স্বর অল্প উচ্চ করিয়া বলিল—"আপনাকে একটা কথা বল্‌ব ?"

সেজো বাবু দ্রুত পদক্ষেপে পদ্মর সন্নিকটে আসিয়া বলিলেন—"তুমি পদ্ম! আমার বন্ধুর—"

পদ্ম বলিল—আপনি বড় লোক, ভদ্দরলোক, আমরা চাষালোক, আপনাদের সঙ্গে আমরা সমান নই। আপনি ওঁকে—

সেজোবাবু বলিলেন—নারাণ আমাকে 'তুমি, তুমি' করে,

সে কথায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া পদ্ম বলিল—"আপনি ওঁকে ভালো পরামর্শ না দিয়ে কু-পরামর্শ দিচ্ছেন কেন ?"

সেজোবাবু বলিলেন—"কু-পরামর্শ! আমি দিচ্ছি! কাকে!"

"ওঁকে! সে যাকে যাচ্ছে তাই বলে, আর—"

সেজোবাবু বলিলেন—আমি শিখিয়ে দিই? এত বড় স্পর্দ্ধা—

পদ্ম এতক্ষণ সংযত ভাবেই কথা কহিতেছিল, এবার মাথা তুলিল; সিক্তবসন মুখের অর্দ্ধাংশে ছিল, অপরার্দ্ধ মুক্ত। একবার চক্ষু তুলিয়াই তাহা নামাইয়া লইল, বলিল—শেখানই ত! নিজমুখেই স্বীকার করেছে। যত কু-পরামর্শ! আর সে পাবে কোত্থেকে! ভদ্দরলোকের এই কাজ হ'লে—

সেজোবাবু হাঁকিলেন—দরওয়ান!

পদ্ম বলিল—ডাক্ তোর, কে আছে ডাক! কার সাধ্যি—

এতক্ষণে স্নানরতা রমণীরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পদ্ম পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া তাহাদের পানে চাহিয়া বলিল—তোমরা দেখে রেখো। দেখি ত আমার কি করে? কত বড় বাবু হয়েছে তা দেখা আছে।

দরওয়ান সঙ্গে ছিল না, এ সময়ে তাঁহার সঙ্গে তিনি কচিৎ কাহাকেও সঙ্গে আনিতেন। সেজোবাবু এতগুলি স্ত্রীলোকের সম্মুখে পরাজয় বহনে অসমর্থ হইয়া বলিলেন—পদ্ম, তুমি রাগ করছ কেন! আমার দোষ কিছু নেই। তবু তুমি যদি বল—আমি নারাণকে বুঝিয়ে বল্‌ব, যাতে করে সে—

পদ্ম বলিল—তাই করবেন। ঝগড়া করা ত আমার ইচ্ছা নয়।

ব্যূহমুক্ত সৈনিকের মত সেজেবাবু গ্রামের পথে বেগে চলিলেন।

পদ্ম কলস তুলিয়া লইয়া সঙ্গিনীদের বলিল—লোকটা ভারি নচ্ছার! মেয়েছেলের নাওয়ার ঘাটে এসে উঁকি মারে!

৭

বঙ্গদেশের কোন কোন দূর পল্লীগ্রামে দেখিয়াছি, কৃষকেরা ভোর না হইতে পান্তাভাত খাইয়া মাঠে চলিয়া যায়, সমস্ত দিবস মাঠে কাজ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে প্রত্যাগমন করে। মধ্যাহ্নকালে বাড়ীরলোকে গামছা বাঁধিয়া মুড়ী ও লোটায় জল মাঠে পৌঁছাইয়া দেয়, তাহা খাইয়াই তাহারা অক্লান্ত ভাবে, রৌদ্র-বৃষ্টি ঝড়, বজ্র সহিয়া কাজ করিয়া থাকে!

নারাণ আজকাল ভোর না হইতেই বাহির হইয়া যায়, এবং সন্ধ্যা না হইলে আসে না বটে, কিন্তু চাষের ক্ষেতে চাষীরা তাহাকে দেখিতে পাইত না। সেজেবাবুর বৈঠকখানায়, মনের হরষে দিন কাটিয়া যায়।

সেদিনও কয়েকজন বসিয়া তামাক খাইতেছে, সেজেবাবু আসিয়া বাঘের মত নারাণের ঘাড়ে পড়িলেন। পদ্মকে যে আজ তিনি খুন না

করিয়া আসিয়াছেন, নারাণেরই খাতিরে, নহিলে তাহাকে খুন করিয়া তবে গৃহে ফিরিতেন, বলিয়া একটা উৎকট শপথ করিলেন।

নারাণের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিল—সেজেবাবু যে কাজ করেন নাই, সে তাহা শেষ করিয়া আসিবে!

বেগতিক দেখিয়া সেজেবাবু নারাণকে ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, বোস্, বোস্ সব শোন্ আগে?

তিনি যে তাহাকে বাধা দিলেন, তাহা নারাণের হিতকামনা করিয়া নহে। পদ্ম যে রকম মেয়েমানুষ, নারাণের কাছে মার ধোর খাইলে সে একদিন তাঁহাকে পাইলে নখরাঘাতে সেনের মত পারাবত বধ করিয়া ফেলিবে! বাস্তবিক পদ্মকে দেখিয়া স্ত্রীজাতির প্রতি যে তাঁহার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল, তাহার অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। এমন কি তাহার মনের মধ্যে এমন ভাবটি আসিয়াছে যে সংসারে পদ্মের অনুরূপা স্ত্রীলোক থাকিলে, বড় সুবিধার হইবে না।

তিনি নারাণকে বিশেষ করিয়া বলিলেন—এখন নয়, দেখা হ'লে পদ্মকে বুঝিয়ে বলো, মানীর মান রেখে চলতে হয়। যদিও পদ্মর উপর আমার একটুও রাগ হয় নি।

"রাগ করবেন না" বলিয়া নারাণ তাঁহার হাত ধরিল।

৮

পদ্ম শ্বাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসিল মা, জলের কলসী কোথায় রাখব?

একে তাঁহার চিত্ত পদ্মরপ্রতি প্রসন্ন ছিল না, তদুপরি এই অনাবশ্যক প্রশ্নে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ঘরে দোরে জায়গার ত অভাব নেই!

হায়! জায়গার অভাব আছে বলিয়া পদ্ম প্রশ্ন করে নাই, একটি স্নেহ সম্ভাষণের তাহার বড় অভাব হইয়াছিল। পদ্ম সিক্ত বসনে বিষহরির ঘরে ঢুকিয়া কলসী নামাইয়া পুজার আয়োজন করিতে লাগিল। সমস্ত শেষ করিয়া সে গলায় আচল জড়াইয়া প্রণাম করিল, স্পষ্টস্বরে বলিল—বিষহরি, তুমি ঘরে থাকতে অমঙ্গল হবে না, আমি জানি? প্রণাম, ঠাকুর, প্রণাম, প্রণাম!

দু'তিনটি ক্রটী ধরিয়া শ্বাশুড়ী সেদিন তাহাকে সাংসারিক কার্য্যে একেবারেই অনভিজ্ঞা বলিয়া বসিলেন। পদ্ম প্রতিবাদ করিল না, সংশো-

ধনের চেষ্টা করিতেও তাহার মন সরিতেছিল না। মনের ভিতরে একটি আগুন যেন ছাই চাপা আছে, একটি ফুৎকারের অপেক্ষা করিতেছে। সে ফুৎকারটি কখন আসিবে, ব্যগ্রভাবে সে সেই পথেই চাহিয়া আছে!

দিন কাটিল, শ্বাশুড়ীর কাছে বসিয়া অন্যদিন সে পাটকাটিত, আজ দাওয়ায় চুল এলাইয়া শুইয়া পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যাকালে উঠিয়া আবার বিষহরির শীতল-সন্ধ্যার জোগাড় করিয়া দিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। তখনও সমান উৎকণ্ঠা!

একটা শব্দ তাহার কানে গেল—কেরে? পদ্ম বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

পূজারি ঠাকুর বাটিতে দুগ্ধ এবং অন্য পাত্রে মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া গৃহে যাইতেছিলেন, বহির্দ্বারে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া নারাণ হাঁকিল—কেরে? সে-স্বর যেন বাজের মত ডাকিয়া উঠিল। বাম-হস্তে একটা খুঁটি ধরিয়া পদ্ম দাঁড়াইয়া রহিল।

পূজারি বলিলেন—কে বাবা নারাণ? আমি ভট্টাচার্য্য!

"ভ-ট্টা-চা-র্য্য! তোমার হাতে কি—কি?" "শীতলের—"

"বটে! বেটা, আমার ঘরে চুরি!" বলিয়া পা তুলিয়া ভট্টাচার্য্যের পানে ছুটিল।

ভট্টাচার্য্য দ্রুতবেগে পথ দেখিলেন; উত্তোলিত পদে, বিচ্যুত হইয়া নারাণ সশব্দে আছাড় খাইয়া পড়িল।

৯

ওকি হল, ও কি হল—বলিতে বলিতে পদ্ম ছুটিয়া আসিল। নারাণের লুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিল—পড়লে কি করে?

নারাণের মুখ হইতে অস্পষ্ট গোঁঙানির সুরে যে কয়টি কথা বাহির হইল, মুখের কাছে মুখ রাখিয়াও পদ্ম তাহার একবিন্দুও বুঝিতে পারিল না। একটা বিকট দুর্গন্ধে তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সে নারাণকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—শুনছো।

সাড়া-শব্দ নাই—নারাণ অচেতন!

পদ্মের কোলে নারাণের মস্তক, বৌ-মানুষ, চীৎকার করিয়া ডাকিতেও পারে না, অতিকষ্টে সে নারাণকে জড়াইয়া ধরিয়া লইয়া চলিল। নিজের গৃহে বিছানার পরে শোয়াইয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

নারাণ চেতনা পাইয়া জড়িতস্বরে বলিল—আর বাঁচব না—বাবা, মলুম।

পদ্ম নিঃশব্দে বাতাস করিতে লাগিল, অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল; নারাণ বলিল—কে ?

পদ্ম জিজ্ঞাসিল—বড় যন্ত্রণা হচ্ছে ?

হুঁ

কোন্‌খানে—বল দেখি—

এইখানে—বলিয়া বক্ষঃস্থল নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—মরে গেলুম! মরে গেলুম।

কেন অমন হল! মদ খেয়েছ ?

নারাণ উত্তর দিল না; যন্ত্রণায় সে আবার উঠিয়া বসিল।

আমায় বাঁচাবে না পদ্ম ? আমি যে মরে যাব ?

পদ্মমণির বক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল; স্পন্দন যেন হাহারব করিতে লাগিল; পদ্ম সে দুর্ব্বলতা গোপন করিয়া বলিল—বিষহরির পূজারিকে লাথি তুলেছ—বিষহরি না বাঁচালে—

নারাণ আর্ত্তস্বরে বলিল—বিষহরিকে মানত কর পদ্ম, আমায় সারিয়ে দিতে বল।

বলছি—পদ্ম বলিল—বলছি। বাবা বিষহরি যদি ভালো করেন—

যদি করেন কি পদ্ম ? আমি মরে যাব যে!

পদ্ম নীরবে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল। পড়িয়া গিয়া তাহার যকৃতে আঘাত লাগিয়াছে।

পদ্ম পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিয়া, নারাণের পেটে তেল মালিশ করিতে লাগিল।

নারাণ বলিল—কথা কও পদ্ম, কথা কও—মরে যাব।

চুপ করে' ঘুমাও। মা আসছেন।

ঘুম পাচ্ছে না—বিষহরির পূজা দিলে ?

দিয়েছি।

তবে সেরে যাব ?

যাবে—তোমাকেও কাল বাবার পূজা দিতে হবে।

দোব, দোব—ঠিক দোব।

বাবার দিব্যি!

বাবার দিবি !!

মা ঘরে ঢুকিতেই পদ্ম বলিল—একটু ঘুমুচ্ছে বাহিরে যাও, মা।

নারাণ ঘুমায় নাই, সে পদ্মকে বলিল—তুমি সেজ বাবুকে অপমান করেছ ?

অপমান করিনি। তাঁর দোষ দেখিয়ে দিয়েছি। কাল ঘাট চাহিব আর আমার তাঁর ওপর রাগ নেই।

যন্ত্রণা কমিতেছিল, নারাণ ঘুমাইয়া পড়িল।

খুড়োর উইল

[লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল]

(৭)

জ্যাক্ মেলবোর্ণে গিয়া ইংলণ্ড যাত্রী একখানি জাহাজে উঠিল। এই সমুদ্র যাত্রা তাহার নিকট বড়ই দুঃখজনক বলিয়া বোধ হইল। অনুতাপের তীব্র যন্ত্রণা তাহাকে বড়ই কষ্ট দিতে লাগিল। সে যদি এত একগুঁয়ে না হইয়া, আরও বেশী সহিষ্ণু হইত, তাহা হইলে হয়ত পিতাপুত্রের মধ্যে এই বিচ্ছেদ নাও ঘটিতে পারিত। ইহা ভাবিয়া সে বড়ই দুঃখিত হইল। হায়, এখন আর আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই।

জ্যাক একরাত্রি লণ্ডনে কাটাইল। রাত্রে ব্রামলে যাইবার ট্রেন থাকিলে সে এ সময়ও নষ্ট করিত না। পরদিন ট্রেনে চড়িয়া সে ব্রামলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার শোকের বেগ, এত তীব্র ও গভীর যে মৃত পিতা তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি কিরূপ বিলি করিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে একবারও তাঁহার মনে উদিত হইল না। মনে হইল পিতা যদি উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের জন্য তাহাকে ত্যজ্যপুত্রও করিয়া গিয়া থাকেন, তাহলে তিনি সর্ব্বাংশে ন্যায় সঙ্গত বিচারই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে চিন্তা তাহাকে বেশী

কষ্ট দিতে পারিল না। মৃত পিতার চিন্তাতেই তাহার মন অত্যন্ত ব্যথিত। দুঃখজনক অতীতের কথাই কেবল তাহার স্মৃতি সমুদ্রকে মথিত করিয়া তুলিতেছিল। বিষয় সম্পত্তির কিরূপ ভাগ হইল, সে বিষয়ে ভাবিবার তাহার তত অবসরও ছিল না।

গোধূলি সময়ে ট্রেন হইতে ষ্টেসনে নামিয়া সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না। ষ্টেসনের কুলীরা ও কর্ম্মচারীরা নূতন অপরিচিতের ন্যায় তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। এমন কি পিতার কারখানার কর্ম্মচারীরাও তাহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না।

সে একস্থানে দাঁড়াইয়া ছোট সহরটির দিকে একবার তাকাইয়া দেখিল। অমনি অতীতের সুখদুঃখের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি করিল। এখানে আসিয়া সে যেন আপনাকে একান্ত নিঃসহায় বোধ করিল; সুদূর অষ্ট্রেলিয়ার গোলাবাড়ীতে বাসের সময়ও সে এতটা নির্জ্জনতা অনুভব করে নাই।

সে ভাবিল, কারখানার লোকেরা, যাহারা এইমাত্র তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল, তাহাকে তাহাদের মৃত প্রভুর পুত্র স্যার উইলফ্রেড কার্টন বলিয়া চিনিতে পারিলে, কিরূপ আগ্রহ ও কৌতূহল সহকারে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিত, তাহাকে কিরূপ সাদর সম্ভাষণ করিত! সে ঠিক করিল যে, আত্ম পরিচয় দিবার পূর্ব্বে তাহার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার বিষয় তাহাকে সম্যক জানিতে হইবে। তাহাতে হয়ত পুনর্ব্বার সমাজ-চ্যুত ও নিঃস্ব অবস্থায় ব্রামলে সহর ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, ইহাই খুব সম্ভবপর!

পাহাড়ের উপর উঠিতেই তাহাদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা তাহার নয়নপথে পতিত হইল। সে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু সে সম্মুখের ফটক দিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে ইচ্ছা করিল না। বাড়ীর চৌকাট মাড়াইবার পূর্ব্বে তাহার অন্য এক গুরুতর কাজ রহিয়াছে। যে আঁকাবাঁকা রাস্তাটি বাড়ীটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া বাগানের ঠিক পার্শ্বেই একটি ছোট গির্জ্জার সম্মুখে আসিয়া সে উপস্থিত হইল। পরে অন্ধকারে একবারও পদস্খলিত না হইয়া স্থির-পদবিক্ষেপে বরাবর তাহাদের বংশের সমাধিস্থলের নিকট গেল। নিবিড়

অন্ধকারে কবরের উপর পাষাণফলকে খোদিত অক্ষরগুলি পড়া অসম্ভব। জ্যাক পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। সে একটি দেশলাই জ্বালিয়া মোমবাতি জ্বালিল। একটি কবরের উপর পড়িল পাথরের তলদেশে স্যার উইলিয়াম ক্রার্টন, ব্যারন; জে, পি; ডি, এল; সমাহিত আছেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ সদাশয় ব্যক্তি, বিজ্ঞ বিচারক ও দরিদ্রের চিরবন্ধু ছিলেন।" জ্যাক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চিন্তা করিল,—"হাঁ, তিনি এই সবই গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। যদি তাঁহার প্রাণটা আরও একটু কোমল হইত! যদি—না, না, এ সব তাহারই দোষ।" ইহা ভাবিয়া সে আবার এক হৃদয়বিদারক দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

জ্যাক অনাবৃত মস্তকে দাঁড়াইয়া এই লেখাগুলি বার দুই পড়িল। তারপর আলো নিভাইয়া ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিবার সময় গির্জ্জায় রঙ্গিন কাচের জানালার মধ্য দিয়া ভিতরে আলোক জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া সে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে গির্জ্জার ভিতর অর্গান বাজিয়া উঠিল। সুললিত সঙ্গীত ধ্বনি বায়ুভরে তাহার "কানের ভিতর দিয়া আসিয়া মরমে পৌঁছিয়া, তাহার ব্যথিত অন্তঃকরণে অনেকটা সান্ত্বনা ঢালিয়া দিল। সে ফটকে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া, গান শুনিতে লাগিল। কিন্তু এ কণ্ঠস্বর যে নূতন, পরিচিত নহেত! তাহার সময় বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী যেরূপ ভাবে গান করিতেন, তাহার অপেক্ষা এ গান যে খুব উচ্চ অঙ্গের। তবে কি এস্থানের সবই পরিবর্ত্তন হইয়াছে?

জ্যাক মাথা নাড়িতে নাড়িতে ফটক খুলিল। ফটক খুলিবামাত্র এক বালিকা তাহার কাছে দৌড়াইয়া আসিল। তাহার গায়ে ছোট জামা; অসংযত কেশরাশি লাল ফিতার মধ্য দিয়া তাহার পিঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে বালিকা সুলভ কণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল,—গ্রীমস? দিদির কাজ শেষ হয়েছে? রাত্রি যে অনেক হল।"

জ্যাক বালিকাকে দেখিয়া তাহার টুপি উত্তোলন করিল। বলিল,—আমার নাম গ্রীমস নহে! কোন দরকার থাকে ত আমাকে বলতে পার।"

বালিকা অপরিচিত লোক দেখিয়া ভীতা হইল না। সে নবাগত ব্যক্তির প্রতি বিস্মিতভাবে তাকাইয়া রহিল।

"কিছু মনে করবেন না; আমি আপনাকে গ্রীমস বলে মনে করেছিলাম। না আমার দরকার কিছুই নেই। আপনাকে ধন্যবাদ!"

বালিকা আগন্তুকের প্রতি সম্মান সহকারে মাথা নোয়াইল। জ্যাকের মুখের উপর পার্শ্বস্থিত আলোকের রশ্মি পড়িয়াছিল। সেই আলোকে মলি দেখিল, আগন্তুক সুশ্রী যুবক। তাহাকে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি এস্থলে সম্পূর্ণ অপরিচিত?"

"হাঁ।" জ্যাক বাস্তবিকই তখন আপনাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়াই অনুভব করিতেছিল।

মলি তাহার প্রতি আবার সম্মান দেখাইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে গির্জ্জার ভিতর দিকে প্রবেশ করিল। জ্যাক কৌতুহল সহকারে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর গির্জ্জার প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া সে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

বাড়ীর ফটকে আসিয়া সে একটু থামিল। ভাবিল যদি তাহার পিতা তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়া গিয়া থাকেন ও বিষয় সম্পত্তি আর কাহাকেও দিয়া থাকেন, তা'হলে সে সংবাদ বর্ত্তমান মালিকের নিকট হইতে লওয়া দুজনের পক্ষেই সুবিধাজনক নহে!

বিশেষ অনিচ্ছার সহিত সে দ্বিতীয়বার সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং পাহাড় পার হইয়া সহরে গিয়া পৌঁছিল। কারখানার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে সে কলবাড়ীর ভোজঘরে আলো জ্বলিতেছে দেখিতে পাইল। সে বাড়ীতে এখন কে বাস করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য তাহার বড়ই কৌতুহল হইল। ঐ বাড়ীতেই তাহার জন্ম। ঐ স্থানের প্রতি তাহার স্বাভাবিক আসক্তি এই কৌতুহলকে আরও জাগাইয়া তুলিল। সে চিন্তিত ভাবে ঘরের দিকে তাকাইয়া আছে, এমন সময় ঘরের দরজা খুলিয়া এক লম্বা রোগা যুবক বাহির হইয়া আসিল। সে জ্যাকের এত গা ঘেসিয়া চলিয়া গেল, যে আর একটু হইলেই দুজনের গা ঠেকাঠেকি হইয়া যাইত। কিন্তু যুবক গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া মাথা নীচু করিয়া চলিয়াছে, জ্যাকের প্রতি একবার তাকাইয়াও দেখিল না।

জ্যাক ভাবিল,—"হয়ত কারখানার নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষ হবে। দেখছি এর মধ্যে সবই পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে।"

এই রাস্তারই একটু দূরে একটি পুরাতন ধরণের বাড়ী সে দেখিতে

পাইল। বাড়ীর সম্মুখেই মাঠ। মঠটি কাঠের খুটি ও লৌহ শিকলের দ্বারা বেষ্টিত।

বাড়ীর দরজায় তাম্রফলকে মিঃ গ্রেঞ্জারের নাম খোদা রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া জ্যাকের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল।

সে দরজার নিকটে গিয়া দরজায় ঘা মারিল। একজন সুসজ্জিতা দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। জ্যাক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মিঃ গ্রেঞ্জার বাড়ী আছেন ?"

জ্যাকের পোষাক পরিচ্ছদ সামান্য হইলেও তাহাকে দেখিলেই ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। দাসী সসম্ভ্রমে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হাঁ, তিনি বাড়ী আছেন, আপনার নাম কি ?"

জ্যাক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"ডগলস্।"

দাসী তাহাকে মিঃ গ্রেঞ্জারের পাঠাগারে বসিতে বলিয়া প্রভুকে খবর দিতে গেল। জ্যাক ইতিমধ্যে ঘরটির চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়া লইল। দেওয়ালে তাহার পিতার এক বড় তৈল চিত্র ও ব্রামলে বংশের তিন চারজনের ছোট ছোট ছবি সংলগ্ন রহিয়াছে। জ্যাক একদৃষ্টে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; এমন সময় বৃদ্ধ এটর্ণী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঘরে আলো তত জোর ছিল না; মিঃ গ্রেঞ্জার আগন্তুককে প্রথম চিনিতে পারিলেন না।

মিঃ গ্রেঞ্জার ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান ? বসুন, চেয়ারে বসুন।"

জ্যাক চেয়ারে বসিয়া স্থির কৌতূহলপূর্ণ নয়নে বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া রহিল। শেষে বলিল,—"মিঃ গ্রেঞ্জার' আপনি আমাকে চিনিতে পারছেন না ?"

তিনি চসমার ভিতর দিয়া তাহার দিকে তাকাইলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"মিঃ ডগলাস্, আপনার নাম ? এ নাম ত আমার পরিচিত বলে মনে হয় না। আপনার কণ্ঠস্বর যেন চেনা বলে মনে হচ্ছে,—বাঃ ! এ যে উইলফ্রেড কার্টন !" তিনি আনন্দ ও বিস্ময়ের সহিত চেচাইয়া উঠিলেন। এবং নিজের হস্ত প্রসারিত করিয়া আন্তরিক প্রীতির সহিত জ্যাকের করমর্দ্দন করিলেন।

"নিশ্চয়ই, এখন আপনাকে বেশ চিনতে পেরেছি; কিন্তু আপনার কি

অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে! মিঃ উইলফে্ড—না, না, স্যার উইলফ্রেড, আপনি কিছু মনে করিবেন না—আপনাকে একদম চিনবারই যো নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত গাম্ভীর্য্যও ঢের বেড়েছে দেখছি। আপনাকে দেখে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। এখানে কখন পৌঁছিলেন? পানাহার হয়েছে?"

জ্যাক মাথা নাড়িয়া জানাইল,—"হাঁ। আমি আহার করেছি; আপনাকে ধন্যবাদ!"

"এক গ্লাস মদ আসুক; আপনাকে দেখে বড় ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে।"

তিনি চাকরকে মদ আনিতে বলিয়া নিজের চেয়ারখানি জ্যাকের চেয়ারের পাশে টানিয়া লইয়া গেলেন!

"এতদিন পরে আপনি ফিরে এসেছেন। আপনাকে দেখে আমি বড়ই সুখী হয়েছি; আমার মনের ভারও অনেকটা লাঘব হয়ে গেছে। আমার চিঠি পেয়েছিলেন?"

জ্যাক মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না।"

"পান নি? আমি মিনট্রোনার ঠিকানায় পত্র পাঠিয়েছিলাম।"

"বোধ হয়, আপনার পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি সেস্থান ত্যাগ করি।"

"স্যার উইলিয়ামের পত্র পেয়েছিলেন ত?"

জ্যাক হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষে আনন্দ, আরাম ও কৃতজ্ঞতার ত্রিবিধ চিহ্ন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল; সে বলিল,—"না, তাঁর পত্রও ত পাই নাই। তিনি কি তা হ'লে আমাকে পত্র লিখেছিলেন? সে সৌভাগ্য কি আমার হয়েছিল?"

"তিনি পত্র লিখেছিলেন—মিনটোনের ঠিকানায়।"

জ্যাক তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনি কবে লিখেছিলেন?"

"গত বৎসর। আমি পত্রের ঠিক তারিখও বলে দিতে পারি।"

জ্যাক মৃদুস্বরে বলিল'—"আমি সে পত্রও পাই নাই।"

"ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! চিঠি না পাওয়ার কারণ ত কিছুই বুঝিতে পারছি না। আর চিঠি যদি আপনার হাতে পৌঁছিল না, তা হলে পোষ্ট আফিসের মারফৎ আবার ফিরে আসা উচিত ছিল।"

জ্যাক আরও মৃদুস্বরে বলিল—"আমার পিতা তা হলে নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিলেন, যে আমি তাঁর পত্র পেয়েও উত্তর দিই নাই।"

মিঃ গ্রেঞ্জার অনিচ্ছাসহকারেও জ্যাকের কথায় সম্মতি জানাইলেন। বলিলেন,—"আমারও সেরূপ আশঙ্কা হয়। এ বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা! আপনি সে সময় মিনটোনাতেই ছিলেন, বোধ হয়?"

"হাঁ ছিলাম। চিঠি সেখানে পৌঁছিলে নিশ্চয়ই আমার হস্তগত হত।"

"আমি ত ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। অথচ ঘটেছে তাই। আর—"

তিনি একগ্লাস মদ ঢালিলেন,—"আপনি কি আপনার পিতার উইলের কথা, বিষয় সম্পত্তি বিলির কথা কিছু শুনেছেন?"

"না, আমি এক খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যুসংবাদ মাত্র পড়েছি। সে কাগজখানা দৈবাৎ আমার হাতে আসে। তার পরদিনই বাড়ী যাত্রা করি। কাহারও সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কোন সংবাদও আমি পাই নি; আপনার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম—"

মিঃ গ্রেঞ্জার তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"তাই আমার কাছে এসেছেন। স্যার উইলফ্রেড, আপনি এখানে এসেছেন, ভালই হয়েছে। ব্যাপার যে রকম, তাতে পৈতৃক ভবনে ঢুকতে আপনার ইচ্ছা হবে না।"

"ব্যাপারটা কি শুনতে পাই?"

মিঃ গ্রেঞ্জার তাহার মদ্যপাত্র আবার পূর্ণ করিয়া দিলেন; কিন্তু জ্যাক তাহা পান না করিয়া একপাশে সরাইয়া রাখিল। বলিল,—"না, আর না; আপনাকে ধন্যবাদ। ক'বছরের মধ্যে আমি এই প্রথম মদ্য পান করছি।"

"সত্যি নাকি? আপনার হাতে বোধ হয় টাকাকড়ি কিছু ছিল না। আমি সে কথা জানতে পারলে, আপনাকে টাকা পাঠাতে পারতাম।"

"আপনার সহৃদয়তা আমি জানি। তবে যাদের কাছে কাজ করছিলাম, তারাও খুব ভাল লোক। আমার কোনও অভাব রাখে নাই। এবার উইলের কথা বলুন।"

মিঃ গ্রেঞ্জার দাড়ীতে হাত দিয়া যুবকের সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট সুন্দর মুখের দিকে ভ্রূকুটির সহিত তাকাইলেন। বলিলেন,—"আমি যত সংক্ষেপে পারি, আপনাকে উইলের কথা বলছি, শুনুন।"

এই বলিয়া তিনি তাহাকে উইলের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন।

জ্যাকের মুখ একটু গম্ভীর ও শক্ত হইয়া উঠিল। এটর্ণীর নীরস কণ্ঠস্বর থামিবার পর সে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। পরে একটু হাসিয়া বলিল,—

"তাহলে আমি এখনও ত্যজ্য। অবশ্য এ কাজে আমি তাঁর একটুও দোষ দেখিনে। তিনি ঠিকই করে গেছেন। আমি তাঁর কুপুত্র ছিলাম—"

মিঃ গ্রেঞ্জার আলোচনার স্রোত অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বলিলেন,—"অবশ্য দোষ দুদিকেই; কিন্তু আপনার পিতা যে পরে আপনার সব দোষ ভুলে গিয়ে আপনাকে ক্ষমা করবার জন্য ইচ্ছুক হয়েছিলেন, এমন কি বড়ই উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন, একথা আমি নিশ্চয় বলতে পারি। আপনাকে যখন পত্র লিখেছিলেন, তা হতেও আপনি সে বিষয় বেশ বুঝতে পারছেন!"

জ্যাক উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"সেই চিন্তাই এখন আমার তীব্র অনুতাপের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। আমি তাহলে এখন আসি—"

মিঃ গ্রেঞ্জার কাতর ভাবে তাঁহার হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং একটু রাগান্বিত হইয়া বলিলেন,—"এ কি? এ ব্যাপারটাকে এভাবে নিলে চলেবে কেন? আপনি এমন ভাবে চলে যাচ্ছেন, যেন সব কাজই শেষ হয়ে গেছে।"

জ্যাক সরলভাবে উত্তর করিল,—"কাজ কি শেষ হয় নাই?"

তিনি সজোরে উত্তর করিলেম,—"না এখনও শেষ হয় নাই; আপনি নিশ্চয়ই উইলের মর্ম্ম সম্যক বুঝিতে পারেন নাই। আপনি দেখতে পারছেন না, যে এই সম্পত্তির অধিকারী হতে গেলে, আপনাকে কেবল আপনার পিতার ইচ্ছা, এই উইলের সর্ত্ত অনুসারে কাজ করিতে হবে। অবশ্য এটাও স্বীকার করি যে, এ সম্পত্তি বিনা সর্ত্তে আপনাকেই দাওয়া উচিত ছিল।"

জ্যাক তাহার উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় এটর্ণীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া সোজা-ভাবে বলিল,—আপনি বলতে চান যে, আমি এই যুবতীকে বিবাহ করে, বিষয়ের অধিকারী হব?"

মিঃ গ্রেঞ্জার নির্ভয়ে জোরের সহিত প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"নিশ্চয়ই। আরও দেখুন, উইলের সর্ত্ত পালন করা এমন কঠিন ব্যাপার নহে। এরূপ অবস্থায় সকলেই মনে করেন যে, এই সর্ত্ত থাকায় বিষয়ের মূল্য আরও ঢের বেড়ে গেছে। আপনার হয়ত মিসেস ব্রামলিকে মনে না থাকতে পারে!

জ্যাক এমন ভাবে তাকাইল, যেন রমণীকে স্মরণ করিবার সে চেষ্টা করিতেছে। পরে তাহার মাথা নাড়িল।

"তাঁকে আপনার স্মরণ নেই। একথা নিশ্চয়ই সত্য। আমি স্থির বলতে

পারি, তাঁর অপেক্ষা সুন্দরী বালিকা আমি এ অঞ্চলে জীবনে কখনও দেখি নাই। আমি বেশ বলতে পারি, আপনি যদি তাঁর সঙ্গে আবার আলাপ পরিচয় আরম্ভ করেন,—"তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন। দেখিলেন, জ্যাক উঠিবার জন্য জামার বোতাম আঁটিতেছে। তাহার ওষ্ঠে চক্ষে ভীষণ হাসি খেলিয়া বেড়াইতেছে। "দেখবেন, যেন নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করবেন না।"

"সে কথা আমি ঠিক বলতে পারি না। তবে, একথা জোর করে বলতে পারি যে, সুন্দরী হউক আর নাই হউক, আমি এত নীচ নহি যে কাহাকেও বিবাহ করে আমি ইংলণ্ডের সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হব।"

এই কথা শুনিয়া মিঃ গ্রেঞ্জার বড়ই রাগিয়া গেলেন।

"আচ্ছা দেখুন—" তিনি পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু জ্যাক তাঁহাকে হঠাৎ এক প্রশ্ন করিয়া থামাইয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, আমি যদি বিবাহের প্রস্তাব করি আর মিস ব্রামলে আমাকে বিবাহ করতে অসম্মত হন, তাহলে তিনি কি এ বিষয় হতে বঞ্চিত হবেন?"

"মিঃ গ্রেঞ্জার তাঁহার ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন। রাগের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি যে নির্ব্বুদ্ধিতা ও উন্মত্ততার পরিচয় দিতে প্রস্তুত হয়েছেন, তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি?"

জ্যাক শান্তভাবে বলিল,—"সে কথা আপনি ছেড়ে দিন। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।"

"হাঁ তিনি বঞ্চিত হবেন। এতদূর আপনার মনের উদ্দেশ্য, আমি বেশ বুঝতে পারছি।"

জ্যাক তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনিই বা কি করবেন ঠিক করেছেন? আপনি না বল্লেও আপনার মুখ দেখেই স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে, তিনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই এবিষয়ে অঙ্গীকার করেছেন। আপনি আমাকে এতই নীচ ভাবেন না, যে সম্পত্তির লোভে আমি তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে তাকে বিষয়চ্যুত করবো? আমা হতে একাজ নিশ্চয়ই হবে না। আমি স্থির সিদ্ধান্ত করেছি, মিস ব্রামলের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করব না।"

মিঃ গ্রেঞ্জার ঘরের ভিতর দুএক পদ পায়চারী করিতে লাগিলেন। পরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জ্যাকের উন্নত মূর্ত্তির দিকে রাগ ও অসহিষ্ণুতার সহিত তাকাইয়া বলিলেন,—"আমার বরাতে এত কষ্টভোগ, এত দুশ্চিন্তা কেন? এই বৃদ্ধবয়সে দুজন ছেলেমানুষ নির্ব্বোধ নিয়ে আমার কাজ। দু ই সমান

নির্ব্বোধ, কিন্তু—"একটু হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"ভগবানের দয়া। অন্ততঃ এক বছর আপনি এরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করতে পারবেন না। তত দিনে হয়ত সৌভাগ্য বশতঃ আমার মৃত্যুও ঘটিতে পারে। আমাকে তখন এ সব আর দেখতে শুনতে হবে না; আর যদি বেঁচেই থাকি, তাহলে যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে আপনার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে, দেখ্‌তে পাই।

জ্যাক কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর টেবিলের কাছে গিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বলিল,—"আমাকে আমার মনোভাব কাগজে কলমে লিখে দিতে অনুমতি দিন।"

একখানা চিঠির কাগজ লইয়া সে তাড়াতাড়ি অথচ ধীর ভাবে লিখিতে আরম্ভ করিল। মিঃ গ্রেঞ্জার বিদ্রুপের সহিত হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"আপনি এখন ত্যাগ পত্র লিখে দিতে পারেন না। বার মাস না গেলে এ সম্পত্তি ত্যাগ করবার অধিকার আপনার নাই। কেন, বৃথা একষ্ট স্বীকার করছেন? যাহোক, আপনার পিতা তাঁর অস্বাভাবিক দানপত্রে এই এক বুদ্ধিমানের ন্যায় কাজ করে গেছেন। ব্যস্ত হবার দরকার নাই। এখনও যথেষ্ট সময় আছে, মাথা ঠাণ্ডা করে—অবসর মত ভেবে দেখবেন।"

জ্যাক লেখা শেষ করিয়া কাগজখানি তাঁহার হাতে দিল। কাগজখানি পড়িয়া মিঃ গ্রেঞ্জারের মুখ হইতে বিশ্বাসের হাসিটুকু দূর হইয়া গেল। তিনি বিস্ময়সূচক ভ্রুকুটি করিলেন।

জ্যাক ত্যাগপত্র লিখিয়া পত্রের তারিখ তাহার পিতার মৃত্যুর তের মাস পর দিয়াছে।

বৃদ্ধ মস্তক নাড়িয়া বলিলেন,—"স্যার উইলফ্রেড" এ বড় চালাকি খেলেছেন বটে, কিন্তু—"তিনি পত্রখানি হাতে করিয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন।

"থামুন; আপনি যদিও লেখা নষ্ট করে ফেলেন, তাহলে আমি আর একখানি মিস ব্রামলেকে ডাকে পাঠিয়ে দেব।"

মিঃ গ্রেঞ্জার কাগজটুকু আর আগুণে ফেলিয়া দিলেন না। এই অদ্ভুত যুবকের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিলেন,—"দেখছি নিজের গলায় নিজে ছুরী বসাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। আর আমিও সাধ্যমত আপনাদের দুইজনকেই এই

কাজে বাধা দিতে সঙ্কল্প করেছি। স্যার উইলফ্রেড, মনে করে দেখুন, আমি আপনার পিতার এটর্ণী ছিলাম, ব্রামলে বংশেরও সব কাজ করে এসেছি। অতীতের সেই সম্মান আজ আমাকে বজায় রাখতে হবে। আমার কর্ত্তব্য আমাকে সম্পাদন কর্‌তে হবে এবং যদি সম্ভবপর হয়, তাহলে এই দুজন নির্ব্বোধ তরুণবয়স্ক যুবক যুবতীকে দুঃখময় জীবন যাপনের যন্ত্রণা ভোগ হতে রক্ষা করবো।"

"আপনাকে এত বিরক্ত করলাম, বিবাহ করতে অস্বীকার করে আপনার মনে কষ্ট দিলাম, এসবের জন্য আমি বড়ই দুঃখিত আমাকে এখন যেতে দিন।"

মিঃ গ্রেঞ্জার দ্রুতপদে সেঘর হইতে বাহিরে গেলেন এবং কয়েকমুহূর্ত্ত পরে আবার ফিরিয়া আসিলেন।

"আমি মিস ব্রামলের এখনকার একটা ফটো খুঁজিতে গিয়াছিলাম। আপনি তাঁকে বাল্যকালে দেখেছেন, তখন তাঁর শরীরের গঠন সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে নি; এখন তাঁহার চেহারা একেবারে বদলে গেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁর ফটোখানি দেখতে পেলাম না।"

"অবশ্য ফটো দেখতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তাতে আমার মতের কিছুই পরিবর্ত্তন হবে না। আমি বলি, ও অপ্রীতিকর বিষয় নিয়ে আর আমাদের মধ্যে আলোচনা করবার দরকার নেই। আমি যেমন অলক্ষিতে অপরিচিতের ন্যায় এ দেশে এসেছিলাম, সেই ভাবেই এ স্থান ত্যাগ করে যাব। তবে একটু হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি, সেকথা স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য বিষয় সম্পত্তি বা অর্থের বিষয় আমি বিশেষ কিছু চিন্তা করি নাই, তার জন্যে দুঃখও করছি না; আর এ কষ্ট এত তীব্র নহে যে, তা সহ্য করতে না পেরে জীবনের সব আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিব। সে দেশে উন্নতি হবারও আমায় বিশেষ সম্ভাবনা আছে; সেখানেই ফিরে গিয়ে নিজের কাজে মন দেব।

জ্যাক অষ্ট্রেলিয়ায় ফিরিয়া যাইবার কথা বলিল। মি গ্রেঞ্জার কাতর ভাবে বলিলেন,—"না, এখনি যাবেন না; কিছুদিন ইংলণ্ডে থাকুন।"

"না, ইংলণ্ডে থাকা হতে পারে না; আমাকে সেখানে যেতেই হবে।"

বৃদ্ধ রাগে রুক্ষ কথা বলিয়া ফেলিলেন। এমন কর্কশ কথা সহজে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। মানসিক চিন্তায় তিনি একটু

অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গিয়াছিলেন। বিস্ময়ের সহিত বলিলেন;—"এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা, নির্ব্বোধ শিশুরই উপযুক্ত। আমি যখন আপনার এটর্নী, তখন আমার নিকট থেকে কিছু টাকা ধার করে আপনি কিছুদিন ইংলণ্ডে থাকুন। আপনি বোধ হয় আমার এ প্রস্তাবে অস্বীকার করবেন না ?"

জ্যাক অনিচ্ছা সহকারে উত্তর করিল,—"তা বেশ, আমি আপনার কাছ থেকে পঞ্চাশ পাউণ্ড ধার করব, যতদিন না সেই টাকা খরচ হয়ে যায়, ততদিন আমি ইংলণ্ডে থাকতে প্রতিজ্ঞা করছি। তাহলে এখন আসি, আপনাকে এত কষ্ট দিলাম বলে বড়ই দুঃখিত—হাঁ, আর একটা কথা, আমি যে এখানে এসেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করেছি, একথা বোধ হয় কাহাকেও বলবেন না।"

মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া মিঃ গ্রেঞ্জার তাহার কথায় সম্মত হইলেন। বলিলেন "আচ্ছা, এ প্রতিজ্ঞা আমি করছি, আপনি যে এখানে এসেছিলেন, সে কথা কেউ জানবে না।" তিনি আরও ভাবিলেন, যদি তিনি মিস ক্লাইটিকে বলেন যে, স্যার উইলফ্রেড তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন, তাহলে তিনি যে মিস্ ক্লাইটিকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, একথাও বাহির হইয়া পড়িবে।

"হাঁ, আর একটা কথা, আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার আছে। আপনি বল্লেন, আমার পিতা কারখানাটা আমার জ্ঞাতি ভাই হেসকেথ কার্টনকে দিয়ে গেছেন। হেসকেথ কেমন ধরণের লোক ?"

মিঃ গ্রেঞ্জার ভ্রূকুটী করিলেন। বলিলেন,—"কি রকম লোক ? খুব চতুর যুবক, কাজকর্ম্মে খুব মাথা; কারখানা থেকেই তাঁর উন্নতি হবে।

জ্যাক আনন্দ সহকারে বলিল,—"তিনি ইহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমি তাঁকে কখনও দেখি নাই, আমার অবর্ত্তমানে তিনিই বোধ হয় আমারই স্থান অধিকার করেছিলেন। বাবা তাঁকে কারখানা দিয়ে খুব ভাল কাজই করেছেন। তাহলে এখন আমি আসি।"

মিঃ গ্রেঞ্জার জ্যাককে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ দরজায় দাঁড়াইয়া তাহার লম্বা সুগঠিত মূর্ত্তি রাস্তার উপর দিয়া যাইতে দেখিলেন। পরে ভোজন ঘরে ঢুকিয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকাইয়া তাহার বিষয়ই ভাবিতে লাগিলেন। মনুষ্য চরিত্র তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেন।

স্যার উইলফ্রেড যে একজন সচরিত্র যুবক, তাঁহার সহিত অল্পক্ষণ কথা কহিয়াই তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মুখে, চোখেও কণ্ঠস্বরে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের চিহ্ন মাত্রও নাই। তিনি সর্ব্বাংশেই পিতার উপযুক্ত পুত্র; তাঁহার উপাধি, বিষয় সম্পত্তি ও ধনরত্নের উপযুক্ত মালিক এবং মিস ক্লাইটি ব্রামলের ন্যায় রমণীরত্নের স্বামী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত!

তিনি অধীরভাবে দুঃখের সহিত বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"নির্ব্বোধ একগুঁয়ে তরুণবয়স্ক যুবক!" তাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার প্রতি বড়ই অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ দ্বারদেশের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পথে লোকের পদ শব্দ শুনাগেল। দাসী ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল,—"মিঃ কারটন এসেছেন। বল্লেন, বিশেষ দরকার আছে। আমি তাঁকে পাঠাগারে বসতে বলেছি।"

মিঃ গ্রেঞ্জার মনে মনে একটু হাসিলেন। আর কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আসিলে, দুই ভায়ে সাক্ষাৎ হইত। তিনি অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে একটু অপেক্ষা করিলেন। স্যার উইলফ্রেডের চিন্তাতেই তিনি নিমগ্ন, অপর বিষয়ে মনোযোগ দিতে তত উদ্‌গ্রীব নহেন। পরে পাঠাগারে গিয়া দেখিলেন, হেসকেথ টেবিল হইতে অনেক দূরে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

যথাসাধ্য অভিবাদনের পর হেসকেথ বলিলেন,—

"এখন, আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি বলে বড়ই লজ্জিত; কিন্তু কি করি, বড় জরুরি কাজ।"

"তার জন্য আর কি? আপনাকে দেখে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলাম। আশা করি, আপনি এখন একটু সুস্থ হয়েছেন।" এই কথা বলিয়া তিনি হেসকথের পাংশুমুখ ও জীর্ণ ওষ্ঠদ্বয়ের প্রতি তাকাইলেন।

"এখন বেশ সুস্থ হয়েছি; আপনাকে ধন্যবাদ! কারখানার সম্মুখে ব্রাউনিদের যে সম্পত্তিটা আছে, সেটা কিনতে পারলে বড় সুবিধা হয়। তাদের টাকার বড় দরকার এবং এখন একটা যুক্তি সংগত প্রস্তাব করলে—"

তাঁহারা দুজনে বসিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে মিঃ গ্রেঞ্জার বলিলেন,—"আমি কালই তাদের কাছে যাব। আপনি বসুন। একটু মদ্যপান করে যান।"

হেসকেথ কার্টন বিনীত ভাবে পানে অসম্মতি জানাইলেন। মিঃ গ্রেঞ্জার

দরজা খুলিয়া দিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইয়া চাকরকে ডাকিলেন। হেসকেথ চলিয়া গেলে, তিনি চেয়ারে ঠেসান দিয়া বসিয়া শূন্যদৃষ্টিতে সম্মুখে তাকাইয়া রহিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"খুব কাজের লোক। দুজনের মধ্যে এ বিষয়ে কত পার্থক্য! ও, বড় মনে পড়ে গেল, উইলফ্রেড যে ত্যাগপত্র লিখে দিয়ে গেল, সেটা গেল কোথায়? সেটা সাবধানে রাখতে হবে, বা নষ্ট করে ফেলতে হবে। কি করা যায়?

তাড়াতাড়ি উঠিয়া টেবিলের উপর যেখানে সেই পত্রখানি ফেলিয়াছিলেন, সেখানে খুঁজিতে লাগিলেন। সেখানে পত্র নাই। নানাপ্রকার দলিল কাগজপত্রাদি উল্টাইয়া দেখিলেন। কিন্তু সে কাগজ কোথায়, যাহার দ্বারা উইলফ্রেড এই বিশাল সম্পত্তি, বিপুল ধনরত্ন স্বেচ্ছায় লোষ্ট্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছেন? তিনি টেবিলের উপর যেখানে কাগজখানি রাখিয়াছিলেন, সেদিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

"এই বড়ই আশ্চর্য্য!" মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমি শপথ করে বলতে পারি, ঐখানেই সেখানি রেখেছিলাম। যখন মিস ব্রামলের ফটো খুঁজতে যাই, তখনও আমি সেটা ওখানে দেখেছিলাম। ওঃ!" এ সময় একটা কথা তাঁহার মনে পড়িয়া তাঁহার মুখ হইতে অন্ধকার দূর হইয়া গেল। তিনি একটু হাসিলেন।

"তাই হয়েছে! নিশ্চই তাই। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর বোধ হয় উইলফ্রেড তাঁর মনের ভাব পরিবর্ত্তন করে কাগজখানি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।" তখন ছেঁড়া কাগজ ফেলিবার ঝুড়িটা হাতড়াইলেন, কিন্তু তাহার ভিতর কাগজের ছিন্ন অংশ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন "হয়ত বা পুড়িয়ে ফেলেছেন।" অগ্নিকুণ্ডের ভিতরটা একবার লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কয়লা বা ছায়ের মধ্যে উহা ভস্মীভূত করার কোন চিহ্নও ছিল না। "হয়ত বা মনের ভাব এত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হওয়ায় লজ্জায় সেটা সঙ্গে করেই লয়ে গেছেন। ঠিক, সেইটাই বিশ্বাস হচ্ছে। তাহলে দেখছি এখনও আশা আছে।"

হেসকেথ ধীর গম্ভীর পদ বিক্ষেপে তাঁহার বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া তিনি বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং চিন্তিত ভাবে আগুণের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তিনি তাঁহার বুক পকেট হইতে ভাঁজ করা একটুকরা কাগজ সযত্নে বাহির করিলেন। এই কাগজটুকু তিনি মিঃ গ্রেঞ্জারের পাঠাগারের মেজে হইতে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। জ্যাককে সঙ্গে করিয়া দরজায় পৌঁছিয়া দিবার সময় মিঃ গ্রেঞ্জার উহা মেজের উপরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। হেসকেথ কাগজটুকু টেবিলের উপর তুলিয়া রাখিবার জন্য মেজে হইতে কুড়াইয়া লইলেন, কিন্তু কাগজের উপর একবার চোখ বুলাইয়া উইলফ্রেড কার্টনের নাম দেখিয়াই তিনি আকৃষ্ট হইলেন। কাগজখানি আগাগোড়া ভাল করিয়া পড়িবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কাগজটুকু পড়িয়া তাহা হস্তগত করিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রথমে হয় নাই; প্রলোভন দুর করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলেন কিন্তু প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারিলেন না। কাগজে লিখিত কথাগুলির সহিত যে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত! তিনি সেটুকু পকেটের ভিতর গুজিয়া রাখিলেন।

বাড়ীতে আসিয়া দ্বিতীয়বার তিনি কাগজটুকু পড়িলেন। অক্ষরগুলি হিজিবিজি, সাধারণ কৃষকের হাতের লেখা যেমন হওয়া উচিত, ঠিক সেই রকমই। পত্রের ভাষাও তদনুরূপ।

"আমি, উইলফ্রেড কার্টন। মিস ব্রামলকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়া পিতার দানপত্রের সকল দাবি এতদ্দ্বারা ত্যাগ করিতেছি!" পত্রের তারিখ স্যার উইলিয়ামের মৃত্যুর তেরমাস পরে।

হেসকেথ কার্টন সেটুকুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগলে চিন্তা ও কল্পনার রেখা স্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া উঠিল।

"এ কাগজ ওখানে কেমন করে গেল?" তিনি বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন। কাগজখানি উল্টাইয়া আগুনের নিকট ধরিলেন।" ডাকে এসেছে? এটা ভাঁজ করা রয়েছে বটে। নিশ্চয়ই তাই হবে। তাহলে সে এ বিষয় স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে—কি নির্ব্বোধ!"

তিনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মদ্যপাত্রের দিকে একবার তাকাইলেন।

"মহামূল্য দলিল; অতীব প্রয়োজনীয় কাগজ!" তিনি ইহা পুনর্ব্বার পড়িলেন। তারপর পত্রখানি খামে পুরিয়া গালা দিয়া সিল করিয়া দেয়াল সংলগ্ন সিন্দুকের ভিতর চাবি বন্ধ করিয়া রাখিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন সৌভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতিই ক্রমে প্রসন্ন হইতেছেন! (ক্রমশঃ)

নতুন জামাই।

লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

বাবা তুমি প্রথম শশুর বাড়ী যাচ্ছ, একটু সাবধানে সকল দিক বিবেচনা ক'রে কাজ কর্ব্বে। তাঁরা যেন মনে না করেন, যে পাড়া-গাঁয়ে জামাই, কিছু জানে না। হাজার হোক তুমি যে বনেদী ঘরের ছেলে, সেটা আচার ব্যবহারে ভাল করে বুঝিয়ে দিও।

সে জন্যে মা তুমি কিছু ভেবো না। কলকাতার ধরণ-ধারান যে আমি একবারে জানিনা তা নয়। এই ফি বছরেই ত বড়দিনের সময় দশ বার দিন করে কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি, তাতে সহুরে চাল-চলন অনেকটা বুঝে নিয়েছি।

হরিদাসের সবে দুই মাস হইল বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর এই প্রথম শশুর বাড়ী যাত্রা। শশুর বাড়ী কলিকাতায় শ্যামবাজার পল্লীতে। শশুর রমেশচন্দ্র ঘোষ অনিচ্ছা সত্বেই পাড়া গাঁয়ে আদরের কন্যা সুষমার বিবাহ দিয়াছেন। কি করিবেন, কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহস্থের সকল ইচ্ছা পূরণ হওয়া অসম্ভব! কলিকাতাতেই বিবাহ দিবেন ঠিক করিয়া ছিলেন, কিন্তু শেষে রমানাথ পুরেই বিবাহ দিতে হইল। মোটের উপর বনেদী ঘর, অন্নবস্ত্রের কষ্ট কখনও ভোগ করিতে হইবে না, এই যা সান্ত্বনা।

সাজসজ্জা সাঙ্গ হইলে হরিদাস মাতাকে প্রণাম করিয়া ষ্টেসনের অভিমুখে যাত্রা করিল। ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিবার জন্য মাতা চাকরকে সঙ্গে দিলেন। এবং ঘড়ি চেন আংটী ও টাকা কড়ি লইয়া পথে ঘাটে পুত্রকে বিশেষ সাবধান থাকিতে বলিবেন।

হরিদাস,ট্রেনে উঠিয়াই মাতার উপদেশ স্মরণ করিয়া হাতের আংটী ও সোনার ঘড়ি চেন সমস্ত পকেট হইতে বাহির করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিল। মনে মনে স্থির করিল, পথে এগুলি আর বাহির না করিয়া শশুর বাড়ীর কাছে গিয়া পরিয়া লইলেই চলিবে। তাহাকে যেন কেহ নেহাৎ পাড়া গেঁয়ে মনে না করে, মায়ের এই কথাটাই সমস্ত রাস্তা হরিদাসের মনে জাগিতে লাগিল।

যথা সময়ে ট্রেন কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া থামিলে, হরিদাস নামিয়া ঠিকাগাড়ির চেষ্টায় গেল। শ্যামবাজার যাইতে গাড়োয়ান

পাঁচ সিকা ভাড়া চাহিল। হরিদাস মনে করিল যে তাহাকে পাড়া গেঁয়ে ভাবিয়া গাড়োয়ান ঠকাইবার মতলব করিয়াছে। সে বলিল—তুমি কি আমায় নতুন লোক পেলে, যে শ্যামবাজার যেতে পাঁচ সিকে,—আমি বরাবর ত পাঁচ আনা ছয় আনা ভাড়ায় যাচ্ছি। হরিদাসের ক[illegible] শুনিয়া, "আরে কোথাকার পাড়াগেঁয়ে ভূত, পাঁচ আনায় শ্যামবাজার যাবে বলিয়া গাড়োয়ান অর্দ্ধচন্দ্র দিবার জন্য হাত বাড়াইলে, হরিদাস দৌড়িয়া পলাইয়া সে যাত্রা অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইল।

ষ্টেসন হইতে বাহর হইয়া হরিদাস ট্রামে উঠিয়া বসিল। ইচ্ছা রহিল শ্যামবাজারের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিয়া আনা চারেকে একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া শশুর বাড়ী পৌঁছিবে। ট্রাম শ্যামবাজারের ডিপোয় পৌঁছিলে, সকল লোকের সহিত হরিদাসও নামিয়া পড়িল। বাড়ী হইতে সকালে ১০টার সময় খাইয়া যাত্রা করিয়াছে, আর এখন প্রায় সন্ধ্যা ৬টা বাজিয়াছে। বাড়ীতে হরিদাসের এ সময়ের মধ্যে ২।৩ বার জলযোগ হইয়া যাইত। নিকটেই বড় একখানা খাবারের দোকানের সম্মুখে খরিদ্দারের খুব ভিড়, ভিতরের বেঞ্চে বসিয়াও ৫।৬ জন জলযোগ করিতেছে। হরিদাস ভাবিল যে রূপ ক্ষুধা পাইয়াছে তাহাতে এইখানেই কিছু খাইয়া লওয়া ভাল। কি জানি ক্ষুধার তাড়নায় যদি শশুর বাড়ীতে বেশী করিয়া খাইয়া ফেলি, তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই পাড়াগেঁয়ে রাক্ষস বলিয়া ঠাট্টা করিবে। হরিদাস চার আনার খাবার লইয়া দোকানের ভিতরে খাইতে বসিল। সে যে সময় জঠরানল নিবৃত্তি করিতে ব্যস্ত, সেই সময়ে তাহার শশুর বাড়ীর ঝি, সেই দোকানে তাহারই জন্য মিষ্টান্ন লইতে আসিল। কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। খাবার লইয়া ঝি চলিয়া যাইবে, সেই সময়ে ভিতর হইতে হরিদাস বলিল "ওহে পানতুয়া বেশ হয়েছে, আর দুটো আমায় দাও ত। গলার স্বর শুনিয়াই ঝি থমকাইয়া দাঁড়াইল, দেখিল নতুন জামাইবাবু ঠোঙ্গা হাতে ভিতরে বসিয়া খাবার খাইতেছেন। এই ঝিই কনের সঙ্গে গিয়া হরিদাসের বাটীতে ৭ দিন কাটাইয়া আসিয়াছে। ঝি এই মজার সংবাদ সকলকে জানাইবার জন্য তিলমাত্র সেখানে অপেক্ষা না করিয়া বাড়ীর দিকে দ্রুত প্রস্থান করিল।

হরিদাস আহার সাঙ্গ করিয়া, পার্শ্বের বিড়ির দোকান হইতে একটা পয়সা ভাঙ্গাইয়া নগদ অর্দ্ধপয়সার বিড়ি কিনিয়া ধূমপান সুরু করিয়া দিল।

শ্বশুরবাড়ীতে এ সবের সুবিধাত হইবেই না, এই কারণে সব কটি বিড়িই সেইখানে সদ্গতি প্রাপ্ত হইল। বাকি অর্দ্ধ পয়সার পান কিনিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু হরিদাস স্থির করিল যে পান খাইয়া যাইবে না। সেখানে জানাইব যে আমি পান পর্য্যন্ত খাই না, তাহা হইলে অনেকটা খাতিরও পাওয়া যাইতে পারে। সহরে অনেক ছেলেই আজকাল পান তামাক খায় না। এটা হরিদাসের শোনা ছিল।

কিন্তু এত ঠিক করিলে কি হয়, বিধি যার প্রতি বাম তার কিছুতেই নিস্তার নাই। হরিদাস যখন রাস্তায় দাঁড়াইয়া একমনে বিড়ির ধুম পান করিতে-ছিল, সেই সময় তাহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক ফুটবল খেলিয়া ৮।১০ জন সঙ্গী সহ বাড়ী ফিরিতেছিল। সে দেখিতে পাইয়াছিল যে নতুন জামাই দাঁড়াইয়া বিড়ি খাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখা হাপ্ প্যাণ্ট পরা ছিল বলিয়াই সে হরিদাসের সহিত দেখা না করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

ধূমপান সাঙ্গ হইলে হরিদাস একখানি ভাড়াগাড়ি ঠিক করিল। মোড় হইতে বামে ফিরিয়া ৮।১০ দশখানি বাড়ীর পর তাহার শ্বশুর বাড়ী। গাড়োয়ান দ আনাতেই তাহাকে সেই বাটীতে পৌঁছিয়া দিতে রাজি হইল। হরিদাস ঠিক করিল, ভাড়াটা গাড়োয়ানকে অগ্রেই দিয়া রাখি, কত কি দিলাম কেহ জানিতে পারিবে না, আমাকে নামাইয়া দিয়াই গাড়ি চলিয়া আসিবে; সকলে মনে করিবে যে ষ্টেসন হইতে বরাবরই গাড়ি করিয়া আসিলাম। হরিদাস গাড়োয়ানের হাতে একটি আধুলি দিয়া বাকি ছয় আনা পয়সার জন্য হাত পাতিয়া আছে এমন সময় তাহার শ্বশুর রমেশবাবু ট্রাম হইতে নামিয়াই সম্মুখে জামাইকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সাধারণতঃ সন্ধ্যার পরই অফিস হইতে ফেরেন, কিন্তু আজ নতুন জামাই আসার কথা বলিয়া ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বেই আফিস হইতে চলিয়া আসিয়াছেন।

"এই যে বাবাজী এসেছ বলিয়া রমেশবাবু হরিদাসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! হরিদাস তাড়াতাড়ি তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি বলিলেন বাবাজী এটুকু আর গাড়ির কি দরকার, মিছে পয়সা খরচ। হরিদাস দ্বিরুক্তি না করিয়া শ্বশুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, তাহার আর আট আনা ফেরত লওয়া হইল না। গাড়োয়ান তখনও একটি একটি করিয়া পয়সা গুনিতেছিল, সে কিছুই জানিতে পারিল না।

গাড়ি চড়িয়া যাওয়াও হইল না, অথচ পয়সা গুলা বৃথা গেল। ভাবিতে

ভাবিতে হরিদাস চলিতেছিল। রমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন বাবাজী বাড়ীর সব খবর ভাল ত, হরিদাস অন্যমনস্ক ছিল, উত্তর করিল—না পয়সা কিছু দেইনি। শ্বশুর জামায়ের এইরূপ উত্তর শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন, আর কোন কথা বলিলেন না।

(২)

ঝিয়ের এবং পুত্রের মুখে গৃহিণী ও বাটীর অপর সকলেই জামাইয়ের আগমন বার্ত্তা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। কর্ত্তা জামাই সমেত বাটীতে প্রবেশ করিয়াই জ্যেষ্ঠা কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন প্রতিমা হরিদাস এসেছে। প্রতিমা উপর হইতেই বলিল সে আমরা অনেকক্ষণ আগেই খবর পেয়েছি। হরিদাস মনে মনে ভাবিল, তাইত খাবারের দোকানে কেহ দেখে নাই ত।

আংটী ঘড়ি চেন হরিদাসের টেঁকেই রহিয়া গেল, পরিবার আর সুবিধা হইল না। জ্যেষ্ঠ শ্যালকের সহিত বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ গল্প করিবার পর, ভিতর হইতে জামায়ের ডাক পড়িল। হরিদাস তাড়াতাড়ি পকেট হইতে প্রণামির গিনি বাহির করিয়া লইয়া শ্যালকের সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ করিল।

ভিতরে প্রবেশ করিতেই হরিদাস দেখিল দালানের এককোণে চওড়া পাড় শাড়ী পরা একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। হরিদাস কোন কথা না বলিয়াই গিনিখানা সেই স্ত্রীলোকের পদতলে রাখিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই স্ত্রীলোকটা শশব্যস্তে সরিয়া গেল এবং কর কি কর কি বলিয়া শ্যালক গিনি খানি উঠাইয়া হরিদাসের হাতে দিল। হরিদাসের কেমন ভ্যাবাচাকা লাগিয়া গেল।

বাটীতে শাশুড়ী ব্যতীত আর কোন বয়স্থা স্ত্রীলোক নাই, ইহাই হরিদাসের জানা ছিল। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই সে প্রণাম করিল। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। গৃহিণী জামাই আসিবে বলিয়া কন্যাকে আলতা পরইবার জন্য নাপিত বৌকে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন নাপিত বৌ কাজ সারিয়া বাহির হইয়া যাইবে, সেই সময়ে জামাইও অন্দরে প্রবেশ করিল। হরিদাস ভুলক্রমে নাপিত বৌকেই প্রণাম করিয়াছে।

হরিদাস গিনি পুনরায় পকেটে পুরিয়া উপরে উঠিল। তাহার পা কাঁপিতেছিল, সকলই যেন কেমন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। উপরের ঘরে গিয়া বসিতে প্রথমে জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা আসিল, হরিদাস প্রণাম করিয়া

অতিসন্তর্পণে তাঁহার দুই চারিটি কথার উত্তর দিল। কিছুক্ষণ পরে শাশুড়ী আসিলেন হরিদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া, পকেট হইতে গিনি বাহির করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল তিনি জামাইকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে—বাবা বাড়ীর সব খবর ভাল, বেয়ান ভাল আছেন ত ইত্যাদি দু একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেলেন। শাশুড়ী চলিয়া যাইতেই পার্শ্বের ঘর হইতে ভীষণ হাস্যরোল উঠিল। সেই হাসিতে হরিদাসের অন্তর কিন্তু কাঁপিয়া উঠিল, বুঝিবা আবার কিছু ভুল হইয়া থাকিবে।

হরিদাস জলযোগ করিতে বসিল, বিভিন্ন পাত্রে নানারূপ ফল, নোনতা ও মিষ্টান্ন সজ্জিত, চার পাঁচ প্রকারের সরবৎও রহিয়াছে। প্রতিমা বলিল লজ্জা করবেন না, সব খেতে হবে। হরিদাস প্রত্যেক পাত্র হইতে সামান্য রকম কিছু খাইয়া উঠিয়া যাইতেছে এমন সময় একটি ছোট গামলা করিয়া ৬টি ৫০।৬০ পান্তুয়া ছোট শ্যালক হাসিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া গেল। শ্যালিকা বলিল—আপনি ত এটা খুব ভালবাসেন, একটিও ফেলতে পাবেন না। হরিদাসের চক্ষুস্থির, তবে কি ইহাঁরা আমার দোকানে খাওয়ার কথা জানিতে পারিয়াছেন, এত সেই দোকানের পানতুয়াই দেখিতেছি। হরিদাস হাত ধুইয়া উঠিয়া পড়িল। আচ্ছা পরে সব খেতে হবে, বলিয়া শ্যালিকা মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

প্রতিমা পানের ডিবা লইয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিবামাত্রই হরিদাস বলিল আজ্ঞে আমি ত পান খাই না। প্রতিমা বলিল তাও কি কখনও হয়, শ্বশুর বাড়ীতে এসে দুটা একটা পান খেতে হয়, হরিদাস কিন্তু কিছুতেই রাজি হইল না। গৃহিণী দরজার বাহিরে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি কন্যাকে ইসারায় ডাকিয়া বলিলেন জামাই যদি পান নাই খায়, তবে জোর করে খাওয়ান কেন। এমন সময় জ্যেষ্ঠ শ্যালক আসিয়া বলিল আচ্ছা পান না খান, ধূমপানের কিছু ব্যবস্থা করবো কি? হরিদাস বলিল আজ্ঞে ওসব আমার কখনও অভ্যাস নেই। "পাড়াগেঁয়ে অনেকে পান খায় না বলে, আবার কিন্তু ধূমপান করে, সেইজন্যই জিজ্ঞেস করছি" বলিয়া শ্যালক বাহির হইয়া গেল। তাহার কথাশুনিয়া হরিদাসের ভাল লাগিল না।

রাত্রে আহার করিতে বসিলে প্রতিমা হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিল,

"আমরা যে আংটি দিয়েছি সেটা কি আপনার আঙ্গুলে হয় না, পরেন নি কেন, মা বলছিলেন।" ঘড়িচেন আংটী তখনও হরিদাসের টেঁকে গোঁজা ছিল। শ্বশুরের সঙ্গে বাড়ী প্রবেশের সময় সেগুলি পরার সুবিধা হয় নাই, এবং পরেও আর বাহির করে নাই। কিন্তু শ্যালিকার কথার উত্তরে বলিয়া ফেলিল, আমি ওসব পরা তত পছন্দ করিনা, সে জন্যে সে সব আনিনি।

আহারের পরে হরিদাস বৈঠকখানায় বসিয়া শ্যালকদের সহিত গল্প করিতেছিল। যথা সময়ে শয়নের জন্য ডাক পড়িল। শয়ন ঘরের এক কোনে মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। হরিদাস দেখিল খাটের উপর মশারির ভিতর এক জন শুইয়া আছে। প্রতিমা আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া পরিবার জন্য হরিদাসকে এক খানা কাপড় দিয়া গেল এবং দরজা বন্দ করিয়া শুইতে বলিল। যাইবার সময় মশারি একটু তুলিয়া ভিতরের লোকটিকে কি কথাও বলিয়া গেল।

প্রতিমা বাহির হইয়া যাইলে হরিদাস দরজায় খিল লাগাইয়া দিল। কাপড় ছাড়িবার সময় অসাবধানতা বশতঃ ঘড়িচেন ও আংটী তিনটাই ঘরের মেঝেয় পড়িয়া গেল। হরিদাস শশব্যস্তে তুলিয়া দেখিল ঘড়ির কাচখানা ভাঙ্গিয়া সেটি শব্দশূন্য হইয়া গিয়াছে চেনটা ঠিক আছে। আংটীটি খাটের তলায় কোথায় প্রবেশ করিয়াছে, সন্ধান পাওয়া গেল না। হরিদাস মশারি উঠাইয়া বলিল, সুষমা একবার নেমে দেখত, আংটীটা কোথায় গেল। সুষমা কিন্তু কোন উত্তর দিল না। হরিদাস আবার বলিল তাহাতেও উত্তর মিলিল না। শেষে অল্প রাগিয়া, কাজের সময় আমি ওসব কলকাতার চাল ভাল বাসিনা। ঘড়িটাত চুরমার হয়ে গেল, এখন উঠে একবার আংটীটা খোঁজ—বলিয়া সুষমার অবগুণ্ঠন সরাইয়া হরিদাস বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া গেল। একি এযে একটি বালিসকে শাড়ী পরাইয়া ঘোমটা দিয়া রাখিয়াছে। সেই সময়েই খাটের তলা হইতে হরিদাসের কনিষ্ঠ শ্যালক হাসিয়া বাহির হইয়া, দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল। হরিদাস তখন ভাবিতে লাগিল। আমার আগেই দেখা উচিত ছিল সে সত্যই কোন লোক শুইয়া আছে কিনা।

অল্পক্ষণ পরেই, প্রতিমা সুষমার হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিল। এবং সুষমার হাত দিয়া হরিদাসের হাতে একটী আংটী পরাইয়া

দিয়া, অনেক রাত্রি হয়েচে শুয়ে পড়ুন বলিয়া বাহির হইয়া গেল। হরিদাস দেখিল এযে তাহারই আংটী।

কনিষ্ঠ শ্যালক খাটের নীচে লুকাইয়া থাকার সময়ই আংটীটা পাইয়াছিল, পরে সে বাহির হইয়া গিয়া তাহার দিদির নিকট সেটি দিয়াছিল।

হরিদাস চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। মনে মনে স্থির করল, সুষমা অগ্রে কথা না কহিলে সে কিছুতেই কথা কহিবে না। সুষমাও দরজা বন্ধ করিয়া আস্তে আস্তে শয়ন করিল। ১৫। ২০ মিনিট কাল কেহই কোন্ কথা কহিল না। হরিদাস যখন দেখিল যে সময়টা বৃথাই যাইতেছে, তখন বলিল—এ রকম করে আমাকে অপ্রস্তুত করা কেন? সুষমা ধীরে ধীরে উত্তর করিল "কি রকম!" "কি রকম আবার জাননা, এই একটা বালিশকে কাপড় পরিয়ে রেখে," সুষমা বলিল—"তা তোমার ভাল করে আগে দেখা উচিত ছিল, যে সত্যই কোন লোক শুয়ে আছে কিনা। আচ্ছা তুমি মাকে একটা আধলা দিয়ে প্রণাম করলে কি বলে।" "এঁ্যা তাই নাকি" বলিয়া হরিদাস উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আলো জালিয়া পকেটে হাত দিয়া দেখে গিনিটা যথাস্থানে রহিয়াছে। সে ভুলক্রমে বিড়িক্রয়ের সময় প্রাপ্ত চক্‌চকে আধলাটাই দিয়াছে। সেই জন্যই প্রণামের পরই হাস্যরোল শুনা গিয়াছিল।

হরিদাস বলিল,—তাই ত—বড় ভুল হয়েছে।

সুষমা বলিল,—কোনটাতে তোমার ভুল হয় নি, সবেতেই ত ভুল করেছ।

"কেন আবার কিসে ভুল দেখ্‌লে?"

"আচ্ছা, দোকানে বসে খাবার খাচ্ছিলে কেন। আমাদের ঝি সেই সময়ে দোকানে গিয়ে তোমায় দেখতে পেয়ে বাড়ীতে এসে বল্লে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তুমি বিড়ি খাচ্ছিলে তাও দাদা দেখে এসে দিদিকে বলছিল।"

হরিদাস দেখিল তাঁহার সকল বিদ্যাই জাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই জলযোগের সময় অত পানতুয়া হাজির হইয়াছিল, আর শ্যালক ধূমপানের কথা বলিয়াছিল। সুষমার কথার উত্তরে সে কি বলিবে, স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, "সেই কোন সকালে খেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, খিদে পেয়েছিল আর কি করি!"

তোমাদের পাড়াগেঁয়ে লোকের কিছু বুদ্ধি নেই, খিদে পেয়েছিল কৈশন

থেকে নেমেই কোনও দোকানে বসে খেয়ে নিলে হত, তুমি একবারে বাড়ীর কাছে এসে দোকানে খেতে বস্‌লে।

হরিদাস সুষমার মুখে "পাড়াগেঁয়ের" কথা শুনিয়া একটু চটিয়া গেল। বলিল,—জান আমি তোমার স্বামী, তুমিও আমাকে 'পাড়াগেঁয়ে' বল্‌ছ।

আমি কেন বলব, সকলে বলছিল, তাই বল্‌ছি, বাবা মাকে বলছিলেন—"আমি জামাইকে এক কথা জিজ্ঞেস করলুম, আর সে আর এক রকম উত্তর দিলে, পাড়াগেঁয়ে ছেলে একটু চালাক চতুর কম।" দিদি মাকে বলছিল "জামাইয়ের নামটাও বড় পাড়াগেঁয়ে ধরণের ও নামটা বদ্‌লাতে হবে!"

হরিদাসের রাগটা তখন আরও চড়িয়া গিয়াছে, সে বলিল,—আমি তোমার ও সব কথা আর শুনতে চাই না।

সুষমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল,—আচ্ছা তুমি দিদিকে কেন মিছে করে বললে যে আংটী আনি নি, আবার তা হলে কোথা থেকে বেরুলো।

হরিদাসের মাথা একবারে গরম হইয়া গিয়াছে, চুপ কর বলছি, বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতেও হাসির রোল শুনা গেল। হরিদাস বুঝিল যে বাহিরে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা তাহার কথা শুনিতে পাইয়াছে।

সুষমার আর কোন কথা কহিতে সাহস হইল না। হরিদাস স্থির করিল, এ বাটীতে আর থাকা হইবে না, ভোরে উঠিয়াই সকলের অজ্ঞাতে বাড়ীতে প্রস্থান করিব। এ রকম অপদস্ত হইয়া লোকের কাছে মুখ দেখান হইবে না। সুষমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। হরিদাসও ভাবিল এইবার একটু ঘুমাইয়া লই, খুব ভোরেই উঠিব।

হঠাৎ কি একটা শব্দে হরিদাসের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। হরিদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। সুষমা তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে। হরিদাস আলো জ্বালিয়া নিজের কাপড় জামা পরিল। ঘড়িটি পূর্ব্বেই অচল হইয়া গিয়াছে, কত বাজিয়াছে সে ঠিক করিতে পারিল না। শীঘ্রই ভোর হইবে মনে করিয়া আস্তে আস্তে খিল খুলিয়া নীচে নামিয়া গেল। সদর দরজা খুলিয়া যখন হরিদাস রাস্তায় বাহির হইল, তখনও বাড়ীর কেহ জানিল না, যে জামাই পলাইয়া যাইতেছে। রাস্তায় বাহির হইয়া যেন হরিদাস হাঁফ ছাড়িয়া

বাঁচিল। কিন্তু বরাত যার মন্দ তার কিছুতেই নিস্তার নাই। হরিদাস সবে মাত্র ৮।১০ হাত গিয়াছে, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে এক পাহারাওয়ালা দৌড়িয়া আসিয়া, "শালা তোম্ রোজ চোরি করকে ভাগতা হায়" বলিয়া বজ্র মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। উপস্থিত বিপদে সে যেন কিরূপ হইয়া গেল, বলিল—"আমি চোর নই, ও বাড়ীর লোক।"

"আচ্ছা শালা তোম্ সাধু হ্যায়, চল্"—বলিয়া পাহারাওয়ালা পুনরায় তাহাকে শ্বশুর বাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ইতিপূর্ব্বে রমেশ বাবুর বাড়ী পর পর দুই তিন দিন চুরি হইয়া গিয়াছিল। সে জন্য তিনি বিটের পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"হোলী, পূজা, বড়দিন সবমে তোম লোক্‌কো বক্‌সিস্ দেতা, তব্ বি হাম্‌রা কোঠিমে দোতিন রোজ চোরি হো গিয়া, তোম্ লোক কুচ্ খেয়াল রাখ্‌তা নেহি।" পাহারাওয়ালা উত্তরে বলিয়াছিল "আচ্ছা বাবুজী হাম আপ্‌কো কুঠীকা ওপর নজর রাখেগা।" সেইদিন হইতেই পাহারাওয়ালা রমেশবাবুর বাড়ীর উপর একটু বিশেষ নজর রাখিতেছিল। হরিদাস যখন বাড়ী হইতে বাহির হয়, তখন সে ৩।৪ খানা বাড়ীর পরে একটা রকে বসিয়াছিল এবং এত রাত্রে একজন অপরিচিত লোক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। রমেশ বাবুর বাড়ীর সকলকেই সে চিনিত।

হরিদাসকে ধরিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাহারাওয়ালা হাঁকিল "বাবুজী শালা চোরকো পাকড়া।" তাহার এক হাঁকেই কর্ত্তা গিন্নির ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কর্ত্তা বিছানার উপর হইতেই বলিলেন—মার ব্যাটাকে। গৃহিণী তাড়াতাড়ি আলো লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন। পুত্রও লাঠি লইয়া উপস্থিত হইল।

পাহারাওয়ালা উঠানের মাঝখানে চোরকে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চোর মুখ নত করিয়াছিল। চোরের মুখের কাছে আলো ধরিয়াই গৃহিণী—"ও মা এ যে নতুন জামাই বলিয়া পাঁচ হাত পিছাইয়া আসিলেন। পুত্রের হাতের লাঠিও খসিয়া পড়িল।

সাথী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক—শ্রীপরেশনাথ সরকার।

৮

যেবার কিরণ প্রেবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিল, সেইবার পিতা কিশোরী-মোহন তাহার বিবাহ দিলেন। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা জীবনবাবু ভিটামাটি বেচিয়া একমাত্র কন্যা তরুলতাকে সুখে রাখিবার জন্য, বড়লোক কিশোরীবাবুর পুত্রের হস্তে প্রদান করিলেন। জীবনবাবু বুঝিলেন না, কার্য্যটা সমান ঘরে না হইলে যদি কোন প্রকার একটু গোল একবার বাধিয়া যায়, তবে তাহার আর কিছুতেই প্রতিকার করা যায় না। তাঁহার পক্ষেও তাহাই হইল। সামান্য কিছু টাকা কড়ি লইয়া বিবাহের সময় কিশরী বাবু ও জীবনবাবুর মধ্যে ভয়ানক গোল বাধিল। ফলে সব দোষ গিয়া দাঁড়াইল নিরপরাধা তরুলতার উপর।

এ দিকে কিরণও তরুকে তেমনভাবে বুকের কাছে টানিয়া লইতে পারিল না। কিরণের বিশ্বাস ছিল লেখা পড়া জানা মেয়ে ছাড়া, স্ত্রী লইয়া সুখের সংসার পাতান অসম্ভব! সে দায় পড়িয়া তরুর সঙ্গে বসবাস করিত বটে, কিন্তু তাহার বুকটা ক্ষোভে ভরিয়া উঠিত। কিন্তু পিতার ভয়ে এতদিন কিছু বলিতে পারে নাই। যখন পিতার সহানুভূতি পাইয়া তাহার বিদ্রোহি হৃদয়ের বৃত্তি-গুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন সে প্রস্তাব করিয়া বসিল—তরুকে তাহার পিতার কাছে পাঠায়ে দেওয়া হ'ক!

মাতা বিনোদিনী বলিলেন, ও মা, সে কি কথা, আমার এমন লক্ষ্মী বউ!

কিশোরীমোহন বলিলেন,—এই কথা! আমি তোমাকে এমন বউ এনে দিচ্ছি, যার তুলনা নেই!

বিনোদিনী স্বামীকে চিনিতেন, তিনি আর কোন কথা বলিলেন না! তারপরে যে দিন তরুকে রাখিয়া আসিবার দিন আসিয়া পড়িল, সেই দিন তিনি শুধু বলিলেন,—বধূমাতা অন্তঃস্বত্তা! এমন ভাবে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া কি ভাল?

গম্ভীর মুখে কিশোরীমোহন উত্তর করিলেন—তুমি কি মনে কর এর যে সন্তান হবে, তার জন্য আমার বাড়ীতে এক মুঠাও ভাত আছে?

সাহস করিয়া বিনোদিনী আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তরুলতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—নিরপরাধীকে আজ আমরা তাড়িয়ে দিচ্ছি!

তরুলতা অশ্রুসিঞ্চিত নয়নে, কম্পিত-কণ্ঠে শ্বশ্রুমাতাকে প্রণাম করিয়া বলিয়া গেল,—না মা আমি নিজের কপাল সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি!

সেই হইতে তরুলতার কোন সংবাদ, কিশোরীমোহন, পুত্র কি স্ত্রী কাহাকেও রাখিতে দেন নাই! যখন তরু পিতার সেই দারিদ্র্য-পূর্ণ গৃহে একটি চাঁদের মত পুত্র সন্তান প্রসব করিল, তখন জীবন বাবু কিশোরীবাবুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রের কোন উত্তর দেওয়া কিশোরীবাবু সঙ্গত মনে করেন নাই। এমন কি পত্রখানি পাঠ করিবার পূর্ব্বেই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে জীবনবাবু স্বয়ং কিশোরীবাবুর বাসায় আসিলেন—তখন ভবানিপুরে কিশোরীবাবুদের বাসা ছিল—তিনি দারোয়ান দিয়া যথেষ্ট অপমান করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন— তাঁহাকে একটি কথাও বলিবার অবকাশ দিলেন না!

আজ বহুদিন পরে সহসা এমন ভাবে তরুলতাকে একটি শিশু কোলে করিয়া আসিতে দেখিয়া কিরণ বিস্মিত, চমকিত হইয়া উঠিল। মুখ দিয়া অলক্ষ্যে বাহির হইয়া পড়িল—একি—তরু?

তরুলতা পুত্রকে কিরণের পায়ের কাছে বসাইয়া দিল। মিষ্টান্নের থালাখানা একটু দূরে সরাইয়া রাখিয়া আসিয়া দুই হাতে কিরণের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—চিনতে পেরেছ?

কিরণ কোন কথা না বলিয়া পদতল হইতে শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইল।

তরু বলিল—চিনলে?

কিরণ—না!

কিরণ চুপ করিয়া রহিল! সেই যেদিন তরুলতাকে তাহাদের সংসার থেকে তুলিয়া ফেলেছে, সেই দিন হইতে আর তরুর কথা ভাবিবার স্পৃহা তাহার ছিল না। তবে আভাকে দেখিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটা কি জানি কেমন ভাব যখন তখন তাহার মনে উদিত হইত। তরুর প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারিল না।

তরু বলিল—আমায় ত্যাগ করেছ, কিন্তু তোমার খোকাকে তুমি নিয়ে

যাও। কিরণের বুকের উপর শিশুটি চুপ করিয়া বসিয়াছিল, হা করিয়া কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন কত কি দেখিতেছিল।

তরু বলিল—দেখত, তোমার মুখের দিকে কেমন ভাবে তাকিয়ে আছে! আশ্রয় হীন শিশুর মত তোমার কাছে আজ তোমারি সন্তান আশ্রয় ভিক্ষা চাইছে। ওকে ঠেলে ফেলনা!

দুই হাতে কিরণের পদযুগল বুকে চাপিয়া ধরিয়া তরু কাঁদিয়া ফেলিল! কিরণ ধীরে ধীরে তরুকে তুলিয়া লইল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল—এখানে কার কাছে আছ তরু?

তরুলতা বলিল—মাসীমা আর ভূপেন দাদা!

কিরণ বলিল—ভূপেন তোমার দাদা!

তরুলতা—হাঁ মাসতাত ভাই।

দুইজনেই নীরব হইল। তরু কিরণের ঘাড়ের উপর মাথা রাখিয়া বহু-দিনের নিরুদ্ধ অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। খোকা দুইহাতে কিরণের সার্টের বুতামগুলি খুলিয়া ফেলিতে ছিল।

মুক্ত বাতায়ন পথে সান্ধ্যসমীর মন্দ মন্দ হিল্লোলে বহিয়া আসিয়া তাহাদের অঙ্গে লুটাইয়া পড়িতেছিল।

কিরণ বলিল—তরু?

তরু—কি?

কিরণ—মনে পড়ে?

তরু—কি?

কিরণ—কতদিন এই ভাবে দুইজনে বসিয়া বসিয়া সমস্তটা রাত কাটায়েছিলেম।

তরুর কি তাহা ভুলিয়া যাইবার মত কথা। দীর্ঘ বিরহের স্বাদ যে পাইয়াছে, তাহার নিকট ক্ষুদ্র মিলনের দিনগুলিও এক একটা বিরাট ঘটনার মত স্পষ্ট স্মরণ হয়।

তরু বলিল—পড়ে।

কিরণ—তখন যদি এমনি করে আমার সঙ্গে কথা কইতে, এমনি আবেগে—

বলিতে বলিতে কিরণ থামিয়া গেল। তরু বলিল—বল বল এমনি আবেগে, কি বল, নিষ্ঠুর! বলতে বলতে থেমে গেলে! আমি যে কতদিন তোমার কথা শুনিনি!

কিরণ—যদি এমনি আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরতে, তবে বুঝি আমাদের এমন বিচ্ছেদ হত না!

তরু স্বামীর কাঁধের উপর হইতে মাথা না তুলিয়াই বলিল—তুমি আমার শিখিয়ে নিলে না কেন? আমি ত কিছু জানিনা, বুঝি না, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিলে না কেন?

কিরণ চুপ করিয়া রহিল!

তরু বলিল—আমার ভাগ্যে যা ছিল হয়েছে, এখন বল তোমার খোকার অবস্থা কি হবে! তোমার ছেলে তুমি নিয়ে যাও; আমি সে বোঝা বইব কেন?

কথাটা বলিয়াই সে কাঁপিয়া উঠিল, খোকাকে ছাড়িয়া তরু যে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিবে না; আর খোকা কি তাহার কাছে থাকিতে পারে! সে যে তাহার অঙ্গে বসন্তের সমীরণের চেয়েও মধুর স্পর্শ আনিয়া দেয়।

কিরণ বলিল—এখন আর সময় নেই।

তরু শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—কি, কি বল্‌লে?

কিরণ—প্রতিকারের আর কোন উপায় নেই!

তরু—কিন্তু এই ফুলের মত পবিত্র শিশু, এর অপরাধ কি?

কিরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, খোকাকে মেজের উপর বসাইয়া দিল, তরু দুইখানি সুকোমল বাহুপাশে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়া বলিল—বলে যাও, বলে যাও, নিষ্ঠুর! ওকে আমি কি করে মানুষ করব!

কিরণ শুধু বলিল—এখন আর সময় নেই তরু, কেন আগে তুমি এমনটি ছিলে না!

স্ত্রীর বাহুবন্ধন জোর করিয়া ছাড়াইয়া কিরণ তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পড়িল। তাহার পদযুগল কাঁপিতেছিল। দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

তরু পড়িতে পড়িতে নিজেকে সামলাইয়া লইল। তাহার দৃষ্টি পড়িল মিষ্টান্নের থালার উপর! হায় সে কি করিয়াছে, স্বামীর জন্য যাহা নিয়ে এসেছিল, তা'ত তাহার দেব সেবায় ব্যবহৃত হয় নাই! সে নিজের কথায় ব্যস্ত ছিল! এমনি ভাবেই তাহার নিশ্চল জীবন বহিয়া গেল! স্বামীকে সে উত্তেজিত করিয়া তাড়াইয়া দিল, তার পূর্ব্বে কেন সে অতটা অধীর না হইয়া তাহাকে ভোজন করাইল না। তাহার এমন ভুল কেন হইল।

জীবনে এমন দিন কি আর হইবে। সাহারায় কি এমন অমৃত ধারা আর বহিবে। পূজার লগ্ন যে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নিজের ভুলে, দেবতার চরণে অঞ্জলি দেওয়া হয়নি। সমস্ত জীবনের ব্যর্থ-অশ্রু যে তার জমাট হইয়া থাকিবে, কখনো ত আর তার পদতল ধৌত করিয়া দিতে পারিবে না।

তরু খোকাকে বুকে তুলিয়া লইল। খোকা মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তরু তাহাকে এত আবেগে জড়াইয়া ধরিল যে কে যেন তাহার নিকটে হইতে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। তারপর আসিয়া খাটের উপর শোয়াইয়া দিল; আর সমস্ত দিন পরে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বিহঙ্গিনী যেমন আপন শাবককে নিজের প্রাণের কাছে লুকাইয়া রাখিতে চায়,সেই ভাবে তাহাকে বুকের কাছে লইয়া শুইয়া পড়িল।

মাসীমা মনসা কিরণকে এমনভাবে নিচে নামিয়া যাইতে দেখিলেন, যাহাতে তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না ব্যাপার খানা কি দাঁড়াইয়াছে, তিনি ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন! দেখিলেন এক থালা মিষ্টান্ন তেমনি ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে; আর শয্যায় লুটাইয়া তরু কাঁদিতেছে।

তিনি খাটের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; রোরুদ্যমনাকে তিনি কি সান্তনা দিবেন? এ হেলা, এ তাচ্ছল্য স্ত্রীলোকের পক্ষে মৃত্যুদণ্ড, কি তার চেয়েও ঢের বেশী!

খোকা এতক্ষণ মায়ের ভাব দেখিয়া মুখ মলিন করিয়াছিল, মাঝে মাঝে তাহার ওষ্ঠযুগল কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল; সে কাঁদিবে কি না ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। মনসার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।

মনসা। বলিলেন—কিরে, দাদু, দাদু!

খোকার ক্রন্দনের ধ্বনি আরও বাড়িয়া চলিল।

মনসা তরুর কোলের মধ্য হইতে তাহাকে তুলিয়া লইলেন। খোকা মনসার বুকে মাথা রাখিয়া খুব কাঁদিল।

তরুকে কোন কথা না বলিয়া তিনি খোকাকে বলিলেন—কেমন দেখলে দাদু, বাবা?

খোকা আর ঘাড় তুলিয়া চাহিল না; সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অধীর হইয়া পড়িয়াছিল।

মনসা তরুর দিকে চাহিয়া রহিলেন; এমন সোনার প্রতিমা, এতরূপ, ওর দেব পূজায় লাগিল না, তাঁহার নয়ন যুগল ভিজিয়া উঠিল, ধরা ধরা কণ্ঠে বলিলেন—চল দাদু, ছাদে যাই।

সে রাত্রে আর তরু আহার করিল না। যে ভাবে পড়িয়াছিল, সেই-ভাবে পড়িয়া রহিল। মনসা খোকাকে তরুর কাছে শোওয়াইয়া দিয়া গেলেন।

তরু তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া; তাহার মুখে একটি অতৃপ্ত চুম্বন দাগ আঁকিয়া দিল।

৯

আভা তৈল গামছা কাপড়, সাবান ঠিক করিয়া রাখিয়া দিল, আজ নগেনকে সাবান দিয়া দিবে। রবিবার, তাই একটু বেলা হইয়াছিল সেদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না—সে একটা বই পড়িতেছিল।

ঝি আসিয়া বলিল—নাইতে যাও দিদিমণি।

বই হইতে মুখ না তুলিয়া আভা জিজ্ঞাসা করিল—"নগেন দা কোথায়।"

"মা তাকে নাইয়ে দিচ্ছেন।"

সে আবার আসিয়া বই লইয়া বসিয়া গেল। আবার উঠিল, যে কাপড় খানি কুচাইয়া রাখিয়াছিল, সেই খানার ভাঁজ ভাঙ্গিয়া বাহিয়ে ফেলিয়া দিল, গামছা খানা টেবিলের তলে টান মারিয়া ফেলিয়া সাবান ও তৈলের শিশি, জানালা পথে নিচে ফেলিয়া দিল।

তারপর শয্যার উপর যাইয়া শুইয়া পড়িয়া বাক্স হইতে একখানি চিঠির কাগজ বাহির করিল; ফাউনটেন পেনটা হাতের কাছেই ছিল। সে লিখিতে লাগিল।

"তরু, আজ যাইতে পারিব না! মনে কিছু করোনা, আসছে রবিবার নিশ্চয় যাইব। এমন কি দরকার যে এমন করে যাইতে লিখেছ?"

লিখিতে লিখিতে পত্রখানি কুটি কুটি করিয়া ছিড়িয়া মেজের উপর ফেলিয়া দিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া সহসা উঠিয়া টেবিলের কাছে দাঁড়াইল। টেবিলের নিচে হইতে গামছা খানি কাঁধের উপর ফেলিয়া, নিচে নামিয়া গেল।

বিধুমুখী নগেনের গা মোছাইয়া দিয়া বলিলেন, ও কাপড় আনতে ভুলে গেছি ত!

এই সময় আভা আসিয়া সেইখানে দাড়াইল !

বিধুমুখী বলিলেন—ওর কাপড় ঠিক করে রেখে এসেছিস ?

আভা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল—সরনা মা, আমি নাইতে এসেছি !

বিধুমুখী কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন ; এত ঠিক স্নেহশীলা কন্যার অভিমানের কণ্ঠ নয় ; ইহায় মধ্যে যেন একটু ক্ষোভের রাগিনী লুকান আছে !

তিনি বলিলেন—কিরে আভা !

আভা বলিল—সর না মা, একটা লোককে নাইয়ে দিতেইত দিনটা কেটে গেল !

কি আশ্চর্য্য কথা ! নগেনকে আজ তিনি কতক্ষণই বা কলতলায় লইয়া আসিয়াছেন ! আভা যে তাহাকে ৯ টায় কলতলায় নিয়ে আসে, প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সে স্নান আর হয় না ! তিনি মেয়ের গম্ভীর মুখ খানির দিকে চাহিয়া বুঝিলেন, মেয়ে যেন কেন অভিমান করিয়াছে ! তিনি একপাশে সরিয়া গেলেন ! আভা কলের তলে গিয়া বসিল।

বিধুমুখী বলিলেন—একি তেল মাখলি না !

আভা বলিল—সেটা আমার ইচ্ছা !

বিধুমুখী আর দাঁড়াইলেন না। উপরে উঠিয়া গেলেন। নগেন সেইখানে ভিজাকাপড়ে দাঁড়াইয়া ছিল, আভা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। আভার ঘরে গিয়া বিধুমুখী দেখিলেন আলনায় কোন কাপড় নাই !

তিনি এমনটি আর কখনো দেখেন নাই ; আভা নগেনের কাপড় সব সময় ঠিক করিয়া রাখিত।

তিনি অন্য ঘরে গিয়া একখানি কাপড় আনিয়া নগেনের হাতে দিলেন !

নগেন কাপড় পরিয়া উপরে চলিয়া গেল !

বিধুমুখী আভার হাত হইতে গামছা খানা লইয়া, তাহার হাতটা রগড়াইয়া দিতে দিতে বলিলেন—কি হয়েছে মা ?

আভা উত্তর করিল—কিছু না।

বিধুমুখী চুপ করিয়া তাহার গা রগড়াইয়া দিতে লাগিলেন !

আহারের পরে অভ্যাস মত নগেন আসিয়া আভার শয্যায় শুইয়া পড়িল।

আভা ঘরে আসিয়া দেখিল নগেন বিছনায় পড়িয়া চুপ করিয়া রহিয়াছে; আর শ্যামাসুন্দরী তাহার টেবিলের উপরে বইগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখিতেছেন!

ধীরে ধীরে আভা শয্যার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; নগেনের একখানি হাত ধরিয়া টান মারিয়া উঠাইয়া বলিল—আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাও!

বিস্মিত শ্যামাসুন্দরী আভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আভা তাহাকে টানিয়া ঘরের দুয়ারে নিয়া আসিল। বিধুমুখী, বামুন ঠাকুরাণী খাইতে বসিয়াছিল, তার জন্য কি নিতে উপরে আসিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়া বলিলেন—কি হয়েছে, অমন কচ্ছিস কেন?

আভা শুধু নগেনকে বলিল—বের হও বলচি।

বিধুমুখী বলিলেন—কেন ও তোর কি করেছে? ও থাকবে তোর ঘরে!

চন্দ্রা কোথা হইতে আসিয়া বলিল—আর বাছা ওরত মানুষের শরীর, কত আর সইবে বলত! বিশ বছরের ধাগি, যদি এমন ধারা সব সময় করে তবে কাহাতক সহ্য করা যায়। বের হয়ে যেতে বলচে, তবু কেমন করছে দেখ!

আভা একবার চন্দ্রার মুখের দিকে চাহিল। তারপর নগেনের হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল!

চন্দ্রা বলিলেন—মজা দেখ বাঁদরের! এমন ভুতও মানুষের ঘরে জন্মায়! বড় ভাগ্যি যে এমন একটা হয় নি!

বিধুমুখী নগেনের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন, বলিলেন—চল নগেন, তুই আমার ঘরে শুয়ে থাকবি!

আভা ছুটিয়া আসিয়া নগেনকে টানিয়া লইতে লইতে—"তোমায় আজ বাড়ীর বের করে দেব, দেখি কে তোমায় ঘরে আনে।

চন্দ্রা বলিলেন—আমি কিন্তু সে কথা আগে থেকেই বলে আসচি!

বিধুমুখী বিষাদমুখে বলিলেন—একটা সরল, অবোধ ছেলে, তার সঙ্গে তোমরা কেন যে এত লাগ বুঝি না, দিদি!

'ও আমার দরদ' বলিয়া চন্দ্রা নিচে নামিয়া গেলেন, আভা তাহাকে সত্যই বাড়ীর বাহির করিল কিনা এইটাই তাহার দেখিবার ইচ্ছা! ফটকের বাহিরে

নগেনকে রাখিয়া আসিয়া আভা দাসীকে বলিল—খবরদার বাড়ী ঢুকতে দিবিনি কিছুতে!

চন্দ্রা আসিয়া আভার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—এরা কি কম মা,—আমার হাড় জ্বালায়ে তবে এখানে এসেছে!

আভা কোন কথা না বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল! বিধুমুখী সেই দরজার পাশে সেই ভাবে দাড়াইয়া ছিলেন, আভা ঘরে ঢুকিতে ছিল; তিনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—আজকার অভিমানটা কি আমার উপর মা? আভা কথা না বলিয়া মায়ের বুকে মুখ রাখিল!

বিধুমুখী চোখের জলে তাহাকে স্নান করাইয়া দিলেন। তারপর আভা ঘরে গিয়া দুয়ারে খিল দিল।

বিধুমুখী বলিলেন—এতেও তোর অভিমান গেল না! মায়ের আর সন্তানের অভিমানে তফাৎ এই। তুই যদি আজ এমন ভাবে আমার হাতখানি ধরতিস, আমি কি তারপরও রাগ করে থাকতে পারতাম?

শ্যামাসুন্দরী স্তব্ধভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আভা ঘরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল, তিনি আসিয়া তাহার হাতখানি ধরিলেন।

আভা শ্যামসুন্দরী মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—মাকে বলে দিও জ্যেঠাইমা, ওকে যেন সে ঘরে না আনে!

তারপর সে যাইয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। শ্যামাসুন্দরী অনেক ক্ষণ আভার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বিধুমুখী তখনও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন!

শ্যামাসুন্দরী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—এই ভাবে দাঁড়িয়ে যে।

বিধুমুখী বলিলেন—সন্তানে, সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে না, যে সন্তানের জন্য মায়ের প্রাণ কি করে!

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—ভুল করো না দিদি! ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখ, ও যেন নিজের সঙ্গে কত যুদ্ধ করচে! এমন মেয়ে কি কারো পরে অভিমান করে, নিজে না কেঁদে থাকতে পারে!

আভা উঠিয়া আসিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল! নগেনের বোধদয় ও খাতা কলম; টেবিল হইতে টান মারিয়া মেজে ফেলিয়া দিয়া আবার গিয়া শুইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

একাল-সেকাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[লেখক— শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(১১)

দেখিতে দেখিতে তিন তিনটা মাস কাটিয়া গেল, নির্ম্মল বাড়ীতে ফিরিবার নামও করিল না। গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া কর্ত্তাকে গিয়া ধরিলেন— বলিলেন—"তোমার যেমন কোন ভাবনা চিন্তাই নেই, ছিষ্টিছাড়া মানুষ, পৃথিবী উল্‌টে যাক্‌, তবু চোখমেলে চাইবে না।"

কর্ত্তা সদানন্দ আনন্দিতচিত্তে কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিলেন— "ভেবে তুমিই কি কিছু কর্ত্তে পেরেছ যে, আমায় অনুযোগ কর্ত্তে এসেছ, ওতে কোন লাভ নেই বলে যতটা পারি দূরে থাক্‌তেই চেষ্টা কচ্ছি!"

গৃহিণী ক্রুদ্ধ হইলেন, মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—"এদিকে সংসারটা যেতে বসেছে, ছেলেটার খোজও নেই, খবরও নেই, বাছা আমার কোন্‌ অভাবে এমন বৌ ঘর সংসার ফেলে বিদেশে পড়ে আছে।"

সদানন্দ বলিলেন—"অভাব যে কার কখন কিসের উপস্থিত হবে, তাত সে ছাড়া আর কেউ বল্‌তে পারে না। নির্ম্মল এখন বড় হয়েছে, লেখা পড়া শিখেছে, তার কর্ত্তব্যের ভার তার ও'পর দিয়ে আমার নিশ্চিন্ত থাকাই হচ্চে দরকার। কথায় বলে উপযুক্ত পুত্রের সহিত মিত্রের মত ব্যবহার কর্‌বে।"

গৃহিণী মুখ ভার করিয়া উঠিয়া গেলেন, অনন্যোপায় হইয়া পুত্রবধূকে গিয়া বলিলেন—"বৌমা, তোমার বৌদিকেই নয়ত একবার ডেকে পাঠাও।"

বিমলা মলিন বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ছোটদেবরের সঙ্গে গল্প করিতেছিল, হাসিটি তাহার মুখ হইতে যেন চিরবিদায়ের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তবু তাহার মধ্যে এমন একটি জ্যোতিঃ ছিল, যাহা দেখিয়া মানুষ স্বতঃই মনে করিত, সে মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল— "বৌদিকে, কেন মা?"

"বাছাত আমার বাড়ী আসার নামটি করে না, চিঠী লিখে লিখে উত্তরও পাচ্ছি না, পরামর্শ করব এমনও ত কেউ নেই।"

বিমলার বুকটা ধরাস ধরাস করিয়া উঠিল, বলিল—"বাবা কি বলেন ?"

"তিনি আবার কি বল্‌তে যাবেন, এক মুখে বুলি লেগেই আছে, ভবিতব্য যা কর্‌বে তাই হবে।"

বিমলা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"ও কথা ছাড়াত উপায়ও নেই মা, বৌদিকে ডেকে আর কি কর্‌বে, বরং বাবার ও'পরই ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"

"ঐ দেখ, তুমিও যেন কোন্ কথাই বুঝ্‌বে না।" বলিয়া গৃহিণী নিরুপায়ের মত বলিলেন—"আমিত চিরদিন দেখে আস্‌ছি, পৃথিবীর কারুর জন্যই ওর কোন ভালবাসা বা আকর্ষণ নেই।"

"ঐটেতেই বিশেষত্ব, কারুর জন্যে নেই বলেই সেটা কোথাও আবদ্ধ হতে পারে না, সময় ও সুযোগ বুঝে সবারই মধ্যে গিয়ে পড়ে, কাউকে ভালবাসি না, তার মানে জগৎকে ভালবাসি" মনে মনে কথাগুলি বলিয়া প্রকাশ্যে বলিল —"ভেবে ভেবে শরীর নষ্ট ক'র না মা, বরাতে যা আছে, তাই হবে।"

গৃহিণী সন্তুষ্ট হইতে পারিলে না, একেত পুত্রের সংবাদ না পাইয়া তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, ইহার উপর আবার পরম স্নেহপাত্রী পুত্রবধূ বিমলার শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তিনি শিহরিয়া উঠিতেন। বিমলা যেন দিন দিনই ক্ষয়ের পথে যাইতে বসিয়াছে "ভাবনা যত আমার শরীর নিয়ে না মা।" বলিয়া অঞ্চলে চোখ মুছিলেন, বিমলা লজ্জিত হইল, তাহার ক্ষুব্ধ হৃদয় বার বার বলিতেছিল,—"দিন দিন এমন ভাবে শুকিয়ে যাওয়া তার পক্ষে ঘোরতর অন্যায় হচ্ছে, মাতৃসমা শ্বশ্রূ যে তাকে দেখেই আহার নিদ্রা ত্যাগ কর্ত্তে বসেছেন।"

বিমলা প্রাণপণ করিয়াও জীবন-যুদ্ধের পরাজয় সংবাদটা গোপন করিতে পারিতেছিল না, এজন্য তাহার অনুতাপের সীমা ছিল না, কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য বলিয়া তাহার সে অনুতাপ সন্তানই বৃদ্ধি করিত, প্রতিকারের উপায় বলিয়া দিতে পারিত না। এই প্রসঙ্গ এখানেই চাপা দিবার জন্য বলিল—"চল মা, তোমার সেই কাঁথাখানা শেলাই করে দি।"

সন্ধ্যার পরে সদানন্দ মালা হাতে খড়ম পায়ে বাড়ীর এপাশে ওপাশে

ঘুরিতেছিলেন, গৃহিণী ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন—"নয়ত আমায় পাঠিয়ে দাও তার কাছে।"

সদানন্দ আকাশের দিকে চাহিলেন, আকাশে মেঘ ছিল, না নির্ম্মল প্রভাতের মত পবিত্র একটা ভাব তাহা হইতে বাহির হইতেছিল, শ্রেণীবদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ হইতে ফোটা ফুলগুলি গন্ধ বিলাইতেছে, পুকুরের জলে স্নাত বায়ু অশোকের গন্ধ লইয়া ধীরে ধীরে বহিতেছিল, শান্ত স্বরে বলিলেন—"দেখ গিন্নী, যুদ্ধ করে জয়লাভ কর্‌ব, এমন বীর আমি আজও হইনি ?"

গৃহিণী কথাটা বুঝিলেন না, স্বামীর মুখের উপর ব্যাকুল জ্যোতিঃশূন্য দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সদানন্দ বলিলেন—"নির্ম্মলকে কিছু আমরা যেতে বলিনি, বরং বারণই করা হয়েছিল, কোন দোষতও এতরফ হতে হয় নাই, যাতে তাকে সেধে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে, ভাগ্যের ফল ভগবান্ ভোগ করেন, আমরা ত মানুষ।"

"কিন্তু বৌমার দিকে একবার চেয়ে দেখেছ।"

"দেখেছি।" বলিয়া সদানন্দ অন্যমনস্ক হইতে চেষ্টা করিলেন, গৃহিণী ছাড়িলেন না, বলিলেন—"এমনি দিন কাটাতে হলে মাঝে আমার মারা যাবে, মনের মত বৌ পেয়ে সংসারে সুখ হল না।"

"সুখ সুখ করে হাহাকার কল্লেই কিছু হবে না, যে তোমার এমন বৌ জুটিয়ে দিয়েছে, তাকেই ডেকে বল, ছেলেটিকে ফিরিয়ে আন্‌তে, সংসারে সুখ এনে দিতে।" বলিয়া ধীরে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রিতে শ্বশুরের পায়ের তলায় বসিয়া বিমলা পায়ে হাত বুলাইতেছিল, সদানন্দ ডাকিলেন—"মা!"

"কেন বাবা ?"

"তুমিত আমার বোকা মেয়ে নও যে বোঝাতে হবে, জানত জোরজুলুম করে সংসারে কিছুই হয় না, স্বভাব যখন যেটাকে যেখানে নিয়ে দাঁড় করাবে, তার আগে যদি কপাল খুড়ে মরি তবুও কিছু করে ওঠ্‌বার যোটি নেই।"

"এ কথা কেন বাবা ?"

"কোন দিন বলিনি, আমি জানি, আমি যা বল্‌ব, তা তুমি জেনেই রেখেছ, তোমার বুদ্ধির ও'পর বিশ্বাস কর্‌বার মত নির্ভরতা আমার আছে, বুদ্ধিভ্রংশ হলেত চল্‌বে না মা।"

"বাবা ?"

"মা !" বলিয়া সদানন্দ উঠিয়া বসিলেন, কমলার হাত ধরিয়া বলিলেন— "বলত আমি চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি, কিন্তু তাতে ফল কিছুই হবে না, বরং বিপরীত দাঁড়াবে, স্রোতের পূর্ণ বেগ ত আটক রাখা যায় না, সেখানে চেষ্টা বিপন্ন হয়ে পড়ে, বাধা দিতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত বেগে নিজেকেই তলিয়ে ফেল্‌তে হয়।"

বিমলা কথা বলিতে পারিল না, লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল, সদানন্দ বলিলেন—"লজ্জা ক'র না মা, যা তোমার বল্‌বার থাকে বল্লে আমি তাই কর্‌ব।"

"যা ভাল বুঝ্‌বেন, তাই কর্‌বে বাবা, আমি আবার কি বল্‌তে যাব।"

"তোমার জন্যেই ভয় হচ্ছে মা, দিন দিন এমন শুকিয়ে যাচ্ছ, গিন্নীত পাগল হয়ে পড়েছেন, বলেন আমার এমন বৌ মারা পড়্‌বে।"

"আমায় কি কর্ত্তে বলেন।" বলিয়া বিমলা জোর করিয়া মুখ ফিরাইল, সদানন্দের অজ্ঞাতে তাহার মুখ ভিজিয়া বুক ভিজিয়া উঠিল, সদানন্দ বলিলেন— "আর কিছু তোমায় বল্‌তে চাইনি, মনকে প্রবোধ দাও, একটু ধৈর্য্য রাখ্‌তে চেষ্টা কর, অধৈর্য্য হলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই এসে পড়বে।"

(১২)

রমাকে ডাকিতে হইল না, সে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল, গৃহিণী অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, অন্তত বিমলার মনটা কদিন ভাল থাকিলেও একদিনের জন্য তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন।

রাত্রিতে শুইতে গিয়া রমা বিমলার গলা জড়াইয়া ধরিল, বিমলা আকুল কান্না কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—"বৌদি, আমি যে দুষ্ট গ্রহ হয়ে উঠ্‌লুম, আমার জন্যে মার মনে শান্তি নেই, বাবা চিন্তা করে আধমড়া হচ্ছেন, হাসি যেন এবাড়ী থেকে উঠে গেছে।"

রমা বিমলাকে বুকে টানিয়া আনিল, মাথায় হাত দিয়া বলিল— "ঠাকুরঝী, কেউ কারুর জন্য অশান্তি ভোগও করে না, চিন্তাও করে না, ঐটে আমাদের ভুল, অদৃষ্টের ফল সবাইকে ভোগ কর্ত্তে হয়।"

"এমনই কি কাজ করেছি, যারি জন্যে আমার এই দুরদৃষ্ট এসে উপস্থিত হল।"

রমা জবাব দিল না, বিমলা আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আমিত প্রাণপণ করে আমার মনের কথা লুকিয়ে রাখি, যাতে বাবা মা না জান্‌তে পারেন,

আমার জন্যে কোন কষ্ট না পান, কিন্তু পোড়া শরীর যে দিন দিন শত্রুতা কচ্ছে, ওর জ্বালাতে ত আমাকে সবার নিকট ধরা দিতে হচ্ছে।"

"দিন দিন কেনই এমন করে শরীরটাকে ক্ষয় কচ্ছ।"

"ঐ দেখ, তোমরা কেমন, সব মানবে, আবার অনুযোগ কর্ত্তেও ছাড়্‌বে না।"

রমা অবুঝের মত চাহিয়া রহিল, বিমলা বলিল—"অদৃষ্ট যদি সবই করে ত আমায় কেন বাদ দেবে বল্‌তে পার?"

রমা মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল,—"অদৃষ্টের উপরও একজন আছে, সবাই তাকে ধর্‌তে পারে না, তোমার কাছেত আমরা তারি প্রত্যাশা করি।"

বিমলা জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল, রমা বলিল—"জানত অদৃষ্ট আমাদের কাজ হতে তৈরি হয়, কাজের মত কাজ কর্‌তে পাল্লে সে যে ফু কাটিয়া সুতে উঠ্‌বে, শরীর শুকিয়ে না গিয়ে শুধ্‌রে উঠ্‌বে।"

বিমলা ভাবিতে লাগিল, কি সে কাজ, কেমন করিয়া তাহা করিতে হয়, পতির উপেক্ষা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে না করিতে পারে এমন কাজত নাই, ঠিক বালিকাটির মত জিজ্ঞাসা করিল—"আমার পাপে যে এ সব হচ্ছে, সে আমিও বুঝ্‌ছি বৌদি, কিন্তু কি কল্লে এ পাপ হ'তে মুক্ত হতে পারব, সে ত কেউ বলে দিতে পারে না।"

রমা বিমলার কপালে কপাল রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সান্ত্বনা করিয়া উত্তর করিল—"তোমার শরীরে পাপ আছে, এ যদি দেখি, তবুও বল্‌তে সাহস করব না। ওর জন্যে তুমি দুঃখ কর না, গাছকে বাদ দিয়ে পরগাছার কথাই আগে ভাবি, পাপপুণ্য ত সবারি থাকতে পারে।"

বিমলা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—"আমার দেবতার মত শ্বশুর, দেবীর মত শাশুড়ী, তাঁদের ত কোন পাপ থাকতে পারে না।"

"এ জন্মের না হ'ক" বলিয়া রমা থামিল, বিমলাও উত্তর করিল না, জন্মজন্মান্তরের কথার আলোচনা আর ভূতাবিষ্টের স্বপ্নদর্শন, একই কথা, যেখানে প্রত্যক্ষদর্শনের কোন মাত্র সম্ভাবনা নাই, সেখানে চুপ করিয়া থাকা ছাড়া আর উপায়ান্তর ছিল না। রমা ডাকিল "ঠাকুর ঝি।"

"বৌদি।" বলিয়া বিমলা নীরব হইল, রমা জিজ্ঞাসা করিল—"নির্ম্মলবাবু কি কোন চিঠিও লেখে নি।"

বিমলা জবাব দিল না, "তিনি কোথায় কেমন আছেন," সে সংবাদ

পাও-ত ?" বলিয়া উঠিয়া বসিয়া রমা বিমলাকে টানিয়া তুলিল, বিমলার চোখ বহিয়া যেন অজস্র অশ্রু আষাঢ়ের বৃষ্টির মত অবিশ্রান্ত গতিতে বহিয়া পড়িতেছিল, শ্বশুর ও শাশুড়ীর সন্তাপ সম্ভাবনায় যে অশ্রু সে এতকাল জোর করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিল, আজ যেন একটা আশ্রয় পাইয়া সেই অশ্রু গলিত চন্দ্রকান্ত মণির মত তাহার তপ্ত বুক সিক্ত করিয়া শীতলতা আনিয়া দিল। রাত্রির বাতাস মৃদুমন্দ বহিতেছিল, রমা উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিল, শিশিরসিক্ত বায়ু করবীগন্ধ লইয়া মূর্চ্ছিতের মত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, পাশের টিপায়ে অবস্থিত প্রদীপটা মিটি মিটি জ্বলিতেছে।

"কেমন করে জান্‌ব বৌদি।" বলিয়া বিমলা রমার কাঁধে মাথা রাখিল. রমা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—"এতকাল একটা সংবাদ দেন নি, এ কেমন করে সম্ভব হল, আমি কেবল তাই ভাব্‌ছি ভাই।" বিমলা তবু কথা বলিতে পারিল না, রমা আবারও বলিল—"যে তোমায় দেখ্‌বার জন্য ছুটে আস্‌ত,তার এত অভিমান, একে তাড়াতেত একটু বেশী করে যত্ন নিতে হবে, যেমন রোগ তেমনি অষুধ না হলেত রোগ সার্‌বে না।" "কি কর্ত্তে বল।" "চল এবার গঙ্গাস্নানে যাই।" "না না সেত আমি পার্‌ব না, এদের আমি কার কাছে ফেলে যাব" বলিয়া বিমলা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সকালে গৃহিণী রমাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন—"বলত মা, কি উপায় করি।"

"আপনার কি মনে হচ্ছে মা" "বুঝ্‌তে ত কিছুই পার্‌ছিনা, নির্ম্মল আমার সোণার ছেলে, জানত মা বল্‌তে অজ্ঞান হত, সেই ছেলের এমন মতি কেমন করে হল, যে একখানা চিঠি দিয়েও খোজ করে না।"

গৃহিণীর সজল চোখের উপর করুণা ভাসিয়া উঠিল, রমা মনে মনে সন্দেহ না করিয়া পারিল না, কলিকাতার নামে তাহার মনে অনাবশ্যক একটা সন্দেহ যেন আপনা হইতেই উদিত হইত, গৃহিণী ঠিক সেই স্থানটিতে আঘাত করিয়া বলিলেন—"তাকেত শত্রুরাও প্রশংসা করে, আমিত তাকে অবিশ্বাস কর্ত্তে পারি না।"

বিমলা মনে মনে বলিল—"আঘাত পেয়ে সুখের আশায়ত যায় নি, গেছে, আঘাতের দাগ্‌টা উজ্জ্বল করে তুল্‌তে, কিন্তু তাত হবে না, বেদনা যখন বেড়ে উঠ্‌বে, তখন যে তাকে শুধ্‌রে নেবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ কর্ত্তে হবে, ভালমন্দ সৎ অসৎ বিচারের সময়ত আর থাক্‌বে না। প্রকাশ্যে বলিল

—"আমিত শীগ্‌গীর একবার কল্‌কাতা যাব ভেবেছি, যদি মত দেন ত ঠাকুর ঝীকে সঙ্গে নে যেতে পারি।" বলিয়া রমা থামিতেই বিমলা আসিয়া ডাকিল "বৌদি তোমায় বাবা ডাক্‌ছেন।"

[ক্রমশঃ

নষ্টোদ্ধার

লেখক—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ব্যাপার কি হ্যা ফণি, মুখটা অত গম্ভীর ক'রে আছ কেন?"

একটু চেষ্টার হাসি হাসিয়া ফণি বলিল,—"ও বিশেষ কিছু না, একটা বিষয় একটু ভাবিয়ে তুলেছে।"

তাহার কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। জগতে কত বৈচিত্রই দেখিতে হইবে! সদাপ্রফুল্ল ফণিরও চিন্তা! তাহাকে প্রশ্ন করিলাম,—"গোপনীয় কিছু নাকি? তোমার স্ত্রীর——

"হ্যাঁ, তার সম্বন্ধেই বটে, তবে এমন কিছু গোপনীয় বিষয় নয়। তোমার কাছেই এ বিষয়ে একটা যাহোক পরামর্শ নেব মনে ক'রছিলুম। তবে রাস্তার মাঝখানে কোন কথার আলোচনা না করাই ভাল।"

আমি তখন বেসরকারি গোয়েন্দার কার্য্য করিতেছিলাম। একটা মক্কেল হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হইল না; তাহাকে বলিলাম,—"চল আমার আফিস ঘরে বসে কথাটার আলোচনা করা যাবে।"

আমরা আমার অফিস কক্ষে আসিয়া উপবেশন করিলাম। ফণি বলিতে লাগিল,—"আমার শ্বশুর দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে ক'রেছিলেন জান ত? সেই দোজ-পক্ষের স্ত্রীটী কিন্তু বেশী দিন বাঁচেন নাই, বিয়ের বছর খানেক পরেই মারা যান; সে স্ত্রীর একটী ছেলে আছে—অর্থাৎ আমার একটী বৈমাত্র সম্বন্ধী আছে; ছেলেটা যৎদূর বখা হ'তে হয় তা হয়েছে, তারপর বছর দুয়েক থেকে তার আর কোন খোঁজ খবরই নেই। আমার স্ত্রীই এখন শ্বশুর মশায়ের একমাত্র সন্তান।"

"তা বেশ ত, এতে আর ভাবনার কথাটা কি?"

"আরে সবটা আগে শোনই না ছাই!"

"বেশ বলে যাও।"

ফণি বলিতে লাগিল,—"আমার শ্বশুরের বিষয়ের আয় বছরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। শ্বশুর এই বিষয়টা সমস্তই আমার স্ত্রীর নামে উইল করে ছিলেন; একদিন কথায় কথায় সেকথা আমায়ও বলে ছিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র শরৎকে তিনি ত্যজ্য পুত্র করেন।"

"বেশত', তা এতে সে কি······

"সবটা না শুনলে বুঝতে পারবে না। আজ তিন সপ্তাহ হ'ল তিনি মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরই হঠাৎ কোথা থেকে শরৎ এসে হাজির হ'য়েছে। সে বলে তার বাপের বিষয়ে তারই অধিকার—মেয়ের কোন অধিকার নেই। এখন মুস্কিল হয়েছে এই যে, সেই উইল খানাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তোমরা বোধ হয় সব জায়গা খুঁজে দেখনি, তা নইলে সেখানা আর যাবে কোথা?"

"আমরা ত ভাই খুঁজিতে কোথাও বাকী রাখিনি, কিন্তু কোথাও সেখানা পেলুম না। তুমি যদি একবার চেষ্টা ক'র তা হ'লে বড় ভাল হয়।"

ফণি আমার বাল্য বন্ধু। তাহার সহিত চিরদিন আমার বিশেষ মাখা মাখি ছিল। ফনির পত্নী নীরার সহিতও আমার যথেষ্ট আলাপ হইয়া ছিল, সুতরাং তাহাদের কার্য্যোদ্ধার করিতে অমত করিতে পারিলাম না। ফণিকে বলিলাম,—"কাল সকালে তোমাদের বাড়ী যাব।"

আমি ক'দিন শ্বশুর বাড়ীতেই রয়েছি, সেই খানেই যেয়ো।"

ফণির শ্বশুরবাড়ী খিদিরপুরে। আমি তাহার কথায় সম্মতি জানাইলে ফণি চলিয়া গেল।

পর দিন প্রভাতেই আমি সাইকেলে করিয়া ফণির শ্বশুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। ফণি আমায় আদর আপ্যায়ন করিয়া বসাইল। নীরার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শুনিলাম, তাহার পিতা যে তাহাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন সে কথা সে তাঁহার নিকট হইতেই শুনিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার মস্তিস্ক বিকৃত হয়, সেই সময় উইল খানা যে কোথায় রাখিয়াছেন তাহা কেহই জানিত না। আরও বুঝিতে পারিলাম নীরা তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শরৎকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে,এবং তাহার পিতার বিষয় যে সেই লম্পট চরিত্রহীনের হস্তে পড়িয়া নষ্ট হয়, এটা সে কোন মতেই সহ্য করিতে পারিবে না।

বাহিরে আসিয়া শরতের সহিত আলাপ হইল। একহারা চেহারা, মুখটা পাকাটে ধরণের এবং চোখের কোণ বসা। অতিরিক্ত পাপ করিলে যাহা হয় তাহারও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। আমার সহিত আলাপ হইলে সে বলিল,—"দিদি বলছে বাবা তাকেই সব বিষয় দিয়ে গেছে, কিন্তু সে উইল খানা পাওয়া যাচ্ছে না; আপনার নাম আমি অনেকবার শুনেছি, আপনি যখন এ বিষয়ে হাত দিয়েছেন ননী বাবু, তখন দিদি নিশ্চয়ই উইল পাবে—আমিও অন্তরের সঙ্গে তাই প্রার্থনা ক'রছি। যদিও বিনা কারণে বাবা আমার ওপর অবিচার করেছেন, তবু এমন ক'রে ছড়িয়ে বিষয় আমি নিতে চাই না।"

ছোকরার কথা শুনিয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ফণির নিকট তাহার চরিত্র সম্বন্ধে যে সব কথা শুনিয়া ছিলাম তাহাতে তাহার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হওয়া আমার নিকট অষ্টম অশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হইল।

যাহা হউক আমি আর অধিক সময় নষ্ট না করিয়া উইল খানার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। সারা দিন ধরিয়া নানা সম্ভব অসম্ভব স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও কিন্তু কোন ফল হইল না। উইলখানা পাইলাম না। ফণি আমায় বাড়ী যাইতে দিল না, দুই চারি দিন সেই স্থানে থাকিয়া তাহাদের কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিয়া যাইতে বলিল।

এইভাবে দুই দিন কাটিয়া গেল। আমার অক্ষমতায় ফণী ও নীরার মুখ আরও গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিল। তৃতীয় দিন প্রভাতে চা পান শেষ করিয়া আমি ও ফণি বেড়াইতেছিলাম; শরৎ তখন কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল। অকস্মাৎ পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল নীরা উইল পাইয়াছে।

আমি ও ফণি দ্রুতপদে পরিচারিকার অনুসরণ করিয়া নীরার পিতার পাঠাগারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নীরা বলিল আল্‌মারী হইতে একখানা বই বাহির করিতে গিয়া সে একখানা নূতন বই দেখিতে পায়। সেটা তাহার পিতার আমলের পুস্তক নহে। বইখানা তুলিয়া লইয়া খুলিতেই একটা খাম তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়ে। খামখানা সে আমাদের হাতে দিল। সেখানার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল,—

"আমার শেষ উইল।"

ফণি খামখানা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল,—"এই খানাই সেই উইল,

তিনি বলেছিলেন একটা খামের মধ্যে পুরে আটা দিয়ে জুড়ে রেখেছেন খাম ছিঁড়িয়া ফণি পড়িল,—

"এতদ্বারা আমি আমার ভাবৎ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আমার একমাত্র পুত্র শরৎকুমার ঘোষালকে স্বেচ্ছায় ও সুস্থ শরীরে দান করিয়া গেলাম। শরৎ ইহা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিবে, অন্য কাহারও ইহাতে কোন অধিকার থাকিবে না।

শ্রীশশীকান্ত ঘোষাল!"

ফণির কম্পিত হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া উইলখানা টেবিলের উপর পড়িয়া গেল। নীরার মুখখানা তখন মৃতার মুখের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি উইলখানা তুলিয়া লইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কোন ত্রুটীই দেখিতে পাইলাম না।

নীরা অল্পক্ষণের মধ্যেই আত্ম সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল,—"যাই হোক একখানা উইল ত পাওয়া গেছে, না হয় শরৎই বাবার বিষয়টা পেলে. তাতে আর হবে কি?"

এমন সময় শরৎ আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল,—"কি গো দিদি কি হয়েছে?"—তাহার পরই সে উইলখানা পড়িয়া লাফাইয়া উঠিল,—"উঁহু, এ হ'তেই পারে না, বাবা যে আমায় বাড়া থেকে তাড়িয়ে দেবার এক সপ্তাহ পরেই আমার নামে সমস্ত বিষয় উইল ক'রে দিয়েছেন এ কথা কথাই নয়—নিশ্চয়ই এটা জাল জুচ্চুরি!"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম,—"কিন্তু জাল ক'রলে কে?—কার এতে লাভ?"

"যে হেমকান্ত সর্ব্বাধিকারী স্বাক্ষী রয়েছে, ঐ ব্যাটারই কাজ—ও বেটা অনেকদিন আমাদের বাড়ী গোমস্তা ছিল।"

আমারও মনে হইতেছিল উইল খানা জাল কিন্তু প্রমাণ করিব কি করিয়া? কোন প্রমাণই ত নাই!

অকস্মাৎ একটা কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। ফণিকে বলিলাম,—"উইলখানা তোমার কাছে রেখে দাও, আমি এখুনি আসছি। আর যে তারিখে উইলখানা লেখা ঐ তারিখের আর দু একখানা চিঠিপত্র জোগাড় ক'রে রাখ; তারপর আমি দেখছি উইলখানা জাল কি খাঁটি।"

একশিশি Oxalic acid কিনিয়া লইয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম।

ফণি, নীরা এবং শরৎ তখন রন্ধন গৃহের মধ্যে উইলখানা লইয়া পরীক্ষা করিতেছিল। আমি উইল খানা তাহাদের নিকট হইতে লইয়া বলিলাম,—"উইলখানা জাল কি না এখুনি বোঝা যাবে। আমি একশিশি Oxalic acid এনেছি, এর গুণ হ'চ্ছে পুরোণ লেখার 'ওপর এ এসিড প'ড়লে লেখার কোন চিহ্নই থাকে না। তার স্বাক্ষী এই দেখ—" বলিয়া আমি ফণির নিকট হইতে একখানা পুরাতন চিঠি লইয়া একটা তুলিতে এসিড্ মাখাইয়া চিঠি খানার উপর লাগাইয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত লেখা মুছিয়া গেল। তাহার পর উইলখানা লইয়া তাহার প্রথম অক্ষরটার উপর এসিড্ লাগাইয়া দিলাম। হরফটার কোনই পরিবর্ত্তন হইল না।—" এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে উইলখানা জাল এবং এক বছরের মধ্যে লেখা হ'য়েছে। যে তারিখ ওতে দেওয়া রয়েছে সে তারিখের লেখাই নয়।"

শরৎ, আমাদের বাধা দিবার পূর্ব্বেই উইলখানা টানিয়া লইয়া একেবারে উনানের মধ্যে পুরিয়া দিল। মুহূর্ত্তে সেটা ভস্মে পরিণত হইল। উত্তেজিত ভাবে সে বলিল,—"আমি ত' তখনই বলেছিলুম ওটা জাল, এ কখনও হ'তেই পারে না!"

মোটের উপর সে আমাদের জালিয়াংকে ধরিবার সকল পন্থা রুদ্ধ করিয়া দিল।

আরও দুই দিন ব্যর্থ অনুসন্ধানে কাটিয়া গেল।

যতই দিন যাইতে লাগিল আপনার অক্ষমতায় ততই আমি লজ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। শেষে এক দিন বিরক্ত হইয়া ফণিকে বলিলাম,—"আচ্ছা উইল খানা কোথায় রেখেছেন সে সম্বন্ধে কোন দিন কোন কথা তোমার শ্বশুরকে জিগেস করনি?"

"করেছিলুম, কিন্তু কোন উত্তর পাইনি।"

"তার মানে?"

"শেষ ক'মাস তাঁর মাথার গোলমাল হয়েছিল। যত বারই উইলের কথা জিগেস করেছি, তত বারই তিনি গম্ভীর ভাবে কাণের কাছে মুখ এনেছেন—যেন কি একটা ভয়ানক গোপনীয় কথা বলবেন—তার পর "বক্‌-বকুম্‌-কুম" ক'রে পায়রা ডেকে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে লুটোপুটী খেয়েছেন।"

"পায়রা ডাকবার মানে কি?...তবে কি......আচ্ছা ফণি তোমার শ্বশুরের পায়রা ছিল?"

"ছিল, সে অনেক দিন আগে—প্রায় দশ বছর হ'ল সে সব বিদেয় ক'রে দিয়েছেন।"

"কোথায় থাকৃত পায়রা ?"

"তেতালার ছাদে একটা ছোট চিল কুটুরী আছে, তার মধ্যে খোপ করা ছিল।"

"খোপ এখনও সেখানে আছে ?

"আছে।"

"বেশ ; আজ রাত্রে সকলে ঘুমুলে আমরা সেই ঘরটা একবার খুঁজে দেখব। তুমি আজ সদরে একটী ঘরে শুয়ো।"

ফণি বিস্ময় ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল,—"তুমিও কি খেপলে নাকি হে ননী ? পায়রার খোপে উইল ?"

হাসিয়া আমি বলিলাম,—"ক্ষতি কি একবার চেষ্টা ক'রতে ? কথাটা কাউকে এখন বোল না কিন্তু !"

ফণি একটা বোকামি করিয়াছিল ;—শরতের সম্মুখেই নীরার নিকট হইতে চিল কুটুরির চাবি চাহিয়া লইয়াছিল।

রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে খালি পায়ে আমি ফণির কক্ষে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিলাম ; পরক্ষণেই ফণি বাহির হইয়া আসিল। একটা চোরা লণ্ঠন লইয়া আমরা সন্তর্পণে তেতালার চিল কুটারিতে প্রবেশ করিলাম। ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া আমরা অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম।

খোপের পর খোপ অনুসন্ধান করিয়া এবং রাশিকৃত শুষ্ক পায়রার বিষ্ঠা ঘাঁটিয়া অবশেষে আমাদের পরিশ্রমের পুরস্কার মিলিল—পায়রার খোপের মধ্যে ন্যস্ত উইল খানা পাওয়া গেল। ফণি আনন্দে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে একটা কিসের শব্দ হইল। আলোটা দ্বারের দিকে ফিরাইতেই দেখিতে পাইলাম দ্বারে চাবির গর্ত্ত দিয়া একটা চক্ষু আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ফণি খামখানা জামার ভিতরকার পকেটে রাখিয়া একলম্ফে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

দ্বার খুলিয়া কিন্তু আমরা কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ফণি আমার দিকে চাহি বলিল,—"শরৎ বোধ হয় ?"

"তা নয় ত আবার কে ?"

সমস্ত বাড়ীটা তখন নিস্তব্ধ। আমরা নীচে নামিয়া ফণিকে বলিলাম,—

"উইলটা এখন খুলো না, সকালে সকলের সামনে খোলা যাবে।"—তাহার পর আমরা আবার যে-যাহার কক্ষে শুইতে গেলাম।

গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। অকস্মাৎ কাহার চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—ফণি! আমায় দেখিয়া সে উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল,—"আগুন। আমার ঘরে আগুন লেগেছে।"

ছুটিয়া গিয়া জল ঢালিয়া আমরা আগুন নিভাইয়া দিলাম। ফণির জামা কাপড়গুলা সমস্ত পুড়িয়া গিয়াছিল।

ফণিকে প্রশ্ন করিলাম,—"হঠাৎ আগুন লাগল কি ক'রে বল ত হ্যা?"

"তা ত' ব'লতে পারি না, আমার খুব সজাগ ঘুম, পোড়া গন্ধ পেতেই ঘুম ভেঙে গেছে।"

"উইলটা কোথায়?"

"ওঃ! উইলটা ত বলিয়া" সে, যে চেয়ারের উপর তাহার জামাগুলা ছিল সেই দিকে ছুটিয়া গেল।

আমি তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিলাম,—"তোমার কাজ নয়, সর আমি দেখছি।"

অতি সন্তর্পণে আমি সেই জামা কাপড়ের ভস্ম-শেষ হইতে পোড়া খামখানা বাহির করিলাম। ফণি উইলখানার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম,—"ছেলেমানুষী ক'র না, এখন যা বলি তাই কর; দুখানা চায়ের ডিস নিয়ে এস।"

ফণি তৎক্ষণাৎ চায়ের ডিস লইয়া আসিল। আমি সাবধানে উইলখানি একখানি ডিসের উপর রাখিয়া অপর ডিসখানি চাপা দিলাম। তাহার পর সেটী সাবধানতার সহিত লোহার সেফের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলাম।

অতপর আমরা পুনরায় শয্যার আশ্রয় লইলাম। সকালে উঠিয়া ফণিকে বলিলাম,—"কোন কথা এখন কাউকে বোল না, আমি অসছি—এখুনি, তুমি একটু আগুন করে রাখো।"

অল্পক্ষণের মধ্যে আমি ফিরিয়া আসিয়া লোহার সিন্দুক হইতে ডিস দুই খানি বাহির করিয়া সন্তর্পণে খাম হইতে উইলখানি বাহির করিলাম; তাহার পর অনুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিয়া যেদিকে লেখা তাহার পিছনদিকে এ্যালুমিনিয়াম এসিটেট্ দ্রাবক মাখাইয়া দিলাম। তৎপরে সেটী ডিসের উপর

রাখিয়া ফণিকে তপ্ত করিতে বলিলাম। এই ভাবে দুই তিনবার করিবার পর কাগজখানা পিজ্‌বোর্ডের মত শক্ত হইয়া গেল।

ফণিকে বলিলাম—"এইবার একটা ক্যামেরা নিয়ে এস দেখি।"

ফণি ক্যামেরা আনিতে গেল।

আমি নীরার নিকটে গিয়া বলিলাম,—"উইল পাওয়া গেছে নীরা!"

"সত্যি? কোথায়?"

"দেখবে এস।"

নীরা উইলখানার অবস্থা দেখিয়া বিবর্ণ লইয়া গেল।—"এমন করে পোড়ালে কে এটাকে!"

"জানি না, বোধ হয় শরৎ।"

এরূপ সময়ে ক্যামেরা লইয়া ফণি ফিরিয়া আসিল। ক্যামেরাটা ঠিক করিয়া লইয়া ফণিকে ডিসখানা উঁচু করিয়া ধরিতে বলিলাম এবং একটা দেশালায়ের কাটি জ্বালিয়া কাগজটা ধরাইয়া দিলাম; মুহূর্ত্তে সেটা সাদা কাগজের মত হইয়া গেল এবং তাহার লেখাগুলা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কাগজখানার একখানা ফটো তুলিয়া লইলাম এবং সেখানা পড়িয়া একটা নকল করিয়া রাখিতে বলিলাম। ফণি পড়িয়া পড়িয়া নকল করিতে লাগিল,—

"আমি এতদ্দারা আমার তাবৎ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আমার কন্যা নীরা দেবীকে দিয়া গেলাম। আমার পুত্র শরৎ চরিত্রহীন ও জালিয়ৎ বলিয়া আমি তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিলাম।

শ্রীশশীকান্ত ঘোষাল।"

নকল করা শেষ হইয়াছে এমন সময় শরৎ আসিয়া সে কক্ষে প্রবেশ করিল,—"কি হচ্ছে গো দিদি?"

তাহার পরই উইলখানার উপর তাহার নজর পড়িল চকিতে সে দগ্ধ উইলখানা ধূলি মুষ্টিতে পরিণত করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"এ জাল উইল, কখনই আদৎ উইল নয়, কিছুতেই………"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—"আর অনর্থক গোল করিবেন না শরৎ বাবু, ভাল চান ত এখনি এখান থেকে সরে পড়ুন। ওখানা গুঁড়িয়ে ফেলিলেও কোন ক্ষতি হবে না, আমি ওটার একটা ফটো তুলে নিয়েছি, আর ফণিও একটা নকল রেখেছে। আর আগেকার জাল উইলখানা যে আপনারই করা

সে প্রমাণ এবং কাল রাত্রে উইলখানা পোড়ানও যে আপনার কাজ সে প্রমাণও পেয়েছি।"

বাধা দিয়া শরৎ বলিল,—"এই প্রথম এটা পোড়া অবস্থায় আমি দেখলুম, তবে পোড়ালুম কি করে?"

"ছিল কুটুরীতে ফণি যখন ওখানা পকেটে রাখে, তখন আপনি চাবির গর্ত্ত দিয়ে দেখেছিলেন।"

শরৎ আর কোন কথা না বলিয়া দিব্য সপ্রতিভ ভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার পর হইতে শরতের আর কোন সন্ধান আমরা কোন দিন পাই নাই।

অকৃতজ্ঞ।

(লেখক—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চৌধুরী।)

সমস্ত দিবস হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর কাছারী হইতে আসিয়া অলস দেহ খানিকে তখন সবেমাত্র বারান্দায় ইজি চেয়ারে বিন্যস্ত করিয়াছি, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া ডাকের পত্রগুলি দিয়া গেল। সটকার নলটা মুখে দিয়া অন্যমনস্ক ভাবে "সঞ্জীবনী" খানা তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে সম্পাদকীয়, যুদ্ধের কথা, দেশের কথা প্রভৃতি কলম পড়া হইয়া গেল। অবশেষে সময় কাটাইবার জন্য বিজ্ঞাপনগুলির উপর চক্ষু বুলাইতে লাগিলাম। হঠাৎ চক্ষু বড় বড় অক্ষরে ছাপা একটী বিজ্ঞাপনের উপর পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল:—

নিরুদ্দেশ।

পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার।

গত রবিবার আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান মোহিতকুমার বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহার বয়স ১৮ বৎসর, বর্ণ গৌর ও চক্ষু ঈষৎ পিঙ্গল। বাটী হইতে বাহির হইবার কালে তাহার পরিধানে কালপেড়ে মিলের ধূতি, গায়ে কাল 'আলপাকার' কোট ছিল। যে কেহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাহার

কোন সংবাদ দিতে পারিবেন, তাহাকে উপরোক্ত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

শ্রীহৃদয়নাথ মজুমদার।
পোঃ আঃ পাঁচগাও। জিলা ঢাকা।

বিজ্ঞাপন খানা পড়িয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম। বহুদিনের একটা কথা মনে পড়ায় মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। বহুদিনের একটী ছবি চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। সে আজ বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। অনেক দিনের হইলেও আমার কাছে তাহা যেন সদ্য ও নূতন; যখনই একা বসিয়া থাকি তখনই তাহা মনে পড়িয়া যায়! চিরদিনই বোধ হয় ইহা স্মৃতি পটে এমনি ভাবে জাগিয়া থাকিবে। আমার জীবনেও এমনি একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। যখন মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি; যখন সংসার চিনি নাই; জীবনে দুঃখের আভাসও পাই নাই; তখন এক মুহূর্ত্ত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কি কাণ্ড করিয়াছিলাম—কেমন করিয়া স্নেহ মমতা পদদলিত করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা মনে পড়িলে আজ এই বৃদ্ধ বয়সে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, অশ্রুরোধ করিতে অসমর্থ হই।

কথাটা কি বুঝাইয়া বলিতেছি—ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ হওয়ায় ছোট বেলা হইতেই একটু অতিরিক্ত রকমে আদুরে ছিলাম। কোন কিছুর জন্য বায়না ধরিলে তাহা না দিবার যো ছিল না—কাঁদিয়া বাড়ী তোলপাড় করিয়া ফেলিতাম। ধনীর সন্তান ছিলাম বলিয়া কিছুরই অভাব ছিল না। আমার সুখের জন্য বাড়ীর সকলে উদ্‌গ্রীব থাকিতেন। আমার অসুখ করিলে তাঁহাদের প্রাণপণ শুশ্রুষা ও যত্নের ত্রুটী হইত না।

পাঁচবৎসর বয়সে আমার হাতে খড়ি হইল। বাবা আমাকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। প্রথম দিন পাঠশালায় যাইতে—সাধারণতঃ বালকেরা যাহা করে আমিও তাহার অন্যথা করি নাই। বরং এ বিষয়ে অন্যান্য অপেক্ষা একটু বেশী ছিলাম বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। গুরুমহাশয়ের সেই উন্নত ভুঁড়িযুক্ত দেহ, বেত মণ্ডিত, কারণে অকারণে শিষ্যদিগের পৃষ্ঠে পতিত সেই কুম্ভকর্ণের বাহুতুল্য হস্ত মনে পড়ায় বিদ্যাশিক্ষার দিকে ঝোকটা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। পড়িতে যাবৃ না মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে খেলা করিতেছি, এমন সময় বাবা আসিয়া পাঠশালায় যাওয়ার

জন্য প্রস্তুত হইতে বলায়, আমার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। খেলা ছাড়িয়া দৌড়িয়া গিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিলাম। ভাবিলাম যখন এমন সুদৃঢ় দুর্গের আশ্রয় লইয়াছি তখন আর ভয় কোথায়! কিন্তু দেখিলাম হিতে বিপরীত হইল! মা যে নিজেই আমাকে পাঠশালায় যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রাগ, মান, অভিমান শেষে কান্না পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইল। অবশেষে আর কোন উপায় নাই দেখিয়া আমাকে আত্ম সমর্পণ করিতে হইল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়িতে গেলাম। আমার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইল।

ক্রমে পাঠশালায় পাঠ সমাপ্তির পর আমাকে ইংরেজী পড়িবার জন্য সহরে আসিতে হইল। সহরে আমাদের একটী বাসা ছিল, তাহাতে খুল্লতাত মহাশয় থাকিতেন। তিনি সেখানের একজন গণ্য মান্য হাকিম—প্রতিপত্তিও খুব কম নয়।

খুড়া মহাশয়ের যত্নে এখানে থাকিয়া পড়িতে লাগিলাম। তিনি আমাকে ইংরেজী উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রথমদিন স্কুলে যাইয়া দেখিলাম মাষ্টারগণ গ্রাম্য বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়দের মত নহেন। কিন্তু গ্রাম্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট যে ছিলেন না, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি না।

দুই তিন বৎসর অতীত হইল। হঠাৎ একদিন এক নিদারুণ সংবাদ আসিয়া উপস্থিত; সংবাদ পাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল, সূর্য্যের আলো আমার চক্ষে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল—চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। কি নিদারুণ সংবাদ! আমার স্নেহময় পিতৃদেব আর ইহ জগতে নাই! আমি আর তাঁহাকে এ জীবনে দেখিতে পাইব না। আর তাঁহার সুধা মাখা কথা শুনিতে পাইব না! হতভাগ্য আমি পিতার মৃত্যু শয্যায় উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না? তাঁহার সেবা শুশ্রূষাও করিতে পারিলাম না। চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। জীবনে এই প্রথম দুঃখের আস্বাদ পাইলাম। ইহাই আমার প্রথম শোক, তাই সামলাইতে অনেক বেগ পাইতে হইল। মহাসমারোহে পিতার ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দরিদ্র ও কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া মনে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইলাম। শ্রাদ্ধের পর সহরে ফিরিয়া আসিয়া আবার বিদ্যা শিক্ষায় মন ডুবাইয়া দিলাম। এই

রূপে 'প্রবেশিকা' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। স্কুলের পড়া শেষ হইল। আমাদের সহরেই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কলেজ ছিল তাহাতে নাম লিখাইলাম। দুই বৎসর পরে মা সরস্বতীর কৃপায় 'এফ, এর সাগরও পার হইলাম।

আমাদের কলেজে বি, এ ক্লাস ছিল না। তাই এখন কোথায় গিয়া পড়িব তাহা লইয়া গোলমাল লাগিয়া গেল। বাল্যকাল হইতেই যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা আমার বড় প্রবল। কিসে দশের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিব, দেশের মধ্যে গণ্যমান্য বলিয়া বিবেচিত হইব, ইহাই আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য ইংলণ্ডে গিয়া সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য খুল্লতাতকে ধরিয়া বসিলাম। তিনি কিন্তু ইহাতে রাজী হইলেন না। বরঞ্চ ইংলণ্ড কিরূপ ভয়ঙ্কর স্থান, অপরিণত বয়সে সেইখানে গেলে কিরূপ অধঃপতন হয়, সেই সব বিষয়ে উপদেশ দিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু "ভবী" ভুলিবার নয়। তাঁহার উপদেশ বাণের সন্ধানে আমি জর্জ্জরিত হইলাম। আমার ইচ্ছাকে অবিচলিত ও অটল রাখিতে চেষ্টা করিলাম। ক্রমে খুড়ামহাশয়ের সঙ্গে ইহা নিয়া অনেক বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কথা প্রসঙ্গে তিনি একটু রাগ করিয়া আমায় তিরস্কার করিলেন। সে তিরস্কার বোধ হয় স্নেহের :— ব্যথিত জনক যেমন অবাধ্য পুত্রকে তিরস্কার করেন, খুড়া মহাশয় আমাকেও তেমনই তিরস্কার করিলেন। হতভাগ্য আমি সে তিরস্কারের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। প্রাবৃটের একদিনের জলধারা পাতে অন্তঃসলিলা নদীর বারিরাশি যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনই তাঁহার এই তিরস্কারে আমার অষ্টাদশবর্ষের রুদ্ধ অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কি জানি কেন হৃদয়ের ভাবগুলি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। "আমার সঙ্গে আপনার সব সম্বন্ধ এই শেষ"—রোষরুদ্ধ কণ্ঠে কথাগুলি বলিয়া গৃহের বাহির হইয়া পড়িলাম। খুল্লতাত আমাকে ডাকিলেন। আমি ফিরিলাম না। রাস্তায় বাহির হইয়া একবার দ্বিতলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অশ্রু ভারাক্রান্ত দুইটী কাতর নয়ন আমার দিকে চাহিয়া আছে দেখিলাম। সে চক্ষু দুটী খুড়িমার। খুড়িমার কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। আমি একাই তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকু অধিকার করিয়া বসিয়াছিলাম। তাঁহার ক্ষুধিত পুত্রস্নেহ আমাকে পাইয়া যেন কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া-

ছিল। হায়! বন্ধ্যানারীর স্নেহ এমনই বটে! তাঁহার নিকট যে অকৃত্রিম স্নেহ পাইয়াছিলাম, এ পৃথিবীতে কয়জন সেরূপ স্নেহ দিতে পারে। খুড়িমাকে দেখিয়া মনটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তখনই আবার বিদ্রোহী ভাবগুলি, জাগিয়া উঠিল। হায় নারী! আপনার হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহরাশি দিয়াও ত আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলে না। কই, আমিত তোমার স্নেহডোরে বন্দি হইলাম না। তোমার সমস্ত স্নেহমমতা পদদলিত করিয়া চলিয়া গেলাম—রাখিতে ত পারিলে না!

এইরূপে খুড়ামহাশয়ের গৃহত্যাগ করিলাম। রাগের বশে ত বাটী হইতে বাহির হইলাম। কোন দিকে যাইব, কোথায় যাইব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। লক্ষ্যহীন ভাবে চলিতে চলিতে একটী হোটেলের দ্বারদেশে আসিয়া পড়িলাম। কি জানি কি ভাবিয়া তাহাতেই গিয়া আশ্রয় লইলাম। সঙ্গে যে টাকাকড়ি আনিয়াছিলাম তাহাতে শীঘ্র অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

কয়দিন হোটেলে কাটাইলাম। একদিন হোটেলের বাহিরের টেবিলের উপর হইতে "সঞ্জিবনী" খানা উঠাইয়া লইয়া পড়িতে পড়িতে দেখিতে পাইলাম খুড়ামহাশয় আমাকে গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিয়া তাহাতে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। বিজ্ঞাপনটী পড়িয়া একটু ম্লান হাসি হাসিলাম।

বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম অনেক বাঙ্গালী গৃহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন সহরে গিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতে পারে। তাই সেখানে যাওয়াই ঠিক করিলাম। রেঙ্গুনে আসিয়া একজন সদাশয় ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় লইলাম। এখানে আসিয়া এক নূতন সজীবতা অনুভব করিতে লাগিলাম। কোথায় দেখি হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র পরিহিত নগ্নপদ 'ফুঙ্গি' স্ত্রীপুরুষের মেলা, কোথায় দেখি বিচিত্র—'থামি' পরিহিতা বিবাহিতা স্ত্রীলোক 'আপি'ওদের মনোরম ফুল ও মালা বিক্রয়। দেখিলাম এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা অতিশয় কর্ম্মঠ ও সজীবতার প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু পুরুষগুলা জড়তার অবতার বিশেষ;—তাহারা কেবল আমোদ প্রমোদেই দিন কাটাইয়া দেয়। রেঙ্গুনে থাকিয়াই বি, এ, ও ওকালতি পাশ করিয়া সেইখানের বারে প্রবেশ করিলাম। দিনে দিনে পসার বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। যে বাঙ্গালী বাবুর বাসায় প্রথম আশ্রয় লইয়াছিলাম তিনি আমার

প্রতিপত্তি লাভ দেখিয়া আমাকে তাঁহার জামাতা পদে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। আমিও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের সুযোগ পরিত্যাগ করিলাম না। আমার বিবাহ হইল। এইরূপে অনেক দিন গত হইল। ইতিমধ্যে খুড়ামহাশয়ের কোন সংবাদ পাই নাই, দেশেও ফিরি নাই। ক্রমে যৌবন গত হইল মস্তকের কৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যে শ্বেত রেখা দেখা দিল; শরীরের উষ্ণ রক্ত ক্রমে শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। তখন বুঝিতে পারিলাম কি ভ্রমই করিয়াছি। যাঁহাদিগকে স্নেহ মমতার বিনিময়ে কেবল যাতনা দিয়া আসিয়াছি তাঁহাদের কথা ভাবিয়া উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলাম। তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু লজ্জায় দেশে ফিরিতে পারি নাই।

আরও কিছুদিন গত হইলে দেশের কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইলাম। তাহাতে লিখা ছিল:—আমার খুড়ামহাশয়ের ও খুড়িমার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে উইল করিয়া খুড়ামহাশয় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আমায় দান করিয়া গিয়াছেন। আমি যেন দেশে গিয়া তাহা ভোগ দখল করি। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন যে:—আমার নিরুদ্দেশের পর হইতে খুড়ামহাশয় ও খুড়িমা আর বাড়ী যান্ নাই ও মাতাঠাকুরাণী ও জ্যেষ্ঠের সহিত দেখা করেন নাই।

পত্র পড়িয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। হায়! আমি কি করিয়াছি! আমিই যে তাঁহাদের মৃত্যুর কারণ। জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মিয়া গেল। দেশে ফিরিবার আশা চিরতরে বিসর্জ্জন দিলাম। রেঙ্গুনেই খুড়ামহাশয় ও খুড়িমার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলাম। শ্রাদ্ধে খুব ব্যয় করিলাম বটে কিন্তু কই মনেত শান্তি পাইলাম না। তার পর এই বিংশতি বৎসর যাবৎ এইখানেই বাস করিতেছি। এ তাপ দগ্ধ জীবনে শান্তি পাইবার নয়। তাঁহাদের স্মৃতি পূজা করিয়া এইখানেই জীবন কাটাইয়া দিব মনস্থ করিয়াছি—দেশে আর এই কালামুখ দেখাইবার ইচ্ছা নাই।
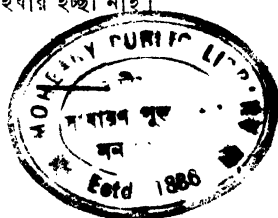
৫ম বর্ষ, } আশ্বিন, ১৩২৪ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

নূতন ও পুরাতন

[লেখক—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী]

১

বর্ষার কূলভাঙ্গা নদীর মত প্রথম যৌবনের উদ্দাম প্রবাহ যখন মানুষের কানায় কানায় ভরিয়া বহিতে থাকে, তখন অনেক রকম কঠোর অলীক কল্পনাও সরল সত্যের মূর্ত্তিতে চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে।

নদীর যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না—দু'কূল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তোলপাড় করিয়া সামনে যা পায় ভাসাইয়া লইয়া যায়, মানুষেরও তেমনি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়া, অত্যন্ত অসম্ভব জিনিষগুলাকেও তাহারা নিত্যনৈমিত্তিক সহজ সাধারণ ব্যাপারের মত আঁকড়াইয়া ধরিতে যায়।

তেমনি এক উদ্দাম মুহূর্ত্তে বিনোদিনী স্বামীর জন্য খুব একটা স্বার্থত্যাগ দেখাইয়া ভালবাসার প্রতিদান দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। কিন্তু এমন কি স্বার্থ সে বলি দিতে পারে, যাহাতে স্বামী তাহার ভালবাসার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইবেন, তা' অনেক দিন অবধি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

বড় মানুষের এক ছেলের বৌ—শাশুড়ীর বুকের একখানা পাঁজরার মত, রাঁধিতে বাড়িতে হয় না, চাকর দাসী রাঁধুনীর অভাব নাই। তবুও বিনোদিনী শাশুড়ীর কাজ গুলি এবং নিজের ঘরের কাজগুলি আপনার হাতে করিত—ঝি চাকরদের সে দিকে ঘেঁসিতে দিত না। তা ছাড়া দিন রাত শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ফিরিয়া তাঁহাকে এমন করিয়া

লইয়াছিল যে তিনি বৌ মা বলিতে অজ্ঞান হইতেন। ঝি চাকররাও সবাই গুণে বশ। গাঁ শুদ্ধ লোক বলিত—"এমন লক্ষ্মী বৌ কারুর বরাতে হয় না।"

শাশুড়ী বিধবা—ভোর বেলা উঠিয়া গঙ্গা স্নান করিতে যাইতেন। বিনোদিনী সেই সময়ের ভিতরে রান্নাবাড়ার সকল বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিয়া রোজ তাঁহার পূজার আয়োজন করিতে বসিত।

সে দিন ঠাকুর ঘরে পূজার আয়োজন করিয়া দিয়া বিনোদিনী চন্দন ঘসিতেছে, শাশুড়ী স্নান করিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই কহিলেন—"ও সর্ব্বনাশ, এ কি করেছ বৌমা, হাতের মাদুলি গুলো সব খুলে ফেলেছ ?"

"আর কতকাল মা ওই সব একরাশ বোঝা বয়ে বেড়াব ?"

"না না, মা অমন কথা বলো না, সব ঠাকুর দেবতার জিনিষ—ওতে কি হেলা কর্‌তে আছে? কত লোকের যে ওই ধারণ করে ছেলে হ'ল ?"

বধূ ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"তা মা, জন্মভোর কি বইতে হবে ?"

"তা মা দোষ কি, বয়েস তো যায়নি। তিন বছরে হ'ল না, চার বছরে ফলবে। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে এখনো সতেরো পেরোয় নি, এরির মধ্যে কি বয়েস গেল ?"

"তোমার কাছে আমার বয়েস কখ্‌খনো যাবেনা মা, বলিয়া বধূ আবার একটু হাসিল, তার পরে বলিল—"লোকে যে ঠাট্টা করে—" বলিয়াই মুখ নীচু করিল।

শাশুড়ী বুঝিলেন, কহিলেন—"নলিন কিছু বলেছে বুঝি ? তা মা ওরা সব এ কালের ইংরাজী-পড়া ছেলে—ওরা মানে না বলে তুমি শুনো না।"

বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিল।

শাশুড়ী আবার কহিলেন—"তা যা খুলে ফেলেছ—থাকগে, কাল ভোরে হালদার বাড়ীতে সঙ্গে নে' গে' মা কালীর স্বপ্নাদ্য কবচ পরিয়ে আনবো, অব্যর্থ ওষুদ। দাসেদের বৌয়ের, মুকুয্যেদের মেয়ের আর শাঁখারী গিন্নীর শুনতে পাই ওই কবচ ধারণ করে বছর ফিরতে না ফিরতে বেটা হয়েছিল।"

বিনোদিনী একটি ছোট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।"

কিন্তু হালদার বাড়ীর অব্যর্থ স্বপ্নাস্থ কবচও, গিন্নীর বরাত দোষেই হোক কি বৌয়ের কর্ম্মের ফেরেই হোক, ব্যর্থ হইয়া গেল।

এ দিকে তিন চার বছর কি, বিনোদিনীকে তেরো হইতে তেইস বছর পর্য্যন্ত দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া নানা রকমের ঔষধ-পালা করিয়া, ব্রত-নিয়ম করাইয়া, মন খানেক সোনা-রূপা-তামা-লোহার বোঝা বহাইয়া, বুক চিরিয়া রক্ত দিবার মানসিক পর্য্যন্ত করাইয়াও যখন কিছুতেই সন্তান-সম্ভবা করিয়া তুলিতে পারিলেন না, তখন গিন্নী নিরাশ হইয়া অত্যন্ত দুঃখে হাল ছাড়িয়া দিলেন।

নাহিতে আসিয়া শাঁখারী-গিন্নী এদিক ওদিক চাহিয়া চুপি চুপি বলিল —"তা বোন্, ওর বরাতে নেই, তা তুমি চেষ্টা করলে কি হবে বল? তা বলে কি একটা ছেলের জন্যে এত বিষয়-সম্পত্তি ভেসে যাবে, নলিনের আর একটি বে দেও।"

গিন্নী চমকাইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন যে, এমনতর অসম্ভব ব্যাপার যেন আর কিছুই হইতে পারে না, তেমনি ভাবে জবাব করিলেন—"দূর বোন, তাও কি কখনো হয়?"

দিন কতক পরে ঘোষেদের ছোট বউ চাল ধার করিতে আসিয়া পরামর্শ দিল—"তা বলে কি বংশের কেউ একটু জল পিণ্ডি পাবে না? তুমি দিদি বেটার আবার বে দেও।"

গিন্নী হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ঘোষবউ দৃঢ় স্বরে কহিল—"কথাটা শুনতে কষ্ট বটে, কিন্তু এমন কি হচ্ছে না? এই যে আমাদেরই দ্যাখ না, বড়-জার ছেলে হলনা বলে বটঠাকুর আবার বে করলেন। ছেলে বিইয়ে সে আবাগী মরে না গেলে কি একসঙ্গে ঘর করতো না— না, বড়দিদি পর হয়ে ভেসে যেতো?"

এই রকম করিয়া মাস কতক ধরিয়া পাড়ার শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় বন্ধুরা যখন নলিনের আবার বিবাহ দিবার জন্য অনবরত সৎপরামর্শ দিতে লাগিল, তখন গিন্নীর একদিন হঠাৎ মনে হইল যে—এটা একেবারে অসম্ভব নয়, এমনও তো হইতেছে, নলিনের আবার বিয়ে দিলেই কোন্ বৌমা পর হইয়া যাইতেছে, বিনোদিনীর মত লক্ষ্মী বৌ কি

কাহারও হয়—সে যেমন তাঁহার বুকের পাঁজরা তেমনিই থাকিবে! কিন্তু তিনি তখনই কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

তা না পারুন, কথাটা যখন কিছুদিন ধরিয়া নাড়াচাড়া হইতে লাগিল তখন বুকের পাঁজরার তা টের পাইতে দেরি হইল না, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে খড় খড় করিয়া উঠিল।

এতদিন হইতে বিনোদিনী মনে মনে যে একটা কিছু করিবার জিনিষ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না—সেটা যেন ভগবান তাহার চোখের সুমুখে ধরিয়া দেখাইয়া দিয়া গেলেন। সে আনন্দে লঘু চিত্তে রাত্রে স্বামীকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া বসিল—"তোমার আর একটি বে করতে হবে।"

নলিন রহস্য ভাবিয়া জবাব দিল—"একে চন্দ্র দিন রাত আলো দিচ্ছে, দুয়ে—পক্ষ হলেই যে মাসের অর্দ্ধেক দিন অন্ধকারে কাটবে।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল—"এখন বরং অন্ধকারের ভয়, তখন চাঁদ সুয্যি দুদিক থেকে দিন রাত আলো করবে।"

"আমার চাঁদই ভাল—সুর্য্যের তাপ সইতে পারব না।"

এমনি করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস রোজ রোজ বিনোদিনী যখন স্বামীকে বড়ই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল, তখন একদিন সে ব্যাজার হইয়া কহিল—"দ্যাখ রোজ রোজ ওই এক কথা নিয়ে জ্বালাতন করো না. শেষ কি আমায় বাড়ী ছাড়া না করে ছাড়বে না?"

"তুমিও কি এত বড় বংশের নাম পর্য্যন্ত লোপ না করে ছাড়বে না?"

"চুলোয় যাক বংশ—আমার খুসী, জ্বালাতন করো না।"

"তবে আমিও আত্মহত্যা করে মরবো।"

৩

শাশুড়ী অনেক দিন হইতেই বৌকে কথাটা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিলেন না—কে যেন সবলে ঠোঁটের দোরে আগড় ঠেলিয়া ধরিয়াছিল। বিনোদিনী বুঝিতে পারিয়া একদিন আপনিই কথা পাড়িল।

বিনোদিনীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন গা বৌমা, মুখখানা আজ অমন ভার ভার দেখছি? নলিন কিছু বলেছে বুঝি?"

বিনোদিনী মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে জবাব দিল—"না, মা।"

"তবে ?"

"আর যেন এ বাড়ীতে মন টেকেনা মা, কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।"

শাশুড়ীরও চোখের কোনে দু'বিন্দু জল দেখা দিল, ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"সত্যি কথা মা, এত বড় বাড়ী, ছেলে পুলে না থাকায় খাঁ খাঁ করছে, কি বরাত করে এসেছিলুম—সকল থাকতেও জল পিণ্ডের আশা লোপ হ'ল।" বলিয়া উদাস ভাবে চাহিলেন।

বিনোদিনী উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—"তা এখনো উপায় থাকতে কর না কেন মা ? আমাদের বংশটা লোপ হবে সে যে মহাপাতক, ভাবলেও গা শিউরে উঠে।"

শাশুড়ী আশ্চর্য্য হইয়া বধূর পানে নীরবে চাহিয়া রহিলেন, বধূ আবার কহিল—"কেন মা, এই দশ বচ্ছর ধরে আমায় নিয়ে যত ওষুধ-পালা ক'চ্ছ—এ্যাদ্দিনে যে আর একটি বউ আনলে ছেলের আমার হাতে খড়ি হয়ে যেতো ?"

শাশুড়ী তবু কথা কহিতে পারিলেন না, বৌয়ের পানে বিরাট বিস্ময়ে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বৌ আবার বলিল—"সত্যি বলছি মা, আমার বড় সাধ যে একটি রাঙা টুকটুকে বোন ঘরে আসে। আমি তাকে নাওয়াবো খাওয়াবো সাজাবো পরাবো আপনার হাতে মানুষ করে তুলবো, তোমায় কোন ঝক্কি পোহাতে হবে না।

বলিতে বলিতে উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া ছোট মেয়েটি যেমন মায়ের গলা ধরিয়া পুতুলের জন্য আবদার করে—তেমনি করিয়া শাশুড়ীর গলা জড়াইয়া আবদার করিয়া কহিল—"দেওনা মা আমায় একটি ছোট বোন এনে ?"

নবছরের বেলা হইতে এই মাতৃহীনা বধূটিকে ঘরে আনিয়া শাশুড়ী এমন আদরে মানুষ করিয়াছিলেন যে শাশুড়ী বৌয়ের মাঝখানে আর কোন রকম সরম-সঙ্কোচ-সম্ভ্রমের বাধা ছিল না। সুতরাং বধূর কথাগুলো যে একটাও মন-রাখা ছেঁদো-কথা নয়, অথবা অভিমানের খোঁচাও নয়, সে গুলো যে তার সরল প্রাণের সোজা সত্য কথা—তা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। তবু আরো ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য বলিলেন—

"তুমি বল কি মা, সাধ করে ঘরে সতীন আনতে কে চায় ?

বধূ ডাগর ডাগর চোখ দুটি কপালে তুলিয়া একটুখানি অবাক হইয়া শাশুড়ীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল তারপরে বলিল—

"সতীন কে মা ? সে যে আমার বোন। তুমি কি ভাবছো যে আমার হিংসে হবে ? কেন গা, আমি বড় সংসারের গিন্নী আমার ওপর কে এক কথা কইতে পারবে ? সত্যি বলছি মা যদি আমার তিন কুলে একটা বোনও থাকতো, তা হলে আমি যেমন করে পারি হাতে পায়ে ধরেও এ বাড়ীতে এনে পুরতুম। একটা সন্তানের জন্যে প্রাণ আমার আকুলি-বিকুলি করছে। তোমার পায়ে পড়ি মা— তুমি একটি বউ এনে দেও।"

শাশুড়ী আদর করিয়া, কচি মেয়েটির মত, বধূকে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন। তাহার দু'চোখ উপচাইয়া জলধারা স্রোতের বেগে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সেদিন রাত্রে জীবনে প্রথম ও শেষ বিনোদিনী স্বামীর সঙ্গে নেহাৎ একগুঁয়ে হইয়া যথার্থ ঝগড়া করিল, শেষে তাহার পা ছুঁইয়া দৃঢ়ভাবে তিন সত্য করিয়া শপথ করিল—

"তুমি যদি ফের বে না কর, তবে আমি আত্মহত্যা করে মরবো, মরবো, মরবো। তোমার বাড়া প্রিয়, তোমার বাড়া গুরু আমার জগতে কেহ নেই, যদি আমি সত্য রাখতে না পারি, তবে ইহ জীবনে যেন তোমার মুখ দর্শনে বঞ্চিত হই।"

বিনোদিনী অভিমানের বশে হঠাৎ অতি ভয়ানক শপথ করিয়া ফেলিল, কিন্তু কথা কটা বলিয়াই পরমুহূর্ত্তে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—আতঙ্কে মুখ শুকাইয়া গেল।

নলিন জীবনে কখনো স্ত্রীর মুখে এমন কথা শোনে নাই—এমন মূর্ত্তি দেখে নাই, সে মনে মনে ভয় পাইল।

তার উপর রোজ রোজ এই কথাটার আলোচনায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—রাগ করিয়া কহিল—"আচ্ছা, বে করবো, যদি আপনা হতে জোটে। কিন্তু তারপর আমায় দুষতে পাবেনা—তা এখন থেকে বলে রাখলুম।"

বিনোদিনী হঠাৎ তাহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"আমি বড় সুখী হলুম, কিন্তু মাফ কর আমায়।"

নলিন কিছু বুঝিতে পারিল না, হাত ধরিয়া তুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

তখনও বিনোদিনীর বুকের ভিতরটা আতঙ্কে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল; পাণ্ডুর মুখে, চোখ দুটি মাটীর পানে নামাইয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল —"আমি রাক্ষসী, মুখ দেখোনা, আমায় ত্যাগ কর, কি মহা অলক্ষণে কথা মরতে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ?"

নলিন উচ্চ হাসিয়া বিনোদিনীকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া আদরে মুখ চুম্বন করিল।

৪

এক বছর পরের কথা।

নলিনের আবার বিবাহ হইয়াছে। মাস খানেক হইল চোদ্দ বছরের লেখাপড়া জানা নূতন বৌ ঘর করিতে আসিয়াছে।

সেই যেদিন কোন্ এক অশুভক্ষণে বিনোদিনীর মুখ দিয়া হঠাৎ সেই নির্ঘাৎ কথাটা বাহির হইয়া গিয়াছিল—সেই দিন হইতে যেন কোন্ অদৃশ্য হস্ত তাহার ও তার স্বামীর মাঝখানে এমন একটা অন্ধকার গভীর খাদ খুড়িয়া দিয়া গিয়াছে যে, সেটা পার হইয়া সেই চির আরাধ্য, চির ঈপ্সিত জনের কাছে যাইতে আতঙ্কে তাহার সারা বুকের ভিতরটা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত।

তারপরেও স্বামী তাকে কত আদর করিয়াছেন, কতবার যত্নে বুকের উপর টানিয়া লইয়াছেন কিন্তু সে কিছুতেই আর ঠিক্ সেই আগেকার মত তাহার ভিতরে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া মিশিয়া যাইতে পারে নাই —যতবার চেষ্টা করিয়াছে ফি বারেই যেন সেই অদৃশ্য শক্তি তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া তফাৎ করিয়া দিয়াছে।

এতদিন নলিন সেটা ভাল রকম ঠাহর পায় নাই, ছোট বউ ঘর করিতে আসার পর' হইতে টের পাইল।

বিনোদিনী ছোট বউকে ঠিক আপনার ছোট বোনটির মত ভালবাসে, সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়া বেড়ায়, খাওয়ায় পরায় সাজায় গোজায় আর সন্ধ্যার একটু পরেই নিজের ঘরে দিয়া আসিয়া, বাহিরের জানালাটির ফাঁকে চোখ দুটি রাখিয়া চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

স্বামীর সহিত নববধূর সম্ভাষণ শুনিয়া তার ভারি আমোদ বোধ হয়,

প্রাণ ভরিয়া হাসে। যেন—সে কখনো নূতন বৌ ছিল না, এমন করিয়া নলিনের সঙ্গে কখনো তার ভাব করিতে হয় নাই! সে পুতুল খেলার মত, যেন এই যুবক আর কিশোরীটীকে লইয়া সংসার পাতিয়া সাধ মিটাইয়াছে!

যেদিন স্বামী নববধূর মুখ খানিতে জোর করিয়া প্রথম চুম্বন দিল, আড়ি পাতিয়া দেখিয়া, বিনোদিনীর ভারি আহ্লাদ হইল, তাড়াতাড়ি অস্থির হইয়া ছুটিয়া গিয়া, শাশুড়ীর চুল গুলো একটানে খুলিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া বাঁধিতে বসিল। তাহার খুব আনন্দের কারণ ঘটিলেই এমনিতর চুল লইয়া বাঁধিতে বসিত, তা শাশুড়ি জানিতেন, অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে বৌমা ?"

বিনোদিনীর ঠোঁটের আগায় কথাটা আসিয়া পড়িয়াছিল,—"ওগো" বলিয়াই হঠাৎ জিভ কাটিয়া থামিয়া গেল, তারপরে মুখে কাপড় গুজিয়া ছুটিয়া পলাইল।

শাশুড়ী অনুমানে ব্যাপারটা কতক বুঝিলেন, অবাক হইয়া ভাবিলেন—"বৌমা কি আমার মানুষ না দেবতা ?" তার পরক্ষণেই হঠাৎ মনে পড়িল—তিনিই তো সাধ করিয়া এমন বৌয়ের সুখের পথে কাঁটা তুলিয়া দিয়াছেন। বিষাদে নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে জানাইলেন—"হে ঠাকুর, দেখো, মা লক্ষীর আমার নাইতে যেন কেশ না ছেঁড়ে, এ সোণার পদ্ম যেন কখনো মলিন না হয়।"

একদিন সে ধরা পড়িয়া গেল।

সেদিন বোধ হয় আড়ি পাতিতে গিয়া, আনন্দের বেগ সামলাইতে না পারিয়া বিনোদিনী অসাবধানে একটু খুট করিয়া শব্দ করিয়া থাকিবে।

সেদিন নবদম্পতীর মান ভঞ্জনের পালা। নলিন হাজার রকমের চেষ্টা করিয়া প্রভাবতীকে কথা কহাইবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। হঠাৎ খুট করিয়া শব্দটি কাণে ঢুকিতেই প্রভা চমকাইয়া উঠিল, নলিন ধাঁ করিয়া বাহিরে আসিয়াই বিনোদিনীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল, বলিল—"তবে রে চোর ?"

বিনোদিনী লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল।

নলিন তাহাকে ধরিয়া ঘরে লইয়া যাইবার জন্য যতই টানাটানি করিতে লাগিল, সে কিছুতেই গেল না, শেষে অত্যন্ত জোরে আপনাকে মুক্ত করিয়া

গম্ভীর হইয়া চলিয়া গেল। নলিন একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

ঘরে ঢুকিতেই প্রভাবতী জিজ্ঞাসা করিল—"কে, বড় গিন্নি বুঝি?"

নলিন গম্ভীর হইয়া বলিল—"হুঁ।"

"মরণ আর কি, একটু লজ্জাও নেই, লুকিয়ে আড়ি পাতা? বুড়োমাগী মরবার বয়েস হয়ে এলো—এখনো ঢং দ্যাখ। একি হিংসে রে বাপু? একটু নিশ্চিন্দি হয়ে দুটো কথা কবার জো নেই। কেন, এতকাল তো একলা ভোগ করে এলি—দুটো দিন আর সয় না!"

নলিনের অন্তরে কথাগুলো বিঁধিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

স্বামীকে গম্ভীর মুখে নীরব থাকিতে দেখিয়া আবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল— "বলি কিগো, তোমার যে শোকের সাত-সমুদ্দুর একেবারে উথলে উঠ্‌লো দেখ্‌তে পাই? তা, বেশ, ওই কালামুখী বড়াই বুড়ীকে নিয়েই থাক—যাই আমি বাপের বাড়ী চলে।"

তারপরে অভিমানে মুখ রাঙা করিয়া কান্নারসুরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিল—"তাই যদি মনে ছিল তবে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে কেন? তুমি না বে কর্‌লে কি আমার আর বর জুটতো না?"

নলিনী গলিয়া জল হইয়া গেল। আদর করিয়া, অভিমানখিন্ন রাঙা মুখে চুমো খাইয়া—মান ভাঙ্গাইতে ভাঙ্গাইতে ভাবিল—"পুরাণোর চেয়ে নূতন ভাল।"

সেই হইতে দারুণ লজ্জায় এবং একটা অজ্ঞাত আতঙ্কের ভয়ে বিনোদিনী যতই স্বামীর চোখ এড়াইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিল, নলিনও ততই দিন দিন নূতনের প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া পুরাতনের প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল যে বড় বৌয়ের নাম শুনিলেও সেখান হইতে উঠিয়া যাইত।

এটাও বিনোদিনী হাসিমুখে সহ্য করিল, ভাবিত—"দোষ তো আমারই, আমিই যখন ইচ্ছা করিয়া আপনার হাতে বিষ খাইয়াছি—তখন জ্বলুনি না সহিলে চলিবে কেন?"

ভাবিয়া, সে হাসিমুখে সকল অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিত। স্বামীর অতিরিক্ত বশ্যতায় ছোটবউয়েরও শাশুড়ীর ভয় ঘুচিয়া ছিল—ইদানীং যখন তখন বড়বৌকে জ্বালাইতে, গঞ্জনা দিয়া অগ্রাহ্য করিয়া আপনার একচেটিয়া

আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টায় ফিরিত। তাও বিনোদিনী আমোলে আনিত না।

কিন্তু যখন স্বামীর উপেক্ষার আচরণ গুলো প্রতিদিন শেলের মত আসিয়া তাহার উপর পড়িতে লাগিল, তখন আর সহিতে পারিল না। দিনে দিনে শুকাইয়া শয্যা লইল।

কাশি, বুকে ব্যথা তার উপর দারুণ জ্বর। নলিন শুনিয়াও শুনেনা—একবাড়ীতে থাকিয়াও খোঁজ লয় না, তার প্রিয়তমার মনোরঞ্জন করিতেই উন্মত্ত। ছোটবউও একটিবার আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখে না। কেউ কিছু বলিলে বলে—"ও সব ঢং দেখতে পাওনা? তোমরা যে বল শক্ত ব্যামো, তা একদিনের তরেও কি একটু আঃ উঃ, কি আতরাণি কাতরাণিও টের পেতে না? বলে—

কত ঢংই জানোরে বাছা, কত ঢং জানো,
আর, মাঝ দরিয়ায় জাল ফেলিয়ে ড্যাঙ্গায় বসে টানো।

লোকে শুনিয়া অবাক হইয়া যাইত, কিন্তু শাশুড়ী বউ কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিত না। এই দুটি উপেক্ষিত প্রাণী পরস্পর আপন আপন পাপের ফলে অপরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ভাবিয়া পরস্পরের প্রতি অগাধ সহানুভূতিতে নিরালা গৃহকোনে পরস্পরের জন্য নিভৃত স্নেহনীড় বিছাইয়া দুটিতে কেবল দুটির মুখ চাহিয়াই কোনমতে শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(৬)

মাস ছয়েক পরে একদিন প্রভাবতীর ইচ্ছাক্রমে নলিন শালী-শালাজদের নিমন্ত্রণ করিয়া প্রীতিভোজনের আড়ম্বর জুড়িয়া দিল। সকাল বেলাতেই চাকরবাকরদের নানা রকম ফরমাস করিয়া বাজারে পাঠাইয়া বাড়ীর ভিতর আসিতেই প্রভা চুপি চুপি স্বামীকে ডাকিয়া কহিল,—

"ওগো শুনছ, কালিয়াটা বামুন ঠাকুর রাঁধতে পারবে না।"

"তবে কে রাঁধবে? আগুন তাত লাগলেই তো এখুনি তোমার মাথা ধরে সারারাত ছটফট করবে, আর আমার তো ও বিদ্যেটা হয় নি!"

প্রভা নীচু স্বরে চোখ টিপিয়া কহিল—"কেন বড় গিন্নী কি করে?"

"তার কি অসুখ না কি শুনেছিলুম না?"

"কে বল্লে? ও সব কল্লা—শোন্ন কেন? অসুখ করলে তো আর তার জবাব দিই নাই—সাতখুন মাপ। কেন আমাদের সংসারে খেটে মরতে

যাবে, তাই ওই ছুতো করে—ছ'মাস শয্যে নে আছেন। মেজ দিদি আমায় ঠাট্টা করে বলেছিল—তোর নাকি লো ভারি গুণের সতীন, খুব ভাল কালিয়া রাঁধতে পারে? তাই বড়গিন্নির কালিয়া রান্না তাকে খাওয়াবো।"

নলিন আর কিছু না বলিয়া মায়ের ঘরের সামনে গিয়া বাহির হইতে ডাকিল—"মা, মা—"

"কেন বাবা?" গিন্নি বাহির হইয়া আসিলেন।

"আজ আমার ভবানীপুরের শালী শালাজরা আসবে, নেমন্তন্ন করে এসেছি। বড়্‌কীকে বলে দাও কালিয়াটা যেন ভাল করে রাঁধে।"

গিন্নী আশ্চর্য্য হইয়া ছেলের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"সে কিরে বাবা, বৌ-মা যে আজ ছ'মাস শয্যা ধরা, এ যাত্রা—"বলিয়াই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

"ওসব কান্না রেখে দিতে বল, আমি কিছু বুঝিনা—বটে! খাটতে হলে সবাই শয্যা নিতে পারে।"

গিন্নি স্তম্ভিত হইয়া ছেলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন—কোন রকম জবাব করিতে পারিলেন না।

"রান্না যেন ভাল হয়—এগারোটার মধ্যে চাই। না পারেন যেখানে চলে যান, এবাড়ীতে ভিট্‌কিলিমি সাজবে না। অসুখ বুঝিনা বটে?" বলিয়াই হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

গিন্নি চোখে আঁচল চাপিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

কথাগুলো একটাও বিনোদিনীর শ্রুতি এড়াইল না। স্বামীর চলিয়া যাওয়ার শেষ পদশব্দ মিলাইতে না মিলাইতে কোনমতে বিছানা হইতে উঠিয়া টলিতে টলিতে ভাঙ্গা দেহখানাকে টানিয়া আনিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল।

নিশ্বাসের শব্দে চমকাইয়া চাহিয়া শাশুড়ী অবাক হইয়া গেলেন—কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—"একি বৌ-মা?"

"মাগো রাঁধবো—আ—মি, ধরে নিয়ে চল।" হাঁপাইতে হাঁপাইতে কোন মতে কথা কটা বলিয়া যেমন এক পা বাড়াইবে, অমনি মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

গিন্নী চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন

সেই শব্দে নলিন তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিয়া চমকাইয়া দাঁড়াইল,

তাহার এককালের বড় আদরের বিন্দু প্রশান্ত মুখে শুইয়া আছে। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতরটা আজ কাঁপিয়া উঠিল, চোখের সুমুখ হইতে যেন এক-খানা কালো পরদা সরিয়া গেল. অবাক হইয়া দেখিল—

প্রভাতারুণের রক্তরাগে রঞ্জিত তপ্ত শোনিতাপ্লুত সানের উঠানের উপর বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি একসঙ্গে উজাড় করিয়া কে যেন ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে!

সেই সময়ে বাড়ীর সামনের রাজপথে পথিক গাহিয়া উঠিল—

নূতন ও পুরাতন এ বড় বিষম দায়।
কারে ফেলে কারে দেখি, প্রাণ মম কারে চায়?

খুড়োর উইল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল]

(৮)

মলি প্রাঙ্গণে অপরিচিত ব্যক্তির সহিত ভদ্রতার আদান প্রদান করিয়া গির্জ্জার ভিতর গিয়া বসিল। হাতের উপর দাড়ী ও জানুর উপর কনুই রাখিয়া বিস্মিতভাবে চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

সে তখন সেই অপরিচিত সুশ্রী যুবকের কথাই ভাবিতেছিল। এরূপ ভাবে সন্ধ্যার সময় গির্জ্জের নিকট কে যুবক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! সে ভাবিতে লাগিল, এ ব্যক্তি কে, সেখানে কেনই বা ঘুরিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে ক্লাইটি যখন বাদ্যযন্ত্র বন্ধ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন, মলি তাঁহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"ক্লাইটি, তুমি যখন গির্জ্জেতে এসেছিলে, তখন কাকেও পথে দেখতে পেয়েছিলে?"

গান বাজনায় নিমগ্ন থাকায় ক্লাইটি এতক্ষণ যেন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। মলির প্রশ্নে তাঁহার চৈতন্য হইল। বলিলেন;—"না, কেন বল দেখি?"

"না, হয়নি কিছু; আমি দেখলাম, গোধূলির অন্ধকারে একজন যুবা প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তাই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি তাকে দেখেছ কি না।"

ক্লাইটি তখনও অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিলে,—"না, কিন্তু আমার যেন একবার মনে হল, স্যার উইলিয়মের সমাধি স্থানে আলো জ্বলছে।"

"কি আশ্চর্য্য! চল, দিদি, বাড়ী যাই।" সে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্লাইটির হাত ধরিল। তাহার দৌড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু ক্লাইটি তাহার হাত ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া লইলেন। হাসিয়া বলিলেন,—"আমি ত দৌড়ুতে পারব না।"

মলি সমস্ত পথ বকিতে বকিতে আসিল। কিন্তু একটা জিনিষ সে লক্ষ্য করিল যে, ক্লাইটি বাহিরে যতটা প্রফুল্লভাব ধারণ করুক, তাহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। তবে কি ক্লাইটির মনে আদৌ শান্তি নাই? তাহার কি কোনও অসুখ করিয়াছে? সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ক্লাইটিকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়। সে মনে মনে এক মতলব আঁটিয়া ঠিক করিয়া রাখিল।

পরদিন প্রাতে দিদিকে জানাইল যে, তাহার জ্বর হইয়াছে! এবং তাহার কোমল গণ্ডস্থল হস্তের দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া বলিল,—"আসল, ম্যালেরিয়া জ্বর!"

ক্লাইটি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার মর্টনকে সংবাদ দিতে লোক পাঠাইলেন। মলি অন্য সময় সামান্য পীড়িত হইলে, ক্লাইটি ডাক্তার ডাকিবার কথা বলিলে, মলি অসম্মতি জানাইত। এবার ডাক্তার আনিবার কথায় কোন দ্বিরুক্তি করিল না, অন্যমনস্ক ভাবে বলিল,—"তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর।"

ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মলি ক্লাইটিকে পূর্ব্বে রোগের যেরূপ বিবরণ দিয়াছিল, ক্লাইটি ডাক্তারের নিকট সে সব যথাযথ বর্ণনা করিলেন।

ডাক্তার মর্টন গম্ভীর ভাবে মলির দিকে তাকাইলে, সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"আমার রোগই হয়নি। আমার অসুখের কথা একটা অছিলা মাত্র। আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি ক্লাইটিকে একবার ভাল করে দেখুন; সে নিজের অসুখের জন্য আপনাকে ডেকে পাঠাবে না, এ কথা আমি বিলক্ষণ জানতাম; তাই এই কৌশল।"

ক্লাইটি লজ্জিত ও রাগান্বিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—"বাস্তবিক মলি—"

ডাক্তার মর্টন মুহূর্ত্তের জন্য মলির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি মলিকে অতীব চতুর বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। তারপর ক্লাইটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"মিস মলি ঠিকই বলেছেন। আপনাকে বেশ সুস্থ বলে বোধ হচ্ছে না। বোধ হয় সম্প্রতি মানসিক চিন্তার বেগ একটু বেড়েছে। আপনার একটু স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এসেছে মনে হয়।"

মলিও বিশ্বস্ত সহকারে বলিল,—"আপনি ঠিক ধরেছেন।"

ডাক্তার সাহেব গম্ভীরভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আমার রোগ নির্দ্ধারণ বিষয়ে আপনি এই যে অযাচিত ভাবে অনুমোদন করলেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

মলি হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য—টনিক ওষুধে কিছু হবে না। আমি সে ওষুধ দিয়ে দেখেছি, কোন ফল হয় নি। গত সপ্তাহে রোজ আমি তার চেয়ে নাক্স-ভমিকা দিয়ে আসছি।"

"এ যে দেখছি, খুনের অপরাধে অভিযুক্ত হবার যোগাড় করেছেন। এ বড় ভাল কথা নয়, মিস ক্লাইটি এঁকে কোন বোর্ডিং স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন না কেন?"

মলি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—"কারণ সে যেতে চায় না।"

ডাক্তার বাবু তখন ক্লাইটিকে বলিলেন,—"আপনার দরকার হাওয়া পরিবর্ত্তন। এই স্থান, দৃশ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সবই পরিবর্ত্তন করতে হবে, আর মানসিক উদ্বেগ একেবারে মন হ'তে দূর করতে হবে। আচ্ছা ভেবে দেখি, কোথাকার জল হাওয়া আপনার সহ্য হবে।" তিনি ভাবিতে লাগিলেন। মলি বাহ্যিক ধৈর্য্য দেখাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্লাইটির তিরস্কার পূর্ণ দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে সে মুখ গম্ভীর করিয়া নানা-প্রকার মুখভঙ্গী করিতে লাগিল। "হাঁ, মনে পড়েছে, বাল্যকালে আপনার শরীর অসুস্থ হলে আমি আপনাকে উইদিকম্বে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য পাঠিয়ে দিতাম। আপনার সে কথা স্মরণ আছে কি?"

মলি হাততালি দিয়া উঠিল।

"অবশ্যই স্মরণ আছে। সেই সুন্দর পরিচিত স্থান! সমুদ্রের তীরবর্ত্তী পাহাড়ের উপর সেই আনন্দদায়ক পুরাতন গোলাবাড়ী! উপযুক্ত স্থান।

ক্লাইটি, চল, আমরা সেইখানেই যাই। এখনি চল। মাত্র বিশ মাইল দূরে। আমরা সেই গোলাবাড়ীতে গিয়েই থাকব। গোটাকতক ঘোঁড়া সঙ্গে নাও। মনে কর, যেন বনভোজনে যাওয়া যাচ্ছে। সেই গোলাবাড়ীর বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মিসেস বাক্স তোমাকে কত ভালবাসত, আমাকে তুমি একদিন সে কথা বলেছিলে।"

ডাক্তার মর্টন বলিলেন,—"মিসেস বাক্স মারা গেছেন। তাঁর বিবাহিতা কন্যা এখন গোলাবাড়ী চালাচ্ছে। তা, আপনি সেইখানেই যান, শরীর সুস্থ হয়ে যাবে।"

মলি বলিয়া উঠিল,—"হঁা, সেই কথাই ঠিক; আপনি মিঃ গ্রেঞ্জারকে বলবেন, তিনি যেন বিষয় সংক্রান্ত চিঠি কাগজপত্র নিয়ে সেখানে আর দিদিকে জ্বালাতন না করেন।"

"আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য!"

মলি এই বিদ্রূপাত্মক উক্তিতে একটুও দমিয়া না গিয়া নির্ভীক ভাবে বলিল,—"আমি আপনাকে বড়ই পছন্দ করি; আপনি বড় বুদ্ধিমান। আমি এখনি মিসেস—ঐ কি নামটা—তার কাছে খপর পাঠাব। কাল বা পরশুই আমরা সেখানে যাত্রা করব। ক্লাইটি খুব মোটা হয়ে আসবে। তখন আপনিও বলতে পারবেন, আপনার চিকিৎসাগুণেই রোগী কিরূপ আরোগ্য লাভ করেছে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আপনাকে দেখছি রোগ সারাবার জন্য প্রথম কিছু ওষুধ খাওয়ান দরকার।"

"আপনাদের ওষুধের যা গুণ তা আমার বেশ জানা আছে; একবার আমি একবোতল ওষুধ ফুলের টবে ঢেলে দিয়েছিলাম। গাছটা পুড়ে মরে গেল।"

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে, মলি তাহাদের যাত্রার সব বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

* * * * *

যাত্রার সব বন্দোবস্ত করিতে তিন দিন সময় লাগিল। যে গোলাবাড়ীতে তাহারা যাইতেছিল, সেখানে তাহাদের বাসের জন্য ঘর দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইল। ঘোঁড়াও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তৃতীয় দিনের দিন, সন্ধ্যাবেলা, তাহারা

দুইজনে ব্রামলে পরিত্যাগ করিয়া সেই সুন্দর গোলাবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। স্থানটি বড়ই নির্জ্জন ও রমণীয়।

গোলাবাড়ীটি এক প্রকাণ্ড পুরাতন ধরণের বাড়ী। মলি বৈঠকখানা ঘরের চারদিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া তাহার সন্তোষ জানাইল।

"ঠিক যেমনটি তুমি চাও, দিদি! কোন জাঁকজমক নেই, আদব কায়দা নেই, বেশী চাকর বাকর নেই; তবে আমি কিন্তু বাড়ীতে চাকর বাকর রাখার বড় পক্ষপাতী। আরও ভাল যে এখানে মিঃ গ্রেঞ্জার ও তাঁহার কাজের পত্র নেই; আর সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দজনক যে মিঃ হেসকেথ কার্টনও এখানে নাই। মিসেস ক্রাইকে আমার বেশ পছন্দ হয়। তাকে দেখলে মনে হয় বেশ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক। সেও বেশী জাকজমক ভালবাসে না। আমাদের দুজনকে তার বাড়ীতে পেয়ে সে মনে মনে বড়ই গৌরব অনুভব করেছে।" এমন সময় মিসেস ক্রাই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।—"ওঃ! এই যে মিসেস ক্রাই, যদি কিছু মনে না কর, এক পেয়ালা চা, একটু ক্রীম, এনে দাও। ক্রীম একটু করে এন। ক্লাইটি বসে বসে কি ভাবছ?"

ক্লাইটি উন্মুক্ত জানালা দিয়া নদীর দিকে তাকাইয়া ছিলেন। প্রশান্ত সমুদ্র অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রশ্মিপাতে উজ্জ্বল নীলকান্তমণির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। এ দৃশ্য দর্শনে তিনি একটু চমকিত হইয়া উঠিলেন। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলিলেন,—"আমি ভাবছিলাম, এখানে চিরকালের মতন থাকলে ভাল হয়।"

"সেটা তোমার ভাল লাগতে পারে; আর এ জায়গাটা বছরের এই সময়ই বেশ ভাল লাগে; কিন্তু আমি ব্রামলে হলে চিরকাল থাকতে পেলে আর কিছুই চাই না।"

ক্লাইটির সে রাত্রে গভীর নিদ্রা হইল। মলি ক্লাইটির প্রতি বিশেষ নজর রাখিল। পরদিন প্রাতঃকালেই ক্লাইটির গণ্ডদেশ রক্তাভ হইল।

গৃহ নির্ম্মিত রুটি, মাখন, ডিম প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর খাদ্যে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া মলি ক্লাইটিকে জোর করিয়া সমুদ্রতীরে টানিয়া লইয়া গেল। কতকগুলি ধীবর তাহাদের নৌকা সারিতেছিল, কেহ কেহ বা জাল ঝাড়িতেছিল। তাহারা ও তাহাদের স্ত্রীকন্যারা ভগ্নীদ্বয়কে আন্তরিক সরলতার সহিত সম্বর্দ্ধনা করিল। তাহাদের দুজনকে পাহাড়ের উপর দিয়া সমুদ্রের জলের ধারে যাইতে দেখিয়া তাহারা ঈষৎ হাসিতে লাগিল।

"বাতাস ত একেবারে বন্ধ দেখছি; এ সময় নৌকায় বেড়ান মন্দ হবে না। অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার নৌকায় বেড়িয়েছিলাম। এখানে কোন মাঝি নেই যে, আমাদের নৌকায় চাপিয়ে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।" এই বলিয়া মলি আশেপাশে একবার তাকাইল।

একজন যুবক নীলবর্ণের গেঞ্জি ও জেলেদের ন্যায় লম্বা বুট জুতা পরিয়া একখানি নৌকার উপর বসিয়াছিল। মুখে একটি ধূমপানের নল। সে পূর্ব্ব হইতেই যুবতীদ্বয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। মলি তাহার নিকট গিয়া ধীর এবং সরল ভাবে বলিল,—"আমাদের খানিকটা ঘুরিয়ে আনবে।"

যুবক মুখ হইতে নলটি সরাইয়া টুপিতে হাত দিল। এবং টুপি মাথা হইতে তুলিতে না তুলিতেই হাত নামাইয়া লইল। মুহূর্ত্তমাত্র বালিকার দিকে তাকাইয়া উত্তর করিল,—"নিশ্চয়ই।" এই বলিয়া সে জোয়ারের মুখে নৌকা টানিয়া আনিল।

মলি ক্রাইটীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"লোকটী নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে।" ক্রাইটি তখন এক উপলখণ্ডের উপর বসিয়া সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া ছিলেন।

যুবক নৌকাখানি জলে ভাসাইয়া দিল। পরে তাহাদিগকে নৌকায় উঠিবার সাহায্য করিয়া দাঁড় টানিতে লাগিল।

মলি বলিল,—"বেশী দূরে যেও না। আর তীরের ধার দিয়ে দিয়ে চল, বলিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল; যুবকের মুখেরদিকে একবার তাকাইল। ভাবিল, ইহাকে কি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি? পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" সে উত্তর করিল,—"ডগলস্—জ্যাক ডগলস্।"

"তা বেশ, বেশী দূর যেও না, জ্যাক" মলি হঠাৎ এই কথাগুলি বলিয়া হাই তুলিল।

জ্যাক তীরের ধার দিয়াই নৌকা কিছুদূর বাহিয়া চলিল। তাহার মুখে একটিও কথা নাই।

সেও শান্তির অন্বেষণে এই প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পিতার মৃত্যুর সময়ও পিতাপুত্রের মধ্যে যে বিচ্ছেদ বর্ত্তমান ছিল, তাহার জন্য সে বড়ই অনুতপ্ত। সেই অনুতাপানল হইতে শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করিবার আশায় সে এই মনোরম নিরাবিল সমুদ্র উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ধীবরের ছদ্মবেশ বেশ সুবিধাজনক হইবে ভাবিয়া সে ঐ বেশ ধারণ করিয়াছিল। সমুদ্রবক্ষে বেড়াইতেও জ্যাক খুব ভালবাসিত। এ প্রদেশের লোকেরা তাহাকে এখানে হঠাৎ আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিত চাকরির উদ্দেশে আসিয়াছে। কেহই তাহার আসল পরিচয় পায় নাই। অবশ্য মিসেস বাস্ বাঁচিয়া থাকিলে, তাহাকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিতেন। কিন্তু তিনিও মারা গিয়েছেন। তাঁহার কন্যা জ্যাককে বাল্যকালে সমুদ্র তীরে খেলা করিয়া বেড়াইতে দেখিলেও এখন আর তাহাকে চিনিতে পারিল না।

জ্যাক পূর্ব্বে শুনে নাই যে, মিস ব্রামলে দ্বয় এখানে আসিয়াছেন! তাহাকে ধীবর জ্ঞানে, তাহারাই যে তাহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহা সে বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। তাহাকে সাধারণ মৎস্যজীবি বলিয়া জ্ঞান করায় তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণায় সে আদৌ বিরক্ত হয় নাই, বরং আমোদিতই হইয়াছিল।—সে মনে মনে তাহার ছদ্মবেশের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং ভাবিল, প্রাতঃকালে একলা নৌকা ভ্রমণে বাহির হওয়া বা সমুদ্রতীরে বিষণ্ণভাবে বসিয়া দুঃখজনক অতীতের বিষয় চিন্তা করা অপেক্ষা, এ কাজ বেশী আরামপ্রদ।

ক্লাইটি নদীর উভয়তীরবর্ত্তী কুটীর সমূহের দিকে তাকাইয়াছিলেন। জ্যাক নৌকা বাহিতে বাহিতে মধ্যে মধ্যে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল,—"দুজনেই সুন্দরী—বড়টি কিছু বেশী সুন্দরী। একে যেন কোথায় দেখেছি মনে হয়, কিন্তু স্মরণ করিতে পারছি না। বোধ হয় এর কোন আত্মীয় মারাগেছে, তা না হলে এত বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল ভাবে বসে থাকবে কেন? এরা বোধ হয় এদেশ বেড়াতে এসেছে।"

মলি ঘাড় নীচু করিয়া জলে আঙ্গুল টানিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—"বড়ই রমণীয়! তুমি কি মনেকর এ পৃথিবীতে এমন সুন্দর আর দুটি স্থান আছে?"

ক্লাইটি চারদিকে একবার তাকাইলেন।

"না, আমার মনে হয়, এরূপ সুন্দর স্থান আরও আছে।"

"আমার ত সন্দেহ হয়। তুমি কি কখনও বিদেশ ভ্রমণে গেছ?" মলি এত দ্রুতভাবে জ্যাককে এই প্রশ্ন করিল যে, জ্যাকের চৈতন্য হইল, এরূপ, এক দৃষ্টিতে জ্যেষ্ঠা যুবতীর দিকে তাকাইয়া থাকা, ভদ্রতাসঙ্গত নহে।

"হাঁ, আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, এ স্থানও সুন্দর বটে, তবে পর্ত্তুগালের সমুদ্রতীর—মিসর বন্দর—"

তাহার গলার স্বর সাধারণ ধীবরের কণ্ঠস্বর হইতে এত স্বতন্ত্র যে তাহার প্রতি ক্লাইটির মনোযোগ স্বতই আকৃষ্ট হইল।

মলি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ডগলস, তুমি কি এইখানেই বাস কর ?"

"হাঁ, বর্ত্তমানে এখানেই আছি। মাত্র দু'এক সপ্তাহ এখানে এসেছি।"

"তুমি তাহলে এই দাঁড়িমাঝির কাজই কর।"

"হাঁ, সে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল।"

ক্লাইটি চুপি চুপি মলিকে নীরব হইতে বলিলেন। মলিও দু'এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল! কিন্তু অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পরই তাহার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সে আবার কথাবার্ত্তা, আরম্ভ করিল।

"তোমার বোধ হয় কোন বন্ধু বা আত্মীয় এখানে আছে।"

"না, আমি ছুটিতে বেড়াতে বেড়াতে এখানে এসে পড়েছি।"

"এ কথা পূর্ব্বে বল নি কেন? যখন আমি তোমাকে নৌকা করে আমাদের বেড়িয়ে আনতে বল্লাম, তখন জানাতে হয়।"

সে হাসিয়া উত্তর করিল,—"এত কাজের মধ্যেই গণ্য নয়!" মলির চতুর কথাবর্ত্তায় জ্যাক তাহার প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে ছিল।

"আজ সকালে যে তোমার বিশ্রাম লাভে আমরা বাধা দিলাম, তার জন্য বড়ই দুঃখিত।"

জ্যাক ভদ্রভাবে উত্তর করিল,—"না, তা মনে করবেন না। আজ সকালে প্রকৃতির এ দৃশ্য বড়ই মধুর বলে মনে হচ্ছে। আপনারাও বোধ হয় সেটুকু বেশ উপভোগ করেছেন ?"

"ডগলস্, তুমি কি বিবাহ করেছ ?"

ক্লাইটি এবার তিরস্কার পূর্ণ দৃষ্টিতে মলির দিকে তাকাইলেন।

জ্যাক গম্ভীরভাবে উত্তর করিল "না।" এবার অনেক কষ্টে তাহাকে হাসি চাপিয়া রাখিতে হইল।

"একথা জিজ্ঞাসা করেছি বলে, কিছু মনে কর না।"

ক্লাইটি এই কথাবার্ত্তার স্রোত অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বলিলেন,—"মলি আমাদের বাড়ী ফিরে যাবার সময় হয়েছে, বোধ হয়।"

"না, ক্লাইটি, আর একটু পরে।"

জ্যাক দাঁড় টানিতেছিল। এই নাম শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। তাহার বাম হাত হইতে দাঁড়টি সশব্দে জলে পড়িয়া গেল।

"কিসের শব্দ?"

"না—কিছুই নয়।" এই বলিয়া জ্যাক লজ্জিত হইয়া দাঁড়টি জল হইতে তুলিয়া লইল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ক্লাইটি! ক্লাইটি! তাহলে ইনিই মিস ব্রামলে, যাঁহার সঙ্গে তাহার পিতা তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং উইলেও যে কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সে কি নির্ব্বোধ! সেই ক্লাইটিকে সে আদৌ চিনিতে পারে নাই! সে লুকাইয়া একবার তাঁহার প্রতি তাকাইল এবং এবার নামটি জানিতে পারায় তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিল। এই কি সেই বালিকা, যাহার সঙ্গে বাল্যকালে সে নিঃসঙ্কোচে খেলা করিয়া বেড়াইত? ইহা অসম্ভব! সে এখন কিরূপ সুন্দরী যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! তাহারও চেহারার নিশ্চয়ই কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে ক্লাইটিও তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারে নাই!

এই চিন্তায় সে একটু বিচলিত হইল। অবশ্য ইহাতে তাহার কি আসে যায়? সুরূপা বা কুরূপা—সে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। বিবাহ করিবে না বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে। যাহা হউক তাহাকে দেখিয়া আজ তাহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, তিনি তাহার পৈতৃক বাসভবন ও বিষয় সম্পত্তির সর্ব্বাংশেই উপযুক্ত অধিকারিণী হইবেন। ক্লাইটির শরীর অসুস্থ। পাছে ঠাণ্ডা লাগিলে অসুখ বাড়ে, এই ভয়ে মলি চিন্তিত হইল। তখন জ্যাক তাহার গায়ের জামা খুলিয়া ক্লাইটির পায়ে জড়াইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিল সেস্থানে ফিরিয়া আসিল।

সমুদ্রে ভাটা পড়িয়াছে। তীর কর্দ্দমাক্ত। ভগ্নীদ্বয় হাঁটিয়া যাইতে গেলে কাদায় তাহাদের পা ভর্ত্তি হইয়া যাইবে। জ্যাক দাঁড়ে ভর দিয়া তীরে লাফাইয়া পড়িল। এবং যতদূর পারিল, নৌকাখানিকে তীরের দিকে টানিয়া আনিল। কিন্তু সে স্থানও কর্দ্দমে পরিপূর্ণ। জ্যাক মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া নৌকার পাশে গিয়া তাহার বাহুদ্বয় বিস্তার করিয়া দিল।

মলি এত জোরে তাহার কোলে লাফাইয়া পড়িল যে, জ্যাক বলবান না হইলে তাহাকে মাটিতে ঠিকরাইয়া পড়িতে হইত। জ্যাক তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া ক্লাইটিকে লইয়া যাইতে আসিল। ক্লাইটি নৌকার উপর দাঁড়াইয়া কি করিবে ভাবিতে ছিলেন। জ্যাককে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন,—"আগে এখানে তীরে নামবার জন্য একটা তক্তা ফেলা ছিল।"

জ্যাক চারিদিকে তাকাইয়া বলিল,—"এখন ত কিছুই দেখছি না।"

ক্লাইটি আর কি করেন?

জ্যাক তাঁহাকেও কোলে করিয়া লইল। তিনি মলির অপেক্ষা সামান্য একটু ভারি, কিন্তু কেন বলিতে পারি না, জ্যাকের অন্তঃকরণ কাঁপিতে লাগিল। সে এক অদ্ভুত ভাব হৃদয় মধ্যে অনুভব করিল। অবশ্য বাহিরে তাহা কিছু প্রকাশ পাইল না। সে বাহ্যিক স্বচ্ছন্দ ও উদাসীন ভাবে তাঁহাকে শুষ্ক তীরে লইয়া গেল। ক্লাইটি বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া শান্তভাবে বলিলেন,—তোমাকে ধন্যবাদ!" তাহার মানসিক উত্তেজনারও কোন কারণ ছিল না।

জ্যাক তাহার টুপি উত্তোলন করিয়া তাহাদের প্রতি সম্মান দেখাইয়া নৌকায় ফিরিয়া যাইতেছিল, মলি তখন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, —"ভুলে গেছলাম, কিছু মনে কর না।" এই বলিয়া সে তাহার পকেটে হাত দিল। পরে ক্লাইটির সহিত দু'চার কথা বলিয়া তাহাকে বলিল,—"বড়ই দুঃখিত, আজ আমাদেয় কাছে কিছুই নেই। তোমার পারিশ্রমিক দিতে পারলাম না, কাল দিয়ে যাব।"

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও জ্যাকের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সেও ভদ্রভাবে বলিল,—"তার জন্য কিছু এসে যায় না। কাল কি আপনাদের আমাকে দরকার হবে?"

মলি ক্লাইটিকে জিজ্ঞাসা করিল। "তা ঠিক করে বলতে পারি নি। হলেও হতে পারে। তুমি এখানেই থেক। আমরা খবর পাঠাব। ক্লাইটি, চল, ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।"

জ্যাক নৌকাটিকে যথাসাধ্য তীরের উপর টানিয়া আনিয়া পরে তামাকের নলে অগ্নিসংযোগ করিয়া সেইখানে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল।

সে ভাবিতে লাগিল, এ ঘটনা বড়ই রহস্যময়! সে মাঝির পোষাক পরিয়া তাহার নির্ব্বাচিত পল্লীর সেবা করিতেছে। একদিন হইল, তাহাই ভাল। এবার তাহার এস্থান ত্যাগ করা উচিৎ নহে কি? কেনই বা সে ইংলণ্ডে থাকিয়া এ সকল যন্ত্রণা কষ্ট ভোগ করিবে? পারালুনায় তাহাকে সবাই সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সেখানে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতিরও বিশেষ সম্ভাবনা। সে ভিক্ষুকের ন্যায় নিঃস্বও নহে। অরে এখানে—

কিন্তু তাহাকে তাহাদের কাল আর দরকার হইবে কিনা; একথা সে নিজেই স্বেচ্ছায় তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। মলি তাহাকে এখানে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে বলিয়াছে। এই কৌতুকজনক ব্যাপারের বিষয় ভাবিয়া সে মনে মনে খুব হাসিতে লাগিল। তখন দুই বোনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। মলিকে তাহার খুবই পছন্দ হইয়াছে। ব্রামলে হলের গির্জ্জার প্রাঙ্গণেই জ্যাক তাহার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছিল। তাহলে সে রাত্রে গির্জ্জার ভিতর ক্লাইটিই বোধ হয় আর্গান বাজাইয়া গান গাহিতে-ছিল। ক্লাইটি তাহার সহিত চারিটির বেশী কথা কহিয়াছে কিনা সন্দেহ, তবুও মলি অপেক্ষা ক্লাইটিকেই তাহার বেশী পছন্দ হইল। ক্লাইটির এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তাহার মনে হইল যেন সে ক্লাইটির সহিত নূতন করিয়া পরিচয় করিতেছে। ক্লাইটি সভ্য ও নম্র, অথচ এই কোমলতার মধ্যেও তাহার মনের জোর সে স্পষ্ট অনুভব করিল।

পিতার সহিত তাহার ঝগড়া না হইলে, যদি সে দেশে থাকিয়া ক্লাইটির সহিত একত্র বর্দ্ধিত হইত, তাহলে খুব সম্ভবতঃ তাহার সহিত—। হঠাৎ সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। রাগান্বিত ভাবে জ্যাক বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল,— "আমি এমনই বোকা যে, এসব বিষয় এখনও চিন্তা করিতেছি। এ হলে কি হত, ও হলে কি হত, সব বিষয়ে চিন্তা করে কি ফল? আমি যা করলার, তা স্থির সিদ্ধান্ত করেছি, তার নড়চড় হবার নয়। আমার এখন উচিত, এদেশ ত্যাগ করা, পারলুনায় গিয়ে কাজকর্ম্মে মন দেওয়া। ক্লাইটি নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া, এই সম্পত্তির যোগ্য অধিকারিণী হইবে।"

এমন সময় যে কুটীরে সে বাসা লইয়াছিল, সেই কুটীরের গৃহকর্ত্রীর এক ছোট মেয়ে তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মা আপনাকে খুঁজতে পাঠালেন; খাবার তৈরি, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

"চল, যাই" এই বলিয়া সে বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইল।

জ্যাক ডগলস এক বিধবা জেলেনার গৃহে বাসা লইয়াছিল। মেরী তাহার একমাত্র সন্তান। মাতা ও কন্যা দুজনেই জ্যাককে খুব ভালবাসে ও যত্ন করে।

জ্যাক কুটীরে উপস্থিত হইতেই গৃহকর্ত্রী তাহাকে ভোজনে বসিতে বলিল। জ্যাক তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া মেরীকে পিঠে লইয়া সমুদ্র-তীরে চলিল। রাস্তায় যাইতে যাইতে মলি ও ক্লাইটির সহিত তাহার দেখা হইল। তাহারা অশ্বারোহণে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ক্লাইটি জ্যাকের পৃষ্ঠোপরি বালিকার দিকে তাকাইয়া একবার মাত্র হাসিলেন। কিন্তু মলি জ্যাকের নিকটে আসিয়া বালিকাকে বলিল,—"তুমিও দেখছি, বেশ ঘোঁড়ায় চড়ে চলেছ। কিন্তু তোমার ঘোঁড়া আমার ঘোঁড়ার চেয়ে বেশী শান্ত, ও সহজেই বাগ মানে!"

মেরীও গর্ব্বভরে উত্তর করিল,—"এমন ভাল ঘোড়া কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।"

জ্যাক বিড় বিড় করিয়া বলিল,—"ঘোড়া নয়, গাধা বল! তাহলেই ঠিক হবে।"

মলি হাসিয়া বলিল,—"হাঁ, ডগলস, তোমাকে কাল বিকাল বেলা আমাদের দরকার হবে। সব ঠিকঠাক করে রেখ।"

"নিশ্চয়ই রাখব। আপনাকে ধন্যবাদ!"

মলি চলিয়া গেলে, জ্যাক তাহাদের দিকে তাকাইল। তাহার দৃষ্টি ক্লাইটির মূর্ত্তির উপরই নিবদ্ধ। রমণীয় পোষাকে তাঁহাকে সেদিন বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। এমন সময় জ্যাক দেখিল একজন অশ্বারোহী যুবক সে দিকে আসিতেছে। যুবকের মুখ দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল, ব্রামলে সেদিন রাত্রে মিঃ গ্রেঞ্জারের বাড়ী যাইবার পথে ইহারই সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে মেরীর মাও কূপ হইতে জল লইবার জন্য পাত্রহস্তে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। জ্যাক অশ্বারোহী যুবককে দেখাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ যুবককে তুমি চেন?"

"চিনি, চিনি, বলে মনে হচ্ছে,—হাঁ,—ইনি হচ্ছেন, মিঃ হেসকেথ কার্টন ব্রামলের পিট কারখানার বর্ত্তমান সত্বাধিকারী।"

(১০)

হেসকেথ এরূপ মুখভঙ্গী করিলেন যেন যুবতীদ্বয়কে এস্থানে দেখিয়া তিনি একেবারে বিস্মিত হইয়াছেন, যেন তাহাদের সহিত এস্থলে সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। অথচ তিনি ডাক্তার মর্টনের নিকট হইতেই শুনিয়াছিলেন যে, ইহারা উইনিকাম্বে আসিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই এখানে আসার তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

তিনি ক্লাইটির নিকট অশ্বারোহণে অগ্রসর হইয়া টুপি উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—"এ আনন্দ অপ্রত্যাশিত! আমি আমাদের কারখানার একজন কর্ম্মচারীকে দেখতে এসেছিলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে সে হঠাৎ আহত হয়। তাকে এখানকার স্বাস্থ্য নিবাসে পাঠিয়ে ছিলাম।"

"এ আপনার সহৃদয়তারই পরিচয়!" ক্লাইটি উত্তর করিলেন।

এমন সময় মলি আসিয়া দলে যোগ দিল। কার্টন তখন তাহার দিকে মুখ করিয়া বলিলেন,—"মিস্ মলি, আপনি কেমন আছেন? ঘোড়ায় চড়ে বেড়বার এ অতি উত্তম সময়। আপনাদের অনুমতি পেলেই আমিও আপনাদের সঙ্গ লই।"

কার্টন এরূপ স্বরে কথাগুলি বলিলেন যে, এমন কি মলিও তাহার এই প্রস্তাবে অমত করিবার কোন অছিলা খুজিয়া পাইল না। ক্লাইটি আনন্দ-সহকারে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। হেসকেথ কথা কহিতে যেরূপ পটু, অশ্বারোহণে সেরূপ দক্ষ ছিলেন না। তিনি ক্লাইটির সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইলেন। কিছুদুর অগ্রসর হইয়া মলি বলিল, "ক্লাইটি, আমরা বোধ হয় অনেক দূর এসেছি; চল, ফিরে যাই।"

তাহারা বাড়ীর দিকে ফিরিলেন। এমন সময় হেসকেথের ঘোড়াটি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হেসকেথ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বাগ মানাইতে পারিল না। মেরী নাম্নী ছোট বালিকাটি সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। ঘোড়াটি আসিয়া তাহার গায়ের উপর পড়িল। সে কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। জ্যাক তাহার চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া ঘটনাস্থলে দৌড়াইয়া আসিল এবং ঘোড়ার রাশ সজোরে টানিয়া ধরিয়া বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইল।

ভগ্নীদ্বয় ব্যাপার দেখিয়া বড়ই ভীত হইয়াছিল। ভয়ে তাহাদের মুখে কথা ফোটে নাই। জ্যাক বালিকাকে তুলিয়া ধরিতে তাহারা অনেকটা আশ্বস্ত হইল। মলি জিজ্ঞাসা করিল, "বড় আঘাত লেগেছে বোধ হয়!"

জ্যাক বালিকার পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল,—"না, বোধ হয় লাগে নি। না, না, লাগে নে, কেঁদো না।"

হেসকেথ রাগান্বিত ভাবে জ্যাককে বলিয়া উঠিলেন,—"ওহে, ছেলেদের সাবধানে রাখতে পার না ?"

এই কথা বলিতে বলিতে কম্পিত হস্তে হেসকেথ তাহার ধূলি ধুসরিত পরিচ্ছদ ঝাড়িতে লাগিলেন।

জ্যাক শান্তভাবে উত্তর করিল,—"আপনিই বা ঘোড়াকে বশে রাখতে পারেন না কেন ?"

"কি !"

হেসকেথের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি জ্যাকের দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"ওহে, তুমি ত বড় উদ্ধত দেখছি। এটুকু তোমার মাথায় ঢোকে নি যে, আমি যদি ঘোড়াটাকে সামলাতে না পারতাম তাহলে বালিকাটি যে চাপা পড়ত।"

এমন সময় ক্লাইটি জ্যাকের কাছে গিয়া বালিকাটিকে চাহিয়া লইলেন এবং তাহাকে কোলে করিয়া কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

তখন তাহারা দুজন পরস্পর মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হেসকেথের মুখের ভাব ক্রোধান্বিত ও উদ্ধত। কিন্তু জ্যাক যেন ঘৃণাসূচক ভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। রাগ অপেক্ষা ঘৃণা সহ্য করাই বড় কষ্টকর! মলি একবার কার্টনের মুখের দিকে, একবার জ্যাকের মুখের দিকে তাকাইতেছে। অবশ্য জ্যাকের সহিতই তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি !

"তুমি কে ? তোমার নাম কি ?" হেসকেথ রাগে গরগর করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তার সঙ্গে এ ব্যাপরের কি সম্বন্ধ, তা ত বুঝতে পারছি না।" জ্যাক একটু কর্কশ ভাবে এই কথাগুলি বলিল। "আপনি কে ?"

হেসকেথ কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন,—"আমি ত্রামলে নিবাসী হেসকেথ কার্টন—"এই বলিয়া তিনি তাঁহার দন্ত নিষ্পেষিত করিলেন। মনে করিলেন এ উত্তরে লোকটা একেবারে চুপ হইয়া যাইবে। কিন্তু জ্যাক তাহাতে ভীত না হইয়া হেসকথরই দোষ দেখাইয়া প্রত্যুত্তর করিল। হেসকেথ কি উত্তর দিবেন,

ঠিক করিতে পারিলেন না। তখন মলির দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"মিস্ মলি, আপনি বোধ হয় ভয় পান নি ?"

"না—মেয়েটির যে কোন আঘাত লাগে নি, তাই ভাল। ঐ লোকটি সময়ে এসে উপস্থিত না হলে, আপনি তাকে চাপা দিয়েছিলেন আর কি ?"

"যাক্, বিপদ যে কেটে গেছে, তার জন্য আমি বড়ই সন্তুষ্ট।" এই বলিয়া হেসকেথ তাঁহার পকেটে হাত দিয়া একটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিলেন এবং জ্যাকের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া ঘৃণাসূচক ভাবে বলিলেন,—"এই নাও, যাও। একবার ডাক্তারের কাছে গিয়ে মেয়েটাকে দেখাও গে। আর ভবিষ্যতে লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে শিখো।"

জ্যাক স্বর্ণমুদ্রাটি লইয়া হঠাৎ হেসকেথের শরীর লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল। সেটি হেসকেথের দাড়িতে আসিয়া লাগিল। হেসকেথ, রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ঘোড়ার চাবুক লইয়া জ্যাকের দিকে দৌড়াইয়া গেলেন এবং তাহাকে মারিবার উদ্দেশ্যে চাবুকটি তাহার মাথার উপর তুলিলেন।

জ্যাক তাহার হাত ধরিয়া চাবুকটি কাড়িয়া লইল; পরে সেটি এরূপ ভাবে ঊর্দ্ধে তুলিল যেন আক্রমণকারীকে প্রহার করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সংযত হইয়া চাবুকটি দূরে নিক্ষেপ করিল। রাগে তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে, তাহার চোখ জ্বলিতেছে। দুজনেই নীরব। মলি, স্তম্ভিত হইয়া জ্যাকের ক্রোধ বিকৃত মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। এ দৃশ্য বড়ই ভয়ঙ্কর!

জ্যাক আদৌ সহ্য করিতে পারিত না। তাহার মেজাজ স্বভাবতঃই একটু গরম। ইহার জন্যই তাহার পিতার সহিত তাহার কলহ হইয়াছিল। হেসকেথের এই অভদ্র ব্যবহারে তাহার মেজাজ অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে একটু শান্ত হইলেও, মলির প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হইতেছিল, পাছে দুজনের কলহ হাতাহাতিতে পরিণত হয়। আর সে মারামারির ফলও হেসকেথের পক্ষে যে বড় সুবিধাজনক হইবে না তাহাও সে বেশ জানিত;—লোলজিহ্বা অগ্নির মুখে তৃণ খণ্ডের ন্যায় তাহার অস্তিত্বেরও কোন চিহ্নও থাকিবে না।

দেখিতে দেখিতে জ্যাক বেশ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। হেসকেথ

তখন নিজের অবস্থা সম্যক জ্ঞাত হইলেন। মলির দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"মিস্ মলি, আমি বড়ই দুঃখিত যে আপনার সম্মুখে এরূপ একটা দৃশ্যের অভিনয় হয়ে গেল।"

মলি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"না, তাতে কিছু এসে যায় না। তবে আপনি অনুগ্রহ করে এখান থেকে চলে যান; এখানে অপেক্ষা করে কোন ফল হবে না। অনুগ্রহ করে যান।"

হেসকেথ তাহার টুপি উত্তোলন করিয়া যেন স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য বলিলেন,—"আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমি চল্‌লাম। আপনি ঠিকই বলেছেন, এ প্রকার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার উচিত নয়।"

আর একবার টুপি উত্তোলন করিয়া এবং জ্যাকের দিকে আর না তাকাইয়া হেসকেথ অশ্বারোহণ করিলেন এবং রাস্তার উপর দিয়া চলিয়া গেলেন। জ্যাক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

(১১)

জ্যাক কিছুক্ষণ হেসকেথের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। তারপর আহত বালিকাটির কথা মনে পড়িতেই সে একটু লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইল। মলিও ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার পিছু পিছু চলিল।

কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহারা দেখিল মেরী ক্লাইটির কোলে শুইয়া আছে। তাহার কান্না থামিয়া গিয়াছে। সেবাপরায়ণা ক্লাইটিকে দেখিয়া জ্যাকের মনে হইল তাহার মুখমণ্ডলের এরূপ স্বর্গীয় জ্যোতি সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। তাহাকে তখন দয়া ও কোমলতার জীবন্ত প্রতি-মূর্ত্তি বলিয়া তাহার বোধ হইল।

ক্লাইটি জ্যাকের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"না, কোন ভয় নাই। আঘাত বেশী লাগে নি। ভয়ে এতক্ষণ অমন করে চীৎকার করছিল। ওর মা এখন বাড়ী নেই। তিনি না আসা পর্য্যন্ত আমারা এখানে অপেক্ষা করি।"

জ্যাক ইত্যবসরে চা প্রস্তুত করিয়া ভগ্নীদ্বয়কে পাত্রে ঢালিয়া দিল। পরে

নিজে এক পেয়ালা লইয়া পান করিতে বসিল। তাহার মন গভীর চিন্তা-মগ্ন। সে ভাবিতে লাগিল;—"তাহলে ইনিই হচ্ছেন আমার জ্ঞাতি ভাই হেসকেথ কার্টন। ভবিষ্যতে ইনিই পিতার আগাধ সম্পত্তি ও উপাধির অধিকারী হতেন এবং পিতার জীবদ্দশায় আমার স্থান অধিকার করে ছিলেন। দুঃখ—ভায়ের এরূপ মিলন বড়ই অদ্ভুত অপ্রীতিকর।" প্রথম দৃষ্টিতেই হেসকেথের চেহারা তাহার ভাল লাগে নাই। আবার তাহার সহিত কলহের পর তাহার উপর ঘৃণার মাত্রা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু হেসকেথ কার্টন রমণীদ্বয়ের সহিত বেশ মিলিয়া মিলিয়া বেড়াইতেছে; আর সে তাহাদের নৌকায় চড়াইয়া মাঝির বেশ ধারণ করিয়াছে—এ কি ভাগ্যবিপর্য্যয়!

এমন সময় গৃহকর্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইতেই জ্যাক কুটীর হইতে বাহিরে আসিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যত শীঘ্র সম্ভব, সে এই স্থান ত্যাগ করিবে। কারণ আগমী কল্য সে ভগ্নীদ্বয়কে নৌকায় চড়াইয়া বেড়াইয়া আনিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তার পরদিনই প্রস্থান। এ মানসিক উদ্বেগ আর সহ্য হয় না। এ অঞ্চলই একেবারে ত্যাগ করিয়া সে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। ভাবিতে ভাবিতে জ্যাক তীরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

সমুদ্রতীরে যাইবার পথে একটি বড় ফিটন গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। জ্যাককে দেখিতে পাইয়া গাড়ীর সহিস বলিল,—"ঐ যে জেটীর উপর যে ভদ্র লোকটি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাকে এই কাগজখানি দিয়ে আসবে? এখানি বিশেষ দরকারী; উহাঁদের এখনই দরকারে লাগিবে।"

জ্যাক তাকাইয়া দেখিল, জেটীর উপর এটি ভদ্রলোককে মধ্যস্থ করিয়া অনেক লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জ্যাক সহিসকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এরা কারা? কি জন্যেই বা এসেছেন?"

"তা বুঝি জান না? ঐযে মাঝখানের যুবককে দেখতে পাচ্ছ, উনি হচ্ছেন, লর্ড ষ্ট্যাণ্টন। আর ওঁর পাশেই ইঞ্জিনীয়ার দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঐ রকম একটি জেটি লর্ডের তৈয়ারী করিবার ইচ্ছা হয়েছে। তা কাগজ-খানা দয়া করে দিয়ে আসবে?"

জ্যাক লর্ড ষ্ট্যাণ্টনের নাম মাত্র পূর্ব্বে শুনিয়াছিল, তাহাকে কখনও দেখে নাই। উহাদের জমিদারী, বিষয় সম্পত্তি ব্রামলে গ্রামের লাগালাগি।

জ্যাক নিকটে আর কোনও লোককে না দেখিতে পাইয়া নিজেই যাইতে স্বীকৃত হইল।

জ্যাক কাগজখানি ইঞ্জিনীয়ারের হাতে গিয়া দিল। তিনি আবার লর্ড ষ্ট্যাণ্টনের নিকট গিয়া বলিলেন,—"দেখুন, আমাদের এই জেটীর নক্সা; এর চেয়ে আরও ভাল করে তৈয়েরী করতে হবে। এখন কথা হচ্ছে, কোথায় জেটী তৈয়ারী করা হবে। তীরটা একবার ঘুরে না দেখলে, স্থানটা ঠিক করা যায় না।"

ষ্ট্যাণ্টন বলিয়া উঠিলেন,—"তার আর কি? আমি এখনই নৌকায় চড়ে তীরটা ঘুরে আসছি।" পরে সম্মুখে তাকাইয়া জ্যাককে দেখিতে পাইলেন, "এই যে, তোমার নৌকা কোথায়, চল ত যাই।" এরূপ ভাবে তিনি এ বিষয়ে প্রস্তাব করিলেন যে জ্যাক কিছুতেই তাঁহার কথায় অস্বীকার করিতে পারিল না। সে পথ দেখাইয়া তাঁহাকে তাহার নৌকায় লইয়া গেল।

জ্যাক জোরে দাঁড় টানিতে লাগিল। ষ্ট্যাণ্টন তীরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, পরে জ্যাককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখ, আমি এখানে একটা জেটী তৈয়ারী করব। প্রজাদের বড় কষ্ট হচ্ছে। তা, তুমি ত এ স্থানের লোক, বলতে পার কোন জায়গাতে জেটী তৈয়ারী করলে সুবিধা হবে?"

জ্যাক এ সম্বন্ধে এত কথা বলিল, জেটী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এত পরামর্শ দিল যে, লর্ড ষ্ট্যাণ্টন তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

জ্যাক যে নীচ ধীবর জাতীয় তাহা ভুলিয়া গিয়া সমবয়স্ক বন্ধুর ন্যায় তিনি তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। তাহার নিকট হইতে দিয়াশলাই ও তামাক চাহিয়া লইয়া তিনি ধূমপান করিলেন। তাহার শিষ্ট ব্যবহারে জ্যাক বড়ই মুগ্ধ হইল ও তাহার প্রতি আসক্ত হইল।

জেটি নির্ম্মাণের উপযুক্ত একটি স্থান ঠিক করিয়া ষ্ট্যাণ্টন নৌকা ফিরাইতে বলিলেন। ফিরিবার মুখেও সারাপথ তিনি জ্যাকের সহিত জেটি নির্ম্মাণ, ও প্রজাগণের অপরাপর হিতকর অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরে তীরে নামিয়া জ্যাককে ধরিয়া বসিলেন,—"এ কাজে তোমাকে আমাকে সাহার্য্য করতেই হইবে। এসব সম্বন্ধে তুমি যত জান, এমন আর কেউ জানে

বলে বোধ হয় না। আমার কথা তোমাকে রাখতেই হবে। আর মাহি-নার সম্বন্ধে তোমার কোন ভাবনা নাই, তুমি যা চাবে, তাই দিব।"

জ্যাক পূর্ব্ব হইতেই যুবকের সদয় ব্যবহার ও সরলতায় মুগ্ধ হইয়াছিল। এক্ষেত্রে কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল, ইতিমধ্যে ষ্ট্যাণ্টন মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

(১২)

জ্যাকের মনে হইতে লাগিল যেন অদৃষ্ট দেবী পরিহাসচ্ছলে তাহাকে এ স্থানের প্রতি আরও আকৃষ্ট করিতেছেন এবং তাহার এস্থান ত্যাগ করিবার সঙ্কল্পকে বিফল করিয়া দিয়া অন্তরালে বসিয়া হাসিতেছেন। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, ইহার জন্য সে যতটা দুঃখিত হইয়াছে বলিয়া মনে ভাবিয়াছিল ততটা দুঃখ সে যথার্থই অনুভব করে নাই। আরও যুবক ষ্ট্যাণ্টনের প্রতি তাহার অনুরাগের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতেছিল।

পরদিন জ্যাক নদীতীরে বসিয়া তাহার নৌকা ঠিক করিতেছে, এমন সময় লর্ড ষ্ট্যাণ্টন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্যাককে দেখিয়া বলিলেন, "যাহোক, তোমার সঙ্গে দেখা হল, ভালই হল; চল খানিকটা ঘুরে আসি।"

"এখন ত আমার যাবার জো নেই; পূর্ব্ব হতেই আমি আর একজনদের কথা দিয়েছি।"

এমন সময় ভগ্নীদ্বয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষ্ট্যাণ্টন জ্যাককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এই দুটি স্ত্রীলোকের কথাই সে বলিতেছিল, এবং ইহাদের নাম মিস ব্রামলে। তিনি পূর্ব্বেই ইহাদের নাম শুনিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া ফেলিলেন। এক-নিঃশ্বাসে তাঁহার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য, জেটীনির্ম্মাণের সঙ্কল্প সবই তাঁহাদের নিকট বলিলেন। মলির রূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি একটু মুগ্ধও হইয়া ছিলেন।

"আপনারা বোধ হয় এর নৌকায় চড়ে বেড়াতে যাচ্ছেন। আমারও একটু দরকার আছে। তা আমি অন্য নৌকা খুঁজে নিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি আশেপাশে একবার তাকাইলেন। কিন্তু জ্যাকের নৌকা ব্যতীত ঘাটে আর দ্বিতীয় নৌকা ছিল না। ক্লাইটি, তাঁহাদের সহিত একত্রে

যাইবার ষ্ট্যাণ্টনের ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিহেন,—"চলুন না, আমাদের সঙ্গেই চলুন; আমাদের বিশেষ কোন জায়গায় যাবার দরকার নেই।"

ষ্ট্যাণ্টন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের সহিত নৌকায় উঠিলেন। জ্যাকও নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা তিনজনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। ক্লাইটি বেশী কথা কন নাই। মলি ও ষ্ট্যাণ্টন দুজনে নানাবিষয়ে আলাপ করিতে লাগিল। ষ্ট্যাণ্টনের সরলতা ও অমায়িকতা লইয়া মলি মধ্যে মধ্যে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না।

কিছুদূর গিয়া ষ্ট্যাণ্টন তীরে নামিতে উদ্যত হইলেন এবং মলিকেও সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা দুজনে তীরে নামিল। জ্যাক ও ক্লাইটি নৌকায় বসিয়া রহিল। ক্লাইটি তাহাদের সহিত যাইতে চাহিলেন না। তিনি জ্যাকের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন,—"কাল বালিকাটি বড় রক্ষা পেয়েছে; তুমি সময়ে না এলে, তার খুব আঘাত লাগত। তোমার লাগে নি ত?"

"না আমাকে আদৌ লাগে নি। তা, আপনি যখন ও কথা তুললেন, তখন একটা কথা বলি। কাল আপনাদের সম্মুখে আমার অমন রাগ প্রকাশ করা ভাল হয় নি। তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার রাগটা স্বভাবতঃই একটু বেশী।" এই কথা বলিয়াই জ্যাক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। পুরাতন দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। এই ক্রোধেই বশীভূত হইয়া পিতাপুত্রের মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল।

ক্লাইটি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর আবার কি ভাবিয়া জ্যাককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি কখনও অষ্ট্রেলিয়ায় গেছ?"

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনিয়া জ্যাক একটু চমকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হাঁ, গেছি।"

ক্লাইটি চিবুকে হাত দিয়া উৎসুকনয়নে জ্যাকের দিকে তাকাইলেন। "আচ্ছা, ও জায়গাটা তোমার কি ভালরূপ জানা আছে?"

"হাঁ, অনেকটা জানি, খুব বড় দেশ!"

"তা, আমি জানি, সেখানে কাকেও খুঁজে বার করা বড় কষ্টকর। তা নয় কি? ইচ্ছা করলেই লোক আপনাকে সেখানে বেশ লুকিয়ে রাখতে

পারে।" একথা কতদূর গড়াইবে, জ্যাক তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া নিজেকে রীতিমত সংযত করিয়া লইল।

ক্লাইটি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অষ্ট্রেলিয়ায় মিন্‌-টোনা সহরের নাম শুনেছ ?"

"মিন্‌টোনা! বোধ হয় যেন ও নাম শুনেছি।"

ক্লাইটি নৈরাশ্যের সহিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। "তুমি তাহলে সেখানে যাও নি। আমি একজন লোকের খবর জিজ্ঞাসা করছিলাম। তিনি এখনও সেখানে আছেন, কিংবা কিছুদিন পূর্ব্বে ছিলেন। তাঁর নাম স্যার উইলফ্রেড কার্টন। তবে সেখানে বোধ হয় তিনি ছদ্মনাম ধারণ করেছেন।"

"তা হতে পারে। এমন লোক সেখানে অনেক আছে। আপনি বোধ হয় স্যার উইলিয়ামের পুত্রের কথা বলছেন ?"

"হাঁ, তিনি কয়েকমাস পূর্ব্বে ইংলণ্ড ত্যাগ কর যান; কিন্তু মিনটোনাতে আছেন সংবাদ পেয়ে সেখানে তাঁকে দুখানি পত্র দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু একখানিরও উত্তর পাওয়া যায় নি। তার সম্বন্ধে কোন খবরও পাই নি। মনে করেছিলাম, সেখানে তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে থাকবে বা তুমি তাঁর বিষয় শুনে থাকবে,—কিন্তু তা দেখছি সম্ভব নয়। দেশ মস্ত বড়—" এই বলিয়া ক্লাইটি আবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"আচ্ছা, তিনি দেখতে কেমন বলতে পারেন ?"

"না, তা বলতে পারি না। সেই ছেলেবেলায় দেখেছিলাম, আর দেখি নি। তবে তখন তিনি দেখতে বেশ সুশ্রী ছিলেন, কিন্তু বড় দুর্দ্দান্ত—"জ্যাক কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল,—"আবার এখন বোধ হয় কুসংসর্গে পড়ে আরও খারাপ হয়ে গেছেন,—"

বলিতে বলিতে ক্লাইটি কি ভাবিলেন। এরূপ ভাবে একজনের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা ভদ্রতাসঙ্গত নহে ভাবিয়া চুপ করিলেন।

এমন সময় লর্ড ষ্ট্যাণ্টন ও মলি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা নৌকায় চড়িলে জ্যাক নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকা যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল। ভগ্নীদ্বয় তীরে নামিয়া একটু অগ্রসর হইলেন। লর্ড ষ্ট্যাণ্টন জ্যাকের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"কাল যা বলেছিলাম, মনে আছে ত ? আজ আবার মিস মলির নিকট তোমার গুণের

পরিচয় পেয়ে তোমায় কিছুতেই ছাড়তে পারছি না। আমার কাজ তোমাকে করতেই হবে, আর কোথাও যেতে পাবে না।"

জ্যাকের সম্মতি বা প্রত্যাখ্যাত কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। দুচার পদ অগ্রসর হইয়াই আবার জ্যাকের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"দেখ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। তুমি কেবল আমারই কাজ করবে বটে, তবে এই স্ত্রীলোক দুটি তোমাকে যখন যা করতে বলবেন, তাতে অস্বীকার করবে না।" এই কথা বলিয়াই তিনি দ্রুতপদ-বিক্ষেপে তাহাদের সঙ্গে গিয়া জুটিলেন।

জ্যাক হাঁ, না, কিছুই বলিল না। তাহার মানসিক অবস্থা এরূপ নহে যে সে এই সব কথার যোগ্য উত্তর দেয়। সে নলে অগ্নিসংযোগ করিয়া চিন্তাকুল দৃষ্টিতে নদীতীরস্থ উপলখণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিল।

মৃত্যু-মিলন।

(লেখক—শ্রীধরণীধর ঘোষাল)

(১)

রমেশের বারবার নিষেধ সত্ত্বেও যখন তাহার স্ত্রী সুষমাকে আনিবার জন্য পুনরায় লোক প্রেরিত হইল, তখন তাহার মনের ভাব কিরূপ দাঁড়াইল তাহা বলা শক্ত। একটা আগ্রহ ও আশঙ্কা, হর্ষ ও বিষাদ যুগপৎ তাহার মনকে বিপর্য্যস্ত করিতেছিল। 'এতদিন হয়ত সুষমার জ্ঞান হইয়াছে, এবারে বোধ হয় শ্বশুর বাড়ী আসিতে সে আর অমত করিবে না,'—এ সব কথা যতবার সে ভাবিতে লাগিল, ততবার তাহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু 'যদি সে না আসিতে চায়, যদি তাহাদের লোক অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আইসে'—এই কথা মনে হইবা মাত্র রমেশের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। বুকের রক্ত যেন চলাচল বন্ধ হইয়া জমাট বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি বন্ধুদের মধ্যে যাইয়া নানারূপ হাস্য পরিহাসের মধ্যে আপনাকে লুকাইতে চেষ্টা করিল।

সুষমা, ধনী পিতা হরলাল রায়ের এক মাত্র সন্তান। বাল্যে মাতৃহারা

হওয়ায় পিতার সমস্ত স্নেহ একমাত্র তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া ঘেরিয়াছিল। বৃদ্ধ পিতার অনুরোধ সত্ত্বেও হরলাল বাবু আর বিবাহ করেন নাই। সুষমাকেই জীবনের অবলম্বন করিয়া লইয়া বেশ সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। হরলাল বাবু আধুনিক শিক্ষার পক্ষপাতী। নিজে বিদ্বান—পাণ্ডিত্যাভিমানি। সুষমাকে কন্যা বলিয়া কোন দিন তিনি ছোট দেখেন নাই। পুত্র নির্ব্বিশেষে তাহাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুষমাও পিতার কামনা সফল করিয়া সুশিক্ষিতা বলিয়া সাধারণের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। বৃদ্ধ পিতাকে বারবার মনঃকষ্ট দিতে না পারিয়া বাল্য বিবাহের বিরোধী হইলেও হরলাল বাবু নিতান্ত অনিচ্ছায় একাদশ বর্ষীয়া বালিকা কন্যা সুষমার মল্লিকপুর গ্রাম নিবাসী ৺নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রমেশচন্দ্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অবস্থা ভাল না হইলেও কুলীনের সন্তান বলিয়া রমেশ ধনীকন্যা সুষমার পানি গ্রহণে সক্ষম হইয়াছিল। বৃদ্ধ সুখময়ের ইচ্ছাতেই এরূপ অসামঞ্জস্য বিবাহ হইয়াছিল। অন্যান্য সকলের ন্যায় হরলাল বাবু বিবাহ দিয়াই কন্যার শিক্ষার সমাপ্তি করেন নাই। বিবাহিত হইলেও সুষমাকে পূর্ব্বের ন্যায় কলেজে শিক্ষার্থ পাঠাইতে লাগিলেন।

বিবাহের পর দুই একবার রমেশের মা নববধূকে লইয়া যাইবার জন্য পাল্কী পাঠাইয়া ছিলেন। নাতনী ছোট বলিয়া বৃদ্ধ সুখময় তাহা ফেরৎ পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও হরলাল বাবু দুইবার রমেশদের লোক ফেরৎ দিয়াছেন। কন্যাকে এত অল্পবয়সে (যদিও সুষমার বয়স প্রায় পনের) শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে তিনি সম্পূর্ণ নারাজ। কিন্তু সুষমার নিজের অমতই তাঁহাকে বৈবাহিকার লোক ফিরাইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাধ্য করিয়াছিল।

ইংরাজী ধরণে পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় এবং ইংরাজী শিক্ষায় হৃদয় গঠিত হওয়ায় সুষমা জীবনের আদর্শ যেরূপভাবে গড়িয়া তুলিয়া ছিল, বাস্তব জগতের মধ্যে, সংসারের বুকে, ঠিক সেটীর দেখা সে পাইয়া উঠিতে ছিল না। আদর আহ্লাদ, বিলাস সম্ভোগের মধ্যে যৌবনের প্রারম্ভে মনুষ্য-জীবনের যে সব উজ্জ্বল ছবি সে মনের মধ্যে কল্পনার সাহায্যে আঁকিয়া ছিল, সংসারের দুঃখজ্বালা, শোক অশান্তির মধ্যে সে সব ছবির একখানিও সে দেখিতে পাইতেছিল না। সে ধনীর সন্তান। তাহার

প্রতি অঙ্গুলি চালনে, প্রতি ভ্রুভঙ্গীতে, প্রতি কথায় কত লোক ছুটাছুটী করিয়া তাহার সন্তোষ বিধানের জন্য ব্যস্ত! গাড়ি ঘোড়া, মটর, রাশি রাশি বস্ত্র অলঙ্কার, খ্যাতি প্রতিপত্তি,--এমনিতর জিনিষের উপর তাহার অদেশে'র ছায়া! সে কি করিয়া একজন দরিদ্র গৃহস্থের প্রকোষ্ঠ মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিবে? সংসারের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের গণ্ডীর মধ্যে সে আপনাকে বদ্ধ রাখিতে চাহে না। সে চাহে আকাশের মত উদার, সাগরের মত অসীম, বসন্তের মত সরস, প্রকৃতির মত লীলাময়—এমনি একটা কাল্পনিক দেশ, যেখানে স্বাধীন কোমল বাসনা গুলি শরতের লঘু সাদা সাদা মেঘ খণ্ডের মত যথেচ্ছা উড়িয়া, ঘুরিয়া বেড়াইবে, যেখানে আশার শেষ নাই—অথচ পূরণের বাধা নাই, হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি যেখানে একে একে জাগিয়া ও ঘুমাইয়া জীবনকে চিরমধুময় করিয়া রাখিবে!—এমনি একটী মানস-জগতে সুষমা বাস করিতে চায়। দরিদ্র রমেশ কিরূপে তাহাকে তুষ্ট করিবে? তাই সুষমা শ্বশুরবাড়ী যাইতে চাহিল না। স্বামীর একটা ছোট প্রকোষ্ঠ তাহাকে কি এত সুখ, এত আনন্দ, এত তৃপ্তি দিতে পারিবে? যাহা সে তাহাদের এই রাজার মত প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে পাইতেছে? স্বামীর সীমাবদ্ধ ঘর কি তাহাদের এই এত বড় প্রাসাদের তুল্য? ছিঃ! সুষমা এবারও লোক ফেরৎ পাঠাইল।

বার বার অপমানিত হইয়া রমেশের মা 'এবারে কন্যা না পাঠাইলে পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিব', এইরূপ রুক্ষভাবে পত্র লিখিয়া সুষমাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। পিতার মুখে শাশুড়ীর স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া সুষমা হাসিয়া উঠিল। পুত্রের বিবাহ দিবে? দিক্ না! কে তাহাদের ধরিয়া রাখিয়াছে? এ কথা তাহাদের জানাইবার কি প্রয়োজনটা ছিল? তাহার ছেলে বিবাহ করিবে এই ভয়েই যেন তাহার ঘুম হইতেছে না! বাবা, 'তুমি বেশ ক'রে লিখে দাও ত' শ্বশুরবাড়ীতে তোমার মেয়ের কিছুই দরকার নাই',—সুষমা সগর্ব্বে সে স্থান ত্যাগ করিল। দরিদ্র বেয়ানের স্পর্দ্ধার চিঠি পড়িয়া হরলালবাবু বিষম চটিয়াছিলেন। সুষমাকে ডাকিয়া তিনি সব কথা শুনাইলেন। কন্যার মনোভাব নিজের ইচ্ছার অনুকূল দেখিয়া তিনি রমেশদের চিঠি দিলেন,—'তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিও। আমার কন্যা তোমাদের অন্নের কাঙ্গাল নহে। সে কখনও তোমাদের বাড়ী যাইবে না।'

শ্বশুরের পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া রমেশের আপনাকে সামলান দায় হইল। তাহার কত আশা, কত কল্পনা—সব শেষ! জীবনের কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে শত আমোদ আহ্লাদ, আশা ভরসা ও আশীর্ব্বাদের মধ্যে সে তাহার মানসী দেবীর হাত ধরিতে পাইয়াছিল, আজ তবে,—আজ তবে এ কি? সে কি তবে ভুল করিয়া অন্য কাহারও পদতলে আপনার হৃদয় উজাড় করিয়া সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়াছে? না, সে ত ভুল হইবার নহে! সে যে ভাল করিয়াই তাহাকে দেখিয়াছে। দেখিয়াই সে ত চিনিতে পারিয়াছিল, তাহার মানসী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহাকে ধরা দিতে আসিয়াছে! সে ত দেখিয়াই বুঝিয়াছিল, সে দেহলতা তাহারই, একান্ত তাহারই! তবে—রমেশ কোনরূপে যাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। পুত্রের অবস্থা লক্ষ্য করিরা রমেশের মাতা শপথ করিলেন, আগামী ফাল্গুনমাসেই রমেশের বিবাহ দিয়া ধনী কন্যা সুষমার আস্পর্দ্ধা চূর্ণ করিবেন।

রমেশের দিন আর কাটিতে চায় না। তাহার শেষ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন তাহার দীর্ঘ ছুটী। কি উপায়ে এই সুদীর্ঘ সময় কাটান যায় এবং চিন্তার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, রমেশ তাহাই ভাবিতে লাগিল। বাহিরে বিশেষ কিছু ভাবান্তর না হইলেও অন্তর তাহার আগ্নেয় গিরির গৈরিক নিঃস্রাবের মত হতাশার তীব্র জ্বালায় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল। জীবনের প্রভাতে তাহার জীবনের অবসান। মিলনের বোধন হইতে না হইতেই বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। রমেশ পুনর্ব্বিবাহের অসম্মতি জানাইলেও, রমেশের মা পাত্রীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবং অল্প দিনেই একটীর সন্ধান পাইয়া কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া ফেলিলেন। এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, রমেশ পুঁটলী পাঁটলা বাঁধিয়া হাওয়া বদলাইবার অছিলায় একদিন প্রভাতে পশ্চিম যাত্রা করিল। রমেশের মা কন্যাপক্ষকে পুত্রের অসুস্থতার কথা জানাইয়া বিবাহ স্থগিত রাখিলেন।

স্রোতের মুখে তৃণ খণ্ডের মত এখানে সেখানে,—কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া রমেশ কুল কিনারা পাইতেছিল না। হিন্দুর কীর্ত্তি-মণ্ডিত এই সব স্থান দেখিবার জন্য সে সাগ্রহে এই দিনের অপেক্ষা করিয়াছে! কত হর্ষ বিস্ময়ে মানচিত্রে এই সব স্থানের নাম দেখিয়া হিন্দুর গর্ব্বে সে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে!—কিন্তু আজ ত সেই সব স্থান সে প্রত্যক্ষ করিতেছে! সে ত' এই সব আসল বৃন্দাবন, মথুরা, দিল্লি, কুরুক্ষেত্রের

উপর দাঁড়াইয়া! কিন্তু আজ তাহার সে আনন্দ কই? সে বিস্ময়, সে ঔৎসুক্য কই? জীবনের শৃঙ্খলা নাই,—কোন উদ্দেশ্য নাই। শেষে নিজের উপর বিরক্ত হইয়া রমেশ এলাহাবাদে শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া জীবনের গত দিনগুলি ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রমেশের মা নিজের প্রাণে রমেশের জ্বালা অনুভব করিতেছিলেন। এই সুদূর দেশে রমেশের চাকুরী গ্রহণের সংবাদ পাইয়া অভাগিনী মাতা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া ঈশ্বরের কাছে পুত্রের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

(২)

পূর্ব্বের মত বেশ আরামেই সুষমার দিন কাটিতেছিল। নভেল, নাটক পড়া, বেশ ভূষা করা, ময়দানে বেড়াইতে যাওয়া, গার্ডেনপার্টিতে যোগ দেওয়া কিছুরই ক্রটী হইতে পায় নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ছোট বড় কবি ও ঔপন্যাসিকের নিস্তার তাহার কাছে ছিল না। কাহার কতটুকু ভাল, কতটুকু মন্দ, কতটুকু শ্লীল, কতটুকু অশ্লীল, সংবাদ পত্রে বহুবার তন্নতন্ন করিয়া সমালোচনা করিয়া সাহিত্যে সে নাম করিয়া লইয়াছে। নিজে সে একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও উপন্যাসলেখিকা বলিয়া বিখ্যাত। পুরুষ ও নারী সকল সম্প্রদায়ের লেখকই তাহাকে সাহিত্যের স্বর্ণসিংহাসনখানি বিনা কলহে ছাড়িয়া দিয়াছে। পিতা হরলাল ও কন্যা সুষমা উভয়েই এ সম্মানে গর্ব্বিত। পিতার অগাধ স্নেহ, বন্ধুবান্ধবের অকৃত্রিম প্রেম ও সাধারণের ভালবাসার মধ্যে সুষমা আপনার বিবাহিত জীবনকে একেবারে ভুলিবার অবকাশ পাইয়াছিল। সহচরীদের কলহাস্য ও কৌতকে এবং সাহিত্য চর্চ্চায় সে আপনাকে এত বেশী ডুবাইয়া দিয়াছিল যে, এক দিনও স্বামীর স্মৃতি তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। তাহার হৃদয়ের কপাট সেদিকে চিরতরে বন্ধ ছিল। অতি সুখে সুষমা জীবনের সতেরটী বৎসর কাটাইয়া দিল।

সেদিন মধ্যাহ্নে আপনার কক্ষে চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর হস্ত মধ্যে মুখ রাখিয়া সুষমা ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল তাহার জীবনের কথা! এতদিন এ কথাটা তাহার মনেই ছিল না। জীবন সম্বন্ধে ভাবিবার মত যে কিছু একটা, আছে উপন্যাস বা কবিতায় তাহা স্বীকার করিলেও আপনার অন্তঃকরণে সে মোটেই স্বীকার করিত না। এতদিন সে সত্য

সত্যই জীবনের দিকে চাহিয়াও দেখে নাই। কাল এক বন্ধুর বিবাহসভায় কোন এক বন্ধু সুষমার বিবাহিত জীবনের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিল। সুষমা তখন হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও কথাটা তাহার অন্তরে বাজিয়াছিল। তাই আজ সে আনমনা ভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল তাহার জীবনের কথা! বৈশাখের দুপুরের রৌদ্রে জগৎ ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছিল। জলে ভেজা খস্‌খসের মধ্য দিয়া আসিয়া পুষ্পগন্ধে ভরা বাতাস সুষমার এলায়িত চুলরাশি লইয়া খেলা করিতেছিল। বাড়ীর পার্শ্বে শিরিশ গাছের নবোদ্গত কিশলয় ঘন পল্লব ছায়ার মধ্যে বসিয়া ঘুঘু ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া অবশভাবে ডাকিতেছিল। সুষমা বিশৃঙ্খলভাবে একথা, সেকথা, পাঁচ কথা ভাবিতে-ছিল। কোন একটা সূত্র পাইতেছিল না। টেবিলের উপর নব প্রকাশিত কতকগুলি মাসিকপত্র সাজান ছিল। সুষমা তাহাদের মধ্য হইতে এক-খানি টানিয়া লইয়া প্রবন্ধ সূচী দেখিতে লাগিল। সব পরিচিত নাম,—নরেনবাবু, সতীশবাবু, ধীরেনবাবু, সুশীলা, চারুশীলা, বিনোদিনী সকলেই তাহার পরিচিত। সকল প্রবন্ধই সে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে পড়িয়াছে বা শুনিয়াছে। তাহার একটা উপন্যাস সেই পত্রে প্রকাশিত হইতেছিল। সুষমা একবার সেটা চোখ ধুলাইয়া দেখিয়া লইল। তাহার উপন্যাসের পরেই একটা গল্প—"আশাহত"! লেখকটা কে? লিখেছে তো মন্দ নয়? বা:! সুন্দর! চমৎকার! কে এ লেখক! সুষমা তাড়াতাড়ি নামটা দেখিয়া লইল—রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রমেশ? কই এ লেখকের নাম তো সে পূর্ব্বে দেখে নাই? নবীন লেখক! কিন্তু লেখ্‌বার ভঙ্গিটী তো খাসা! ভাব প্রকাশের কায়দা অতি সুন্দর। বড় বড় সাহিত্যিক এরূপ পারে কি না সন্দেহ। সুষমা সাগ্রহে গল্পটী পড়িতে লাগিল। একি, এলোকটা কি নিজের প্রাণটা এ গল্পের মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছে? যেরূপ আগ্রহে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেইরূপ আগ্রহেই ভগ্নপ্রাণে সুষমা গল্পটি শেষ করিল। নায়ক জ্যোতিষের হতাশার হাহাধ্বনি কেবলি তাহার প্রাণে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। সুষমা উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সুষমা বাহিরের কিছুই দেখিতে-ছিল না। প্রাণের উদাস ভাবটা জগতের বক্ষে দেখিয়া তাহার মন কেবলি অলসভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কেবলি আশাহত জ্যোতিষের কথা মনে পড়িতেছিল। আর তাহার প্রাণে কাঁটা ফোটার মত যন্ত্রণা

অনুভব করিতেছিল। সে দিন আর সুষমা বেড়াইতে বাহির হইল না। বিছানায় শুইয়া কেবলি জ্যোতিষের কথা ভাবিতে লাগিল।

পরদিনও সুষমা হতভাগ্য জ্যোতিষের কথা ভুলিতে পারিল না। প্রাণের অন্তঃতম দেশে জ্যোতিষের নিরাশার ঘা বাজিয়া সুষমাকে আর একজনার কথা মনে করিয়া দিতেছিল। সে তাহার গরীব স্বামীর কথা। স্বামীর কথা মনে হইবামাত্রই সুষমা নানারূপে কথাটা চাপা দিতে লাগিল। সকাল হইতে তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না।. বিবাহের কথা মনে হইবা মাত্রই সে বিনা প্রয়োজনে নানা কার্য্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিল। বিছানা-ঝাড়া, কাপড়-গোছান, বই-সাজান, নানা কাজের তাড়া পড়িয়া গেল। তাহাকে কাজ করিতে দেখিয়া দাসীরা ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতের কাজ কাড়িয়া লইতে চাহিল। সুষমা তাহাদের সকলকে নানা কৌশলে অন্যান্য কাজে পাঠাইয়া আপনার কাছ হইতে সরাইয়া দিল।

১০।১৫ দিন পরে সমালোচনার জন্য সুষমা একখানা উপন্যাস পাইল—'বিসর্জ্জন'। অন্য সময় হইলে সুষমা লেখকদের নাম দেখিয়া লইয়া বইটাকে একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিত। কিন্তু সে দিন লেখকের নাম দেখিয়াই বইটাকে তখনি পড়িতে লাগিল। সেই 'আশাহতের লেখক। সেই লেখা! সেই একটা প্রাণের মর্ম্ম বিদারক করুণ কাহিনী। সুষমা অশ্রুজলে বইয়ের লেখার ছত্র হারাইয়া ফেলিতে লাগিল। বইপড়া হইল না, মর্ম্মে আঘাত পাইয়া সুষমা উঠিয়া পড়িল। বইয়ের পাতার মধ্য হইতে একি সুর উঠিয়া তাহার প্রাণকে কাঁদাইয়া তুলিতেছে! গর্ব্বিতা লতিকার পরিণাম দর্শনে সুষমার নারীহৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। স্বামীকে পাইবার জন্য একবার মাত্র তাহাকে দেখিবার জন্য লতিকার শেষ জীবনের ব্যাকুলতা, আগ্রহ, সুষমার প্রাণে তাহার নিজের কথাই জাগাইতেছিল। সেও তো লতিকার মত তাহার স্বামীকে দূর করিয়া দিয়াছে। সেও ত লতিকারই মত স্বামীর কাছ হইতে আপনাকে জোর করিয়া ছিন্ন করিয়া লইয়াছে। তবে কি তাহার শেষ জীবন লতিকার মত হইবে? সুষমা চমকাইয়া উঠিল! পরে নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া আবার তখনি হাসিয়া উঠিল! এত একটা গল্প! কবির খেয়ালের একটা লীলা! জীবনের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি?

কথাটা চাপাদিতে চাহিলেও সুষমার জীবন-বীণা কেমন বেসুরা

বাজিতে লাগিল। হাজার চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই পূর্ব্বের স্বাধীনতা, মনের অবাধ গতি ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। থাকিয়া থাকিয়া তাহার নারীহৃদয় কাহার জন্য অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। শত চেষ্টাতেও সুষমা পারিল না। আপনার হৃদয়কে কিছুতেই বশ করিতে পারিল না। সুষমা নির্জ্জনে, নীরবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিল।

(৩)

কাহারও সঙ্গ ভাল লাগে না। সাহিত্যচর্চ্চায় তেমন আনন্দ নাই। সুষমা একসঙ্গে 'বন্ধুসঙ্গ' ও 'সাহিত্যসঙ্গ' সমভাবে ত্যাগ করিল। তাহার সাহিত্যের পরিত্যক্ত আসনখানি ধীরে ধীরে অন্যে দখল করিল। সুষমা স্বেচ্ছায় তাহার স্বত্ব ছাড়িয়া দিল। সুষমার এই উদাসভাব লক্ষ্য করিলেন প্রথমে হরলালবাবু। মায়ের হৃদয় লইয়া হরলাল সুষমাকে মানুষ করিয়াছেন। সুতরাং তাহার খুঁটি নাটি কিছুই তাঁহার কাছে গোপন থাকে না। কন্যার সহসা এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রবীণ হরলাল চিন্তিত হইলেন। এবং তাহার এরূপ হইবার কারণ কি তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন।

সুষমার সাহিত্যসঙ্গ ত্যাগে বাজারে একটা সরগোল পড়িয়া গেল। কিন্তু নানা চেষ্টাতেও কেহই কারণটা যে কি, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। প্রকাশক এতবড় একটা লোক হাতছাড়া হয় দেখিয়া, দুইবেলা হাঁটাহাঁটি করিয়া পায়ে ঘা করিল। সুষমা নানারূপ বুঝাইয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিল। বেচারা ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেল। সহযোগী, সমপাঠী, বন্ধুগণ দেখা করিয়া পত্র দিয়া বারবার তাহার এ ব্যবহারের জন্য অনুযোগ করিতে লাগিলেন। বঙ্গবাণীর পূজা ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধও সুষমা কোনরূপে এড়াইল। কিন্তু যে দিন তাহার প্রিয়তম বন্ধু সুশীলা আসিয়া তাহাকে নিতান্তই ধরিয়া বসিল, সে দিন সে কিছুতেই 'না' বলিতে পারিল না। নীরবে পরিত্যক্ত খাতা ও কলম তুলিয়া লইল। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখিকার নূতন বই প্রকাশিত হইয়াছে। সকলেই সাগ্রহে পড়িতে লাগিল। কিন্তু হায়! তাহাদের উৎসাহ একেবারে দমিয়া গেল। একি সুষমার লেখা! হইতেই পারে না। সংবাদপত্র দুঃখ করিয়া বইখানির সমালোচনা বাহির করিল। কোন কোন সম্পাদক গালি দিল। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে লাগিল। সুষমা

ম্লানহাস্য করিয়া সুশীলাকে বলিল—আর সে দিন নেই ভাই। Those days are gone—তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ। আমার যশ-চন্দ্র প্রভাত সূর্য্যের উদয়ে ম্লান হ'য়েগেছে। আমি হেরেছি; বলিতে সুষমা কাঁদিয়া ফেলিল। সুশীলা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সহানুভূতিতে তাহার হৃদয়খানি গলিয়া গিয়াছিল। সে নানারূপে তাহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল।

একদিন বৈকালে সুশীলা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সুষমার যে বইখানার সকলে নিন্দা করিয়াছে, একজন সে খানার খুব প্রশংসা করিয়াছে। সুষমা চমকিত হইয়া বলিল, "কে সে পাগল!" সুশীলা বলিল, "না, না, তিনি পাগল নন। আজকালকার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক রমেশবাবু! রমেশ বাবুকে চেন না? সেই সে দিন তুমি যাঁর খুব কড়া ক'রে সমালোচনা করেছিলে। মনে পড়ছে না? সুষমা বহুকষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া ম্লানহাস্য করিয়া বলিল, "ও! আজকালকার সাহিত্যের রবি!" এমন ভাবে সে কথাটা বলিল যে, সুশীলা বুঝিতেই পারিল না সেটা বিদ্রূপ, কি হিংসা, কি অন্য কিছু। কথা বদলাইয়া সুষমা সুশীলাকে বিদায় দিল।

সুশীলা চলিয়া গেলে বাজার হইতে যে কাগজে তাহার সমালোচনা ছিল, সেই কাগজখানা কিনাইয়া আনিয়া সুষমা নিবিষ্ট মনে পড়িতে বসিল। (আগে সকল কাগজই আসিত, এখন ২।১ খানার আসা বন্ধ হইয়াছে। অদৃষ্ট!) লেখক প্রতি ছত্র ধরিয়া সমালোচনা করিয়াছে। নির্ভীক সমালোচনা! তুলা দণ্ডের মাপ! অন্যান্য সমালোচকদের প্রতিবাদ খণ্ডন করিয়া সুষমার যশ-সূর্য্যকে মেঘমুক্ত করিয়াছে। কাগজ রাখিয়া সুষমা ভাবিতে লাগিল। এই সেই লেখক যাহাকে সে একদিন অতি কঠোর ভাবে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়া তাহার উদীয়মান প্রতিভাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর আজ সেই লেখকই তাহার লুপ্ত প্রায় গৌরবকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে! তাড়াতাড়ি তপ্ত অশ্রু জল মুছিয়া সুষমা দাসীদের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিল।

বড় দীর্ঘ দিন—কিছুতেই ফুরাইতে চাহে না। ঘড়ি দেখিয়া দেখিয়া বিরক্ত হইয়া দুই তিনটা ঘড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। একটা জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। ঘরে ঘড়ি রাখা বন্ধ করিল। তবু দিন আর কাটিতে চায় না। পূর্ব্বে দিনগুলা ছোট বলিয়াই বারবার অনুযোগ করিয়া

আসিয়াছে। আজ সুষমা দিন 'বড়' বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল। আপনার স্বার্থের সহিত জগতের মিল না দেখিলেই মানুষ এমনি করে বটে!

(৪)

সেদিন দুপুরবেলার হাতে কোন কাজ ছিল না। সর্ব্বদা সূচ সুতা ভাল লাগে না। সুষমা যত পুরাতন, জীর্ণ বই, খাতা, কাগজ, চিঠি খুলিয়া খুলিয়া পড়িতে লাগিল। প্রতি কাগজপত্র তাহার হারাণ সুখের দিনের কথা মনে করিয়া দিতে লাগিল। কত বন্ধু তাহার সৌভাগ্যের সম্বর্দ্ধনা করিয়া কত পত্র দিয়াছে। কত সম্পাদক, প্রকাশক তোষামোদ করিয়া তাহাদের কাগজে প্রবন্ধ দিতে অনুরোধ করিয়াছে। কত পুস্তক-বিক্রেতা তাহার বইয়ের প্রকাশক হইবার জন্য লালায়িত হইয়া চিঠি দিয়াছে! সুষমা এক একখানি করিয়া পড়িতে লাগিল। আর অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া কখন হাসিতে কখন বা কাঁদিতে লাগিল। এই সুলীলার চিটি। এই নিরুপমার, এই বিমলার, এই কমলার; এই সরলার, এই জয়কালীবাবুর, এই নবকৃষ্ণবাবুর, এই হরেন বাবুর, এই কানাইবাবুর, এই নয়নতারার, এই বিভার, এই লক্ষ্মীর, এই কালীর কত চিঠি। এই সুভাষিণী লিখিয়াছে। এই তারক দিয়াছে! এ খানা কার? চমৎকার হাতের লেখা ত! কাঁপিতে কাঁপিতে সুষমা নাম পড়িল শ্রীরমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এ তাহার বিবাহের পর স্বামীর প্রথম চিঠি! সুষমা বিবর্ণ মুখে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ আছে কি না। তাহার পর ঘরের কপাট দিয়া চিঠিখানা বুকে করিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িল। যখন জাগিয়া উঠিল, তখন তাহার বুকের কাপড় ও চুলের রাশি ভিজিয়া গিয়াছে। সুষমা তাড়াতাড়ি মুখ চোখ পরিষ্কার করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল—সন্ধ্যা হইয়াছে।

সারারাত ঘুমাইতে পারিল না। কেবলি তাহার স্বামীর কথা মনে পড়িতে লাগিল। সেই ফুল শয্যার দিন তাহার স্বামীর কত আদর সোহাগ! আর তাহার উদ্ধত ব্যবহার! তাহার স্বামী শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে একটা কথাও কহাইতে পারে নাই। বাড়ী আসিবার দিন স্বামীর ছলছল চোখদুটী সুষমাকে আজ কি ভয়ানক আঘাত করিতেছে। সে দিন সে ফিরিয়াও দেখে নাই। সগর্ব্বে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার স্বামীর সরল নম্র আকুল চিঠির উত্তর না দিয়া স্বামীকে কষ্ট দিয়া যে দিন সে যতটুকু

আমোদ উপভোগ করিয়াছিল, আজ তাহার বিশগুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। সুষমা প্রাণপণে সেই পুরাণ দিন জড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে চাহিল। কিন্তু উপহাস করিয়া তাহারা সরিয়া যাইতে লাগিল।

অনুতাপে আত্মগ্লানিতে বিছানায় লুটাপুটি করিয়া সুষমা জাগিয়া জাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত কাটাইল। প্রভাতে হরলালবাবু কন্যার চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই জানিতে পারিলেন না। সারাদিন তাঁহার কিছুই ভাল লাগিল না। বৈকালে সুশীলা আসিলে সুষমা কথায় কথায় বহুকষ্টে ধরাধরা গলায় তাহাকে শুধাইল "তোর রমেশবাবুর খবর কি? লিখ্‌ছেন কেমন?" সুশীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "জাননা তুমি? আহা বেচারার বড় অসুখ! কাগজে পড়্‌লাম বাঁচেন কিনা সন্দেহ।" সুষমা অস্ফুটস্বরে কি একটা বলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল সুশীলা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। খানিক পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া সুষমা আসল কথাটা চাপিয়া বলিল, "আমার কদিন মাঝে মাঝে এমনি হচ্ছে।" ডাক্তার দেখাইতে পরামর্শ দিয়া এবং খুব সাবধান হইতে বলিয়া সুশীলা সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইলে সুষমা খানিকক্ষণ ভাবিল। পরে উঠিয়া বৈঠকখানায় হরলালবাবুর কাছে যাইয়া তাঁহার চেয়ারের হাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া পায়ের নখ দিয়া ঘরের মেঝে ঘষিতে লাগিল। কন্যাকে সহসা কাছে আসিতে দেখিয়া হরলালবাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন। সুষমার সম্বন্ধেই তিনি ভাবিতেছিলেন। মেয়েটার কেন এমন হইল। কন্যাকে আদর করিয়া বসাইয়া কথায় কথায় হরলালবাবু সুষমার শরীরে কথা তুলিলেন। এবং হাওয়া বদলানর জন্য যাইবে কি না সেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সুষমাও এই জন্যই আসিয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া বলিল, "হাঁ বাবা, আমিও তাই মনে কচ্ছি। আমি আজ রাত্রেই এলাহাবাদ যাব।" আজ রাত্রে যাওয়া হইতে পারে না বুঝাইয়া হরলালবাবু আগামী কল্য যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। এবং নিজে সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সুষমা তাঁহার বৃথা কষ্ট হইবে বলিয়া লইতে চাহিল না।

কোনরূপে দীর্ঘ রাত্রি ও দিনটা কাটাইয়া পরদিন রাত্রে পাঞ্জাবমেলে সুষমা এলাহাবাদ যাত্রা করিল। তাহার মনের মধ্যে তখন প্রলয়ের

ক্রীড়া চলিতেছিল। আশা, আশঙ্কা, হর্ষ বিষাদ;—বিভিন্ন ভাবের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কেন সে এলাহাবাদ যাইতেছে, কাহার জন্য, সে তাহার কে, সুষমা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। অথচ তাহার প্রাণের এ ভীম বেগকে রুদ্ধ করিবার শক্তি বা ইচ্ছা তাহার নাই। সে চলিয়াছে। যে জন্যই হউক, ভালই হউক বা মন্দই হউক, না যাইয়া সে থাকিতে পারে না, তাই সে চলিয়াছে। ট্রেণটা চলিতে পারিতেছে না! যাহারা পাঞ্জাব মেলকে দ্রুতগামী বলে তাহারা মিথ্যাবাদী। সুষমা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া সারাপথ প্রত্যেক ষ্টেসনের নাম পড়িতে লাগিল,—এলাহাবাদ কতদূর। বর্দ্ধমান হইতে আরম্ভ করিয়া কোন ষ্টেশনই তাহার চক্ষুর ব্যাকুল দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। এই মোটে মোকামাঘাট। এখনও বহুদূর। টাইম টেবল খুলিয়া সুষমা গণিয়া দেখিল,—এলাহাবাদ পৌঁছাইতে এখনও ৫ ঘণ্টা। সময় কাটাইবার জন্য সে একখানা সংবাদ পত্র কিনিয়াছিল। পড়িতে পড়িতে এক জায়গায় দেখিল, বড় বড় অক্ষরে লেখা—"সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন, উপন্যাস লেখক মধ্যে ধ্রুবতারা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অন্তিম শয্যায়! ডাক্তারেরা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছেন।" সুষমা সবলে বেঞ্চটাকে চাপিয়া ধরিয়া আপনাকে পতনের হাত হইতে বাঁচাইল।

এলাহাবাদে নামিয়া সে দেখে তাহার বন্ধু নিরুপমা তাহার ভার পাইয়া ষ্টেসনে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জিনিসপত্র দাসীর কাছে রাখিয়া সুষমা দ্রুতগতিতে নিরুপমার কাছে যাইয়া তাহার হাতখানি সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ভাই রমেশবাবু কেমন আছে?' বিস্মিতা নিরুপমা উত্তর করিল, ভাল নাই। দাদা সেখানে গিয়েছিলেন এইমাত্র ফিরে আসচেন।' সুষমা কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি গিয়াছিলে? সত্যই কি তিনি বাঁচবেন না?' নিরুপমা তাহার ব্যাকুলতায় ও কাতরস্বরে অধিকতর বিস্মিত হইল। সুষমা ত' কখনও চপল নহে। আর রমেশবাবুর সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু আছে। সে উত্তর করিল, 'যাই নাই। বৈকালে যাব যাব মনে কচ্ছি।" সুষমা—'এখনি চল' বলিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। বেয়ারাকে সুষমার দাসীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে বলিয়া নিরুপমা সুষমাকে লইয়া রমেশবাবুর বাসার দিকে গাড়ী হাঁকাইল, নিরুপমা সুশীলাকে কি একটা কথা বলিতে

যাইতেছিল। কিন্তু তাহার চেহারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সুষমা মরার মত ফ্যাকাশে ও কঠিন হইয়া অবশভাবে বসিয়া আছে। জীবনের কোন লক্ষণ নাই। নিরুপমা তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিল। সুষমা সেইরূপভাবেই নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল। নিরুপমা ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। কিছুপরে সুষমা উঠিয়া বসিলে নিরুপমা ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'রমেশবাবু তোমার কি—' সুষমা তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি জানি না, আমি জানি না!" তাহার এরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহারে নিরুপমা মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইল। কোন কথা না বলিয়া বিহ্বল ভাবে বসিয়া রহিল। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সুষমা লজ্জিত হইয়া সমস্ত রাস্তা পুনঃপুনঃ নিরুপমার নিকট ক্ষমা চাহিতে চাহিতে চলিল।

গাড়ী একটা বাড়ীতে আসিয়া দাঁড়াইল। নিরুপমা কম্পিতা সুষমাকে কোনরূপে নামাইয়া লইল। কিন্তু সুষমা চলিতে পারিল না; সেইখানেই বসিয়া পড়িল। নিরুপমা বাড়ী ফিরিতে চাহিলে সুষমা বহুকষ্টে নিরুপমাকে ধরিয়া কোনরূপে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। তখন তাহার প্রাণে যে কি হইতেছিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। যেন একটা গুরুভার বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে। কে যেন মুগুর মারিয়া পা দুইটাকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। চোখ দুইটী ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। মাথায় আগুন জ্বলিতেছিল। বহুকষ্টে সুষমা চলিতে লাগিল। নিরুপমা কোনকথা না বলিয়া অবাক হইয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। যখন তাহারা রকের উপর, গৃহমধ্য হইতে একটা আর্ত্তনাদ তাহাদের কাণে আসিয়া বাজিল। সুষমার মনে হইল যেন কোটী কোটী বজ্র এক সঙ্গে তাহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যাশায়ী রোগীটাকে দেখিবামাত্রই আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো, আমায় ক্ষমা কর—আমায় ক্ষমা কর।" তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ মৃতের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। রোগীর আত্মীয়েরা চাহিয়া দেখিল ধনীর কন্যা সুষমা দরিদ্র রমেশের পদতলে লুটাইতেছে।"

সাথী

(পূর্ব্ব প্রকাশের পর)

লেখক—শ্রীপরেশনাথ সরকার

(১০)

আভা সেই যে ঘরে দুয়ার দিল, আর খুলিল না। বিধুমুখী এক এক বার দুয়ারের কাছে গিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, একবার নিচে নামিয়া গেলেন. ফটকের দ্বারে ত নগেন বসিয়া নাই। তিনি ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন—দেখে আয়ত নগেন কোথায় বসে আছে!

শ্যামাসুন্দরী বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, বিধুমুখী সেইখানে আসিয়া বলিলেন—নগেনকে ডেকে আনলেও ত হত!

শ্যামাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন- সে যার কাজ সে করবে; আমাদের অত শত কেন?

বিধুমুখী কথাটায় আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। তিনি আবার নিচে নামিতে ছিলেন। চন্দ্রা তখন একরাশি হাসি মুখে লইয়া আসিয়া বলিলেন—আঃ আজ যেন বাড়ীটা ঠাণ্ডা হইয়াছে!

বিধুমুখীর সে কথা কানে পৌছিল কিনা চন্দ্রা তাহা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আবার বলিলেন—মেয়েটাকে জ্বালাতন করে মেরেছে। সাধে কি আর এমন মেয়ে এত চটে গেছে।

শ্যামাসুন্দরীর বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল; বিধুমুখী আর সেখানে দাড়াইলেন না; নিচে নামিয়া যাইতে লাগিলেন!

ঝি উপর উঠিতে ছিল, বিধুমুখী বলিলেন—কিরে, নগেন কোথায়?

ঝি বলিল—তাকে ত দেখছি না মা!

শ্যামাসুন্দরী কথাটা শুনিলেন—তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

বিধুমুখী বলিলেন—যা যা দেখ, কোথায় বসে আছে, তাকে নিয়ে আসবি.এখানে!

চন্দ্রা বলিলেন—তাকে যে আনতে বলছ বউ; মেয়ে কিন্তু একশবার মানা করেছে!

বিধুমুখী বলিয়া দিলেন—যা—আমি বলছি নিয়ে আয় !

চন্দ্রা—এর পরে আবার মুস্কিল আছে !

বিধুমুখী সে কথার জবাব দিলেন না !

ঝি আসিয়া বলিল নগেনকে কোথাও পাওয়া গেল না !

বিধুমুখী সত্যচরণের ঘুম ভাঙ্গাইয়া ব্যাপার সব খুলিয়া বলিলেন।

সত্যচরণ বলিলেন—কথাত ভাল নয়—কলিকাতার রাস্তা, পথ হারাইলে ত আর খুজিয়া পাইবে না। বিশেষতঃ বাসার নম্বর কিছুই বলতে পারবে না !

তিনি তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া আসিয়া সহিসকে গাড়ী জুড়িতে বলিলেন।

বিধুমুখী আভার ঘরের কাছে আসিয়া দেখিলেন, শ্যামাসুন্দরী দরজার কাছে দাড়াইয়া আছেন।

বিধুমুখী বলিলেন—এখনো ডাকনি দিদি ?

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—বুঝি না দিদি, আভা আজ এত বড় অভিমান কার উপর করল !

বিধুমুখী বলিলেন—তুমি তাই ভাবচ, আমার বুক কেঁপে উঠচে, নগেনকে যে পাওয়া যাচ্ছে না !

তিনি দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিলেন—আভা ! আভা !

আভা কোন উত্তর করিল না। তিনি আবার ডাকিলেন, কোন সাড়া শব্দ আসিল না, তিনি আবার ডাকিয়া বলিলেন—একি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি ?

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—বোধ হয় ঘুমায় নি !

বিধুমুখী—এত ডাকেও সাড়া দেয় না !

শ্যামসুন্দরী বলিলেন—বোধ হয় অভিমান এখনো পড়ে নাই।

সত্যচরণ উপরে আসিয়া বলিলেন—তাইত কোথায় পথ ভুলে চলে গেছে ! আমি যাই দেখে আসি ! ওবাড়ীর কিরণকে আর চাকর বাকর যাকে হয় একটু এদিক ওদিক তালাস করতে বলে এস ! এই সময় ধীরে কক্ষ-কবাট মুক্ত হইল ! আভা স্থির ভাবে দাড়াইয়া !

বিধুমুখী বলিলেন—কি করলি বলত, নগেনকে ত পাওয়া যায় না ! নূতন কলিকাতা এসেছে, পথঘাট চেনে না কিছুই, কোথায় গেছে কে জানে !

আভা স্থির ভাবে দাড়াইয়া রহিল। তারপর বলিল—বেশ তার যেথানে খুসী চলে গেছে, তাতে আমাদের কি !

সবাই বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সত্যচরণ বলিলেন—তুমি যে দাড়িয়ে রইলে যাও ও বাড়ীর ওদের বলে এস; কিরণ হয়ত ঘুমচ্ছে এখন। যত দেরী হবে, ততই খারাপ। কোথা হতে কোথায় যাবে, ঠিক কি ?

আভা শুধু বলিল—বেশী-ঝাড়ী বাড়ী করোনা মা, তাকে আর ডেকে এন না। তা হলে তার বোঝাপড়া কত্তে হবে !

বিধুমুখী কি বলিতে যাইতে ছিলেন শ্যামাসুন্দরী তাহার মুখে হাত দিয়া বলিলেন—মেয়ের দিকে চাইয়ে তোকে দুকথা শুনায়ে দিতে ইচ্ছে হয় ? দেখত ওর কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে !

সত্যচরণ বলিলেন—হারে আভা; তুই ও যাবি নাকি, গাড়ি ত যাবে !

আভা বলিল—কেন, আমি যাব কেন ?

সত্যচরণ—তোর নগেন দাদাকে তালাস করে নিয়ে আসবি !

আভা বলিল—না বাবা, তুমি তাকে আর এখানে নিয়ে এস না !

বিধুমুখী বলিয়া ফেলিলেন—সে আর আসবে না !

সত্যচরণ নীচে নামিয়া যাইতে ছিলেন; এমন সময় চন্দ্রা আসিয়া বলিলেন—ঠাকুর পো, গাড়ী খানা নিয়ে একবার আলিপুরের বাগান দেখে আসি ! কিরণ সাথে যাবে বলেছে।

সত্যচরণ বলিলেন—মেজ বউদি, শোননি নগেনকে পাওয়া যাচ্ছে না !

চন্দ্রা বলিলেন—তা আর কি হয়েছে, অমন কতদিন দেখেছি, দেশে ২।৩ দিন পরে কোথা থেকে এসে উপস্থিত হত, শেষে শুনতাম, অমুক গ্রামে রাত জেগে রোগী পাহারা দিচ্ছিল; বা অমুখ গ্রামে মড়া পোড়াচ্ছিল। এক সময় এসে উপস্থিত হবেই ! যাবে কোথায়, এমন আলগা ভাত আর কোথায় ?

শ্যামাসুন্দরীর নয়ন যুগল ছলছল করিয়া উঠিল, বিধুমুখী তাহার হাত ধরিয়া নিচে নামিয়া গেলেন। সত্যচরণ কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। আভা যেমন ভাবে দাড়াইয়া ছিল, ঠিক সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন একখানি জড় প্রতিমা !

চন্দ্রা বলিলেন—বেশ করেছিস মা, তিল তিল করে খেয়ে রাজার গোলা ফুরায় ! সময় থাকতে বুঝতে হয় !

আভা কোন কথা বলিল না ! চন্দ্রা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে মুখে হর্ষ বা বিরক্তির কোন চিহ্নই ফুটিয়া উঠে নাই !

চন্দ্রা আভার প্রাণের সহানুভূতি পাইতে ইচ্ছুক; তিনি বলিলেন—যাবি না, আলিপুরের বাগানে!

আভা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—জেঠাইমা, গাড়ী ডাকাও আজ গঙ্গার ধারে বেড়াব!

চন্দ্রা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বেশ? কিরণকে তবে গাড়ী ডাকতে বলিগে?

আভা বলিল—হঁা!

চন্দ্রা নিচে নামিয়া গেলেন!

কিছুক্ষণ পরে শ্যামাসুন্দরী ও বিধুমুখী দেখিলেন আভা জেঠাইমার সঙ্গে নিচে নামিয়া আসিতেছে।

চন্দ্রা আসিয়া বলিলেন যাই বউ, একটু গঙ্গারধারে বেড়িয় আসি!

বিধুমুখীর মুখে একটা বিষময় ও বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল!

চন্দ্রা ও আভা গাড়ীতে গিয়া উঠিল, কিরণ গাড়ীতেই ছিল।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—দেখলে বোন, আভার প্রাণ কি স্থির থাকতে পারে!

বিধুমুখী বলিলেন—তাই গঙ্গায় হাওয়া খেয়ে অস্থির প্রাণ জুড়াতে চলল!

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—না বোন ও সব বাজেকথা, নগেনের জন্যেই আভার এই গঙ্গার ধার বেড়ান।

(১১)

সত্যচরণ নিকটবর্ত্তী সব গলিতে, সদর রাস্তায় কোথাও নগেনের সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে তিনি থানায় সংবাদ দিয়া আসিলেন। সংবাদ পত্রেও বিজ্ঞাপন ছাপাইতে বলিয়া আসিলেন!

বিধুমুখী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন—তবে কি হবে?

শ্যামাসুন্দরীর চক্ষে একবিন্দু জল ছিলনা; তিনি বলিলেম—আভা কিছুতেই তাকে বাড়ী না নিয়ে ফিরবে না। তুমি ভেবনা বোন!

নগেনকে পাওয়া যাইবে না, নগেন যে আসিবে না, একথা কি শ্যামাসুন্দরী ভাবিতে পারেন? মা তিনি, তাঁহার সন্তান, যাকে তিনি জন্মের সাথে সাথে বুকের মাঝে করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সন্তান নিরুদ্দেশ—না না এ একটা কথাই নয়। হয়ত কোথাও বসে আছে, হয়ত বা আভা তাহাকে দেখিতে

পাইয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। আভার সঙ্গেই আবার ফিরিয়া আসিবে! তাহার সমস্ত হৃদয়ের স্নেহরাশি তাহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে দিতে চায় না, নগেন আজ ফিরিয়া আসিবে না।

আভা চুপ করিয়া গাড়ীতে বসিয়া রহিল। চন্দ্রা ও কিরণ কত কথা বলিতে লাগিলেন, তাহার সে দিকে কোনও লক্ষ্য ছিলনা। কিরণ চন্দ্রাকে এটা দোকান, ওটা পোষ্ট অফিস, সেটা গুদাম, এইরূপ সব বলিতে লাগিল।

শোভাবাজার হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত দু বার ঘুরিয়া আসিয়া গাড়োয়ান বলিল এখন কোথায় যাব!

চন্দ্রা আভার মুখের দিকে চাহিল। আভা কোন কথা বলিল না।

কিরণ বলিল—গড়ের মাঠে যাওয়া যাক্!

আভা বাধাদিয়া বলিল—না না এই গঙ্গার ধার দিয়াই বেড়ান যাক! কেহই আপত্তি করিল না, কিরণ গাড়োয়ানকে বলিয়া দিল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই গঙ্গার ধার দিয়াই গাড়ী হাঁকাও!

গঙ্গার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আভা বলিল—জ্যেঠাইমা, এই গঙ্গাধার থেকে যদি লোক গড়াইয়া পড়ে যায় তবে কি হয়?

চন্দ্রা এতবড় নদীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওমা, তবে কি তার আর রক্ষা আছে, কোন দেশে ভাসিয়ে নে যায় কে জানে; বলিয়াই তিনি কিরণকে বলিলেন—গাড়োয়ানকে বলেদে ত বাবা, গাড়ীটা যেন এত ধার দিয়ে না চালায়।

কিরণ বলিল—ভয় কি মাসিমা, গাড়ী পড়ে যাবে না!

চন্দ্রা বলিলেন—দৈবের কথা কে বলতে পারে, তুই বলেদে!

আভা আবার জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা এত গুলি লোক যে এখানে সেখানে রয়েছে এরা কি ধরেও তোলে না!

চন্দ্রা বলিল—ইস্ তাকি হয়, যেমন পড়া ওমনি স্রোতের টানে মাঝ গাঙ্গে গিয়ে ডোবা। তুলতে পাল্লে ত!

আভা চুপ করিল। সেই গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন সন্ধ্যা হইল তখন চন্দ্রা বলিলেন, এখন বাড়ী যাওয়া যাক!

এতক্ষণ তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতে ছিল! শ্যামাসুন্দরী এতক্ষণ কেমন করিতেছেন কি ভাবে আছেন এইটা তাহার দেখিবার ইচ্ছা।

আভা বলিল—জ্যেঠাইমা জান কটা পর্য্যন্ত এইভাবে এখানে লোক যাওয়া আসা করে ?

কিরণ বুঝিল, আভা কি তাল্লাস করিতেছে। সে বলিল—প্রায় সমস্ত রাত্রি।

"আর একটু বেড়াইলে হয় না, জ্যেঠাই মা ?"

কিরণ হাসিয়া বলিল—সে আর এখানে আসবে না !

আভা একবার কিরণের দিকে চাহিয়া চুপ করিল।

চন্দ্রা বলিলেন—সন্ধ্যাকালে আমার ত গোঁসাইএর নাম নিতে হবে, এখন ফিরে চল।

আভা বলিয়া বসিল—এই গঙ্গার ঘাটে তুমি সন্ধ্যা কর না, জ্যেঠাইমা, আমরা ততক্ষণ এই ঘাটে দাঁড়াই !

চন্দ্রা বাধা দিয়া বলিলেন—না, না, আর না, চল বাসায়ই যাই !

গাড়ী বাসার সম্মুখে দাঁড়াইতেই, বিধুমুখী উপর থেকে নামিয়া আসিলেন। তিনি দেখিলেন, চন্দ্রা আর আভা বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

তবে কি আভা নগেনকে পায় নাই !

তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না ; সাহস হইল না, যদি আভা বলে তাকে পাইলাম না।

শ্যামাসুন্দরীর কাছে গিয়া বিধুমুখী বলিলেন—আভা ত ফিরিয়া এসেছে দিদি, নগেন ত আসে নাই !

শ্যামাসুন্দরী মাত্র একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন ! বিধুমুখী আবার আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কন্যার মুখ দেখিয়া ত তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না ! তাতে না আছে বিষাদ, না আছে হর্ষ !

সত্যচরণ সেই যে আসিয়া বারান্দায় একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াছিলেন, আর একবারও উঠেন নাই। বিধুমুখী আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইলেন। সত্যচরণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন—যেন উদাস, ব্যথিত সে দৃষ্টি !

বিধুমুখী স্বামীর দিকে জলভরা নয়নে চাহিয়া বলিলেন—আভা এসেছে।

সত্যচরণ বলিলেন—পায় নায় বুঝি ? কলিকাতা সহর, পাওয়া কি সহজ। দেখি কি সংবাদ আসে, দুই এক দিনের মধ্যেই পাব বোধ হয় !

ঘরে প্রবেশ করিয়া আভা দেখিল, সব চুপচাপ, কারও মুখে একটি কথা নাই। জানালাপথে দেখিল শ্যামাসুন্দরী নিশ্চিন্ত মনে সন্ধ্যায় বসিয়াছেন! বামুন দিদি, ঝি রসুই ঘরে মুখামুখী বসিয়া আছে, বারান্দায় পিতামাতা বিমর্ষভাবে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন!

সে নিজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিল, টেবিলের উপর দীপ জ্বলিতেছে, যে সব দ্রব্য বিশৃঙ্খল ভাবে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা বেশ সুসজ্জিত! শয্যার উপরে ময়লা চাদরটার পরিবর্ত্তে একটা ধবধবে চাদর বিছান! অনেকক্ষণ সে টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর শ্যামা-সুন্দরীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—তিনি স্বায়ং সন্ধ্যা করিতেছিলেন, কোন কথা বলিলেন না। তখন সে রসুই ঘরের কাছ দিয়া ২।৩ বার ঘুরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ তাহাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। ধীরে ধীরে আসিয়া সে আবার নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া আলনার কাছে অগ্রসর হইল। সব কটা জামাইত ঠিক রহিয়াছে। নগেনকে দিনে তিনবার জামা পরিবর্ত্তন করিতে হইত। এখন ত নগেন ঠিক মতই তাহা করিয়া থাকে।

বিধুমুখী ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন—মায়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া আভা আবার টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিধুমুখী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আভা ধীরে ধীরে শয্যার উপর গিয়া বসিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আর একবার উঠিয়া আসিয়া দেখিল নগেনের সেই মলিন ছিন্ন সার্টটা তেমনি ভাবে পড়িয়া আছে! তার পর যাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া রহিল।

চন্দ্রা এ ঘর সে ঘর ঘুরিয়া যখন দেখিলেন সব চুপ চাপ, তখন বুঝিলেন আপদটা আর আসে নাই। তিনি হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। রসুই ঘরে আসিয়া তিনি বামুন ঠাকুরাণীকে বলিলেন—কি গা রান্নাবাড়া হবে না আজ?

ঝি বলিয়াছিল—মা বারণ করেছেন।

তিনি আসিয়া বিধুমুখীকে বলিলেন—সে কি গো ছোট বউ, আজ নাকি উনুনে হাঁড়ি চড়বে না; ঠাকুরপো খাবেন কি?

বিধুমুখী বলিলেন—আজ আর তিনি খাবেন না।

চন্দ্রা বলিলেন—মেয়েটাত দুটা মুখে দেবে। লেখা পড়ায় যে কষ্ট, একটা রাত সে উপাস দিতে যাবে কেন?

বিধুমুখী বলিলেন—তার ইচ্ছে হয় সে খাবার কিনে এনে খাক্!

চন্দ্রা বলিয়া গেলেন—রকম দেখে আর বাঁচিনা বাপু, কি হয়েছে, তোদের সবতাতেই বাড়াবাড়ী।

বিধুমুখী অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রা আভার কাছে আসিয়া দেখিলেন, সে বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে, তিনি তাহার গায়ে হাত দিলেন, আভা চমকিয়া চক্ষু চাহিল।

তিনি বলিলেন—এরি মধ্যে ঘুমিয়েছিস্? আজ নাকি বাছা পাক হবে না!

আভা বলিল—জ্যেঠাই মা, বড় ঘুমটা ভেঙ্গে দিলে। যাও, আজ কিছু খাবনা। খিধে নেই।

মুখ বিকৃতি করিয়া চন্দ্রা সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

শ্যামাসুন্দরী ধীরে ধীরে একবার দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, আভার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে! যেন আভা নগেনকে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইতেছে। তিনি ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। অনেকক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আকাশ ভরা নক্ষত্র গুলি ঠিক যে যার স্থানে জ্বলিতেছে—কেউ ত পথ হারায় নাই! তাঁহার নগেনও আজ পথ হারাইয়া এখানে সেখানে কাঁদিয়া ফিরিতেছে—না! এত গাড়ী ঘোড়া, পথে চলিতে চলিতে হয়তঃ—না—না—তা কখনো হয় নাই, আভা নিশ্চয় তাকে পাইয়াছে, কোথায় রাখিয়া সবাইকে কাঁদাইতেছে। তিনি আর একবার দরজার কাছে আসিলেন। আভা তেমনি শয্যায় পড়িয়াছিল! এক পা দুই পা করিয়া তিনি শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এ কি আভার মুখে কে এমন কালী ঢালিয়া দিয়াছে! তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি—তবে কি—তিনি আর উঠিতে পারিলেন না। দুইখানি কম্পিত হস্তে আভার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—মা—ঘুমাচ্ছিস?

আভা তাহার কোমল বাহুযুগলদ্বারা জ্যেঠাইমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল—যাও এখন নগেনদাকে নিয়ে এস, জ্যেঠাই মা, আর আমি কাউকে

বারণ করব না ! সে ত আজ জল খায় নি ! শ্যামাসুন্দরী আর কথা কহিতে পারিলেন না, আভার বুকের উপর মাথা রাখিলেন।

১২

একমাস অতীত হইয়া গেছে, নগেনের কোনও সংবাদ নাই। সত্যচরণ এই এক মাসেই যেন বসিয়া গিয়াছেন; সন্ধ্যাপূজার মাত্রা অসম্ভব রূপ বাড়িয়া গিয়াছে। সব সময় চিন্তিত। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে দু এক সময় হয়ত এক একটা অসংলগ্ন উত্তর দিয়া বসেন।

বিধুমুখী কোন কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলেন। শ্যামাসুন্দরী যখন তখন আসিয়া আভাকে কোলে লইয়া বসিয়া থাকেন—আর আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সময় সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক আধটি নিশ্বাস ফেলেন।

আভা দিন রাত বই নিয়া পড়িয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রভাতের সঙ্গে একটা বড় আশা আসিয়া মনে উদিত হয়, সন্ধ্যার অন্ধকার তাহা ঢাকিয়া ফেলে—কিন্তু কোথায় নগেন ?

চন্দ্রা মাঝে মাঝে বিলাপরাগিনী আরম্ভ করিয়া দেয়। এখন তাহার দুঃখ যেন রাখিবার আর স্থান নাই।

একদিন সন্ধ্যায় সত্যচরণ বৈঠকখানায় চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, ঝি তামাক সাজিতেছে, এমন সময় এক বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—সত্যচরণ !

কণ্ঠ পরিচিত, অথচ মুখ দেখিয়া তিনি তাহাকে চিনিতে না পারিয়া,চাহিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন—আমায় চিন্‌তে পার নি ? আমি হরবল্লভ !

সত্যচরণ উঠিয়া বসিলেন, নমস্কার করিয়া বলিলেন—আসুন বসুন দাদা, আপনার মুখে এত কি দাগ, বসন্ত হয়েছিল নাকি ?

হরবল্লভ—যমের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছি, ভাই এবার, আর আশা ছিল না যে বাঁচব !

সত্যচরণ ভাবিলেন—আপনার মত লোক না বাঁচিলে যে সংসারে একটু সুখের মুখ লোকে দেখতে পাবে, এতবড় একটা অন্যায় ভগবান্ কি করিয়া সহ্য করিবেন !

হরবল্লভের মত মতলব বাজ লোক দুটি ছিল কিনা কেহ জানিত না। জাল জুয়াচুরী সবটার ভিতর হরবল্লব জড়ান ছিলেন—ভা কম আর বেশী।

ফল কথা তাকে ছাড়া গ্রামে হুকা বন্ধ করিবার পরামর্শ, অন্যের জমিখানি নিজের জমির সামিল করিয়া লওয়া, অমুকের ঘাড়ে এক নম্বর ফৌজদারি মামলা চাপাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত কিছুই চলিত না।

হরবল্লভ সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের কথা যেন বাহির করিয়া নিলেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—লোকে জীবন ভরিয়া ভুল করে, কিন্তু এমন দিন আসে যখন তার চোখ খুলে যায়।

সত্যচরণ বলিলেন—সে কথা বিশ্বাস করেন দাদা ?

হরবল্লভ—এখন করি।

সত্যচরণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আপনি যে দাঁড়ায়েই রইলেন, বসুন না।

হরবল্লভ বলিলেন—না না আমি বসব না। আমার কাজ আছে। তুমি গিন্নিকে ডাক।

হরবল্লভ শ্যামাসুন্দরীকে গিন্নি বলিতেন।

সত্যচরণ বলিলেন—কেন ?

হরবল্লভ তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন—জীবনের একটা ভুলের সংশোধন করি।

সত্যচরণ আশ্চর্য্য হইয়া হরবল্লভের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার বসন্ত-চিহ্ন-অঙ্কিত মুখখানি বেদনা কাতর দেখাইতে ছিল, তিনি ভাবিলেন, এ একটা নূতন ধরণের অভিনয় নয় ত! সংসার নাট্য জগতে এতগুলি বিভিন্ন ভাবের ভূমিকা লইয়া যে ব্যক্তি এত সুচারুরূপে অভিনয় করিয়া আসিতেছে, এ যে তাহা আর একটা অভিনয়ের প্রস্তাবনা নয়, তা কে বলিতে পারে ? এই করুণ বচন শেষে বিষাদের হাস্যরাগে রঞ্জিত হইয়া হয়ত নূতন বিভিষিকার সৃষ্টি করিয়া বসিবে। যাহা হউক, তিনি শ্যামা-সুন্দরীকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

শ্যামাসুন্দরী তখন রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। নগেনের সেই পুরাতন শত ছিন্ন বসনখানি তিনি ড্রেন হইতে চুপে চুপে তুলিয়া লইয়া আসিয়া ছিলেন। সেই মলিন বস্ত্রখানি বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, তিনি কি যেন ভাবিতে ভাবিতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল—কর্ত্তা তোমায় ডাকচেন, মা। বুকটা দুর দুর করিয়া উঠিল, তিনি নিচে নামিয়া গেলেন।

শ্যামাসুন্দরী ঘরে প্রবেশ করিতেই, হরবল্লভ তাঁহাকে বলিলেন—অপরাধী আজ তোমার কাছে এসেছে গিন্নি, তাকে ক্ষমা করতে হবে।

শ্যামাসুন্দরী চখের জল মুছিয়া বলিলেন—আমার ত আর কিছু নাই, আবার কেন আমার সঙ্গে লাগতে এসেছেন। একমাত্র যা আমার সম্বল ছিল, তাও নিরুদ্দেশ।

হরবল্লভ শ্যামাসুন্দরীর হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—আর আমায় লজ্জা দিওনা গিন্নি, আমি বুঝেছি, ধর্ম্ম যাহাদের সহায়, তারা ছাড়া সংসারে বড় কেউ হতে পারে না। গায়ের জোরে লোকে বড় হইতে চায় বটে, অনেক সময় হয়ও বটে, কিন্তু তাতে এক বিন্দু সুখ পাওয়া যায় না। যদি তাই হত, তবে আমার চেয়ে বেশী সুখী কেউ হত না। কিন্তু আমি বড় দুঃখী দয়া না করলে আর বাঁচব না।

শ্যামাসুন্দরীর হাত ধরিয়া বৃদ্ধ বালকের মত কাঁদিতে ছিলেন। তিনি বলিলেন—সেকি আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

হরবল্লভ তখন চাদরের মধ্য হইতে একখানি দলিল বাহির করিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাতে দিয়া বলিলেন গিন্নি এই তোমার বাড়ী তোমায় ফিরাইয়া দিলাম। আমিই বেনামিতে বাড়ী কিনিয়া নিয়াছিলাম। বল আমার উপর তোমার আর বিদ্বেষ নাই।

হরবল্লভ আবার তাঁহার হাত ধরিতে যাইতেছিলেন, সত্যচরণ উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিলেন এবং শ্যামাসুন্দরীকে বলিলেন—দেখি বউদি দলিল খানা!

শ্যামাসুন্দরী দলিলখানি সত্যচরণের হাতে দিলেন, তিনি দেখিয়া বলিলেন—হাঁ তাই ত।

তারপর দলিলখানি শ্যামাসুন্দরীর হাতে দিয়া বলিলেন—আমায় বড় আশ্চর্য্য করেছেন দাদা।

হরবল্লভ বলিলেন—অবিশ্বাস হ'য়ে ছিল, আমি দলিল ঠিক দিয়াছি কিনা, তাই তুমি দেখে নিলে। এই ফল—এত বছর যা করে এসেছি, তাতে আমি এই পেয়েছি যে, কাউকে এক ফোটা জল দিলেও সে ভাবে আমি তার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি, কারো সঙ্গে হেসে কথা কইলে, যে ভাবে হাসির আড়ালে ভয়ানক ষড়যন্ত্র আছে। কাকে ডেকে পাঠালে, সে মনে ভাবে হয়ত একা পেয়ে বুকে ছুরি মারবে। আর পেয়েছি—ভীষণ জ্বালা, বুক ভেঙ্গে

গেছে। আশ্চর্য্য হচ্ছ—আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নেই, এ হতেই হবে, এটা ভগবানের নিয়ম।

সত্যচরণ বলিলেন—তবে ভগবান বিশ্বাস করেন?

হরবল্লভ—এখন করি।

সত্যচরণ—কতদিন হতে?

হরবল্লভ বাধা দিয়া বলিলেন—আর আমায় জ্বালা দিও না। এখন আর পিছুপানে চাহিতে সাহস হয় না। কিন্তু মনে হয় সম্মুখে বড় উজ্জ্বল আলোক জ্বলচে। এখন বল আমি কবে সেইখানে যেয়ে পৌঁছিতে পারব?

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—পারবেন। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা কচ্ছি, আপনি সুখী হবেন। আপনি আমার বড় অসহায় অবস্থায় পথে দাঁড় করিয়েছিলেন, আজ যখন বিশ্বের কাছে একে একে সব বন্ধন শিথিল হয়ে আসচে, সেই সময় আবার আমায় এঁকে ফিরিয়ে দিলেন। দিলেন কিন্তু অসময়ে! পুত্র আমার নিরুদ্দেশ—এই মাত্র তার চিহ্ন আমার বুকের কাছে লুকায়ে রেখেছি।

বলিতে বলিতে শ্যামাসুন্দরী সেই ছিন্ন মলিন বসনখানি বুকের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিলেন। সত্যচরণ সরিয়া যাইয়া শয্যার উপরে বসিয়া পড়িলেন। হরবল্লভ কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—আমায় ক্ষমা কর গিন্নি। এত বড় পাপী, তাকে যখন তুমি এমন ভাবে ক্ষমা করতে পেরেছ, তখন তুমি ত দেবী। অমঙ্গল তোমার ছায়া স্পর্শ করতে পারে না।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—সে জেদ আমার ছিল, কিন্তু আর বুঝি থাকে না। আজ এক মাসের উপর নগেন আমার নিরুদ্দেশ, এতেও কি বিশ্বাস থাকতে পারে?

হরবল্লভ বলিলেন—নগেন তোমার কাল বাড়ী গেছে।

শ্যামাসুন্দরী পড়িয়া যাইতেছিলেন, কষ্টে নিজকে সামলাইয়া লইলেন!

সত্যচরণ উঠিয়া আসিয়া হরবল্লভকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—সত্যি দাদা, আপনি জানেন সে বাড়ী গেছে?

হরবল্লভ বলিলেন—নিতাইর সাথে সে দেশে চলে গেছে! দেশে একটা অন্নছত্র দেব, আর একটা স্কুল করব; এখন দেশে খুব

মড়ক লেগেছে। তাই নিতাইর সাথে নগেনকে পাঠিয়ে দিয়েছি। জান ত গিন্নি, নগেন ছাড়া নিতাই এক পাও নড়িতে চায় না।

সত্যচরণ বলিলেন—সে কি দেশে মড়ক লেগেছে, এমন সময় তাদের আপনি সেখানে পাঠিয়ে দিলেন?

হরবল্লভ—আগে হয় ত দিতাম না। কিন্তু এখন আর তেমন মন নেই। যে লোকের হাসির চেয়ে অশ্রু দেখিতে সুখী হইত, সে এখন পরের দুঃখে কাঁদিতে শিখেছে।

সত্যচরণ বলিলেন—কিন্তু তাই বলিয়া এই মহামারীর ভিতর নগেনকে পাঠিয়ে দিলেন! যে নিজের যত্ন করতে জানে না, তাকে এমন ভীষণ স্থানে—

হরবল্লভ বাধা দিয়া বলিলেন—জ্ঞানী হয়ে এমন কথা বললে সত্যচরণ? সে নিজের যত্ন নিতে জানে না, তাই তাকে পাঠিয়েছি পরের যত্ন নিতে। নিজের প্রতি যে উদাসীন তার দ্বারাই বুঝি পরের যত্ন ভাল হয়। তুমি দেখনি রোগীর পরিচর্য্যার সময় তার মুখে কি দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। মার ছেলে সে, তার ভয় কি? এই সাহসে তাকে সেখানে নিশ্চিন্ত মনে পাঠিয়েছি।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—একবার আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না?

হরবল্লভ বলিলেন—বলেছিলেম, তা সে রাজী হয় নি। আমাকে বলে গেছে, তোমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে। আমি কাল বাড়ী যাব, তোমারও যেতে হবে।

শ্যামাসুন্দরী সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিলেন, সত্যচরণ একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বউদি, নগেন আমার বুঝল না যে, আমি তার বাবার ভাই!

শ্যামসুন্দরী বলিলেন—না, না, ঠাকুর পো এ অভিমান তার তোমার উপর নয়। এ অভিমান—

আর বলিতে না পারিয়া শ্যামাসুন্দরী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সত্যচরণ বলিলেন—যা হক বউদি যাও যাও শুভ সংবাদটা সবাইকে দাও গিয়ে। আমিও যাই সব বন্ধু বান্ধবদের বলে আসি আমাদের নগেনকে পাওয়া গেছে।

[ক্রমশঃ

একাল সেকাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৩)

বিমলা কমর বাধিয়া লাগিয়া গেল, যেভাবে যেমন করিয়া হউক, তাহার শরীর ঠিক যেমনটি ছিল, তেমনটিই রাখিতে হইবে, মুখ কাল করিলে চলিবে না, জোর করিয়া হাসিয়া শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে তুষ্ট করিবে। সকালে উঠিয়া শ্বশুরের নিকটে আসিয়া সে বলিয়া বসিল—"আচ্ছা বাবা, মাকে সাবিত্রীর ব্রত লওয়ানো যায়ত কেমন হয়?"

সদানন্দ সম্মতি জানাইয়া বলিলেন—"আমার কোন আপত্তি নেই মা, কিন্তু সে যে স্বীকার করবে, এমন আশা ত করি না, একত নির্ম্মল নির্ম্মল বলে ক্ষেপে আছে, তাতে আবার তাকেই বাদ দিয়ে ব্রত নিয়ম, এতটা সহ্য করে উঠ্‌তে পারবে কি?"

"আমি তার মত করিয়ে নোব"—বলিয়া বিমলা জোর করিয়া উজ্জ্বল দৃষ্টিতে শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল, সদানন্দ ধীর শান্ত স্বরে উত্তর করিলেন,—"পার আপত্তি নেই।"

শ্বশ্রূর নিকট কথাটা পাড়িতে কিন্তু বিমলার কেমন শঙ্কা হইতেছিল, এক পা অগ্রসর হইয়া আবার সে পিছাইয়া পড়িল, রমাকে ধরিয়া বলিল—"চল বৌদি, মাকে বুঝিয়ে বলি।"

রমা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"কিসের কথা ঠাকুর ঝী?"

বিমলা বলিল—"জানত মার মনের অবস্থা, ভেবে ভেবে সারা হচ্ছেন, ধর্ম্মকর্ম্মের নামে যদি সাম্‌লিয়ে উঠ্‌তে পাবেন।"

লুকাইতে গিয়া বিমলা রমার নিকট ধরা দিল, রমা বুঝিল, আগুন চাপিয়া রাখিবার জন্য ছাইয়ের সন্ধান হইতেছে, বলিল,—"আলোটা নিবিয়ে ফেল্‌তে গিয়ে সল্‌তা বাড়িয়ে দিলে ত হবেনা ঠাকুর-ঝী, তাতে যে সে উজ্জ্বল হয়েই উঠ্‌বে।"

বিমলা খোচা খাইয়া পরিপাক শক্তিটার প্রতি সন্দিহান হইয়া

উঠিল, নিরুপায়ের ছট্‌ফটানিটা তাহার হৃদয় বেড়িয়া ছুটিয়া চলিল, বলিল—"তবু"

"তবু কি ? ওতেত কিছু হবেই না, বরং উৎসবের আয়োজনে মার মন সন্তানের জন্য উধাও হয়ে ছুটে চল্‌বে।"

"তবে"—বলিয়া বিমলা জোড় করিয়া শ্বাস চাপিল। রমা বলিল—"লজ্জা-সরম ভাসিয়ে দাও, বরং শ্বশুরকে গিয়ে বল, চল সবাই মিলে তাঁর সন্ধানে বেড়িয়ে পড়ি, ধরে বেধে যদি ফিরিয়ে আন্‌তে পারি।"

বিমলা এত আশা করিতে পারিল না, তেমন সাহসও তাহার ছিল না। বিশেষ করিয়া এমনই প্রস্তাব সে গুরুজন পিতৃতুল্য শ্বশুরের নিকট উত্থাপন করিতে পারিবে না, ইহাই ঠিক করিয়া লইল, স্বভাবসুলভ লজ্জাটা একেবারে এক দিনে মাড়িয়া ফেলিবে, সেকি হইতে পারে! বলিল—"সে এখন হতে পারে না. বাড়ী ঘর সব ফেলে, বাবা কেন এতে মত দেবেন।"

রমা কথাটা বুঝিল, বলিল—"সর্ব্বস্ব যার, তারি জন্যে কপর্দ্দকের লোভ ছাড়্‌তে যে কোনই কষ্ট হবে না, সে আমি নিশ্চিত ভাবেই বল্‌তে পারি, কিন্তু—"

বিমলা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পাণ্ডুর মুখ সাদা হইয়া উঠিতেছিল, অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিতে বিমলার সেকেলে প্রাণ কোন মতেই যেন আপনাকে প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারে না। রমা বলিল—"বিষয়আশয় বাড়ীঘর এর জন্য তোমার শ্বশুর কোন চিন্তা বা আপত্তি করবেন না, সে ধ্রুব, তবে পেছনে লেগেই সুফল পাব, সে আশাও তিনি রাখেন না, এ কথা এমনই খাটি যে, তাকে নিজের মতের বিরুদ্ধে টেনে আনা সহজ হবে না।"

নিরুপায়ে বিমলার জোড় কমিয়া আসিল, এত অল্প কালেই একটা হাহাকার যেন এই বাড়ী শুদ্ধ সবাইকে গ্রাস করিয়া ধরিতেছিল, সদানন্দ বাহিরে পা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৌমা, তোমার মার মত হল ?"

বিমলা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"মার কাছেই যাচ্ছি বাবা, আমার বিশ্বাস আছে, তিনি তাঁর এ মেয়েটির আব্দার উপেক্ষা করবেন না।" বলিয়া সে রমার হাত ধরিল, বলিল—"চল ঠাকুর ঝী, মার মতটাই আগে জেনে আসি।"

(১৪)

গৃহিণী করুণাময়ী পুত্রবধূ বিমলার কথা শুনিয়া একবাক্যেই স্বীকার করিয়া বসিলেন, রমা বিস্মিত হইল, এ স্বীকারটা যেন বিমলার মনের উপরকার ভারটাও বৃদ্ধি করিয়া দিল; সে মনে মনে বেশ বুঝিল যে, তাহারই জন্যে মাতৃসমা শ্বশ্রূ আজ পুত্রের অনুপস্থিতির কথা না, ভাবিয়া এক-বাক্যে সায় দিয়া গেলেন, বালকবালিকাকে পুতুল-খেলার মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া মাতা যেমন মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি বোধ করে,এও যেন ঠিক তারি মত। বিমলা এই কার্য্যের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও যদি মনের বেদনা ভুলিতে পারে। রমার চিত্তটা কিন্তু এপথে ঘেঁষিতেই চাহিল না, সে নির্ম্মলের শুভাশুভের জন্য যক্ষের মত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, গোড়া বাচাইয়া তবেত ফলপাতার প্রত্যাশা। সে গিয়া কর্ত্তা সদানন্দের কাছে উপস্থিত হইল, হঠাৎ কোন কথা বলিতে তাহার কেমন লজ্জা হইতেছিল, সদানন্দ হাসিয়া বলিলেন—"বৌমা ত বলে গেল, সাবিত্রীব্রতের কথা ঠিক হয়ে গেছে।"

রমা নড়িল না, একটা শ্বাসও ত্যাগ করিল না, সদানন্দ সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমায় কিছু বল্‌বে মা?"

"হাঁ"—বলিয়া রমা থামিল, লজ্জা ও সঙ্কোচের প্রথম বেগটা কমিয়া আসিলে মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আমি কেবলই ভাব্‌ছি, নির্ম্মলবাবুর কথা।"

সদানন্দ মৌন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, রমাও তাহার মন গড়া সন্তান সম্বন্ধে অযথা সন্দেহের কথাটা প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধ পিতার মনে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইয়া বিমুখ হইয়া পড়িল, রমাকে নীরব দেখিয়া সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"যা বল্‌বার থাকে খুলে বল মা, আমি যে শুন্‌বার জন্য প্রস্তুত হয়েই রয়েছি।"

রমা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, অতিকষ্টে বলিল—"বরাতের দোহাই দিয়া পুত্রের কথায় পিতাকে নিশ্চিন্ত থাক্‌লে ত চল্‌বে না, যে দিন পড়েছে, স্থান-কাল বিবেচনা করে জোর করে হলেও যে তার জন্য আপনার ভাব্‌তেই হবে।"

সদানন্দের মন যেন কেমন নরম হইয়া আসিল, তবু দৈবে শ্রদ্ধাবান্ একান্ত নির্ভরশীল তিনি বলিলেন—"চেষ্টা যা কর্‌বার তাতে যে আমিও ত্রুটি কর্চ্ছি এমন কথা ভেব না মা,আমি তাকে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যে লোকও পাঠিয়েছি, গোপনে সে তার সন্ধানও নিচ্ছে, এর বেশী আমি কর্ত্তে পারি

না, হয়ত তাতে বিপরীত ফলই দাঁড়াবে। এখনও সে আমাদের হাতে আছে, ভয় করে, ভক্তিও করে, একবার যদি নিজেরই ভুলে ভয় ভাঙ্গিয়ে দি, তবে যে সেটা কর্ত্তব্য না হয়ে শক্রতাই হবে, বাপ হয়ে তেমন কাজত আমি কর্ত্তে পারি না।"

রমা একান্ত বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। এই গম্ভীর একান্ত নির্ভরশীল, উদার উচ্চপ্রকৃতির লোকটিকে সে উপদেশ দিতে আসিয়াছিল, বলিয়া নিজকে শত ধিক্কার দিল, মনে মনে বলিল—"কি ভুল আমার, এমন পিতা যার মাথার ওপর রয়েছেন, তার জন্যে আবার পথের লোকও ভাব্‌তে আসে ছিঃ।"

গৃহিণী আসিয়া মুখ ভার করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা লিখেই দেখ না, আমি ঠিক জানি, আমার অসুখের কথা জান্‌লে, সে কখ্‌খনই বাড়ী ছেড়ে থাকৃতে পার্‌বে না।"

সদানন্দ স্মিত হাস্যে বলিলেন—"শুনেছ মা, ছেলেকে ঠকিয়ে বাড়ী আন্‌তে হবে, গিন্নি, সে আমি পারব না, বাপ যদি ছেলেকে ঠকায়, তবেত ছেলেও বাপ্‌কে খাতির করে পথ দেবে না।" বলিয়াই তিনি উঠিয়া গেলেন। গৃহিণী হাত নাড়িয়া বলিলেন—"ঐ এক কথা মুখে লেগেই আছে, ধর্ম্মপুত্তুর হয়ে আমার ছেলেটাকে আমি এখন পথে ছুড়ে ফেলি আর কি।"

(১৫)

একটা বড় রকমের আঘাত পাইয়াই নির্ম্মল শোভাদের বাড়ী ছাড়িয়া বাসায় আসিয়া বসিল। তিন দিন আর সে বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই, অবসন্ন দেহ মন লইয়া তাহার চিন্তার দিক্‌টা ওলটপালট হইতেছিল। বিমলা এমন কি অপরাধ করিয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে স্নেহময় পিতামাতার কথাও মনে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল, লজ্জার খাতিরে বিমলা হয়ত তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না, তাহারই জন্য তাহার কি এমনই নিষ্ঠুর হওয়া উচিত ছিল, সাধ্বী স্ত্রী, সন্তানবৎসলা মাতা, কর্ত্তব্যে জাগরূক পিতার কথা এই কয়টা মাস ধরিয়া সেযে একটিবার মনেও করে নাই। শোভা বা সতীশের সঙ্গে তাহার কি এমন সম্বন্ধ যে, তাহাদের জন্যই মান অপমান ভুলিয়া মনের লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছিল। নির্ম্মল কণ্টকিত হইয়া উঠিল, শোভার সেই পূর্ণ মুখখানা যেন বসন্তের পুষ্পসম্ভার লইয়া তাহার মনের কোণে উকি দিয়া উঠিল। সেই যৌবনোদ্দীপ্ত চঞ্চল মুখখানা বীণার তানের মত

মধুর শব্দসম্ভারে নির্ম্মলের কর্ত্তব্য বুদ্ধির উপর আঘাত করিয়া তাহাকে ছিনাইয়া লইতে যাইতেছিল, শশাঙ্ক গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কিহে কেমন আছ ভায়া ?"

বাল্য বন্ধু শশাঙ্কের স্বরে নির্ম্মল চমকিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কবে এলিরে শশাঙ্ক ?"

"এয়েছি সে বড় কম দিন হয়নি, কিন্তু তুমি যে অজ্ঞাত বাসের পালাটা সুরু করেছ, তাতেত খুঁজে বাড় করাই দায় হয়ে উঠেছে। একেবারে হয়রাণ হয়ে তবেই না লাগ পেয়েছি।"

নির্ম্মল উত্তর করিল না, তাহার কণ্ঠনালী আটকিয়া আসিতেছিল। পিতামাতা কেমন আছেন, বিমলা শোধরাইয়াছে ত, সে তাহাকে টানিয়া বুকে নিতে পারিবে কি না, জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু লজ্জা ও কুণ্ঠা বাধা দিল, মনে মনে বলিল—"নিজেই ত জোড় করে সে অধিকার ছিন্ন কর্ত্তে বসেছি, তাতে ত তাদের কোন অপরাধ নেই।" নিজের অপরাধের ভার চাপিয়া বসিয়া নির্ম্মলকে বাক্‌শক্তিহীন করিয়া দিল। শশাঙ্ক বলিল—"একেবারে চিঠী পত্র শুদ্ধ বন্ধ, কি এমন অপরাধ হয়েছে রে।"

নির্ম্মল তবু জবাব দিল না, শশাঙ্ক অনুযোগ করিয়া বলিল—"লেখা পড়া শিখে তোর এমন মতিচ্ছন্ন হবে, তাত একদিনও ভাবিনি নির্ম্মল ! তুমি যে আমাদের মস্ত ভরসার স্থল ছিলে, এমন করে কি তার প্রতিশোধ নিতে হয়, আমাদিগকে নাহক দূর করে তাড়িয়ে দিলে, কিন্তু বাপমা—।"

নির্ম্মল চকিত চাহনীতে শশাঙ্কের দিকে দৃষ্টি করিল, সহসা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল—"তাঁরা কেমন আছেন শশাঙ্ক ?"

"সে খোজে কি তোমার প্রয়োজন আছে, না কর তুমি তাদের কোন তত্ত্বতল্লাস।" বলিয়া শশাঙ্ক থামিতেই নির্ম্মল তাহার হাত ধরিল, বলিল—শশাঙ্ক ভাই, অন্যায় যা তা ত করেছি, তা বলে আর পীড়া দিয়ে কি হবে, বল মা বাবা ভাল আছেন।"

শশাঙ্ক বলিল—"বেচে আছেন, এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, ভাল কেমন করে থাক্‌বেন্, একটিমাত্র ছেলের বাপমা কি ছেলের অভাবে ভাল থাক্‌তে পারে রে।"

তাই কি, পিতামাতা কি পুত্রের অভাবে ভাল থাকিতে পারেন না,

একথাটা যে এমন করিয়া আর নির্ম্মলের মনেই হয় নাই। শশাঙ্ক বলিল—"কার যে কি অপরাধ তাওত বুঝতে পারি নি, এ নির্ব্বাসনদণ্ড সাধ করে ঘাড়ে নিয়েছ কেন বলত, ঘরের ছেলে এবার ঘরে ফিরে চল।"

"তাই চল"—বলিয়া নির্ম্মল কেমন অন্যমনা হইয়া পড়িল, সতীশের বাড়ী ঘর, আলো আসবাব সমস্তই যেন শোভার স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়া তাহায় মন জুড়িয়া দাঁড়াইল, আর একটি বার দেখা করিয়াও যাইতে দোষ কি? শশাঙ্ক চিন্তায় বাধা দিল, বলিল—"আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি, আজকের রাত্রির ট্রেনেই রওনা হতে হবে।"

"আজকেই, এত তাড়াতাড়ি কেন?" বলিয়া নির্ম্মল জোরে শ্বাস ছাড়িল। দক্ষিণা বাতাসটা কেমন উদাস ভাবে বহিয়া তাহার মনের কোণে টিপ দিতেছিল, অপরাহ্ণের সেই নিষ্প্রভ আলোতে শোভার সহিত দেখা করিবার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল, সহসা মনে পড়িল, সেপথ যে বন্ধ, দশদিন দশ বৎসর এখানে অপেক্ষা করিলেও সে কোন্ লজ্জায় কি সাহসে আবার সেমুখো হইবে, না না কিসের লোভে, কোন্ আশায় সে নিজকে এত খাট করিতে যাইবে, তাহা অপেক্ষা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, যেখানে অভিমান নাই, তিরস্কার নাই, ঘৃণা নাই, এমন কি ভালমন্দ বিচার পর্য্যন্ত নাই, পাইলেই যেখানে আদরে আহ্লাদে টানিয়া কোলে লইবে, এমন স্নেহের আত্মনিয়োগের আশ্রয় সে কেন ছাড়িতে যাইবে। পূর্ণ জোড়ে সে বলিয়া উঠিল—"না না, আজই, আজই আমায় যেতে হবে শশাঙ্ক, মা হয় ত বড় কাতর হয়েছেন।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গাউন পড়া মেমটি সাজিয়া শোভা তাহার বিস্তৃত চক্ষুর নিবীড় দৃষ্টি লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"নির্ম্মলবাবু যে আমাদের একেবারে ভুলেই গেলেন, আর একবার সে মুখোও হচ্ছেন না, অমন তর্ক ত কথায় কথায় হয়ে থাকে, তা বলে নাকি অভিমান কর্ত্তে আছে, ছিঃ।"

(ক্রমশঃ)

৫ম বর্ষ, } কার্ত্তিক, ১৩২৪ { ৭ম সংখ্যা

খুড়োর বরাত।

(লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু)

খুড়োমহাশয় যে চুপ করিয়া শুইয়া আছেন একথা আমরা জানিতাম না। জানিলে কখনই তাঁহার নিকটে বসিয়া পরামর্শ আঁটিতাম না। কথা শেষ করিয়া আমরা দুইজনে অন্ধকার বৈঠকখানা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইব, এমন সময় খুড়োমহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"আমাকেও সঙ্গে নিও, তোমাদের অনেক সুবিধে হবে। আর তোমরা উপযুক্ত ভাইপো থাকতে আমার যদি না কাশী দেখা হয়, তা হলে জন্মটাই বৃথা বলতে হবে।"

মণি বলিল—"খুড়োমশাই দেখছি বেশ মজার লোক, চুপটি করে পড়ে আছেন, একটু সাড়াও দিতে নেই। আমরা মনে করেছিলুম ঘরে কোন লোক নেই।" আমি বলিলাম—"খুড়োমশাই এবারে আর আপনাকে নিয়ে যেতে পারব না। এখন রেলে কন্‌সেশন্ নেই, তার ওপর সেকেণ্ড ক্লাশ ছাড়া ভদ্রলোকের যাওয়া পোষায় না। আপনি আমি দুজনে যেতে গেলে অনেক খরচ হয়ে যাবে। আপনাকে আসছে বছর নিয়ে যাব। ততদিনে যুদ্ধও থেমে যাবে, আর রেলের কন্‌সেশনও আরম্ভ হবে।" খুড়োমহাশয়ের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমরা দুইজনে বাহির হইয়া গেলাম।

মণিকে খানিক দুর আগাইয়া দিয়া বাড়ি ফিরিতেই খুড়োমহাশয় আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে তাঁহাকে সঙ্গে লইতে হইবে। আমি তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম যে এখন ভাড়া খুব বেশী। আর আমি কাশাতে মণির শ্বশুর বাড়ি গিয়া উঠিব, সেখানে দুজনে যাওয়া ভাল দেখায় না। বিশেষ বাড়িতেও একজন পুরুষ থাকা দরকার। অনেক কথাই বলিলাম কিন্তু কিছুতেই খুড়ো-

মহাশয়ের মন ফিরিল না। তিনি বলিলেন "যতিন, আমাকে সঙ্গে নিলে তোমাদের খুব সুবিধে হবে, তোমরা যেখানেই যাও, বিদেশ ব'লে বুঝতে পারবে না। সমস্ত ভার আমার ওপর দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।" সব ঠিক কথা কিন্তু এবছর আর নিয়ে যাবার উপায় নেই খুড়ো-মশাই, বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। খুড়োমহাশয়ও—আমার বরাতে থাকেত যাওয়া হবে, বলিয়া তক্তাপোষের উপর শুইয়া পড়িলেন।

চব্বিশ বৎসর বয়স হইল কলিকাতার পশ্চিমে একবার শ্রীরামপুর ব্যতীত আর কোথাও যাই নাই। ছেলেবেলায় স্কুলের ছেলেদের কাছে কাশী, গয়া, দিল্লী, আগ্রার কত গল্প শুনিতাম, তখন হইতেই মনে বিদেশ ভ্রমণের একটা প্রবল ইচ্ছা জাগিয়াছিল। কিন্তু কখনও কোন সুযোগ ঘটে নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাত এড়াইয়া গতবর্ষে যখন মণি ও আমি গভর্ণমেণ্ট অফিসে কর্ম্ম লইলাম তখনই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম যে আগামী পূজার বন্ধে দুইজনে পশ্চিম ভ্রমণে যাইব। কয়দিন হইল মাকেও বেশ করিয়া বুঝাইয়া রাজি করি-য়াছি। মণির শ্বশুর বাড়িতে গিয়া উঠিব, কোন কষ্ট হইবে না, জানিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু কাশী হইতে যে আরও অন্য জায়গায় যাইবার ইচ্ছা আছে সে কথা কাহারও নিকট ঘুনাক্ষরে প্রকাশ করি নাই।

খুড়োমহাশয়কে সঙ্গে লইলে আমাদের ভ্রমণ যে বিশেষ আনন্দের হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তাঁহার মত আমোদপ্রিয় লোক কমই দেখা যায়। অল্পক্ষণের মধ্যে নিতান্ত অপরিচিত লোককেও আপনার করিয়া লইবার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। সমাজ নীতি, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি সকল বিষয়ের আলোচনাতেই তিনি সমান পটু। সকলপ্রকার রন্ধনেও সিদ্ধ হস্ত, কোথাও প্রীতি ভোজের ব্যবস্থা হইলে সকলে আগে খুড়ো মহাশয়ের সন্ধান করে। নিজে কখনও বিবাহ না করিলেও সংসারের খুটিনাটি পর্য্যন্ত তাঁহার অজানা নাই। সঙ্গে থাকিলে খুব ভালই হয়, কিন্তু কি করিব, কেবল কাশী পর্য্যন্ত হইলে না হয় লইয়া যাইতাম। অন্য জায়গায়ও যে যাইব; অনেক খরচ পড়িবে।

যাঁহারা ছেলেবেলা হইতেই নানাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না যে, পরিণত বয়সে প্রথম বিদেশ যাত্রায় কিরূপ আনন্দ। তিনদিন ধরিয়া কেবল গোছগাছই করিতে লাগিলাম। অনেকে হয়ত হাসিবেন যে, কাশী যাইবে তার আবার এত ব্যাপার,

তিন দিন ধরিয়া গোছ গাছ। কিন্তু হাসিলে কি হয়, অনেকে এবয়সে হয়ত পাঁচ সাতবার, কাশী কেন দিল্লী লাহোর ঘুরিয়া আসিয়াছেন, আর আমার এই যে প্রথম পশ্চিম যাত্রা। কখন বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইব মনে কেবলই তাহারই চিন্তা জাগিতে লাগিল।

সমস্ত জিনিষপত্র তুলিয়া দিয়া ভাড়াগাড়ির ভিতরে উঠিয়া বসিলাম। মা গাড়ির নিকটে আসিয়া বিশেষ সাবধানে থাকিতে, পৌছিয়াই চিঠি দিতে এবং শীঘ্র বাড়ী ফিরিতে বলিয়া দিলেন। সমস্তই তাঁহার আদেশমত করিব বলিয়া, গাড়ি হাঁকাইতে বলিলাম। মনিকে তাহার বাড়ী হইতে উঠাইয়া লইয়া যথা সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলাম। পূর্ব্ব হইতেই আমরা পাঞ্জাব মেলে দুইটা সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিলাম, সেজন্য গাড়ীতে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না।

গাড়ীতে উঠিয়া আমরা দুইটি লোয়ার বার্থ দখল করিলাম। পূর্ব্ব হইতেই আর একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অপর লোয়ার বার্থ এবং তাঁহার পুত্র একটী আপার বার্থ দখল করিয়া বসিয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহারাও কাশী যাইবেন। আমরাও সেখানেই যাইতেছি শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন।

খানিক পরে আর একটী মুসলমান ভদ্রলোক আসিয়া অপর বার্থটি দখল করিলেন। সকলে মিলিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে, ট্রেণ প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। মণি দরজার ধারে দাঁড়াইয়া প্লাট ফরমের দিকে দেখিতেছিল, এমন সময় "এই যে, মণি এখানে" বলিয়া খুড়োমহাশয় শশব্যস্তে দরজা ঠেলিয়া আমাদের গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমিত তাহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

মনি বলিল, খুড়োমশাই ব্যাপার কি বলুন দেখি। খুড়োমহাশয় আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যতিন যে একেবারে বাকশক্তি রহিত হয়ে গেলে দেখছি। বাবা বরাতে থাকলে কি কেউ কখনও খণ্ডন করতে পারে। তোমাদের কত করে সাধলুম তোমরা সঙ্গে নিলে না, এখন দেখ নিজেই এসে হাজির হয়েছি।" আমি বলিলাম—এসেত হাজির হলেন, টাকা কোথায় পেলেন। খুড়োমহাশয় বলিলেন "বাবা রাগ করো না, তোমার টাকা নিয়েই এসেচি।" আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

খুড়ো মহাশয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—যখন তোমার জিনিসপত্র ভাড়াগাড়িতে উঠান হইতে ছিল, তখন আমি বৈঠকখানায় বসিয়া এক মতলব আঁটিয়া ফেলিলাম। গাড়ী চলিয়া গেলে যখন তোমার মা চোখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে প্রবেশ করিতে ছিলেন, তখন আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে আসিয়া বলিলাম "বৌদিদি মণিকে একলা যেতে দিয়ে কাজটা বড় ভাল করলে না।" "ঠাকুরপো আমার কি ইচ্ছে যে তাকে বিদেশে যেতেদি" বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। দেখিলাম সময় মতই ঘা দিয়াছি। বলিলাম, "সেই জন্যইত তাকে বলেছিলাম যে, ছেলে মানুষ বিদেশে যাবে, আমায় সঙ্গে নিও, তা সে কিছুতেই রাজি হ'ল না।" জানত যতই বয়সই হোক না কেন মার কাছে সকল ছেলেই ছেলেমানুষ। বৌদিদি পরে বলিলেন—ঠাকুর পো তোমাকে তার সঙ্গে যেতে হবে, এখনো ত অনেক সময় আছে, তাড়াতাড়ি দুটি খেয়ে নাও। আমি বলিলাম হাঁ এখনও একঘণ্টার বেশী সময় আছে। আমার খাওয়ার যোগাড় করিতে তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমিও নিশব্দে খানিকটা হাসিয়া তৎক্ষণাৎ চাকরকে একখানি গাড়ী আনিতে বলিয়া দিলাম।

খাওয়া শেষ হইলে বৌদিদি বলিলেন, ঠাকুর পো, কত টাকা দিতে হবে। আমি বলিলাম, কাশী যেতে সেকেণ্ড ক্লাসের একপিঠের ভাড়া কুড়ি টাকা, যাওয়া আসা চল্লিশ টাকা, পথ খরচও কিছু লাগবে, আর দু পাঁচ টাকা হাতেও থাকা চাই, মোট গোটা পঞ্চাশেক টাকা হলেই চলবে। বৌদিদি পাঁচখানি দশটাকার নোট আমার হাতে আনিয়া দিয়া বলিলেন, মণি আমার কাছে তিনশো টাকা রেখেছিল, তাই থেকেই তোমায় দিলুম।

একখানি কম্বল ও বালিশ লইয়া গাড়িতে উঠিয়া জোরে হাঁকাইতে বলিলাম, ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম তখন ট্রেণ ছাড়িবার পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়িল, টিকিট করিয়াই প্লাটফরমের দিকে ছুটিলাম, দুর হইতেই এই গাড়ির দরজায় মণিকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। এত তাড়াতাড়ি করিয়া না আসিলে নিশ্চয়ই যাওয়া হইত না, বরাত জোর তাই একটুর জন্য ট্রেণ ধরিতে পারিয়াছি।

খুড়োমহাশয়ের কথা শুনিয়া রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। মাকে কথার চাতুরীতে ভুলাইয়া তিনি আমাদের সঙ্গী হইয়াছেন। মায়ের উপরও যে রাগ হইতেছিলনা তাহা নহে। তিনি কেন আমার টাকা

দিলেন। শেষে ভাবিলাম, মায়ের [illegible] তিনি অতিরিক্ত স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়াই এরূপ ভুল করিয়াছেন। [illegible]ত খুড়োমহাশয়েরই, আমি আর কোন কথা না কহিয়া, শুইয়া [illegible]। খুড়োমহাশয়কে যে স্থানাভাবে সমস্ত রাত্রি আমার পদতলে বসি[illegible]ইতে হইবে, সে বিষয় আর আমি বিবেচনার মধ্যে আনিলাম না[illegible]নি বুঝিতে পারিলেন যে আমি রাগিয়াছি।

অর্দ্ধরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া [illegible]ড়োমহাশয়কে দেখিতে পাইলাম না, হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি বসিয়াছি[illegible]র পুত্রটী সেই বেঞ্চেই শুইয়াছিল। তাহার দিকে ফিরিতেই তিনি ব[illegible]াবুজী ডাগ্‌দার বাবু উপরমে শুয়া হ্যায়। চাহিয়া দেখি খুড়োম[illegible]রের বার্থে আরামে ঘুমাইতেছেন। বুঝিতে পারিলাম যে তিনি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের কাছে নিজেকে ডাক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এবং কোন নূতন ফন্দিতে উপরের বার্থটা দখল করিয়াছেন।

কাশীতে পৌঁছিয়া যখন রাগ কমিয়া গেল, তখন খুড়োমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যারা আগে থেকে বার্থ রিজার্ভ করে দখল করেছিল, আপনি ট্রেন ছাড়বার শেষ মুহূর্ত্তে এসে কি করে তাদের বেদখল করালেন! হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটী সমস্ত রাত্রি ব'সে কাটালেন, আর আপনি ত আরামে ঘুমিয়ে এলেন। খুড়োমহাশয় বলিতে লাগিলেন—তোমরা ত যে যার যায়গায় ঘুমাইয়া পড়িলে, দেখিলাম যে, আমাকে বোধ হয় সমস্ত রাত এইরূপ বসিয়াই কাটাইতে হইবে। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটীর সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, তিনি একজন নামজাদা পাটের দালাল, পুত্রের মাসখানেক হইল হাঁপানির মত হইয়াছে, সেজন্য তিনি তাহাকে বাটীতে রাখিয়া আসিতে যাইতেছেন। কাশীতে কচুরী গলিতে তাঁহাদের বাটী। ছেলের অসুখের কথা শুনিয়া আমি নিজেকে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বলিয়া পরিচয় দিলাম এবং কাশীতে রোগী দেখিতে যাইতেছি একথাও তাঁহাকে বলিলাম। ডাক্তার শুনিয়া তিনি তাঁহার ছেলের অসুখ সম্বন্ধে আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আমিও বিশেষ বিবেচনার সহিত সকলগুলির উত্তর দিলাম। অল্পক্ষণ পরে হঠাৎ তাঁহার পুত্রটির ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া, হাঁপানি আরম্ভ হইল! ভদ্রলোকটী বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমার সাহায্য চাহিলেন। আমিও সুযোগ বুঝিয়া

উপর হইতে বালককে নামাইতে বলিলাম এবং আর যেন উপরে উঠিতে না দেন সেজন্য নিষেধ করিয়া দিলাম। নিচে নামিয়াই খানিক পরে বালকের হাঁপানি বন্ধ হইল এবং ভদ্রলোকটীও অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। পুত্রকে নিচের বেঞ্চে শোয়াইয়া তাঁহাকে উপরে উঠিতে বলিলাম, কিন্তু তিনি নিজের বিশাল বপু লইয়া কিছুতেই উঠিতে পারিবেন না, ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ভদ্রলোকটী শেষে আমাকেই উপরে উঠিতে অনুরোধ করিলেন এবং তিনি পুত্রের নিকটে বসিয়াই রাত কাটাইবেন স্থির করিলেন। আমিও প্রথমে দুই চারিবার মৌখিক অনিচ্ছাপ্রকাশ করিয়া; যথা সময়ে উপরে উঠিয়া শয়ন করিলাম। আগে হইতে বার্থ রিজার্ভ করিয়া হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটী সমস্ত রাত বসিয়া কাটাইলেন, আর আমি শেষ মুহূর্ত্তে ট্রেণে উঠিয়াও বরাত জোরে সমস্ত রাত্রি আরামে ঘুমাইয়া আসিলাম।

কাশীতে চকে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ভদ্রলোকটির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল, তিনি খুড়োমহাশয়কে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহার পুত্রকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরদিন প্রাতে দেখিতে যাইবেন বলিয়া খুড়োমহাশয় তখনকার মত তাঁহার হাত এড়াইলেন।

সকালে খুড়োমহাশয় যে কখন বাহির হইয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। দশটার সময় তিনি হাসিতে হাসিতে বাড়ি ঢুকিয়া বলিলেন—বাবা তীর্থস্থানে ত সকলে খরচ করতেই আসে, কিন্তু এসে উপায় করতে পারে কজনা, তোমাদের না বলে সকলে বেরিয়ে, দশাশ্বমেধ ঘাট রোডে এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানায় হাজির হলুম। নানাকথায় ডাক্তার বাবুর সঙ্গে বেশ করে আলাপ করে, পরে হাঁপানির কোন ভাল ওষুধ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলুম! তিনি খুব ভাল বলে দুআনা নিয়ে এক শিশি ওষুধ দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বুক দেখবার যন্ত্রটা কিছুক্ষণের জন্য একবার চেয়ে নিয়ে, কচুরী গলির দিকে রওনা হলুম। ডাক্তার বাবু তাঁর যন্ত্রটা ফেরত দেবার জন্যে একজন লোকও সঙ্গে দিলেন, বোধ হয় পাছে অপরিচিত লোকের হাতে যন্ত্রটা খোয়া যায় এই ভয়েই লোক দেওয়া। আমি নিজেই ফেরত দিয়ে যাব বলে ছিলুম, লোক দিয়ে আমার সুবিধাই হ'ল। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের বাড়ি তার ছেলেকে দেখে ভিজিট্ আট টাকা আর ওষুধের দরুণ দুটাকা মোট দশটি টাকা নিয়ে এই আসছি। "খুড়োমহাশয়ের কথা শেষ

হইতেই, মণি বলিয়া উঠিল —আপনার বরাত বটে কিন্তু খুড়োমশাই ও কটি টাকা খরচ করে আমাদের খাওয়াতে হবে। আমিও মণির কথায় সায় দিলাম। খুড়োমহাশয় রাজী হইলেন।

কাশীতে দিন পাঁচেক কাটাইবার পর আমরা স্থির করিলাম যে দিল্লী যাইব। চুপি চুপিই সমস্ত ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম, পাছে খুড়োমহাশয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইবার জন্য ধরিয়া বসেন। খুড়োমহাশয় এই কয় দিনেই কাশীতে অনেক লোকের সহিত আলাপ করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্রই ডাক্তার বাবু বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। তিনি অধিক সময়ে একেলাই বেড়াইতে বাহির হইতেন সেজন্য আমাদের সুবিধা হইয়াছিল। আমরা দুজনে যে পরামর্শ করিয়াছি তাঁহার বিন্দু বিসর্গ তিনি জানিতে পারেন নাই।

পরদিন কয়েকটী আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র কিনিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, দেখি খুড়োমহাশয়, মণির শ্যালক ও একজন পাহারাওয়ালা দরজার সম্মুখে দাড়াইয়া আছে। আমরা আসিতেই খুড়োমহাশয় বলিলেন,—"আমাকে এখানে ফেলে রেখে তোমরা দুজনে দিল্লী যাচ্ছ, আচ্ছা বরাতে থাকেত আমরাও যাওয়া হবে। এখন পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট সাহেবের কাছ থেকে পরোয়ানা এসেচে, একবার ব্যাপারটা কি দেখে আসি।" বলিয়া খুড়োমহাশয় পাহারাওয়ালার সহিত চলিয়া গেলেন।

আমাদের আর অধিক সময় ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই ষ্টেসনের দিকে রওনা দিলাম। ট্রেণে উঠিয়া মণি ও আমি, পুলিস সাহেব কি কারণে খুড়োমহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন সে সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু অনেক অলোচনার পর, খুড়োমহাশয়কে ডাকাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না, ইহাই স্থির হইয়া গেল।

তিন দিন ধরিয়া দিল্লীর যাহা কিছু দ্রষ্টব্য আছে সমস্ত দেখিয়া ফিরিবার দিন আর একবার কেল্লা দেখিতে গেলেন। যিনিই দিল্লী আগ্রায় প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ দেখিয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন যে, ঐ সকল একবার দেখিয়া তৃপ্তি হয় না, ইচ্ছা হয় বারবার দেখি। কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করিয়া মণি বিজ্ঞ ঐতিহাসিকের ন্যায় আমাকে মোগল ইতিহাস শুনাইতে লাগিল, আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার বক্তৃতা শুনিতে লাগিলাম। দেওয়ানী আম, মতিমস্জিদ ইত্যাদি দেখিয়া শেষে আমরা দেওয়ানী খাসে প্রবেশ করিলাম।

হঠাৎ দুই জনেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। নিজের চক্ষে যাহা দেখিতেছি, তাহাই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। একি? দেওয়ানী খাসে যে মর্ম্মর বেদীর উপর সম্রাট সাজাহানের ভুবন বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন বসান থাকিত, সেই বেদীতে যমুনার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন, খুড়োমহাশয়! ইনি এখানে কি করিয়া আসিলেন?

"দুনিয়ার মালিক খোদাবন্দ কসুর মাফ্ কিজিয়ে" বলিয়া মণি খুড়োমহাশয়ের সন্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। খুড়োমহাশয়—"এই যে তোমরা এসেছ" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "খুড়োমশাই ব্যাপার কি?" তিনি উত্তর করিলেন—আমার বরাত।

আমরা বসিলে, তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—পুলিস অফিসে উপস্থিত হইলে, সুপারিণ্টেডেণ্ট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু আপনার নাম কি নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়? আমি উত্তর করিলাম—আজ্ঞে হাঁ। আপনি কলিকাতার জানবাজারে থাকেন—হাঁ। আপনার পেশা কি—সেরূপ কোন কাজ কর্ম্ম করি না। বাবু আপনি আমার কাছে মিথ্যা বলিতেছেন, আপনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বলিয়া সাহেব আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। আপনি এখানেও কচুরী গলির বাবু বিশ্বেশ্বর প্রসাদের পুত্রের চিকিৎসা করিয়াছেন। আপনার চেহারাতেই আপনাকে বিশেষ চালাক লোক বলিয়া বোধ হইতেছে, আপনি কয়দিন পূর্ব্বে আপনার পূর্ব্বেকার বড় দাড়ি কামাইয়া ফেলিয়াছেন? সাহেব আপনি ভুল করিতেছেন, আমি কোন কালেই দাড়ি রাখি নাই। আচ্ছা বাবু আমার ভুল হইতে পারে, কিন্তু আপনাকে এখনে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে—বলিয়া সাহেব নিজের কার্য্যে মন দিলেন। ইনস্পেক্টারের ইঙ্গিতে আমি সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া পার্শ্বের একটি ঘরে বসিলাম।

দীর্ঘ চার ঘণ্টা কাল নানা ভাবনায় কাটিবার পর, সাহেবের কাছে পুনরায় ডাক পড়িল। সাহেব বলিলেন বাবু আপনাকে রাত্রের ট্রেণে আমরা দিল্লীতে পাঠাইব। দিল্লীতে একটা মকদ্দমার ডাক্তার নৃত্য গোপাল মুখোপাধ্যায় নামে একজন বাঙ্গালী পলাতক আসামীর জন্য এই পুলিস অফিসে সংবাদ আসিয়াছিল। গুপ্তচরের সাহায্যে আমি আজ আপনার সংবাদ পাইয়াই আপনাকে এখানে ডাকাইয়া আনিয়াছি। অন্য সব ঠিক মিলিলেও,

আমরা আসামীর আকৃতির যে বিবরণ পাইয়াছি, তাহার সহিত আপনার আকৃতির কিছু কিছু অমিল দেখিতেছি। সেজন্য দিল্লীর পুলিস অফিসে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, সেখান হইতে এখনি উত্তর আসিয়াছে। আপনাকে সেখানে পাঠাইতে বলিয়াছে, সেইখানে সোনাক্ত করা হইবে। আপনার যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব।

একজন হিন্দুস্থানী ইনেস্পেক্টারের সহিত সেকেণ্ডক্লাস গাড়ীতে করিয়া খুব আরামে কাল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। রাত্রে পুলিস অফিসেই ছিলাম, আহারাদিও প্রচুর হইয়াছিল। আজ সকালে পুলিসের বড় সাহেবের নিকট হাজির হইতে হইয়াছিল। তিনি আমাকে দেখিয়া ও কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া শেষে বলিলেন যে, বাবু ভুল ক্রমে আপনাকে এখানে আনা হইয়াছে সেজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। আপনি এখন মুক্ত, কোথায় যাইতে চান বলুন। আমি বলিলাম কলিকাতার বাটীতে যাইব। সাহেব একজন অফিসারকে ডাকিয়া, কলিকাতা পর্য্যন্ত ভাড়া ও পথ খরচের জন্য ১০৲ টাকা দিতে হুকুম দিলেন। আমি টাকা কড়ি লইয়া, প্রথমেই কেল্লা দেখিতে আসিয়াছি। ভাবিতে ছিলাম যদি তোমাদের দেখা পাই বড় ভাল হয়। ভগবান আমার সে কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, তোমরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ।" খুড়োমহাশয় বক্তব্য শেষ করিলে, মণি বলিয়া উঠিল—"বরাত বটে ?"

খুড়োর উইল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল।

জেটি গঠন কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জ্যাক খুব মনোযোগের সহিত কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। ষ্ট্যান্টনের সরলতায় ও সদয় ব্যবহারে সে বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং এই কার্য্যের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। জেটির মালমসলা সংগ্রহ করিতে, অধীনস্থ লোকদের কার্য্য সমগ্র পরিদর্শন

করিতে তাহার দিনের বেলা প্রায় সবই কাটিয়া যাইত। সন্ধ্যার সময় সে কার্য্য হইতে অনেকটা বিশ্রাম পাইত। তাহার কার্য্যে ষ্ট্যাণ্টন বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি তাহার উপরই সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় মলির সহিত গল্পগুজবে ও আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতেন। পরন্তু তরুণ বয়স্ক ষ্ট্যাণ্টনের কার্য্যে উৎসাহ ছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধির তাদৃশ দৌড় না থাকায় কাজকর্ম্ম তেমন ভাল বুঝিতেন না।

একদিন জ্যাক সন্ধ্যাবেলা দিনের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া নদীতীরে বসিয়া আছে, এমন সময় লর্ড ষ্ট্যাণ্টন ও ভগ্নীদ্বয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লর্ড ও মলি নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে নানা প্রকার হাসি ঠাট্টার কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ক্লাইটি তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নৌকায় বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সন্ধ্যাসমীরণ মৃদুমন্দ বহিতেছিল। জ্যাক নৌকায় পাল তুলিয়া দিতে ক্লাইটি নৌকায় গিয়া উঠিলেন। জ্যাক নৌকা ছাড়িয়া দিল!

কিছুদূর গিয়া জ্যাক বলিয়া উঠিল,—"স্থানটি বেশ সুন্দর!"

মিস ক্লাইটি মৃদুস্বরে বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু ব্রামলে এর চেয়ে বেশী সুন্দর।"

"নিশ্চয়ই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই!"

"তুমি কি সেখানে কখনও গেছ?"

"না, যাই নাই, তবে ছবিতে দেখেছি। আপনারা সেখানে বোধ হয় অনেক দিন ধরেই আছেন।"

"হাঁ, প্রায় তিনশ বছর। তুমি যদি এবার ওদিকে কখনও যাও ত আমাদের বাড়ীতে একবার যেও। আমরা সেখানে থাকৃব, এমন একদিন যেও। আমি তোমাকে সঙ্গে করে ঘুরিয়ে সব দেখাব।"

আকাশ হঠাৎ মন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল! সমুদ্রে ঝড় উঠিল। উচ্চ তরঙ্গ সমুদ্র বক্ষ আলোড়িত করিতে লাগিল। নৌকা খানিও তরঙ্গের সহিত উঠিতে ও নামিতে লাগিল।

"আপনি কি ভয় পেয়েছেন?" জ্যাক মৃদুস্বরে ক্লাইটিকে জিজ্ঞাসা করিল।

"না, ভয় পাই নাই। কোন বিপদের আশঙ্কা আছে নাকি?"

হঠাৎ বৃষ্টি নামিল। ঝড় ও বৃষ্টি একত্র মিলিয়া এক তুমুলকাণ্ড উপস্থিত

করিল। সম্মুখের কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। সবই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাহাদের গায়ে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকণা ছিটাইয়া পড়িতে লাগিল। প্রকৃতি দেবীর এই ক্রীড়া দেখিয়া মিস ক্লাইটি ভীত হওয়া দূরের কথা, আনন্দে তাঁহার অন্তঃকরণ নাচিতে লাগিল।

জ্যাক তখন বিমর্ষভাবে বলিল,—"আকাশের অবস্থা দেখে আমার পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল, ঝড় বৃষ্টি হইবে। আপনাকে এমন সময় নৌকায় না চড়ালেই ভাল হইত। আপনি একবারে ভিজে গেছেন, দেখছি।"

"না, আমি বেশী ভিজি নাই, কিন্তু তুমি যে একেবারে জলে নেয়ে গেছ দেখছি। আশ্চর্য্যের কথা, এত বিপদেও আমার বড়ই আনন্দ হচ্ছে। এ রকম আনন্দ আমি অনেক দিন অনুভব করি নাই।"

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড তরঙ্গ আসিয়া নৌকাখানিকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে নাড়া দিল। ক্লাইটি ভর রাখিতে না পারিয়া নৌকার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। জ্যাক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া ধরিল।

সে বড়ই ভয় পাইয়াছিল। তথাপি একহাতে মূর্চ্ছিতা ক্লাইটিকে ধরিয়া অপর হাতে দাঁড় টানিতে লাগিল। ক্লাইটির চক্ষুদ্বয় নিমীলিত, ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর পৃথক; দেখিলে মনে হয় যেন জীবাত্মা বহুক্ষণ পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

জ্যাকের সংজ্ঞা লোপ পাইবার জোগাড় হইল। সে অনেক কষ্টে সাহস সংগ্রহ করিয়া ক্লাইটিকে নাড়া দিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইতে লাগিল,—

"ক্লাইটি! ক্লাইটি!

ক্লাইটির দেহ যেন একটু নড়িয়া উঠিল। জ্যাক সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আরও জোরে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল,—

"ক্লাইটি, তোমার কোনও ভয় নাই। বিপদের আশঙ্কা দূর হয়ে গেছে। এই যে আমি তোমার পাশে বসে রয়েছি,—ডগলাস্—উইলফ্রেড কার্টন—আঘাতটা কি বড় বেশী লেগেছে?"

সে ক্লাইটিকে নিজের বক্ষের দিকে টানিয়া লইল এবং তাঁহার চৈতন্য সঞ্চারের জন্য নানাপ্রকার উৎসাহবর্দ্ধক কথা বলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি চক্ষু মেলিলেন এবং জ্যাকের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—

"কি হয়েছে ? আমাদের নৌকা কি ডুবে গেছে ?"

"না, না; আমরা নিরাপদে আছি। কেবল তরঙ্গের আঘাতে আপনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। বড় লেগেছে কি ?"

ক্লাইটি সংজ্ঞা লাভ করিয়া ধীরে ধীরে জ্যাকের বক্ষ হইতে সরিয়া গেলেন। জ্যাক উদ্বেগপূর্ণ নয়নে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সেই মেঘাচ্ছন্ন নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও ক্লাইটি দেখিতে পাইলেন সে চক্ষুদ্বয় জ্বলিতেছে !

আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল। বৃষ্টি থামিয়া গেল। ঝড় মৃদুমন্দ বাতাসে পরিণত হইল। জ্যাক নৌকার পাল তুলিয়া দাঁড় টানিতে লাগিল। ক্লাইটি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। অন্ধকারে তাঁহার মুখ দেখা যাইতে ছিল না। নচেৎ জ্যাক দেখিতে পাইত যে, বিস্ময় সন্দেহ ও উদ্বেগ এই ত্রিবিধ ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তিনি তখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রহিয়াছেন !

তাহারা নির্ব্বিঘ্নে তীরে আসিয়া পৌঁছিল। মলি ও লর্ড ষ্ট্যাণ্টন তাহাদের জন্যই শঙ্কিত চিত্তে তীরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ক্লাইটিকে লইয়া তাঁহারা বাড়ী চলিয়া গেলেন। মলি যাইবার সময় জ্যাককে দুচার কথা বলিতে ছাড়িল না।

বাড়ীতে গিয়া ক্লাইটিকে গরম শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া মলি জিজ্ঞাসা করিল,—

"এখন কেমন আছ ?"

"ভালই। তবে এখনও ভয় পাচ্ছে।" কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে তখন প্রবল ঝড় বহিয়া যাইতেছিল।

ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও উচ্চারিত জ্যাকের সেই আত্মপরিচয়, সেই রহস্যময় নামোচ্চারণ তখনও তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে ছিল !

(১৪)

জ্যাক ক্লাইটিকে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল।

ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ক্লাইটির দেহ বক্ষে ধারণ করিবার সময় সে ইহা সম্পূর্ণ রূপেই বুঝিতে পারিয়াছে, নিজের বক্ষের ভিতর তাহার বক্ষের স্পন্দন অনুভব করিয়াছে। তখন বাহিরের ঝড় অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী ঝড় তাহার হৃদয়ের ভিতর বহিয়া গিয়াছিল।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া ক্লাইটিকে দেখা অবধি সে তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাল্যকালে যখন তাহারা দুজন একত্রে খেলা করিত, তখন হইতেই তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আসক্তি জন্মাইয়াছে। সেই ভালবাসা ক্রমেই একটু একটু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। সে বুঝিতে পারিল কেন তাহাকে দেখিলে, তাহার অন্তঃকরণ আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাহার পাশে থাকিলে সে এত সুখী হয়, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সে তাহাকে ভাল বাসিয়াছে!

এখন কি করা উচিত? এই প্রশ্ন সে বহুবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। এরূপ গোলমালে সে আর কখনও পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ। ক্লাইটির পরিবর্ত্তে সে যদি কোন সাধারণ গ্রাম্য স্ত্রীলোককে ভালবাসিত, তাহলে অনায়াসে তাহার নিকট হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া দূর অষ্ট্রেলিয়ায় লইয়া যাইতে ও সেখানে সুখে ঘরকন্না করিতে পারিত!

কিন্তু তাহার ভালবাসার পাত্রী যে মিস ব্রামলে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব না করিলে তিনিই তাহার পিতার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী হইবেন। এইজন্যই ত তাহার মনে এত দুঃখ। ক্লাইটির নিকটে গিয়া এখন আত্মপরিচয় দিলে, তিনি নিশ্চয়ই ইহা স্থির করিবেন যে সম্পত্তির লোভে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য সে এত কাণ্ড করিতেছে।

জ্যাক তামাকের নলে আগুন ধরাইয়া জেটীর উপর পাইচারি করিতে লাগিল এবং এইসব মনে মনে ভাবিতে লাগিল। সে ভাবিল, ঝড়ের রাত্রে সে যে উত্তেজিত হইয়া ক্লাইটির নিকট তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছিল, ক্লাইটি নিশ্চয়ই সে কথা শুনিলে, পরে তাঁহার মুখে নিশ্চয়ই সন্দেহের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিত। সে বুঝিল না যে, স্ত্রীলোক অতি অল্প আয়াসেই মনের ভাব অপরের নিকট হইতে আশ্চর্য্যরূপে গোপন করিতে পারে, ইহা তাহাদের জাতির স্বভাব। স্ত্রীলোক যে অতি দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার সময়ও হাসিতে পারে, তাহা সে মানসিক উত্তেজনার বসে ভুলিয়া গিয়াছিল।

এখন কি করা যায়? ইহাই তাহার চিন্তা। অবশ্য পলাইয়া যাওয়া এক উপায় বর্ত্তমান। কিন্তু পালাইয়া যাওয়া বড়ই হেয় বলিয়া মনে করিল। সে ষ্ট্যাণ্টনের অনুরোধে জেটী নির্ম্মাণের ভার নিজস্কন্ধে লইয়াছে। লর্ড

ষ্ট্যাণ্টন তাহার সহিত যথা সম্ভব সদয় ব্যবহার করিতেছেন। তাহার কার্য্য কুশলতার উপর তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে পলায়ন করা অমানুষের কাজ। অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল যে, না, সে পলাইবে না। তবে, ভবিষ্যতে জিহ্বাকে সংযত রাখিয়া অতি সাবধানে কথাবার্ত্তা কহিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। পরে জেটি নির্ম্মিত হইয়া গেলে, সে পারালু-নাতে ফিরিয়া গিয়া কৃষকের বেশে চাষবাস করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবে।

জ্যাক মনকে অনেকটা শান্ত করিয়া বাড়ী গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। বিছানার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ও নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও তাহার চক্ষুর সম্মুখে সেই ছবি ভাসিয়া উঠিল,—যেন নৌকার উপর ক্লাইটির মূর্চ্ছিত দেহ সে বক্ষে ধরিয়া রহিয়াছে!

ক্লাইটিও সারারাত্রি বিছানায় জাগিয়া রহিয়াছেন। মানসিক উত্তেজনায় ও উদ্বেগে তিনি শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। জ্যাকের সেই কথাগুলি কেবলই তাঁহার কাণের ভিতর বাজিতেছে। জ্যাকই যে স্যার উইলফ্রেড, এতদিন ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া আসিতেছে, আজ তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন! অনেক চেষ্টা করিয়াও এসব চিন্তা তিনি মন হইতে কিছুতেই দূর করিতে পারিলেন না।

জ্যাক মৎস্যজীবির মত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে। সে কত বলবান ও সাহসী! সেই ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টির সময়ও সে একটুও ভীত হয় নাই। দেখিতে কেমন সুন্দর, আচার ব্যবহার কত নম্র। কিরূপ সাহসের সহিত সে তাহাকে সেই সর্ব্বগ্রাসী বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। তিনি মনের মধ্যে কেবল সেই সব প্রসঙ্গেরই তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে ক্লাইটির একটু তন্দ্রা আসিল। কিন্তু তন্দ্রাবেশেও তিনি কেবল জ্যাকের বিষয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

পরদিন ক্লাইটির শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি বাড়ীর বাহির হন নাই। মলি জ্যাকের দেখা পাইয়া ক্লাইটির অসুস্থতার সংবাদ তাহাকে দিল এবং তাহার দুঃসাহসের জন্য পুনর্ব্বার তাহাকে মৃদু ভৎর্সনা করিতেও ছাড়িল না। ক্লাইটির অসুখের কথা শুনিয়া জ্যাক মনে মনে বড়ই অনুতপ্ত হইল এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

জ্যাকের সে আশা শীঘ্রই পূর্ণ হইল। পরদিন অপরাহ্নে জ্যাক নদীতীরে বসিয়া আছে, এমন সময় ক্লাইটি, মলি ও ষ্ট্যাণ্টন সমভিব্যাহারে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার বদনমণ্ডল বিবর্ণ ও চিন্তাযুক্ত। জ্যাকের প্রতি তিনি স্থির সরল দৃষ্টিতে তাকাইলেন। সে চাহনি লক্ষ্য করিয়া জ্যাক স্থির করিল যে ক্লাইটি তাহার আত্মপরিচয় নিশ্চয়ই টের পান নাই। ষ্ট্যাণ্টন তাহাকে জানাইলেন, ক্লাইটি আজ একটু ভাল আছেন। সেখানে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা অন্যত্র চলিয়া গেলেন। জ্যাকও স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

জ্যাক উঠিয়া পড়িয়া কাজে লাগিয়া গেল। সমস্ত দিন অধীনস্থ লোকজন লইয়া কার্য্যে সে এত ব্যস্ত থাকিত যে, স্বয়ং ষ্ট্যাণ্টন আসিলেও তাঁহার সহিত কথা কহিবার বেশী অবসর পাইত না। ক্লাইটি ও মলি প্রত্যহই নদীতীরে বেড়াইতে আসিত। কিন্তু ডগলস ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিত। মলি নৌকায় চড়িয়া বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা করিলে, জ্যাক নিজে কাজের অছিলা করিয়া অপর জেলের নৌকা ঠিক করিয়া দিত। এবং নৌকা ছাড়িয়া দিলে সে একদৃষ্টে তাহাদের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিত।

জ্যাকের প্রকৃতি দিন দিন বড়ই গম্ভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ক্লাইটি ক্রমেই তাঁহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইলেন! স্থানীয় জলবায়ু বা বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের গুণে তাঁহার যে এ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। তিনি বুঝিতে পারিতেন যে জ্যাক নিশ্চয়ই তাঁহাকে ভালবাসে এবং সে রাত্রে অকস্মাৎ আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়া ফেলাতে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতেছে, অথচ দূর হইতে তাহার কার্য্যাবলি নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে মনে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন। এবং এ ব্যাপার তাঁহার জীবন সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিলেও তাঁহার মনের মধ্যে শান্তি আনয়ন করিয়াছিল।

ভগ্নীদ্বয়ের ব্রামলে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। যেদিন তাঁহারা তথায় যাইবেন, সেদিন সকালে রাস্তায় মলির সহিত জ্যাকের দেখা হইল। মলি বলিয়া উঠিল,—"মিঃ জ্যাক! আমরা আজ ব্রামলে যাচ্ছি। দিদি সেদিন এখানে একখানা বই ফেলে গেছে; তাই নিতে এলাম।

"হাঁ, বইখানা আমার কাছেই আছে। তিনি ফেলে গেছিলেন, আমি কুড়িয়ে বাড়ী নিয়ে যাই। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি ঘর থেকে এনে দিচ্ছি।"

"তবে তুমিই বইখানা তাকে দিয়ে এস। আমি একটু ব্যস্ত আছি। বাজারে যাচ্ছি, অনেক জিনিষপত্র কিনতে হবে।"

জ্যাক প্রথম ভাবিল অন্য কাহাকেও দিয়া বইখানি পাঠাইয়া দিবে! কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া, বোধ হয় ক্লাইটিকে একবার দেখিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া নিজেই পুস্তক লইয়া চলিল। ক্লাইটির ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তিনি তখন যাত্রার আয়োজন করিবার জন্য জিনিষপত্র বাঁধিতেছেন।

"এই আপনার বইখানা এনেছি।"

"হাঁ, তোমাকে ধন্যবাদ। বইখানা ভুলে ফেলে যাচ্ছিলাম। তা, আমরা আজ চলেছি। তুমি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছ, তার জন্য তোমার নিকট আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ। যতদিন না জেটি নির্ম্মাণ শেষ হয় ততদিন বোধ হয় তুমি এখানেই থাকবে?"

"হাঁ, বোধ হয় ততদিন আমাকে এখানেই থাকতে হবে। জিনিষপত্র গুলো আপনার একলা গুছুতে কষ্ট হচ্ছে। দিন আমিও কিছু জোগাড় করে দিই।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই জ্যাক কাজে লাগিয়া গেল। দড়ি, ছুরি সে সঙ্গে আনিয়াছিল। খুব উৎসাহের সহিত জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিল।

কাজ শেষ হইয়া গেল, ক্লাইটি দেখিলেন তাঁহার একটি দস্তানা জ্যাকের পকেট হইতে ঘরের ভিতর পড়িয়া গেল। ক্লাইটি এরূপ ভাব দেখাইলেন যেন তিনি উহা লক্ষ্য করেন নাই! এবং জ্যাক যে উহা স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাহার নিকট রাখিতে চাহিতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিলেন। তিনি দস্তানটি কুড়াইয়া লইয়া দেখিয়া বলিলেন,—"এটা কি হবে? এ যে বহু পুরাতন দেখছি।" এই বলিয়া জানালা দিয়া সম্মুখস্থ উদ্যানে উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

"তাহলে আমি এখন যাইতে পারি। আপনার আর কিছু করতে হবে কি?"

"না, তোমাকে ধন্যবাদ। এখানে শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাদের জন্য তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হলো!"

"ওকথা বলবেন না। আপনারা এত শীঘ্র যাচ্ছেন বলে আমরা বিশেষ দুঃখিত।"

জ্যাক ঘরের বাহিরে যাইবামাত্র ক্লাইটি "মিঃ ডগলস্" বলিয়া চেঁচাইয়া ডাকিলেন।

জ্যাক পুনর্ব্বার ঘরের ভিতর ঢুকিল। ক্লাইটি বলিলেন,—"দেখ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, তাই আবার ডাকলাম। যদি আমাদের ঘর বাড়ী দেখতে কখনও ব্রামলে যাও, তাহলে আমাদের খবর দিয়ে যেও, বুঝলে?"

"আচ্ছা।" জ্যাক আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

জ্যাক বিষণ্ণবদনে প্রস্থান করিল। নীচে নামিয়া আসিয়া বাগান হইতে দস্তানাটি কুড়াইয়া লইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। ক্লাইটিও জানালা হইতে জ্যাককে উহা কুড়াইয়া লইতে দেখিয়া মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। লজ্জায় তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষে ও ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসির রেখা খেলিয়া গেল। তিনি একদৃষ্টে গৃহপ্রত্যাগত জ্যাকের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। জ্যাকের মাথা বুকের উপর নুইয়া পড়িয়াছে। চরণের গতি বড়ই শিথিল। এমন সময় ক্লাইটি দেখিলেন একখানা গাড়ী তাঁহাদেরই বাড়ীর দিকে আসিতেছে।

জ্যাক গাড়ীর ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিল, হেসকেথ বসিয়া রহিয়াছে। ক্লাইটিকে জানালায় দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য হেসকেথ টুপি তুলিয়া বলিলেন,—"আপনারা বাড়ী যাচ্ছেন শুনে একবার এলাম, যদি কোন কাজে আপনাদের একটুও সাহায্য করতে পারি।"

জ্যাকের মুখে যেন গভীর কালিমা ব্যাপ্ত হইয়া গেল।

(১৫)

ভগ্নীদ্বয় গৃহে ফিরিয়া আসিলে ডাক্তার মর্টন ক্লাইটিকে সুস্থ দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার চিকিৎসা প্রণালী ফলদায়ক হইয়াছে বলিয়া মনে মনে বড়ই উল্লসিত হইলেন। দুষ্ট বুদ্ধি মলি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, —"হাঁ, ভাগ্যে সেখানে ডাক্তার ছিল না, তাই দিদি এত শীঘ্র সেরে উঠেছে।"

ক্লাইটি সহাস্যমুখে নিজমনে গান গাহিতে গাহিতে বাড়ীর চারদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার মানসিক গতির এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া মলি মধ্যে মধ্যে ভাবিত,—এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? ঝড়বৃষ্টির দিন নৌকায় যাহা ঘটিয়াছিল, মলি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ক্লাইটি এখন আর নির্জ্জনে থাকিতে চাহেন না। সকলের সঙ্গে মনের স্ফূর্ত্তিতে কথাবার্ত্তা কন। অধীনস্থ লোকজনও তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল।

দুচার দিন না যাইতে যাইতেই লর্ড ষ্ট্যাণ্টন তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার খুড়ী লেডী মারভিনও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। ভগ্নীদ্বয়ের সরল ও নম্র ব্যবহার দেখিয়া লেডী মারভিন বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। বিশেষতঃ মলির কথাবার্ত্তায় ও আমোদপ্রমোদ তিনি বড়ই প্রীত হইলেন। অল্পক্ষণের পরিচয়েই তিনি ভগ্নিদ্বয়কে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়া ফেলিলেন এবং স্নেহ ও যত্নে তাহাদের মৃত মাতার স্থান অধিকার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এ প্রস্তাবে ক্লাইটির নেত্রদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা তাঁহার যোগাইল না।

কয়েকদিন পরে ব্রামলে হলে এক বিরাট ভোজের আয়োজন হইল। অপরাপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত হেসকেথও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ক্লাইটীর পিছু পিছু ঘুরিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলেই ভাবিতে লাগিল, এ দুইজন পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলে পরিণাম বড়ই সুখের হয়। কিন্তু কার্টনের ব্যবহার মলির নিকট বড়ই বিসদৃশ ঠেকিল। সে পার্শ্বস্থিত ষ্ট্যাণ্টনকে বলিল,—"দেখছেন কার্টনের কেমন মুখে হাসি, কিন্তু উহার অন্তরে বিষ! ওকে দেখলে, আমার চিড়িয়াখানার কুমীরের কথা মনে পড়ে যায়। তারাও কেমন হাসিমুখে রোদ পোহায়, কিন্তু সম্মুখে খাদ্য দেখলেই কামড়াবার জন্য দশনপংক্তি বিকাশ করে।"

গভীর রাত্রে অপরাপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা স্ব স্ব বাড়ী চলিয়া গেলে হেসকেথও বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজের কারখানার দিকে চলিলেন। তাঁহার মুখ বিমর্ষ ও চিন্তাযুক্ত। যে বাড়ীতে আজ তিনি নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারই বিষম ভুল আসল উইলখানি পুড়াইয়া না ফেলিলেই, আজ তিনিই সে বাড়ীর গৃহস্বামী হইতে পারিতেন। এই দুর্ব্বিসহ চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণ পুড়াইয়া ফেলিতেছিল।

যদি ঐ ভুলটা না হইত? তবে কি ও ভ্রম সংশোধন করিবার—নষ্ট-সম্পত্তি উদ্ধার করিবার আর কোনও উপায়ই নাই?

এটর্নীর বাড়ী হইতে উইলফ্রেড কার্টনের যে ত্যাগ পত্রখানি তিনি কুড়াইয়া আনিয়াছেন, তাহা তাঁহার আলমারির ভিতর অতি সযত্নে রক্ষিত আছে। নির্দ্দিষ্ট দিন অতিবাহিত না হইলে, ইহা কোন কাজেই আসিবে না। ইতিমধ্যে উশৃঙ্খল প্রকৃতি উইলফ্রেডও বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পারে, তখন সম্পত্তি উদ্ধারের সকল আশাই তাঁহার নির্ম্মূল হইবে। কিম্বা উইলফ্রেডের ত্যাগপত্র অনুসারে কার্য্য হইলেও, ক্লাইটিই সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। তাঁহার আর লাভ কি? তবে এক উপায় আছে, ক্লাইটিকে বিবাহ করা। একথা বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্লাইটির এ বিষয়ে সম্মতি লাভ করা বড় সহজসাধ্য নহে। বিশেষতঃ মলির ব্যবহার মনে পড়িলেই হেসকেথের মুখ কাল হইয়া উঠে। তিনি বুঝিতেন যে, সে তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা করে।

কোন উপায়ই তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। আফিস ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া কাগজপত্র নাড়িতে লাগিলেন। এমন সময় দরজায় কে ধাক্কা মারিল। এতরাত্রে কাহার কি দরকার ভাবিয়া তিনি একটু রাগান্বিত হইলেন। পরে দরজা খুলিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী মেরিল।

"এত রাত্রে কি দরকার?"

"আজ্ঞে একটা বিশেষ দরকার, তাই আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে এসেছি। ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। আমাদের কারখানার মার্থা ব্রাউন মারা গেছে। সকলের ধারণা যে সে যক্ষারোগে মরেছে। কিন্তু বোধ হয়, তা নয়। আমি আজ তার জিনিসপত্রের মধ্যে এই শিশিটা পেয়েছি। আমার সন্দেহ হয়, এর মধ্যে কোন বিষাক্ত দ্রব্য আছে। তাই খেয়ে সে মরেছে।"

হেসকেথ শিশিটা হাতে লইয়া দেখিয়া বলিলেন,—"না, না; এত দেখছি বাতের ঔষধ। থাক্ একথা যেন আর কারও কাছে বলো না। তাহলে বেচারীর পরিবার বর্গকে অনর্থক কষ্ট ভোগ ও অর্থ খরচ করতে হবে।"

মেরিল প্রভুকে অভিবাদন করিয়া বিদায়গ্রহণ করিল। হেসকেথ শিশিটা হাতে লইয়া আগুনের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন, "বিষখেয়ে মরা আজকাল বড়ই প্রচলিত হয়েছে দেখছি।"

শিশির ভিতরস্থ তরল পদার্থ টুকু তিনি অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু পরক্ষণেই কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া কি উপায়ে ইহা প্রস্তুত, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য শিশিটি আলমারির ভিতর তুলিয়া রাখিলেন।

(১৬)

জ্যাক বলিয়াছিল একদিন সুবিধামত ব্রামলে বেড়াইতে আসিবে। ক্লাইটি বাড়ী আসা অবধি তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, কিন্তু সে আশা তাঁহার ফলবতী হইল না। জ্যাকের অদর্শনে একদিন তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সুতরাং তিনি স্বয়ংই জ্যাককে দেখিবার জন্য উইদিকম্বে আসিলেন। এবং নদীতীরে উপবিষ্ট বিমর্ষ জ্যাককে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে গিয়া তাহার কুশল প্রশ্ন করিলেন। "তোমাকে দেখে ত বেশ সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না। অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, তোমার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে দেখছি। তুমি ছুটি নিয়ে দিনকতক অন্য কোথাও ঘুরে এস।"

"না, আমার শরীর বেশ সুস্থই আছে। এ আমার মনের অশান্তি; দূর হবার নয়। জীবনে যা চাই, তা পাবার নয় জেনেও মন তারই জন্য ব্যাকুল হয়।"

"তাহলে দেখছি, তুমি বড় উচ্চাভিলাষী।"

"উচ্চাভিলাষী? হাঁ ঠিক বলেছেন—বড়ই দুর্ভাগ্য আমার যে, আমার সীমার বাহিরের জিনিষ লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পাড়ছি।"

"তা ধৈর্য্য ধরে থাকলে সময়ে পেলেও পেতে পার।"

"না, না, তা হবার নয়। আমার নিজের সর্ব্বনাশ আমি নিজেই সাধন করেছি। আপনাকে সে কথা সব খুব বলতে পারলে অনেকটা শান্তি পেতাম বটে, কিন্তু সে বিষয় আপনাকে বলবার পর্য্যন্ত আমার অধিকার নেই। সে অধিকারও আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছি। তবে যদি কখন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তাহলে একদিন আপনাকে এ কথা বলবো। যত দিনই হোক, আমি ধৈর্য্য সহকারে সেই শুভমুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করে থাকবো। তখন যা বলবো, আপনি অনুগ্রহ করে শুনবেন কি? না, না, আমাকে ক্ষমা করুন; আপনাকে এরূপ ভাবে যা তা বলা ভদ্রতাসঙ্গত নহে।

ক্লাইটি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—"তুমি যা বলবে, আমি আনন্দের সহিত

শুনবো। তুমি আমাদের ছ'বোনকে যথেষ্ট যত্ন করেছ। তাহলে এখন চল্লাম, দেরী হয়ে যাচ্ছে।" এই বলিয়া তিনি অশ্বারোহণে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জ্যাক তাঁহার দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"হাঁ, যতদিন না উইলের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়, ততদিন আমি অপেক্ষা করবো। তারপর গিয়ে বলবো,—আমিই উইলফ্রেড কার্টন। বিষয় সম্পত্তি সব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছি; এসব তোমার। আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি কি আমাকে বিবাহ করতে সম্মত আছ?"

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে লর্ড ষ্ট্যাণ্টন আসিয়া বলিলেন,—"বাঃ! এই যে তোমার দেখা পেয়েছি, ভালই হলো। আজ রাত্রে আমাদের এখানে তোমার নিমন্ত্রণ। সেখানেই খাওয়া দাওয়া করো, মলি, ক্লাইটি ও হেসকেথ নিমন্ত্রিত হয়েছেন। তাহলে দেখো, যেন ভুল না।" এই কথা বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। জ্যাকও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য বাড়ী ফিরিয়া গেল। আজ তাহার বিমর্ষতা দূর হইয়া গিয়াছে। মুখ প্রফুল্ল, ভবিষ্যতের এক মধুরোজ্জ্বল চিত্র তাহার মানস চক্ষে ভাসিয়া উঠিল।

জ্যাকও যথাসময়ে ষ্ট্যাণ্টনের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। সে আর ভোজঘরের ভিতর ঢুকিল না, উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া দেখিল ঘরটি আলোকমালায় সজ্জিত। সুন্দরী রমণীগণ বিবিধ সুচারু বেশভূষায় অলঙ্কৃতা হইয়া ঘরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ক্লাইটিও তাহাদের মধ্যে মণিমুক্তা-বেষ্টিত উজ্জ্বল হীরক খণ্ডের ন্যায় ঘর আলো করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাহাকে এত সুন্দর সে আর কখনও দেখে নাই।

তাহারই বুদ্ধিদোষে সে আজ এই সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত। এই সব ভাবিতে ভাবিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় দেখিল হেসকেথ, ষ্ট্যাণ্টনের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ক্লাইটির সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন। ক্লাইটি তৎক্ষণাৎ সে ঘর ছাড়িয়া হেসকেথের অনুসরণ করতঃ পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

জ্যাক চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। হিংসায় তাহার বুক জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। হায় সে যেরূপ নির্ব্বোধ, তার নির্ব্বুদ্ধিতার উপযুক্ত পুরস্কারই পাইয়াছে। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সে এতদিন বৃথা উচ্চাশা হৃদয়ে

পোষণ করিয়া আসিতেছে,আর হেসকেথ কার্টন বুদ্ধিবলে ইতি পূর্ব্বেই ক্লাইটির হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছে। জন্মের মত আজ সে ক্লাইটিকে হারাইতে বসিয়াছে!

সেখানে আর মুহূর্ত্তমাত্র থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সেস্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া প্রায় সারারাত্রি সে গ্রামের আসে পাশে চারদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। গাছের গোড়া পায়ে লাগিয়া কতবার হোঁচট খাইল, দেহ ক্ষতবিক্ষত হইল, সেদিকে তাহার আদৌ হুস্ নাই। তাহার মাথা ঘুরিতেছে, পা টলিতেছে। ভোর হয় হয় এমন সময় সে কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাতের নির্ম্মল বায়ু সেবনে তাহার মাথা একটু ঠাণ্ডা হইল, দেহ একটু স্নিগ্ধ হইল। সে তখন মনে মনে এক মতলব স্থির করিল।

তাড়াতাড়ি ষ্ট্যাণ্টনকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিল যে, সে চিরদিনের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। তাহার ফিরিবার আর কোনও সম্ভাবনা নাই। তারপর নিজের ঘরে ঢুকিয়া সামান্য পোষাক পরিচ্ছদ যাহা কিছু ছিল গুছাইয়া লইয়া বসিয়া দু'এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল। পরে চুপি চুপি সকলের অলক্ষিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

* * * * * *

এদিকে ক্লাইটি হেসকেথের পিছু পিছু পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে উঠিয়া আসিলেন। তাঁহাকে হঠাৎ এমন নিভৃতে ডাকিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এযাবৎ হেসকেথের ব্যবহারে তাঁহার মনে এ ভাব কখনও উদিত হয় নাই যে হেসকেথ তাঁহার প্রণয়প্রার্থী। অবশ্য হেসকেথও কখন সে উচ্চভাব হৃদয়ে পোষণ করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য, বিষয় সম্পত্তি হস্তগত করা। ক্লাইটিকে ভালবাসা নহে।

ক্লাইটি নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া হেসকেথের বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলেন। হেসকেথ বলিতে লাগিলেন,—

"মিস্ ব্রামলে, বহুদিন যাবৎ আমার আচার ব্যবহার দেখে আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পেরেছেন বোধ হয়, আমি আপনাকে কত ভালবাসি। এতদিন মুখে যে কথা প্রকাশ করতে পারি নাই, আজ প্রতিজ্ঞা করেছি, সে বিষয় আপনাকে জানাবোই জানাবো। আপনি আমার স্ত্রী হতে সম্মত আছেন কি? জানি আমার পক্ষে এ উচ্চ অভিলাষ মাত্র; আমার দুঃসাহস আপনি ক্ষমা করবেন। আপনি যদি এই বিশাল ধনসম্পত্তির অধিকারিণী

না হয়ে সামান্য কৃষকবালাও হতেন, তাহলেও আমি আপনার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করতাম। আমি আপনাকেই চাই, আপনার ধনরত্নের কণামাত্রেরও প্রার্থী নহি।"

এ কথা শুনিয়া ক্লাইটি বিস্মিতবদনে হেসকেথের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মৌনতা সম্মতির পূর্ব্বলক্ষণ জ্ঞানে উৎসাহিত হইয়া হেসকেথ আরও আবেগভরে বলিতে লাগিলেন,—

"সামাজিক হিসাবেও আপনি আমার অপেক্ষা অনেক উচ্চে। আমি সামান্য কারখানার মালিক মাত্র, তবে আমার জীবন, হৃদয়ভরা ভালবাসা, সব আপনার চরণতলে উৎসর্গ করতে এসেছি। আপনি কি বলেন? এ দীনের প্রতি কি সদয় হবেন না? আপনার উত্তরের উপর এখন আমার জীবনের সুখ শান্তি সব নির্ভর করছে।"

ক্লাইটি আর নীরব থাকা উচিত নহে ভাবিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,— আমি বড়ই দুঃখিত। আমি জানতাম না—আমি আশা করি নি যে—"

"তাহলে আমার প্রস্তাবে আপনি অসম্মত হচ্ছেন?"

'হাঁ; এ ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই।"

"তবে কি আপনার আশা ভরসা আমাকে একেবারে ত্যাগ করতে হবে? দুদিন পরেও কি আমার বাসনা পূর্ণ হবে না?"

"না, তা হতে পারে না। আমি শেষ কথাই বলে দিয়েছি।"

"তবে, একটা অনুরোধ আমার রাখবেন। আমাকে ভালবাসতে না পারেন, বন্ধু বলেও জ্ঞান করবেন। তবে বিদায়—এখন আসি!"

"নিশ্চয়, আমরা আজীবন বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ থাকবো।"

ক্লাইটি সে ঘর ত্যাগ করিয়া ভোজঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই, হেসকেথ বাড়ী ছাড়িয়া রাস্তায় উপস্থিত হইয়াছেন।

গাড়ীর ভিতর বসিয়া তিনি ক্লাইটির বিষয় ভাবিতে লাগিলেন,—তাঁহার মুখ বিমর্ষ, অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিবাহপ্রস্তাব গ্রাহ্য না হইলে কেহই সুখী হন না। তদ্ব্যতীত হেসকেথের নৈরাশ্যের ও দুঃখের বিশেষ কারণও ছিল। তিনি বুঝিলেন, ক্লাইটির কথার আর নড়চড় হইবে না। তাঁহার স্বামীরূপে ব্রামলেতে আধিপত্য করা, তাঁহার ভাগ্যে বিধাতা লেখেন নাই। এত চেষ্টার

পর সামান্য রমণী শেষে তাঁহার বাসনাপূর্ণের পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল—ইহা অসহ্য !

নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তিনি বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু ঘুম আর আসে না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ হইল না! ব্রামলে সম্পত্তি তাঁহার করতলগত হইবার সব আশাই নির্ম্মূল হইয়া গেল। ক্লাইটি যেরূপ সুস্থ ও সবল, তাহাতে তাহার শীঘ্র মৃত্যু নিশ্চয়ই ঘটিবে না। এই কারখানার কাজ করিয়া সারাজীবন দুঃখে কষ্টে তাঁহাকে কাটাইতে হইবে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিষ্পীড়িত হইতে হইবে !

পরদিম প্রাতে ভগ্নীদ্বয় নিজেদের বাড়ীতে বসিয়া গতরাত্রের ভোজের বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। ক্লাইটি কিন্তু হেসকেথের বিবাহ প্রস্তাবের কথা মলিকে কিছু বলিলেন না। তিনি ভাবিলেন, একেইত মলি হেসকেথকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না; তার উপর একথা তাহাকে জানাইলে তাহার ঘৃণার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইবে। এমন সময় মিঃ ষ্ট্যাণ্টন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—

"অসময়ে আপনাদের বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না। একটা বিশেষ খবর আছে। জ্যাক হঠাৎ চলে গেছে। তার চিঠি এই মাত্র পেলাম।"

মলি জিজ্ঞসা করিল,—"বোধ হয় দুচার দিন কোথাও বেড়াতে গেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছিলো, একটু সুস্থ হয়ে আসুক।"

"না' তা নয়, সে একেবারে চলে গেছে, এর কারণ কিছু বুঝিতে পারলাম না। চিঠিতেও সে বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। আমার উপর হঠাৎ এত রাগই বা কেন হবে, 'কিছু বুঝিতে পারলাম না। সকালে কাজে আসে নাই। একজন লোক এসে তার চিঠিখানা আমাকে দিয়ে গেল। সে চলে গেল, আমার কাজ কি করে চলবে, তাত বুঝতে পারছি না।"

ক্লাইটি অনেক চেষ্টা করিয়া নিজেকে সংযত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার কথায় বা মুখভঙ্গীতে কিছুতেই তাঁহার ব্যগ্রতা বা চঞ্চলতা প্রকাশ পাইল না। 'মলি ক্লাইটির দিকে একবার বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া ষ্ট্যাণ্টনকে বলিল,—"তা, আর কি হবে। নতুন লোক দেখ। জ্যাক না হলে কি

আর কাজ চলবে না! আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে বোধ হয়। চলুন, কুকুরদের খাবার দেবো, দেখবেন।"

তাহারা চলিয়া গেলে, ক্লাইটি আরাম বোধ করিলেন। জ্যাক তাহলে আর ফিরিবে না! ইহার অর্থ কি? এর মধ্যে কি এমন গুরুতর ঘটনা ঘটল? যাহা হউক তিনি সে সব চিন্তা ত্যাগ করিয়া নিজের কার্য্যে মন দিলেন! কিন্তু নানা কার্য্যের মধ্যেও জ্যাকের কথা তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। কোথায়ই বা সে গেল? আর ফিরিয়া আসিবে না, একথাই বা পত্রে লিখিবার উদ্দেশ্য কি? তাঁহার মন ক্রমেই অশান্ত হইতে লাগিল। তিনি জোর করিয়া পুনর্ব্বার কাজে মন দিলেন।

* * * * * * *

প্রায় দিন পনর পরে একদিন হেসকেথ ক্লাইটিকে দেখিতে আসিলেন। ক্লাইটিও বন্ধুর ন্যায় তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিলেন। মলি বাড়ী ছিল না। ষ্ট্যাণ্টনের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল।

পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চাকর চা লইয়া আসিল। হেসকেথ উঠিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু ক্লাইটির বিশেষ অনুরোধে চা পান করিতে সম্মত হইলেন। ক্লাইটি আলমারি হইতে কেক ও বিস্কুট বাহির করিতে উঠিলেন। ইতিমধ্যে হেসকেথ ক্লাইটির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বুকপকেট হইতে একটা শিশি বাহির করিলেন এবং ক্লাইটির চায়ের পাত্রের উপর তাহা মুহূর্ত্তমাত্র ধরিয়া পুনর্ব্বার পকেটে রাখিলেন। ক্লাইটি ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারিলেন না। চা পান করিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিবার পর হেসকেথ চলিয়া গেলেন। ক্লাইটি মনের আনন্দে পিয়োনো বাজাইতে লাগিলেন। এমন সময় মলি প্রফুল্লবদনে হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

ক্লাইটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন বেশ আমোদে দিনটা কাটলো তো?"

"হাঁ বেশ স্ফুর্ত্তিতেই কেটেছে। খেলাধুলা করেই দিনটা গেছে। একটা সুসংবাদ—লেডী মারভিন তাঁর লণ্ডনের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে যাবেন বলেছেন।"

"অবশ্য তোমাকেও সঙ্গে লয়ে যাবার নিমন্ত্রণ করেছেন!"

"আমাকে একলা নয়, দুজনকেই যাবার কথা বলেছেন। হয় পত্রে

তোমাকে একথা শিঘ্র জানাবেন, না হয় নিজে এসেই নিমন্ত্রণ করে যাবেন। বেশ দিনকতক আমোদে কাটান যাবে। আজ আর কেউ এসেছিলো ?

"না, আর কেউ নয়। কেবল মিঃ কার্টন বেড়াতে এসেছিলেন।"

"ভগবানের দয়া, যে আমি বাড়ী ছিলাম না! লোকটাকে দেখলেই আমার রাগ হয়।"

দুই ভগ্নীতে চেয়ারে বসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব চিন্তায় নিমগ্ন। মলি লণ্ডনে যাইবার স্ফূর্ত্তিতে মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিল। হঠাৎ ক্লাইটির দিকে চাহিয়া দেখিল, ক্লাইটী চেয়ারের উপর ঢুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার চক্ষু মুদ্রিত মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"ক্লাইটি, এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে ?"

কোন উত্তর আসিল না। ক্লাইটি একটু নড়িলেনও না। মলি কিছুক্ষণ বিস্মিত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। এরূপ সময়ে ঘুমান ত তাঁহার কখনও অভ্যাস ছিল না। সে নিকটে গিয়া দিদির ঘাড় ধরিয়া ধীরে ধীরে নাড়া দিল। ক্লাইটির ঘুম আর ভাঙ্গিল না। মলি তখন ভয় পাইয়া তাহার নাম ধরিয়া চেঁচাইতে লাগিল। দু এক মিনিট পরে ক্লাইটির যেন একটু হুঁস হইল। তিনি চোক মেলিয়া মলির মুখের দিকে তাকাইলেন। মলি একটু আশ্বস্ত হইল।

"একি, এমন সময়, এরূপ গভীর নিদ্রা কেন ?"

ক্লাইটি ঈষৎ হাসিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ তখনও বিবর্ণ, চোখদুটি ভারী। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

"তোমার কি কোন অসুখ করেছে ?"

"না, না, ঘুম পেয়েছিলো। মাথাটা একটু ব্যথা করছে। শরীরটা বড় দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে।"

"এ দেখছি সব অম্বলের লক্ষণ! চা খাবার সময় খুব কেক খেয়ে ছিলে তো ?"

"না, না ওসব কিছু নয়। আলোগুলো সব নিভিয়ে দিয়েছ ? ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেছে।"

"কেন, আলো ত সব জ্বলছে! তোমার হলো কি ? ডাক্তারকে খবর দেই ?"

"কিছু করতে হবে না। ভয় নেই আমি এখনই ভাল হয়ে উঠবো একগ্লাস জল আনতে কাউকে বল।"

ক্লাইটি জলপান করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। মলি তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। পরদিন প্রাঃকালে ক্লাইটি একটু সুস্থ বোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর বড়ই দুর্ব্বল, মাথাটাও তখন সামান্য ব্যথা করিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

সাথী

(পূর্ব্বপ্রাশিতের পর)

(লেখক—শ্রীপরেশনাথ সরকার)

(১৩)

ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া নগেন দেখিল—কি সজীবতা। কত লোকজন গাড়ী ঘোড়া! সে একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল! মুক্ত আকাশ, সীমাহীন পথ, সঙ্কীর্ণতার ছায়াটুকও পর্য্যন্ত এখানে নাই!

একপা দু'পা করিয়া সে একটু চলিতে লাগিল। সহসা তাহাদের গ্রামের নিতাইর সঙ্গে দেখা হইল! নিতাই তাহাকে দেখিয়া যেন স্বর্গ হাতে পাইল। বলিল—বাঁচলেম দাদা! আমার বড় বিপদ!

নগেনকে নিতাই বড় ভালবাসিত। দুইজন একসঙ্গে কত মড়া পোড়াইয়াছে, কত রোগীর বাড়ী রাত জাগিয়া পাহারা দিয়াছে! চল্লিশ বছর পার হইয়া গেলেও নিতাই এখনও যুবকের মত খাটিতে পারে! অনেক দিন পরে নিতাইকে দেখিয়া নগেন স্থান কাল ভুলিয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল। কলিকাতার রাস্তা, লোক জড় হইয়া গেল, ভাবিল হয়ত একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়া গিয়াছে। লোক জড় হইয়া গিয়াছে দেখিয়া নিতাই বলিল—দাদা, চল গঙ্গার ধারে গিয়ে তোমাকে সব কথা বলি!

নগেন নিতাইএর সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে রৌদ্র, দুইজনে একটি বৃক্ষমূলে আসিয়া পা ছড়াইয়া বসিল! সম্মুখে গঙ্গা কেমন কুলু কুলু করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কত বড় বড় নৌকা এখানে

সেখানে ভাসিতেছে। ছোট ছোট ঢেউগুলি আসিয়া তাহাদের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িতেছে! আর কেমন মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া! নগেনের মনে পড়িল তাহার বড় সাধের পল্লীগ্রাম। সেইখানে নদীর ধারে নিতাইএর সাথে সে কতদিন বসিয়াছে!

নিতাই বলিল—আমি মাসখানেক এখানে এসেছি, দাদা! আমার মুনিবের ছোট মেয়ের অসুখ! তা সে ত ভাল হয়ে গেছে। বাড়ী যাব ঠিক ঠাক, এর মধ্যে কর্ত্তার বসন্ত দেখা দিল! আর কেমন ধারা এ দেশ গো? ডাকলে একটা লোক আসে না! বাসাভরা লোক দেখি, কেউ কাছে আসে না। এতলোক পথঘাটে চলাফেরা করে, ডাকলে ধেয়ে মারতে আসে! আচ্ছা দেশ এই কলকাতা!

নগেন কথাগুলি শুনিয়া যাইতে লাগিল, অন্য কেহ বক্তা হইলে হয়ত শ্রোতার দিকে চাহিয়া কথার মাঝখানে তাহার কথা বন্ধ করিতে হইত, কারণ শ্রোতা যেন সেদিকে কাণ দিতেছে এমন ভাবই দেখাইল না! কিন্তু বক্তা শ্রোতার সঙ্গে এই ভাবের কথা কহিয়া কহিয়া কত দিন কাটাইয়াছে; সে তাহাকে ভালরূপই জানিত!

নিতাই বলিল—তা দাদা, আজকার রাতটা তুমি যদি থাকত, চোখটা বুজে নিতে পারি। এই একটা মাসের মধ্যে একবার চক্ষু বুজতে পারিনি!

নগেন বলিল—চল!

নিতাই বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি এই ঘটিটায় একটু জল নেব! মা গঙ্গা, কর্ত্তাকে ভাল কয়ে দাও, তোমায় ভোগ দেব!

নিতাই ঘটিতে জল ভরিল, দুই তিন বার ঘটিটা মাথায় ঠেকাইল; নগেনের কপালেও একবার ঠেকাইয়া, মাথায় তুলিয়া লইল! তারপর দুইজনে পথ চলিতে লাগিল। একটা লোককে এত ছোট একটা ঘটি হাতে না লইয়া মাথায় করিয়া নিতে দেখিয়া, অনেক কৌতুহল পূর্ণ দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল, কিন্তু সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই—তাহারা আপন মনে দুইজন চলিতে লাগিল।

নিতাইর সঙ্গে নগেন আসিয়া যখন একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিল, তখন পাশের একটি ঘর হইতে আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছিল।

নিতাই বলিল—শুনেছ দাদা, কর্ত্তা কেমন কচ্ছেন!

দুইজনে আসিয়া শয্যার পাশে দাঁড়াইতেই, রোগী যেন একটু আনন্দিত

হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—কিরে নিতাই, তোর সাথী পেয়েছিস, তবে আর ভয় নেই!

নগেন আসিয়া সেই রোগ-ক্লিষ্ট দেহখানিতে নিজের হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

রোগী বলিলেন—বেঁচে থাক বাবা!

রোগী হরবল্লভবাবু, যিনি মিথ্যা করিয়া শ্যামাসুন্দরীর কলিকাতার বাড়ী খানি কিনিয়া লইয়াছেন।

নিতাই বলিল—কর্ত্তাবাবু, আপনার কলকাতার লোক চেয়ে আমার দেশের লোক ঢের ভাল!

হরবল্লভবাবু জল চাহিলেন, নগেন তাঁহার মুখের কাছে একগ্লাস জল ধরিল!

* * * * * *

তারপর এক মাস আহার নিদ্রা ভুলিয়া শুশ্রূষা দ্বারা নগেন ও নিতাই হরবল্লভ বাবুকে সুস্থ করিয়া তুলিল, দেশের মহামারীর সংবাদ পাইয়া হরবল্লভ বাবু নিতাইএর হাতে কিছু অর্থ দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিলেন। নিতাই সঙ্গীকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে নাই, সঙ্গীও বাড়ীতে যাইতে চাহে, হরবল্লভ বাবু তাহাকে মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। নগেন বলিয়া গিয়াছে—মাকে আপনি দেশে নিয়ে যাবেন!

পরদিন হরবল্লভবাবু আসিয়া শ্যামাসুন্দরীকে তাঁহার বাড়ী ফিরাইয়া দিলেন, আর তাহার চেয়ে অধিক মূল্যবান সংবাদ দিলেন—নগেন ভাল আছে, সে বাড়ী গিয়াছে। সত্যচরণ বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে চলিয়া গেলেন। শ্যামাসুন্দরী চক্ষু মুছিতে মুছিতে উপরে উঠিলেন। হরবল্লভ কাল একবার আসিবেন বলিয়া বিদায় হইলেন!

(১৪)

সন্ধ্যা বেলা আভা ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া দীপ জ্বালিল। অনেকক্ষণ টেবিলের ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বাক্স খুলিয়া নগেনের সবগুলি জামা বাহির করিয়া, একটি একটি করিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া ঝাড়িল! তারপর আবার ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিল! কাপড় গুলি সব কুচাইয়া বেশ করিয়া আলনায় সাজাইয়া রাখিল। আবার ভাঁজ করা জামাগুলি একটি একটি করিয়া আনিয়া আলনায় রাখিয়া দিল। নূতন

একখানি গামছা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। একখানা সাবান বাহির করিল। একশিশি তৈলের কর্ক খুলিয়া এক পার্শ্বে রাখিয়া দিল। আয়না চিরুণী পরিষ্কার করিয়া রাখিল! তারপর বালিশের নিচে লুকান নগেনের সেই মলিন ছিন্ন সার্টটি বাহির করিয়া আনিল। সেইটা হাতে লইয়া চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিল! দেয়ালের গা হইতে সেই দিনকার সেই ফটোখানি পাড়িয়া টেবিলের উপর রাখিল, এবং ঝুকিয়া পাড়িয়া অনিমেষ নয়নে সেইখানা দেখিতে লাগিল। সহসা দীপনিভাইয়া দিয়া জানালা খুলিয়া দিল। মুক্ত বাতায়ন পর্থে অপর্য্যাপ্ত জ্যোছনা আসিয়া ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল! আভা ধীরে ধীরে আসিয়া সেই বাতায়নে বসিয়া পড়িল।

বিধুমুখী এই সময় বাহির হইতে ডাকিলেন—আভা!

আভা তাড়াতাড়ি দীপ জ্বালিয়া, দুয়ার খুলিয়া দিল।

বিধুমুখী ঘরে প্রবেশ করিয়া চখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল নগেন যেন আসিয়াছে, তাই তার ব্যবহার্য্য সব জিনিষগুলি আভা এমন করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে।

আভা আসিয়া বিধুমুখীকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল—মা।

বিধুমুখী বলিলেন—কিমা!

কথাগুলি আবেগ কম্পিত, ধরা, ধরা!

আভা কোন কথা বলিল না; বিধুমুখী দেখিলেন আভা যাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহাকে এখন কুড়াইয়া পাইতে চায়; কিন্তু কোথায় নগেন।

তিনি আভার মাথাটা বুকের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন—তুই ত তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিস্ মা!

আভা শিহরিয়া উঠিল! সে ঘরের বাহির করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু নগেন যে আর আসিবে না, তাহাত সে ভাবে নাই! বলিল—তুমি তাকে তখন নিয়ে এলেনা কেন মা? এত তোমার অভিমান!

চির অভিমানী কন্যা, আজ মাতার অভিমানের উপর হাত দিয়া কথা বলিল। মাতা সে কথার উত্তরে শুধু দুইটি অশ্রু তটিনী তাহার উপর বহাইয়া দিলেন।

শ্যামাসুন্দরীর আর যে কেউ নাই। স্বামী তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না, তাই তাঁহাকে আনিয়া নিজের পরিবার ভুক্ত করিয়া রাখিয়া

ছেন। তিনি এত কথা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া পাওনা দারের বাড়ীতে আছেন—শুধু ভালবাসার খাতিরে। আর এক নগেন তাঁহার ভরসা স্থল, সেও অভিমানী কন্যার জন্যই নিরুদ্দেশ! কন্যা সেই অভিমানের বোঝা আজ মাতার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে চায়! মাতা বুঝিলেন কন্যার হৃদয়খানি যাতনায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সে কোন মতেই তাহা আর বুকে চাপিয়া রাখিতে পারে না! তিনি সমস্ত মাতৃ হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগ লইয়া কন্যাকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন—যেন বিশ্বপ্রকৃতিতে একটা প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, অনন্য উপায় বিহঙ্গিনী শাবককে বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া সেই ঝঞ্ঝার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চায়!

এমন সময় শ্যামাসুন্দরী ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন নগেনকে পাওয়া গেছে বোন।

স্বপ্নোত্থিতের মত বিধুমুখী চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—কই নগেন!

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—সে বাড়ী গেছে!

এত দিনের নিরুদ্ধ অভিমান, বিধুমুখীর প্রাণের উৎস মুখে বাহির হইয়া গেল না। এই শুভসংবাদটায় বরং তাঁহার মনে একটা কঠোর অভিমানের সৃষ্টি করিল! সেই সেদিন তিনিত তাহাকে এত করিয়া বারণ করিয়া ছিলেন, কন্যা তাহা শোনে নাই! আজ যেনতিনি তাহার প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন—সেই বেশ, এবাড়ী সে না এসেছে ভালই করেছে!

শ্যামাসুন্দরী দেখিলেন বিধুমুখী কন্যার উপর অভিমান করিয়া কথাটা বলিলেন! সেই হাস্যময়ী সরলা সুন্দরী বালিকা; স্নেহের একটা মুক্তপ্রস্রবণ প্রীতির ফুল্ল পারিজাত, এমন হইয়া গিয়াছে, ইহার উপরে কি অভিমান সাজে! তিনি বলিলেন—সেকি বোন, মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথাও তুমি বলনা!

বিধুমুখী কথা বলিলেন না। শ্যামাসুন্দরী দেখিলেন আভা মাতার হাত খানি ধরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! তিনি আসিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া লইয়া একটি চুম্বন করিয়া বলিলেন—রেখেদে ত মা এ কাগজ খানা

আভা কাগজ খানি হাতে লইয়া বলিল—এতে কি আছে জ্যাঠাইমা!

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—হরবল্লভ বাবু নগেনের বাড়ী ফিরাইয়া দিয়া গেছে! সেই দলিল পত্র!

বিধুমুখী বলিলেন—কি করে পেলে দিদি নগেনের সংবাদ ?

শ্যামাসুন্দরী—বলিলেন, নগেন তাঁর কাছে ছিল। তিনি তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন!

বিধুমুখী বলিলেন—এতদিন নগেনকে লুকায়ে রেখে তিনি আমাদের যে কষ্ট দিয়েছেন তার তুলনায় নগেনের বাড়ী ফিরায়ে দিয়ে বেশী সুখী করেছেন একথা ত মনে হয় না!

শ্যামসুন্দরী বলিলেন—তিনি লুকায়ে রাখেন নি বোন, তাঁর বসন্ত হয়েছিল নগেন তাঁকে শুশ্রূষা কচ্ছিল!

বিধুমুখী—সেকি বসন্তের রোগী নগেন ছুঁয়েছে!

শ্যামাসুন্দরী—এটা কিছু নূতন নয় বোন, ছেলে আমার ঐ করে বেড়ায়! দেশে মারীভয় হয়েছে তাই সেখানে চলে গেছে! আশীর্ব্বাদ কর দিদি, নগেন আমার ভাল থাকে সেখানে, আমার প্রাণটা অস্থির হয়ে পড়েছে। কাল আমি দেশে চলে যাব। বোকা ছেলে, কোথায় যাবে, কে যত্ন নেবে!

আভা সহসা বলিয়া ফেলিল—এই নাও জ্যোঠাইমা, তোমার দলিল পত্র! ও আমি রাখব কেন? একবার দেখা করে গেলেওত পারত।

বলিয়া মেজের উপর সেই দলিল ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। চন্দ্রা একমুখ হাসি লইয়া আসিয়া বলিল—কেমন বলিনি বউ, যাবে কোথায়! যাওয়া তত সহজ নয়! খাওয়া আসে কোথাথেকে? কই কোথায় সেই বাঁদরটা! ঝির মুখে যে মুহুর্ত্তে বাহির হইল নগেনকে পাওয়া গিয়াছে, তৎক্ষণাৎ চন্দ্রা ছুটিয়া আসিয়াছেন। নগেন যে কোথায় সে খবর জানিবার ধৈর্য্যও তাঁহার ছিলনা। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল যে বাঁদরটা কোথায়। কেহই তাহার কথার উত্তর দিলেন না! চন্দ্রা মুখ ভার করিয়া বলিলেন—রকম দেখ!

আভা বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল! শ্যামাসুন্দরী আসিয়া বলিলেন, চল খাবেনা মা?

আভা বলিল—আজ না খেলে হয় না জ্যাঠাই মা?

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—সেকি, অসুখ করবে যে!

(১০)

শ্যামাসুন্দরী পরদিন যাইতে চাহিলেও যাওয়া হইল না। সত্যচরণ সব

বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত সকলি শ্যামা-সুন্দরীর হাতে ফেলিয়া দিয়া তিনি বলিলেন—দেখ বউদি তোমার সেকালের হাতটা ঠিক আছে কিনা!

শ্যামাসুন্দরী বুঝিলেন, বলিলেন—বেশ ঠাকুরপো, আজ যেন রইলেম কিন্তু কাল যাবার বন্দোবস্ত করে দিও!

হরবল্লভ একদিনও দেরী করিতে রাজী হন নাই, তিনি সেইদিনই রওনা হইবেন, বলিয়া গিয়াছেন।

সত্যচরণ বলিলেন—সে আমি করে দেব। নগেন সেখানে আছে, বিশেষ দেশে এমন ব্যারাম দেখা দিয়েছে।

বিধুমুখী আসিয়া বলিলেন—সেই কথক ঠাকুরকে নিয়ে এলে হত না?

সত্যচরণ হাসিয়া বলিলেন—তাকে আসতে বলে দিয়েছি! আর পুরুত ঠাকুরকে বলে এসেছি, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করবেন!

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসিলেন; অপর্য্যাপ্ত আহার ও আপ্যায়নে কৃতার্থ হইয়া কেহ বাটী ফিরিলেন! আর অনেকে যে গৃহে ভাগবত পাঠ হইতেছিল সেই গৃহে বসিয়া সেই অমৃতোপম আখ্যান সমূহ শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইতে লাগিলেন।

কিশোরীবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সত্যচরণ আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন! ধ্রুব উপাখ্যান শেষ করিয়া কথক ঠাকুর বলিলেন—এখন কোন্ উপাখ্যান শুনিবেন?

কিশোরীবাবু বলিলেন—হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান বোধ হয় বেশ লাগিবে।

বিষয়টা ভাল। কথকঠাকুর আরম্ভ করিলেন। প্রথমে অতিমৃদু, তারপর ক্রমে উচ্চে তাঁহার মধুর কণ্ঠ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল! সেই স্বর্গের রাজসভায় কেমন অমূল্য মণিমুক্তা খচিত রত্ন সিংহাসনে দেবরাজ ইন্দ্র বসিয়া ছিলেন, কেমন সেই উর্ব্বসী মেনকা প্রমুখ স্বর্গ-বিদ্যাধরীগণ নৃত্যগীতে স্বর্গের সে রম্য সভাগৃহ মাতোয়ারা করিয়া তুলিতে অকস্মাৎ কি করিয়া কয়েকটি প্রেমাতুরা অপ্সরী তাল ভঙ্গ করিয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে কি কঠোর শাপে তাহাদের স্বর্গ চ্যুতি ঘটিল। কি করিয়া তাহারা মর্ত্তে বিশ্বামিত্রের তপোবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিল, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য বিশ্বামিত্র কেমন করিয়া ফাঁদ পাতিলেন; একদিন কি করিয়া একে একে অপ্সরাগণ লতাবিতানে বদ্ধ হইয়া গেল; এবং কেমন করিয়া হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া

দিলেন! তারপর বিশ্বামিত্র ক্রোধ কম্পিত কলেবরে রাজসভায় যাইয়া বিচার প্রার্থী হইলেন; হরিশ্চন্দ্র কেমন ভাবে সসাগরা পৃথিবী তাঁহাকে দান করিয়া ফেলিলেন, এবং দক্ষিণা সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিনি ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সেই ঋণপাশ মুক্ত হইতে রাজরাজ্যেশ্বর দীনহীন ভিখারীর বেশে পত্নী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতের হস্ত ধারণ করিয়া কাশিধামে চলিয়া গেলেন। সেইখানে ঋণপাশ বদ্ধ পতিকে ঋণ মুক্ত করিতে কেমন করিয়া সাধ্বী নিজেকে আত্ম বিক্রয় করিলেন! নিজে হরিশ্চন্দ্র শ্মশান রক্ষকের ক্রীত দাস হইয়া সেই ঋণপাশ মুক্ত হইলেন। তারপর এমন গভীর মেঘের পরে আবার কেমন মিলনের দিন প্রতিভাত হইয়া উঠিল! ধার্ম্মিক হরিশ্চন্দ্র কেমন করিয়া নবস্বর্গ লোকের অধিকারী হইলেন!

কথকঠাকুর চখের জলে ভিজিয়া কাহিনীটি অতি করুণভাবে বিবৃত করিলেন। শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত তন্ময় হইয়া শুনিয়া গেলেন!

সত্যচরণ শিহরিয়া উঠিলেন, তিনিত ঋণপাশে বদ্ধ। এ বন্ধন থাকিতে পৃথিবীতে শান্তি নাই। পরলোকে মুক্তি নাই। ইহকালে তাঁহার দুইই যাইতে বসিয়াছে। তিনি কি করিবেন! যেন চারিদিক হইতে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাহাকে টানিয়া লইতে চাহিতেছে—মুক্তি কোথায়, কি করিয়া তিনি এই ঋণপাশ হইতে মুক্ত হইবেন।

কথা সমাপ্ত হইয়া গেল, অভ্যাগত ব্যক্তিগণ একে একে চলিয়া গেলেন। তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বিধুমুখী আসিয়া বলিলেন—ওগো তুমি অমন ভাবে বসে রইলে যে। সত্যচরণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—আজকার কথা শুনেছ?

বিধুমুখী স্বামীর হৃদয় বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, বলিলেন যাই হয়, তুমি শীঘ্র একটা কিছু করে ফেল।

সত্যচরণ বলিলেন—কিন্তু তারপর?

বিধুমুখী—তারপর অদৃষ্টে যা আছে হবে, না হয় গাছের তলে বাসা বাঁধব।

সত্যচরণ বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন—সেই ছোটকালের মত একটা কথা আজ বলে বসলে যে! কিন্তু মেয়ের কি হবে?

বিধুমুখী বলিলেন—এইবার মেয়ের একটা সম্বন্ধ দেখ ; তারপর আর কি, দুইজন রইলাম, এতবড় একটা পৃথিবীতে দুটা প্রাণীর স্থান হবে না ?

সত্যচরণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—সত্যি সত্যিই কি তুমি ছোটকালের মত হয়ে উঠলে নাকি। তেমনি ধারা আব্দার, তেমনি কণ্ঠ, তেমনি ধারণা! তোমার মেয়ে বিয়ে দিতে টাকা লাগবে না ? যে ঋণ দাঁড়িয়ে গেছে, তাতেই সর্ব্বস্ব বিক্রয় করে শোধ দিতে পারি কিনা, তারপর মেয়ের বিয়ের টাকা !

বিধুমুখী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন—তবে না হয় তাই হক !

সত্যচরণ তাহার কথার ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—কি হবে ?

বিধুমুখী বলিলেন—কিরণের সঙ্গে আভার বিবাহ !

সত্যচরণ চুপ করিয়া রহিলেন !

বিধুমুখী বলিলেন—চুপ করিয়া আর ভাবিবার কিছুই নাই ! এতদিন মেয়ের শিক্ষার দরকার ছিল, মেয়ে অবিবাহিত রেখেছি। এখন বেশ শিক্ষা পেয়েছে। এইবার যে করে হক মেয়ে পার করতে ত হবে।

সত্যচরণ বলিলেন—কিন্তু সতিনের ঘরে মেয়ে দেব ?

বিধুমুখী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন—সেওত কথা বটে, কিন্তু কি উপায় করবে, আমিত কিছুই বুঝি না। দেখ তুমি যা হয় একটা কিছু করে ফেল !

এই সময় কিশোরীবাবু সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বিধুমুখী তাড়াতাড়ী সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

কিশোরীবাবু সত্যচরণের পাশে বসিয়া বলিলেন—একটা বিশেষ কথার দরকার আছে তাই আবার এসেছি ! আচ্ছা আপনি মেয়ের বিয়ে দিবেন না ?

সত্যচরণ বলিলেন—হাঁ এখন দিতে হবে বই কি ? গৌরীদান আমাদের দেশে একটা পদ্ধতি ছিল, মেয়ে ত সে ৮ বছরে পার করতে পারিনি, অবশ্য একমাত্র মেয়ে এত অল্প বয়সে অশিক্ষিত অবস্থায় পরের ঘর করতে পাঠিয়ে দেব, এই সব ভাবিয়া ! তারপর মেয়েকে যা পেরেছি রীতি মত শিক্ষা দিয়েছি। এখন উপযুক্ত পাত্র পেলেইত কন্যাদান করে ধন্য হয়ে যেতে পারি !

কিশোরীবাবু বলিলেন—আপনার মেয়েত বেশ বড় হয়েছে !

সত্যচরণ বলিলেন—হাঁ হয়েছে। যখন ৮ বছরে গৌরীদান করিনি তখন

শিক্ষিতা না হলে বিবাহ দিব না, এই আমার ইচ্ছা, আমার বিবেচনায় এইটাই ভাল। আর শাস্ত্রেও বলেছে, কন্যাকে শিক্ষিতা করিয়া স্বামী গৃহে প্রেরণ করিবে, উপযুক্ত পাত্র না পাইলে মেয়ে আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, তাতে কোন দোষ নাই। তথাপি অসৎ পাত্রে কন্যা অর্পণ কিম্বা অশিক্ষিত অবস্থায় কন্যা স্বামী গৃহে প্রেরণ করিবে না।

কিশোরীবাবু বলিলেন---সেত সত্য কথা। যদি আপনার কন্যাকে আমার—

সত্যচরণ বলিলেন—কিরণের স্ত্রী নাকি বর্ত্তমান। এমন অবস্থায় আপনি তাকে আবার কেন বিবাহ দিতে ইচ্ছুক—বুঝি না!

কিশোরীবাবু বলিলেন—সে অনেক কথা। ফল কথা আমি সে বধু ত্যাগ করিয়াছি। আমার বাড়ী ঘরে তার স্থান নেই। আমি এই মাসের ভিতর কিরণের সম্বন্ধ করিব। আপনার মেয়েকে বাড়ীর সবাইর পছন্দ হয়েছে। ছেলেরও তাই ইচ্ছা, এই রকম সংবাদ পাইলাম!

সত্যচরণ বলিলেন—কিরণ বেশ ছেলে, লেখা পড়ায় বেশ, আপত্তির কারণ কি থাকতে পারে, কেবল ঐ—

বাধা দিয়া কিশোরীবাবু হাসিয়া বলিলেন—আপনি দেখছি সেই দাশ রাজের কথা স্মরণ করায়ে দিচ্ছেন, এ যে সেই শান্তনু রাজার কথাটা। বেশ শুনুন, আমার ঐ একমাত্র ছেলে, সব সম্পত্তি আমি আমার বধু মাতার নামে লিখিয়া দিব! আপনার কিছুই দিতে হইবে না! বিয়ের খরচ তা না হয় —বুঝলেন কিনা!

কিশোরীবাবু হাসিতে লাগিলেন। সত্যচরণবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিশোরীবাবু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, আর কোন কথার দরকার নেই, আশীর্ব্বাদের একটা দিন ঠিক করে ফেলুন শীঘ্র শীঘ্র! বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

সত্যচরণ চুপ করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিলেন।

কিশোরীবাবু চলিয়া গেলে বিধুমুখী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন— এরি মধ্যে মতটা দিয়ে ফেল্লে?

সত্যচরণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তা-তা-তেমন—

বিধুমুখী বাধা দিয়া বলিলেন—আর বাকিই বা রাখলে কি! যাক্, মেয়ের যা অদৃষ্ট!

কথাটা শ্যামাসুন্দরী, চন্দ্রা, আভা, এবং বাড়ীর সবাইর কাণে উঠিল !

চন্দ্রা বলিলেন—কিরণ ত বেশ ছেলে, জামাইর মতনই দেখতে !

বিধুমুখী শ্যামাসুন্দরীকে বলিলেন—শুনলেত দিদি, এখন তুমিত বাড়ী যাচ্ছ ! মেয়ের আশীর্ব্বাদটার দিন ঠিক হলে জানাব— এস কিন্তু !

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—না যেয়ে কি করি বোন, নগেন আমার কেমন ভাবে কোথায় আছে। এক মাস হল তাকে দেখি না !

বিধুমুখী বলিলেন—দিদি নগেনকে এখানে আনলে হয় না ?

শ্যামাসুন্দরী কি বলিতে যাইতে ছিলেন, সহসা বাধা দিয়া বিধুমুখী বলিলেন—না এবাড়ী তার আসার কোন দরকার নেই !

শ্যামাসুন্দরী বিধুমুখীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন !

বিধুমুখী বলিলেন—এমন ভাবে যেখানে অপমানিত হওয়া !— আভা নিকটে দাড়াইয়া ছিল। তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল ! শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—এমনি করিয়া বুঝি মেয়ের মনে আঘাত দিতে হয় ?

বলিয়া তিনি আভার হাত খানি ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। আভা শ্যামাসুন্দরীকে বলিল— জ্যাঠাইমা, তুমি আজ যাবে ?

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—আবার আসব মা, নগেন একা সেখানে পড়ে আছে !

আভা বলিল—তুমি যাবে জ্যাঠাইমা, সেখানে নাকি মড়ক লেগেছে ! না জ্যাঠাইমা তুমি যেওনা !

শ্যামাসুন্দরী বুঝিলেন, আভা কি বলিতে চায় ; তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় খানি কেন আজ এমন উদ্বেলিত—জ্যাঠাইমাকে দেশে যাইতে বারণ করিতেছে, দেশে মড়ক লাগিয়াছে ; আর সেখানে যে নগেন রহিয়াছে, সে দিকে আভা এত উদাসীন, লক্ষ্যহীনের ন্যায় দেখাইতে চায় যেন সেকথা একবারও সে ভাবে না, তিনি বুঝিলেন আভা হৃদয়ের সঙ্গে কতটা যুদ্ধ করিতেছে ! তিনি ধীরে ধীরে আভাকে কোলে টানিয়া নিলেন ; আভা তাঁহার বুকে মাথা রাখিল !

ক্রমশঃ

কাল-বৈশাখী

[লেখক—শ্রীধরণীধর ঘোষাল]

টিপ, টিপ, টিপ! আজ পাঁচ দিন ধ'রে কেবলি বৃষ্টি হ'চ্ছে—টিপ, টিপ, টিপ! বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, সকাল হ'তে ফের সকাল পর্য্যন্ত সদাই জল ঝরছে—টিপ, টিপ, টিপ! কখনও হু হু ক'রে খানিকক্ষণ বেগে হ'য়ে, হাওয়াকে পাগল ক'রে, আকাশে মাদল বাজিয়ে, বিদ্যুতের ফুলঝুরি জ্বেলে আবার জল পড়ছে—টিপ, টিপ, টিপ! নাঃ, অস্থির ক'রে, তুলেছ! খালি জল—খালি জল! হাল্‌কা মেঘ দালান প্রায় ছুঁয়ে, নেচে নেচে চলে যাচ্ছে। ঝির, ঝির ক'রে জল পড়ছেই! ঘড়িটা না থাক্‌লে দিন রাত ঠাওরাবার যোটি নেই! কিছু ভাল লাগছে না! এ বাদলায় নিঃসঙ্গ হ'য়ে একলা চুপটি ক'রে বসে আছি, কেউ কোথাও নেই। আমাদের হাস্যমুখর আড্ডা বাদলায় আফিংখোর বুড়োর মত নেহাৎ ঝিমিয়ে আছে! হাওয়ায় খোলা পড়ে থাকা চাল ভাজার মত একেবারে মিইয়ে গেছে। কাঁল তবু নরেশ ও সতীশ দুজনা এসে এই একঘেয়ে দিনটাকে রকমারি সুরে জাগিয়ে তুলেছিল! আজ আর কেউ নেই! দেবতার সাধ্য সাধনা ক'রে, ঠাকুরের সিন্নি মেনে, ঝগড়া ক'রে কিছুতেই কোন রকমেই জল ছাড়াতে না পেরে, শেষে হতাশ হ'য়ে একলা জানালার ধারটিতে ব'সে আছি; একলা থাকা কোন দিন পোষায় না। যাকে হোক একজনকে ঘুমুবার আগে অবধি চাই চাই ই। কোন কাজ না থাক্‌লে, কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেও সময়টা কাটান—আমার কেমন একটা অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল! আজ কেউ নেই! এ ঘোর দুর্য্যোগে বাড়ীর বার হ'বার ও যো নাই! অথচ সময়ও কাটতে চায় না।

মোটে ৬টা! ঘড়িটাও কি বাদলার হাওয়ায় মেদা মেরে গেল! এতক্ষণ জেগে আছি—চা খেয়ে, ভাত খেয়ে, ঘুমিয়ে, ফের চা খেয়ে—এত ক'রে, তবু ৬টা! নাঃ! আজ সবাই আমার পেছু লেগেছে! আর রাত হ'লেই বা কি হ'বে। গিন্নি আজ ৪ দিন বাড়ী ছাড়া! তাঁর সঙ্গে যে দু'ঘণ্টা মধুর গণ্ডগোল ক'রে কাটাব, তারও উপায়টি নেই! যাক, আজ এমনি ক'রে বসে বসেই কাটাব!

ষ্টোভে কেটলিটা বসিয়ে দিয়ে চা তৈ'রী ক'রে খেয়ে আবার জানালার

ধারে রাস্তা পানে চেয়ে ব'সে রইলাম! সেই একঘেয়ে হতচ্ছাড়া টিপ, টিপ, টিপ—জল প'ড়ছেই!

এ ঘোর দুর্য্যোগে কে আর বাড়ী হ'তে বার হ'বে? রাস্তায় এ সময়ে গাড়ী ঘোড়া লোক জনের পা ফেলবার জায়গা থাকে না, আজ আর একটী পিঁপড়ের দেখা পাবার যো নেই! স্বার্থপরের দল! অন্য দিন এই জানালায় কত লোক উঁকি মেরে যায়, আজ কারো দেখাটি নেই! আচ্ছা, জলতো ছাড়ুক আগে। তারপর ব্যবস্থা কর্চ্ছি—দাঁড়াও। দেবো জানালা বন্ধ ক'রে! নাঃ! আমায় ক্ষেপিয়ে তুলিলে দেখছি!

ধোঁয়া, ধোয়া, পাঁশুটে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে! গুর, গুর, গুর ক'রে বাজ রেগে রেগে ডাকৃছে! বাজের রকম দেখে চপলা হেসে আকাশের বুকে গড়িয়ে পড়্ছে! বাতাস গাঁ, গাঁ, ক'রে ডেকে ব'য়ে যাচ্ছে! আবার জল আসছে! ঐযে মেঘটা ঝুলে পড়েছে—জলের ভারে! উঃ! কি বিষম জলই না হবে!

গুড়ুম, গুড়ুম, দুমদাম, বোঁ বোঁ।—জানালা কপাটে মাথা ঠুকে ঠুকে বাতাস বাজের খবর দ্বারে দ্বারে জানিয়ে আলগা রাশ ঘোড়ার মত ছুটে চললো। ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলকে চোখ ঝলসে যেতে লাগল। বাজের ডাকে কাণে তালা লাগবার মত হ'লো। বাপ! শেষে আকাশটা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে ছড়িয়ে পড়বে না কি! উঃ!

ব'সে ব'সে আকাশের আকেলটা ভাব্ছি, হঠাৎ কপাটটা ঝন ঝন শব্দে জোরে ঠেলে খুলে ফেলে প্রেতের মত একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে কাগজ পত্র উড়িয়ে সঙ্গে করে নিয়ে নিমিষের মধ্যে (ধরা পড়বার ভয়ে) সুমুখের জানালা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। লাফিয়ে চমকে উঠে কপাট বন্ধ কর্ত্তে যাচ্ছি, দেখি একটা লোক জলে ভিজতে ভিজতে আমাদের বারান্দার নীচেয় এসে দাঁড়াল। আঃ। বাঁচালে। তবু একটা মানুষের মুখ দেখতে পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি লোকটার কাছে গিয়ে তাকে ঘরে আসতে বল্লাম। বেচারা ভিজে শীতে কাঁপতে কাঁপতে এদিক ওদিক ডাকৃতে ডাকৃতে ঘরে এসে একটা বেঞ্চের উপর বসল!

(২)

লোকটাকে দেখবার কিছু ছিল না। তবু তাকে সাগ্রহে দেখছিলাম! বিষম বুড়ো—থুড়থুড়ে! গায়ের চামড়া লোল হ'য়ে গেছে! নাকটা ঠোঁটের

নীচে ঝুলে পড়েছে ! চোক দুটো কোটরে ঢেকেগেছে ! কুঁজো ! একগাছ লাঠি নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে বেঞ্চে এসে বসলো ! লোকটার সবই দেখতে খারাপ ; তবু তাকে বড় ভাল লাগছিলো। সারাটা দিন একলা থেকে এমন সময় একটা সজীব জীবকে দেখে বুকটা নেচে নেচে উঠছিলো ! আমি সাগ্রহে চোখ দিয়ে তাকে গিলে ফেলছিলাম। হঠাৎ তার কথায় চমক ভাঙলো ! "বাবু, একটা সিগ্রেট আছে ?" খুব ! খুব ! একটা কেন যতপার খাও ! আমার দেশলাই আর সিগারেটের প্যাকেটটা তার হাতে দিয়ে যে আনন্দ পেলাম বন্ধুদের জন্য সর্ব্বস্ব খরচ ক'রেও এতদিন সে আনন্দ পাই নি। বেচারা ভিজে কাপড়ে ঠক ঠক ক'রে শীতে কাঁপছিলো ! তাড়াতাড়ি কাপড় দিতে গেলাম, সে কিছুতেই নিলে না। সিগারেট ধরিয়ে নির্ব্বাকার ভাবে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো ! আমি অবাক হ'য়ে তার কাণ্ড দেখ্‌তে লাগলাম।

গুড়ুম্‌, গুড়ুম্‌, গুড়ুম্‌ ! উঃ ! কি ভয়ানক জলই হচ্ছে ! জানালা খুলে দেখলাম ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছে ! কিছু দেখাযাচ্ছে না ! জানালা বন্ধ ক'রে বুড়োর দিকে তাকিয়ে নীরবতা ভাঙবার জন্যে তার নাম কি, বাড়ী কোথা, এখানে কোথা থাকে, এমনি কতকগুলো প্রশ্ন করে যেতে লাগলাম ! আচ্ছা বুড়োতো ! সে একটারও উত্তর কল্লে না ! চুপটি করে বসে আপন মনে সিগারেট টানতে লাগলো ! বার বার প্রশ্ন করে শেষে বিরক্ত হ'য়ে গেলাম। ভাল এক আপদ জুটিয়েছিতো ! আমি কোথায় কথা কইবার জন্যে ডেকে আনলাম, আর ও কিনা নিশ্চিন্ত ভাবে, আপন মনে সিগারেট খেতে-লাগলো ! আপদটা যে গেলে বাঁচি গা ! আমার অমন মানুষে কাজ নেই, আমি একা বেশ ছিলাম !

মনে মনে মহাচোটে জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাতে চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু মনটা ফস্‌ ফস্‌ কর্ত্তে লাগলো। মাঝে, মাঝে, ফিরে, ফিরে লোকটার দিকে রোষকষায়িত চোখে তাকিয়ে, তার ব্যাপার খানা দেখতে লাগলাম। বাইরে তখন ঝম, ঝম ক'রে খুব ভয়ানক জল ! আর তেমনি কড়, কড় শব্দে বাজের গর্জ্জন ! দেখি, লোকটা সিগারেট হাতে করে হাঁ করে বাইরের পানে তাকিয়ে আছে। তার চাউনি দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো ! ভাল মুস্কিল ! শেষে কি বুড়ো কবির হাতে পর্ল্লাম নাকি ? থাকতে না পেরে তাকে বল্লাম, "কি মহাশয় ! আপনি কি একজন স্বভাব কবি

নাকি ?" লোকটা চমকে আমার পানে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। আপনাকে সামলে নিয়ে হেসে বল্লে, "বাবু খুব চটেছেন দেখছি।" আমি আরো চ'টে বল্লাম, "চটবনা ? কোন ভদ্রলোক এ রকম ব্যাপারে না চ'টে থাকৃতে পারে ? এই বাদলায় দুজনে অথচ একলা,—একটা কথা পর্য্যন্ত নেই !" লোকটা দাঁত শূন্য মাড়ীটা বার ক'রে হাঃ হাঃ ক'রে উচ্চ হাসি হেসে বল্লে, "বাবু বুঝি বিবাহিত ?" তার হাসির শব্দে আমি প্রাণে প্রাণে শিউরে উঠলাম ! কি ভয়ানক সে অট্টহাস্য। পিশাচের হাস কখনও শুনিনি, তবে এ হাসির কাছে বোধ হয় তার হাসিও ভয়ে থেমে যায় ! প্রাণপণে আপনাকে ঠিক রেখে জড়িত স্বরে বল্লাম, "বিবাহিত, তা হ'য়েছে কি ?" সে লোকটা আবার তেমনি ক'রে হেসে উঠলো ! আমি সজোরে সুমুখের বেঞ্চিটা চেপে ধরে আপনাকে খাড়া রাখলাম। হঠাৎ হাসি বন্ধ করে লোকটা সহজ স্বরে বল্লে, "বাবু একটা গল্প শুনবে ? শোন ! আমার তখন হাঁ কি না কিছু বলবার শক্তি ছিল না। জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে তার দিকে ভয় বিহ্বল দৃষ্টে চেয়ে রইলাম। সে কোন দিকে লক্ষ্য না করে বলে যেতে লাগলো ! "লাঠি খেলার তখন খুব চলন ! ভাল লেঠেলের খুব নাম, আমীর ওমরাহের চেয়েও বেশী খাতির ! ছোটলোক, ভদ্রলোক সবাই সাধ করে তখন লাঠি খেলা শিখতো ! এখনকার মত তখন ইতর ভদ্র জ্ঞান ছিল না। তাই জমিদারের ছেলে হ'লেও আমি লাঠি খেলা শিখে ছিলাম। শুধু শিখি নাই, অতি অল্প দিনের মধ্যে বড় বড় লেঠেল আমার কাছে হার মেনে যাওয়ায়, লোকের মুখে মুখে চারিদিকে ভাল লেঠেল বলে আমার নাম জাহির হয়ে পড়্লো। যেখানে যেতাম জমিদারের ছেলে বলে নয়, শ্রেষ্ঠ লেঠেল বলে খুব খাতির যত্ন পেতাম ! চারিদিকে আমার যশের জয় পতাকা উড়্‌ত লাগলো ! আনন্দে, গর্ব্বে আমার বুকের ছাতি দশ হাত উঁচু হ'য়ে উঠলো। কিন্তু হায় ! সেই লাঠি খেলাই আমার কাল হ'লো।

একদিন শুনলাম অমর পুরের জমিদার সেই মুলুকের শ্রেষ্ঠ লাঠিয়ালকে নিজের মেয়ে জহরাকে সমর্পণ করবে বলেছে। আর প্রতিযোগিতার জন্য একটা দিন ঠিক করেছেন। বন্ধু বান্ধবদের উৎসাহে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে নিজের নামটা পাঠিয়ে দিলাম। অমর পুরের জমিদারের সঙ্গে একটা পরগণা নিয়ে আমাদের তখন খুব মকোর্দ্দমা। সে মকোর্দ্দমায় আমাদেরই

সাক্ষী সাবুদ বেশী! আমরা জিতলে পাছে একটা বড় মহল হাত ছাড়া হয়, সেই ভয়ে মোবারক খাঁ যে ভেতরে ভেতরে একটা চাল চেলেছিল, তা তখন বুঝতে পারিনি! সে জানত আমি একজন ওস্তাদ খেলোওয়াড়! আমি নিশ্চয়ই তার মেয়েকে পাবার জন্যে না হোক, নিজের মান রক্ষা কর্ব্বার জন্যেও অন্ততঃ সে প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হব! যদি আমি জিততে পারি, তা হইলে মহলটা নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। আর যদিই হয়, তবে বেশী অপমানিত হ'তে হবে না। মেয়েকে যৌতুক দিয়েছি বলে অপমানটা ঢাকা দেওয়া চলবে। এই ভেবে শয়তান ঐরকম প্রচার ক'রেছিল। তার কথাই ঠিক হ'লো। আমি প্রতিযোগিতায় জিতলাম। জহরাকে পেলাম। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লো না। মহল বাবা জিতে নিলেন। আমি তাঁর শত্রুর মেয়েকে বিয়ে ক'রেছি বলে, আমায় ত্যজ্য পুত্র কর্লেন। শ্বশুরও ভয়ে আমায় জায়গা দিলেন না। জহরার হাত ধরে আমি পথে দাঁড়ালাম।

জহরাকে বুকে করে, দেশে দেশে ঘুরে ভিক্ষা ক'রে খেয়ে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে রইলাম। বাবার ভয়ে কেউ আমাদের ঠাঁই দিলে না। নিরাশ্রয় ভাবে জহরার হাত ধরে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। সে জমিদারের মেয়ে, আদর সোহাগের কোলে মানুষ হ'য়েছে, তার কষ্ট সহ হবে কেন? পাছে তার কষ্ট হয় বেশী খাটলে পাছে তার অসুখ করে বলে, তাকে কোন কাজ প্রায় কর্ত্তে দিতাম না। ভিক্ষা করে, কাঠ কেটে, যা' ক'রে হোক দুটি চাল ডাল এনে তাকে দিতাম। আমিই যা ক'রে হোক কাঁচা পাকা করে কোন রকমে ভাত তরকারী রেঁধে তাকে যত্ন করে খাওয়াতাম। কাঁদতাম আর ভাবতাম, "হায়! জমিদারের কন্যা, জমিদারের পুত্রবধূ তার আজ এই খাবার!" তারপর তাকে বুকে করে দিনটাকে কটিয়ে দিতাম। জহরাকে সেই দুঃখময় জীবনের সঙ্গী পেয়ে আমি হাতে চাঁদ পেয়েছিলাম। আমি যে জমিদারের ছেলে তা ভুলে যেতাম। মনে হ'তো আমরা দুটি দীন হীন পথের কাঙ্গাল। আমাদের কিছু ছিল না, তবু জহরাকে পেয়ে আমার কোন দিন অপর কিছু পাবার লোভ হয়নি। আমি সত্যিই আপনাকে পরম ভাগ্যবান মনে কর্ত্তাম।

ঘুরতে ঘুরতে শেষে আমরা এক জমিদারের কাছে আশ্রয় পেলাম। জমিদারের ছেলেকে লাঠি খেলা শেখাতে হবে। মাসে ৪০৲ টাকা পাব। বড় সুখেই আমাদের দিন কাটতে লাগলো। ফুটন্ত কলির মত জহরা তার

রূপ যৌবন দিয়ে আমার জীবনকে মধুময় করে রেখেছিল। তাকে দেখলে আমি সব ভুলে যেতাম। সত্যিই তাকে নিজের চেয়ে বেশী ভাল বেসেছিলাম।

আমার কষ্ট হয় দেখে জমিদারের ছেলে নিজে আমার বাড়ী এসে খেলা শিখে যেত। জহরাকে ছেড়ে যেতে হবে না দেখে আমি তাতে খুব রাজি ছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার আখ্‌ড়ায় গ্রামের আরো দু'চারজন ছেলে খেলা শিখ্‌তে লাগলো। আমাদের আয় প্রায় ৬০৲ টাকা হ'লো। একে একে জহরার গহনা গড়িয়ে দিতে লাগলাম। সে যখন সেই সব গহনা গায়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বসতো, তখন মনে হ'তো আমি যেন পরীর দেশে, পরীরাণীর পাশে বসে আছি। দেশ' কাল সব ভুলে যেতাম। তাকে বুকে ধরে চুম্বনে তার রক্তিম কপোলকে আরো রক্তিম করে দিতাম। তখন কি সুখেই ছিলাম। ওঃ!"

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একবার থামিল। আমি অবাক হ'য়ে তার গল্প শুনছিলাম। একটু দম নিয়ে আবার সে বলতে লাগলো। স্বরটা যেন একটু কাঁপা, একটু ভার ভার। "আমি যখন সাকরেৎদের শেখাতাম, জহরা তখন জানলা দিয়ে মুখ বাহির ক'রে অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখতো! কোন দিন বা তার পোষা বেড়ালটার সঙ্গে আমাদের খেলা নকল ক'রে একটা ছড়ি নিয়ে আগলবাড়ি খেলতো! কখন বা তার মধুর চঞ্চল হাসিটি শুনিতে পেতাম! ফিরে তার দিকে চেয়ে দেখতাম,—সে অবাক হ'য়ে চেয়ে আছে! রোজই সাজ গোজ ক'রে জানালার গরাদে ধরে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের খেলা দেখতো! এক একদিন মনে হ'তো বারণ করে দেব। কিন্তু তাকে দেখলে সব ভুলে যেতাম। বলতে পারতাম না।

সে দিন কি একটা কাজে—মনে নেই, জমিদারের অনুরোধে, নিতান্ত অনিচ্ছায় রায়পুরের কাছারীতে যেতে হ'লো। জহরাকে বুকে ধরে, চুমু খেয়ে, সাবধানে থাকতে উপদেশ দিয়ে, যতদূর হ'তে দেখা যায় ততদূর হ'তে জহরাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চ'লে গেলাম। যখন তাকে দেখতে পাওয়া গেল না, তখন কেঁদে ফেল্লাম। সেই আমাদের বিবাহের পর প্রথম ও শেষ বিচ্ছেদ। সে দিন রাত্রে ফিরতে পার্ব্ব না! কি ক'রে রাত কাটাব তাই ভাবতে লাগলাম। যখন কাছারী পৌঁছিছলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ ক'রে, কারো অনুরোধ না শুনে বাড়ী ফিরলাম। জহরাকে সমস্ত

বৈকাল দেখতে পাইনি। প্রাণটা যা কচ্ছিল, তা কে বুঝবে? জহরাকে চমকে দেব মনে ক'রে খুব জোরে চল্‌তে লাগলাম। কাল-বৈশাখী! পশ্চিম কোণে একখানা ঘোর কাল রঙের মেঘে উঠ্‌ছিলো! একটু একটু বাতাস বইতে লাগলো! দেখতে দেখতে মেঘটা সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেল্লে! আজকের মত সে দিনটা এমনি অন্ধকার হ'য়েছিলো। আমি তখন মাঠের মাঝে একা। আমাদের গাঁ তখনো ক্রোশ খানেক দূরে। ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো! সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গুরুগম্ভীর চীৎকার। মনে হ'লো আর বুঝি বাঁচলাম না। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতাম জহরাকে না দেখে মর্ব্ব না। সেই ভরসায় সেই ঝড় জল বাজ মাথায় করে, ভিজে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী এসে জহরাকে ডাকতে লাগলাম। কোন সাড়া পেলাম না। সে ঝড় জলে কে সাড়া দেবে? শুনতেই বা পাবে কি ক'রে? শেষে অগত্যা কপাটে ধাক্কা দিলাম। কপাট খুলে গেল। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে দেখি —কি দেখলাম। উঃ!—

ওঃ। বুড়োর চোক দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল। মাথার পাকা আলগা চুলগুলো সব খাড়া হ'য়ে উঠলো। আমি সভয়ে চেয়ে রইলাম। বুড়ো উঠে দাঁড়িয়ে, মাথার চুল টানতে টানতে বলতে লাগলো— "কি দেখলাম? যা কখন ভাবিনি, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, কল্পনাতেও যা কখনও আনতে পারতাম না, তাই দেখলাম! যার জন্য আমি আজ পথের ভিখারী, যার জন্য জমিদারের পুত্র হ'য়ে দু'মুটো অন্নের জন্য আমি আজ পরের গোলাম, যার জন্য আমি পিতামাতা, আমার সাধের প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করেছি, যাকে এতদিন দেবী বলে পূজা করে এসিছি, যার পায়ে আমার সমস্ত ইহকাল পরকাল ঢেলে দিয়েছি,—সেই জহরা, আমার বড় আদরের, সোহাগের প্রেমময়ী জহরা আর একজন যুবার সঙ্গে—প্রথমে আমি চোখ্‌কে বিশ্বাস কর্ত্তে পার্‌লাম না। মনে হ'লো বুঝি স্বপ্ন দেখছি! ভাল করে চোখ চেয়ে দেখলাম সত্যিই আমার—আমার জহরা সেই জমিদারের পুত্রের অঙ্কশায়িনী। ওঃ। চোখে সব ঘোলা ঠেকতে লাগলো। মাথা ঘুরতে লাগলো। দেওয়ালটা ধরে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম, কিছু ঠিক কর্ত্তে পার্‌লাম না। ফিরে চেয়ে দেখি, না আমার দেখা ভুল নয়। পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠা নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। মাথায় আগুন জলে উঠলো। বাইরে তখন কি হ'চ্ছিল জানি না। আমার মাথায় প্রলয়ের ডঙ্কা বেজে উঠেছিল! হত্যার

ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠলো।—দেওয়ালে টাঙ্গি ঝোলান ছিল, পেড়ে নিয়ে জমিদারের ছেলেটাকে এক চোপ বসালাম। মাথাটা ছিটকে আমার পায়ের তলায় এসে পড়ল। আমি হাঃ হাঃ ক'রে অট্টহাস্যে আনন্দ নেচে উঠলাম। আমি তখন প্রেত,—প্রেত,—প্রেত হয়েছিলাম। রক্ত গায়ে লেগে শয়তানী জেগে উঠল—চীৎকার করে কেঁদে উঠল। আমি কি কল্লাম? ক্ষমা?—হাঁ ক্ষমা কল্লাম। একেবারে ক্ষমা কল্লাম। টাঙ্গির আর এক চোপে তাকে জন্মের মত ক্ষমার হাতে সঁপে দিলেম। তারপর? সেই ঘোর অন্ধকারে, সেই ঝড় জলের মধ্যে আমি টাঙ্গি হাতে ক'রে নেচে বেড়িয়েছিলাম। তখন আমার কি আনন্দ। কি তৃপ্তি। কি সুখ। কি সুখ। হাঃ—হাঃ—হাঃ তারপর শুনবে? তারপর কি হ'য়েছিল জানি না। আজ এই ত্রিশ বছর এমনি বাদলা দিনে সেই দিনকার কথা মনে পড়ে—আর আনন্দে, তৃপ্তিতে আমার সমস্ত প্রাণটা নেচে উঠে। হাঃ—হাঃ—হাঃ।

ভয়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে, দুঃখে এত আত্মবিস্মৃত আমি আর কখনও হই নি। যখন চমক ভাঙ্গল, চেয়ে দেখি আমি একা। বৃদ্ধ কখন চলে গেছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত ৯টা। তখনো বাইরে সেই টিপ, টিপ, টিপ জল পড়ছেই।

একাল সেকাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

[১৬]

সৌভাগ্যগর্ব্বিতা শোভার মুখের দিকে তাকাইয়া নির্ম্মল অজ্ঞাত সমবেদনায় চমকিত হইল। বসন্তের হাস্যোজ্জ্বল, প্রকৃতির গায়ে শীতের কাল ছায়া পড়িয়াছে। দুদিনেই শোভার চির-সহাস্য মুখখানা মলিন হইয়া উঠিয়াছে। একটা অকারণ কুণ্ঠা ও অসম্ভাবিত লজ্জায় নির্ম্মলের মন নুইয়া পড়িতেছিল। অনুতপ্তের মত সে প্রশ্ন করিয়া বসিল—"আপনার কোন অসুখ করেছে কি?"

শোভা মৃদু হাসিল, শরতের চাঁদ যেন হাসিরাশি ছড়াইয়া দিল, নির্ম্মলের বুকের ভিতরটা পুলকে ভরিয়া উঠিল, বলিল—"এই খানিকক্ষণ আপনার কথাই ভাবছিলাম।"

"আমাদের কথাও আবার ভাবেন।" শোভা কোন রকমে চঞ্চল মনের সবিকার অবস্থাটাকে চাপিয়া গেল।

নির্ম্মল বলিল—"এই দেখুন, আপনার কেমন ধারণা।"

"মন্দ বৈ ভাল যাদের হতেই নেই, তাদের ধারণা সম্বন্ধে আপনাদের মত যে এমন তর হবে, তাতেত কোন কথাই নেই নির্ম্মলবাবু, আমি সত্যি বিস্মিত হচ্ছি যে, আপনারা আবার আমাদের কথাও ভাবেন! এর বাড়া ভাগ্যের কথা যে হতেই পারে না; মেয়ে মানুষ বিলের ফোটা ফুল, কেউ দেখবে না, খোজও নেবে না, জল কাদা মেখে নিজের মনে হেসে কেঁদে শুকিয়ে যাবে।"

নির্ম্মল অপ্রতিভ হইল, ভীত স্বরে বলিল—"অনুযোগে দুঃখিত হচ্ছি, পৃথিবীর মানুষ কিছু সবাই একরকম হয় না, কেউ যদি ওরকম ভাবে তার জন্য সবাইকে দোষ দেওয়া উচিত নয়, আর এও খাটি যে, যারা শিশু শিক্ষার ধার ধারে না; তাদের কেউই ওপথের পথিক হবে, লেখাপড়া জেনে কিন্তু অমন কথা ভাবতেই পারে না—"

শোভা বাধা দিল, শান্ত স্বরে বলিল—"আপনি ছাড়া।"

একপাশে বসিয়া শশাঙ্ক মনে মনে অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল, ধৈর্য্য বুঝি আর থাকে না, তীব্র কণ্ঠে বলিয়া বসিল—"এর ভেতর আমার কথা বলা হয়ত মানিয়েই উঠবে না, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, যার যতটুকু অধিকার—"

শোভা মাঝখানেই ধরিল, সপ্রগল্‌ভ হাসি হাসিয়া উত্তর করিল—"অধিকারের দাবীতেই আপনারা নিজেকে বড় করে নিচ্ছেন, মাতব্বর হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, কিন্তু একবারও ভাবেন কি, এ দাবি আপনাদের কিসের, কোথেকে এল, মানুষ সবাই, কোন্ অধিকারে আমাদের সে দাবী থেকে বঞ্চিত কচ্ছেন?

"বিধাতার বিধান।"

শোভা অবহেলার হাসি হাসিল, শ্লেষের স্বরেই বলিল—"পথ হারিয়ে বিপথে দাঁড়িয়ে বিধাতার ঘাড়ে ভার চাপিয়ে বসা, এক রকমে ভাল, কেন না, তার যত ঝুক্কি ঐ নিরীহ বেচারীর ওপর, কিন্তু ভূতাবিষ্টের মত অপ্রত্যক্ষ জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করা বুদ্ধিমানের পুষিয়ে ওঠে না।"

মুখের উপর শোভার এই কড়া কড়া জবাবে নির্ম্মল মনে মনে ভীত হইতেছিল, শশাঙ্কের প্রকৃতি তাহার অবিদিত ছিল না, তর্ক বাড়িয়া উঠিলে কি জানি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, চোখের ইঙ্গিতে শশাঙ্ককে বারণ করিয়া সে শোভাকে বলিল—"এ ত আপনার সত্যি কথা, বিধাতার এমন কোন বিধিই হতে পারে না, যে মানুষের কর্ম্মের ওপর কথা কয়।" যে যেমন কাজ করবে, দাবীও ঠিক তার মতই হবে!"

লজ্জায় ক্ষোভে শশাঙ্কের স্নায়ুশিরা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে নির্ম্মলের গায়ে ধাক্কা মারিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"থাম্ নির্ম্মল, আর যেন কাজের বড়াই কর্ত্তে যাস্নি, দু'পাতা ইংরাজি পড়ে মাথা দেখ্ছি বিগ্ড়ে উঠেছে, কাজ কাজ কাজ, কাজত এয়ার্কি, তাই নিয়ে আবার লম্বা বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে। পিতামাতা গুরুজনের বিরুদ্ধে কিছু বল্তে পাল্লেই একটা বাহাদুর হলুম, এই যাদের ধারণা, তারা আবার মানুষ, না তাদের কাজ আবার কাজ বলে গণ্য হতে পারে।"

নির্ম্মল মহা মুস্কিলে পড়িল, ঢাকা দিতে গিয়া যে আগুণ জ্বালাইয়া তুলিতে হইতেছে। শোভা তাহার চিন্তায় বাধা দিল, অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর করিল—"সে অনুযোগ কর্বারও কারুর অধিকার নেই, রুচিই যখন সবারই সমান হয় না, তখন তা নিয়ে আলোচনা করাই মুর্খতা।"

শশাঙ্ক একেবারে দমিয়া গেল, একটা স্ত্রীলোকের এত সাহস, এমন ঔদ্ধত্য, এই প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়া উত্তর করিতেও তাহার লজ্জা হইতেছিল, আত্মদমন করিয়া সে অন্য প্রসঙ্গ টানিয়া আনিল—"তুই বোস, আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি, আজকের ট্রেণেই যে যেতে হবে।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে চলিয়া গেল।

নির্ম্মল হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল, শোভার দিকে তাকাইয়া বলিল—"মাপ্ করবেন, ওর ঐ রকম স্বভাব, এখানে এসে আপনি লাঞ্ছিত হলেন, এর জন্য আমি অনুতপ্ত।"

মুহূর্ত্তে স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া শোভা হাসিয়া বলিল—"মাপ্ সে অবসর মত কল্লে'ও হতে পারবে, তার আগে, কিন্তু আপনাকে আমার একটা কাজ না কল্লে' ছাড়্ছি না।"

নির্ম্মল শোভার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, পরিপূর্ণ যৌবনের পুষ্পিত উপহার লইয়া তীব্র জ্যোতি যেন তাহাকে গ্রাস করিতে

আসিতেছে, শোভা স্মিত মুখে বলিল—"কাল আমারা বাগানে বেড়াতে যাব আপনাকেও ছাড়্‌ছি না কিন্তু।"

নির্ম্মল উত্তর করিতে পারিল না, একদিকে শশাঙ্ক, অন্য দিকে শোভা; তাহার দুই হাত ধরিয়া যেন জোড় করিয়া টানিতে লাগিল। কর্ত্তব্যের বল ভোগের দুর্ব্বলতার আকর্ষণে পিষ্ট হইতে লাগিল। শোভা আবার বলিল— "দাদাবাবু এখানে নেই, এলাহাবাদে কি কাজে গিয়েছেন, বাগানপার্টির এ আয়োজন আপনাকেই নির্ব্বাহ কর্ত্তে হবে।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মল অতিকষ্টে বলিল—"সতীশবাবু এখানে নেইত এখন থাকুকই না—"

"না না, সে কি করে হবে, আয়োজন যে সব হয়েও রয়েছে।'

"আমার যে আজই দেশে যাওয়ার কথা হচ্ছিল।" বলিয়া নির্ম্মল মুখ নীচু করিল।

শোভা পূর্ণ উৎসাহে জোর দিয়া বলিল—"সে কি হয়, বিশেষ করে আপনার জন্যই যে এ আয়োজন, দাদাবাবু আপনাকে বৃথাই সে কষ্টটা দিলেন, মনে কর্‌বেন না, আমিও তা ভুলে গেছি, আপনি কাল না গেলে ভারি জন্যে যান নি জেনে আমাদের কিন্তু ভারি কষ্ট হবে।"

শশাঙ্ক হাতের গোড়ায় আর কিছু দেখিতে পাইল না, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। শোভা পা বাড়াইল, চলিতে চলিতে বলিল—"বেলা তিনটায় আমাদের সঙ্গে মিস্‌বেন, আমরা আপনার অপেক্ষা কর্‌ব।" বলিয়াই সে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া চলিল।

[১৭]

"হাঁ না" করিতে না পারিয়া নির্ম্মল শোভার পেছনে পেছনে গাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, শশাঙ্ক তাহার অপেক্ষা করিতেছে, সে এদিক্ ওদিক্ না চাহিয়া চেয়ারে বসিয়া একটা খবরের কাগজ টানিয়া আনিয়া তাহাতে মন দিতে চেষ্টা করিল, শশাঙ্ক ভাব গতিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"গোছানত একরকম হয়ে গেল, একবার দেখে নে, আর কিছু নিতে হবে কি ?"

নির্ম্মল মাথা তুলিল না, বেশী করিয়া ঝুকিয়া পড়িয়া কাগজের আড়ালে আপনাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিল, শশাঙ্ক আবার বলিল—"এতগুলো চাকর বামন রেখে যাবার দরকার? কদ্দিনে ফির্‌বি, তার যখন কোন ঠিক নেই, তখন এদের জবাব দিয়েই চল!"

নির্ম্মল কাগজ হইতে চোখ না তুলিয়াই উত্তর করিল—"না না, জবাব কেন দিতে যাব, আছে থাকুকই না।"

শশাঙ্ক প্রতিবাদ করিল, বলিল—"বৃথা এই যে টাকাগুলো যাচ্ছে, এতে ইচ্ছা কল্লে কত কাজ কর্ত্তে পার্ত্তিস, তা কি ভেবে দেখেছিস!"

"বৃথা যাচ্ছে!"

"তা নয়ত কি, একটা মানুষ, একগোষ্ঠি চাকর বামুন, এমন কিছু বড় লোক আমরা নৈ।"

নির্ম্মল আবার চুপ করিল। শশাঙ্ক বলিল—"সে যা তোর ইচ্ছা কর, এদিকে কিন্তু সময়ও হয়ে এল, তৈরি হয়ে নে।"

সুর খাট করিয়া নির্ম্মল কম্পিত স্বরে বলিল—"আজ হয়ত আমার যাওয়াই হচ্ছে না।"

"সে কি?"

"তুমি যাও, মাকে ব'ল আমি দুদিন পরেই যাচ্ছি,।"

"হেয়ালী রাখ, খুলে বল দিকি, এরই মধ্যে আজকে যেতে পারবি না, এমন কি কারণ ঘট্‌ল।"

"হাতে একটা শক্ত কেস রয়েছে।" নির্ম্মল থামিল, সত্য কথাটা বলিতে না পারিয়া মনে মনে সে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল।

শশাঙ্ক গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"এর ও'পর অবশ্য কথা কইতে নেই, এক জনের জীবনমরণ নিয়েত খেলা করা চলে না।"

দুই জনই নীরব হইল, ঘণ্টাখানেক আগে আকাশের গায়ে তারা ফুটিয়া উঠিয়া ছিল, বাতায়ন গলাইয়া রাত্রির জ্যোৎস্না মেঝেতে লোটাইয়া পড়িতেছে, চাকর চা আনিয়া দিল, নির্ম্মল যেন জাগিয়া উঠিল, সহসা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল,—"আমি না গেলে মা কি বড় কাতুর হবেন রে—?"

"তা কেন?" বলিয়া শশাঙ্ক নির্ম্মলের হাত ধরিল, বলিল—"মাত কাতর হবেন, আর একটা মানুষ যে মরতে বসেছে।"

নির্ম্মলের পীঠে যেন ঘা কতক চাবুক পড়িল, শশাঙ্ক বলিল—"বিমলাকে মেরে ফেল না নির্ম্মল, অমন মানুষ পৃথিবীতে বড় দেখা যায় না, হাতের লক্ষ্মী অবহেলায় হারিও না।"

নির্ম্মল বোকার মত চাহিয়া রহিল, শোভার আগ্রহপরিপূর্ণ প্রার্থনা তাহার মনের কোণে উঁকি দিতেছিল, বলিল—"আমারই বা এমন কি অপরাধ?"

"অপরাধ কার কত হয়েছে, তা আমি জানিওনি, জান্তে চাইওনি, হয়ত একদিনের জন্য তারও কোন অন্যায় হতে পারে; তাকেও অপরাধ বলে ধরাই চলে না, কারণ ভুল ভ্রান্তি নেই, এমন লোকই দেখ্তে পাওয়া যায় না, যা তোমার আমার নিত্য হচ্ছে, স্ত্রীলোকের পক্ষে—"

নির্ম্মল আর পারিল না, ব্যস্ত ভাবে বলিল—"থাম থাম।" ভাবিতে লাগিল, ভুলভ্রান্তি, সত্যি কি তাই, না সে কথাত নির্ম্মল স্বীকার করিতে পারে না, শোভা কিছু বালিকা নহে, বোকাও নহে, তবে এমন ভুল তাহার, কেন হইবে, এ অনাদর, কেন? অবজ্ঞা নয়ত, স্ত্রীজনসুলভ লজ্জা, তাই কি, না না, তার জন্যে কেই বা এমন করিয়া স্বামীর মনে পীড়া দিতে যায়, দ্বিধায় উৎকণ্ঠায় নির্ম্মল চঞ্চল হইয়া উঠিল, দৃঢ় স্বরে বলিল—"ভুলভ্রান্তিত নয়, এ যে গর্ব্ব।"

শশাঙ্ক দৃঢ় হস্তে নির্ম্মলের হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যস্ত ভাবে বলিল—"ছিঃ, অমন কথা মুখে আনিস্ না, দেবতার ও'পর দোষ দিয়ে নিজের অপরাধ ঢাকৃতে গিয়ে তা যেন বাড়িয়ে নিস্‌নি।"

নির্ম্মল আত্‌কাইয়া উঠিল, খোঁচা সাম্‌লাইয়া লইয়াও অবিচলিত কণ্ঠে বলিল—"মাটির প্রতিমাকে দেবতা বলে পূজা করব, সে শক্তি আমার নেই, তার নীরব গর্ব্ব মাথা পেতে নেব, তেমন ধৈর্য্য যার আছে, তারাই তার আরাধনা করবে।"

"আবার—।" বলিয়া শশাঙ্ক নির্ম্মলের হাত ছুড়িয়া ফেলিল, বলিল—"এ তোমার দোষ নয় শশাঙ্ক, এ যে শিক্ষার দোষ, এ শিক্ষাত চিটাচিনীর স্বাদ বোঝে না, মাকাল ফল হতে দৃষ্টি তুলে আন্‌তেই যে ওদের মানা।"

নির্ম্মল বসিয়া পড়িল, ক্লেশের স্বর টানিয়া আনিয়া বলিল—"তবু ভাল, তুমি চিনেছ।"

"সে কথা তোর মানি, চিন্‌তে পেরেছি বলেইত সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে ছুটে এসেছি, এখন কাজের কথা বব, আজ কি যাওয়া হতেই পারে না রে?"

"না"—বলিয়া নির্ম্মল নীরব হইল, শশাঙ্ক বলিল—"হলে ছিল ভাল, এক একটা দিনে যে তাদের এক বছরের আয়ু শেষ হচ্ছে।"

নির্ম্মল বাহিরের জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া ছিল, উত্তর করিল না, একটা শ্বাসও টানিল না, শশাঙ্ক আবার বলিল—"বিমলার জন্যেই যত ভাবনা, তার

অবস্থা দেখে তোর মাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, আস্‌বার আগে যে সে কথাই বার বার করে বলে দিলেন।"

"মা আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, সত্যি রে শশাঙ্ক ?"

"সত্যি নাত মিথ্যে; আর বিমল, সেত ভারি বোঝা মনের কোণে চেপে-রাখ্‌তে গিয়ে অন্তর্জ্জালায় শুকিয়ে উঠেছে "

নির্ম্মল আর পারিল না, শশাঙ্কের হাতখানা হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া চোখের তারা কপালে তুলিয়া অস্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"শশাঙ্ক খাটি করে বল, বিমল আমার কথা ভাবে ?"

"না তা কেন, আর পাঁচ জনের কথা ভেবে, প্রাণে মারা যেতে বসেছে, দেবতার পায়ে বুক চিরে রক্ত দিয়ে সে আর এক জনের মঙ্গল কামনা কর্চ্ছে ?"

"বিমল !"

"হাঁ সেই, যাকে তুমি দুটি চোখে দেখ্‌তে পার না।"

নির্ম্মল মনে মনে বলিল—"দেখ্‌তে পারি না, তাকে দেখ্‌বার জন্যে প্রাণ যে আমার আজও খাবি খাচ্ছে, কিন্তু তাকে কি আমি আমার মনমত করে দেখ্‌তে পারব, বিমল তুমি কি আমায় ধরা দেবে না, বুক যে শুকিয়ে গেল, তোমাকে ভুলবার জন্যে যে আমি সাগরে ঝাপিয়ে পড়েছি, কৈ তবু ত তোমার সেই মুখখানা আমার বুক থেকে সরে যাচ্ছে না।"

শশাঙ্ক বলিল—"কি অত ভাবছিস, ভেবে দেখ, অসম্ভব না হয়ত আজকেই চল, আর কষ্ট দিসনি তারে, সতী স্ত্রীর মনে এমন অকারণে কষ্ট দিলে ভাল হবে না।"

নির্ম্মল সব কথাগুলি যেন শুনিতেই পাইল না, তাহার কাণের গোড়ায় যেন "আর তাকে কষ্ট দিস না" এ কটা কথা জটলা পাকাইয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল, সে শোভাকে ভুলিল, তাহার নিমন্ত্রণের কথা মনেও আনিল না, জোর করিয়া বলিল—"তাই চল, আমি আজকেই যাব, মিথ্যা দিয়ে আর যে সত্যকে ঢেকে রাখ্‌তে পার্চ্ছি না, ঐ কর্ত্তে কর্ত্তে যে আমার বুকের পাজর ভেঙ্গে বসে যাচ্ছে।"

ক্রমশঃ

মরিচিকা

[লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল*]

তখন আমার পূর্ণ যৌবন,তাহার পর তিরিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন আমি বৃদ্ধ, তথাপি সে কথা অদ্যাপিও কিছুতেই আমি আমার স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই ; তাহার পর এ জীবনে কত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছি, কত কঠিন আঘাতে হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে ছবি ঠিক সেই ভাবেই আজও পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। আজ সেই কথাই বলিব।

পূর্ণ যৌবনের নব আশা, নব উদ্যম লইয়া আজ প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমি বোম্বেমেলে বেনারস হইতে ফিরিতে ছিলাম; ট্রেন যখন মধুপুর ষ্টেসন ধীরে ধীরে অতিক্রম করিতেছিল. সেই সময় ঠিক রেল লাইনের পার্শ্বস্থিত একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যানে বেষ্টিত ক্ষুদ্র বাঙ্গলা আমার নয়ন-পথে পতিত হইল। সেই ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানের মধ্যে ক্ষুদ্র এক শীলা খণ্ডে বসিয়া, দেখিলাম এক আলুলায়িত কেশা বালিকা অঞ্চলে এক রাশ ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে। যৌবন সমাগম বার্ত্তা বালিকার সমস্ত অঙ্গে প্রচারিত হওয়ায় তাহার অপরূপ রূপে যেন উদ্যান হাসিতেছে। এই রমণীয় উদ্যানে, এই কুসুম পেলব বালিকার অপরূপ সৌন্দর্য্যে আমার নয়ন ভরিয়া গেল, আমি প্রাণ ভরিয়া সেই অপরূপ রূপ একবার ভালো করিয়া দেখিবার জন্য গাড়ীর গবাক্ষ দিয়া মুখ বাহির করিলাম, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বাঙ্গলার ভিতর হইতে কে উচ্চকণ্ঠে "নীহার" ,বলিয়া বালিকাকে আহ্বান করিল, বালিকা মধুর হাসিতে চারিদিক হাসাইয়া ছুটিয়া বাঙ্গলার ভিতর প্রবেশ করিল। বালিকার সেই ঢল ঢলে মুখ খানি, সেই মধুর হাসি সেই অপরূপ রূপ মুহূর্ত্তে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল। গাড়ী সেই বাঙ্গালা হইতে বহুদূর চলিয়া আসিলেও, বালিকার সেই মধুর নামটী, সেই হাসিমাখা মুখ খানি বার বার আমার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। আমার কত বার মনে হইল ইহারা কত সুখী, এই নির্জ্জন সুন্দর স্থানে ইহারা কি পবিত্র শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। সমস্ত পথ বালিকার চিন্তাই অতিবাহিত হইয়া গেল

কলিকাতায় ফিরিয়া নানা কার্য্যে মধুপুরের সেই সুন্দর বাঙ্গালার সুন্দর বালিকার কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিলাম, কারণ বহুকাল আর আমি কলিকাতা হইতে কোথাও বাহির হই নাই। প্রায় সাত বৎসর পরে ঘটনা ক্রমে পুনঃরায় বোম্বেমেলে পশ্চিম হইতে ফিরিতে ছিলাম। গাড়ী মধুপুর ষ্টেসন পরিত্যাগ করিবা মাত্র সেই সুন্দর বাঙ্গলার সুন্দর বালিকার কথা নব ভাবে আবার আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। বালিকাকে আর একবার কেবল মাত্র দেখিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, আমি গাড়ীর গবাক্ষ হইতে মুখ বাহির করিয়া সেই বাঙ্গলার দিকে কত আশায় চাহিতে লাগিলাম কিন্তু উদ্যানে একটী ক্ষুদ্র শিশু ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমি নিরাশ হইয়া ফিরিতে ছিলাম সেই সময় শিশু মধুর স্বরে, "মা—মা—এল গাড়ী—এল গাড়ী।" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। শিশুর চীৎকারে একটী যুবতী বাঙ্গলা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শিশুকে বক্ষে তুলিয়া আদরে তাহার গণ্ডে চুম্বন করিল। রমণীকে দেখিবা মাত্র আমার চিনিতে বিলম্ব হইল না, যে এই সেই নীহার। সাত বৎসর অতীত হইলেও তখন সে মুখখানি আমার নয়ন সম্মুখে ভাসিত ছিল। আমার নিকট কয়েকটা কমলালেবু ছিল, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার কয়েকটি ছুড়িয়া উদ্যানে নিক্ষেপ করিলাম, শিশু জননীর কোল হইতে নামিয়া ছুটিয়া আসিয়া লেবু কয়েকটী তুলিয়া লইল, আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি তাহাদের ভালো করিয়া দেখিতে না দেখিতে গাড়ী উদ্যান অতিক্রম করিয়া বহুদূর চলিয়া আসিল। আমি নীরবে বসিয়া সেই প্রথম যেদিন নীহারকে শীলা খণ্ডে বসিয়া মালা গাঁথিতে দেখিয়া ছিলাম সেই দিবসের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এই ঘটনার পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসর, এক দিবসের জন্যও আমি নীহারকে বিস্মৃত হইতে পারি নাই। তাহার সহিত একবার মাত্র সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সহিত দুই একটী কথা কহিবার সাধ বহুবার আমার হৃদয়ে উদিত হইয়াছে কিন্তু অপরিচিতা পরস্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ অসম্ভব জানিয়া হৃদয়ের ইচ্ছা হৃদয়ে দমন করিয়াছি। এই সময় সহসা একটা কার্য্য উপলক্ষে আমাকে দিল্লী যাইতে হইল,—তথায় কয়েক দিবসের মধ্যে কার্য্য শেষ করিয়া আমি দিল্লী প্যাসেঞ্জারে কলিকাতায় ফিরিতে ছিলাম। বেলা ১০ টার সময় গাড়ী মধুপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী মধুপুর ষ্টেসন হইতে ছাড়িবা মাত্র,—নীহারদের উদ্যানে কেহ আছে কিনা দেখিবার জন্য আমি দরজার নিকট যাইয়া গবাক্ষ দিয়া মুখ বাহির করিলাম। দেখিলাম বাঙ্গালার বারান্দায় একটী প্রৌঢ়া রমণী একটী ক্ষুদ্র শিশুকে কোলে করিয়া আদর করিতেছে,—তাহারই নিকটে বারান্দার পার্শ্বে রেলিং ধরিয়া একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া যুবতী একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে। সে পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া গাড়ীর দিকে চাহিল। নীহারকে চিনিতে আমার বিলম্ব হইল না। তাহার সেই শিশু যাহাকে দশ বৎসর পূর্ব্বে কোমলালেবু

দিয়াছিলাম, সে আজ সান্তানের জননী। মুহূর্ত্তে সেই বালিকা নীহারের সেই শালা খণ্ডে বসিয়া মালা গাঁথিবার কথা আমার হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিল। সেই তাহার ক্ষুদ্র শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার কথা মনে পড়িল। একদিন তাহাকে বালিকা দেখিয়া ছিলাম,—আজ সে দিদি মা। আর আমি সংসার সমুদ্র-বক্ষে ভেলার ন্যায় উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি। এই বালিকা, যাহাকে এক দিনের জন্য ভুলিতে পারি নাই,—তাহার সহিত একটীবার, একটী মাত্র কথা বলিবার জন্য আমার মন এতই চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, আমি বহু চেষ্টায়ও হৃদয় সমিত করিতে পারিলাম না।

ছয় মাস কাল হৃদয়ের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াও কিছুতেই হৃদয় স্থির করিতে না পারিয়া এক দিবস রাত্রের শেষ ট্রেনে মধুপুর যাত্রা করিলাম। এখন সে প্রৌঢ়া, এখন তাহার সহিত দুই একটা কথা কওয়া কঠিন নহে।

অতি প্রত্যুষে মধুপুর উপস্থিত হইয়া আমি বহুকষ্টে স্পন্দিত হৃদয়ে সেই বাঙ্গলার দ্বারের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ, আমি কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে দ্বার ঠেলিয়া উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিলাম। আজ ১৭ বৎসর যে বাঙ্গালায় আমার প্রাণ পড়িয়া রহিয়াছে; নিয়তি চক্রে এতদিন পরে আমি তথায় উপস্থিত হইলাম। উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে দেখিলাম নীহার তাহার ক্ষুদ্র নাতি'টীকে কোলে করিয়া বাঙ্গালার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সে আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বাঙ্গালার ভিতর অন্তর্হিতা হইল। পর মুহূর্ত্তেই একটী যুবক গৃহ হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কাহকে খুঁজিতেছেন?"

আমি যুবকের কথায় সহসা কি উত্তর দিব স্থির করিতে পারিলাম না, নীরবে মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে লাগিলাম। যুবক পুনঃরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি এখানে কিছু প্রয়োজন আছে?"

আমি কম্পিত হৃদয়ে কষ্টে বলিলাম, এখানে—একটী—একজন ছিলেন —তাঁহার নাম নীহার, আমি একবার তাঁহারই সহিত দেখা করিতে চাই।"

যুবক সম্ভবত আমার কথা ভালো বুঝিতে পারিলেন না, বিস্ফারিত নয়নে আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "নীহার? নীহার কে? নীহার নামে এখানে কেহ থাকেন নাতো।"

যুবকের বাক্যে আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। নীহার নাই—সে কি? অসম্ভব! আমি এই সতের বৎসর তাঁহাকে এই উদ্যানে দেখিয়া আসিতেছি। আমি আবেগে বলিলাম, "না—হইতেই পারে না, আমি তাহাকে এখানে বহুবার দেখিয়াছি। আমি কেবল একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব মাত্র!"

যুবক বোধ হয় আমার কথায় আমাকে উন্মাদ স্থির করিলেন, বলিলেন, 'মহাশয় আপনার ভুল হইয়াছে, আমরা এখানে সম্প্রতি আসিয়াছি। এখানে নীহার বলিয়া কেহ থাকেন না।'

'যুবক চলিয়া যাইতেছিলেন আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিলাম, "আজ এই মাত্র যাহাকে দেখিলাম উনি কে?"

"আমার মা।"

"সতের বৎসর পূর্ব্বে কি আপনার মা এখানে ছিলেন না?"

"না মহাশয়! আমরা পূর্ব্বে আর কখনও মধুপুরে আসি নাই।"

আমি স্তম্ভিত! নীরব! তবে নীহার কোথায়? আমি এতদিন তবে কাহাকে এখানে দেখিতেছি। আমি যুবককে পুনঃরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের আসিবার পূর্ব্বে এই বাঙ্গালাটায় কে ছিলেন বলিতে পারেন কি?"

"না মহাশয়!"

আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই যুবক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আমি কিয়ৎক্ষণ তথায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। এরূপ ভাবে অধিকক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া থাকা উচিত নয়, কাজেই শূন্য হৃদয়ে হতাশ চিত্তে উদ্যান হইতে বাহির হইলাম।

সেই প্রথম দিনের সেই নীহারের চঞ্চল নয়ন, মধুর হাসি আজিও আমার হৃদয়ে স্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে, আমার ভুল হইবে, অসম্ভব! নীহার নিশ্চয়ই এই সতের বৎসর এই উদ্যানে আছে, আমি তাহাকেই দেখিয়াছি, তাহাতে কোনই সন্দেহই থাকিতে পারে না। নিশ্চয়ই যুবক আমার কথা বুঝিতে পারে নাই। আমি নীহারের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া গৃহে ফিরিব না দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম। কি উপায়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি, রাস্তার এক পার্শ্বে দাঁড়ায়াইয়া সেই চিন্তাই করিতে ছিলাম, সেই সময় একটী প্রবীন ভদ্রলোক আমার পার্শ্ব দিয়া যাইতে ছিলেন, আমাকে এরূপভাবে এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহাকে খুঁজিতেছেন?"

তাঁহার কথায় আমার চমক ভাঙ্গিল, আমি একটু ইতঃস্তত করিয়া বলিলাম, "আগে মাস দুয়েক পূর্ব্বে এই বাঙ্গালায় যাঁহারা ছিলেন এখন তাঁহারা কোথায় তাহাই অনুসন্ধান করিতেছি।"

আমার কথায় ভদ্রলোকটী বলিলেন, "ঐ সম্মুখের দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন, উহারা এখানে বহুকাল হইতে দোকান করিতেছে।"

আমি দোকানে গিয়া দেখিলাম, দোকানদার অতিবৃদ্ধ, খাতাপত্র দেখিতেছে। আমি তাহাকে অতি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছয় মাস পূর্ব্বে এই বাঙ্গলাটায় নীহার নামে যে রমণী বাস করিতেন তিনি এক্ষণে কোথায় বলিতে পারেন?"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কই নীহার নামে এখানে তো কেউ বাস করিত না।"

"বাস করিতেন না! কিন্তু আমি ঐ বাঙ্গালায় একটি প্রৌঢ়া

রমণীকে একটী শিশু কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম।”

“ও তাই বলুন, তাঁহারা এখন কলিকাতায় গিয়েছেন, হাঁ তাঁহারা এই বাঙ্গলায় প্রায় দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন।”

“দুই বৎসর! আমি আজ প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে একটী যুবতীকে একটী বালিকার সহিত ওই উদ্যানে খেলাকরিতে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের কথা কি আপনার মনে আছে?”

বৃদ্ধ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“হাঁ—হাঁ ছিলেন বটে, তবে তাঁহারা কেবল মাত্র কয়েক মাস ওখানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে কোথায় আছে ঠিক বলিতে পারি না।”

বৃদ্ধের কথায় আমি আবেগে বলিলাম, “কিন্তু আমি ঐ খানেই নীহারকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাহার বয়স সতের বৎসরের অধিক নহে। আমার ভুল হওয়া অসম্ভব। তাহার সেই মধুর হাসি, তাহার সেই মালা গাঁথা আজও আমার নয়ন সম্মুখে ভাসিতেছে।”

আমি নীরব হইলে বৃদ্ধ বলিল,—“কি সর্ব্বনাশ আপনি সেই নীহারের সন্ধান করিতেছেন, আহা মেয়েটী বড় ভালোছিল। তাই বলুন। আপনি প্রথমে বলিলেন প্রৌঢ়া, পরে বলিলেন যুবতী, শেষে বলিতেছেন বালিকা। সেত আজ বহুদিনের কথা, কমপক্ষে সতেরো আঠারো বৎসর হবে, আহা মেয়ে নয়তো যেন একটা গোলাপ ফুল, আমার দোকানে কতদিন এসেছে। বাবু সে মেয়েটী মারা গিয়াছে, সবে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল, হঠাৎ কলেরায় একদিনে মরা গেল, তখন তার বয়স কত হবে, সতেরর বেশী কিছুতেই নয়।”

আমি যেদিন নীহারকে প্রথম সেই শীলাখণ্ডে বসিয়া মালা গাঁথিতে দেখিয়াছিলাম কুসুম রাশির সৌগন্ধের মত তাহার পবিত্র আত্মা তাহার কয়েক দিন পরেই সংসারের সকল দ্বন্দ্বকে জয় করিয়া আপন অভিষ্টে মিলিত হইয়াছে আর আমি আমার প্রেমমরিচিকা লইয়া এই সতের বৎসর——”

আমার মুখ হইতে আর বাক্য নিস্থত হইল না; বিশ্বসংসার সহসা যেন চক্ষের সম্মুখে একবারে অন্ধকারে নিমর্জ্জিত হইল। অজ্ঞানিত আঘাতে আমার হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

গল্পলহরী

৫ম বর্ষ, } অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ { ৮ম সংখ্যা

ফুলশয্যা

(১)

ইংরাজ রাজত্বের কেবল প্রারম্ভ,—সেই সময়ে দেবীপুর গ্রামের একটী ক্ষুদ্র কুটীরে একটী সামান্য বিবাহ উৎসব হইতেছিল। কুটির ক্ষুদ্র, তাহাও অর্দ্ধ ভগ্ন;—সেই হীন কুটীরের দীন দাওয়ায় লাল চেলির কাপড় ও সোলার টোপর মস্তকে একটী সুপুরুষ যুবক আলপনা যুক্ত পিঁড়িতে উপবিষ্ট। সম্মুখে বালুচরি সাড়ীতে আপাদ মস্তক আবরিতা একটী বালিকা;—উভয়ের হস্ত উভয়ের হস্তে সংস্থাপিত। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন; একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সজল নয়নে এক পার্শ্বে উপবিষ্টা রহিয়াছেন; কয়েকজন প্রতিবেশী অঙ্গনে চিড়া, দই, চিনি, মোণ্ডা লইয়া ব্যস্ত আছেন; দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, অতি দরিদ্রের গৃহ, অতি দরিদ্রের বিবাহ,—সমারোহ কিছুই নাই। সামান্য,—অতি সামান্য, আমোদ উৎসব যাহা সম্ভব, তাহাই এ বিবাহে হইতেছে। পল্লির এক প্রান্তে এই ক্ষুদ্র কুটীর,—গ্রামের বোধ হয় অধিকাংশ লোকই এ বিবাহ সংবাদ পান নাই।

সহসা উৎকট "রে রে" শব্দে চারিদিক আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে বিভীষিকাময় শরীর-শিহরিক শব্দ সে সময়ে কে না জানিতেন? তখন দেশ ডাকাতের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে ডাকাত;—জমিদারগণ সকলই ডাকাত। দরিদ্রের ধন, রমণীর সৌন্দর্য্য, জমিদারগণ অবাধে লুণ্ঠিত করিতেন, তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিবার ক্ষমতা কাহারই ছিল না। ভয়ঙ্কর "রে রে" শব্দ নিকটে শুনিয়া পুরোহিতের মুখ পাংশু বর্ণ হইল; বৃদ্ধা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন; বর ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিলেন; বালিকা তাহার অবগুণ্ঠণ ঈষৎ অপসারিত করিয়া, বিস্ফারিত নয়নে

বরের দিকে চাহিতে লাগিল। অঙ্গনস্থ প্রতিবেশিগণ চিড়া দই ফেলিয়া সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ;—তাহার পর কি হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। অন্ধকার মধ্য হইতে যেন সহসা অসংখ্য ভূত প্রেত ভয়াবহ শব্দ করিতে করিতে তথায় লম্ফে ঝম্ফে আসিয়া পড়িল! কেবলই "রে রে" শব্দ ;— কেবলই লাঠি সোঁটা সড়্‌কি ;—কেবলই মশাল! প্রতিবেশিগণ যে যাহার প্রাণ লইয়া, লাঠি প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া, যে যে দিকে পারিল, পলাইল। বৃদ্ধা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূপতিতা হইলেন। পুরোহিত কাঁপিতে কাঁপিতে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। বালিকা অস্ফুট চীৎকার করিয়া বরকে জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু ডাকাতগণ আসিয়া তাহাকে সবলে দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, বালিকাকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার বিকট চীৎকারে বালিকার আকুল আর্ত্তনাদ কেহ শুনিতে পাইল না।

যুবকের দেহে বলের অভাব ছিল না। তাহার দুই চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া এক জনের লাঠি কাড়িয়া লইয়া, দুই হস্তে লাঠি চালাইতে লাগিলেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় বালিকাকে এই সকল দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাহার পর কি হইল, তাহা তাঁহার আর জ্ঞান নাই। ডাকাতদিগের লাঠি মুসলধারে তাঁহার মস্তকে পড়িল ;—তিনি চারি দিকে এক অদ্ভুত পূর্ব্ব আলোক দেখিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

(২)

যখন তাঁহার জ্ঞান হইল, তখন তিনি দেখিলেন কুটির ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে। ডাকাতগণ কুটিরে আগুন দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোন দিকে জন মানবের চিহ্ন নাই। গ্রামবাসিগণ ডাকাতের ভয়ে যে যাহার গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া ভগবানকে ডাকিতেছে ; এই দরিদ্র হতভাগ্যদিগের সাহায্যে আসিতে কাহারও সাহস হয় নাই।

সহসা যুবকের কর্ণে যেন কাহার আর্ত্তনাদ প্রবেশ করিল ;—তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছিলেন। ডাকাতের লাঠিতে তাঁহার মস্তক ফাটিয়া গিয়াছিল,—রক্তে তাঁহার পরিধান বস্ত্র সিক্ত হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার দেহ থর থর কাঁপিতেছে।

আবার সেই অস্ফুট আর্ত্তনাদ! কোথা হইতে এই আর্ত্তনাদ আসিতেছে, যুবক প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। সহসা তাঁহার দৃষ্টি প্রজ্বলিত

কুটীরের দিকে পড়িল; তখন তিনি সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন, বৃদ্ধা সেই জ্বলন্ত কুটীরের দাওয়ার উপর বসিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। তিনি তথা হইতে বাহিরে আসিতে পারিতেছেন না! চারিদিক আগুন হা হা করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

মুহূর্ত্তে যুবক তাঁহার মস্তকের বেদনা,—তাঁহার দেহের যন্ত্রণা,—তাঁহার দুঃখ কষ্টের কথা সমস্তই বিস্মৃত হইলেন; তিনি উন্মাদের ন্যায় সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ছুটিলেন। নিমিষে তিনি বৃদ্ধাকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। তাঁহার কেশ দগ্ধ হইয়া গেল,—বস্ত্র ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—দেহের স্থানে স্থানে যেন ভস্মীভূত হইয়া গেল! তিনি অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়া অগ্নিকুণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া ছুটিয়া দূরে আসিলেন। প্রান্তরের ঘাসের উপর বৃদ্ধাকে শয়ন করাইয়া দিলেন,—বৃদ্ধা নিস্পন্দ, নিশ্চল, নীরব!

তাঁহারও আর দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি বসিয়া পড়িলেন,—তাহার পর কি হইল, তাহা তিনি জানেন না।

(৩)

যখন তাঁহার পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন তিনি দেখিলেন, সূর্য্যোদয় হইয়াছে। একটা শৃগাল তাঁহার গা শুঁকিতেছে। তিনি সভয়ে উঠিয়া বসিলেন; শৃগাল তাড়া পাইয়া নিকটস্থ জঙ্গলে অন্তর্দ্ধত হইল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে আরও কয়েকটা শৃগাল পলাইল! যুবক উঠিয়া বসিয়া ব্যাকুল ভাবে চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। কি হইয়াছে,—তিনি কোথায়,—তাহা তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মাথা যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে! তিনি দুই হস্তে মাথা ধরিয়া অবনত মস্তকে নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে রৌদ্র উঠিল! সেই রৌদ্রের উত্তাপে তাঁহার শরীরে যেন ধীরে ধীরে একটু বল আসিল,—তিনি মস্তক তুলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ভস্মীভূত কুটীরের উপর পতিত হইল। তখন বিদ্যুৎ বেগে গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল;—তখন সকলই তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার যে বিবাহ হইতেছিল! এই কি বিবাহের পরিণাম! বালিকা কোথায়! ক্রোধে, শোকে, মর্ম্মযাতনায়, তিনি উন্মত্ত প্রায় হইলেন। উঠিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু উঠিতে পারিলেন না;—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা। ডাকাতের লাঠিতে তাঁহার অস্থি মজ্জা যেন সমস্তই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে!

দুই চক্ষে দরবিগলিত ধারে নয়নাশ্রু বহিল। তিনি অতি কাতর, অতি গভীর

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হা ভগবান !" সহসা তাঁহার দৃষ্টি পার্শ্বস্থ বৃদ্ধার উপর পতিত হইল। তিনি সত্বর গিয়া তাঁহার কপালে হস্ত স্থাপন করিলেন। বৃদ্ধা নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া আছেন ;—তাঁহার দেহ আড়ষ্ট, চক্ষু মুদিত,—যুবকের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে বৃদ্ধা আর নাই ! তখন যুবক তাঁহার সকল কষ্ট বিস্মৃত হইলেন। বৃদ্ধার বুকের উপর পতিত হইয়া ব্যাকুলে কাঁদিয়া বলিলেন, "মা—মা,—আমায় ফেলে কোথায় গেলে মা ! আর কাকে আমি মা বলে ডাকৃব মা ! মা—মা "

তিনি কতকক্ষণ সেই জনশূন্য স্থানে বৃদ্ধার বুকের উপর পতিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার বুক ভাসাইয়া ছিলেন, তাহা তিনি জানেন না। সহসা কে বলিল, "বাবা সুবোধ, ওঠ,—আর কাঁদিয়া কি করিবে ! ভগবান অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কে খণ্ডায় ! এখন ওঠ,—উঠিয়া ইঁহার সৎকারের আয়োজন কর।"

যুবক মস্তক তুলিয়া দেখিলেন বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয়। তিনি কোন গতিকে গত রাত্রে পলাইয়া ডাকাতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। বেলা না হওয়া পর্য্যন্ত বাড়ীর বাহির হইতে সাহস করেন নাই। এক্ষণে বৃদ্ধা ও যুবকের ও বালিকার কি হইল, তাহাই জানিবার জন্য স্পন্দিত হৃদয়ে সন্তর্পণে বৃদ্ধার কুটীরের দিকে আসিয়া ছিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত জল ঝরিতেছিল। এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপারে কাহার না চক্ষে জল আইসে !

যুবক উঠিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু পারিলেন না ; তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। তিনি একরূপ জোর করিয়া নিজ জ্ঞান রক্ষা করিতেছিলেন, এই মাত্র ! প্রকৃতই ডাকাতের লাঠিতে তাঁহার মস্তক ও দেহ চুর্ণিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে যাতনা, সে বেদনা, তিনি অনুভব করিতে পারিতেছিলেন না। কাল যে তাঁহার বিবাহ হইতেছিল। আশৈশব যে তিনি জ্যোৎস্নাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন ! কাল যে তিনি কত সুখী হইবেন মনে করিয়া ছিলেন ! আজ ভগবান এ কি করিলেন ! তিনি কখনও তাহার পিতা মাতাকে দেখেন নাই ; বৃদ্ধাই তাহাকে আশৈশব সন্তানের ন্যায় লালনপালন করিয়া আসিতেছেন। তিনিই তাহার প্রকৃত মা ছিলেন। তাহাকে ছাড়া তিনি যে আর কোন মা জানেন না ! আজ তিনি সেই মা হারা হইয়াছেন ! এক রাত্রে তাহার এ কি হইল ! কে মুষলাঘাতে তাহার হৃদয় নির্ম্মম ভাবে ভাঙ্গিয়া দিল ! এ যাতনা যে আর তাহার সহ্য হয় না !

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সুবোধ,—ওঠ ;—ইঁহার সৎকারের আয়োজন কর। এখন ছেলের কাজ কর,—তুমি ভিন্ন ইঁহার আর সন্তান নাই।"

(৪)

সুবোধ উঠিলেন ; কষ্টে উঠিলেন। জোরে হৃদয়ে বল আনিলেন। বিবাহের রক্তাক্ত চেলির কাপড়ে চক্ষু জল মুছিলেন ; ধীরে ধীরে বলিলেন। "বামুন দাদা, ঠিক বলিয়াছেন, আমি অতি অপদার্থ। এখন বলুন,—কি করিব।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি এই খানে অপেক্ষা কর ; আমি দুই এক জন লোকের চেষ্টা দেখি।"

"যান" বলিয়া সুবোধ বৃদ্ধার পদপ্রান্তে বসিলেন ;—ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়া গেলেন।

জীবনে আর কাহারও কি এ অবস্থা ঘটিয়াছে ! মা গিয়াছেন,—জ্যোৎস্না গিয়াছে ! দুরাত্মাগণ না জানি তাহার উপর কি লোমহর্ষণ অত্যাচারই করিতেছে ! তবে তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন কেন ! ভগবান কি তাঁহাকে অসহনীয় যন্ত্রণা দিবার জন্যই এ সংসারে পাঠাইয়া ছিলেন ! অথবা তিনি তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের পাপের প্রতিফল পাইতেছেন ! আর এ দুঃখের—এ কলঙ্কের—এ যাতনার জীবনের প্রয়োজন কি ! বৃদ্ধাই তাঁহার মা ছিলেন ; বৃদ্ধার সৎকার করা,—তাঁহার শেষ কার্য্য করা,—তাঁহার কর্ত্তব্য নয় কি ! সুবোধ সবেগে বলিলেন, "হাঁ, তাহা করিব ;—তাহার পর জীবন আর রাখিব না। না, সহজে মরিব না। যে দুরাত্মা আমার বুক হইতে জ্যোৎস্নাকে লইয়াছে, তাহার বুকের রক্ত পান করিয়া তবে মরিব ;—তবে মরিব,—এখন নয় !"

যুবকের চক্ষু হইতে আগুন ছুটিল,—মস্তিষ্কের ভিতর সহস্র চিতা জ্বলিয়া উঠিল ; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, এখনই পাগল হইলে চলিবে না। কাজ আছে,—কাজ আছে,—তারপর—তারপর——"

তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ;—কয়েকটা শৃগাল পার্শ্বস্থ জঙ্গল হইতে উকি মারিতেছিল, তাঁহার অস্ফুট বিকট নিনাদে ভয় পাইয়া দূরে সরিয়া গেল। দেখিয়া সুবোধ অতি ক্ষোভে বলিলেন, "এইতো জীবন ! এইতো দেহ ! কুকুর শৃগালে খাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছে ! ছি—ধিক !"

তিনি আবার বসিলেন। তিনি কেন এখনও সম্পূর্ণ উন্মাদ হইতেছেন না,

তাহাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। চারিদিকে কি হইতেছে,—তাহা তাঁহার কিছু মাত্র জ্ঞান নাই। বেলা যে দুই প্রহর হইয়া গিয়াছে, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। নিকটে মনুষ্য পদ শব্দ শুনিয়া তিনি চমকিত হইয়া চাহিলেন ; দেখিলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কয়েক জন প্রতিবেশীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন।

প্রতিবেশীগণ অতি বিষণ্ণ বদনে আসিলেন ; কিন্তু কেহ তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত দেহ,—তাঁহার হৃদয়বিদীর্ণক ব্যাকুল উন্মাদ ভাব,—তাঁহার রক্তাক্ত বিস্ফারিত নয়ন,—তাঁহার উস্ক খুস্ক রক্ত জড়িত কেশ,—তাঁহার বিষণ্ণ বিকল ভাব দেখিয়া, সকলেরই চক্ষে জল আসিল, তাঁহারা অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। সুবোধের ন্যায় ভাল ছেলে গ্রামে আর কেহ ছিল না। সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। তাঁহার নীরব কষ্টে সকলের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা কোন কথা না কহিয়া, বৃদ্ধার দেহ স্কন্ধে লইয়া নদীর তীরাভিমুখে চলিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "সুবোধ বাবা, এস।"

সুবোধ কেবল মাত্র বলিলেম, "চলুন,—আমায় কাঁধে করিতে দিন।"

(৫)

হতভাগা সুবোধের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। দেবীপুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন ; সুবোধ তাঁহার একমাত্র পুত্র। এক দিনে এক রাত্রে বিসূচিকা রোগে সুবোধ পিতৃ মাতৃহীন হইয়াছিলেন। তখন গ্রামস্থ তর্কলঙ্কার মহাশয় ও তাঁহার ব্রাহ্মণী নিজেরা অতি দরিদ্র সত্ত্বেও সুবোধকে গৃহে আনিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। তর্কলঙ্কার মহাশয়ের একটী মাত্র কন্যা ছিল, পুত্রাদি ছিল না ; সুতরাং সুবোধই তাঁহার পুত্র স্থানীয় হইলেন।

তর্কলঙ্কার মহাশয়ের কন্যা বয়স্থা ও বিবাহিত হইয়াছিলেন। জামাতা কখন কদাচিত শ্বশুরালয়ে আসিতেন। দেশাচার অনুসারে তাঁহার আরও কয়েকটী পরিবার ছিল। যখন সুবোধের বয়স ৭।৮ বৎসর, তখন তর্কলঙ্কার মহাশয়ের কন্যার এক কন্যা জন্মিল, সেই কন্যাই জ্যোৎস্না। তাহার ন্যায় সুন্দরী সে প্রদেশে আর কেহ ছিল না।

কয়েক বৎসর হইল জ্যোৎস্নার জননীর মৃত্যু হইয়াছে। সেই পর্য্যন্ত তাহার পিতাও দেবীপুর গ্রামে আর পদার্পণ করেন নাই। তাহার পিতা

জীবিত আছেন কিনা, জ্যোৎস্না তাহাও জনে না। বৃদ্ধ তর্কলঙ্কার মহাশয়ের সামান্য কিছু ব্রহ্মত্তর ছিল, তাহাতেই তিনি ব্রাহ্মণী ও দুইটী দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকা লইয়া দুঃখ কষ্টে সংসার চালাইতেন। তাঁহার দৌহিত্রী আদরের জ্যোৎস্না ও তাঁহার পালিত পুত্র সুবোধ কখনও দুঃখের সংসারেও দুঃখ অনুভব করিতে পারে নাই। তর্কলঙ্কার মহাশয় যথাসাধ্য সুবোধকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, দেবীপুর গ্রাম মধ্যে সুবোধের ন্যায় আর কেহই সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিল না।

সুবোধ ও জ্যোৎস্না দুই জনে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় এক সঙ্গে লালিত পালিত হইয়াছে। একসঙ্গে খেলাধুলা, এক সঙ্গে লেখা পড়া, করিয়াছে। ছেলে-বেলা হইতে দুই জনে দুই জনকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে শিখিয়াছে। সেই ভ্রাতা ভগিনীর অতুলনীয় ভালবাসা, তাহাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গভীর প্রণয়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তাহাদের দুই জনের বিবাহ দিবেন, এ কথা গোপন রাখেন নাই। সুবোধ ও জ্যোৎস্না বাল্যকাল হইতেই জানে, তাহারা দুই জনে দুই জনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তাহারা এক বৃন্তের দুইটী ফুল,—একত্রে ফুটিয়া একত্রে শুখাইয়া যাইবে! কিন্তু নিয়তি যে তাহাদের জন্য সতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা তাহারা কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই। সংসারের দুঃখ কষ্ট ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জানিতেন। সুবোধ ও জ্যোস্না তাহার কিছুই জানিত না। তাহারা অতি সুখেই দুই জনের প্রণয়ে, দুই জনের অপরিমেয় ভালবাসায়, মগ্ন হইয়া, অতি সুখে জীবনাতিবাহিত করিতেছিল। আজ বিবাহ দিব, কাল বিবাহ দিব করিয়া, বৃদ্ধ তর্কলঙ্কার মহাশয়ের সুবোধ ও জ্যোস্নার বিবাহ দেওয়া হইল না। সহসা বাতশ্লেষ্ম বিকারে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যুকালে তিনি ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "তুমি সহমৃতা হইও না। সুবোধ ও জ্যোৎস্না রহিল। আমরা দুই জনে চলিয়া গেলে, তাহাদের দেখিবে কে? যত শীঘ্র পার তাহাদের বিবাহ দিও।"

তখন সুবোধ বিংশবর্ষীয় যুবক,—জ্যোৎস্না প্রায় পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী! কালাশৌচ অতীত হইবামাত্র দরিদ্রা ব্রাহ্মণী যে কোন উপায়ে সুবোধ ও জ্যোৎস্নার বিবাহ দিতেছিলেন, কিন্তু নিয়তি তাহার বিপরিত সংঘটন করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গেল! কি সর্ব্বনাশ ঘটিল, তাহা আমরা বলিয়াছি।

প্রতিবেশিগণ কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া যে কোন প্রকারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর সংকার কার্য্য সমাধা করিলেন। নীরবে বিনা চক্ষু জলে সুবোধ ব্রাহ্মণীর

মুখে অগ্নি সংযোগ করিয়া চিতার আগুণ জ্বালাইয়া দিলেন;—ধু ধু করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে সকলই ফুরাইয়া গেল। সতী সাবিত্রীর চিতার আগুণ স্তিমিত হইতে স্তিমিত হইয়া আসিল। ব্রাহ্মণগণ কলসি কলসি জল চিতায় ঢালিয়া, গ্রামে প্রত্যাগমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শ্মশানের এক পার্শ্বে দুই হস্তে মস্তক ধরিয়া, হেট মুণ্ডে নীরবে সুবোধ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি একটী কথাও কহেন নাই। তাঁহার দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া, কেহই তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহসী হন নাই। সকলেই নীরবে বিষণ্ণ চিত্তে চিতার পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। এক্ষণে কার্য্য শেষ করিয়া বলিলেন, "সুবোধ, বাবা, স্নান কর।"

"হুঁ" বলিয়া সুবোধ নীরবে নদীর জলে নামিলেন। কষ্টে, দারুণ যাতনায় মস্তকের রক্ত, দেহের রক্ত, ধৌত করিয়া স্নান করিয়া তীরে আসিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত বলিলেন, "বাবা, এই নূতন থান কাপড় উত্তরীয় আনিয়াছি; পরিতে হয়—পর।"

সুবোধ নীরবে পরিলেন; তৎপরে পরিত্যক্ত চেলির কাপড় খানি যত্নে তুলিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ও খানিকে নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া আইস।"

এবার সুবোধ সবেগে বলিলেন, "এ অনুরোধ করিবেন না। যত দিন প্রাণ আছে, তত দিন এ কাপড় আমার বুকে বুকে থাকিবে।"

কেহ কোন কথা কহিতে পারিলেন না। সকলেরই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাতরে মনে মনে বলিলেন, হাঁ—ভগবান!"

সুবোধ চেলির কাপড় খানি অতি যত্নে নিংড়াইয়া হস্তে লইলেন। শ্বেত নূতন বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া একবার ভস্মীভূত চিতার দিকে চাহিলেন; তৎপরে ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। তিনি কোথায় যাইবেন! জগতে তাঁহার যাইবার স্থান আর নাই! তর্কলঙ্কার মহাশয়ের ক্ষুদ্র কুটীর সহ তাঁহার জগতের সর্ব্বস্ব সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে! সংসারে আর তাঁহার কেহ নাই, কিছু নাই! তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত নাই! তিনি নির্ব্বন্ধু, নিঃগৃহ, নিঃসম্বল! জ্যোৎস্নার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদপিণ্ড উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে! তাঁহার চারি দিকে শূন্য—শূন্য ভিন্ন আর কিছু নাই!

বৃদ্ধ পুরোহিত বলিলেন, "এস বাবা।" আর হৃদয়াবেগ সম্বিত রহিল না, হৃদয়ের সহস্র দ্বার যেন উন্মুক্ত হইয়া গেল; সুবোধ বলিলেন, "কোথায় যাইব, বামুন দাদা! আমার যাইবার স্থান আর কোথায়!" আর সহ্য হইল না; সুবোধ ব্যাকুল ভাবে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রতিবেশীগণ বলিলেন, "কাঁদ—কাঁদ—কাঁদ বাবা, তা হলে অনেক উপসম পাবে!"

সুবোধ দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হাঁ—হাঁ, —আমায় একটু কাঁদিতে দিন; না হলে আমি পাগল,—আমি—উন্মাদ—হইয়া যাইব!"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বাবা, আমায় স্পর্শ করে বল যে তুমি আমার বাড়ী যাবে, —আর কোথাও যাবে না!"

সুবোধ কাতরে বলিলেন, "না—না, আর কোথও যাব না। আমার স্থান কোথায়!"

ব্রাহ্মণগণ চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। সুবোধ কাঁদিতে কাঁদিতে সেই জনশূন্য শ্মশানে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার কান্নার বিরাম নাই! জ্যোৎস্না কোথায়! মা কোথায়! তাঁহার হৃদয় অগ্নিশিখায় দ্রবীভূত হইয়া তাঁহার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইল।

কতক্ষণ তিনি কাঁদিলেন, তাহা তিনি জানেন না, ক্রমে ভয়াবহ শীতে তাঁহার দেহ থর থর কাঁপিতে লাগিল। তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল তিনি সেই শশ্মান ভূমে মূর্চ্ছিত হইলেন। পূর্ব্ব গগন হাসাইয়া চাঁদ উঠিল। চারিদিক কোমল জ্যেৎস্নায় হাসিল। কেহ কাহার জন্য কাঁদে না!

(৬)

বিবাহ হইতেছে, ইহার মধ্যে সহসা কি হইল, জ্যোৎস্না তাহা ভাল বুঝিতে পারিল না। এই মাত্র তাহার মনে হইল, যে ভয়াবহ কি একটা ঘটিল; সে বুঝিল, কে নিমিষে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল; সে চারিদিকে বিভীষিকাময় চীৎকার আর্ত্তনাদ শুনিল,—তাহার পর কে তাহাকে কোথায় বসাইল; সে যেন উর্দ্ধশ্বাসে কোথায় ছুটিল; ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞান যেন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে লাগিল; সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিল; তাহার পর কি হইল, তাহার আর কিছুই স্পষ্ট মনে নাই।

যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল, সে এক ডুলিতে বসিয়া আছে। হুঁ হুঁ শব্দে বেহারাগণ ডুলি লইয়া ছুটিতেছে। সঙ্গে দশ বিশ জন লোক

ছুটিয়া আসিতেছে। সকলই কি যেন কি বলিতে বলিতে ছুটিতেছে। তাহারা কি বলিতেছে, জ্যোৎস্না তাহা ভাল বুঝিতে পারিল না। সে একটু ডুলির কাপড় অপসারিত করিয়া উঁকি মারিল; চারিদিকে ঘোর অন্ধকার;—কিছুই দেখিবার উপায় নাই!

সে কি চীৎকার করিবে! চীৎকার করিলে কেহ কি তাহার সাহায্যে আসিবে! চীৎকারে আর্ত্তনাদে এই দুর্ব্বৃত্ত ডাকাতগণের তাহার উপর কি দয়ার উদ্রেক হইবে! যদি সে ডুলি হইতে লাফাইয়া পড়ে, তবে কি সে এই দুরাত্মাগণের হাত হইতে পালাইতে পারিবে! সুবোধ কি তাহাকে রক্ষা করিতে আসিতেছে না! ইহারা তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে! কে তাহার এত সুখের বিবাহের দিবসে তাহার এরূপ সর্ব্বনাশ সাধন করিল! তাহার দিদিমার কি হইল! সুবোধ কোথায়! এইরূপ শত সহস্র প্রশ্ন বিদ্যুৎ বেগে তাহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল! সে নিতান্ত বালিকা নহে,— তাহার যে চির জীবনের মত সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সে বেশ বুঝিল। তাহার ন্যায় সুন্দরী কন্যা বলে লইয়া যাওয়া, ডাকাতদিগের এই প্রথম নহে। সে সুন্দরী, তাহাই তাহার দিদিমা কতবার তাহার সম্মুখে এ ভয় প্রকাশ করিয়াছেন। তখন সে দিদিমার মিথ্যা ভয় ভাবিয়া মনে মনে কত হাসিয়াছে; কিন্তু আজ তাহার অদৃষ্টে সত্য সত্যই তাহাই ঘটিল। ডাকাতে লইয়া গেলে আর গৃহে ফিরিবার উপায় নাই,—আশা নাই! কোন গতিকে তাহাদের হস্ত হইতে পালাইলেও ডাকাতে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সে অস্পর্শীয় হইয়াছে,—আর তাহার কুলে ফিরিবার উপায় নাই! আর তাহার সুবোধকে পাইবার আশা নাই! মুহূর্ত্তে জ্যোৎস্না এ সমস্তই বুঝিল। কেন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া হাসি উদিত হইতে লাগিল, তাহা সে জানে না। আজ যে তাহার একটু আগে বিবাহ হইতেছিল!

কেন সে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল না, তাহা সে জানে না। কেন সে কাঁদিল না,—উচ্চ হাস্য করিল না,—কেন সে চীৎকার করিল না, আর্ত্তনাদ করিল না,—কেন সে ডুলি হইতে লাফাইয়া পড়িল না,—তাহা সে জানে না। তাহার অঙ্গ অবশ অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহার প্রাণ হৃদয় মন নিস্পন্দ হইয়া আসিয়াছিল! সে কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় ডুলির ভিতর বসিয়া রহিল। বেহারা ও লাঠিয়ালগণ হুঁ হুঁ শব্দ করিতে করিতে মাঠের ভিতর দিয়া ডুলি লইয়া ছুটিল!

(৭)

বেহারাগণ ডুলি এক স্থানে ধপাস্ করিয়া নামাইয়া রাখায়, জ্যোৎস্নার চৈতন্য হইল। সে কোথায় আসিয়াছে! সে সবলে ডুলির কাপড় টানিয়া দূরে ফেলিল। অসংখ্য মশালের আলোকে জ্যোৎস্নার চক্ষু ঝলসাইয়া গেল; সে কিছুই ভাল দেখিতে পাইল না। কাণে শুনিল, কে বিকট মত্ততা পূর্ণ অস্পষ্ট স্বরে বলিতেছে, "এই যে আমার সোনার চাঁদই বটে!" সে বুঝিল,—তথায় অনেক লোক উপস্থিত রহিয়াছে। সে একটা বৃহৎ অট্টালিকার বিস্তৃত অঙ্গন মধ্যে আসিয়াছে!

কিন্তু সে কিছুই ভাল দেখিতে পাইতেছিল না। তাহার চক্ষে সকলই যেন কুয়াশার ন্যায় দেখাইতেছিল। তাহার বুঝিবার দেখিবার ক্ষমতা যেন আর নাই। কে সবলে তাহার হস্ত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে ডুলি হইতে বাহির করিল;—সে নামিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকেই অস্পষ্ট অন্ধকার,—অস্ফুট শব্দ! সে কোথায়! তাহার সুবোধ কোথায়!

"তোমায় আমি হৃদয়ের মণি করে রাখ্‌ব," এই বলিয়া একটা লোক তাহার মুখ চুম্বন করিতে উদ্যত হইল। তখন জ্যোৎস্নার শিরায় শিরায় যেন সহস্র অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল,—সে ক্ষিপ্তা বাঘিনী হইল। সবলে সেই দুরাত্মাকে পদাঘাত করিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিল। লোকটা সুরাপানে টলিতেছিল, তাহার পদাঘাতে দূরে গিয়া ভূপতিত হইল, বলিল, "না বাবা, তেজ আছে! কিছু বল না বাবা. কিছু বল না! গোবরার মা, ওকে ঘরে নিয়ে যা!"

একটী স্ত্রীলোক আসিয়া জ্যোৎস্নার হাত ধরিয়া বলিল, "এস বাছা!" জ্যোৎস্না সবলে তাহার হাত সবলে ছাড়াইয়া লইয়া দূরে দাঁড়াইল। ক্রোধে, শোকে, অভিমানে, লজ্জায়, তাহার নিশ্বাস সবলে পড়িতেছিল। তাহার দেহ ফুলিয়া যেন দ্বিগুনিত হইয়াছিল। তাহার আজানুলম্বিত কৃষ্ণ কেশ স্ফীত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহার বিশাল নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। তাহার এই ভীমা ভৈরবী ভয়ঙ্করী ভাব দেখিয়া সকলেই ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল, ভীত ও বিস্মিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

জ্যোৎস্না একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। অন্ধকারে মশালের আলো,—একটা বড় বাড়ীর উঠান,—লম্বা লম্বা বাবরিকাটা বড় বড় লাঠি হাতে অনেক লাঠিয়াল,—আর একটী বৃদ্ধা কদাকার ডাইনীর ন্যায় স্ত্রীলোক!

দূরে এক মাতাল যুবক ভূমি হইতে উঠিবার চেষ্টা পাইতেছে! দুঃখে ঘৃণায় জ্যোৎস্না উন্মাদিনী প্রায় হইল। সে গর্জ্জিয়া বলিল, "কে আমায় এ রকম করিয়া এখানে আনিয়াছে, তাহাই আমি শুনিতে চাহি!" তাহার কথায় কেহ উত্তর দিতে সাহস করিল না। গোবরার মা আরও পশ্চাৎপদ হইল। ভূপতিত যুবক অন্ধকারে তাহাকে ভাল দেখিতে পাইতেছিল না। বলিল, "শুনবে চাঁদবদনি? তোমার পরম ভাগ্যি! তোমায় গোবিন্দপুরের জমিদার হরগোবিন্দ রায় এনেছে। ভাগ্যি—ভাগ্যি—অনেকের এ ভাগ্যি হয় না!"

জ্যোৎস্না বলিল, "তুমি এখনই আমায় বাড়ী পাঠাইয়া দেও!"

হরগোবিন্দ রায় বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। তাহার সেই বিকট হাসি সেই অন্ধকারে চারিদিকে এক ভয়াবহ বিভীষিকা বিস্তার করিল। সে বলিল, "ছুঁড়িকে আজ ঘরে আটকিয়ে রাখ,—কাল সিদে হয়ে যাবে।"

কিন্তু কেহ জ্যোৎস্নার নিকটস্থ হইতে সাহস করিল। ইহা দেখিয়া হর-গোবিন্দ রায় হিংস্র পশুর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিল, "শালারা আমার হুকুম শুনতে পাও না! বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে, — "

একজন বলিল, "হুজুরের হুকুম হলেই পারি।"

হরগোবিন্দ ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে বলিল, "শালারা কি শুনতে পাচ্চ না!"

পর মুহূর্ত্তে পাঁচ সাত জন ভীমকায় লাঠিয়াল জ্যোৎস্নার উপর পতিত হইয়া তাহাকে নিমিষে তুলিয়া লইয়া ছুটিল। একটা গৃহের দ্বারে আসিয়া তাহারা সবলে তাহাকে ভিতরে নিক্ষিপ্ত করিল। তাহার পর দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া শিকলি দিল।

জ্যোৎস্না সজোরে ভূমে পতিত হইল। নিম্নে মোটা কোমল গদীর উপরিস্থ দুগ্ধ ফেনিল শয্যায় পতিত না হইলে, সে নিশ্চয়ই গুরুতর আঘাত পাইত। তবুও সে অতি জোরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল,—কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া রহিল,—তাহার মস্তিষ্কের স্থিরতা ছিল না। তাহার মস্তক হইতে যেন সহস্র অগ্নি শিখা ছুটিতেছিল। সে দুই হস্তে মস্তক ধরিয়া কিয়ৎ-ক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

(৮)

সে দেখিল স্লেটি একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। দুই দিকে দুইটী দ্বার ও দুইটী জানালা আছে; উপর হইতে একটী ঝাড় ঝুলিতেছে। ঝাড়দুর কয়েকটী

প্রজ্জ্বলিত বাতির আলোকে ঘরটী আলোকিত। গৃহে বিস্তৃত ফরাস বিছানা; আর কোন আসবাব নাই। এক কোণে এক খানি টুলের উপর এক ঘটি জল রহিয়াছে।

জ্যোৎস্না কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মানা রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে গিয়া দরজা ও জানালা ঠেলিয়া দেখিল,—সকলই বাহির হইতে সুদৃঢ় ভাবে বন্ধ। কোনরূপে পলাইবার উপায় নাই! সে বন্দিনী হইয়াছে! ভগবান ভিন্ন আর কাহারও তাহাকে রক্ষা করিবার সামর্থ নাই! ভগবান কি নাই! তিনি কি তাহাকে রক্ষা করিবেন না! সুবোধ নিশ্চয়ই প্রাণ দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। সে নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া নিকটে কোন স্থানে আছে! হায়, অভাগিনী জানে না যে তখন সুবোধ লাঠিয়ালের লাঠির আঘাতে সংজ্ঞাহীন হইয়া তাহাদের বাড়ীর প্রান্তে প্রান্তরমধ্যে পতিত রহিয়াছে!

চীৎকার করিলে কি হইবে,—আর্ত্তনাদ করিলে কি হইবে। এই দুরাত্মাগণ তাহাতে কেবল হাসিবে বইত নয়! পলাইবার উপায় নহে,—আত্মরক্ষার উপায় নাই;—সুবোধের এ শত্রুপুরে আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই! তবে কি ভগবান নাই! তিনি কি তাহাকে রক্ষা করিবেন না!

গৃহমধ্যে দণ্ডায়মানা হইয়া জ্যোৎস্না বহুক্ষণ ধরিয়া শতবার মনে মনে এই কথা বলিল। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটিয়া যাইতে লাগিল;—সে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কেবলই তাহার হাসি পাইতেছে;—কষ্টে—অতি কষ্টে,—সে হৃদয়ের এই হাস্যের প্রবল বেগ উপশমিত করিতেছে!—কেন তাহার হাসি পাইতেছে!—কেন!—ওঃ, আজ যে তাহার বিবাহ!

তাহারও গলা শুখাইয়া কাঠ হইয়া উঠিয়াছে! বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে! – একটু জলের জন্য যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে,—প্রাণ যায়! জ্যোৎস্না ভাবিল,—প্রাণ যায়, তবে যাইতেছে না কেন! এ প্রাণ রাখিয়া ফল কি! শুনিয়াছি গলায় দড়ি দিয়া লোকে মরিতে পারে,—তবে গলায় দড়ি দিয়া মরিনা কেন!—এই বিছানার চাদর আছে,—গলায় জড়াইয়া জড়াইয়া মরি না কেন!

সহসা তাহার ভিতরে যে আগুণ জ্বলিতে ছিল, তাহা সহস্রগুণ প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার দেহের সমস্ত রক্ত আগুন হইয়া তাহার মাথায় উড়িল। তাহার চক্ষু লাল হইয়া যেন বেগে বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম

করিল। সে দন্তে দন্ত পেশিত করিল, বলিল, "না, মরিব না! যে আমার এ সর্ব্বনাশ করিয়াছে,—যে আমাকে সুবোধের নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়াছে,—আগে তাহার রক্ত দেখিব,—তবে মরিব ;—এখন মরিব না!"

তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছিল,—সহসা গৃহকোণস্থ ঘটির উপর দৃষ্টি পড়িল। সে উন্মাদিনীর ন্যায় গিয়া ঘটি তুলিয়া লইয়া এক নিশ্বাসে প্রায় ঘটি নিঃশেষ করিল। তাহার পর বলিয়া উঠিল, "আঃ! মরণে কি এত জ্বালা!"

সহসা তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল ;—সে চারিদিকে আবার অন্ধকার দেখিল ;—আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, বসিয়া পড়িল। দুই হস্তে ভূমি ধরিয়া কাতরে বলিল, "একি হল! এমন হচ্চে কেন! সব যেন ঘুরছে! জলে কি ছিল।" জ্যোৎস্না চারিদিকে অভূতপূর্ব্ব আলোক দেখিল,—তাহার পর কি হইল, সে আর জানে না।

(৯)

কতক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান হইল, তাহাও জ্যোৎস্না জানে না। তখনও তাহার মাথা ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতেছিল। সে অতি ত্রস্তে উঠিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয় মন প্রাণ সমস্তই যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে! কেবল মস্তিষ্কের ভিতর কি যেন প্রবল বেগে ঘুরিতেছে!

কতকক্ষণ সে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া ছিল, তাহাও সে জানে না। ক্রমে ধীরে ধীরে তাহার মস্তিষ্ক কতকটা প্রকৃতস্থ হইয়া আসিতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মিলীত করিল। দেখিল, সুসজ্জিত গৃহ, সুন্দর পালঙ্ক,—তাহাতে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা। তাহার উপর সে উপবিষ্টা। উপরে সুন্দর ঝাড় ঝুলিতেছে,—সেই আলোকে গৃহ আলোকিত। আতর গোলাপের গন্ধে গৃহ পূর্ণ!

সে লম্ফ দিয়া পালঙ্ক হইতে নামিল। বিস্ফারিত নয়নে ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল,—সে কোথায়! সে কি কেবল বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিতেছে! বিদ্যুৎ বেগে তাহার সকল কথাই স্মরণ হইল। আজ যে তাহার বিবাহ!

দেখিল, গৃহের দ্বারের নিকট এক যুবক আলুথালু ভাবে পতিত রহিয়াছে। তাহার মুখ হইতে ফেন নির্গত হইতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে তাহার নাসিকা গর্জ্জন গৃহ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বুঝিতে পারা যায় ঘোর সুরাপানে

যে দুর্ব্বৃত্ত গৃহ প্রবেশ করিয়াই ভূপতিত হইয়া অজ্ঞান হইয়াছে; দুই পদও অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই।

তাহাকে দেখিয়াই জ্যোৎস্না চিনিল। এই পাপাত্মাই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! দুর্ব্বৃত্তকে দেখিয়া জ্যোৎস্নার শিরায় শিরায় রক্ত বিদ্যুৎ বেগে প্রধাবিত হইয়া ছুটিল! সে উন্মাদিনী হইল!

গৃহের প্রাচীরে নানাবিধ অস্ত্র ঝুলিতেছিল। সহসা উন্মাদিনীর দৃষ্টি সেই ভয়াবহ অস্ত্রের প্রতি পতিত হইল। সে মৃদু হাসিল; বিকটে নিশব্দে হাসিল, যুবক সুরা পানে অজ্ঞান।

"আজ আমার বিবাহের বাসর।" এই বলিয়া ধীর পদবিক্ষেপে জ্যোৎস্না গৃহ প্রাচীরের নিকটে আসিয়া প্রাচীর হইতে এক শাণিত ছুরিকা খুলিয়া লইল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে অস্ত্রশস্ত্রই এ দেশের যুবক জমিদারগণের চির সঙ্গী ছিল। গোবিন্দপুরের জমিদার মধ্যবয়স্ক কুলাঙ্গার, সুরা স্ত্রীলোক ও অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই জানিত না। তাহার শয়ন গৃহও একরূপ অস্ত্রশালা ছিল। জ্যোৎস্না ছোরা হাতে লইয়া তাহার ধার দেখিতে দেখিতে মৃদু হাস্য করিতে লাগিল। তাহার মস্তকের কেশ ফুলিয়া দ্বিগুণিত হইয়াছে, তাহার নিশ্বাস সবলে বহিতেছে! সে বিকট ভাবে পাপাত্মার দিকে চাহিতেছে! বিড়াল যেরূপ ইন্দুরের দিকে চাহিতে থাকে,—ক্ষুধিতা বাঘিনী যেরূপ শিকারের দিকে লোলুপভাবে চাহিতে থাকে,—জ্যোৎস্নাও সুরাপানে অজ্ঞান দুরাত্মার দিকে সেইরূপ ভাবে চাহিতে লাগিল।

জ্যোৎস্নার হস্তস্থ শাণিত ছোরা ঝাড়ের আলোকে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সে ধীর পদবিক্ষেপে দ্বারের নিকট চলিল,—সে নিশব্দে নীরবে বিড়ালের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ যুবকের নিকট আসিল।

সে যুবককে সবলে নাড়া দিল,—তবুও যুবকের সজ্ঞা নাই। সে ক্ষিপ্তা সিংহিনীর ন্যায় যুবকের বুকে হাটু পাতিয়া বসিল,—দক্ষিণ হস্তে সবলে ছোরা ধরিল;—তথাপি যুবকের চৈতন্য হইল না। সে পাপাত্মার গলায় ছোরা বসাইতে গিয়া নিরস্ত হইল,—বলিল, "না—অজ্ঞান অবস্থায় মরিলে জানিতে পারিবে না। জানুক যম আছে।"

উন্মাদিনী জ্যোৎস্না বাম হস্তে যুবকের দীর্ঘ কেশ ধরিয়া সবলে টানিয়া তাহার মস্তক উর্দ্ধে তুলিল;—যুবক যাতনায় আর্ত্তনাদ করিয়া কষ্টে চক্ষুরুন্মিলন করিল;—অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "কে—কি চাও—তুমি কে!"

জ্যোৎস্না দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া বলিল, "আমি তোর যম!" পর মুহূর্ত্তেই সে হস্তস্থ ছোরা যুবকের গলায় বসাইয়া গলা প্রায় দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল! রক্তে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত হইয়া গেল! সে বিকট হাসিতে হাসিতে লম্ফ দিয়া দাঁড়াইল! পুনঃ পুনঃ অর্দ্ধ দ্বিখণ্ডিত যুবকের মুখে পদাঘাত করিয়া, সে হস্তস্থ রক্তাক্ত ছোরা দূরে নিক্ষিপ্ত করিল; তাহার পর হাসিতে হাসিতে পার্শ্বস্থ অর্দ্ধ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

[১০]

সুবোধ রাত্রি দুই প্রহরের সময় শ্মশান হইতে উঠিলেন। তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনুরোধ বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার জগৎ সংসারের জ্ঞান কিছুই ছিল না! কিসে কি যেন তাঁহার প্রাণ টানিতেছে! কে যেন তাঁহাকে টানিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে! তিনি উঠিলেন; তিনি চলিলেন। কোথায় যাইতেছেন, তিনি তাহা জানেন না। তিনি প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। কোথায় ছুটিতেছেন, তাহাও তিনি জানেন না। এই পর্য্যন্ত বুঝিতেছেন যে কি যেন তাঁহাকে টানিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে! যেখানে জ্যোৎস্না গিয়াছে, সেই খানে তাঁহার প্রাণ ছুটিতেছে। তিনি ইহাও বুঝিলেন যে জ্যোৎস্না আর নাই! তাহার প্রেতাত্মা তাঁহাকে ডাকিতেছে! তিনি এখনও সম্পূর্ণ উন্মাদ হন নাই, তবে তাঁহার উন্মাদ হইবার যে আর অধিক বিলম্ব নাই, তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন।

সহসা তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি অন্ধকারে সম্মুখে এক বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। অট্টালিকাও অন্ধকারে তাঁহার নিকট এক বৃহদাকার ভয়াবহ পিশাচ মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সম্মুখে উন্মুক্ত দ্বার। তিনি সেই দ্বার দিয়া সেই অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার; তিনি সেই গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়া কয়েকটী প্রকোষ্ঠ উত্তীর্ণ হইয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ,—ঝাড়ের বাতি কয়েকটা প্রায় নিঃশেষ হইয়াও তখনও জ্বলিতেছে। সেই আলোকে তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত জল হইয়া গেল।

সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট নহে। দ্বার পার্শ্বে এক ভয়াবহ মৃতদেহ! মৃতদেহের গলা প্রায় দ্বিখণ্ডে

বিভক্ত! রক্ত জমিয়া চারিদিকে এক ভীষণ বিভীষিকা বিস্তার করিয়াছে! আড়ষ্ট দেহ, বিস্ফারিত নিশ্চল চক্ষু, সে বিকট মুখের বর্ণনা হয় না! সুবোধ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই ভয়াবহ বিভীষিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন!

কতক্ষণ তিনি এই ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহা তিনি জানেন না। সহসা কতকগুলি লোক সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে চারিদিক হইতে প্রহার আরম্ভ করিল। লাথি, কিল, চড় চাপড়ে, তিনি জর্জ্জরিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন তাহারা তাঁহাকে কুৎসিত গালি দিতে দিতে সুদৃঢ় রজ্জুতে বাঁধিয়া ফেলিল। তিনি কি করিয়াছেন, কোথায় আসিয়াছেন, ইহারা কি অপরাধে এরূপ নির্ম্মম ভাবে তাঁহাকে প্রহার করিতেছে, তাহার তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কোন কথা কহিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইলেন না। প্রহারে অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত হইলেন। সকলই তাঁহার নিকট অস্পষ্ট স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তিনি কেন কিরূপে জমিদার বাড়ী আসিয়া ছিলেন, তাহা তিনি জানেন না। তিনি যে তাঁহাদেরই নব্য যুবক জমিদারের বিকট মৃতদেহ তাঁহার সম্মুখে দেখিতেছিলেন, তাহাও তিনি জানিতেন না। তিনি যে জমিদারের হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হইয়াছেন,—এখন যে তাঁহার ফাঁশি হইবে,—তাহাও তিনি বুঝিলেন না।

জ্যোৎস্না চলিয়া গেলে, প্রাতে জমিদারের ভৃত্যগণ তাঁহার বৈঠকখানা গৃহে আসিয়া ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই বৃহৎ পুরির অসংখ্য লোক তথায় ছুটিয়া আসিয়া, এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল! চারিদিকে মহা হুলুস্থুল পড়িল। নিদ্রিত জমিদারের গলা কাটিয়া জ্যোৎস্না যে পালাইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও আর বিলম্ব হইল না। অন্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল উঠিল; কাছারী বাড়ী হইতে অসংখ্য লোক জ্যোৎস্নার অনুসন্ধানে চারিদিকে ছুটিল। দশ ক্রোশের মধ্যে সমস্ত স্থান তাহারা ওলটপালট করিয়া ফেলিল, কিন্তু কোথাও জ্যোৎস্নার কোন অনুসন্ধান পাইল না। তাহারা প্রত্যাগমন করিলে, একজন প্রাচীন বৃদ্ধ বলিলেন, "খুনীকে ধরিতেই হইবে ইহার এক উপায় আছে। তোমরা হয়তো জান না, আমি জানি।—খুনী পর দিন রাত্রে খুনের যায়গায় প্রেতাত্মার দ্বারাই আসিতে বাধ্য হয়। যে খুন করিয়াছে, সে আজ রাত্রে এখানে

নিশ্চয়ই আসিবে। আজ সৎকারের প্রয়োজন নাই; কাল সৎকার হইবে; অপঘাত মৃত্যু হইলে ইহাই শাস্ত্র। ঘর যেমন আছে, তেমনই থাক। দেখিবে খুনী নিশ্চয়ই রাত্রে আসিবে।”

তাহাই হইল;—সকলে বৈঠকখানা গৃহের চারিদিকে লুক্কাইত থাকিয়া খুনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল,—কিন্তু জ্যোৎস্না আসিল না,—আসিল হতভাগ্য সুবোধ। তিনি কেন কিরূপে এই ভয়াবহ স্থানে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানেন না।

বেদম প্রহার করিয়া সুবোধকে জমিদারের লোকেরা অর্দ্ধমৃতাবস্থায় এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া জমিদারের সৎকারের জন্য ব্যস্ত হইল। জেলা অনেক দূর;—পর দিন খুনীকে জেলার সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে। এদিকে তাহারও বন্দোবস্ত চলিল।

বহুক্ষণ হতভাগ্য সুবোধ সেই গৃহ মধ্যে পতিত রহিল। তাঁহার উত্থান শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল,—চিন্তাশক্তি ছিল না,—দেহ ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল! তাহার পর বোধ হয় চির শান্তিদায়িনী—চির সুখ-প্রদায়িনী, নিদ্রাদেবী তাঁহার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া, তাঁহাকে নিজ চির দুঃখহারিণী ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন। জ্যোৎস্না তাহার সেই বিবাহ সাজে,—সেই লাল চেলিতে,—সহাস্যবদনে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাকে বলিতেছে, “স্বামীন—এস,—আজ যে আমাদের ফুলশয্যা! এস—আর দেরি করো না।” সহসা তীর বিদ্ধ হইলে, লোকে যেরূপ লম্ফ দিয়া উত্থিত হয়,—সুবোধও ঠিক সেইরূপ ভাবে উঠিয়া বসিলেন। জ্যোৎস্না কোথায়!

গৃহ অন্ধকারময়! বোধ হয় অনেক রাত্রি হইয়াছে! চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ;—তিনি কোথায়! তিনি কি তখনও স্বপ্ন দেখিতেছেন! ক্রমে ধীরে ধীরে একে একে তাঁহার সকল কথাই স্মরণ হইতে লাগিল। শ্মশান পর্য্যন্ত সকলই তাঁহার সুস্পষ্ট মনে হইল, কিন্তু তাহার পর আর কিছুই তিনি ভাল স্পষ্ট মনে করিতে পারিলেন না। তিনি শ্মশান হইতে কাহার বাড়ীতে আসিয়া বিভীষিকা দেখিয়াছিলেন! কাহারা তাঁহাকে প্রহার করিয়া এই ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! ইহার তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখনও তাঁহার কর্ণে বজ্র নিনাদে জ্যোৎস্নার কথা ধ্বনিত হইতেছিল। সে বলিতেছে,—“স্বামীন, এস; আজ যে আমাদের ফুলশয্যা!”

সহসা সুবোধের দেহে যেন আসুরিক বল আসিল; তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্ধকারে কষ্টে দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলেন, দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। তিনি কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন,—কোন দিকে কোন শব্দ নাই,—চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ। নিশ্চয়ই অনেক রাত্রি হইয়াছে! সকলেই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছে!

দ্বার খুলিবার কোন উপায় নাই। পশ্চিম দিকে একটা ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে। সুবোধ অতি কষ্টে অন্ধকারে তাহা খুলিলেন; জানালায় মোটা কাঠের গরাদে। অসুর বলে তিনি নিমিষে গরাদে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাহার পর উন্মাদের ন্যায় সেই গবাক্ষ পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি অন্ধকারে কোথায় পড়িলেন, তাহা তিনি জানেন না;—তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন।

যখন তাঁহার জ্ঞান হইল, তখন তিনি দেখিলেন, তিনি তাঁহাদের গ্রামের ভিতর আসিয়াছেন। কেমন করিয়া কোথা দিয়া এখানে আসিলেন, তাহা তিনি জানেন না। তাঁহার কপাল দিয়া ঝর ঝর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে।

তিনি কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি কি করিবেন,—কোথায় যাইবেন! যথার্থই কি তিনি খুনী! যথার্থই কি তিনি সেই লোকটার গলা কাটিয়াছেন! তাঁহার কিছুই স্মরণ নাই। ধরা পড়িলে নিশ্চয়ই তাঁহার ফাঁসি হইবে! জ্যোৎস্না কোথায়! একবার তাহার সহিত দেখা হইল না! নিশ্চয়ই সে আত্মহত্যা করিয়াছে,—সে আর নাই!

সহসা দূরে ধু ধু করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া সুবোধ বলিয়া উঠিলেন, "আবার কাহার সর্ব্বনাশ হইল! আবার কোথায় ডাকাত পড়িল!" কিন্তু চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ,—বোধ হয় ভোর হইয়া আসিয়াছে। সুবোধ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অগ্নির দিকে চলিলেন;—আগুন ক্রমে অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে।

তিনি অগ্রসর হইলেন। আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে! সেই আলোকে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে! অন্ধকার মধ্যস্থ আলোকে গাছগুলি যেন প্রেতাত্মার ন্যায় দেখা যাইতেছে! সুবোধ কলের পুত্তলিকার ন্যায় ছুটিলেন। নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পালকপিতা, জ্যোৎস্নার

মাতামহ, বৃদ্ধ তর্কলঙ্কার মহাশয়ের গৃহের অনতিদূরে তাঁহার যে ক্ষুদ্র চারচালা টোল গৃহ ছিল, তাহাতেই আগুন লাগিয়াছে। আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে!

তাহার পর তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে নিমিষে তাঁহার হৃদয় পাষাণে পরিণত হইল। সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত চিতা,—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের টোল গৃহের মধ্যে নানা কাষ্ঠে রচিত এক চিতা। সেই চিতা ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে!

চিতায় উপবিষ্টা জ্যোৎস্না! সেই লাল চেলিতে বিবাহ সজ্জায় সজ্জিতা জ্যোৎস্না! নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় জ্যোৎস্না! তাহার চারিদিকে আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে!

অন্ধকারে প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ উত্তীর্ণ হইয়া অভাগিনী জ্যোৎস্না অন্ধকার হইতে গভীরতর অন্ধকারে আসিয়া পড়িয়াছিল ;—সে দুরাত্মাকে বধ করিয়াছে,—তাহার রক্তে স্নাত হইয়াছে,—তাহার মস্তিষ্কের অগ্নি কতকটা নির্ব্বাপিত হইয়াছে,—সে এই মাত্র জানে ;—তাহার পর আর সকলই যেন অন্ধকার! আর কিছু চিন্তা করিবার ক্ষমতা তাহার নাই! তবে তাহার মনে হইতেছে, কি যেন হয় নাই,—কি যেন নাই! সে অন্ধকারে বিকট হাসি হাসিয়া ছুটিল,—কোথায় ছুটিল, তাহা সে জানে না।

যখন সে তাহাদের ভস্মীভূত কুটীরের দগ্ধ ভিটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বিদ্যুৎ বেগে তাহার সকল কথা মনে পড়িল। সে হাসিয়া বলিল, "ওঃ—আজ যে আমার ফুলশয্যা!"

নির্জ্জন রাত্রি, চারিদিক নিস্তব্ধ! সে একবার সেই গভীর অন্ধকারে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর ধীর পদবিক্ষেপে তর্কলঙ্কার মহাশয়ের বহুদিন হইতে পরিত্যক্ত টোল গৃহে আসিল। তাহার পর কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। নিকটে সম্প্রতি কাহারা একটা বড় তেঁতুল গাছ কাটিয়াছিল,—তাহারই বিস্তৃত ডালপালা নিকটেই পড়িয়া ছিল,—উন্মাদিনী তাহাই একে একে সংগ্রহ করিয়া চিতা নির্ম্মিত করিল। তাহার আগুনের অভাব হইল না। কাঠুরিয়াগণ তাহাদের আগুনের মালসা তথায় ফেলিয়া গিয়াছিল,—জ্যোৎস্না সেই আগুনে চিতা জ্বালাইয়া দিল! চিতায় বসিয়া হাসিয়া বলিল, "আজ যে আমার ফুলশয্যা!"

সুবোধের কিছুই বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি উন্মাদের ন্যায় সেই অগ্নির দিকে ছুটিলেন। এখনও সময় আছে,—এখনও তিনি হয়তো

জ্যোৎস্নাকে রক্ষা করিতে পারিবেন! তিনি উন্মাদের ন্যায় "জ্যোৎস্না— জ্যোৎস্না, কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ!" বলিতে বলিতে বিকট চীৎকার করিয়া চিতার দিকে ছুটিলেন! আগুনের ভিতর হইতে জ্যোৎস্না তাঁহাকে দেখিল, —দেখিয়া মৃদু হাসিল। সে স্বর্গের হাসি;—মর্ত্তের নহে! কিন্তু সে নড়িল না,—সে পাষাণ হইয়া গিয়াছে!

তখন সুবোধ লম্ফ দিয়া সেই চিতা মধ্যে পতিত হইলেন; দুই হস্তে জ্যোৎস্নাকে ধরিলেন;—সেও তাহার অর্দ্ধ দগ্ধ হস্তে সুবোধের গলা বেষ্টন করিয়া বিমল হাসি হাসিয়া বলিল, "স্বামীন,—এস, আজ যে আমাদের ফুলশয্যা!"

সুবোধ প্রাণপণ বলেও তাহাকে চিতা হইতে তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহও অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল! তখন ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না সুবোধের গলা জড়াইয়া চিতাগ্নিতে শয়ন করিল,—সুবোধ চক্ষু মুদিলেন। দুইটী স্বর্গের ফুল ঝরিয়া গেল,—কেহ দেখিল না!

সম্পূর্ণ।

সতী।*

(লেখক—শ্রীধরণীধর ঘোষাল।)

জামাই ষষ্ঠীর পূজা লইতে ঘোষেদের নববিবাহিত ফুটফুটে, টুকটুকে কার্ত্তিকের মত জামাইটিকে আসিতে দেখিয়া, দত্তদের নয় বৎসরের রাণী ছুটিয়া গিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বারংবার শুধাইতে লাগিল,—তাহাদের জামাই কোথা? এখনও আসিল না কেন? কখন আসিবে? মা বিরাজমোহিনী কুটনা কুটিতে ছিলেন। কন্যার প্রশ্নে হাতটাকে তরকারী মনে করিয়া, অন্য মনস্কে ধারাল বঁটিতে বসাইয়া টান দিলেন। আঙ্গুলটা কাটিয়া যখন জ্বালা করিতে ও রক্ত পড়িতে লাগিল তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। দেখিলেন হাতটা তরকারী হইতে রাজী নহে, তরকারীর পেতে তাঁহার পার্শ্বে পড়িয়া। রাণী পশ্চাৎদিক হইতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল। প্রথমে দেখিতে

* সত্য ঘটনাবলম্বনে লিখিত।

পায় নাই, আপন কথাতেই মত্ত ছিল। মাকে তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিতে দেখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল, ঝরঝর করিয়া মায়ের আঙ্গুল হইতে রক্ত পড়িতেছে! আর তাহার মা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। রাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! বিরাজমোহিনী বঁটি ছাড়িয়া, উঠিয়া অন্য এক আঙ্গুলে ক্ষতহাতটি টিপিয়া ধরিয়া, কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কোলে উঠিয়া মায়ের চক্ষে জল দেখিয়া রাণী আরো কাঁদিতে লাগিল। পাছে ছোট বৌ জানিতে পারে, সেই ভয়ে বিরাজমোহিনী কন্যাকে থামাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন! রুদ্ধ আবেগ তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিল, কোন কথা বাহির হইতেছিল না। রাণীকে থামাইবার জন্য, তাহার ক্ষুদ্র মাথাটিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। রাণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অন্দর ছোট বৌ কামিনী ঘরে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রাণীর কান্না বধ নিয়া'—কেনরে, রাণু কাঁদছিস্ কেন? কি হ'লো দিদি?" বলিতে বলিতে কত টিয়া আসিলেন। এবং দিদির আঙ্গুল হইতে রক্ত পড়িতে দেখিয়া,—ইস্ সকলড্ড কেটেছে দেখছি যে?" বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া, টিকের গুঁড়া ও রেড়ির তবেতল একটা ন্যাকড়ায় মাখাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কাটা জায়গাটা বিবাঁধিতে বাঁধিতে বলিতে লাগিলেন—"তোমার কি সব কাজেই তাড়াতাড়ি দিদি? দেখদেখি আঙ্গুলটা যে আধখানা হ'য়ে গেছে! আহাহা! পাঁঠা কাটার মত রক্তের ধারা। যদি একটু স্থির তুমি হবে। বারণ করি একশো বার! চুপ কর, রাণু। ভয়কি মা, কিছু হয়নি! তোমার ওকি ছেলে মানুষি দিদি, মেয়েটাকে কাঁদাচ্চো! নাও চুপ কর! কাজ কর্ত্তে যাও কেন? হ'য়েছে যেত সবটা কেটে! আয়রে রাণু, আয়! নে চুপ কর, কাঁদিস নি!" রাণীকে কোলে হইতে নামাইয়া ধাক্কা দিয়া ছোট বৌয়ের গায়ে ঠেলিয়া দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বিরাজমোহিনী বলিলেন, "নিয়ে যা হতভাগীকে, আমার চোখের সাঁমনে হ'তে!" রোরুদ্যমানা রাণীকে কোলে লইয়া, ছোট বৌ বলিলেন, "দিন দিন ভিমরতি হ'চ্চেন! মেয়েটাকে অমন দ'গ্ধে দ'গ্ধে মারা কেন, তার চেয়ে গলাটিপে একেবাঁরে মারলেই তো হয়। যেয়ো এইবার মেয়ে নিতে!" বলিয়া সরোষে সেস্থান ত্যাগ করিলেন। বড়বৌ সেই স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সুখদুঃখময় অতীতের কথা মনে হইলেই, সেই সব হারাণ দিন গুলিকে ফিরাইয়া পাইবার প্রবল আগ্রহ হইত বলিয়া, বিরাজমোহিনী প্রাণপণ চেষ্টায়

আপনাকে বর্ত্তমানের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। নির্জ্জনে পাইলে পাছে পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি আক্রমণ করে, সেইজন্য তিনি আপনার রোগশোক জীর্ণ দেহটিকে সংসারের একটা না একটা কাজে লাগাইয়া রাখিতেন। যে যে ছিদ্র দিয়া গতদিনের গলিত লৌহপিণ্ডের ন্যায় উষ্ণ স্মৃতির প্রবেশ সম্ভব, সেই সব দ্বার রুদ্ধ করিতে বড়বৌ সতত সজাগ ছিলেন। কিন্তু আজ রাণীর এক কথায়, তাঁহার শত চেষ্টাবদ্ধ বাঁধ ভাঙ্গিয়া, অতীত বর্ত্তমানকে উদ্দামবেগে ভাসাইয়া দিল। একাদশ বর্ষীয়া বালিকার নব বধুরূপে সসঙ্কোচে এই গৃহে প্রবেশ হইতে, সকল কথা আজ মনে পড়িতে লাগিল। শ্বশুরশাশুড়ীর আদর যত্ন,স্নেহ, দেবরের আদরের আবদার, অত্যাচার তাহাকে পিতৃগৃহের অভাব দিনেকের জন্যও বুঝিতে দেয় নাই। সর্ব্বোপরি স্বামীর অকৃত্রিম প্রেম, তাঁহার বালিকা জীবনকে চির মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল। শ্বশুর বাড়ীতে তাহার মত সুখ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে! আনন্দে, গর্ব্বে বিরাজমোহিনীর বুক ফুলিতে লাগিল। তারপর স্নেহময় শ্বশুর শাশুড়ীর স্বর্গারোহণ,—কি দারুণ শেল তাহাদের স্বামীস্ত্রীর বক্ষে হানিয়াছিল। বালক দেবরকে মাতার অভাব বুঝিতে না দিতে তাঁহার কত না চেষ্টা, কত না যত্ন। তারপর মনে পড়িল, সন্তান হীন জীবনের দিন পাত,—কি কষ্টকর। শত ঠাকুরের দুয়ার ধরিয়া, বিবিধ প্রকারের হোম স্বস্ত্যয়নে মণ মণ ঘি পোড়াইয়া, ঔষধ ও গাছ গাছড়া নির্ব্বিচারে খাইয়া পেটে চড়া পড়াইয়াও কিছুতেই যখন একটা কানা খোঁড়া সন্তানও জন্মিল না, তখন স্বামীর সর্ব্বদা সেই বিষাদ করুন, হতাশার ভাব কি ভীম বজ্রাঘাত তাঁহার প্রাণে না বাজিত। নারী জীবনের অসম্পূর্ণতায়, ব্যর্থতায়, যখন বিরাজমোহিনীর আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা হইতেছিল, তখন তেজঃপুঞ্জ কলেবর, জটাজুটধারী বনবাসী সন্ন্যাসীর অহেতুকি কৃপা, চব্বিশ বৎসর বয়সে এই রাণীকে কোলে দিয়া তাঁহার রমণী জীবনের চরম সার্থকতা আনিয়া দিল। সন্তান লাভে স্বামী স্ত্রীতে যে সময় আনন্দে আত্মহারা, কনিষ্ঠ দেবরটির গৃহলক্ষ্মী আনিয়া, সেই আনন্দের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া, যে সময় উভয়ে নিজ নিজ জীবনের সফলতায় কৃতার্থ বোধ করিতেছিলেন, সেই সময় সেই সন্তানদানকারী সন্ন্যাসীর সাধের কন্যার দারুণ কোষ্ঠি বিচার, তাঁহাদের অনাবিল আনন্দে বিষাদ কালিমা ঢালিয়া দিল। একমাত্র আদরিণী কন্যার বাল্য বৈধব্যের ও অকাল মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া, তাঁহার স্বামীর সোনার দেহ দিন দিন কালী হইয়া যাইতে লাগিল। অষ্টম হইতে ষোড়শ বর্ষ

মধ্যে বিবাহে কন্যার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে শুনিয়া, রাণীর পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রম হইতে স্বামীর সেই ব্যাকুল ভাবে পাত্রের সন্ধানে ছুটাছুটি, আজিও বড় বৌয়ের স্পষ্ট মনে পড়িল। যদি বা কত চেষ্টায় সৎপাত্র মিলিল, অকাল বলিয়া সে বৎসর বিবাহ হইল না। রাণীর বয়স তখন সাত বৎসর। ফাল্গুন মাসে বিবাহ না হইলে, সম্মুখে কালরূপী অষ্টম বর্ষের বৈশাখ মাস। কন্যার বৈধব্যের আশঙ্কায় তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে পূর্ব্বে যেরূপ ব্যস্ত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আজ দুই বৎসর পরেও বিরাজমোহিনী সেইরূপ শিহরিয়া উঠিলেন। অদৃষ্ট পুরুষের কখন, কোন অজ্ঞাত আঘাতে বুঝি বা তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের জীবন কুসুম প্রভাতেই ঝরিয়া যায়। একটা আশা, এখনো ফাল্গুন মাসটা সম্মুখে। এই মাসের মধ্যে বিবাহ দিতেই হইবে। মহাসমারোহে বিবাহের জোগাড় হইতেছে, এমন সময় গ্রামে মা শীতলার দয়া দেখা দিল ; প্রায় ঘরে ঘরে বসন্ত রোগ ন্যাকড়ার আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িল। কন্যাকে লইয়া বড়বৌ দূর সম্পর্কীয় এক ভাইয়ের বাড়ীতে পলাইয়া গেলেন। বিবাহের আর দেরী ছিলনা। কল্য গাত্র হরিদ্রা। সোদ্বেগে রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায়, স্বামী স্ত্রীতে কন্যাকে বক্ষে লইয়া বিনিদ্র নেত্রে বসিয়া আছেন, মুখে একটি কথা নাই, পরস্পরের মুখ চাহিয়া চোখে চোখে প্রাণের উৎকণ্ঠা জানাইতেছেন, আর মনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ বড়বৌ বলিয়া উঠিলেন,—"ওগো রাণুর গাটা কেমন গরম লাগছে কেন?" ঘুমন্ত কন্যাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া, স্বামীর কারতভাবে বার বার নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে, হতাশভাবে সেই করুণস্বরে "আর দেখছ কি, রাণীর জ্বর এলো।" কথাটা বিরাজমোহিনীর কাণে সূচের মত বিঁধিল তখন তাঁহাদের প্রাণে কত শত পাহাড় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল,—বিরাজ আজো তাহার গুরুভার যাতনা অনুভব করিতেছিলেন। পরদিন রাণীর বসন্ত দেখা দিল। বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল,—বর অন্যত্র বিবাহ করিল। ফাল্গুন মাসে কন্যার বিবাহ হইল না।

তাপর স্বামীর সেই উন্মত্তের মত দেশবিদেশে বিখ্যাত পণ্ডিতমহাজনের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, কন্যার বৈধব্য নিবারণের জন্য কাতর প্রার্থনা, অখিল শাস্ত্র সাগরে কোন এক নিভৃত তলদেশে যদি ইহার বিধি বিধান, লুকাইয়া থাকে, তাহার উদ্ধারের জন্য সেই রাশি রাশি অর্থ ব্যয়, শেষে হতাশোন্মত্তভাবে, সকলের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বৈশাখ মাসেই আদরিণী কন্যার

বিবাহ দেন, পর মাসেই কন্যার বৈধব্য, উন্মাদ স্বামীর শোচনীয় মৃত্যু। সকলি একে, একে বড় বৌয়ের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল! তার পর, আনন্দের হাটতো ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাদের সাধের গৃহকুঞ্জে ফুল ফোটাতো শেষ হইয়াছে। এখন কেবল শীতের তুষারসম্পাতে পত্রপুষ্পহীন বৃক্ষের ন্যায় কয়টি জীব নির্জ্জীবভাবে বাঁচিয়া আছে মাত্র। ইহার অপেক্ষা আর কি হইবে। হঠাৎ বিরাজমোহিনীর মনে পড়িল—কি সর্ব্বনাশ! এখনো যে সন্ন্যাসীর আর এক ভীষণ বাণী বাকী। সন্ন্যাসীর প্রথম কথাতো ফলিয়াছে, তবে কি তাঁহার শেষ বাণীও ফলিবে? তবে কি তাঁহার জীবন ধারণের শেষ অবলম্বনটি, ভগবান, তুমি কাড়িয়া লইবে? সন্তানাপহরণ ভয়ভীতা বড়বৌ ব্যাকুলভাবে কন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কন্যাকে কাছে না দেখিয়া, বিরাজমোহিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "রাণী, রাণু, মা, মা!" উন্মাদিনীর মত ছোট বৌয়ের কাছে যাইতে উঠিতেই, দেখিতে পাইলেন, তাঁহার রাণী পাড়ার আর একটি মেয়েকে বলিতে বলিতে খেলিতে যাইতেছে "আমাদের জামাই আসবে গো! দেখিস্ তখন।" বড়বৌয়ের মনে হইল তিনি চীৎকার করিয়া বলেন,—"সে আর আসবে না, আসবে না, আসবে না! পোড়া কপালী তোর পোড়া কপাল এ জন্মের মত পুড়িয়া গিয়াছে!"—কিন্তু তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র "ভগবান!" বলিয়া সেইস্থানেই থপ্ করিয়া সংজ্ঞাহীনভাবে বসিয়া পড়িলেন।

রাণীকে ভুলাইয়া, পাড়ার মেয়েদের কাছে খেলিতে পাঠাইয়া, ছোটবৌ বিরাজ মোহিনীর কাছে আসিলেন। রাণীকে পাইয়া, তিনি তাঁহার অতি শিশু পুত্রের মৃত্যু শোক ভুলিয়াছিলেন। রাণীর সুখ দুঃখ বড়বৌ অপেক্ষা কোন অংশেই তিনি কম বুঝিতেন না। বড়বৌকে রাণীকে ঠেলিয়া ফেলিতে দেখিয়া ছোটবৌ রাগিয়াছিলেন; পরে রাণীর কাছে সমস্ত অবগত হইয়া, তিনিও নিজেকে স্থির রাখিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারো মাতৃ হৃদয় উদ্বেলিত বর্ষার সমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বড়দিদিকে তিরস্কার করা অন্যায় হইয়াছে বুঝিয়া, তাহার মার্জ্জনা চাহিতে আসিয়া ছোটবৌ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বড়বৌ কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়াছিলেন। প্রথমে কি করিবেন, ছোটবৌ ঠিক করিতে পারেন নাই। পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বড়বৌকে জড়াইয়া ধরিলেন। বিরাজ মোহিনী বাঁচিলেন, তাঁহার চক্ষে বাণ ডাকিল।

* * * * *

"দিদি, কিছু খাবে এসো।"

"না বোন, আজ মহালয়া, আজ কিছু খাব না।"

"কতদিন আর এমনি ক'রে শুকিয়ে থাকবে দিদি! ঈশ্বরের মনে যা' আছে, তাই হ'বে। তাই যদি হয়——"

বড়বৌ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন রাণী কোথা গেল ছোটবৌ, "সে খেলতে গেছে। এইত এতক্ষণ এখানে ছিল।"

বিরাজ মোহিনী ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "ডাক তাকে বোন! তার খেলে কাজ নেই।" "ডাকছি"—বলিয়া ছোটবৌ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

সেই জামাই ষষ্ঠির দিন হইতে, রাণী বড়ই চঞ্চল ও আগ্রহান্বিত, হইয়াছে, তাহার শ্বশুর বাড়ীর কথা জানিবার জন্য এই কয়মাস প্রায়ই সে তাহার মা কি ছোট মা, কি পাড়ার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের তাহার শ্বশুর বাড়ীর কথা শুধাইয়াছে, কিন্তু কিছুই জানিতে পারে নাই। অনেকেই চক্ষু মুছিয়াছে, কেহ কেহ বা প্রসঙ্গান্তরে তাহার প্রশ্ন ঢাকিয়াছে। মাকে শুধাইলে তিনি অন্য কাজে চলিয়া যান' ছোট মা কোলে করিয়া চুমা খায়, সন্দেশ দেয়, কিন্তু তাহার কথার উত্তর দেয় না। নবমবর্ষীয়া বালিকার নিকট সকলের এরূপ আচরণ রহস্য বলিয়া বোধ হইত। বালিকার দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন মা বিরাজ মোহিনীর, কিংবা ছোট মা কামিনীর চক্ষু এড়ায় নাই। রাণী এখন আর সে রাণী নাই! পার্ব্বত্যহরিণীর মত, তাহার আর সে সদা প্রফুল্ল, মত্ত ভাব নাই। যদিও সে হাসে, খেলে বটে, কিন্তু তাহার আর বালিকা সুলভ চপলতা, চঞ্চলতা নাই,—প্রৌঢ়জনোচিত গাম্ভীর্য্য এখন তাহার সকল কার্য্যে কি যেন একটা কি বিষাদের ছাপ মারিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে তাহার উদাস, হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টি, কোন্ দূরাগতের আগমন আশায় সুদূর গগনপ্রান্ত-লগ্ন শূন্য প্রেক্ষণ, বিরহিনীর কাতরতা কাহার চরণে যেন নীরবে নিবেদন করিত। বড় বৌ ও ছোট বৌ তাহার সে ভাব দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেন। দিন, দিন কন্যার ভাবান্তর দেখিয়া, বড় বৌ কন্যার আসন্ন মৃত্যু আশঙ্কায় অন্নজল একরূপ ত্যাগ করিলেন। ছোট বৌ জোর করিয়া কিঞ্চিৎ খাওয়াইতে চেষ্টা করিলে, বিরাজ মোহিনী দু'এক গ্রাস নিয়া, 'ভাল লাগছে না' বলিয়া উঠিয়া পড়িতেন।

আজ মহালয়া। ঘোষেদের বাড়ীতে মহামায়ার আগমনী ঘট স্থাপনোল্লাসে নহবৎ বাজিয়া, বাজিয়া, গ্রামবাসী সকলের প্রাণে আনন্দের সুর জাগাইতেছিল। বড় বৌ ও সে উল্লাস বাদ্য শুনিলেন। কিন্তু একি! তাঁহার প্রাণে সে আনন্দসুরলহরী বেসুরা বাজিয়া উঠিল কেন? তাঁহার রাণী কোথায়? রাণী! রাণী! বড় বৌ চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—"রাণী! রাণী!" "রাণী ছুটিয়া আসিয়া, মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, একগাল হাসিয়া, বলিল, "নাই বা ব'ল্লে তোমরা! আমি জানতে পেরেছি গো, আমি জানতে পেরেছি। আমায় বিজয়ার দিন শ্বশুররা নিতে আসবে। আমার কিন্তু ভাল কাপড়, জামা চাই। কাকাকে লিখে দাও। ছোট মা কোথা গেল? ও ছোট মা, ছোট মা?"

ছোট মা আসিয়া বলিলেন, "এই যে তুই এখানে। ডাকছিস্ আমায়?" রাণী সোল্লাসে বলিতে লাগিল, "তোমরা আমায় বলনি। আমি, কিন্তু জানতে পেরেছি। শ্বশুররা আমায় বিজয়ার দিন নিয়ে যাবে। কাকাকে লিখে দাও, রাণু মায়ের ভাল কাপড় জামা চাই—রায়েদের নেপুর মত।" ছোট বৌ কিছু বুঝিতে না পারিয়া বড় বৌয়ের পানে চাহিলেন। বড় বৌ রুদ্ধ শ্বাসে রাণীর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। ছোট বৌ শুধাইলেন, "কে তোকে এ কথা বল্লে?"

রাণী—"কেন, একটা সন্ন্যাসী। ঘোষেদের ওখানে, পূজোর বাড়ীতে এসেছিল।" ছোট বৌ পাথরের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বড় বৌ প্রাণপণ বলে সজোরে কন্যাকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন।

ধনীর বাড়ীতে রাণীর বিবাহ হইয়াছিল। পুত্রের মৃত্যু হইলেও, শ্বশুর বধূকে প্রতি বৎসর পূজার সময় তত্ত্ব করিতেন। সপ্তমীর প্রভাতে বড় বৌ ও ছোট বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে, রাণীর শ্বশুরদত্ত জিনিষ পত্র তুলিতেছিলেন, এমন সময় রাণী আসিয়া শুধাইল, "হাঁ মা, এসব কে দিয়েছে?" অন্য বারের ন্যায় এবার আসল কথা গোপন না করিয়া বিরাজ বৌ বলিলেন, "তোর শ্বশুর দিয়েছেন।" "হো, হো, আমার শ্বশুর বাড়ী হ'তে জিনিষ এসেছেরে—"বলিতে বলিতে রাণী ছুটিয়া পাড়ায় সে আনন্দ সংবাদ দিতে চলিল। বড় বৌ আর থাকিতে পারিলেন না—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ছোট বৌ নীরবে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে বলিল, "দেখ না মা, বোসেদের বুঁচি বলছে, আমার

বর নেই। হঁা মা, আমার বর নেই।" আপনাকে দৃঢ় করিয়া বিরাজ মোহিনী—"না" বলিয়া, কম্পিত বক্ষে ক্ষিপ্রপদে ঘরে যাইয়া, সানের মেঝেয় আছড়াইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে ছোট মায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া রাণী বলিল, "হঁা ছোট মা, সত্যি আমার বর নেই!" ছোট বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। রাণী তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

কন্যার মুখে সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বড় বৌ যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, পূজার তিনদিন রাণীকে পাড়ার মেয়েদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া খেলিতে দেখিয়া, তাঁহার সে আশঙ্কা অনেকটা কমিয়া গেল। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না। বিজয়ার দিন যত কাছে আসিতে লাগিল, তাঁহার উদ্বেগ তত বাড়িয়া চলিল। এ কয়দিন রাণীর মোটেই সময় ছিল না। মেয়ে জামাইয়ের তত্ত্ব করা, ছেলে বৌয়ের নূতন কাপড় চোপড় সাজান, নানারূপ খাবার তৈয়েরী করা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে সে এত ব্যস্ত যে নিজের খাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। (অবশ্য এ সমস্ত কার্য্য তাহার খেলার পুতুল ছেলে, মেয়ের)। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইল, কে, কে আসিল না, যাহারা আসে নই, তাহাদের বাড়ীতে খাবার পাঠান প্রভৃতি ব্যাপার, পাকা গৃহিণীর মত বিশেষ নিপুণতার সহিত শেষ করিয়া, রাত্রে সুস্থশরীরে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই ঘুমাইয়া পড়িত। জননী বিরাজ মোহিনী ও ছোট বৌ কামিনী অদূরে বসিয়া নিবিষ্ট মনে তাঁহাদের স্নেহের পুত্তলিটির পুতুল খেলা দেখিতেন, আর আনন্দে আত্মহারা হইতেন। সঙ্গে সঙ্গে কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িত। বিজয়ার দিন মনে হইলেই ছুটিয়া গিয়া রাণীকে বক্ষ মাঝে টানিয়া শত চুম্বনে ও আশীষবচনে অভিনন্দিত করিতেন। সারাদিনের পরিশ্রমে রাণী সন্ধ্যায় ঘুমাইয়া পড়িল, ছোট বৌকে জোর করিয়া শুইতে পাঠাইয়া, বড় বৌ সারারাত্রি তাহার শিয়রে বসিয়া চৌকী দিতেন। ভয়, পাছে কখন, কোন্ সময়ে চোর প্রবেশ করিয়া তাঁহার এ অমূল্য রত্নটি হরিয়া লয়। ভোর বেলায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া, ছোট বৌ আসিয়া দেখিতেন, ঘরের কোণে তৈলহীন প্রদীপ মিট্‌মিট করিয়া জ্বলিতেছে, আর বড়দিদি সতর্কদৃষ্টিতে চাহিয়া ঘুমন্ত রাণীর শিয়রে বসিয়া আছেন।

দশমীর প্রভাতে রাণী স্নান করিয়া আসিয়া মাকে বলিল, "মা শ্বশুররা যে

কাপড় খানা দিয়েছে সেই খানা দাও তো?" কাপড় পরিতে পরিতে মাকে ও ছোট মাকে বলিল, "আজ বাপু, আমায় খেতে ব'লো না। আজ আমার মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাবে। মাকে কিছু খেতে নেই, মেয়ের অকল্যাণ হবে।" বলিয়া খেলা ঘরে চলিয়া গেল। দশমীর প্রভাত হইতেই, বিরাজ মোহিনীর বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিয়াছিল। বিজয়ার সানাইয়ের করুণ সুরে তাঁহার প্রাণের সুর এক হইয়া মিলিয়া গেল। কন্যার কথা শুনিয়া তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। সে দিনের রাণীর শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার কথা মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে, সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণীও মনে হইল। বড় বৌ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

"ও বেলফুল আয় না ভাই! আজ আমার মনের ঠিক নেই ভাই! আজ আমার খুকী শ্বশুর বাড়ী যাবে। তোরা ভাই পায়ের ধূলা দে, যেন সুখে থাকে, সোয়ামীর মন পায়, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদের আদর যত্ন পায়। ও গঙ্গাজল, আয় ভাই, আয়! এসনা মকর, আজ আমার খুকী শ্বশুর বাড়ী যাবে, আশীর্ব্বাদ কর ভাই। ও একগলাজল, ও আচকাফুল ও দেখনহাসি, ও মনের কথা, ও টগর, আয় ভাই সকলে মিলে জোগাড় উদ্যোগ করে দে। আমার ভাই মনের ঠিক নেই তো! ওরে ও বেয়ারা, পাল্কী এদিকে আন। অদিনে পাঠাতে নেই আবার! কেঁদনা মা, কান্না কেন? আমি রোজ তোমার খবর নেব।"

কন্যাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া, রাণী তাহার সাধের খেলা ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পুতুল পুতুলের কাপড়, গহনা, সব পাড়ার ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যে বিলাইয়া দিতে অপরাহ্ন হইয়া গেল। বিরাজ মোহিনী উদ্‌গ্রীব ভাবে সকাল হইতে কিসের যেন অপেক্ষা করিতে ছিলেন। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, তাঁহার উৎকণ্ঠা তত বাড়িয়া চলিল। শেষে আর বসিতে না পারিয়া, মধ্যাহ্নে শুইয়া পড়িলেন। ছোট বৌ পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। বড় বৌয়ের প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল, কে যেন তাঁহার রাণীকে লইতে আসিতেছে। অমনি তিনি কন্যাকে ডাকিয়া আদরে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া মনকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নেও কন্যাকে প্রফুল্ল দেখিয়া, বিরাজমোহিনী উঠিয়া বসিলেন। রাণী কিছুতেই খাইল না দেখিয়া, তাঁহারা দুই জায়েও উপবাসী রহিলেন।

সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর, রাণী অন্যান্য বালিকার সহিত গ্রামের

প্রত্যেক বাড়ী যাইয়া বিজয়ার প্রণামাদি করিতে লাগিল। তাহার অপরূপ সাজ দেখিয়া প্রত্যেকে বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। হায়! বালিকাতো তাহার পোড়া কপালের কথা জানেনা! জানেনা যে, বিধবার সাজ সজ্জা নিষেধ। বিজয়ার সম্ভাষণাদি করিয়া, সে তাহাদের রকে আসিয়া এমন ভাবে বসিয়া রহিল যে, তাহাকে দেখিলেই বোধ হয়, যেন সে কাহার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে চুপ করিয়া বসিতে দেখিয়া বিরাজমোহিনী ও ছোট বৌ তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন। মায়েরদিকে চাহিয়া রাণী বলিল, "মা দুর্গা স্বামীর ঘরে গেল, না মা! আমিও যাব।" বিরাজমোহিনীও ছোট বৌয়ের বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। "সরে এসতো ছোট মা! তোমার কোলে শুই। দেখ মা, কেমন চাঁদ। ঐখানে বুঝি মা দুর্গার ঘর! আমি যাব যে ওখানে।" বিরাজমোহিনী শক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। ছোট বৌ বলিলেন, "ছি মা ও সব কথা বলতে নেই।" "ছোট মা আমার যেতে ইচ্ছে হ'য়েছে। কৈ এখনোতো কেউ আমায় নিতে এলোনা! হাঁ, মা, তারা বলেছিল যে, আজ আমায় নিতে আসবে। কৈ এখনো তো কেউ এলোনা।"—বলিয়া রাণী ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া কাহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। কাহাকেও না পাইয়া, অধীর হইয়া বলিল, "আজ যে আমায় যেতেই হ'বে। আমি যে প্রতিবার এমনি সময়েই গেছি। কিন্তু কই সে নিতে আসছে না কেন!"

"এই যে মা, নিতে এসেছি। তোমার স্বামী আসতে পারেন নি, আমায় পাঠিয়েছেন। এস সতী, এস, স্বামীর কাছে এস।" বলিতে বলিতে এক দীর্ঘ জটাজুটধারী, তেজঃ পুঞ্জকায় সন্ন্যাসী রকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বড়বৌয়ের মনে হইল, জগৎটা যেন রেণু, রেণু হইয়া বিরাট অন্ধকারে লয় প্রাপ্ত হইতেছে! ছোটবৌ সভয়ে চক্ষু মুদিল। পদধূলি লইতে হাত বাড়াইয়া সন্ন্যাসীর পদস্পর্শ করিতেই রাণীর প্রাণশূন্যদেহ ছোট বৌয়ের কোল হইতে সন্ন্যাসীর পায়ে গড়াইয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া ছোটবৌ মৃত দেহ জড়াইয়া ধরিলেন। বিরাজমোহিনী সন্ন্যাসীর পাদমূলে আছড়াইয়া পড়িলেন।

খুড়োর উইল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

(১৮)

জ্যাক ষ্টেসনে গিয়া লণ্ডনের ট্রেনে উঠিল। তাহার মনে কেবল ক্লাইই-টির কথাই উদিত হইতে লাগিল। ভালবাসার সহিত ঈর্ষ্যা মিশ্রিত হইলে অতি জ্ঞানী লোকেরও মাথা বিকৃত করিয়া দেয়। গত রাত্রে ক্লাইটির সহিত হেসকেথের কথাবার্ত্তার ধরণ দেখিয়া সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছে, হেসকেথ ক্লাইটির পাণিপ্রার্থী। দু'এক বার তাহার মনে হইল ব্রামলেতে ফিরিয়া গিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে এবং ক্লাইটির প্রতি তাহার হৃদয়ের গভীর ভালবাসা জানাইয়া হেসকেথের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এখন সে পন্থা অব-লম্বন করা বড়ই গর্হিত বলিয়া ধারণা হইল। পাছে বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করিবার ভয়ে ক্লাইটিকে জোর করিয়া বিবাহে সম্মত করান হয়।

জ্যাক গাড়ীতে ঘুমিয়া পড়িয়া চিন্তার হাত হইতে অনেকটা নিস্তার পাইল। লণ্ডনে ট্রেন থামিলে সে নামিয়া পড়িল। চারিদিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন। জ্যাকের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বহিঃ-প্রকৃতির বেশ একটা মিল ঘটিল। পদব্রজে হাঁটিয়া সে এক পান্থনিবাসে গিয়া আশ্রয় লইল।

অষ্ট্রেলিয়ার পারালুনাতে ফিরিয়া যাইতে সে একপ্রকার মনস্তই করিয়া-ছিল। কিন্তু লণ্ডন ছাড়িয়া যাইতে তাহার বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। এ স্থান ত্যাগ করিলে ক্লাইটির আশা তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিতে হয়। তাহাকে পাইবার আশা খুবই কম বটে, তথাপি সব ভরসা একেবারে ত্যাগ করিতে জ্যাকের প্রাণ চায় না। রাজধানীর আমোদপ্রমোদ, ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে দুঃখ ও অশান্তি ভুলিবার আশায় কিছুদিন লণ্ডনে থাকিতেই সে স্থির করিল। লর্ড ষ্ট্যাণ্টনের নিকট হইতে পরিশ্রমিক স্বরূপ সে যথেষ্ট অর্থ পাইয়াছে। ধীবরের ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া ভদ্র সন্তানের ন্যায় জীবন যাপন করিতেই মনস্থ করিল। পরদিনই দোকান হইতে সে নূতন মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ কিনিয়া আনিল। লণ্ডনে আমোদ প্রমোদের কিছুরই অভাব নাই। জ্যাক তাহাতে মত্ত হইয়া দুঃখকষ্ট সব ভুলিবার চেষ্টা করিল। অন্য কেহ হইলে হয়ত এ অবস্থায় সহরের নানা প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া

উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিত; কিন্তু জ্যাকের চরিত্র সে ভাবে গঠিত হয় নাই। অধিকন্তু ক্লাইটির প্রতি তাহার পবিত্র ভালবাসাও তাহাকে এই অসৎপথ হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখিত।

সেখানে কাহারও সহিত সে আলাপ পরিচয় করিল না। কেবল সেই পান্থশালায়ই মিঃ চোপ নামে একজন বাসাড়িয়ার সহিত তাহার একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। মিঃ চোপও ইংরাজ বটে কিন্তু কার্য্যগতিকে অষ্ট্রেলিয়াতেই বসবাস করিয়াছেন। কিশোর বয়সে মাত্র দশ সিলিং পকেটে করিয়া তিনি কর্ম্মের সন্ধানে অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করেন। এবং সেখানে স্বর্ণখনির অন্বেষণে কঠোর পরিশ্রম করিয়া কিছু অর্থও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি দিন কতকের জন্য জন্মভূমি বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

দুজনে এক সঙ্গে অভিনয় দর্শনে, সঙ্গীত শ্রবণে ও আমোদ অন্বেষণে নানা স্থানে যাইতে লাগিলেন। জ্যাক কিন্তু ক্লাইটির চিন্তা কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

একদিন তাহারা আহারাদি শেষ করিয়া হোটেলের বিশ্রামাগারে ধূমপান করিতেছেন। এমন সময় মিঃ চোপ বলিলেন,—

"দেখুন, আমি যে কেবল আমোদ আহ্লাদের জন্যই লণ্ডনে বেড়াতে এসেছি, তা নয়! আমার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি একটা লোকের সন্ধানেও ঘুরছি। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে জলবিন্দু অন্বেষণের ন্যায় লণ্ডনেও লোকের সন্ধান করা অসম্ভব। অষ্ট্রেলিয়ায় কার্য্যের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে আমি একদিন পারালুনা নামক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হই।

জ্যাক ধূমপানের নল তামাকপূর্ণ করিতেছিল। স্থানের নাম শুনিয়াই সে হঠাৎ থামিয়া চোপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ চোপও শ্রোতার উৎসাহ দেখিয়া আনন্দ সহকারে বলিতে লাগিলেন,—

"সুন্দর জায়গা। এবং গোলাবাড়ীর মালিক জ্যারো দম্পতীও বড় সজ্জন। অমন ভাল লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে বড়ই বিরল। তাঁরা আমাকে আদর অভ্যর্থনা যথেষ্ট করেছিলেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল।" সিলভার রিজ" নামে তাদের আর একটি গোলাবাড়ী আছে। সেখানে দুদিন থাকিবার জন্য আমি যাই। স্থানটি বড়ই রমণীয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, দ্বিতীয় দিন স্রোতের মুখে হাত মুখ ধুচ্ছি, এমন সময়ে জলে একতাল সোনা দেখতে পেলাম।

এ সংবাদ শ্রবণে জ্যাক আদৌ বিস্মিত হইল না। অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় স্বর্ণ-গর্ভ দেশে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে স্বর্ণ উৎপন্ন হওয়া খুবই সম্ভব। স্বর্ণের কথায় তাহার মানসিক উত্তেজনাও একটুও লক্ষ্য হইল না। পৃথিবীর সকল ধনরত্ন বিনিময়েও সে আর ক্লাইটিকে লাভ করিতে পারিবে না!

মিঃ চোপ বলিতে লাগিলেন,—"আমি ইচ্ছা করলে এ সন্ধান তাদের না দিয়ে যায়গাটুকু কিনে নিতে পারতাম। কিন্তু জ্যারো দম্পতীর ন্যায় সরল প্রকৃতি লোকের সঙ্গে প্রতারণা করতে আমার আদৌ ইচ্ছা হ'লনা। আমি তাদের গিয়ে সব কথাই খুলে বল্লাম। তারাও আমার স্কন্ধে সব কাজের ভার চাপিয়ে স্বর্ণের সমান ভাগ দিতে সম্মত হলেন। এক তৃতীয়াংশ স্বর্ণ আমার ভাগে পড়েছে!"

"উভয়পক্ষেই বেশ ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু ভাগ যখন সমান সমান হলো, তখন এক তৃতীয়াংশ কেন, আপনারত অর্দ্ধেক পাওয়া উচিত ছিল।"

"না, তা নয়। একভাগ জ্যারো দম্পতীর। এক ভাগ আমার, আর এক ভাগ জ্যারোর একজন অংশীদার আছে, তার জন্য। এই অংশীদারকে তারা গোলাবাড়ীর অর্দ্ধেক ভাগ দিয়াছিল! লোকটিও বড় দক্ষ, সৎ ও পরিশ্রমশীল। সবাই তার গুণে মুগ্ধ হয়েছিল। তার নাম জ্যাক ডগলস্। দেশ হইতে কি সংবাদ পেয়ে একদিন হঠাৎ সে অষ্ট্রেলিয়া ত্যাগ করে চলে যায়! জ্যারো তাহার অংশীদারের সম্মতি না লয়ে কিছুতেই কার্য্যে অগ্রসর হতে চাচ্ছেনা। তাকে খুঁজতে আমি দেশে এসেছি। আর দেশটা অনেকদিন দেখিনি একবার বেড়িয়েও গেলাম। আর স্বর্ণ তুলবার জন্য দুচারটা যন্ত্রপাতিও কিনতে হবে। কিন্তু তাকেত খুঁজে পেলাম না। গিয়ে বলিগে যে, তার অংশ পৃথক রেখে আমরা কাজে লেগে যাই।"

জ্যাক চিন্তিতভাবে নলের ধূমরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। চোপের সহিত তাহার এই অদ্ভুত মিলনের বিষয় ভাবিয়া সে বড়ই বিস্মিত হইল। মিঃ চোপ যে তাহারাই অনুসন্ধান করিতেছেন, সে যে স্বর্ণখনির অংশীদার এসব বুঝিতে তাহার একটুও বিলম্ব হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া একবার তাহার মনে হইল চোপকে বলে,—"আমারই নাম ডগলস্। আমা-কেই তুমি খুঁজছো। চল, আমরা কালই অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করি।"

কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সংযত করিয়া লইল। এবং জ্যারো দম্পতীর উদারতার বিষয় ভাবিয়া কৃতজ্ঞতায় তাহার প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু

স্বর্ণের ভাগ লওয়াত তাহার উচিত নহে। প্রথমতঃ উহাতে তাহার যে অংশ আছে, তাহা কাগজ কলমে কিছুই লেখা পড়া নাই। দ্বিতীয়তঃ জ্যাক স্বেচ্ছায় সে স্থান ত্যাগ করিয়া লাভের অংশও ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সদয় ব্যবহারে সে বড়ই আকৃষ্ট হইল এবং পুনর্ব্বার তাহাদের নিকট গিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করিতে তাহার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু ক্লাইটিকে দেখিবার আশাও একেবারে ত্যাগ করা তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর,—বড়ই শক্ত! স্থির করিল, যাইবার পূর্ব্বে একবার ক্লাইটির প্রফুল্ল বদনকমলখানি দেখিয়া যাইবে। সহস্র মাইল দূরে থাকিয়াও সে মুখ স্মরণে তাহার অনেকটা শান্তি লাভ হইবে। ক্লাইটি সুখে আছে জানিয়াও সে সুখী হইবে।

"তা মিঃ জ্যাক, তাকেও খুঁজে পেলাম না। আপনি আমার সঙ্গে চলুন না? আপনার এখানে ত কাজকর্ম্মের সুবিধা দেখছি না। এ কথা বন্ধু হিসাবেই আপনাকে বল্‌ছি; কিছু মনে করবেন না।"

"আচ্ছা, আমি ভেবে দেখবো। এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

সে রাত্রি অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া জ্যাক একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় পরদিন সন্ধ্যায় সে একাকী এক রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে উপস্থিত হইল। জ্যাক আসন গ্রহণ করিয়া একবার উদাস দৃষ্টিতে দর্শকবৃন্দের দিকে তাকাইল। একি! ও কারা বসিয়া রহিয়াছে। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে, না, ইহা যে সত্য ঘটনা! এ যে লেডী মারভিন, ক্লাইটি ও মলি। তাহার অন্তঃকরণ নাচিয়া উঠিল; দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়া জড় হইল। ক্লাইটি একই ঘরে তাহার সহিত রহিয়াছে, ডাকিলে সে শুনিতে পাইবে, এ কথা এত সহজে তাহার মন বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তাহার অন্তঃকরণের স্পন্দন এত দ্রুত হইতে লাগিল, যে ভয় হইল পাছে পার্শ্ববর্ত্তী লোক তাহা শুনিয়া ফেলে। কিন্তু পরক্ষণেই বিস্ময় ও আনন্দের স্থলে উদ্বেগ ও চিন্তা আসিয়া তাহাকে অধিকার করিয়া বসিল। সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, ক্লাইটির মুখ বিমর্ষ, দেহ বিবর্ণ ও শীর্ণ, যেন কোন অসুখে সে ভুগিতেছে।

সে কিছুতেই ক্লাইটির মুখ হইতে চোখ ফিরাইতে পারিল না। যতই দেখে, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, ক্লাইটির চেহারার ভীষণ পরিবর্ত্তন

ঘটিয়াছে। তারকার ন্যায় উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে। দৃষ্টি উদাসীন। তাহার এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? জ্যাক এরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় প্রথম অঙ্ক সম্পূর্ণ হইল। হেসকেথ আসিয়া ক্লাইটির চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিল।

অভিনয় শেষ লইলে, হেসকেথ রমণীত্রয়কে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া নিজে পদব্রজে চলিয়া গেল। জ্যাক তখন একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাদের পিছু পিছু গিয়া বাড়ী দেখিয়া আসিল।

ক্লাইটির ত দর্শন লাভ হইল! কিন্তু তাহার মুখ এত বিমর্ষ কেন? এই বিষণ্ণ মুখমণ্ডল কি সে অবশিষ্ট জীবনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ লইয়া যাইবে? ক্লাইটি এত অসুখীই বা কেন? তবে কি তাহার কোন অসুখ বিসুখ করিয়াছে? শেষবার যখন তাহাকে সে দেখে, তখন ত বেশ সুস্থ ও প্রফুল্লই দেখিয়াছিল!

(১৯)

লেডী মারভিন ও মলি বেশ মনের স্ফুর্ত্তিতেই লণ্ডনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। মিঃ ষ্ট্যাণ্টনও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন কিন্তু দুদিন পরেই বিশেষ কার্য্যবশতঃ তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হয়। মিঃ কার্টনও প্রয়োজনীয় কর্ম্মের অছিলা করিয়া দু'একদিন লণ্ডনে বেড়াইতে আসিয়াছেন। লণ্ডনে আসিয়াও ক্লাইটির দু'একবার সেই পূর্ব্বের মতন মূর্চ্ছা হইয়াছিল। ক্লাইটি উহা সামান্য বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিলেও, লেডী মারভিন ও মলি তাঁহার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

একদিন হঠাৎ পত্র আসিল যে, ষ্ট্যাণ্টন কর্ম্ম স্থানে অসুস্থ হইয়া শয্যাগত হইয়াছেন। লেডী মারভিন এসংবাদ পাইয়া বড়ই কাতর হইলেন এবং ভগ্নীদ্বয়ের পরামর্শে ষ্ট্যাণ্টনের নিকট যাওয়াই স্থির করিলেন। কিন্তু ভগ্নীদ্বয়কে বিনা অভিভাবকে লণ্ডনে রাখিয়া যাওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে ভাবিয়া তিনি নিকটস্থ এক গ্রাম্য বাড়ীতে তাহাদের রাখিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে ক্লাইটি এটর্ণি মিঃ গ্রাঞ্জারের নিকট হইতে এই মর্ম্মে পত্র পাইলেন যে, উইলের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ প্রায়, এই মাসের ২৩ তারিখই শেষ দিন।

কার্টন ও জ্যাক উভয়েই লণ্ডনের বাড়ীতে ভগ্নীদ্বয়কে খোঁজ করিতে

আসিয়া চাকরদের নিকট হইতে তাহাদের নূতন বাসার ঠিকানা জানিয়া গেলেন।

লেডী মারভিনের নিকট হইতে প্রত্যহই সংবাদ আসিতে লাগিল। মিঃ ষ্ট্যান্টন ক্রমেই আরোগ্যলাভ করিতেছেন এবং সুস্থ হইলেই লেডী মারভিন তাঁহাকে লইয়া ভগ্নীদ্বয়ের সহিত মিলিত হইবেন।

একদিন সন্ধ্যায় আহারাদি শেষ করিয়া মলি বাগানের সম্মুখে দরজায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সান্ধ্য প্রকৃতির শোভা বড়ই রমণীয়। পল্লীটি নিস্তব্ধ। মলি মনের আনন্দে মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিল। এমন সময় অদূরে মনুষ্যের পদধ্বনি শুনিতে পাইল। সে দিকে তাকাইয়া দেখিল এক বলিষ্ঠ যুবক বৃক্ষশ্রেণী ভেদ করিয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিশেষ সতর্কতার সহিত আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিয়া মলি তাহাকে চিনিতে পারিল এবং দরজা খুলিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে উদ্যত হইল।

"মিঃ ডগলস!"

জ্যাক যেন পাপী ব্যক্তির ন্যায় বলিল,—"মিস মলি, চুপ করুন; দয়া করে চেঁচাবেন না।"

"না, তা ভয় নাই। তুমি হঠাৎ উইদিকম্ব ত্যাগ করে চলে গেলে কেন? তুমি দেখছি ভদ্রলোকের বেশ ধরেছ। এসবের অর্থ কি?"

"মিস ক্লাইটি বোধ হয় বেশ সুস্থ আছেন?"

"হাঁ, তা আছেন, মন্দ নয়। আমার প্রশ্নের উত্তর আগে দাও না।"

জ্যাক মাথা নীচু করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল,—"মিস্ মলি, আপনি আমার অন্তঃকরণের কথা নিশ্চয়ই জানেন। আমি আপনার ভগ্নীকে ভালবাসি।"

"আমি জানি। প্রথম থেকেই আমি তা লক্ষ্য করে আসছি। তারপর?"

"আপনি বোধ হয় মনে মনে হাসছেন, আর ভাবছেন একজন সামান্য মৎস্যজীবী আপনার ভগ্নীকে ভালবাসতে সাহসী হয়েছে!"

"এ পোষাকে তোমাকে ত সাধারণ মৎস্যজীবী বলে বোধ হচ্ছে না। আর তা হলেও পবিত্র প্রেম বংশগত সব পার্থক্য দূর করে দেয়। তা, তুমি যদি যথার্থই আমার ভগ্নীকে ভালবাস, তাহলে পুরুষ মানুষের মতন ব্যবহার

কর। ক্লাইটিকে সে বিষয় তোমার জানান উচিত। বুঝতে পারলে ? আর দেরী করে কাজ নাই। কাল বিকাল তিনটার সময় আমরা নদীতীরে খেলা দেখতে যাবো। তুমি তখন সেখানে উপস্থিত থেকো।”

জ্যাক তাহাতেই সম্মত হইয়া ফিরিয়া গেল এবং পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নদীতীরে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে মলি সেস্থলে আসিয়া বলিল,—“এই যে জ্যাক! কেমন আছ?” হঠাৎ জ্যাককে দেখিয়া ক্লাইটির বদনমণ্ডল লজ্জারুণ হইয়া উঠিল। ক্রীড়াকৌতুকদর্শন শেষ হইয়া গেলে, মলি জ্যাককে তাহাদের টম্‌টম্ গাড়ী হাঁকাইতে অনুরোধ করিল। জ্যাক ভগ্নীদ্বয়কে তাহাদের বাড়ী লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল। ক্ষুদ্র বাড়ীটি তাহাদের হাস্য-কৌতুকে মুখরিত হইয়া উঠিল। জ্যাকের শতবার ইচ্ছা হইল যে, প্রাণের কথা সব খুলিয়া ক্লাইটিকে বলে কিন্তু তাহার মুখ খুলিল না। শেষে চাপানান্তর অন্য বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়া কল্য সন্ধ্যায় আসিবে বলিয়া জ্যাক বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন ক্লাইটিকে বড়ই সুন্দর ও প্রফুল্ল দেখা গিয়াছিল। এত স্ফুর্ত্তির সহিত তাহাকে কোনও দিন কথাবার্ত্তা কহিতে দেখা যায় নাই। জ্যাকও স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় লণ্ডনে ফিরিয়া গেল।

পরদিন ক্লাইটি শয্যাত্যাগ করিয়া এঘর ওঘর গুণগুণ স্বরে গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মিঃ কার্টন কার্য্যের অছিলা করিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন এবং একত্রে আহারাদি করিয়া বিকালে চাপানন্তর বাড়ী ফিরিলেন।

হেসকেথ চলিয়া গেলে ক্লাইটি যত্নপূর্ব্বক সুন্দর পোষাকপরিচ্ছদে আপনাকে সজ্জিত করিলেন। সাজসজ্জার প্রতি এত যত্ন তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও লন নাই। আজ তাঁহার মনও বেশ প্রফুল্ল। ক্লাইটিকে সুখী দেখিয়া মলিরও আনন্দের সীমা রহিল না। এই পরিবর্ত্তের কারণও বুঝিতে তার বেশী দেরী হইল না।

সান্ধ্যভোজ শেষ করিয়া চাপান করিবার নিমিত্ত তাহারা বাহিরের বারন্দায় আসিয়া বসিল। এমন সময় জ্যাকও আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল। মলি তাহাকে ক্লাইটির পার্শ্বে বসিবার জন্য চেয়ার দিল। দু’চার কথার পরই মলি জ্যাকের জন্য চা আনিতে উঠিল। জ্যাক ক্লাইটির সহিত কথা কহিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা ঠোটেই মিলাইয়া গেল। সে

উঠিয়া দাঁড়াইল, একি! ক্লাইটির চেহারা মৃতব্যক্তির ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছে; তাহার চায়ের পিয়ালা হাত হইতে পড়িয়া গেল। তিনি অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িলেন।

"মিস ব্রামলে—ক্লাইটি আপনি এমন করছেন কেন? শরীর অসুস্থ বোধ হচ্ছে!"

"না, না, চেঁচিয়ো না। আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই।"

মলি জ্যাকের চা লইয়া হাজির হইল। ক্লাইটি তাহাকে পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন।

জ্যাক ব্যগ্রভাবে ক্লাইটির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ক্লাইটির ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে; দেখিলে মনে হয় যেন কোন অশরীরি আত্মার সহিত তিনি কথা কহিতেছেন। যেন কোন কথা বলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল ঠোঁটই নাড়িতেছেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় কালো হইয়া গিয়াছে।

অবস্থা দেখিয়া জ্যাকের ভয় পাইল। সে মলিকে ডাকিতে উদ্যত হইল। ক্লাইটি হাত নাড়িয়া তাহাকে বারণ করিলেন, বলিলেন,—"শোন, আমি—আমি বলছি; কিন্তু বলতে বড়ই বাধ বাধ ঠেকছে। যাহোক্, আর দেরী করতে পারি না। তুমি সে কথা শুনে আমার বিষয় কি ধারণা করবে, তাও ভাববার আমার অবসর নাই। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। তা শুনে তুমি বোধ হয় বড়ই বিস্মিত, স্তম্ভিত হবে। কথাটা হচ্ছে এই—তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। হস্তদ্বয় ক্রোড়ের উপর চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি জ্যাকের মুখের উপর নিবদ্ধ,—"তুমি আমাকে বিবাহ করবে?"

একথা শুনিয়া জ্যাক আদৌ চমকিত হইল না। তাহার অন্তরাত্মাও নাচিয়া উঠিল না। তাহার মনে হইল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। ক্লাইটির ন্যায় লজ্জাশীলা মুখচোরা স্ত্রীলোককে স্বয়ং পুরুষের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিতে শুনিয়া সে একটুও বিস্মিত হইল না। অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোতে তাহার সমস্ত দেহ মন প্লাবিত হইয়া গেল।

ক্লাইটি উত্তরের আশায় তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

"আমার আবার সম্মতির প্রয়োজন কি? তুমি ত জানো, আমি নিশ্চয়ই সম্মত হব।"

"এর কারণ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। এখন এর উত্তর কিছু পাবে না। কিছুদিন পরে সব জানতে পারবে।"

জ্যাক তাহাতেই সম্মত হইল। একবার আত্মপরিচয় প্রকাশ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সংযত করিল। পাছে তাহার সঠিক পরিচয় পাইলে, ক্লাইটির মত পরিবর্ত্তিত হয়।

"আর একটি বিষয় তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে! আমাদের বিবাহের কথা তুমিও কাহাকেও বলতে পারবে না। এমন কি মলিকেও নয়। তাকে বলবার দরকার হয়, আমিই বলবো। আর বিবাহ কার্য্যও যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে। বিবাহের পর হতেই আমরা পৃথক থাকবো, তখন পত্রে তোমাকে সব কথা খুলে জানাবো।"

এসব রহস্য উদ্ঘাটন করিতে জ্যাকের ইচ্ছা হইল না। সব স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও সত্য ঘটনা। ক্লাইটি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত! বিবাহের জন্য সব আয়োজন করিতে জ্যাক সেদিন শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া গেল। ক্লাইটির মনে হইল, তিনি একটা অসম্ভব সম্ভব করিয়াছেন। কারণ আজ কালের সামাজিক জীবনে স্বাধীনতাপ্রিয় স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিতে সাহস করে না!

মলি গান গাহিতে গাহিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। ক্লাইটি তাহাকে পাশে ডাকিয়া বলিলেন,—"একটা কথা আছে; শুনে তুমি বড়ই বিস্মিত হবে। জ্যাকের সঙ্গে আমার বিবাহ ঠিক হয়ে গেছে। এই জ্যাকই হচ্ছে আমার,—স্যার উইলফ্রেড কার্টন।"

মলি শুনিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন একথা সে আজ নূতন শুনিল না।—"বহুদিন পূর্ব্বেই আমার যে সন্দেহ হয়েছিল। প্রথম যেদিন তাকে আমি ব্রামলেতে তার পিতার কবরের নিকট দেখি, সেইদিনই এ ধারণা আমার মনে জন্মেছিল। শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার কথাবার্ত্তায়, আচারব্যবহারে সে প্রতি পদে পদে ধরা পড়তো। তুমি কবে জানতে পারলে, শুনি?"

"নৌকায় সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রে। কিন্তু মলি, সাবধান, জ্যাক না জানতে পারে, আমরা তাকে চিনতে পেরেছি। তাহলে এ বিবাহে সে কিছুতেই রাজি হবে না।"

"কেন?"

"এ আবার বুঝিয়ে দিতে হবে? আমাকে বিবাহ করে পৈতৃক সম্পত্তি

লাভ করতে সে কোনমতেই সম্মত হবে না। সে মনে করেছে, আমি তার আসল পরিচয় পাই নাই। তাই বিবাহ করতে সম্মত হয়েছে। মিঃ গ্রাগ্রার লিখেছিলেন যে, জ্যাক কাগজ কলমে লিখে দিয়েছে আমাকে বিবাহ করে কিছুতেই সে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করবে না। সে কাগজটুকুও আবার তিনি কোথায় রেখেছেন, খুঁজে পান নাই। কোথায় হারিয়ে গেছে। জ্যাকের যে পরে এ বিষয়ে মত পরিবর্ত্তিত হবে, তা বিশ্বাস হয় না। আমিও আর দেরী করতে পারি না। ২৩ শে তারিখ শেষ হলো বলে। সেই জন্যই তাড়াতাড়ি কার্য্য সারবার মতলবে আমি নিজে উপযাচক হয়ে বিবাহের প্রস্তাব করেছি। জ্যাক জেলে বলে আত্মপরিচয় দিয়ে ব্রমলেবংশের রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব করতে সাহস করতো না। এ বিবাহের কথা কেউ জানতে পারবে না। তার কারণ জিজ্ঞাসা করো না। জ্যাককেও বলি নাই। সে তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছে।" (ক্রমশঃ)

একাল সেকাল

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(১৮)

সতীশ বাড়ীতে নাই, অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কার বোঝা জড় হইয়া পিসীর বুকে চাপিয়া বসিতেছিল। গচ্ছিত সম্পত্তি চুরি হইবার ভয়ে গৃহস্থ যেমন উৎকণ্ঠায় একান্ত ব্যাকুলতায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, শোভার স্বেচ্ছাচারিতা, আচার-ব্যবহার চলাফিরায় পিসীর হৃদয়ও তেমনি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। শোভা ভুলেও পিসীর দিক দিয়া ঘেসিত না. বেলা আটটা বাজীতে ঘুম হইতে উঠিয়া চা-বিস্কুট খাইয়া বাহির হইত, কোন দিন দুপুরে এক আধ ঘণ্টার জন্য ফিরিত, কোন দিন বা ফিরিবার নামও করিত না। পিসী কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যাইত, অথবা কড়া কথায় কর্কশ স্বরে বিধিয়া রাখিয়া বিদায় হইত।

দেখিতে দেখিতে বাহিরের ঘরের ঘড়ীতে ৫টা বাজিয়া গেল। উৎকণ্ঠাপূর্ণ

দৃষ্টি লইয়া পিসী পথের পানে তাকাইয়া আপন মনে আপনি কাঁপিয়া উঠিতে-ছিলেন, অস্তমিত রৌদ্র পশ্চিমের আকাশে আবির ছড়াইয়া দিল। 'জানালা গলান মৃদুমন্দ বাতাসটা তখনও কেমন গরম ঠেকিতেছিল। নীচে শোভার ব্যস্ত স্বর উঠিল—"রাম সিং, ডাক্তারবাবু আয়া নেই।"

"নেই দিদিবাবু।" বলিয়া রাম সিং আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই বিবর্ণ শোভা হুকুম করিল—"যাও, জল্‌দি বাবুকো বোলাও।"

রাম সিং চলিয়া গেল, শোভা আপন মনে বকিতে লাগিল—"এখনও আসেন নি, কেন? অসম্ভব, কথা দিয়ে চলে যাবেন, তাও কি হয়, নির্ম্মলবাবু যে তেমন মানুষই নন।"

অপরাহ্লের রৌদ্র লাগিয়া শোভার শ্রান্ত মুখ লাল করিয়া তুলিয়াছিল, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম কপাল বাহিয়া নীচে আসিয়া জড় হইতেছে,—"যদি নাই আসেন।" বলিয়া শোভা ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতে লাগিল। সহসা বসিয়া পড়িয়া শূন্য দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকাইয়া বলিল—"সব আয়োজন যে পণ্ড হবে।" বলিয়া সে মুখ ফিরাইল, আবার প্রতিবাদ করিয়া নিজের মনেই বলিতে লাগিল—"পণ্ডই বা কেন হতে যাবে, আর কি মানুষ নেই, আচ্ছা কি আক্কেল তাঁর।"

শোভা ভাবিতে লাগিল, আস্তে আস্তে মুখের রোদ সরিয়া গেল, অস্ফুটস্বরে বলিল,—নাইবা এলেন, এইত এতগুলো লোক নিমন্ত্রণ করেছি, তিনি না এলেই বা—আমার কোন্ কাজ আট্‌কে থাক্‌ছে।"

শোভার রমণীত্ব সাড়া দিয়া উঠিল, মনের যে কোণে নির্ম্মলের জন্য একটা অজ্ঞাত লালসার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল, সেই কোণটায় কেমন্ টন্ করিয়া আঘাত লাগিল। বীণার তার যেন অঙ্গুলীর আঘাতে বেসুরা বাজিয়া উঠিল। লুকায়িত প্রবৃত্তিটি যেন ধরা দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। ঠিক এই সময়ে পিসী আসিয়া ডাকিলেন—"শোভা।"

"কেন পিসীমা।"

শোভার এই একান্ত অসম্ভব স্বরে পিসী থমকিয়া গেলেন, ঘরের দুইটা প্রাণীর কেহই এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ খুজিয়া পাইল না। মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে পিসী বলিলেন—"আয় মা, আমার ঘরে দুদণ্ড বস্‌বি, সতীশ বাড়ী নেই, একাটি যে হাপিয়ে উঠেছি।"

"আমার ত আজ বস্‌বার জোটি নেই।" বলিয়া শোভা আবার পথের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল।

পিসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন? আবার কোথাও যেতে হবে না কি?"

উদাস ভাবে শোভা উত্তর করিল—"আজ যে আমাদের বাগানপার্টি।"

পিসীর মনটা দ্বিগুণ ভাবে দমিয়া গেল, সামান্য একটু স্বরের পরিবর্ত্তনে যে স্নেহের বন্যাটা তাহার বুকের উপরকার ধূলাকাদা মুছিয়া দিবে আশা করিতেছিলেন, সেই বন্যাটাই যেন পরপারের চড়া হইতে রাশীকৃত কাদা লইয়া তাহার সারা বুকে স্তূপীকৃত করিয়া চাপাইয়া দিল। ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ কি না গেলেই নয় শোভা।"

"না গেলে কি করে হবে"—বলিয়া শোভা হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চিন্তামলিন মুখের কোণের সে হাসিটুকু যেন মুহূর্ত্তে কোথায় বিলীন হইয়া গেল। যেন আকাশের কাল রঙ্গের গাঢ়তা বাড়িয়াই উঠিল। মনে মনে বলিল,—না গেলে ত নয়,কিন্তু গিয়েই বা কি কর্চ্ছি,যার জন্যে এত আয়োজন, সেই যখন এল না, তখন এ যে মাটিশূন্য খড়কাঠের প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্যই যাওয়া হচ্ছে।"

পিসী অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন,—"সতীশ কবে আস্‌বে রে শোভা?"

"দাদাবাবু!—তিনিত এই দুতিন দিনের মধ্যেই আস্‌ছেন।"

"একটা দিন অপেক্ষা কল্লে কি চলে না রে শোভা।"

"ঐত দোষ তোমার" বলিয়া শোভা বেঁকিয়া বসিল, বলিল—"যা বুঝ্‌বে না, তাই নিয়ে কথা বল্‌তে এস বলেই তোমায় আমায় বনে না।"

পিসী স্বর খাট করিয়া ভীতভাবে উত্তর করিলেন—"কেমন করেই বা বন্‌বে মা, দেখ্‌তিস্ যদি আজ তোর মা থাকৃত।"

শোভা একটা ক্ষুদ্র শ্বাস ত্যাগ করিল, ভয়ানক বিস্ময়ের স্বরে উত্তর করিল—"মা থাকলে আমায় ঘরে আটক করে রাখ্‌ত, তাই না!"

"তখন টের পেতিস্ মা—সে চলে গেছে, তাইত, যত জ্বালা এই বুড়ীর।"

শোভার বড্ড হাঁসি পাইতেছিল, তবু যেন কেমন সে আজ হাসিতে পারিল না, জোর দিয়া বলিল—"তুমি ঠিক যেন পিসীমা, মা থাকৃলে আমায় আটক করে রাখ্‌তে চাইত না, সে ঠিক বুঝ্‌ত, সে কাল চলে গেছে।"

"চলে কিছুই যায়নি রে শোভা।"

শোভার কেমন তর্ক করিবার শক্তিও ছিল না, একটা মরা চিন্তা

যেন বার বারই তাহার হৃদয়ের উপর সাড়া দিয়া উঠিতেছিল। সে এবার রুষ্ট স্বরে বলিল—"তোমার ঐ এক কথা, চলে যায় নি, দেখ্‌তে ত পাচ্ছ, কোথায় আজও তোমার মত মালা টপ্‌টপানি রয়েছে?"

"যার যা সাজে।" বলিয়া পিসী থামিলেন, জোর করিয়া শ্বাস টানিয়া লইয়া বলিলেন—"কেউ বা মালা জপে, কেউ বা ঘরসংসার করে।"

"আর যারা পড়্‌ছে পড়াচ্ছে।"

"তারা ম্লেচ্ছ হয়েছে।"

এবার আর শোভা হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, হাসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"যাও, আর অত বাজে বক্‌তে এস না যেন, সবাই যখন ম্লেচ্ছ, তখনত আর বাচবিচার করে চল্‌বে না, ছেলে মেয়ে বৌ ঝী সবাই যদি অস্পৃশ্য হয় ত, তা নিয়েই যে ঘরসংসার কর্ত্তে হবে।"

পিসীর আর সাহসে কুলাইল না, তিনি মুখ নীচু করিয়া পা বাড়াইলেন। বাহিরের দিকে চাহিয়া শোভাও কেমন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অন্যমনে ডাকিল—"পিসী মা।"

পিসী ফিরিয়া দাঁড়াইতেই, শোভা একপা অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"যারা লেখা পড়া কর্‌বে, তারা সবাই যদি ম্লেচ্ছ, তবে দাদাবাবু আমায় পড়্‌তে দিলেন কেন?"

পিসী কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর করিলেন—"তাতে কি তোর দাদাই সুখী হয়েছে রে, সেদিন দুঃখ করে কত বল্লে।"

"কি"—বলিয়া শোভা উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি লইয়া পিসীর মুখের দিকে তাকাইল।

পিসী বলিলেন—"সে অনেক কথা।"

শোভার মন ভার হইয়া উঠিল, পৃথিবীর মধ্যে ভ্রাতা সতীশকেই সে আপন বলিয়া জানিত, তাহার হৃদয়ের স্নেহ, কোমলতা একমাত্র সতীশের জন্যই যেন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছিল, তাই আজ পিসীর এই অসম্ভব কথাটা তাহার তর্কের গোড়াটা জটিল করিয়া তুলিল। তবু সে নির্ব্বন্ধের সহিত বলিল—"অসম্ভব, স্ত্রীশিক্ষায় দাদাবাবুর কষ্ট হতেই পারে না, শিক্ষাতে যে সবারই সমান প্রয়োজন, একথা তিনি মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করেছেন।"

পিসী অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"কি জানি, হবে হয়ত।"

"হবে কি, তুমি সত্যি করে বল পিসী মা, দাদাবাবু এমন কোন কথা তোমায় বলেছেন।"

শোভার সেই বিষণ্ণ অথচ উত্তেজিত মুখের ভাব দেখিয়া করুণাময়ী পিসীর করুণায় আঘাত লাগিল, তিনি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—"কি জানি মা, বুড়ো মানুষ, হয়ত কি শুন্‌তে কি শুনে ফেলেছি।"

"তাই বল।" বলিয়া শোভা সোজা হইয়া দাঁড়াইতেই রামসিং প্রবেশ করিয়া বলিল—"ডাক্তাবাবু চলা গিয়া।"

সহসা আকাশ হইতে পড়িয়া খোঁড়া পায়ে জোর করিয়া দাঁড়াইয়া শোভা জড়িত কণ্ঠে বলিল—"চলে গেলেন কি রে, আমি যে তাঁরি জন্যে এত আয়োজন করেছি।"

খোট্টা দারোয়ান রাম সিং অত বুঝিল না, সে তাহার কথারই দ্বিরুক্তি করিল, সূর্য্য তখন একেবারেই ঢলিয়া পড়িয়াছিল। দূর দিগন্তের গাঢ় রক্ত রাগের মত শোভার মুখও একেবারে লাল হইয়া গেল। "চলে গেলেন, একটা খবর দিতে পর্য্যন্ত সময় হল না" বলিতে বলিতে সে ইজি চেয়ারের এক কোণে বসিয়া পড়িয়া ঘন শ্বাস টানিতে লাগিল।

(১৯)

ছোট্ট ক্যাম্বিশের বেগ হাতে নির্ম্মল আসিয়া ঘরের দোড়ে দাঁড়াইল, "মা" বলিয়া ডাকিতে গিয়া অপরাধীর মত তাহার স্বর আট্‌কাইয়া আসিতেছিল। বিমলা ঠাকুরের ভোগ রাঁধিতেছিল। জ্বলন্ত কড়ায় তেল ঢালিয়া দিয়া শান্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"শান্তি! দেখ্‌ত, দুপুর রোদে কে এল, বাইরে জুতার শব্দ শোনা যাচ্ছিল না।"

শান্তির দেখিতে হইল না, দোরের গোড়ায় বেগটা নামাইয়া নির্ম্মল তাহার প্রথম কাঁপনিটা কমাইয়া দিয়া ধরা গলায় ডাকিল—"মা।"

বিমলার হাতের থালাটা কাটা তরকারিশুদ্ধ মাটিতে পড়িয়া গেল। "দাদাবাবু যে।" বলিয়া শান্তি ত্বরিত পদে বাহির হইয়া গেল। কড়ার তেলটা জ্বলিয়া উঠিল, ক্ষীপ্রহস্তে একটা বাসন চাপা দিতে দিতে বিমলা যুক্ত করে ডাকিয়া বলিল—"ভগবান্, আমার অপরাধ নিয়ো না, আমি অবলা, তোমার বল না পেলেত কোন কাজ করিতে পারি না।"

"কে বাছা, নির্ম্মল এলি বাপ" বলিয়া গিন্নী আসিয়া পুত্রের হাত ধরিলেন। নির্ম্মল মায়ের পায়ের উপর পড়িয়া প্রণাম করিতেই তাহার মাথার উপর কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অপরাধটা যেন প্রমাণ লইয়া সোজা খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। করুণাময়ী পুত্রের হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ

করিতে করিতে ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে বলিলেন—"আয় বাপ, এম্‌নি করে নাকি আমাকে কষ্ট দিতে হয়।"

নির্ম্মলের মুখে কথা ফুটিল না, কারণে অকারণে পুঞ্জীভূত সম্ভব-অসম্ভব চিন্তার রাশি যেন তাহার চাপা বুকের উপর ভার বোঝা হইয়া পড়িল। পুত্তলীর মত সে মায়ের অনুগমন করিল। করুণাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেখানে বেশ ভাল ছিলি ত।"

নির্ম্মল নিজের শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিল, অসুখবিসুখ তাহার কিছু হয় নাই, তবু কেমন সে বলিতে সাহস পাইল না, তাহার শরীর বেশ ভাল ছিল। করুণাময়ী পাখা লইয়া বাতাস করিতে গেলে সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"থাক্‌ মা, তুমি কেন?" একটা অজ্ঞাত ক্ষোভ যেন তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল, এমনই সেবার জন্য সে যেন কাতর ভাবে কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মা তাহা বুঝিলেন না, হায় মাতৃহৃদয়ের সেই গভীর অতলস্পর্শ স্নেহ-মমতার কথা কে বুঝিবে। কাল ও বয়স যে আপন দাবী লইয়া মাতৃস্নেহকেও পরাঙ্মুখ করিতে চাহে। যে স্নেহ একদিন চরম আরাম প্রদান করিত, আজ আর নির্ম্মল সে স্নেহের দাবী করিতে চাহে না, তাহার পরিবর্ত্তে তাহার নূতন গঠিত মন নব সেবার জন্য আগ্রহব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। করুণাময়ী কিন্তু পুত্রের কথায় কাণও দিলেন না, এক হাতে পাখা করিতে করিতে অন্য হাতে কপালের ঘাম মুছিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যারে গাড়ীতে কোন কষ্ট হয়নিত!"

"না" বলিয়া নির্ম্মল মাতার মুখের দিকে তাকাইল। সেই পূত আনন হইতে যেন স্নেহের উদ্বেগের ধারা জোয়ারের মত ছুটিয়া বাহির হইতেছে। অতিকষ্টে এবার সে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা সব ভাল ছিলেত মা!"

"মার নাকি আবার ভাল থাকৃতে আছে!" বলিয়া খানিকক্ষণ থামিয়া করুণাময়ী আবার বলিলেন—"বুঝ্‌বি যখন নিজের ছেলে এম্‌নি বিদেশে যাবে!"

বিমলা যেন এতক্ষণ নেশার ঘোরে অচেতন হইয়াছিল, একবার উঁকি দিয়া দেখিবে সে শক্তিও তাহার হয় নাই, সহসা পায়ের শব্দে সে চমকিয়া উঠিল, সদানন্দ ঘরে ঢুকিলেন, এক পাশে শালগ্রাম শিলা রাখিয়া ভোগের

ব্যবস্থা দেখিয়া বিষণ্ণ মুখে একবারমাত্র তাকাইতেই বিমলার চোখ বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি কথাটিও না বলিয়া অপ্রসন্ন মনেই ভোগ নিবেদন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বাসনচাপা কড়ার তেলটা কিন্তু তখনও বিমলার অপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য অবরুদ্ধভাবে তাহার কাণের গোড়ায় ফোস্ ফোস্ করিতেছিল। মূক গৃহদেবতাটির কাছ হইতে এই ভাবে অপরাধী হইয়া বিমলার প্রাণটা যেন থেকে থেকে কাঁপিয়া উঠিতে ছিল। সে কেবলই ভাবিতেছিল, কিছু পরে যখন এই প্রত্যক্ষ দেবতাটি আহারে বসিবেন, তখন কেমন করিয়া ডালমাত্র উপকরণ দিয়া শ্বশুরের পাতের গোড়ায় ভাত দিবে। বিমলা শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্ষীপ্র হস্তে দুই তিনটা ব্যঞ্জন করিয়া লইয়া শ্বশুরের আসন পাতিয়া মনে মনে ভাবিয়া বলিল—"তুমিত অন্তর্য্যামী, আমার অন্তরের কথা বুঝিয়া ক্ষমা করিও দেব।"

ঘণ্টাখানিক পরে আহারে বসিয়া সদানন্দ মুখ বিকৃত করিলেন, বলিলেন—"এ সব কি করেছ বৌমা, জানত, আমি ভোগের প্রসাদ ছাড়া আর কিছু খাই নি!"

বিমলার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, তবু মুখে কথা ফোটে না, সদানন্দ বলিলেন—"হয়ে যা গেছে তারি জন্যে আমি অনুতাপ করি না, কথা এই, এমনটা যেন আর হয় না, গৃহস্থ ঘরে গৃহদেবতার ভোগ না হলে যে দিনটাই বৃথা যায়।" বলিয়া তিনি বিমলার ক্ষিপ্রহস্তে যত্নে প্রস্তুত ব্যঞ্জন-গুলি হাত দিয়া ঠেলিয়া রাখিলেন।

বিমলা আর পারিল না, অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"অপরাধ যা তাত হয়েছে, আপনি যেন তাকে আর বাড়িয়ে তুল্‌বেন না।"

সদানন্দ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"বাড়িয়ে তুল্‌তে পারি না বলেই যে, তোমার এত যত্নের তৈরী ব্যঞ্জনগুলি আমায় ত্যাগ কর্ত্তে হচ্ছে।"

"কিন্তু আপনিত আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, আমিত আপনাকেও দেবতার চেয়ে কম মনে করি না।"

"ঐ কম মনে না করাটাই, আমি যে ও অপেক্ষা কত কম, তাই প্রমাণ করে দিচ্ছো মা।" বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি গণ্ডূষ করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

সাথী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(লেখক—শ্রীপরেশনাথ সরকার)

(১৬)

সেই যেদিন ভূপেন কিরণকে লইয়া গিয়া তরুর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়াছিল, সেই দিন যে কিরণ অমন ভাবে তরুর কাছ হইতে চলিয়া আসিল, তারপর আর সেখানে একবারও যায় নাই! প্রথম দুই এক দিন মনটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সম্মুখে একটা প্রবল পিপাসা রহিয়া গিয়াছে আভা, সে মনের সঙ্গে যুদ্ধে অনায়াসেই ইচ্ছা করিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল।

ভূপেনের অবস্থা ভাল ছিল না। সে টিউসনি করিয়া কোন রকমে পড়ার খরচ চালাইত, বৃদ্ধা মাতা, একমাত্র পুত্র রাখিয়া থাকিতে পারিতেন না, তিনি আসিয়া পুত্রের কাছে থাকিলেন, বাড়ীর খরচও ভূপেনকেই বহন করিতে হইবে, তাই মাকে কলিকাতা রাখিতে তাহার কোন আপত্তির কারণ ছিল না! এবাড়ী ভূপেনের মামার, ভাড়ায় খাটিত, মাত্র ৩টি ঘর মামা ভূপেন ও তাহার ভগ্নীর থাকিবার জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতায় থাকিবার মধ্যে বাসাভাড়াই বড় খরচ! সেই সামান্য আয়ে ভূপেন কোন মতে সংসার চালাইয়া আসিতেছে। কিছু দিন হইল মাতৃহীন, পতিপরিত্যক্তা তরু একমাত্র সংসার আশ্রয় পিতাকে হারাইয়া আসিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল! ভূপেন এই টানাটানির সংসারে তাহাকে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত বরণ করিয়া লইল। মাতা মনসা তরুণ নবজাত শিশুটির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ভূপেনকে বলিলেন—"বাবা, আমার এ দাদুর জন্যে তোরে কিছু ভাব্‌তে হবে না, আমার বিকালের জলখাবারটা বন্ধ করিয়া দিলেই হবে। মায়ের কথাটায় ভূপেনের মনে বড় লাগিল; হায়, এমন দরিদ্র করিয়া ভগবান কেন তাহাকে সংসারে পাঠাইলেন। সে হাসিয়া বলিল—"সেকি, মা খোকার খরচ ভগবান্ জুটাবেন!"

মেট্রোপলিটন কলেজে একদিন কিরণের সঙ্গে ভূপেনের আলাপ হইল! সেইদিন হইতে তাহারা বেশ মিশামিশি করিতে আরম্ভ করিয়াছে! তাহার সঙ্গে মিশিয়া ভূপেন বুঝিতে পারিল কিরণ তরুর স্বামি! কিন্তু তখন কিরণ স্বর্গচ্যুত্যগঙ্গাধারার মত প্রবল বেগে একটা নূতন প্রেমের কৌতুহল পূর্ণ কাহিনী তাহাকে শুনাইয়া আসিতেছিল! তাহার মন বড় অধীর হইয়া পড়িল। তরুর দিকে চাহিয়া তাহার চক্ষে জল আসিত! কিন্তু তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল, খোকা একটু বড় হইলে সে আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে, এদের মিলন ঘটান যায় কিনা! এমন একটা সৌরভময় জীবন তরুর ব্যর্থ চলিয়া যাইবে। সেদিন যখন সেই গঙ্গাধারে বিনোদ তাহাকে কিরণের সেই আরাধ্যাদেবীর ফটো দেখাইল, তখন তাহার মনের অনেকটা বোঝা নামিয়া গেল, কারণ সে দেখিল আভা কিরণের ভালবাসার পাত্রী! আভাকে ভূপেন চিনিত! আভা তরুর বাল্য সখী! জীবনবাবু একবার কলিকাতায় গঙ্গা স্নান করিতে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। সত্যচরণের সঙ্গে গঙ্গাধারে তাহার সাক্ষাৎ হয়; তিনি সেই অবস্থায় তাহাকে তাহাদের বাড়ী লইয়া আসেন। সঙ্গে ছিল তাহার একমাত্র কন্যা তরু! তরুর তখন বিবাহ হয় নাই। সেই অসুখে জীবনবাবুকে প্রায় ৩ মাস সত্যচরণের বাড়ী থাকিতে হয়। সেই সময় হইতে তরুর সঙ্গে আভার ভাব! মাঝে মাঝে আভা তরুকে পত্র দিত, তারপর অনেকদিন তরুও আভার কোন সংবাদ লইত না, সেই সময়ের মধ্যে তরুর বিবাহ হইল এবং সে স্বামী হইতে বিতাড়িত হইল! তরু কলিকাতায় আসিয়া একবার আভাকে পত্র লিখিল। আভা তরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল! সেইদিন ভূপেন নিজের একটু অসুবিধা স্বীকার করিয়াও রীতিমত আয়োজন করিয়াছিল! তরু স্বহস্তে পাক করিয়া প্রাণের সখিকে আহার করাইল। সেই দিন হইতে মাঝে মাঝে দুইজনের সাক্ষাৎ হইত। আভা কলেজ হইতে আসিতে আসিতে, হয় ত তরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিত! আভা তরুর জন্য মনে বড় আঘাত পাইল! তরুর মন যখন মরুভূমির মত খা খা করিয়া উঠিত, তখন আভা আসিয়া তাহাকে যতদুর পারিত স্বান্তনা দিয়া যাইত।

ভূপেন সেইদিন পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া গিয়াছিলে যে সে কিরণকে লইয়া আসিবে, তাই তরু বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়াছিল। কিরণ জানিত ভূপেন এইটা মেসে থাকে! সে কিরণকে তাহার পরিচয় একদিনের জন্যও

দেয় নাই! বিষয়টা তাহার ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিরণ আবার বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প, এ বিষয়টা যদিও ঘটনাক্রমে সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল তথাপি তাহার কিছুতেই বিশ্বাস হইতে ছিল না, যে ভগবান কি চিরদিন তরুকে এমনি ভাবে কাঁদাইবেন! সে কিরণকে কৌশল করিয়া লইয়া আসিল, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। সেই বিরহসন্তপ্তা যৌবন সুষমা-বিজড়িতা লাবণ্যময়ী তরুলতা, সেই কুন্দ-কোরকের মত সুন্দর শিশুপুত্র কিছুতেই কিরণের মনে একটা দাগ আঁকিয়া দিতে পারিল না!

তরু স্নান করিয়া উপরে উঠিয়া আসেতেছিল, মনসা বলিলেন—একি মা আজ এত সকালে স্নান করলি?

তরু মনসার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তাতে কি মাসী মা স্নান ত করতেই হবে, তা নয় একটু আগেই করে এসেছি!

মনসার কোলে তরুর শিশুপুত্র ছিল, মনসা তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিলেন দাদু, মা যে নেযে এসেছে, তাকে কি খেতে দেব বল?

তরু মনসার দিকে চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

ভূপেনের যে টিউসনি ছিল তার একটা টিউসনি গিয়াছে, তাই এখন এত টানাটানি পড়িয়াছে যে একবেলা অন্ন সংস্থানের কষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ভূপেনকে কলেজে যাইতে হয়, তরু সকালে ১০টার সময় পাক করিয়া রাখিত। সেই ১০টায় আহার করিয়া আর সকল সময়টা উপবাস দিয়া পরদিন আবার ১০টায় আহারের বন্দোবস্ত করিত। তাই ভূপেন নিয়ম করিয়াছিল, বেলা ১০টায় পাক করিয়া রাখিতে, আড়াইটায় তাহার এক ঘণ্টা ছুটি আছে, সেই সময় সে আসিয়া খাইয়া যাইত। মনসা পুত্র ও বোনঝির এই কষ্টের মধ্যেও তরুর শিশুপুত্রকে দুই বেলা একটু দুধ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন!

তরু ঘরে আসিয়া গামছাখানা রাখিয়া দিয়া কপালে সিন্দুর পরিল, মনসা ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন—তরু, কাল ত খোকা রেতে খায়নি, তার সে দুধটুকু রয়েছে, সেটুকু না হয় মুখে দিয়ে নে!

তরু হাসিয়া উত্তর করিল—সে কি মাসীমা, এরি মধ্যে বুঝি আবার ক্ষিদে পেতে পারে!

কখন ক্ষুধা পায় না পায়, তা কি মনসা জানেন না। তরুকে কি তিনি নূতন দেখিতেছেন! যে তরু একটু ক্ষুধা সহ্য করিতে পারিত না, সে আজ

এই কথা বলিতেছে। তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, তিনি বলিলেন—না, না, তুই খেয়ে নে।

তরু কথাটা চাপা দিয়া বলিল—আজ ত তোমার একাদশীর উপস মাসীমা, হাতে একটা পয়সা নেই, কাল সকালে কি হবে?

মনসা বলিলেন—তুই যদি ও না খাবি ত, আজ আমি মাথা খুড়ে মরব।

একটা গভীর বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তরু বলিল—মাসীমা, এমন ভাবে কতদিন চলবে?

মনসা বলিলেন—যে ক'দিন ভগবান চালান।

"একটা কাজ করলে হয় না।"

"কি?"

"আর একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না?"

"তোর বাপ যে অকালে কেন মরেছে তা জানিস্? তোর শ্বশুর ত বাছা মানুষ নয়। আর জামাই—"

তরু বাধা দিয়া বলিল—সে যাহা হ'ক, মাসীমা, সেই সংসারেইত আমার স্বর্গ। আমি একবার চেষ্টা করে দেখব।

মনসা চখের জল মুছিয়া বলিলেন—সে ভাগ্য কি আমার হবে মা, তোকে হাসিমুখে আবার শ্বশুরের ঘর করতে দেখে চক্ষু বুজব।

তরু চুপ করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল, তারপর বলিল—এতে আমার কোন অপমান নাই মাসীমা, স্বামীর ঘর সতীর পবিত্র তীর্থ। অদৃষ্টে যাই হোক, একবার সেখানে যাব, খাশুড়ীর কোলে খোকাকে ফেলে দিয়ে তার পর যা হয় তাই করব!

ভূপেন কথাটা শুনিয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—সেই ভাল, তরু একবার ভাল করে অদৃষ্ট পরীক্ষা করে আয়। তার পর দুই ভাই বোনে একসঙ্গে অনন্ত দুঃখরাশিকে বরণ করিব!

১৭

যেদিন কিরণের পিতা কিশোরীমোহন বাবু সত্যচরণ বাবুর একমাত্র কন্যাকে কিরণের হাতে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া আসিলেন, তাহার পর দিন বিনোদ আসিয়া কিরণকে বলিল—এইবার ভায়া খাইয়ে দাও ত!

কিরণ এক মুখ হাসি হাসিয়া বলিল—মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ। তুমিও যে ভায়া সেই শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়লে!

বিনোদ হাসিয়া বলিল—যাক্ ভাই, আজ না হয় একদিনের মত ইতরই হলেম!

কিরণ বলিল—কিহে তোমার ভূপেনের খবর কি?

বিনোদ হাসিয়া বলিল—সেই যে তোমায় কোথায় নিয়ে গেল, তার পর থেকে ত তার সঙ্গে বড় সাক্ষ্যাৎ হয় না। যদিও বা দু একদিন হয়, সে যেন তেমনটা আর মেশে না! আচ্ছা তাকে এ শুভ সংবাদটা দিয়েছ!

কিরণ একটু থতমত খাইয়া বলিল—না হে তাকে এখনো বলা হয় নি, একেবারে নিমন্ত্রণ পত্র গিয়ে হাজির হবে, সেই বেশ!

বিনোদ বলিল—ভূপেনের কিন্তু বড় বিশ্বাস ছিল, তুমি এ বিবাহ কিছুতেই করতে পারবে না!

"কি করে বুঝলে?"

"একদিন ত সে আমার সঙ্গে কথায় কথায় বাজী বেঁধেই বসল।"

কিরণ চুপ করিয়া রহিল। পশ্চিমের দিকের জানালাটা মুক্ত ছিল, সে সেই বাতায়নপথে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। সূর্য্য কোথায় ঢলিয়া পড়িয়াছে, কে জানে। নভ নীল যমুনায় কে যেন কনকের কলসী ভাসাইয়া দিয়াছে। কিরণের মনে হইল সমস্ত আকাশখানিতে যেন কাহার অলক্তক রাগ রঞ্জিত চরণ চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে। সে চরণের নপূর-নিক্কন যেন তাহার পরিচিত, বাসর-নিশীথের লজ্জা-জড়িতা নববধূ তরুলতা-কম্পিত চরণে যেন একদিন সেই মধুর মঞ্জির-ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল। তার পর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে, তরুলতা তাহাকে আশ্রয় পাদপের মত কেমন করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল! ধীরে ধীরে সে কেমন করিয়া সেই লতাপাশ মুক্ত হইয়া একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল। তার পর সেইদিনকার সেই তরু, কেমন বুকভরা প্রেম, দেহভরা লাবণ্য, সেই আবেগময়ী তটিনীর প্রেম পরিপূর্ণ হৃদয়া, তাহার হৃদয়টাকে একটা মুহূর্ত্তের মধ্যে তোলপাড় করিয়া দিয়াছিল। আর সেই সুন্দর সুকুমার শিশুপুত্র! কিরণ যেন দেখিল, সেই সন্ধ্যার আকাশে স্তরে স্তরে মেঘগুলি যেন সেই তরুর সেই দিনকার ভাব ও লাবণ্য এবং শিশুর সেই সুন্দর গঠনের অনুকরণ করিয়া আকাশের গায়ে ভাসিয়া যাইতেছে। সে একটা গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবিতে চেষ্টা করিল, সন্ধ্যার আকাশখানি যেন আভার হৃদয়ের প্রেম-তুলিকা স্পর্শে আজি এমন মধুর সাজিয়াছে।

বিনোদ বলিল—কিহে তুমি যে বড় চুপ করিয়ে গেলে, এর পর ত দরজায় "প্রবেশ নিষেধ" টানিয়ে দেবে!

কিরণ একটা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—সে দেখা যাবে পরে!

বিনোদ বলিল—একখানা গান শুনায়ে দাও না হয়!

গত কল্যকার আনন্দ কিরণ আর বুকে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই, সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ভাবিয়াছে, কি করিয়া আভাকে তাহার হৃদয়ের গৃহে বরণ করিয়া লইবে। এতদিন সে নীরবে উপাসনা করিয়াছে। সেই নীরব উপাসনায় দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে তাহার বাঞ্ছিত রতন মিলাইয়া দিতেছেন, কি করিয়া তাহাকে অভিবাদন করা যায়। তাহার সমস্ত কাব্য-কানন ফুলে-ফলে সহসা ভরিয়া উঠিয়াছে। কোথা হইতে এমন মলয় সমীরণ ছুটিয়া আসিল, যে তাহার পতিত মানস-মালঞ্চ সুন্দর ফুলে ফুলে ভরিয়া দিল! সে সবগুলি ফুল কুড়াইয়া আনিয়া সমস্ত রজনী জাগিয়া, একগাছি মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছে, এই প্রেমহার তাহার বাঞ্ছিতার কমকণ্ঠে পরাইয়া দিবে। কিরণ বিনোদকে বলিল—আচ্ছা গাহিব, কাল একটা গান বেঁধেছি ভাই।

বিনোদ হাসিয়া বলিল—সেইটাই শুনব। কালকার গানের ভিতর নিশ্চয় কিছু আছে।

কিরণ হারমোনিয়মটা টানিয়া লইয়া গাহিল—

ধর জীবন, ধর যৌবন, ধর অর্ঘ্য এনেছি চরণে,
ধর প্রণয়ের মণি মুকুতার মালা মঞ্জু মধুর বরণে।
আজি আবেশে মলয় বহিয়ে মন্দ,
পরাণে জাগায় কি নব ছন্দ;
শুধু রহি রহি হিয়া উঠিছে কাঁপিয়া তব মধুময় স্মরণে!
ধর কম্পিত হিয়া স্পন্দিত প্রাণ
তোমাকেই শুধু করিব হে দান,
ধর, জীবন দিয়ে লওগো জড়ায়ে শিথিল করোনা মরণে!

গানের প্রত্যেক বর্ণ সজীব হইয়া যেন কক্ষের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল!

বিনোদ অভিভূত হইয়া বলিল—সত্যি ভাই কিরণ; এই বিয়ে হয়ে তোর

হল ভাল। তোর কদর বুঝ্‌তে পারবে। তোর ভিতর এমন বিদ্যে আছে সে কি। একটা অশিক্ষিতা মেয়ে বুঝ্‌তে পারে ?

এই সময় বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—খোকা, দেখে এস্‌ত বাড়ীতে ওরা কে এসেছে !

কিরণ হারমোনিয়মটা সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিল। বিনোদ বসিয়া রহিল, হারমোনিয়মটা কোলের কাছে লইয়া একটা গদের লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধারে মন সন্নিবেশ করিল।

কিরণ ও মাতা বিনোদিনী নিচে নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, আঙ্গিনায় একটি যুবতী একটি শিশু ক্রোড়ে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মুখ অর্দ্ধ আবৃত—তাহারা চাহিয়া দেখিলেন, এ মুখখানি তরুলতার।

এই সময় কিশোরী বাবু বাড়ী প্রবেশ করিলেন! তিনি একবার তরুলতা ও শিশুপুত্রের দিকে চাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

বিনোদিনী তাহার পেছু পেছু উপরে উঠিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন—বধূমাতা যে ছেলে কোলে করে এসেছে !

কিশোরী বাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—কি করতে চাও ?

"তাকে কি ঘরে আনব না ?"

"কেন ?"

"শত হলেও ত আমার পুত্রবধু, ও কি দোষ করেছে।"

"দোষ করেছে ওর বাবা।"

"সেজন্য সে শাস্তি ভোগ করবে। লক্ষ্মীবউ আমার, তার জন্য এত কষ্ট সহ্য করবে কেন ?"

"যার যার অদৃষ্ট নিয়ে পৃথিবীতে আসে, যাও বিরক্ত করোনা।"

"তবে কি হবে ; বাড়ীতে এসেছে।"

"আসতে বল্লে কে ?

"নিজের ঘর করতে আসবে তাকে আবার কে আসতে বলবে গা ?"

"আমি ত তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, এ বাড়ীতে তার স্থান হবে না !"

বিনোদিনী বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তাঁহার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া গেল, অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে এক এক বার লুকাইয়া শিশুটিকে দেখিতে লাগিলেন! হায় এই শিশুর সহিত তাঁহার ঘরের বউ, তিনি কি করিয়া তাড়াইয়া দিবেন ?

তরুলতা দেখিল, তাহার শ্বশ্রূমাতা নামিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার শশুরের সঙ্গে আবার উপরে উঠিয়া গেলেন,আর ফিরিয়া আসিলেন না। কিরণ মায়ের সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছিল। তরুকে এমন ভাবে তাহাদের বাড়ী আসিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া গিয়েছিল। সে কি করিবে ঠিক করিয়া উঠিবার পূর্ব্বে, তরু ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া বলিল—বলে দাও, ওগো বলে দাও, আমি কি করব ?

কিরণ বলিল—এ ভাবে এসে তুমি ভাল করো নাই !

"কি মন্দ করেছি, বল ত? আমার সংসারে এত থাকতে, আমি কেন পরের বোঝা হয়ে পড়ে থাকব? আমার শিশুর যত্ন করবার, আদর করবার মানুষ থাকতে, আমি তাঁদের ভাসিয়ে দিয়ে নিজে খোকার উপর রোজ রোজ চখের জল ফেলব?"

"তোমাকে ত কেউ এবাড়ী ডেকে আনে নাই!"

ডেকে আনে নাই! ডেকে আনে নাই! নিশ্চয় তাকে ডেকে এনেছে! সেই বিবাহ বাসরে ধর্ম্মসাক্ষ্য করিয়া, পূত মন্ত্রে অভিষেক করিয়া তাহার স্বামী তাকে এ সংসারে ডেকে আনে নাই? আজ এ কি কথা। না না, এতবড় ভীষণ কথা তাহার স্বামী কি করিয়া বলিল!

তরু বলিল—নিশ্চয় ডেকে এনেছ। নৈলে ধর্ম্ম সাক্ষী করে আমায় গ্রহণ করলে কেন? দেখ আমায় আর পরিত্যাগ করোনা। ছোট ছিলেম বুঝিনি, তোমায় কি করে যত্ন করতে হয়। আমাকে আর একবার চরণতলে বসিয়ে দাও। আমি সাধ পূর্ণ করে তোমার সেবা করি।

কিরণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে! আভার সঙ্গে বিবাহ এক প্রকার ঠিক হইয়া গিয়াছে। এখন যদি পাশের বাড়ীর কেহ দেখিতে পায়, তরুলতা স্বামীগৃহে আবার আসিয়াছে। তখন—একটা ভয়ানক গণ্ডোগোল ঘটিবে!

কিরণ বলিল—দেখ শুধু শুধু অপমানিত হতে এসেছ! তুমি ত বাবাকে ভালই জান!

তরু একটুকাল চুপ্ করিয়া রহিল, তারপর বলিল—তিনি কি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন না?

কিরণ কথা বলিল না।

তরু বলিল—কি করব, বলনা?

"আমি কিছুই জানি না" বলিয়া কিরণ উপরে উঠিয়া গেল। তরু শিশুপুত্র ক্রোড়ে সেইখানে দাড়াইয়া রহিল। তাহার পা কাঁপিতে ছিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিল। খোকা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া দিশাহারা ভাবে বলিল—মা!

তরু শক্ত করিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া শিহরিয়া উঠিল।

ঝি আসিয়া বলিল—আপনাকে বাবু চলে যেতে বলেছেন!

তরু ঝির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—তুমি এই ছেলেটিকে তাঁর কাছে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে এস, এর স্থান এ বাড়ীতে হবে কি না!

ঝি শিশুকে কোলে লইতে গেল, খোকা কাঁদিয়া উঠিল, তরু তাহার মুখ চুম্বন করিয়া ঝির হাতে জোর করিয়া ফেলিয়া দিল। ঝি খোকাকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল, তরু সেইখানে বসিয়া পড়িল। এমন ভাবে কখনো ত সে খোকাকে ঠেলিয়া ফেলে নাই।

ঝি যখন খোকাকে কোলে লইয়া উপরে উঠিল, তখন বিনোদিনী দরজার পাশে দাড়াইয়া ছিলেন। তিনি ঝির কোল হইতে খোকাকে কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—দাদু!

খোকা কাঁদিয়া উঠিল! তিনি তাহাকে বুকে লইয়া কিশোরী বাবুর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলেন। কিশোরী বাবু বলিলেন—একি, একে নিয়ে এলে যে?

বিনোদিনী বলিল—এরই ত সব, এর বাড়ীতে একে নিয়ে এসে কি অন্যায় করেছি!

কিশোরী বাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

বিনোদিনী স্বামীর কোলের ভিতর খোকাকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন—এখন একবার ভেবে দেখত, এ কি আমাদের পর?

"নিয়ে যাও।"

"ধর, কোলে নাও, ফেলে দিওনা। এমন জিনিষ, এ কি ফেলবার।"

"আচ্ছা আজ তুমি একে দিয়ে দাও, ওকে আর একদিন আসতে বলো এর মধ্যে আমায় ভাবতে দাও।"

বিনোদিনী স্বামীর পাদুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—ভাববার আর কি আছে! বধূমাতাকে ঘরে তুলে লও। আমি খোকাকে ছেড়ে থাকতে পারব না! আমি আত্মহত্যা করব!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কিশোরী বাবু বলিলেন—আচ্ছা ওকে আমার কাছে ডেকে আন!

বিনোদিনী ছুটিয়া নিচে নামিয়া গেলেন। তরুলতার হাতখানি ধরিয়া তুলিলেন!

তরু মনের আবেগ আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, শ্বশ্রূর বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তরুকে আনিয়া যখন বিনোদিনী কিশোরী বাবুর নিকট দাঁড় করাইলেন, তখন তরু কাঁপিতে ছিল। আজকার বিচারে তাহার ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে।

কিশোরী বাবু বলিলেন—তুমি যে এসে এবাড়ী ঢুকলে, কি করে জানলে আমরা এখানে আছি?

তরু নির্ব্বাক।

"সঙ্গে এসেছে কে?"

"ভূপেন দা।"

"সে কোথায়?"

"গাড়ীতে আছেন।"

"বেশ বুদ্ধিমান বটে। ভালই করেছে, বাড়ী ঢুকলে পুলিশের হাতে দিয়ে দিতাম। তুমিও ঢুকে ভাল কর নাই। তোমার বাবা কোথায়?

তরুর চক্ষে জলধারা বহিল, সে অস্ফুট স্বরে বলিল—স্বর্গে!

"মারা গেছে, বেশ! তবে দেখে গেল না, আমি আবার ঘরে কি রকম বউ আনতে পারি!"

তরু কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যাইতেছিল, বিনোদিনী তাহাকে ধরিয়া

ফেলিলেন। খোকা কিশোরী বাবুর কোলের উপর হইতে লাফদিয়া মায়ের কোলে আসিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। তরু তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

কিশোরী বাবু বলিলেন—এখন তুমি যেতে পার, এই কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য তোমায় ডাকিয়েছিলাম।

তরু শ্বশুরের পায়ের কাছে খোকাকে বসাইয়া দিয়া বলিল—একে আপনি রাখুন, আমি কি করিয়া একে বাঁচাব।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলিয়া বলিলেন—তোর কি ভাবনা রে দাদু, আমি থাকতে তোর কি ভাবনা, দাদু।

তরু শ্বশুরের পায়ে একটা প্রণাম করিয়া, শ্বশ্রূমাতার চরণ ধূলি লইয়া, সে গৃহ পরিত্যাগ করিল। ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল! মাঝপথে থামিয়া গিয়া ভাবিল, তাহার খোকা, তাহার খোকাকে রাখিয়া সে কোথায় গিয়ে থাকিবে। না না এ হতেই পারে না। নিজে ভিক্ষা করে খোকাকে খাওয়াবে, তবু সে খোকাকে রেখে যেতে পারবে না। সে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল—কিরণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সে ধীরে ধীরে সেইখানে আসিয়া বলিল—চলিলাম, একটু পায়ের ধূলা দাও!

কিরণ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তরু তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বহুদিনের সাধ মিটাইয়া লইল!

তরু বলিল—তুমি আবার বিয়ে করচ!

কিরণ কথা বলিল না। তরু সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—বেশ, সুখে থাক। বলিয়া সে ছুটিয়া নীচে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। ভুপেন তরুকে ঐভাবে আসিতে দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছিল, বলিল—খোকা?

তরুর অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল, বলিল—খোকা!

এই সময় ঝি খোকাকে কোলে করিয়া সেইখানে আসিল, তরু তাহাকে দেখিয়াই বলিল—দে দে ঝি, আমার খোকা আমাকে দে!

সে একরকম জোর করিয়া ঝি কোল হইতে খোকাকে নিজের বুকের মধ্যে আনিয়া জড়াইয়া ধরিল। ভুপেন বলিল—তরু এইবার চল যাই বোন, দেখি এ দুঃখনদী আর কতদূর সাঁতারে কুল পাওয়া যায়!

তরু খোকার মুখখানি একহস্তে উত্তোলন করিয়া, একটি গভীর চুম্বন করিয়া বলিল—'খোকা'! সঙ্গে সঙ্গে একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল! (ক্রমশঃ)

গল্পলহরী

৫ম বর্ষ, } পৌষ ও মাঘ, ১৩২৪ { ৯ম ১০ সংখ্যা

জন্ম রহস্য

(১)

যাহা বলিতে যাইতেছি,—অনেকে হয়তো তাহা বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু জীবনে আমি আর কখনও এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখি নাই! মনে হইলে এখনও প্রাণ শিহরিয়া উঠে,—সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া যায়! সত্য মিথ্যা কেবল ভগবান জানেন! যাহা ঘটিয়াছে তাহাই বলিতেছি।

নরেন আমার বাল্য বন্ধু,—বিশেষ বন্ধু। বাল্যকাল হইতে আমরা দুই জনে এক স্কুলে এক কলেজে পাঠ করিয়াছি;—দিন রাত্রি একত্রে কাটাইয়াছি; উভয়ের নিকট উভয়ের কিছুই গোপন ছিল না। আমি নরেনকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতাম;—সেও আমায় প্রাণ দিয়া ভাল বাসিত।

অবশেষে আমি ডাক্তার হইলাম; সে উকিল হইয়া পশ্চিমে ওকালতি করিতে প্রস্থান করিল। তথায় তাহার পশার যথেষ্ট হইল। সে আমাপেক্ষা অনেকগুণ বড় লোক হইল। সেইখানেই সে বিবাহ করিল। বহুদিন পরে সম্প্রতি সে স্ত্রী লইয়া দেশে আসিয়াছে। আসিয়াই আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছে; তাহার স্ত্রীর সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছে। দেখিলাম উষা পরমাসুন্দরী। গুণেও নিশ্চয়ই অতুলনীয়া,—নতুবা নরেন এত সুখী কেন? দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তাহার ন্যায় সুখী জগতে আর কেহ নাই।

তাহার দিদিমার নরেন একমাত্র দৌহিত্র। তাহার পিতা মাতার বাল্যকালে মৃত্যু হওয়ায় সে দিদিমার বাড়ীতেই মানুষ হইয়াছিল। তাঁহার অনেক টাকা ছিল,—সম্পত্তি ছিল; নরেন সে সমস্তই পাইয়াছে! শ্যামবাজারে

তাঁহার বৃহৎ বাড়ী ছিল ; নরেন স্ত্রী লইয়া এক্ষণে সেই বৃহৎ অট্টালিকায় খুব বড়লোকের মত বাস করিতেছে। আমিও শ্যামবাজারে থাকিতাম, সুতরাং আমাদের দুই জনে প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হইত। প্রায় রাত্রে তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ,—না বলিবার উপায় ছিল না। কোন কথা বলিলেই সে বলিত, "আবার পশ্চিমে চলিয়া যাইব,—কয় দিন আর এখানে আছি বল!—আবার কবে ফিরিব, কে জানে?—যে কয় দিন এখানে আছি, তোমায় ছাড়িব না।" কাল রাত্রেও তাহার বাড়ীতে তাহার সহিত আহার করিয়াছি ; সুতরাং প্রাতে ডাকে হঠাৎ তাহার এক পত্র পাইয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। নরেন এরূপ ভাবে আমায় পত্র লিখিবার অর্থ কি? আমি প্রকৃতই অতি ব্যগ্র ভাবে পত্র খুলিলাম। দীর্ঘ-পত্র,—আমি পড়িলাম। আমার দেহের সমস্ত রক্ত জল হইয়া গেল,—কি ভয়ানক,—কি ভয়ানক! আমি লম্ফ দিয়া উঠিয়া উন্মাদের ন্যায় নরেনের বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। সম্মুখে নরেনের দ্বারবান।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি তথায় আসিয়া যাহা দেখিলাম,—তাহাতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল,—আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম! যদি হাত দিয়া প্রাচীর না ধরিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভূপতিত হইতাম। সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে,—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইয়াছে!—এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার আর যেন জগতে কখনও কাহাকেও দেখিতে না হয়!

আমি কিছু বলিব না ;—নরেন যাহা লিখিয়াছিল,—তাহাই বলিতেছি।

(২)

কলিকাতা,
১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮২।

ভাই!

"তোমায় না বলিলে,—কাহাকেও সব খুলিয়া না বলিলে,—আমি উন্মাদ হইয়া যাইব ; তাই তোমায় বলিতেছি,—তাই তোমায় লিখিতেছি। কি কুক্ষণে আমি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম! এখানে আসিয়া আমার এত সুখ সমস্তই জলাঞ্জলি দিলাম! যাহা লিখিতে যাইতেছি, তাহা তুমি বিশ্বাস করিবে না ;—আমায় কেহ বলিলে, আমিও বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু যাহা হইয়াছে, সমস্তই তোমায় লিখিতেছি।—আমি জানি,—আমি বেশ

বুঝিয়াছি,—একটা কি ভয়ানক, কি বিভীষিকা ঘটিতেছে,—তাহাতে আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছি,—আমাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

তুমি আমার বিষয় জান না এমন কিছুই নাই! ছেলেবেলায় আমি বড় দুষ্টু ছিলাম, তাহাও তোমার অবিদিত নাই; বিড়ালের উপর আমার মর্ম্মান্তিক রাগ ছিল। বিড়াল দেখিলেই তাহাদিগকে ছাদ হইতে ফেলিয়া দিতাম।—লাঠি সোটা যাহা পাইতাম,—তাহাই হাঁকরাইতাম।—দুই দশটা বিড়াল যে আমার হাতে প্রাণ হারায় নাই তাহা নহে। ইহার একটা কারণও ছিল। দিদিমার একটা বড় পিয়ারের সাদা বিড়াল ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা সেটা তাঁহার কাছে কাছে থাকিত। ভাল ভাল খাবার সে খাইত। ভাল ভাল জামা পরিত, একটা দাসী তাহার সেবায় নিযুক্তা ছিল,—তাহার আদর দেখে কে! দিদিমা যে আমায় ভালবাসিতেন না—তাহা নহে; তবে তিনি বোধ হয় আমাপেক্ষাও তাঁহার সাদা বিড়ালকে বেশী ভালবাসিতেন; ইহাতেই আমার সেই বিড়ালের উপর রাগ, মর্ম্মান্তিক আক্রোশ। তখন আমার বয়স ১৫।১৬ বৎসর।—এ বয়সে বিড়াল ঠেঙ্গানো কেবল আমারই যে স্বভাব ছিল, তাহা নহে। তবে দিদিমার সাদা বিড়ালের কিছুই করিতে পারিতাম না;—দিদিমাকে যমের মত ভয় করিতাম,—তাহাই সেই রাগ অন্য বিড়ালের উপর পড়িত। বিড়ালটা আমার মনের ভাব যে বুঝিতে পারিত, তাহা তাহার অর্দ্ধ-নিমিলীত চোক দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। পারতপক্ষে সে আমার কাছে আসিত না,—আমায় দেখিলে ধীরে ধীরে দিদিমার গা ঘেসিয়া বসিত। আমার মনে হইত যে সেটার গলা টেপা দূরে থাক্,—তাহাকে আদর করিতে বাধ্য হইতাম। আমি তাহাকে আদর করিলে দিদিমা খুসী হইতেন,—তাহাই তাহাকে সময় সময় ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতাম। কিন্তু সে আমার কোলে আসিলে থর থর করিয়া কাঁপিত। অতি ভীতভাবে এক অভাবনীয় দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া থাকিত। ইহাতে আমার তাহার প্রতি ক্রোধ শত গুণ বৃদ্ধি পাইত,—কিন্তু উপায় নাই;—আমি কষ্টে আত্মসংযম করিতাম।

তুমি জান,—দিদিমার অনেক বয়স হইয়াছিল,—কিন্তু মরিবার ইচ্ছা ছিল না। আমি যে তাঁহাকে ভালবাসিতাম না, তাহা নহে;—তবে তাঁহার এই বিড়ালকে ভালবাসার জন্য তাঁহার প্রতি আমার রাগ প্রত্যহ বৃদ্ধি হইতেছিল। তাঁহার পীড়া হইলে, সেই রাগ আমার আরও দিন দিন বৃদ্ধি

পাইতে লাগিল। তিনি চব্বিশ ঘণ্টাই আমাকে তাঁহার বিছানায় বসাইয়া রাখিতেন; আমাকে চোখের আড়াল হইতে দিতেন না। আমার তখন খেলিবার বয়স,—আমার কি এরূপ অর্দ্ধ অন্ধকার ঘরে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়! কেবল ভয়ের জন্যই পালাইতে পারিতাম না;—তবে রাগে মনে মনে গর্জ্জিতাম! বিড়ালটাও দিদিমার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত; আমার দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিত; ইহাতে আমি প্রায় পাগল হইয়া উঠিতাম! দিদিমা চক্ষু বুঝিয়া পড়িয়া থাকিতেন, কিন্তু আমার হাত ছাড়িতেন না। তাঁহার ঠাণ্ডা হাতে আমার শরীরের ভিতর যেন বরফ চলিত!—তাহার উপর বিড়ালটা!—আমি ক্রমে পাগল হইবার মত হইলাম। মনে মনে বিড়ালটার দফা শেষ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম।

বোধ হয় তোমার মনে আছে, এক দিন দুই প্রহরের সময় আমার দিদিমার মৃত্যু হইল। সেই আমি প্রথম মৃত্যু দেখিলাম। সহসা দিদিমা কটমট করিয়া আমার দিকে চাহিলেন,—তাহার পর আর তাঁহার চক্ষের পলক পড়িল না। সে ভয়ানক দৃষ্টি। আমি লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বিড়ালটা ভয়াবহ ভাবে আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার পর আমি কি করিলাম; তাহা ঠিক জানি না; এই মাত্র মনে হয় যেন বিড়ালটার গলা টিপিয়া ধরিয়া ছিলাম;—তাহার পর বোধ হয় চীৎকার করিয়া ছিলাম; কারণ পর মুহূর্ত্তে অনেক লোক জন সেই ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। কেহ বলিল, "আহা, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সঙ্গে তাঁহার বিড়ালটাও মারা গেছে। পশু প্রাণী যেমন ভালবাসে, মানুষে তা পারে না।"

(৩)

সে আজকের কথা নয়। দিদিমা আজ ১৬ বৎসর মারা গিয়াছেন;—কিন্তু আজ সে দিনের কথা যেন জ্বলন্ত অক্ষরে আমার চক্ষের উপর উদিত হইতেছে! কেন—কে বলিবে কেন! আমার মস্তিষ্ক হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে! প্রাণের অন্তস্তম প্রদেশ হইতে কে যেন বলিতেছে, "কি ভয়ানক!"

তারপর তুমি কলেজ ছাড়িয়া ডাক্তার হইলে, আমি উকিল হইয়া পশ্চিমে চলিয়া গেলাম। হয়তো কলিকাতায় থাকিলে কিছুই করিতে পারিতাম না। দিদিমার যে টাকা কড়ি ও সম্পত্তি পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার কিছু না করিলেও রাজার হালে চলিয়া যাইত; কিন্তু তুমি তো জান, আমি নিশ্চিন্ত

বসিয়া থাকি, এমন লোক নই। কলিকাতায় থাকিলে টাকার অভাব না থাকায় কিছুই করিব না, ইহাই ভাবিয়া আমি তোমাদের সকলকে ছাড়িয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছিলাম। সেখানে বেশ পসার, বেশ প্রতিপত্তিও হইয়াছে,—এ সকলই তুমি জান। সেইখানেই উষাকে পাইয়া আমি বড়ই সুখী হইয়াছিলাম,—কিন্তু এ কি ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিল! মনে হইলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে,—কিছু জ্ঞান থাকে না!

মা বাপ ছিলেন না,—তাহাই আমার বিবাহের জন্য তত ব্যাকুলতাও ছিল না,—কিন্তু আমার পশ্চিমের বন্ধুগণ আমায় বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। আমাদের স্বজাতীয় একটী ভদ্র লোক পশ্চিমে সামান্য চাকুরী করিতেন। তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন, তাহাই সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য ভক্তি করিতেন,—ভাল বাসিতেন। সহসা একমাসের মধ্যে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী মারা গেলেন। তাঁহাদের এক মাত্র কন্যা উষা সম্পূর্ণ অনাথিনী হইল। প্রতিবেসিগণের মধ্যে একজন তাহাকে গৃহে আনিয়া স্থান দিলেন। তাহার পর সকলেই তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য আমায় নিতান্ত জেদাজিদি আরম্ভ করিলেন। উষা পরমা সুন্দরী,—অতি গুণবতী। পিতার দারিদ্রের জন্য সে বয়স্থা হওয়া সত্তেও তার বিবাহ হয় নাই; সে তখন চতুর্দ্দশ বর্ষিয়া প্রায় যুবতী; আমি বিবাহে সম্মত হইলাম।

বন্ধুগণ তাহাকে আমায় দেখাইলেন; তাহাকে দেখিয়া আমি বিমুগ্ধ হইলাম। সে নিমিষের জন্য আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার চক্ষে আমার চক্ষু মিলিত হইল; আমি তাহার অপরূপ লাবণ্যমাখা রূপে একেবারে মুগ্ধ হইলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। আমার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সহসা কালান্তক সাপ দেখিলে লোকে যেরূপ শিহরিয়া উঠে, আমারও ঠিক সেই ভাব হইল; কিন্তু সে নিমিষের জন্য; আমি বিবাহে আপত্তি করিলাম না,—আমাদের বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

কিন্তু আমি উষার চোক ভুলিলাম না। কোথায় যেন পূর্ব্বে এ চোক দেখিয়াছি, অনেকবার মনে এই কথা উদিত হইল,—কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি, কিছুতেই তাহা মনে করিতে পারিলাম না। ক্রমে আমার মন হইতে এ ভাব দূর হইল,—আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।

আমি ছেলে বেলায় মা বাপ হারাইয়াছিলাম; দিদিমা আমায় প্রকৃত

ভাল বাসিতেন কিনা, তাহা আমি জানিতাম না। তোমার অতুলনীয় ভালবাসা ব্যতীত আমি জীবনে আর কখনও কাহারও ভালবাসা পাই নাই। এক্ষণে উষার স্বর্গীয় বিমল ভালবাসা পাইয়া আমি জগত সংসার ভুলিয়া গেলাম। তুমি দেখিয়াছ, আমরা কত সুখী! কত জন আমাদের সুখের হিংসা করিয়াছে! যতদিন আমরা পশ্চিমে ছিলাম, এক দিনের জন্যও আমাদের সুখের জ্যোৎস্নাভাবিত আকাশে কখনও বিন্দুমাত্র দুঃখের মেঘ উদিত হয় নাই। হায়,—কি কুক্ষণে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম! সবই কি নিয়তি!

(৪)

বহুদিন দেশে আসি নাই,—তাহাই একবার দেশ দেখিবার জন্য মন ব্যাকুলিত হইল। উষাও জেদাজিদি করিতে লাগিল। তোমাদের সঙ্গেও বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই,—তাহাই দেশে আসিলাম। কেন আসিলাম? না আসিলে আমার এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না!

তারপর এখানে আসিয়া যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বলিতেছি। তুমি তো জান,—আজ তিন মাস হইল, আমি উষাকে লইয়া দেশে আসিয়াছি। আজ ৬ বৎসর হইল দিদি মা মারা গিয়াছেন;—এই ছয় বৎসর আমি পশ্চিমে আছি;—এই ছয় বৎসর দিদিমার বৃহৎ অট্টালিকা প্রায় বন্ধ ছিল, এক জন সরকার ও দুইজন চাকর মাত্র বাড়ীতে ছিল,—তাহারাই বাড়ীটা ঝাটপাট দিয়া পরিষ্কার রাখিয়াছিল। দিদিমার সময় বাড়ী যেরূপ ছিল, এখনও ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে। আজ বহুদিন পরে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। দিদিমার মৃত্যুশয্যা আমার চক্ষের উপর ফুটিয়া উঠিল। নিমিষের জন্য প্রাণটা যেন কেমন কিরূপ হইল; কিন্তু উষা আমার পার্শ্বে,—আমার নিকট বিষাদের ছায়া তিলার্দ্ধ তিষ্টিতে পারে না।

সহসা আমার পার্শ্বে উষা বলিল, "দেখ—কি আশ্চর্য্য!"

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে বিস্ফারিত নয়নে অতি বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতেছে। আমি তাহার এরূপ ভাব দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইয়াছে উষা? কি বলিতেছ? অমন করে চাহিতেছ কেন?"

উষা ধীরে ধীরে বলিল, "দেখ,—আমার যেন এই বাড়ী চেনা চেনা বলে বোধ হচ্চে। কি আশ্চর্য্য,—খুব চেনা বোলে বোধ হচ্চে! আমি তো

কখনও কলিকাতায় আসিনি,—তবু মনে যেন হচ্চে এ বাড়ী, এ সবই আমার চেনা। যেন আমি অনেক দিন এখানে ছিলাম,—কি আশ্চর্য্য!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "হয়তো কখনও স্বপ্ন দেখে থাকবে? স্বপ্নে ভবিষ্যৎ স্বামীগৃহ দেখা আশ্চর্য্য নয়।"

ঊষা কোন কথা কহিল না। আজ এই প্রথম তাহার মুখে বিষাদের ছায়া দেখিলাম। সে কোন কথা না কহিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আমাদের আসিবার পূর্ব্বেই আমার লোক জন আসিয়া সমস্ত বাড়ী ঠিক-ঠাক করিয়া রাখিয়াছিল; সুতরাং আমাদের কিছুই দেখিতে হইল না। আমি যে গৃহে শয়ন করিব স্থির করিয়াছিলাম, ঊষাকে সেই গৃহ দেখাইতে লইয়া চলিলাম। সহসা সে একটা ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "এ ঘরটায় কে থাকতো।"

আমি দেখিলাম সেটা আমার দিদিমার ঘর। এই ঘরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল! আমি বলিলাম, "এ ঘরটায় আমার দিদিমা থাকতেন,—সে অনেক দিনের কথা।"

ঊষা দাঁড়াইল,—চিন্তিত ভাবে গৃহের দিকে চাহিতে লাগিল,—তৎপরে ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারে গিয়া ভিতরে উঁকি মারিল; তাহার পর সভয়ে সে মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল, "দেখ,—আমার স্পষ্ট মনে হচ্চে,—যেন এই ঘরে আমি ছিলাম! কি আশ্চর্য্য, কেন এমন মনে হচ্চে? ঘরটায় উঁকি মেরে কেমন আমার ভয় কচ্চে,—আমার বুক ধড়াস ধড়াস কচ্চে!"

আমি ঊষার হস্ত ধরিয়া বলিলাম, "ঊষা, সমস্ত রাত্রি রেলে এসেছ,—শরীর খারাপ হয়েছে,—তাই অমন হচ্চে। নাইলে খেলে শরীর ভাল হবে,—এস।"

আমি ঊষাকে লইয়া এতই সুখে ছিলাম, যে তাহার সে দিনের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। কয়েক দিন কাটিয়া গেল,—সে আর সে কথার উত্থাপন করিল না;—আমিও তাহার প্রথম দিনকার বিষয় সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেলাম। আমাদের মত সুখী আর কেহ ছিল না।

বহুদিন পরে দেশে ফিরিয়াছি, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে,—দিদিমার বিষয় সম্পত্তির হিসাব পত্র দেখিতে,—আমার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি আর ঊষার নিকট অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতাম না। পশ্চিমে সে অষ্টপ্রহর আমার নিকট

থাকিবার জন্য ব্যগ্র হইত, এখানে আসিয়া দেখিলাম,—তাহারও একটু—অতি সামান্য একটু—পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে আর আমার নিকট থাকিতে তত ব্যগ্র নহে। আরও দেখিলাম, তাহার চির প্রফুল্লতাময় ভাব যেন আর তত নাই; কিন্তু তাহার এই সামান্য পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করিলাম বটে,—কিন্তু ইহা হইতে ভবিষ্যতে যে কি ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হইবে, তাহা তখন এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে উদিত হইল না!

কিন্তু আমার সুখের দিনের অবসান হইয়া আসিয়াছিল! এক দিন সন্ধ্যার পর আমি গৃহে ফিরিলাম,—তখনও সকল ঘরে আলো দেওয়া হয় নাই। আমি দিদিমার ঘরের সম্মুখ দিয়া আমার ঘরের দিকে যাইতেছিলাম,—সহসা আমার দৃষ্টি দিদিমার গৃহের ভিতর পতিত হইল। ঘরে আলো ছিল না,—কিন্তু অন্ধকারও সম্পূর্ণ হয় নাই। আমি দেখিলাম, ঊষা একখানা ধপধপে সাদা কাপড় পরিয়া সেই ঘরে রহিয়াছে! আমি জানিতাম যে সে কখনও এই ঘরের দিকে আসিত না;—তাহাই বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলাম। সে কি জন্য এই ঘরে আসিয়া কি করিতেছে!

আমি যাহা দেখিলাম,—তাহাতে কেন জানি না,—আমার দেহের রক্ত জল হইয়া গেল! সে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছে,—বিড়ালের মত নিঃশব্দে সন্তর্পণে যাইতেছে! সাদা একটা কি—ভয়াবহ একটা কি,—সে যে আমার স্ত্রী, তাহা আমার মনে হইল না;—কি যেন এক ভয়াবহ প্রাণী! আমার কপাল হইতে ঝর ঝর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল; আমি মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় কতকক্ষণ তথায় দণ্ডায়মান ছিলাম, তাহা আমি জানি না। কিরূপে নিজের ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া ছিলাম, তাহাও জানি না!

সহসা ঊষা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করায় আমার চৈতন্য হইল। আমি বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাঁহিলাম,—তাহার কোনই পরিবর্ত্তন নাই। আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

ঊষা বলিল, "কেন রান্নাঘরে ছিলাম।"

"সেইখান থেকেই কি বরাবর এখানে আসচ?'

"হাঁ—কেন!"

"তুমি দিদিমার ঘরে যাও নি?"

"না,—তুমি তো জান আমার ওঘরটার দিকে যেতে ইচ্ছে হয় না।"

আমি স্তম্ভিত হইলাম,—আমার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না!

এত দিনে উষা আমায় মিথ্যা কথা বলিল,—আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিল! যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসি, তাহার উপর অবিশ্বাস জন্মিলে, প্রাণে যে অসহনীয় কষ্ট হয়, তাহা যে ভুগিয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবে না!

(৫)

ভাই, এক দিনে তোমায় এ পত্র লিখিতেছি না,—তাহা বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিতেছ। এক দিনে এক সঙ্গে সকল কথা লিখিবার আমার আর ক্ষমতা নাই। আমি বুঝিতেছি ধীরে ধীরে,—অতি ধীরে—উষা যেন আমার সম্মুখ হইতে বিলীন হইয়া যাইতেছে! তাহার স্থলে, তাহার সেই সুবিমল দেবী মূর্ত্তি যেন কি এক ভয়াবহ পিশাচিনী মূর্ত্তিতে পরিণত হইতেছে! এ কি কেবল আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি, না আর কি! তাহার যে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা কি উষা বুঝিতে পারিতেছে না! যে এক মুহূর্ত্ত আমাকে দেখিতে না পাইলে প্রাণে বেদনা পাইত,—তাহার চির হাস্যময়ী মুখ বিষাদে পূর্ণ হইত,—সে এখন আর পারতপক্ষে আমার নিকট থাকে না,—আইসে না;—নীরবে একাকিনী থাকিতে ভালবাসে,—আমায় দেখিলে জোর করিয়া মুখে হাসি আনিতে চেষ্টা পায়;—আমি এ সকল বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি,—তাহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে,—অথচ আমি মুখ ফুটিয়া তাহাকে কিছুই বলিতে পারিতেছি না!

এই দুই মাসের মধ্যেই কি তাহার সকল ভালবাসা লোপ পাইল। স্ত্রীলোকের মন কি এতই চপল! এই জন্যই স্ত্রীলোককে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই! ভাই, আমার মনের অবস্থা তুমি কি বুঝিতে পারিবে? এখন আমি ও উষা দুইজনে একত্রে থাকিলেও নীরবে বসিয়া থাকি। আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, উষা হঁা বা না ভিন্ন আর কোনই কথা কহে না। পূর্ব্বে কখনও সে রাত্রে আমার আগে শয়ন করিতে যাইত না—এখন সে আমায় কোন কথা না বলিয়াই শুইয়া পড়ে। আমার মস্তিষ্ক হইতে আগুন ছুটিতে থাকে,—আমি বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া বসিয়া ভাবি! সহসা আমার এ সুখের সংসারে আগুন জ্বালাইয়া দিল কে!

কাল রাত্রে যাহা হইয়াছে,—তাহাই বলিতেছি। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমি বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলাম; তাহার পর নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করায়

শয়ন করিতে গেলাম ;—দেখি উষা নিদ্রা যাইতেছে। আমি কোন কথা না বলিয়া শয়ন করিয়া আলো নিবাইয়া দিলাম।

ঘর ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে—চারিদিকের সেই নিস্তব্ধতায়,—আমার প্রাণে ভয় হইতে লাগিল! আমি কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম। উষার নিশ্বাস শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলাম না। কেমন মন এক বিভীষিকায় পূর্ণ হইল ;—আমি অন্ধকারে উষার হাতে হাত দিলাম,—অমনই সে হাত টানিয়া লইল!

সে তবে জাগ্রত রহিয়াছে,—ঘুমায় নাই! অথচ ঘুমাইবার ভান করিয়া পড়িয়া আছে! এই কি ভালবাসার ফল! রাগে আমার শিরায় শিরায় আগুন ছুটিল! যদি তাহার ভালবাসা সম্পুর্ণ লোপ পাইয়া থাকে,—তবে আমাকে সে স্পষ্ট বলিতেছে না কেন! এত ছল,—এত চাতুরি কেন!

আমি উঠিয়া আলো জ্বালিলাম! দেখিলাম, উষা বিছানার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে। আলো তাহার মুখের কাছে ধরিলাম ; সে নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইতেছে। তাহার নিশ্বাস সরলভাবে পড়িতেছে। সে যথার্থই নিদ্রিত হইয়াছে,—কিন্তু আমি তাহার গায় হাত দিতে উদ্যত হইলে, সে যেন সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল,—আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমি তাহার নিকট এমনই ঘৃণার পাত্র হইয়াছি যে নিদ্রিতাবস্থায়ও সে আমার সংস্পর্শে সরিয়া যাইতেছে! আর এ জীবনে প্রয়োজন কি! ভাই, যদি কখনও কাহাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়া থাক, আর যদি কখনও আমার অবস্থায় পড়িয়া থাক, তবেই আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে! তোমায় প্রাণের কথা খুলিয়া না বলিলে,—আমি পাগল হইতাম! তাহাই এত কথা লিখিতেছি,—হয়তো বিরক্ত হইবে।

আমি কিছুতেই নিদ্রিত হইতে পারিলাম না। আলো নিবাইয়া দিলাম ; বহুক্ষণ নীরবে পড়িয়া রহিলাম ; না—ঘুম হইল না। আমার বোধ হইল যেন আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে ;—আর আমি শুইয়া থাকিতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিলাম। নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া ছাদে খোলা বাতাসে আসিয়া পাগলের ন্যায় পদচারণ করিতে লাগিলাম। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গে যে কি হইতেছিল, তাহা আমি জানি না। এমন স্ত্রীতে প্রয়োজন কি! হয়তো সে গোপনে গোপনে কাহাকে ভাল বাসিয়াছে! বিষে আমার মাথা দিয়া আগুন ছুটিল! আমি সেই নির্জ্জন রাত্রে

একাকী ছাদের উপর ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম! ভাই, সে যাতনার বর্ণনা হয় না!

(৬)

বোধ হয় অনেক ক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম,—বোধ হয় রাত্রির সুশীতল সমিরণ মস্তকে লাগায় মস্তিষ্কও অনেকটা শীতল হইয়াছিল,—আমি তখন ধীরে ধীরে আবার শয়ন করিতে চলিলাম।

চারিদিকে অন্ধকার—চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ, আমি অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইতে ছিলাম না, তাহাই প্রাচীর ধরিয়া ধরিয়া যাইতে ছিলাম। রাত্রে চাকরেরা সকল দরজাই বন্ধ করিয়া তবে শয়ন করিতে যায়,—কিন্তু সহসা এক স্থানে আমার হাত শূন্যে পড়িল, আমি বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলাম; দেখিলাম,—দিদিমার ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে! এ দরজা প্রায়ই কখনও খোলা থাকিত না। আমি যখন একটু পূর্ব্বে এখান দিয়া ছাদে গিয়াছি, তখনও এ দরজা খোলা ছিল না, সহসা এত রাত্রে এখন এ দরজা কে খুলিল? বলা বাহুল্য আমি অতিশয় বিস্মিত হইলাম। একটু প্রাণের ভিতর ভয়ও হইল! আমি এক পা গৃহ মধ্যে অগ্রসর হইবা মাত্র অমনই কে গৃহ মধ্যে অন্ধকারে অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল। কে যেন অতি ভয়ে কাতরাইয়া উঠিল। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম,—কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘরের মধ্যে কে!" কোন উত্তর নাই। চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ আমি কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু বিন্দু মাত্র কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। যে দিন হইতে আমার স্ত্রীর উপর সন্দেহ হইয়াছে, সেই দিন হইতে আমি সর্ব্বদা জামা গায়ে দিয়া শয়ন করিতাম, জামার পকেটে সর্ব্বদা বাতি ও দেশালাই থাকিত, আমি তখনই বাতি জ্বালিলাম।

বাতির আলোকে প্রথম গৃহের এক কোণে কি একটা সাদা জিনিস দেখিলাম। ভাল করিয়া যখন দেখিলাম, তখন দেখিতে পাইলাম, সে উষা। তাহার চক্ষু বিস্ফারিত,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, তাহার মুখ পাংশু বর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভয়াবহ বিভীষিকা দেখিলে লোকের যে ভাব হয়,—তাহারও ঠিক তাহাই হইয়াছে। আমি ভয়ে ব্যাকুলে বিস্মিতে বলিয়া উঠিলাম, "উষা,—উষা—একি! এখানে কেন? কি হইয়াছে?—অমন করিতেছ কেন!"

উষা কোন কথা কহিল না। তাহার মুখ দেখিয়া আমার ভয় হইল ; আমি তাহাকে ধরিলাম, বলিলাম, “কি হইয়াছে ? এখানে কেন ? এমন করিতেছ কেন ?” উষা কোন কথা না কহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, আমি বলিলাম, “কি হইয়াছে, আমায় বল।”

এবার উষা কথা কহিল, কষ্টে বলিল, “তুমি—তুমি—অমন করে কেন এলে ?„

আমি বলিলাম, “সে কি! আমি কি করিলাম! আর তুমি আমায় অন্ধকারে কি করিয়া দেখিলে ?”

সে বলিল, “অন্ধকার! কে, কই ?”

আমি সবেগে বলিলাম, “ঘর ঘোর অন্ধকার ছিল ; আমি যতক্ষণ আঁলো না জ্বালিয়াছিলাম, ততক্ষণ তোমায় দেখিতে পাই নাই। তুমি আমায় কেমন করিয়া দেখিলে।”

উষা ব্যাকুলিত ভাবে বলিল, “কেন! তুমি ঘরে এলেই আমি তোমায় দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। আমার গলা টিপে মের না।”

তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে ছিল, আমি বলিলাম, “উষা, তোমার অসুখ করেছে,—এস শোবে।”

আমি তাহাকে একরূপ টানিয়া আমাদের ঘরে আনিলাম। তাহাকে জোর করিয়া বিছানায় শয়ন করাইয়া আমি তাহার পর পার্শ্বে বসিলাম।

না, আর সন্দেহে থাকিয়া দিবা রাত্রি আগুনে পুড়িয়া মরিব না! আজ এই রাত্রে এখনই এ বিষায়র একটা শেষ মিমাংসা করিব। স্পষ্ট উষাকে জিজ্ঞাসা করিব, ব্যাপার কি ? আমি পশু নই, আমি দুর্ব্বল নই, আমি মূর্খ নই, আমি সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য আমার জীবনকে চিরদিনের জন্য দুঃখে ভাসাইয়া দিব না! আমি আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ,—আমার হৃদয় হইতে সকল ভালবাসা লোপ পাইয়াছে ; ঘোর প্রতিহিংসা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ; আজ আমি অনায়াসে উষার প্রাণসংহার করিতে পারি! এ ভয় কেবল কুলটার লক্ষণ, ব্যাভিচারিণী আমায় দেখিয়া ভয় পাইবে আশ্চর্য্য কি!

আমি অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া অতি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “উষা, এত রাত্রে তুমি অন্ধকারে ওঘরে কি করিতেছিলে ?”

উষা আমার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। মৃদু স্বরে বলিল, “তোমায় বিছানায় না দেখে খুঁজ্‌তে গিয়েছিলাম।”

(৭)

মিথ্যা কথা ! আমি বুঝিলাম সে আমাকে মিথ্যা কথা বলিতেছে। তবুও আমি নিরস্ত হইলাম না,—আমার নিশ্চিন্ত থাকিবার শক্তি আর ছিল না ! আমি বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলাম, "যখন দেখিলে ঘর অন্ধকার, আমি অন্ধকারে সে ঘরে নাই, তখন সে ঘরে গিয়াছিলে কেন ?"

"জানি না।"

"জানি না ! আমায় অন্ধকারে তুমি দেখিতে পাও নাই,—তবুও আমার পায়ের শব্দে কেন ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিলে ?"

"তুমি—তুমি—আমার গলা টিপে মার্ত্তে আস্‌ছিলে !"

আমি বিকট হাসি হাসিলাম ; বলিলাম, "উষা, আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলিও না ; আমি এখনও তোমায় আমারই বলিয়া জানি। তুমিও জান, আমি প্রাণ দিয়া তোমায় ভাল বাসি ! এখন তুমি আর সে উষা নাই। কেন এমন হইয়াছে, আমায় বল,—আমি শুনিতে চাই।"

উষা কাঁদিয়া উঠিল। আমি তাহার ক্রন্দনে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইলাম না, মনে মনে বলিলাম, "ইহাও জাল ! সব জাল ! জগতে সত্য বলিয়া কিছু নাই।"

আমি কঠোর অতি নিষ্ঠুর ভাবে বলিলাম, "উষা, আমি সত্য কথা শুনিতে চাই।"

সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দোহাই তোমার ! আমি কিছু জানি না। এখানে এসে আমার কি হয়েছে, আমি জানি না ! আমি যেন সে নই ;—আমি যেন কে ! আমি যেন এখানে আগে ছিলাম,—তুমি যেন আমার গলা টিপে মার্ব্বে—আমার মাথার ঠিক নেই,—আমি বোধ হয় পাগল হয়েছি !"

আমি বলিলাম, "তুমি যা বলিতেছ, তা যদি সত্য কথা হয়, তা হলে নিশ্চয়ই তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। সব আমায় বল,—সব শুন্‌লে একটা উপায় নিশ্চয় হবে !"

উষা কাতরে বলিল, "কি বলব,—আর কি বলব—সব যে বল্‌লেম !"

রাগে আমি উন্মত্ত হইলাম ! এখনও সে আমার নিকট গোপন করিতেছে ! অথচ তাহার কথার ভাবার্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কেমন তাহাকে দেখিয়া আপনা আপনিই আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে, কেন তাহা জানি না। একটা ভয়াবহ যে কিছু হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় ; কিন্তু সে যে কি, তাহা আমি বলিতে পারি না।

ইহার সহিত আর বসবাস করা কি আমার উচিত! আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ক্রোধে দুঃখে বিষে আমার হৃদয় শতধা হইল; আমি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া আর সে রাত্রি কোন কথা বলিলাম না,—সেই চেয়ারেই রাত কাটাইলাম। উষা বালিসে মুখ লুকাইয়া নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া রহিল! আমি তাহার সহিত আর কথা কহিলাম না,—আর তাহার মুখ দেখিবার আমার ইচ্ছা ছিল না।

পর দিন কাটিয়া গেল,—তার পর দিন ও কাটিল! আমি তাহার সহিত কথা কহিলাম না, সেও আমার সহিত আর কোন কথা কহিল না। সে আমার নিকট হইতে যত অধিক সরিয়া যাইতে লাগিল, আমি ততোধিক তাহার উপর রাগত হইয়া তাহার নিকট হইতে দূরে রহিলাম। আমি দুই দিন বাড়ীর ভিতর শয়ন করিতে গেলাম না, বৈঠকখানায়ই পড়িয়া রহিলাম। দুই দিন সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক নিমিষের জন্য নিদ্রা হইল না,—আমিও কি পাগল হইয়া যাইতেছি।

তৃতীয় দিন আমার আর সহ্য হইল না। বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলে আমি উষার নিকট চলিলাম। আজ তাহাকে আমার মনের অবস্থা খুলিয়া বলিব,—দেখি তাহাতেও সে সত্য কথা বলে কি না!

আমার শয়ন গৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিলাম যে দরজা বন্ধ। দরজা ঠেলিয়া দেখিলাম যে ভিতর হইতে বন্ধ। আমি সবলে দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিলাম' "উষা—উষা?" কোন উত্তর নাই। আমি বুঝিলাম উষা জাগিয়া আছে, তবুও উত্তর দিতেছে না। ঘুমাইয়া থাকিলেও আমি যে ভাবে দরজায় ঘা মারিতেছিলাম, যে ভাবে তাহাকে ডাকিতে ছিলাম, তাহাতে সে নিশ্চয়ই জাগিয়াছে,—তবুও আমায় উত্তর দিতেছে না। এত বড় স্পর্দ্ধা। আমি ক্রোধে উন্মত্ত হইলাম। প্রকৃতই আমার মাথায় খুন চড়িল,—আমি পদাঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

(৮)

ঘরে আলো নাই,—ঘর অন্ধকার। তবে সম্পূর্ণ অন্ধকার নহে,—একটা জানালা একটু খোলা রহিয়াছে'—সেই জানালা দিয়া জ্যোৎস্নার আলো গৃহ মধ্যে আসিয়া ঘর একটু আলোকিত করিয়াছে! স্পষ্ট ভাল কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না,—অথচ সকলই অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তাহাতে আমি দেখিলাম,—কি একটা গৃহের কোণে রহিয়াছে। কি সে—কি বিভীষিকা!

সহসা আমার শিরায় শিরায় রক্ত যেন বরফ হইয়া গেল,—আমার হৃদয় নিস্পন্দ হইয়া পড়িল,—আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল!

কি দেখিলাম! যাহা দেখিলাম, তাহা মানুষ নয়,—যেন কি একটা সাদা ভয়ানক জানোয়ার! সেটা যেন আমার টুঁঠি ধরিবার জন্য লাফ দিতে উদ্যত হইয়াছে! কি বিভীষিকা! উষা কোথায়? আমি চীৎকার করিতে চেষ্টা পাইলাম,—কিন্তু আমার কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গত হইল না,—আমার দেহ মন প্রাণ সমস্তই পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

এই সময়ে কোথা হইতে কে সহসা জানালা বন্ধ করিয়া দিল:—ঘর ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গেল. আর কিছুই দেখা যায় না। সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে দুইটা চক্ষু যেন ঝক ঝক করিয়া জ্বলিতেছে! নীল আলো, —বিভীষিকাময় আলো! সেই বিভীষিকাময় দুই চক্ষু, ক্রমে ধীরে ধীরে আমার দিকে আসিতেছে! আমি পালাইলাম, আমি ছুটিলাম, একেবারে ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম! তখন আমার চৈতন্য হইল, আমি বাড়ীর দরজায় বসিয়া পড়িলাম,—নির্জ্জন নিস্তব্ধ রাত্রি,—কোন দিকে জন প্রাণীর চিহ্ন নাই। এত দিনে বুঝিয়াছি,—যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে আমি পাগল হইয়াছি।

পর দিন তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া ছিলাম. হয় তো তোমার মনে আছে। সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া তোমায় সে দিন কিছুই বলিতে পারি নাই; আর বলিবার কিছুই নাই, এখন আমি সব বুঝিয়াছি।

বোধ হয় তোমার মনে আছে যে সেদিন তোমার সঙ্গে পুনর্জ্জন্মের বিষয় অনেক কথা কহিয়া ছিলাম। ইংরাজি লেখা পড়া শিখিয়া আমাদের হিন্দুর বিশ্বাস পুনর্জ্জন্ম, দিদিমার রূপকথা মনে করিতাম; কিন্তু তুমি আমায় সে দিন বলিয়াছিলে যে পুনর্জ্জন্ম হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে। পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস না করিলে সংসারের অনেক বিষয়েরই কোন অর্থ হয় না। এখন আমায় পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস হইয়াছে। এখন বেশ বুঝিয়াছি, বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি দিদিমার যে সাদা বিড়ালকে গলা টিপিয়া মারিয়াছিলাম,—সেই বিড়ালই হয়তো সেই দিনই দূর পশ্চিমে উষারূপে জন্মিয়াছিল! সকলই নিয়তি, ভাই, সকলই নিয়তি! নিয়তি না হইলে আমি দিদিমার মৃত্যু, সেই সাদা বিড়ালের মৃত্যুর,—চোদ্দ বৎসর পরে পশ্চিমে উষাকে বিবাহ করিব কেন! যে বিড়ালটাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম,—যাহার উপর আমার চির

আক্রোশ ছিল,—যাহাকে কত কষ্ট দিয়াছি,—যাহাকে অবশেষে গলা টিপি। মারিয়াছিলাম, তাহারই আত্মা দৈব নির্ব্বন্ধে উষাতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাই প্রথম দিন এ বাড়ীতে আসিয়াই উষা এ বাড়ী তো চেনা মনে করিয়াছিল। এত দিন যে আত্মা একরূপ নিদ্রিত ছিল, তাহার পুরাতন চির পরিচিত বাসস্থান দেখিয়াই জাগ্রত হইয়াছে! তাহাই উষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে! উষা দিন দিন এখানে উষা হইতে তিরোহিত হইয়া সেই ভয়াবহ বিড়ালে পরিণত হইয়াছে,—আর উষা নাই!

ভাই, আমি পাগল হইয়াছি ভাবিও না। আমি বেশ বুঝিয়াছি, উষা আর নাই। সেই বিড়ালের আত্মা উষা দেহে সম্পূর্ণ জাগরিত হইয়াছে! সে তাহার প্রতিহিংসা বৃত্তি সাধনের জন্য বিড়ালের ন্যায় নিঃশব্দে অবসর খুজিতেছে! এখন উপায়! ইহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার কি আর কোন উপায় নাই। জগতে আর কাহারও জীবনে এরূপ অদ্ভুত পূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে কি! এখন উপায়! এখান হইতে পালাইলে কি রক্ষা পাইব! হতভাগিনী উষাকে যে প্রাণ দিয়া ভালবাসি,—তাহাকে এই ভয়াবহ পৈশাচিক মার্জ্জারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার কি কোনই উপায় নাই! না,—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্মুখে! কখন সে অন্ধকারে আমায় আক্রমণ করিবে, তাহা জানি না! কখন নিদ্রিত অবস্থায় শনৈঃ শনৈঃ আসিয়া সে আমার টুঁটি ধরিবে, তাহাও আমি জানি না! এমন কাল সাপ,—ভয়াবহ মৃত্যু বুকে রাখিয়া, কয়দিন মানুষ পাগল না হইয়া থাকিতে পারে! ভাই, যদি আমি রক্ষা না পাই, যদি হঠাৎ আমার মৃত্যু হয়, তবে তুমিই কেবল আমার মৃত্যুর কারণ জানিতে পারিবে,—আর কেহ জানিতে পারিবে না। যে বিড়ালকে এক দিন নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়াছিলাম, সেই আমার স্ত্রী,—তাহাকে মনপ্রাণ হৃদয় সর্ব্বস্ব দিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম,—কি ভয়ানক! কেবল ইহাই নহে, তাহার ভিতরে সেই বিভীষিকা মূর্ত্তি জাগরিত হইয়াছে,—আমায় চিনিতে পারিয়াছে,—আমার রক্ত শোষণের জন্য ব্যাকুল হইয়া ঘুরিতেছে! আমি পাগল হইয়া যাইতেছি,—না এ সমস্তই সত্য!

(৯)

পর দিন উষা বলিল, "তুমি ঘরে শোও না কেন? আমার উপর রাগ করেছ?"

সেই পূর্ব্বের উষা! আমি যে উষাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতাম, সেই

ঊষা ! কই তাহার তো কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই ; তবে সকলই কি আমার পাগলামি ! আমি বলিলাম, "শরীরটা ভাল ছিল না।"

ঊষা বলিল, "আজ ঘরে এসে শোও !"

ঊষা চলিয়া গেল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আবার সেই বিভীষিকা। সে যেন ধীরে ধীরে আমার চক্ষের উপরে কুঝটিকায় মিশিয়া গেল ! আমার বোধ হইল ঘর হইতে একটা ভয়বহ বিড়াল যেন সন্তর্পণে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতেছে। আবার আমার দেহ পাষাণে পরিণত হইল,—শিরায় শিরায় বরফ ছুটিল ! ভাই, আমার মনের অবস্থা বর্ণনা করিতে পারিব না।

সমস্ত দিন হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিলাম। আমি কি এমনই অপদার্থ, আমি কি এমনই কাপুরুষ, যে কল্পনায় বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া তাহারই ভয়ে উন্মাদ হইয়াছি ! যাহা সম্ভব নহে, তাহা চক্ষের উপর দেখিতেছি ! না, যাহা হয় হউক, আমি ঊষাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

আমি অনেক রাত্রে শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ঊষা শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া কি ভাবিতেছে ! সে আমায় দেখিয়া চক্ষু মেলিয়া বলিল, "এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি কচ্ছিলে ? অনেক রাত হয়েছে,—শোও।"

আমি শয়ন করিলাম, কিন্তু আলো নিবাইলাম না। আমি শয়ন করিলে, ঊষা আমার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া বিছানার অপরপার্শ্বে শয়ন করিল। আমরা উভয়েই নীরবে শয়ন করিয়া রহিলাম, তৎপরে ঊষা ধীরে ধীরে বলিল, "আলো নিবাইতেছ না কেন ? আলোতে কি তোমার ঘুম হবে ?"

আমি বলিলাম, "আমার ঘুম পায় নি।" ঊষা বলিল, "আলো থাক্‌লে ঘুম হবে না। আলো জ্বেলে তুমি তো কখনও ঘুমুতে পার না।"

আমি আলো নিবাইয়া দিলাম, ঘর ঘোর অন্ধকার হইয়া গেল। ঊষা আর কোন কথা কহিল না ; আমার নিকট হইতে দূরে শয়ন করিয়া রহিল ; আমারও তাহার নিকট যাইতে সাহস হইল না। চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ। আমি কাণ পাতিয়া শুনিয়াও ঊষার নিশ্বাস শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু বুঝিলাম সে ঘুমায় নাই। আমি অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না,—সে এই গভীর অন্ধকারেও সব দেখিতে পাইতেছে ! আমি ঘুমাইয়া পড়িলেই আমার টুটি ধরিয়া আমার হৃদয়ের রক্ত পান করিবে ! আমার আর দেহে বল নাই, মনে উৎসাহ কি তেজ নাই, প্রাণে জীবনী শক্তি নাই ! ঊষা বালিকা

নুইত নয়, অথচ তাহাকে দেখিয়া আমি ভয়াবহ বিভীষিকা দেখিতেছি। মনকে সহস্র রূপে বুঝাইয়াও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি প্রাণ থাকিতে নিদ্রিত হইব না, আমি জাগিয়া রহিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতে লাগিল; কোন দিকে কেন শব্দ নাই; কেবল আমারই মস্তিষ্ক হইতে অগ্নি শিখা নির্গত হইতেছে!

বোধ হয় ভোর রাত্রে আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু বিছানায় কে যেন অতি সন্তর্পণে আমার দিকে আসিতেছে, সেই শব্দে চমকিত হইয়া আমি জাগিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "উষা, তুমি কি জাগিয়া আছ?" কোন উত্তর নাই, কোন শব্দ নাই, সকলই নীরব নিস্তব্ধ।

ক্রমে উষার আলোক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন দেখিলাম, উষা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে! অথবা তাহার সকলই জাল! ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অর্দ্ধ মৃতবৎ আমি উষাকে না ডাকিয়াই বাহিরে চলিয়া গেলাম!

(৫)

আর আমার হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই! আমি বুঝিয়াছি, মৃত্যু ধীরে ধীরে আমার নিকটে চোরের ন্যায় পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতেছে! হতভাগিনী বিহগিনী কাল সর্পের দৃষ্টিতে মন্ত্র মুগ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে তাহার মুখের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া অগ্রসর হইতেছে! না,—একবার আত্ম রক্ষার চেষ্টা পাইব! কালই উষাকে এখান হইতে লইয়া পশ্চিমে পলাইব! নিশ্চয়ই তাহা হইলে তাহা হইতে এই ভয়াবহ মার্জ্জারীর আত্মা দূরীভূত হইবে! যাহা হয় কিছু আমি কালই করিব, আমি আমাকে ও উষাকে এরূপ ভাবে নির্ম্মম রূপে হত হইতে দিব না! কালই আমি ইহার ব্যবস্থা করিবই করিব।

* * * * *

এ বিকট অস্ফুট আর্ত্তনাদ কিসের! আমিই কি চীৎকার করিতেছি! আমার যে দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে! কি লোমহর্ষণ বিভীষিকা! আমার টুটি ধরিয়াছে। এ কি! এ কি। আমি যে চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর পত্র লিখিতেছিলাম;—এই যে আমার হাত হইতে কলম পড়িয়া গিয়াছে। কয়েক রাত্রি চক্ষে নিদ্রা নাই; তাহাই নিশ্চয়, আমি তোমায় পত্র লিখিতে লিখিতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়াছি।

কি ভয়ানক স্বপ্ন। স্বপ্নে দেখিলাম—সেই—সেই ভয়াবহ সাদা

বিভীষিকা,—শনৈঃ শনৈঃ আমার নিকট আসিয়া লম্ফ দিয়া আমার টুটি ধরিল। তাহার কোমল পা আমার গলার চারিদিকে ধীরে ধীরে বসিয়া যাইতে লাগিল—এ কি। উষা,—না উষা নয়? আমার দমবন্ধ হইয়া যায়—প্রাণ যায়, হা ভগবান। গলা টিপিয়া মারিলে এত যন্ত্রণা।—এই সময়ে আমার চমক ভাঙ্গিল;—আর ভাই, আমার লিখিবার ক্ষমতা নাই। এ পত্র ডাকে পাঠাইতেছি,—উষা আমায় ডাকিতেছে,—বোধ হয় এই পর্য্যন্ত।

* * * * *

কাল পত্র ডাকে দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু দেওয়া হয় নাই? তোমার আরও দুই একটা লিখিবার ইচ্ছা হইতেছে,—তুমি ডাক্তার,—শরীর তত্ত্ব ও প্রেত তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক পড়িয়াছ,—তুমি কি মনে কর আমি পাগল হইয়াছি,—মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এরূপ বিভীকিা দেখিতেছি? না, আমি পাগল হই নাই,—আমি তোমায় সত্যই বলিতেছি যে সেই সাদা বিড়ালের আত্মা উষার দেহ আশ্রয় করিয়াছে,—সে এক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্ত আমার গলা টিপিয়া মারিবার জন্য অবসর খুঁজিতেছে? উষা আর নাই, সেই ভয়াবহ মার্জ্জারীতে পরিণত হইয়াছে? তাহার হস্তে আমার রক্ষা নাই।

আমি মরিলে উষার কি হইবে? তখনও কি কাল পিশাচী বাঁচিয়া থাকিবে? যদি থাকে তবে কোন শক্তিকে তাহার হস্ত হইতে উষাকে রক্ষা করিও,—বন্ধুর এই শেষ অনুরোধ। টাকা কড়ি যথেষ্ট রহিল,—যদি পিশাচী মার্জ্জারী আমাকে হত্যা করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, ভাই—তাহাকে দেখিও,—আর কি বলিব। দেখিও, তাহার যেন কোন কষ্ট না হয়।

আর একটা অনুরোধ আছে,—আমার মৃত দেহ বিনা দ্বিধায় অঙ্গব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা করিও,—দেখিও যথার্থ আমি পাগল হইয়াছিলাম, না আমি যাহা লিখিতেছি তাহা সত্য সত্যই ঘটিয়াছে? আমি মরিতেছি,—কিন্তু যদি তুমি ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে জগতের বিশেষ উপকার করিতে পারিবে।

আমি যাহা দেখিয়াছি,—আমি যাহা উপলব্ধি করিয়াছি,—সকল তোমাকে লিখিতে পারিলাম না,—হয়তো তাহা হইলে তুমিও আমার মত বুঝিতে পারিতে যে যথার্থই সেই সাদা বিড়াল উষার দেহ আশ্রয় করিয়া আছে? নিয়তি—ভাই সকলই নিয়তি। এমন আর কখনও কাহারও হইয়াছে কি!

* * * * *

নরেনের দ্বারবান ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু শীঘ্র আসুন,—শীঘ্র আসুন, বাবুর কি হযেছে!"

আমি যে অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থায় ছুটিলাম। হাঁপাইতে হাঁপাইতে নরেনের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়ীর সকলেই ভীত স্তম্ভিত; কেহ আমায় কিছুই বলিতে পারিল না; সকলেই বলিল, "উপরে যান—উপরে যান।"

নরেনের বাটীর কোন স্থানই আমার অবিদিত ছিল না। আমি ছুটিয়া তাহার শয়ন গৃহে আসিলাম। তাহার পর যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলাম, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না।

দরজা উন্মুক্ত,—সম্মুখে গৃহ কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে—নরেন। তাহার চক্ষু ভয়াবহ বিস্ফারিত,—তাহার মুখ বিকট বিকৃত,—তাহার দন্তে দন্ত পেশিত, তাহার হস্ত পদ আড়ষ্ট। আমি ডাক্তার, অনেক মৃত দেহ দেখিয়াছি, কিন্তু এমন ভয়াবহ মৃত দেহ আর কখনও দেখি নাই। আমার হৃদয় স্পন্দিত হইল,—আমি ভয়ে, বিভীষিকায়, এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলাম না! ব্যাকুল ভাবে স্পন্দিত হৃদয়ে সেই বিকট মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ভৃত্যগণ সকলই যে ভয়ে আত্মহারা হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি। তাহারা সকালে বাবুর শয়ন গৃহের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল,—তাহার পর দ্বারের সম্মুখে আসিয়া নরেনের অবস্থা দেখিয়া আমায় সম্বাদ দিতে দ্বারবান পাঠাইয়া ছিল। কেহই গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই।

আমি একটু প্রকৃতস্থ হইয়া নরেনের মৃতদেহের নিকট গিয়া তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। বুঝিলাম তাহার অনেকক্ষণ মৃত্যু হইয়াছে, দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়,—কিসে যেন তাহার গলা টিপিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে; অথচ তাহার গলায় কোন দাগ বা চিহ্ন নাই। আমার দেহের রক্ত বরফে পরিণত হইল বলিলেও আমার মনের ভাব ব্যক্ত হয় না।

আমি গৃহের বাহিরে আসিয়া ভৃত্য ও লোক জনকে ডাকিয়া একজনকে পুলিশে সম্বাদ দিতে পাঠাইলাম; অপর একজনকে ডাক্তার সাহেবকে আনিতে

পাঠাইলাম। তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের মা ঠাকরুণ কোথায় ?"

তাহারা সকলেই বলিয়া উঠিল, "তা জানি না।"

"তিনি কি এখনও শুয়ে আছেন ?"

"তা জানি না। কাল রাত্রে বাবু ও তিনি ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলেন।"

"আজ সকালে দরজা খোলা ছিল,—তাহলে তিনি উঠে গেছেন।"

এই সময় একজন বলিল, "না ডাক্তার বাবু—তিনি এখনও শুয়ে আছেন।"

আমি অতি বিস্ময়ে বলিলাম, এখনও শুয়ে আছেন ?"

লোকটা ঘরের দিকে দেখাইতেছিল; আমিও তাহার গৃহ মধ্যে চাহিলাম। দেখিলাম, বৃহৎ পালঙ্ক, সুন্দর মশারীতে আবরিত,—সেই মশারীর মধ্যে একজন তখনও নিদ্রা যাইতেছে। আশ্চর্য্য, এই গোলযোগে উষার এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। আমি স্পন্দিত হৃদয়ে খাটের নিকট গিয়া ধীরে ধীরে মশারী তুলিলাম। উষা দুই হস্ত বুকের উপর রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছে! যেন একখানি দেবী প্রতিমা কে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত করিয়া রাখিয়াছে।

আমি তাহার কপালে হস্ত স্থাপন করিয়া প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিলাম,—দেহ বরফ হইতেও শীতল। বহুক্ষণ উষার প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে।

আর কি বলিব ? এই অভূতপূর্ব্ব লোম হর্ষণ ব্যাপারের আর কি বলিব ? বড় বড় দেশী বিলাতী ডাক্তার আসিয়া দুই মৃত দেহ দেখিলেন, আমরা সকলেই অবশেষে স্থির করিলাম যে হার্টফেল করিয়া সহসা উষার মৃত্যু ঘটিয়াছে,—তাহার হৃদপিণ্ডের রোগ বরাবরই ছিল; কিন্তু আমরা বহু পরীক্ষায়ও নরেনের মৃত্যুর কারণ স্থির করিতে পারিলাম না। পুনর্জন্মের কথা সত্য না সর্ব্বৈব মিথ্যা। কে ইহার উত্তর দিবে ?

খুড়োর উইল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল।

(২০)

জ্যাক লণ্ডনে ফিরিয়া গেল। তাহার মনের ভাব তখন বর্ণনাতীত, সে তখন অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছে। এ রহস্য উদ্ঘাটন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ক্লাইটিকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিবে না। আর প্রশ্ন করিবারই বা প্রয়োজন কি? মরুভূমিতে তৃষাতুর পথিকের পানপাত্র বিচার করিবার সময় থাকে না, ইচ্ছাও হয় না। তাহার জল পাইলেই হইল। কোথা হইতে জল আসিল সে প্রশ্ন করিবার তাহার প্রয়োজন হয় না। রাত্রে তাহার আদৌ ঘুম হইল না।

পরদিন মিঃ চোপের সহিত তাহার দেখা হইল। মিঃ চোপ তাহাকে অষ্ট্রেলিয়ায় যাইবার জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলেন। জ্যাক একেবারে কথা না দিলেও, অনেকটা সম্মতি জানাইল। সমস্ত দিন বিবাহের সব বন্দোবস্ত করিয়া, গির্জ্জা ও পাদরী ঠিক করিয়া, সন্ধ্যার সময় ক্লাইটিকে গিয়া সব সংবাদ দিল। স্থির হইল, পরদিন দুপুর বারটার সময় লণ্ডনের সেণ্টলিউক গির্জ্জায় মলি ও ক্লাইটি জ্যাকের সহিত দেখা করিবে। সেখানেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময় ভগ্নীদ্বয় গির্জ্জায় গিয়া হাজির হইল। জ্যাক পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত ছিল। পাদরী সাহেব যথারীতি শুভকার্য্য সম্পন্ন করিলে, জ্যাক ক্লাইটির হাত ধরিয়া বাহিরে আসিল। তাহার আনন্দ দেখে কে? ক্লাইটি আজ তাহার স্ত্রী। প্রাণের শ্রেষ্ঠ বাসনা তাহার পূর্ণ হইয়াছে! অসম্ভব ভাবিয়া যাহা সে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছিল, আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। ইহা কি সত্য? না, এখনও সে স্বপ্ন দেখিতেছে!

ভগ্নীদ্বয় ট্রেণে উঠিয়া বাড়ী রওনা হইল। জ্যাকও তাহাদের সহিত চলিল। কিন্তু ক্লাইটির কথামত সে অন্য গাড়ীতে গিয়া উঠিল। বাড়ী

আসিয়া ক্লাইটির দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি বিশ্রাম ঘরে গিয়া পোষাকপরিচ্ছদ ছাড়িয়া একটু শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

জ্যাক ও মলি দুজনে মনের আনন্দে কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত হইল। মলি বলিল,—"সারাদিন পরিশ্রমের পর, দিদি একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনি উঠবে। তুমি দুঃখিত হয়ো না। সত্যি জ্যাক, তুমি বড়ই সুখী। ক্লাইটির মতন স্ত্রীরত্ন লাভ করা বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। আমি পুরুষমানুষ হলে, তোমার অবস্থা দেখে আমার হিংসা হতো। আমি জোর করে বলতে পারি যে, স্যার উইলফ্রেড কার্টনের ন্যায় সুখী লোক আজ পৃথিবীতে বড় বিরল—"

জ্যাক চমকিয়া মলির মুখের দিকে তাকাইল। "কি বল্লে ?"

মলি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া বড়ই ভীত হইল। কিন্তু যাহা বলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা আর ফিরাইবার নহে। বৃথা অনুতাপ করিয়া আর কি ফল হইবে ? সে কম্পিত স্বরে বলিল,—

"জ্যাক, আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি।" জ্যাকের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কঠোর দৃষ্টিতে সে মলির পানে চাহিয়া বলিল,—

"আমাকে স্যার উইলফ্রেড কার্টন বলে, সম্বোধন করিলে ? তাহলে তুমি জানতে—"

"হাঁ, আমি জানতাম।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও মলিকে ইহা স্বীকার করিতে হইল।

"কবে তুমি জানতে পারলে ?" জ্যাক ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল।

"যেদিন প্রথম তোমায় ব্রামলেতে দেখি। অন্তত ; সে রাত্রে তোমাকে গির্জ্জাপ্রাঙ্গণে দেখে আমার মনে তাই ধারণা হয়েছিল।"

জ্যাক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—

"আর ক্লাইটি ? সেও জানতো ? কবে থেকে ?"

"কখন ?" মলির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল—

"ও জ্যাক—উইলফ্রেড—অমন করে আমার সঙ্গে কথা কচ্ছো কেন ? ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন ? হঠাৎ এমন রেগে উঠবারই বা কারণ কি ?"

"আমি রাগ করি নাই। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। আমি সত্য ঘটনা জানতে চাই।' কবে সে এ কথা জানতে পারলে ?"

"সেই ঝড়ের দিন নৌকায়—" মলি যেন জোর করিয়া কথা বলিল,—"তুমি ভুলে তোমার নাম উচ্চারণ করেছিলে। তাতে আর কি এসে যায়? তুমি অত রাগছো কেন? তুমি তাকে ভালবাস, বিবাহ করেছ—সে এখন তোমার স্ত্রী—"

"ঝড়ের দিন? হাঁ, মনে পড়েছে। সেই দিন থেকে! এতদিন তাহ'লে আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলো। আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে! এখন সব বুঝতে পারছি। সব রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ছে।" জ্যাক তীব্রভাবে হাসিতে লাগিল। সে হাস্যে মলির অন্তরদেহ কাঁপিয়া উঠিল।

"তুমি কি বুঝতে পেরেছ? কি ভাবছো এত? জ্যাক—উইলফ্রেড জানি না কি নামে তোমাকে ডাকবো! তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছো কেন? এর জন্য তুমি নিশ্চই ক্লাইটির প্রতি নিষ্ঠুর—"

"না, নিষ্ঠুর হবো না। এতদিন ধরে তোমরা জান, আমি কে। অথচ সে কথা লুকিয়ে রেখে আমাকে প্রতারিত করেছ। কেন, তা আমি জানি। এখন আমার চোখ ফুটেছে। বিবাহের কারণও বেশ বুঝতে পারছি। পৈতৃক সম্পত্তি যাহাতে আমার হস্তগত হয়, তাই উদ্দেশ্য।

কিন্তু আমার মনের ভাব সে আদৌ গ্রাহ্য করে নাই। আর কিছু বলতে হবে না—আমি শুনতে চাই না। আমাকে বোকা বানিয়েছে। কিন্তু এখন আমার চৈতন্য হয়েছে। আমি সব বুঝতে পারছি। স্বার্থত্যাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সে এ কাজ করেছে। আমার বিষয় একবার ভাবেও নাই।"

মলি উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"জ্যাক, তুমি ভুল বুঝেছ। ক্লাইটি তোমাকে যথার্থই ভালবাসে—"

জ্যাক তাহাকে দূরে সরাইয়া দিল।

"মিথ্যা কথা! সে আমাকে একটুও গ্রাহ্য করে না। তাকে স্পর্শ করলেই দূরে সরে যায়। একটাও ভালবাসার কথা একদিন সে মুখে উচ্চারণ করে নাই। তাকে চুম্বন করবার অধিকারও সে আমাকে দেয় নি। আমি সব বুঝতে পারছি। নিজের খেয়াল সফল করবার উদ্দেশ্যে সে নিজের স্বার্থ বলি দিয়েছে। যতই ভাবি, ততই পাগল হয়ে যাবার যোগাড় হয় দেখছি। যে ভালবাসে না তাকে বিবাহ করা—"

মলি পুনর্ব্বার তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"জ্যাক, তুমি ভুল বুঝেছ। বস, আমি তাকে ডেকে আনছি।"

"না না, তাকে আর ডাকতে হবে না। তুমি দাঁড়াও। যা বলি, মন দিয়ে শুন। তুমি বুদ্ধিমতী, আমার প্রাণের মধ্যে কি হচ্ছে, আমি যা বলতে চাই, তুমি বুঝতে পারবে। আমি প্রতারিত হতে চাই না। তাকে বলো, আমি তাকে জন্মের মত ত্যাগ কল্লাম। তার এ মহান আত্মোৎসর্গের ফল গ্রহণ করতে আমি সম্মত নহি। যে স্ত্রীলোক আমাকে ভালবাসে না, কেবল একটা মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্য আমাকে বিবাহ করেছে, সে স্ত্রীলোকের স্বামী হতে আমি অনিচ্ছুক। এসব লুকিয়ে রেখে আমার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করবার কারণ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আমি কি এতই নীচ, যে তার এই স্বেচ্ছা-পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট ভোগ করবো? সে পূর্ব্বে আমাকে বলেছিলো যে বিবাহের পরই তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে, তাই আমি চল্লাম।—"

মলি মানসিক যন্ত্রণার বেগে হাত নাড়িতে নাড়িতে কাঁদিয়া বলিল,—"জ্যাক, জ্যাক, সে যথার্থই তোমাকে ভালবাসে। একটু অপেক্ষা কর, আমি তাকে ডেকে আনি।"

"না, আর যেতে হবে না। আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। সে স্বপ্নের ঘোর ভেঙ্গে গেছে। আমি চলে গেলে, তাকে ডেকে সব বলো। আমি চিরদিনের জন্য চল্লাম। যে স্ত্রী স্বামীকে আদৌ ভালবাসে না, তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবো, এত নির্ব্বোধ আমি নই। কি কথাবার্ত্তায়, কি ইঙ্গিতে কখনও সে আমার প্রতি একটুও ভালবাসা জানায় নাই।"

জ্যাক টেবিলের নিকট গিয়া একখণ্ড কাগজে কি লিখিল। সেটুকু মলির দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিল,—"এই নাও। কাগজটা তাকে দিও। আমি বিষয় সম্পত্তি সব ত্যাগ করলাম। আমি ওসব কিছুরই প্রত্যাশী নই। আমি মাত্র ক্লাইটিকে স্ত্রীরূপে পাবার ইচ্ছা করেছিলাম।"

মলি তাহার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভয়ে তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে। জ্যাক তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল,—

"মলি, তুমি ছেলেমানুষ। এসব কিছু বুঝবে না। ক্লাইটি উঠলে তাকে এই কাগজটুকু দিও। তাকে জানিও ভবিষ্যতে কখনও আমি তাকে স্ত্রী বলে দাবি করবো না। আর তার সঙ্গে যাতে আর পরে সাক্ষাৎও না হয় ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।"

জ্যাক তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া গেল। মলি তাহাকে ডাকিতে

ডাকিতে পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু জ্যাক আর পিছনে তাকাইয়াও দেখিল না। দ্রুত পদবিক্ষেপে চলিয়া গেল।

(২১)

জ্যাক মিঃ চোপের সহিত পারলুনায় ফিরিয়া গেল। সে আসিবে বলিয়া জ্যারো দম্পতী পূর্ব্বে কোনও সংবাদ পান নাই। এখন তাহাকে পাইয়া তাহারা আনন্দসাগরে মগ্ন হইল। অধীনস্থ লোকজনেরাও প্রিয় মনিবকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল। কেবল মেরী সিটন জ্যাকের প্রত্যাবর্ত্তনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না; এমন কি তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেও আসিল না।

জ্যাক মেরীর অন্বেষণে গিয়া দেখিল, সে টবে কাপড় চোপড় কাচিতেছে। জ্যাককে সম্মুখে দেখিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

"মেরী, আমি আবার ফিরে এলাম। তোমাকে দেখে এখন বেশ সুস্থ বলেই মনে হচ্ছে। আমি ফিরে আসাতে তুমি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়েছ ?"

মেরী মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"হাঁ, সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনি দেশে বেশ সুস্থ ছিলেন ? আপনাকে একটু রোগা রোগা দেখাচ্ছে।"

জ্যাক ঈষৎ হাসিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। মেরীও স্বকার্য্যে ব্রতী হইল।

কয়েক দিনের মধ্যেই জ্যাক আবার স্থানীয় সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। ক্লাইটির সম্বন্ধে তাহার মনে যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা দিন দিন দূরীভূত হইতে লাগিল। ক্লাইটি যে তাহাকে কেবল মাত্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী করিবার জন্যই স্বেচ্ছায় নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, এ ভ্রান্তি তাহার মন হইতে কিছুতেই দূর হইল না।

"সিলভার রিজ" ভূমিতে যন্ত্র বসাইয়া তাহারা স্বর্ণ তুলিবার বন্দোবস্ত করিল, মিঃ চোপের ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থই ফলিয়া গেল। ভাল ভাল স্বর্ণ মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উঠিতে লাগিল। এ সংবাদ ক্রমেই চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। স্বর্ণের লোভে দুর্ব্বিত্তেরা সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। চোপ ও জ্যাক বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের সহিত তাহাদের আক্রমণ হইতে সে স্থান অতি সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিল।

একদিন মিঃ চোপ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ব্যারো দম্পতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সে রাত্রে জ্যাক একাকীই মাঠের মধ্যে তাঁবুতে

যাইয়া স্বর্ণখনি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। মাথার শিয়রেই একটি গুলিভরা পিস্তল ঠিক করিয়া রাখিল। অর্দ্ধরাত্রে হঠাৎ মনে হইল কে যেন, তাহার দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা মারিতেছে। পিস্তলটি হাতে করিয়া জ্যাক সতর্কতার সহিত দরজা খুলিয়া দিল। দেখিল, মেরী বাহিরে দাঁড়াইয়া। মেরী এই গোলাবাড়ীর গায়েই একখানি ছোট কুঁড়ে ঘরে বাসা লইয়াছিল।

জ্যাককে দেখিয়া মেরী বলিল,—"তাঁহার আশে পাশে একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ঘরের পিছন দিয়ে তাকে গুঁড়িসুড়ি মেরে আসতে দেখেছি।"

"আচ্ছা আমি এর বন্দোবস্ত করছি।" এই বলিয়া জ্যাক ঘরের যে কোণে অগ্নিকুণ্ড ছিল, সেখানে পুরাতন থলে দিয়া এক মনুষ্যাকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিল। দূর হইতে দেখিলে সেটাকে মানুষ বলিয়াই ভ্রম হয়। পরে দরজা ভেজাইয়া দিয়া তাঁবুর মধ্যে দুজনে লুকাইয়া রহিল।

আগন্তুক দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখস্থ জিনিষটা মানুষ মনে করিয়া হামাগুড়ি দিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। আগুনের আলোতে জ্যাক লোকটাকে বেশ চিনিতে পারিল। এই লোকটারই হাত হইতে জ্যাক একদিন মেরীকে উদ্ধার করিয়াছিল। লোকটা সেই আকৃতির সম্মুখীন হইবা মাত্র জ্যাক পিছন হইতে তাহাকে জাপটাইয়া ধরিল। সে তখন জ্যাকের গলদেশ ধরিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। মেরী ইতিমধ্যে সাহসে ভর করিয়া জ্যাকের পকেট হইতে পিস্তল লইয়া দুর্ব্বৃত্তের মাথার উপর ধরিল। সে তখন নিরুপায় হইয়া চেঁচাইয়া বলিল,— "আমি আর কিছু করবো না। আমাকে মেরো না।"

জ্যাক তাহাকে ছাড়িয়া দিল। তাহার জামার পকেট হইতে এক খানা বড় ছোরা, কয়েক পেন্স মুদ্রা, ও তিনখানি পুরাতন ময়লা খাম বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। পরে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল,—

"তুমি কিজন্য এখানে এসেছ, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।" এই বলিয়া জ্যাক একবার মেরীর দিকে চাহিল,—"তোমাকে এখনি আমি গুলি করে মেরে ফেলতে পারি, কিন্তু ছুচোঁ মেরে হাত গন্ধ করতে ইচ্ছা করি না। তুমি আজই এ দেশ ত্যাগ করে যাও। কাল যদি আবার তোমাকে এ অঞ্চলে

দেখতে পাই, তাহলে আমার হাতে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। বুঝতে পারলে ?"

লোকটা গোঁ গোঁ করিতে করিতে চলিয়া গেল। তখন টেবিলের উপরস্থিত সেই খাম কয়খানির উপর জ্যাকের নজর পড়িল। অমনি সে বিস্ময়ের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিল। তিনখানি খামেতেই তাহার নাম ও ঠিকানা লেখা আছে,—স্যার উইলফ্রেড কার্টন, মিণ্টোনা। জ্যাক খামের ভিতর হইতে চিঠি কয়খানি খুলিয়া পড়িল। সবগুলিই মিঃ গ্রেঞ্জারের পত্র। তিনি তাহাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে বায়োস্কোপের ছবির ন্যায় তাহার মনের মধ্যে পুরাতন কথা সব জাগিয়া উঠিল। তাহার পিতার মৃত্যু, দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ও পিতার কবর দর্শন, ক্লারিটি, মলি, বিবাহ, দুঃখ ও নৈরাশ্য যুগপৎ তাহার স্মৃতি সমুদ্র আলোড়িত করিয়া তুলিল। চিঠিগুলি তাহার হাত হইতে নীচে পড়িয়া গেল! জ্যাক এক অব্যক্ত যন্ত্রণা সূচক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। মেরী নিকটে আসিয়া একখানি পত্র তুলিয়া লইল। জ্যাক পত্রখানি তাহার নিকট হইতে লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

"আমি সব জানি—স্যার উইলফ্রেড!"

"তুমিও জান ?"

"হাঁ, বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই আমি জানি। যেদিন ঐ লোকটার হাত হতে আপনি আমাকে প্রথম উদ্ধার করেন, সেই দিন থেকে। জানতাম বলেই আমি খবরের কাগজে আপনার পিতার মৃত্যু সংবাদ পড়ে সেখানি আপনাকে পড়িতে দিই। ব্রামলেই আমার জন্মস্থান। আপনার পিতার কারখানাতেই আমি চাকরি করতাম। মনে করেছিলাম, ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে আপনি পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। কিন্তু এ দেশে আবার কেন ফিরে এলেন, তা কিছুই বুঝতে পারি নাই।"

মানবজীবনে এমন মুহূর্ত্তও আসে, যখন অতি বড় পাষাণ প্রকৃতি লোকেরও হৃদয় বিগলিত হয়, মূকও বাক্‌শক্তি লাভ করে। দুঃখ ও নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জ্যাক অনেক কষ্টে কাজে মন দিয়াছিল। কিন্তু পুরাতন চিঠি কয়খানি দেখিয়াই তাহার সেই অতীতের দুঃখসিন্ধু পুনরায় উথলিয়া উঠিল। মেরীর সহানুভূতিসূচক কথাবার্ত্তা শুনিয়া অজ্ঞাতসারে সে বলিয়া ফেলিল,—

হাঁ, আমিই উইলফ্রেড কার্টন। তোমার প্রদত্ত খবরের কাগজ পড়েই আমি ইংলণ্ডে যাত্রা করি।" এই বলিয়া জ্যাক মন্ত্রমুগ্ধবৎ ইংলণ্ডে যাওয়া হইতে ক্লাইটিকে বিবাহ অবধি যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সব পরপর মেরীর নিকট বর্ণনা করিল। শেষে তাহার চৈতন্য হইল, একথা মেরীকে বলা যুক্তি সঙ্গত হয় নাই। ভয়ে মেরীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—

"মেরী, কিন্তু একথা তুমি আর কাকেও বলতে পারবে না। তোমাকে এ সব না বলাই উচিত ছিল, চিঠি কখানা পড়ে আমার মন বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বিশেষতঃ তুমি ব্রামলের লোক। তোমাকে পুরাতন বন্ধু জ্ঞানেই এ সব কথা বলেছি, কিন্তু দেখো, যেন আর কাকেও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলো না। আমি যে স্যার উইলফ্রেড, তা ভুলে যাও। আমি জ্যাক ডগলস্ এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ নামেই লোকের নিকট পরিচিত হতে চাই।"

"আমাকে আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন। এত অকৃতজ্ঞ নই যে, জীবন দাতার এই সামান্য কথাটা আমি রাখতে পারবো না। আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

এই বলিয়া মেরী চলিয়া গেল। সে রাত্রি জ্যাকের আর আদৌ ঘুম হইল না।

* * * * *

দুদিন পরে মিঃ চোপ ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট হইতে জ্যাক সংবাদ পাইল যে, মেরী সিটন বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে পারালুনা ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছে। একথা শুনিয়া জ্যাক একটু বিস্মিত ও চিন্তিত হইল, কিন্তু মেরীকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

(২২)

জ্যাক চলিয়া গেলে, মলি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। চঞ্চল চরণে ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ কি করিলে ভগবান্? আমারই দোষে ক্লাইটির জীবনের সব সুখের শেষ হইয়া গেল! রঙ্গালয়ে মিলনের অভিনয় আরম্ভ হইতে না হইতেই বিদায়ের কৃষ্ণযবনিকা ফেলিয়া দিলে? মলির মনে এই সব চিন্তাই কেবল উদিত হইতেছে; এমন সময় ক্লাইটি ঘরের ভিতর ঢুকিলেন।

"মলি, অমন করছো কেন? জ্যাক কোথায় গেল?"

মলি শোকের আবেগে ভগ্নীর হাত ধরিয়া বলিল,—"সে চলে গেছে। জন্মের মতন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আমারই সব দোষ! আমি ভুলে তার আসল নাম ধরে ডেকে ফেলেছিলাম। অমনি তাহার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বল্লে, তাহলে তুমি তাকে ভালবাস বলে বিবাহ কর নাই; কেবল তাকে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী করবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজের স্বার্থ বলি দিয়েছ। আমি পুনঃপুনঃ তাকে বুঝিয়ে বল্লাম যে এ ধারণা তার ভুল, কিন্তু কোনই ফল হল না সে আর কখনও আসবে না বলে চলে গেল।"

ক্লাইটি পার্শ্বস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেবল বলিলেন,—"তাহলে সে চলে গেছে!"

"হাঁ, জন্মের মত গেছে, আর ফিরবে না। আমাদের এমন চুপ করে বসে থাকলে হবে না। তাকে খুঁজে বার করতেই হবে।"

ক্লাইটি মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"না, চলে গেছে, ভালই হয়েছে।"

"ভালই হয়েছে! কি যে তুমি বলছো, কিছু বুঝতে পারছি না তা হতেই পারে না। একটা কিছু উপায় ঠিক কর! এমন গুরুতর বিষয়ে এত উদাসীন কেন? তবে কি তুমি তাকে সত্য সত্যই ভালবাস না? তবে কেন তাকে বিবাহ করলে? এত তাড়াতাড়ি, গুপ্তভাবে, এ কাজ করবার উদ্দেশ্য কি?"

"তার পৈতৃক সম্পত্তি সে যাতে পায়, এ চেষ্টা আমি বহুদিন থেকেই করে আসছি, তুমি জান। আর মলি, মানুষের জীবন কবে আছে, কবে নাই। আমার শরীর গতিকও ভাল নয়। মাঝে মাঝে ভয় হয়—"

"একি কথা! তুমি বলতে চাও কি আর বেশীদিন বাঁচবে না? এসব ধারণা তোমার মাথায় কে ঢুকিয়ে দিয়েছে?"

"এই যে মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যাই, আমার ভয় হয় হৃদ্‌যন্ত্র খারাপ হয়ে আসছে। মূর্চ্ছার পূর্ব্বে অন্তঃকরণ গুরুগুরু কাঁপতে থাকে। বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়ি। এই অবস্থায় বিবাহের পূর্ব্বেই মারা গেলে, কি হতো বল দেখি!"

"আমি এখন সব বুঝতে পারছি! কিন্তু জ্যাককে এমন করে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। কিন্তু কোথায় গেল কিছু জানতে পারলাম না ত! আচ্ছা, তুমি একটু স্থির হয়ে বসো, আমি এখনই আসছি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মলি বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। সোজা ষ্টেশনে গিয়া দেখিল, প্লাটফর্ম্ম জনশূন্য। খবর লইয়া জনিল, একখানি ট্রেণ কিছুপূর্ব্বে ছাড়িয়া গিয়াছে। ভাবিল, জ্যাক তাহলে সেই ট্রেণেই দেশ ত্যাগ করিয়াছে। বাড়ী ফিরিবার সময় মলি এক ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া আনিল। ডাক্তার যন্ত্রাদির সাহায্যে ক্লাইটির বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের কোন প্রকার রোগ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সামান্য দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াই টনিকের বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন।

মলি ক্লাইটির রোগ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। এবার জ্যাকের সন্ধান লইতে সে এক উপায় স্থির করিল। খবরের কাগজে এক সাঙ্কেতিক বিজ্ঞাপন লিখিয়া পাঠাইয়া দিল।

বিজ্ঞাপন যথাসময়ে খবরের কাগজে বাহির হইল। কিন্তু কোনও ফল হইল না। ভগ্নীদ্বয় দিনের পর দিন উত্তরের অপেক্ষায় আশাপথ চাহিয়া রহিল, কিন্তু কোন সংবাদই আসিল না। মধ্যে মধ্যে গাড়ী করিয়া লণ্ডনের রাজপথে দুজনে ঘুরিয়া বেড়াইত, যদি জ্যাকের সাক্ষাৎ লাভ হয়, কিন্তু সব চেষ্টাই তাহাদের নিস্ফল হইল। ক্লাইটি তখন সিদ্ধান্ত করিলেন,—সে নিশ্চয়ই ইংলণ্ড ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছে। এ দেশে তার আর সন্ধান পাওয়া অসম্ভব!

এদিকে লেডী মারভিনের নিকট হইতে পত্র আসিল। ষ্ট্যাণ্টন বেশ সুস্থ হইয়া আসিতেছিলেন কিন্তু হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগায় পুনর্ব্বার অসুখে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইবে। কিন্তু ষ্ট্যাণ্টন ভগ্নীদ্বয়ের সাক্ষাৎ লাভের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

ভগ্নীদ্বয় স্থির করিল ব্রামলেতে ফিরিয়া যাইবে। যতই দিন যাইতেছে, জ্যাকের প্রতি তাহার ভালবাসা কত গভীর ক্লাইটি বেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। দিন রাতই কেবল জ্যাকের কথা তিনি ভাবেন। তাঁহার বিরহে জ্যাকও কত কষ্ট ভোগ করিতেছে, নিজের মনের মধ্যে তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

তাহারা ব্রামলে যাত্রা করিল। ষ্টেশনে নামিতেই হেসকেথ আসিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ক্লাইটির মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—

"আপনাকে দেখে বেশ সুস্থ বলেই মনে হচ্ছে। সেদিন লর্ড ষ্ট্যাণ্টনকে দেখতে গিয়াছিলাম। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সুস্থ আছেন।"

পরদিন প্রাতে ভগ্নীদ্বয় ষ্ট্যান্টনকে দেখিতে গেলেন। তাহাদের বিশেষতঃ মলিকে দেখিয়া তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

তারপর অনেক দিন চলিয়া গেল, কিন্তু জ্যাকের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না।

* * * * *

একদিন মিঃ গ্রেঞ্জার হেসকেথের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। পত্রে হেসকেথ একখণ্ড জমি কিনিবেন বলিয়া গ্রেঞ্জারের মত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। যায়গা সম্বন্ধীয় দলিলপত্রও চিঠীর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছেন। দলিলপত্র দেখিতে দেখিতে একটুকরা কাগজ মিঃ গ্রেঞ্জারের নজরে পড়িল। একি, এযে উইলফ্রেডের ত্যাগপত্র। উইলফ্রেড যেদিন গ্রেঞ্জারের সহিত দেখা করিতে আসে সেদিন স্বেচ্ছায় এই কাগজ সে লিখিয়া দিয়াছিল। এ কাগজ কি রকমে হেসকেথের হস্তগত হইল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর মনে হইল, সেদিন উইলফ্রেড এই ত্যাগপত্র লিখিয়া চলিয়া গেলেই হেসকেথ এই সব দলিলপত্রাদি লইয়া তাঁহার পরামর্শ লইতে আসিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই কাগজপত্রের সঙ্গে এই কাগজটুকুও ভুলে গিয়া থাকিবে। তিনি আরও ভাবিলেন, এতদিন তাহার কাগজপত্রের সঙ্গে থাকিলেও হেসকেথ এ কাগজটুকু নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেন নাই। হেসকেথ যে ইচ্ছা করিয়াই অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত এটুকু পাঠাইয়াছে, তাহা তিনি ধরিতে পারিলেন না।

লেখাটুকু দেখিয়াই মিঃ গ্রেঞ্জারের মনে পড়িল যে উইলের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এবার উইলের সর্ত্তানুসারে ক্লাইটিই তখন স্যার উইলিয়াম কার্টনের সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। পৈতৃকসম্পত্তি হইতে একমাত্র পুত্রকে বঞ্চিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে যথার্থই দুঃখ হইল। কিন্তু তাঁহার আর হাত কি! উইলফ্রেডকে বুঝাইতে তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই।

সে রাত্রে উইলফ্রেডের ব্যবহারে তাহার প্রতি তিনি একটু আকৃষ্টও হইয়াছিলেন এবং এ বিষয় সম্পত্তি তাহারই হস্তগত হইলে, তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নাই। এবার আইন সঙ্গত কার্য্য করিতে তিনি বাধ্য। তিনি ক্লাইটিকে এ বিষয় জানাইবার জন্য "ব্রামলে হল" অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যার সময় হেসকথ তাঁহার আফিস ঘরে কাজ করিতে ছিলেন আর ভাবিতেছিলেন মিঃ গ্রেঞ্জার উইলফ্রেডের লেখা কাগজটুকু পাইয়া কি মনে করিতেছেন।

অবশ্য মিঃ গ্রেঞ্জার কোন প্রকারেই তাঁহাকে সন্দেহ করিতে পারেন না। এমন সময় তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী মেরিল আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল।

"আজ্ঞে, আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে এলাম, ক্ষমা করবেন। কর্ম্মচারী রডন আবার কাজে বড় অবহেলা করছে সে কথা আপনাকে জানান উচিত ভেবে বলতে এলাম।"

"তাকে কাজে জবাব দাও" এই বলিয়া হেসকেথ পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। (ক্রমশঃ)

মেহের

(লেখক—শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়)

(১)

কান্দাহার হইতে ভারতবর্ষ আসিবার পার্ব্বত্য পথ—বন্ধুর ও দুর্গম. এই দুর্গমপথ প্রায় অনতিক্রম্য বনারাজি মধ্য দিয়া কোথাও বা সুন্দর উপত্যকার উপর দিয়া কোথাও বা ভয়াবহ অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরদ্বয়ের মধ্যগত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। আবার কোথাও বা বারিহীন বালুকাপূর্ণ অগ্নিময় মরুভূমি। ঈদৃশ ভয়ঙ্কর পার্ব্বত্য পথে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বসন্তকালের প্রারম্ভে একদিন একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক ঘোটকারোহণে ভারতাভিমুখে আসিতে ছিলেন।

পুরুষটির আকৃতি কবিজন কল্পিত মহাজন লক্ষণ সংযুক্ত সুন্দর, উন্নত বংশীয় জনৈক মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার ললাটদেশ দুঃখ রোগাকীর্ণ অথচ দৃঢ়তার লক্ষণ পরিস্ফুট। পরিচ্ছদাদি অতি দীনতা ব্যঞ্জক হইলেও মেঘান্তরাল লুকায়িত অপূর্ব্ব বুদ্ধি প্রতিভার ছটা প্রকাশ পাইয়েছিল। সমভিব্যাহারিণী তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা। আকার দীর্ঘ, অপূর্ব্ব সুন্দরী—কিন্তু শারীরিক ও মানসিক তাপে বিবর্ণা।

অতি করুণস্বরে স্ত্রীলোকটি স্বামীকে বলিলেন—"আর চল্‌তে পার্চ্ছিনি।" ব্যথিত হৃদয়ে স্বামী সহধর্ম্মিণীর কাতরতা ব্যঞ্জক স্বর শুনিয়া বলিলেন—"প্রিয়তামা, আর একটুকুখানি চল! ঐ যে নিকটে উপত্যকার নীচে যে আঙ্গুর ক্ষেত দেখা যাচ্ছে তার ধার দিয়ে একটা নদী গেছে, নিশ্চয়ই বল্‌তে পারি, ওখানে 'গাঁ' আছে।" স্ত্রী স্বামীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া আরও অধিকতর কাতর স্বরে বলিলেন—"আর পার্চ্ছি না।" স্বামী স্নিগ্ধস্বরে অতি দীনভাবে বলিলেন—"প্রিয়ে আর একটু চল।" "যদি তুমি আমায় সত্যই ভালবাসো তবে আশ্রয় অনুসন্ধানে যাও—আমি এইখানেই থাকি। যদি কোথাও সুবিধা পাও কাল সকালে আসিয়া লইয়া যাইও।" পাছে স্বামীর হৃদয়ে ব্যথা লাগে ভাবিয়া পতিপ্রাণা সুন্দরী এতক্ষণ সাধ্যাতীত কষ্ট সহ্য করিতেছিলেন কিন্তু সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে; তিনি স্বামীকে শেষোক্ত কথা বলিবাব সময়ে ঘোটক হইতে পড়িবার উপক্রম হইলে অমনি সেই মুহূর্ত্তে স্বামী বাহু দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করিলেন। গিয়াসবেগ মূর্চ্ছিতা স্ত্রীকে অতি সন্তর্পণে ক্রোড়ে করিয়া নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষতলে রাখিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করাইলেন। স্ত্রীর জ্ঞানহীন মূর্চ্ছিত কলেবর দর্শনে তাঁহার নয়ন হইতে দরদর ধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তিনি অস্ফুটস্বরে ধীরে ধীরে আবেগ ভরে বলিলেন—"যদি আমার দুঃখের সমভাগী, পুণ্যের সহচরী—পিপাসায় পানীয়—জীবনের ধ্রুবতারা এমন সোণার পত্নী না থাকে তবে মিথ্যা এ জীবন ধারণ।"

গিয়াসবেগ মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নিকটস্থ কোন এক উৎস হইতে করপুটে জল আনয়ন করিয়া পত্নীর বিশুষ্ক বদনে ধীরে ধীরে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পত্নীর এতাদৃশ অবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্যান্ধকারে আবৃত হইল। নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারাও পত্নীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে না পারিয়া উন্মত্তবৎ হইয়া পত্নীকে নানাপ্রকার প্রেমগর্ভ বাক্য দ্বারা আহুত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হতভাগ্য গিয়াসের সর্ব্ব প্রকার আয়াস ব্যর্থ হইল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে গিয়াস পত্নী "মীরা" অকস্মাৎ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন—গিয়াস তখন আনন্দাতিশর্য্য বশতঃ মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। আশ্রয়হীনা উত্থানশক্তি রহিতা মীরা বড়ই বিপদে পড়িলেন—মীরা কায়মনে খোদার নাম লইলেন ও গড়াইয়া গড়াইয়া স্বামীর নিকট

গেলেন। অশ্রুধারায় স্বামীর বক্ষ ভিজাইয়া দিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে গিয়াস ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিলেন। পত্নীকে বক্ষোপরি দেখিয়া গিয়াসের আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরব রহিলেন, প্রগাঢ় দুঃখ ও সুখের ভাষা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিবার নহে—বহুক্ষণ পরে গিয়াস হৃদয়ে বল পাইয়া পত্নীকে শারিরীক সন্তাপের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মীরা বলিবার চেষ্টা করিয়াও পুনর্ব্বার বেদনার সঞ্চার হওয়ায় কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নিরাশ্রয় গিয়াস পত্নী মীরার যন্ত্রণার লাঘবের নানা প্রকার উপায় করিতে লাগিলেন—কিন্তু মীরার বেদনার লাঘব হওয়ার পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্যোপায় হইয়া গিয়াস নতজানু হইয়া পত্নীর রোগোপশমের জন্য জগদীশ্বরকে কায়মনে ডাকিতে লাগিলেন। দায়াময় পরমেশ্বর তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন। খোদার নিকট "নেমাজ" সমাপনান্তে চক্ষু মিলিয়া চাহিলেন। বিস্ময় সহকারে দেখিলেন যে, পত্নীর ক্রোড়ে একটি সদ্য প্রসূত শিশু কন্যা। গিয়াস তদ্দর্শনে একেবারে আত্মবিস্মৃত হইলেন—উন্মত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নির্ঝরিণী হইতে বারি আনয়ন পূর্ব্বক মীরার হস্তপদ প্রভৃতি স্থানে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

দুঃখের সময় সুখের হাসি মানবের দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। বর্ষাকালীন প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড যেমন অকস্মাৎ ঘনঘটায় আচ্ছাদিত হয়, গিয়াসের শিশু মুখ সন্দর্শন ও পত্নীর বেদনা মুক্তি দর্শন জনিত সুখও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। সেই জনমানবহীন হিংস্রশ্বাপদ সঙ্কুল মরুভূমি বেষ্টিত পার্ব্বত্য অরণ্যে রাত্রি যাপন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। গিয়াস পত্নীকে ঘোটকের উপর চাপাইয়া দক্ষিণ হস্তে পত্নীকে ধরিলেন ও বাম হস্তে নবজাত শিশুকে লইয়া ধীরে ধীরে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথশ্রান্তে ক্ষুধার্ত্ত গিয়াস আর বেশীদুর চলিতে পারিলেন না। শারিরীক দৌর্ব্বল্য মানসিক দুশ্চিন্তা, অত্যধিক জঠোর জ্বালা ও পিপাসা তাঁহার অগ্রসরের প্রতিবন্ধক হইল। তিনি মনে মনে বহু বদানুবাদের পর আপনাদের উভয়ের প্রাণ রক্ষার জন্য শিশুটিকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া স্থির করিলেন। হায়, কুসুম-কোমল গিয়াস আজ খাদ্যাভাবে বজ্র অপেক্ষা কঠিন হইলেন—পিতা হইয়া আপন কন্যাকে পথিপার্শ্বে ফেলিয়া যাইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। তিনি নানা কৌশলে পত্নীর নিকট হইতে শিশুটিকে লইয়া আপনার পরিধেয় বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন

করিয়া শিশুটিকে আচ্ছাদন করিয়া বামপার্শ্বে স্থাপিত করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শিশু ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে হাস্য করিল।

গিয়াস পত্নীর নিকট ফিরিয়া আসিলে মীরা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার মেয়ে কোথায়?" বেগ তখন বলিলেন—"ভয় নেই—মেয়ে বেশ ভাল যায়গায় আছে—চিন্তার কোন কারণ নাই।" প্রতিপ্রাণা মীরা স্বামীর কথায় বিশ্বাস করিয়া বলিলেন—"মেয়ে এনে দাও," এই বলিয়া মীরা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। 'বেগ' পত্নীকে তৃণপত্র শয্যায় শয়ন করাইয়া শিশুর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

(২)

যে স্থানে শিশুটিকে রাখিয়াছিলেন সেই স্থানে আসিয়া দেখেন, একটি বৃহৎ সর্প ফণাবিস্তার করিয়া শিশুটির মুখ ঢাকিয়া রহিয়াছে। গিয়াস প্রথমতঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন পরে সর্পটিকে মারিবার নিমিত্ত একখানি পাথর লইয়া যেমন অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সর্পটি কোথায় অদৃশ্য হইল? শত চেষ্টা করিয়াও গিয়াস তাহার সন্ধান পাইলেন না। তখন অতি সন্তর্পণে, শিশুটিকে লইয়া বেগ আপন পত্নীর হস্তে দিলেন। জননী পীযুষ পুরিত স্তন্যদ্বয় শিশুর মুখে পুরিয়া দিলেন। এদিকে ভগবানের একনিষ্ঠ সাধক গিয়াসবেগ শিশুর অদ্ভুত উপায়ে প্রাণ রক্ষা হওয়ায় ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে এক মনে খোদাকে ডাকিতে লাগিলেন।

মরীচিমালী আপন রক্তিমচ্ছটা বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমশঃ পশ্চিম গগনে লুটাইয়া পড়িতে ছিলেন, বায়স-চক্ষু জলাশয়ের জলে কমলবঁধু ধীরে ধীরে আপন চক্ষু নিমীলিত করিতেছিল; পক্ষিগণ আপনাপন কুলায়াভিমুখে ফিরিতে ছিল। গিয়াসবেগ সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া ভীত হইয়া বলিলেন—আর পান্থনিবাসে পৌঁছিবার উপায় নেই, অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে একজন বলিল,—"কেন, ভয় কি, আমিই পৌঁছাইয়া দিব।"

পশ্চাৎ ফিরিয়া গিয়াস দেখিলেন একটি সবল সুস্থকায় সুপুরুষ তাহার কথায় প্রত্যুত্তর দিতেছেন। সেই মহাপুরুষটিকে দেখিলে মনে হয় কোন ধনবান্ যুবক। বেগ শুনিয়াছিলেন বিপদকালে পতিতপাবন ভগবান স্বয়ং মনুষ্য মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া বিপদগ্রস্থকে বিপদ মুক্ত করেন। আগন্তুকের আবির্ভাবে গিয়াসের পূর্ব্বোক্ত ধারণা দৃঢ় হইল। গিয়াস বেগ কাতরে

বলিলেন,—"মহাশয়, আমি অত্যন্ত বিপদে পতিত, দয়াকরে উদ্ধার করুন।"

আগন্তুক নিকটে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন,—"আমার নাম মালুক মস্থদ।"

গিয়াস—"আপনি কি বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ মালুক মস্থদ।"

মালুক মস্থদ। "হাঁ, আমি সেই। আমার সেনাদল অগ্রে গিয়াছে। অমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া ছিলাম।"

গিয়াস—"তারপর—"

মালুক মস্থদ—"আপনার স্ত্রীর খেদোক্তি শুনিয়া আপনাদের সহায়তা করিবার ইচ্ছা বলবতী হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের সম্মুখবর্ত্তী হই নাই; পাছে ভয় পান।"

গিয়াস—"না মশাই, আমাদের হৃদয়ে সহসা ভয় বা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারে নাই। আমাদের হৃদয় প্রস্তরবৎ কঠিন।"

মালুক মস্থদ—"তবুও অকস্মাৎ কোন সৈনিক পুরুষ সামনে আপনার ভয় হ'তে পারে।"

গিয়াস—"তারপর—"

মালুক—"আপনাদের কন্যাটি জন্মগ্রহণ করিবার পরই আমি গণনা করিয়া দেখি, আপনার কন্যা ভারতেশ্বরী হ'বে।"

গিয়াস—"হঁা, বলেন কি, সব মিথ্যে—জ্যোতিষ মিথ্যে—শাস্ত্র মিথ্যে—।"

মালুক—"না কখনই মিথ্যে নয়—সত্যই আপনার কন্যা কালে ভারতেশ্বরী হবে। আপনাদের স্থান ত্যাগ কালে আমার বাহ্যিক জ্ঞান ছিল না, তাই আপনাদের স্থান পরিবর্ত্তন বিষয় জানিতে পারি নাই।"

গিয়াস—"আপনি মহানুভব পুরুষ।"

মালুক—"আপুনি ও আপনার স্ত্রী একত্রে আমার উষ্ট্রের হাওদায় উঠুন আর আমি আপনাদের ঘোটকারোহণে শিশুকন্যাটিকে লইয়া যাই, —আসুন।"

এই বলিয়া মালুক শিশুকন্যাকে লইয়া ঘোটকারোহণ করিলেন এবং স্বামী স্ত্রীতে উষ্ট্র হাওদায় চাপিয়া চলিলেন। গিয়াস যাইতে যাইতে নানাপ্রকার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করায় মালুক বলিলেন—"দেখুন ধন্যবাদ বা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় ইহা নয়। বিপদকালে একে অপরের সাহায্য করাই মানবের ধর্ম্ম ও মানব জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য।"

গিয়াস—"একথা এখন কয়জন লোক মানে?

মালুক—"সকলে না মানুক—কতকগুলি লোক মানেন তো!"

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া মালুক নিস্তব্ধতা ভঙ্গপূর্ব্বক গিয়াসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বোধ হয় একজন সরল প্রকৃতি পল্লীবাসী।"

গিয়াস—"না মশাই আমি পল্লীবাসী নহি।"

মালুক—"আপনার পরিচয়টা একবার শুনিতে পাই কি?"

গিয়াস—"নিশ্চয়ই, 'তবে শুনুন। আমার পিতা সাহ মহম্মদ সেরিফ্। তিনি সাহমহম্মদ তখলু খাঁর প্রধান সচিব ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর আমি বৈদেশিক সচিব পদে অভিষিক্ত হই; পিতৃ শত্রুরা আমার একদিন প্রাণবধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে কোনরূপে পরিত্রাণ পাই, পূর্ব্ব রাজার মৃত্যু হইলে নব রাজা—দুর্ব্বল ও শত্রু দ্বারা পরিচালিত, এই কারণে একদিন ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে সস্ত্রীক বহু ধনরত্ন লইয়া সরিয়া পড়ি, কিন্তু নিতান্ত দুরাদৃষ্ট বশতঃ আফগান দস্যুরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল, কেবল প্রাণে মারিল না।

মালুক—"আপনারা কোথায় যেতে ইচ্ছা করেছেন? আপনাদের কি কোন কাজ আছে?"

গিয়াস—"আমি বন্ধুবান্ধবহীন। আমি একবার ভারতের সম্রাট আকবরের দর্শনাভিলাষে ভারতে যাইতেছি। সম্রাট হুমায়ুন সের খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তিহারণে আশ্রয় গ্রহণ কালে আমার পূজ্যপাদ পিতা সম্রাটকে আশ্রয় দেন। হুমায়ুন ভারতের সিংহাসন পাইয়া পত্রদ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সর্ব্ববিধ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু তখন কোন সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। এখন সম্রাট আকবর যদি আমার পিতার কার্য্যকলাপের কথা স্মরণ করিয়া আমার জীবিকা অর্জ্জনের একটি পথ করিয়া দেন—সেই উদ্দেশ্যে যাইতেছি।"

মালুক—"আমি সম্রাটের ব্যক্তিগত মহানুভবতার বিষয় বিশেষ অবগত আছি। তিনি আপনাকে সাহায্য করিবেন। সম্রাটের নিকট ইচ্ছামত গমনাগমনের অধিকার আমায় দিয়াছেন। আমি আপনাকে সম্রাটের নিকটে হাজির করিয়া দিব।"

কৃতজ্ঞ উদ্বেলিত হৃদয় গিয়াসের চক্ষু দিয়া দর্ দর্ ধারায় অশ্রু নিপতিত হইল।

বহুক্ষণ নীরবে গত হইল। মালুক নিকটস্থ একটি পান্থনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথক্লেশ অপনীত হইলে মালুক বলিলেন—"নিশ্চয়ই আপনার কন্যা ভারতসাম্রাজ্ঞী হইবেন। স্বহস্তে রাজদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক ভারত-শাসন করিবেন। সমরাঙ্গণে রণ-মত্তমাতঙ্গিনীর ন্যায় যুদ্ধ করিবেন।"

গিয়াস—খোদাতাল্লার মেহেরবাণী।

মালুক—আপনি কন্যার নাম "মেহের" রাখুন।

মীরা পান্থ নিবাসে আশ্রয় পাইয়া ও কন্যার এতাদৃশ ভবিষদ্বাণী শুনিয়া বলিলেন—"নিসা অর্থাৎ সুখসূর্য্য।"

তখনই মালুক বলিলেন—"আপনি কন্যাকে মেহের—উন—নিসা এই অপূর্ব্ব নামে ডাকিবেন।"

গিয়াস কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহাই স্বীকার করিলেন। পান্থ নিবাসে অহারাদির পর সকলে নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় নিলেন। এই কন্যাই সেই ভারত বিখ্যাত সম্রাজ্ঞী "নুরজাহান।"

সাথী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক—শ্রীপরেশনাথ সরকার

(১৮)

শ্যামাসুন্দরী বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতেই সরকার মহাশয় বলিলেন—আপনি আপনার বাড়ীতেই উঠুন মা। আমি এখান হতে সব জিনিষ পত্র সেখানে পাঠিয়ে দেব। কর্ত্তাকে পত্র দিয়েছি, উত্তর আসিলে আপনাকে এবাড়ীতে নিয়ে আসব।

শ্যামাসুন্দরী কথাটা একেবারেই বুঝিলেন না; কিন্তু দুদণ্ড যাইতে না যাইতে গোপীকিশোর আসিয়া একটা মস্ত বড় ভূমিকা করিয়া জানাইয়া দিয়া গেলেন যে, যার ছেলে চাড়াল, মুচি বাড়ী পড়ে থাকে তাকে নিয়ে কোন রকম ছলাকেরা ও আহার ব্যবহার করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রকাণ্ড বৃক্ষটার মূলে

এমন নৃশংস ভাবে গভীর কুঠারাঘাত করিতে গ্রামস্থ কেহই সম্মত নয়। তখন তিনি আগাগোড়া ব্যাপারখানা জলের মতন বুঝিয়া ফেলিলেন। তিনি বুঝিলেন, কেন আজ তাঁহার বিরুদ্ধে সকলে এমন জোট বাঁধিয়া লাগিয়াছে। এত দিন তাঁহার কিছুই ছিল না, তাই অপ্রকাশ্যে তাঁহার প্রতি যাহার মনের ভাব যেমন থাকুক না কেন প্রকাশ্যে কেহ তাঁহার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া দলাদলি করিতে আসে নাই। আজ হরবল্লভ বাবু তাহাকে বাড়ী ও বিষয় ফিরাইয়া দিয়াছেন, সেই অদৃষ্ট সুপ্রসন্নের সঙ্গে সঙ্গে সকলে তাহাকে এক ঘরে করিবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতেছে। এত দিন সকলে ভাবিয়াছিল যাহার কাছে যা পাওনা আছে তা তিনি কিছুতেই আদায় করিতে পারিবেন না, এখন একটু চিন্তিত হইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোপীকিশোর ২০০০৲ টাকা ধার নিয়ে ছিলেন, তাঁহার ভয়টাই বেশী হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক শ্যামাসুন্দরী সরকারকে বলিলেন—তুমি আমাকে ২০৲ টি টাকা দাও।

শ্যামাসুন্দরী কতকাল পরে স্বামীর ভিটায় আবার উনুন জ্বালাইলেন। বেলা ৩ টার সময় নগেন শবদাহ করিয়া ভিজাকাপড়ে বাড়ীর কাছ দিয়া যাইতে ছিল, এমন সময় শ্যামাসুন্দরীকে দেখিতে পাইয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া মার কাছে দাঁড়াইল।

শ্যামাসুন্দরী তাহাকে এই ভাবে এত বেলায় দেখিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ী তাহাকে একখানি কাপড় দিয়া বলিলেন—নে কত বেলা হয়েছে, খাবি আয়!

নগেন মাতার এইরূপ আকস্মিক আগমনের কারণ যেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, সে হাঁ করিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—মা, কখন এলে?

শ্যামাসুন্দরী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন—নে তাড়াতাড়ী করে কাপড়টা ছেড়ে ফেল!

আহারের পরে শ্যামাসুন্দরী নগেনকে শয্যার পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন—আর তোকে কোথাও যেতে দেব না!

নগেন বলিল—মা, এখনত আমায় যেতে হবে। বাগ্দিপাড়ায় আজ ২৷৩ টার কলেরা হয়েছে!

বলিয়া সে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের মত ছটফট করিয়া উঠিল; মায়ের কোন কথার উত্তর শুনিবার জন্য একমুহূর্ত্তও না দাঁড়াইয়া সে ঘর হইতে

বাহির হইয়া গেল। শ্যামাসুন্দরী দরজার কাছে আসিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, নগেন একবার সেদিক ফিরিয়াও চাহিল না। অনেকক্ষণ সেভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না কি করিয়া এই সন্তানকে তিনি বাধা দিয়া ফিরাইবেন। সন্তান যে কার্য্য মাথায় করিয়া লইয়াছে, যদি মা হইয়া তিনি তাহাকে বাধা দেন, তবে ইহলোকে কাহাকেও তাহার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে না বটে, কিন্তু ভগবানের কাছে তিনি কি বলিবেন; অথচ ব্যাপার যেমন দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নগেনকে এখন বাধা দেওয়াও দরকার—নইলে সমাজ তাহার উপর কঠোর দণ্ড বিধান করিয়া বসিবে।

গোপীকিশোর আসিয়া শাসাইয়া গেলেন—ছেলেকে ফিরাও, অন্ততঃ প্রায়শ্চিত্তের একটা উপায় না হয় রেখে দাও—বলচি!

সেদিন আর নগেনের কোন সংবাদই শ্যামাসুন্দরী পাইলেন না। পরদিন বেলা ১০।১১ টায় যখন নগেন মলিন বস্ত্রখানি মাজায় বাঁধিয়া বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার সেই রুক্ষভাব দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী স্পষ্ট বুঝিলেন, সমস্ত রজনী তাহার নিদ্রা হয় নাই। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আভার কথা মনে পড়িয়া গেল, তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন।

তারপর মাতৃস্নেহ-সিঞ্চিত মধুর কথাগুলি একটু কঠোর করিয়ানগেনকে আর কোথাও যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। নগেন এ নিষেধের কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—সে কি মা, তারা যে আমায় যেতে বলে দিয়েছে। আমি না হাতে করে দিলে কেউ যে ঔষধ খাবে না!

এ কথার কোন উত্তর নাই। শ্যামাসুন্দরী হাঁ করিয়া পুত্রের মুখের দিকে চহিয়া রহিলেন যেন বাহির করিতে চাহেন কেন এই সব রোগাক্রান্ত লোক এমন একটি অবোধ যুবকের উপর এতটা নির্ভর করিয়া সুখী ও নিশ্চিন্ত হয়!

শ্যামাসুন্দরী নগেনকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিলেন না, নগেন সব বাড়ী বাড়ী রোগীর পরিচর্য্যা করিয়া ফিরিতে লাগিল। ফলে গ্রাম্য সমাজ তাহার বিরুদ্ধে একেবারে চিরকালের জন্য একটা মত জাহির করিয়া বসিল—সে একঘরে। গোপীকিশোর মুখপাত্র হইয়া সংবাদটা সত্যচরণকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে শ্যামাসুন্দরীকে সকলে মিলিয়া একঘরে করা হইল, তিনিও সকলের হইয়া তাহার সঙ্গে কোন রকম আচার ব্যবহার না করেন।

সত্যচরণ সরকারের পত্রে পূর্ব্বেই সমস্ত অবগত হইয়া ছিলেন। তিনি গোপীকিশোরের পত্র পাইয়া রতনগঞ্জে চলিয়া আসিলেন।

বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তিনি যখন দেখিলেন একটি নিরপরাধীর উপরে গ্রামবাসী এইরূপ একটি ভীষণ শাস্তির বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছে, তখন তিনি তাহাদের হইয়া সমাজের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিলেন, ফলে ফল দাঁড়াইল আরও ভীষণ।

গোপীকিশোর সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে সত্যচরণ ওদের ত্যাগ করিতে সম্মত হবে না, এক্ষেত্রে তাহাকেও আমরা সমাজচ্যুত করিব।

সত্যচরণ ভাব দেখিয়া বলিলেন—সমাজ ছেড়ে আমার একপা চলিবার ক্ষমতা নেই। বিশেষ আমার কন্যা বড় হয়েছে, তার সম্বন্ধও স্থির হইয়া গিয়াছে।

গোপীকিশোর বলিলেন—বেশ কথা আপনি কন্যার বিবাহ বাড়ীতে দিবেন।

কথাটার মধ্যে যে একটা সামাজিক চাল রহিয়া গিয়াছে, সত্যচরণ তাহা বুঝিলেন, গ্রামে বিবাহ হইলে সেই বিবাহে তিনি শ্যামাসুন্দরীকে নিমন্ত্রণ না করিয়া তাহাকে অপমানিত করিবেন, এইটাই সকলের ইচ্ছা।

অগত্যা তাঁহাকে তাই স্বীকার পাইতে হইল—কন্যাদায়।

শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে আলাপ একেবারে নিষিদ্ধ প্রচার হইয়া গিয়াছিল। ধোপা নাপিত ত বন্ধ অনেকদিন হইয়া গিয়াছে, তবে তাহাদের হুকার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া যে হুকাটী বন্ধ করা যায় নাই, এই জন্য নাকি অনেক মাতব্বর এখানে ওখানে দুঃখ প্রকাশ করিতে ছিলেন।

একদিন খুব গোপনে সত্যচরণ শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—এজন্য আমি তত দুঃখিত নই ঠাকুরপো, সবই ভগবানের হাত। যাক, তোমার দুঃখ করিবার কিছুই নাই। তুমি আভার বিয়ে দাও। আমাকে নিমন্ত্রণ নাইবা করলে। আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করি—তার ভাল হবে।

সত্যচরণ কলিকাতায় আসিয়া বিধুমুখীকে সব কথা বলিলেন। তিনি কোন মতেই বুঝিতে পারিলেন না, শ্যামাসুন্দরীর দোষ কোনখানটায়।

সত্যচরণ বলিলেন—এমনি আমাদের সমাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এমনি ধরণের কত অত্যাচার সমাজের বুকের উপরে দাঁড়াইয়া কত লোকে করিতেছে, তার সীমা নাই!

বিধুমুখী বলিলেন—যাক, মেয়ের বিয়েত দিতেই হবে, নইলে না হয় তার সাথে আমরাও একঘরে হয়ে থাকতাম।

চন্দ্রা যখন মুখভরা হাসি লইয়া আভার নিকট কথাটা বলিয়া ফেলিলেন, তখন আভা উপুড় হইয়া শয্যায় পড়িয়াছিল। সে পাশ ফিরিয়া শুইল, বলিল জ্যেঠাইমা আমার শরীরটা বড় খারাপ হয়ে পড়েছে তুমি এখন যাও।

চন্দ্রা বলিলেন—তা বেশ হয়েছে মা, আমাদের পাড়াগাঁয়ে বিয়েতে যেমন ধরণের আমোদ আহ্লাদ হবে, এখানে কি তা হবার জো আছে? পাড়ার দশজন আসবে, দেখবে শুনবে, আমোদ আহ্লাদ করবে, সেই এক ভাব!

আভা বাধা দিয়া বলিল—তবে আমি যাচ্ছি জ্যেঠাই মা, তুমি এখানে বসে এ সব বকে যাও?

চন্দ্রা বলিলেন—সেকি বাছা বিশ্বাস হল না বুঝি? তা তোরা কি করে বুঝবি সে সব পাড়াগাঁয়ের কি ভাব। এখানে থাকিস, পাশের বাড়ীর সঙ্গে আলাপ সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত তোদের নাই, আমাদের সেখানে গাঁয়ের সবাইর সঙ্গে কেমন একমন একপ্রাণ।

আভা তাড়াতাড়ী শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল!

চন্দ্রা বলিলেন—মেয়ের কিছুই বিশ্বাস হয় না। ধন্যি মেয়ে বটে!

বিধুমুখী বারেন্দায় বসিয়া কি একটা কাজ করিতেছিলেন, আভা ধীরে ধীরে যাইয়া মায়ের পিঠের উপর ঝুকিয়া পড়িল। তিনি সস্নেহে তাহার হাতখানি ধরিয়া মুখ উচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মা?

আভা একবার ছল ছল নয়ন যুগল উত্তোলন করিয়া মাতার সজলনয়নের দিকে চাহিল। বলিল—"কিছু না", "সেকি, তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন বলত!"

আভা একটু হাসিয়া বলিল—কিছুই হয় নি মা!

(১৯)

বিবাহের দিন স্থীর করিয়া দিয়া স্ত্রী কন্যা সহ সত্যচরণ বাড়ী আসিয়াছেন! শ্যামসুন্দরী সে সংবাদ পাইলেন, অবশ্য সত্যচরণ তাহাকে গোপনে সে সংবাদ দেন নাই, গ্রামের ২।৪টি দুরন্ত ছেলেমেয়ে তাহার বাড়ীর কাছ

দিয়া, যাইতে যাইতে এই কথাটি খুব বড় করিয়া বলিতেছিল! গোপী-কিশোর এবং অন্যান্য গ্রাম্য সমাজের নেতাগণ দুই বেলা তাহাদের বাড়ীর কাছ দিয়া যাতায়াত করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে যে সব কথা বলিয়া যায় তাহার অর্থ শ্যামাসুন্দরী বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন; তাহাতে তাঁহার ভয় যতটা না হউক লজ্জা ও ক্ষোভের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়!

একদিন নগেন গভীর রাত্রে বাড়ী আসিয়া বলিল—মা, কাকীমারাত এসেছেন!

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—তুই কি করে জানলি, দেখেছিস!

নগেন—হাঁ মা।

শ্যামাসুন্দরী—সেকি তুই কি সেবাড়ী গিয়েছিলি নাকি রে?

নগেন বলিল—আমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখেছি!

শ্যামসুন্দরী—তোকে কেউ দেখেছে?

নগেন—হাঁ, মা, আভা দেখেছে, সেত আমায় ডাকল না মা। আমায় দেখেই চলে গেল।

শ্যামাসুন্দরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আর তুই সে বাড়ীর কাছ দিয়ে যাসনে কখনো!

নগেন বলিল—সেকি মা, কাল যে সবাইকে সে বাড়ী যেতে হবে, আবার, যে জায়গাটায় আমাদের স্কুল ঘর উঠছে, সেটা যে ওদের জায়গা!

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—তা হ'ক তুই সে বাড়ী যাসনি! আর যে হয় যাবে।

নগেন—কেন মা!

শ্যামাসুন্দরী—আমি বলচি বাবা, যাসনি!

বলিয়া শ্যামাসুন্দরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। নগেন মাতাকে এমন ভাবে চখেরজল ফেলিতে দেখে নাই। সে যেন কেমন হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ী মায়ের আরও কাছে আসিয়া বড় ব্যস্ততার সহিত বলিল—কি হয়েছে মা! শ্যামাসুন্দরী আজ একটা নূতন জিনিষ লাভ করিয়া এই গভীর দুঃখরাশির মধ্যেও একটু আনন্দিত হইলেন। তিনি দেখিলেন নগেনকে হুকুম করিবার চেয়ে, তাহার সম্মুখে চখেরজল ফেলিলে, তিনি নগেনকে ইচ্ছামত কার্য্য বোধ হয় করাইতে পারিবেন!

নগেন মায়ের চখেরজল মুছাইতে মুছাইতে বলিল—না মা, যাব না!

শ্যামাসুন্দরী নগেনের সম্মুখে ভাতের থালা দিয়া বলিলেন—এখন খেতে বস বাবা, রাত কত হয়েছে!

নগেন কয়েক গ্রাস মাত্র খাইয়া উঠিয়া পড়িল। তারপরে আসিয়া মায়ের কাছে বসিয়া রহিল। শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—যা এখন শুয়ে থাক গিয়ে। নগেন বলিল—মা আমি তোমার কাছে শোব। পুত্রকে বুকে টানিয়া আনিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন—ভগবান, এ বিপদে ফেলে যদি এমনি ভাবে আমার নগেনকে আমার বুকের কাছে এনে দাও, তবে যেন এমনি বিপদ আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়।

পরদিন প্রভাতে নিতাই আসিয়া যখন ডাকিল—কই গো দাদা, এখনো উঠনি নাকি, তখন নগেন শ্যামাসুন্দরীর বাহুপাশ মুক্ত হইয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল।

নিতাই বলিল—দাদা, এইবেলা চল যাই!

নগেন বলিল—আমিত যাব না!

নিতাই নগেনের মুখে এমন ভাবের কথা কোন দিন শোনে নাই। নিতাইয়ের কোন কথার প্রতিবাদ সে কোন দিন করে নাই, এবং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন মতও এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করে নাই, আজ এই হঠাৎ প্রতিবাদ বাক্য শ্রবণে, নিতাই একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কোন কথা বলিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া নগেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নগেন বলিল—তুমিই যাও দাদা, আমি যাব না।

নিতাই বলিল—সে কি দাদা, তুমি যাবে না সে কিহে?

নগেন—না আমি যাব না।

নিতাইর বড় রাগ হইল, বলিল—তবে যাও চলে যেখানে ইচ্ছা, আমিও সেখানে যাব না।

নগেন কি যেন ভাবিল, তারপর বলিল—অচ্ছা আমি রাস্তায় দাঁড়ায়ে থাকব।

নিতাই কি বলিতে যাইতে ছিল, নগেন তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

পথে হরবল্লভের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, হরবল্লভ একখানি যামের ক্ষুদ্র প্রশাখা ভাঙ্গিয়া লইয়া দাত মাজিতে মাজিতে খালি গায়ে নদীর দিকে যাইতে ছিলেন। নিতাই বলিল—দাদাত আমার ওবাড়ী যেতে চায় না!

হরবল্লভ বলিলেন—কেন ?

নগেন সে কথার উত্তর দেওয়া বোধ হয় কোন প্রয়োজন বোধ করিল না, সে সমুখ পানে চাহিয়া দেখিল প্রভাত সূর্য্যের কনককিরণ বৃক্ষশীরে কেমন ঢলিয়া পড়িতেছে! হরবল্লভ বুঝিলেন যে গ্রাম্য সমাজের উৎপীড়ন ভয়, এই সংসার জ্ঞানহীন উদাসীনটির ক্ষুদ্র বুকখানির নির্ম্মল প্রস্ফুট কুসুমটিকে মলিন করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে! তিনি একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বেশ তবে তুই যা, সত্যচরণ বাবুকে বল গিয়ে আমি যাচ্ছি!

নিতাই চলিয়া গেল, হরবল্লভ নদীর দিকে না গিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিলেন, নগেন নদীর দিকে চলিয়া গেল। রতনগঞ্জের দক্ষিণ দিকে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইতে ছিল, তাহার তীরে একটা স্থান পছন্দ করিয়া হরবল্লভ স্কুলঘর তুলিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, জায়গাটা লইয়া তাহার সহিত সত্যচরণের সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া আসিতেছে! ভবিষ্যতে আর কোন গোলমালের সূত্রপাত না হয় এই জন্য হরবল্লভ এইস্থানে স্কুলঘর তুলিতে চান। স্কুল সকলের সমান দরকার, সকলের সমানভাবে স্বার্থ ত্যাগ করা দরকার!

নগেন আসিয়া নদীর ধারে বসিল।

উষার স্নিগ্ধ সমীরণ সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমের পরিমল বহন করিয়া আনিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছিল; শীর্ণকায়া কলনাদিনী ক্ষুদ্র তটিনী তরঙ্গ মন্থর চরণে বহিয়া যাইতেছিল! প্রভাতের ফুল্লকুসুম নিন্দিত আরক্ত কিরণ-চ্ছটা বৃক্ষরাজির শীর্ষদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া তরঙ্গের মাথায় মাথায় সুবর্ণ কিরীট পরাইয়া দিতেছিল! ২।৪টি গ্রাম্য মহিলা কলসীকক্ষে নদীর ধারে আসিয়া জলভরিয়া লইয়া যাইতেছিল।

নগেন একদৃষ্টে নদীর দিকে চাহিয়া ছিল, সেই নদীর প্রতি তরঙ্গের শিরে কি যে দেখিবার মত জিনিষ ছিল তা সেই জানে। এমন সময় একটি বালিকা আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার চক্ষুদুটি টিপিয়া ধরিল, গম্ভীর কণ্ঠে নগেন বলিল—মেরে হাড়গুড়া করে দেব, ছাড় বলচি লীলা! হাসিতে হাসিতে বালিকা তাহার চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! পিতলের কলসীটি দূরে রাখিয়া আসিয়াছিল, নগেন সেই দিকে চাহিয়া বলিল—যা জল নিয়ে বাড়ী য !

বালিকা হাসিয়া বলিল—আজ পেয়ারা দেবে দাদা ?

নগেন সে কথার উত্তরে মুখের ভাব এমনই করিল যে বালিকার প্রাণ উড়িয়া গেল, সে ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বলিল—রাগ করলে দাদা ?

নগেন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; বালিকা সেই কলসীটী লইয়া নদী হইতে এক কলসী জল ভরিয়া আনিয়া আবার দাড়াইল। এমন সময় নদীর ঘাটে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। বালিকা উৎসুক হইয়া নৌকার দিকে চাহিয়া রহিল।

নৌকা ঘাটে লাগিতেই তাহার মধ্য হইতে একটি সুন্দর যুবক বাহির হইল। যুবক ভূপেন, সে রতনগঞ্জ স্কুলের হেডমাষ্টার রূপে নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে।

ভূপেন মাঝিকে বলিয়া দিল ঐ বাবুটির কাছে জিজ্ঞাসা করে আয় ত হরবল্লভ বাবুর বাড়ী কত দূর !

মাঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই লীলা বলিল—দাদা তোমাদের মাষ্টার এসেছে !

নগেন বলিল—কি ?

লীলা বলিল—আজ না তোমাদের মাষ্টার আসবার কথা ?

নগেন বলিল—ঠিক !

লীলা কলসী কাখে তুলিয়া লইয়া বলিল—তুমি এখানে থাক দাদা, আমি বাবাকে পাঠিয়ে দেই গে !

লীলা চলিয়া গেল, ভূপেন নৌকার উপর হইতে নগেনকে দেখিয়া চিন্তা করিতে ছিল, একে যেন সে কোথায় দেখিয়াছি ; কিন্তু কিছুতেই তাহার মনে পড়িতে ছিল না, কোথায় দেখিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে ব্যস্তসমস্ত হইয়া হরবল্লভ আসিয়া বলিলেন—আপনার নাম ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ !

ভূপেন উত্তর করিল—হঁ।! আপনি কি সেক্রেটারী !

হরবল্লভ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিলেন—পথে কষ্ট হয় নাই ত আসতে ! আর আপনার সঙ্গে কি আপনার পরিবার এসেছেন নাকি ?

ভূপেন বলিল—না আমার মা, আর বোন এসেছে !

হরবল্লভ বলিলেন—বেশ চলুন আমার বাড়ীতেই আপনাদের থাকতে হবে কিছুদিন ! স্কুলটা আপনাকে গড়ে তুলতে হবে, মাষ্টার বাবু ! এরপর

আপনার জন্য ভিন্ন বাড়ী করে দেব! আপাততঃ এই অসুবিধাটুকু সহ্য করতে—

ভুপেন বাধা দিয়া বলিল—না না এতে আর অসুবিধা কি? বরং বিদেশে স্ত্রীলোক লইয়া ভদ্রলোকের পরিবারে মধ্যে থাকিবার মত আর সুবিধা কি হইতে পারে!

হরবল্লভ বলিলেন—বেশ বেশ উঠুন, উঠুন অনেকটা সময় নৌকায় বসে আছেন, চলুন বাড়ী গিয়ে হাতমুখ ধোবেন। কোন অসুবিধা হবে না, চলুন।

নৌকার ভিতর হইতে এমন সহৃদয়তার কথা শুনিয়া তরু একবার চাহিয়া দেখিল বক্তার মূর্ত্তিটি কিরূপ, যাহার মধ্যে এমন একটী মহৎপ্রাণ রহিয়া গিয়াছে।

মনসা ভগবানের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, যেন বক্তার মঙ্গল হয়, যে তাহার পুত্রকে এমন ভাবে আশ্রয় দিয়াছে।

দুর হইতে নিতাইকে আসিতে দেখিয়াই চন্দ্রা আসিয়া সত্যচরণকে বলিলেন—শোন ঠাকুরপো, তোমায় একটা কথা বলে রাখি, যে জায়গাটায় ওরা স্কুল তুলতে চায়, ও জায়গাটা কিন্তু কিছুতেই ছাড়া হবে না। জানতঃ কত টাকা জলের মত বেরিয়ে গেছে, শুদ্ধ ঐ এক ফোটা জায়গার জন্য।

সত্যচরণ সাজি হস্তে স্বয়ং ফুল তুলিতে ছিলেন, তিনি বলিলেন—কিন্তু বউদি ও জায়গাটা নিয়ে ত গণ্ডগোলই বেধে আসছে, জানত দাদা ঐ নিয়ে একেবারে জেলে গিয়েছিলেন আর কি? আমার ইচ্ছা ও জায়গাটায় স্কুলই হউক, কাহারও কোন পৃথক দাবী আর রইল না। সবাইর সমান স্বর্ত্ত!

চন্দ্রা কহিলেন—বড় আমাদের দরকার স্কুলের! আমাদের কে গিয়ে ও পাঠশালায় পড়বে, তুমি না আমি? ওসব কথার কাছদিও যেওনা তুমি, ও জায়গা ছাড়া হবেনা।

এই সময় নিতাই আসিয়া সেই বাগানের কাছে দাঁড়াইতেই সত্যচরণ ডাকিলেন—শোন নিতাই, তোর কর্ত্তা কি কাল বাড়ী এসেছেন?

নিতাই বলিল—তিনি আমায় পাঠিয়ে দিলেন, তিনি এখনি আপনার কাছে—

চন্দ্রা ধমক দিয়া বলিলেন—বারণ করে দিস তাকে আসতে। অত চালাকি চলবে না বাছা, এমনি করে ফাঁকি দিয়ে জায়গাটা দখল করবার মতলব হয়েছে বুঝি।

নিতাই সে কাথার উত্তরে ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া সত্যচরণের মুখের দিকে চাহিল। সত্যচরণ বলিলেন—আচ্ছা তাঁকে আসতে বলিস।

চন্দ্রা বলিলেন—তোমায় ছাড়ন্ত শনিতে পেয়েছে ঠাকুর পো, নইলে সেদিন তুমি গোপনে ঐ একঘরেদের বাড়ীতে চলেছিলে আর কি, লোকে জানতে প্যরলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর কি? নিজের ভালমন্দ যে না বোঝে সে কেমন পুরুষ! বারণ করে দিলাম তাকে আসতে, তুমি তাকে আসতে বলে দিচ্ছ! এসে মিষ্টি মুখে ২।৪ কথা বলে ত তোমাকে জল করে দিয়ে যাবে! ও জমি কবে সে দখল করে নিত, কেবল পারেনি এই আমার জন্য!

এমন ভাবে হাত মুখ নাড়িয়া চন্দ্রা কথাগুলি বলিলেন যে সত্যচরণ থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চন্দ্রা বলিলেন—আমি বলচি কিন্তু ঠাকুর পো, ও জমি যদি তুমি ছেড়ে দাও, আমি কিন্তু ছাড়ব না, বলিয়া সে চলিয়া গেল। নিতাই এই উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ততটা ভীত হইয়া পড়িল না; কারণ চন্দ্রার এই মূর্ত্তিই গ্রামবাসীর চক্ষে একান্ত পরিচিত; চন্দ্রা, গ্রামবাসীর কল্পনার দ্রব্য, বাস্তব জগতে তাহারা ভুলেও একদিন তাহার মুখে হাসি দেখে নাই!

সত্যচরণ ফুলের সাজি হাতে ঘরে প্রবেশ করিলেন, নিতাই বারেন্দায় দাঁড়াইয়া রহিল! কিছুক্ষণ পরে সত্যচরণ আসিয়া বলিলেন—একি দাঁড়ায়ে রয়েছিস যে?

নিতাই একটু ভাবিয়া বলিল—আচ্ছা আপনারা কি ওদের এক ঘরে করে রেখেছেন নাকি?

সত্যচরণ বলিলেন—কেন একথা, তুই যে বলছিস নিতাই? ওরা কি তোকে কিছু বলেছে?

নিতাই বলিল—না কর্ত্তা, কথাটা গ্রামে শুনিতেছি বটে, তবে আজ আমি দাদাকে এবাড়ী আসতে বলায় সে আসতে চাহিল না!

সত্যচরণ বলিলেন—কে নগেন?

নিতাই বলিল—হাঁ কর্ত্তা!

সত্য হইলেও কথাটা অপ্রিয়, তাই—সত্যচরণ কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন—সেজন্য নাও হতে পারে, তবে তার বোধ হয় আমাদের উপর রাগ হয়ে থাকবে!

নিতাইর একথাটা ভাল লাগিল না, নগেনের রাগ আছে একথা সে

কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেনা। একসঙ্গে এত রোগীর পাহারা দিয়া, মড়া পোড়াইয়া, সে নগেনকে বেশ চিনিয়া লইয়াছে, বলিল—তাও কি হয় কর্ত্তা, আমার দাদার রাগ, এ হতেই পারে না!

সত্যচরণ মনের আবেগটা চাপাদিতে বলিলেন—পারে নিতাই, পারে! আমরা যে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। বলিয়াই সত্যচরণ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, আভা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার নয়নযুগল ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে?

একটা কথা লুকাইতে গিয়া তিনি কন্যার প্রাণে এতবড় একটা আঘাত দিয়া বসিলেন। তাড়াতাড়ি বলিলেন—কি মা?

আভা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে হরবল্লভ আসিয়া প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বেই চন্দ্রা তাহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, সে জায়গা পাওয়াটা তিনি যত সহজ ভাবিয়াছিলেন, তত সহজ নহে!

হরবল্লভ বলিয়া গেলেন—আমিও ঐ জায়গাই স্কুল ঘর তুলব।

চির অভিমানী চিত্ত তাঁহার একমুহুর্ত্তে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেলেন।

হরবল্লভ চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই গোপীকিশোর আসিয়া বলিলেন—কিহে সত্যচরণ, হরবল্লভদা এমন ভাবে চলে গেল যে, ব্যাপার কি?

চন্দ্রা বিশেষণে সবিশেষ বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—আমিও দেখে নেব, কেমন তিনি স্কুল ঘর তোলেন।

হরবল্লভের বিরুদ্ধে দাড়ানের মত শক্তি বা সাহস গোপীকিশোরের কোন দিনই নাই। এমন কল্পনা তাহার স্বপ্নেও কখনো হয় নাই! চন্দ্রার কথার ঝাঁজে, তাহার একটি নূতন ফন্দি মাথায় খেলিল, সে হরবল্লভের বিপক্ষে দাঁড়াইবে! নূতন উকীল মোক্তার যেরূপ প্রবীণ লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিলের বিপক্ষ পক্ষে দাঁড়াইয়া নিজের নাম জাহির করিবার সুযোগ করিয়া লয়, সেইরূপ গোপীকিশোর হরবল্লভের মত একজন পাকা লোককে সমাজের কাছে অপমানিত করিয়া নিজে সমাজের মোড়ল হইয়া বসিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি ভাবিলেন সমাজের কাছে মাথা নিচু কেনা করিয়া থাকিতে পারে? বিশেষ যখন সত্যচরণের মত একটা লোক তাহার পাছে থাকিয়া যাইবে! তিনি চন্দ্রাকে বলিলেন—তা'হলে—

চন্দ্রা বলিলেন—ওটাকেও সমাজ থেকে দূর করে দাও না! সেদিন ওবাড়ী গিয়ে দেখি, সে একঘরের বাড়ী থেকে বের হয়ে এল!

গোপীকিশোর বলিয়া গেলেন—তবে জেনে রেখ, হরবল্লভ বসু একঘরে হয়েছেন!

সত্যচরণ কি ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া পূজা করিতে বসিলেন।

(২১)

সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে নিতাইকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া আভা ধীরে ধীরে বারেন্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। নিতাই আসিয়া দাঁড়াইতেই ডাকিল—নিতাই দা!

নিতাই বলিল—কিরে দিদি! তুই যে আমার নগেনদারই মত দেখচি, প্রথম আলাপের মধ্যে একেবারে প্রাণধরে টান দিয়ে বসলি?

আভা কাঁপিয়া উঠিল। কোন কথা বলিতে পারিল না!

নিতাই বলিল—বস্ দিদি, কি বলতে ছিলি, বল্!

আভা বলিল—আমিত কিছু বলতে চাইনি দাদা!

নিতাই বলিল—একেবারে ঠিক রে, একেবারে এক রকম। সেও এমনি ধরণে আরম্ভ করে। প্রথম ফস্ করে ডাকদিয়ে ফেলে নিতাইদা। তার-পর চুপ করে তোরই মত দাঁড়াইয়া থাকে, ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠে, কোন কথা বের হয় না! জিজ্ঞাসা কল্লে বলে আমি কিছু বলতে চাইনি দাদা! হারে, দিদি, তুই বলতে পারিস। যখন তুইও তারি মতন এক ভাবের, তখন তুই বলত, তোদের এ নিতাইদা কি গণক যে তোদের মনের কথা বুঝতে পারবে! তোরাত কিছু আর বলবি না, কেবল বলবি নিতাইদা!

আভা হাসিয়া বলিল— হাঁ নিতাইদা, তুমি গণক!

নিতাই—সেই এককথা! কি করে ধরলি, বলত দিদি!

আভা গম্ভীর হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে ভাব চলিয়া গেল, বলিল—বলব!

"বল।"

"তুমি যে বল্লে আমি আর সে ঠিক এক রকম।"

নিতাই বলিল—দিদি আমার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে!

"কেন নিতাইদা?"

রহিল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ধীরে ধীরে ধরণীতে নামিয়া আসিতে ছিল; কাননে কলকণ্ঠ বিহগকুলের কুজন সমীরণে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতে ছিল; কুসুমে কানন পরিপূর্ণ বিকশিত—মৃদুমন্দ সান্ধ্যঅনিল পরিমলভারাকুল, সুখস্পর্শ! পল্লী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য শোভার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আভা একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল, একি সেই নগেন!

নগেন ভিখারীর হাতে টাকা দুইটি দিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নিতাই ফিরিয়া আসিয়া দেখিল আভা তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

আভা তাহার আগমন লক্ষ্য করে নাই, নিতাই ডাকিল—দিদি! আভা চমকিয়া উঠিল। বলিল- দাদা আমার হয়ে তুমি একটা কাজ করবে?

নিতাই বলিল—কি বল না শুনি?

আভা বলিল—তোমার সাথীটিকে ঐ কাপড় খানি ছাড়িয়ে আর এক খানা পরিয়ে দেবে! আর এমনি খালি গায়ে, যেখানে সেখানে বেড়িয়ে বেড়াতে বারণ করে দেবে!

নিতাই বলিল—তোর হয়ে আমি বলে দেখতে পারি, কিন্তু যদি সে না শোনে? আভা উত্তেজিতের মত বলিয়া ফেলিল—জোর করে শোনাইতে হবে!

নিতাই হাসিয়া বলিল—সেকি ভাল, দিদি, সাথী আমার, আমি তাকে জোর করে কথা বলব?

আভা বিস্মিতার মত নিতাইর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, নিতাই বলিল—জোর করে তাকে দিয়ে কোন কাজ করালেত, আমি নিজেই ব্যথা পাব। চখের জল ফেলে তাকে বুঝাতে হবে!

আভা হাঁ করিয়া নিতাইর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, এতবড় কথা নিতাইদা কোথায় শিখিল!

সে নিতাইর হাত ধরিয়া বলিল- নিতাইদা, তোমার একাজ করতেই হবে! নগেনদার কাপড় জামা, আমার কাছে আছে, তোমাকে দিচ্ছি, তুমি রোজ তাকে তাই পরিয়ে দেবে!

নিতাইর নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইল, সে তাহা মুছিয়া ফেলিল না, ধীরে ধীরে গড়াইয়া তাহা আভার হাতের উপর পড়িল, আভা বলিল—চল দাদা, তোমায় সব দিয়ে দিচ্ছি

আভা আসিয়া একটি বাক্স নিতাইয়ের কাছে দিয়া, চাবির তাড়া হইতে খুলিয়া বাক্সের চাবি তাহার হাতে দিতে দিতে বলিল—নিতাইদা, দেখ কিন্তু! নিতাই বাকস মাথায় তুলিয়া লইল।

বিধুমুখী আসিয়া বলিলেন—একি মা?

আভা বলিল—নিতাইদাকে দিয়ে দিচ্ছি!

বিধুমুখী বলিলেন—আবার কোন দিন নিতাইদাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিবি কে জানে!

আভা মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—মা, এত তোমার অভিমান! আমায় ক্ষমা করতেও পাল্লে না!

বিধুমুখী আভাকে কোলে টানিয়া লইলেন, তাহার চক্ষু দুটি ভিজিয়া উঠিল!

[ক্রমশঃ।

পাহাড়ী কম্বল

(লেখক—শ্রীসুরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ বি, এ)

সেবার কলকাতায় খুব গরম, যাঁদের অনায়াসলব্ধ অর্থ তাঁরা সব সপরিবারে শৈলবিহার করিতেছেন; আমাদের মিষ্টার মিত্র কলিকাতার একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার, তিনিও তাঁর নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া এই গরম উপলক্ষে দার্জ্জিলিংএ কিছুদিনের জন্য holiday (ছুটি বা আরাম) ভোগ করিতে আসিয়াছেন। অনেক সন্ধানের পর একটু ফাঁকা জায়গায় একখানি ভাল বাংলা পাইয়া মিত্র দম্পতি সেখানি ভাড়া লইয়াছেন, ইচ্ছা নির্জ্জনে তাঁরা কিছুদিন নববিবাহিত জীবনের সুখ ভোগ করিবেন।

একদিন প্রাতরাশের পর তাঁরা যখন ভ্রমণে বাহির হইতেছেন, তখন এক বৃদ্ধ ভুটিয়া এক গাঁট্‌রী কাপড় নিয়ে বাংলায় ঢুকছে দেখে মেমসাহেব—আমরা মিত্র পত্নীকে মেমসাহেব বলিয়াই এ গল্পে উল্লেখ করিব, কারণ আজকাল শিক্ষিতা মহিলারা, বিশেষতঃ যাঁদের স্বামীরা বড় চাকুরে বা বেশী পয়সা উপায় করেন, ঐ আখ্যানে সম্বোধিত হইতে ইচ্ছা করেন—

জিজ্ঞাসা করলেন গাঁটরীতে কি ? ভুটিয়া বল্লে, মেমসাহেব আছে ত অনেক জিনিষ কিন্তু তার মধ্যে একখানি পাহাড়ী কম্বল আছে, সেইখানি আপনাকে দেবার জন্য আনিয়াছি। কম্বল খানির একটু ইতিহাস আছে, যদি অনুগ্রহ করে শোনেন, সেখানি না নিয়ে পারবেন না। রমণীদের কৌতুহল, পুরুষদের অপেক্ষা অনেক বেশী, সুতরাং মিষ্টার মিত্র ফেরিওয়ালাকে দ্বিপ্রহরের পর আসিতে বলিলেও পাছে সে না আসে এই ভয়ে মেমসাহেব তখনি সেই গল্প শুনতে আবদার করলেন। দুই জনে উপবিষ্ট হইলে ভুটিয়া বলিল, মেমসাহেব আপনি বড় ভাগ্যবতী, আপনারই এ কম্বল রাখা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া কম্বলের ইতিহাস আরম্ভ করিল।

ভুটিয়াদের পল্লীতে মণিরাম নামে একজন খুব ভাল কারিকর ছিল; তার বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসর। তার মত কম্বল বুনতে সে অঞ্চলে কেউ জানত না। মোতিয়া নাম্নী পাড়ার একটী ভুটিয়া যুবতীকে সে বড় ভালবাসতো। যদিও তাদের বয়সের অনেক পার্থক্য ছিল তবুও পিতা মণিরামের পয়সার প্রলোভনে কন্যাকে সেই প্রৌঢ়ের হস্তে সমর্পণ করে। মনিরাম তার স্ত্রীকে বড় যত্ন করিত ও কিসে সে সুখী হইবে ভাবিয়া অকাতরে পয়সা ব্যয় করিত, কিন্তু তবুও তার মন পাইত না!

মাঝে মাঝে পাড়ার একটী ভুটিয়া যুবক তার পত্নীর কাছে আসিত ও গল্পগুজব করিত, সে আসিলে মোতিয়ার আনন্দের সীমা থাকিত না ও সেদিন মণিরামকে সে একটু আদর যত্ন করিত ও ভালবাসার ভাবও দেখাইত। কারিকর বুঝিল এই প্রণয়ীযুগলকে রূপলালসায় সে ছিন্ন করিয়াছে কিন্তু তাদের হৃদয়তন্ত্রী এখনও সমভাবে বাজিতেছে; ঈর্ষায় তার বুক জ্বলিয়া যাইত, কিন্তু নিরুপায়। কিছু দিন পরে এক রাত্রে মণিরাম যখন কম্বল বুনিতেছিল তখন তার শোবার ঘরের দরজা অতি ধীরে খোলার শব্দ পাইল, একটু পরে বাহিরে অস্পষ্ট বাক্যালাপ ও হাসির রব শুনিতে পাইয়া ক্ষিপ্তের মত সে উঠিল, নিকটে একখানি কুকরী ছিল সেখানি তুলিয়া লইল। বাহিরে গিয়া দেখে যে তার পত্নী যুবকের অঙ্কশায়া ও যুবক তার মুখ চুম্বন করিতেছে মণিরাম এ দৃশ্যে আত্মহারা হইয়া পশ্চাৎ হইতে কুকরীর এক আঘাতেই যুবককে হত্যা করিল। মোতিয়া তখন স্বামীর পদ ধারণ করিয়া প্রাণভিক্ষা চাওয়ায় মণিরাম ভীষণ সমস্যায় পড়িল। পত্নীকে সে বড় ভালবাসিত কিন্তু অসতীকে আর কেমন করিয়া সে এক শয্যায় স্থান

দিবে, কেমন করিয়া তাকে আদর করিবে, ভালবাসিবে মনে হওয়ায় সে মমতা ত্যাগ করিয়া মোতিয়াকেও তার প্রণয়ীর পথগামিনী করিল।

দুইটী খুনের পর সে একটা বিকট হাসি হাসিয়া তাদের রক্তে তার কম্বলের পশম রঞ্জিত করিল ও লাস দু'টী গোপন করিয়া একমনে কম্বলের কাজ আরম্ভ করিল। দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সাত দিনে সেই কম্বল সম্পূর্ণ হইল; তখন মণিরাম আমাকে ডাকিয়া কম্বল খানি দিল ও সব কথা বলিল। আমায় অনুরোধ করিল যে এই কম্বল কোন পতিব্রতা রমণী ছাড়া আর কাহাকেও যেন বিক্রয় না করি। রমণী ইহার কাহিনী শুনিয়া আনন্দিত মনে যে দাম দিবেন তাহাই লইয়া সেই অর্থে কোন সতী রমণীর কষ্ট দূর করিতে হইবে। মণিরাম আরও বলিয়াছিল যে যিনি কম্বল খরিদ করিবেন তাঁকে বলো যে তিনি যতদিন স্বামীর প্রতি অচলা প্রেম ও ভক্তি রাখিতে পারিবেন এ কম্বল ততদিন তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন রাখিবে। অনুমাত্র বিশ্বাস বা ভালবাসা হারাইলে কম্বলের রং লাল হইতে থাকিবে ও অস্তমিত রবির ন্যায় তাঁর সুখের দিনও শেষ হইবে। এই বলিয়া কম্বলখানি আমার হাতে দিয়া মণিরাম চলিয়া গেল, তারপর হইতেই সে নিরুদ্দেশ।

মেমসাহেব, আপনার চাকরাণী আমাদের পাড়ায় থাকে, তার কাছে শুনিয়াছি আপনার মত পতিব্রতা রমণী দার্জ্জিলিং এ আসেন নাই, আপনি ও সাহেব এক প্রাণ, তাই মণিরামের হুকুম মত আপনাকে সেই কম্বলখানি দিতে আসিয়াছি, এই বলিয়া কাল রংএর একখানি ভুটিয়া কম্বল বাহির করিল।

মিত্রসাহেব হাসিয়া বলিলেন, বুড়ো তোমার কাহিনী বড় সুন্দর, তবে কম্বলের আমাদের প্রয়োজন নাই, বিশেষতঃ যদি গল্প সত্য হয় তবে এমন সর্ব্বনেশে জিনিষ আমার কিনতেও রাজী নই; তোমার গল্পের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে এই টাকাটী দিচ্ছি, মিঠাই খেও। ফেরীওয়ালা বলিল, হুজুর টাকা আমি চাই না, মেমসাহেব নেব না বল্লেই আমি চলে যাব।

মিত্র পত্নী কম্বলের কাহিনী শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন, ভাবিলেন এ একটী গল্প করিবার ও লোককে দেখাইবার জিনিষ হইবে তাই সেখানি লইবার জন্য তিনি জিদ ধরিলেন ও কতদাম দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ বলিল, দাম আপনি যাহা বিবেচনা করিয়া দিবেন, সব কথা ত আমি বলিয়াছি, সাধারণতঃ, এ জিনিষের দাম আর কত, ১৫৲ টাকা হ'বে তবে সতীত্বের দাম ভেবে ও সেই অর্থে কোন সতীর উপকার হ'বে মনে করে

যা দেবেন তাই নেব। মেমসাহেব বলিলেন "সতীত্ব অমূল্য" ফেরীওয়ালা বলিল তাইত মেমসাহেব দার্জ্জিলিং সহরে এত লোক থাকতে এই কম্বল আপনার নিকট আনিয়াছি, কারণ জানি আপনি সতীত্বের কদর বুঝিবেন। মেমসাহেব স্বামী সম্বন্ধে এই আত্ম প্রশংসায় একটু গর্ব্বানুভব করিলেন ও হ্যাণ্ড ব্যাগ হইতে তিন খানি দশ টাকার নোট বার করে বুড়ার হাতে দিলেন, বুড়া তত সুখী হল'না দেখে আর একখানি নোট তাকে দিলেন, ফেরীওয়ালা সেলাম করে গাঁটরী হ'তে কম্বল খানি নিয়ে মেমসাহেবের হাতে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে গেলে। মেমসাহেবও বেয়ারাকে কম্বলখানি বৈঠকঘরে টানিয়ে রাখতে বলে স্বামীর হাত ধরে বেড়াতে চলে গেলেন।

(২)

মেমসাহেবের বাবা মিষ্টার মল্লিক পুরোদস্তুর সাহেব ছিলেন, তাই মেয়েদেরও ছোটবেলা হ'তে অশ্বারোহণ বিদ্যা শেখাবার ভয়ানক জিদ্ ছিল। আমাদের মিসেস মিত্র সেজন্য একজন ভাল ঘোড়সওয়ার, আর মিত্র সাহেবত ভারতীয় অশ্বসেনানীর অন্যতম মেম্বার। দার্জ্জিলিং এ এসে অবধি মেমসাহেব স্বামীকে দু'টী ঘোড়া কিনতে জেদ করছেন ও আজ সেই ঘোড়া ঠিক করতে বেরিয়েছেন। ঘোড়া ঠিক হ'লে দুজনে ঘোড়ায় চড়ে মলের দিকে যাচ্ছেন এমন সময় মিত্রের মামাত ভাই মিষ্টার বোস ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের দিকে আসছেন, দেখে সাহেব ত Halloo Sudhir (এই যে সুধীর) তুমি কবে এলে বলে চীৎকার করে উঠলেন। তিনজনেই ঘোড়া হ'তে নামলে মিত্র সাহেব পত্নীর সঙ্গে সুধীরের আলাপ করে দিলেন। মিষ্টার বোস বোম্বাই এর সিভিলিয়ান, ছুটী নিয়ে দেশে এসে গরমের জ্বালায় দার্জ্জিলিং এ ছুটেছেন। মিষ্টার বোস (Central Hotel) সেণ্ট্রাল হোটেলে এ আছেন শুনে ব্যারিষ্টার সাহেব তাঁকে নিজ বাংলায় আসতে নিমন্ত্রণ করলেন ও তখনই তাঁর জিনিষ পত্র নিয়ে যেতে হ'বে ঠিক হওয়ায় তিনজনেই হোটেলের দিকে গেলেন। পাঠক পাঠিকা, এইখানে বলে রাখা ভাল যে দার্জ্জিলিং এ ১৫ দিনের নির্জ্জন বাস ও আলাপে স্বামী স্ত্রী দুইজনে মনে মনে আর একজন সঙ্গীর প্রয়াসী হয়ে উঠেছিলেন, তবে কেউ সেটী স্পষ্ট করে বলতে সাহসী হন নাই, তাই আজ মিষ্টার বোসকে উভয়েই বড় আহ্লাদের সহিত আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য ধরিয়া বসিলেন।

দু তিন দিন পর দার্জ্জিলিং এ একটী খুনী মকোদ্দমায় মিষ্টার মিত্র বেশ

উচ্চ ফিতে নিযুক্ত হইলেন ও রোজ সকাল সন্ধ্যায় স্থানীয় বড় বড় উকিলরা মকোদ্দমার কাগজ পত্র লইয়া পরামর্শ করিবার জন্য মিত্র সাহেবের কুঠিতে আসিতেন। স্বামী এই ভাবে ব্যস্ত থাকায় মেমসাহেব মিষ্টার বোসের সঙ্গে অশ্বে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইতেন, দুপুরে মিত্র সাহেব কোর্টে গেলে তাঁহারা দুজনে গল্প, গুজবে সময় কাটাইতেন, বৈকালে তিনজনে বাহির হইতেন আর সন্ধ্যা ২।৩ ঘণ্টা ডিনারের (খাবার) পূর্ব্বে মিষ্টার বোস ও মেমসাহেব ড্রয়িং-রুমে (বৈঠকঘরে) গান বাজনা করিতেন।

জানিনা কেন, এই সব দেখিয়া মিষ্টার মিত্রের মনে কেমন একটি খট্‌কা লাগিতে আরম্ভ হইল ও সুধীরকে বাড়ীতে অতিথি করাটা যেন যুক্তি সঙ্গত হয় নাই বলে মনে হ'তে লাগ্‌লো। একদিন কাছারী যাবার পূর্ব্বে মিত্র সাহেব স্ত্রীর কামরায় ঢুকতেই দেখ্‌লেন তিনি একখান চিঠি লিখছিলেন, সেখানা তাড়াতাড়ি সাম্‌লে ফেল্লেন। তাঁর কাছে স্ত্রীর কার চিঠি গোপন করা সম্ভব মনে হওয়ায় মনে একটু সন্দেহের রেখা পড়লো। পরদিন উকিলদের সকাল সকাল বিদায় দিয়ে হঠাৎ ড্রয়িং-রুম এ সন্ধ্যার পর ঢুক্‌তেই লক্ষ্য করলেন যে তাঁর স্ত্রী ও সুধীর কি একটি মন্ত্রণা করছিলেন, তাঁকে দেখে দুজনেই যেন একটু অপ্রস্তুত হ'লেন ও সরে বস্‌লেন। মিত্রের মনটা ক্রমশই সন্দেহ দোলায় দুলতে লাগ্‌লো, একটু পরেই মেমসাহেব হঠাৎ উঠে চলে গেলেন ও ডিনারের সময় এসে টেবিলের নীচে যেন কি একটি জিনিস সুধীরকে দিলেন, মিত্রসাহেব অনুমান করলেন যে একখান চিঠি চালাচালি হ'ল। পত্নীর এই ব্যবহারে লজ্জায়, ঘৃণায় ও অপমানে ব্যারিষ্টার সাহেব মরমে মরিয়া গেলেন। মিসেস মিত্র ও সুধীর তাকে নানা খোস গল্পে হাসাবার চেষ্টা করলে তিনি মাথা ধরেছে বলে তাঁদের drawig room এ রেখে হঠাৎ শয়নাগারে প্রবেশ করলেন। রাত্রে মিসেস মিত্র স্বামীকে আর জাগান নাই।

পরদিবস শয্যাত্যাগের পর খানা কামরায় আসিয়া বেয়ারার কাছে মিত্রসাহেব শুনিলেন যে অতি প্রত্যুষে মেমসাহেব ও বোস সাহেব চা খাইয়া ঘোড়ায় বাহির হইয়াছেন ও বলিয়াগিয়াছেন যে তাঁদের ফিরতে একটু দেরী হইলে সাহেব যেন তাঁদের জন্য হাজরীতে অপেক্ষা করেন। গতরাত্রে অসুস্থাবস্থায় তিনি শয়নাগারে গেছেন, স্ত্রী একবার রাত্রে খবর নেয় নাই, পরদিবস প্রাতে তিনি কেমন আছেন না জানিয়া, বিশেষতঃ

সেদিন তাঁর জন্মদিন, তাঁর মঙ্গল, দীর্ঘ জীবন, সুখ শান্তির কামনা না জানিয়ে, তাঁর এমন ভা'বে চলে যাওয়ায় ও পূর্ব্বের ২।৩ দিনের সেই লুকোচুরি ব্যাপার সব স্মরণ করে মিষ্টার মিত্র পত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইলেন, যতই ভাবিতে লাগিলেন, সন্দেহ তত ঘনীভূত হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। ভাবিলেন তাঁর এই পত্নীই না ১৫।২০ দিন আগে সতীত্বের গরব করিয়া অলীক গল্প মূলক সেই পাহাড়ী কম্বল খরিদ করিয়াছিলেন। ভাবিতে ভাবিতেই তাঁর দৃষ্টি ড্রয়িং-রুম এ সেই কম্বলের উপর পড়িল, প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ পড়ায় কম্বলের রং বেশ একটু ঘোর লাল দেখাইতেছিল, মিষ্টার মিত্র গল্পের শেষ অংশের কথা স্মরণ করিয়া উন্মাদের ন্যায় হইলেন ও বলিতে লাগিলেন আর প্রমাণের আবশ্যক নাই, চরিত্রহীনা রমণীর ক্রীত কম্বলই জলন্তবর্ণে তার চরিত্রহীনতার পরিচয় দিতেছ, আর না, সেই ভুটিয়া কারিকরের মত আজ দুশ্চরিত্রার জীবনলীলা শেষ করিয়া এই কম্বলে জড়াইয়া তাকে পোড়াইব; এই বলিয়া মিত্রসাহেব নিজ আলমারী হইতে রিভলভার বাহির করিলেন। রিভলভারটী কালকাতা হইতে আসিবার সময় নিজ ও পত্নীর প্রাণরক্ষার জন্ম খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন, আজ তাহাদ্বারাই স্ত্রীর প্রাণহরণ করা সংকল্প করিলেন। রিভলভার হাতে স্ত্রীকে তার দুশ্চরিত্রতার কথা কি ভাবে বর্ণনা করিয়া হত্যা করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, আবার মনে হইল বেশী কথা বলিতে গেলে মায়াবিনী তার দোষ স্খালনের প্রয়াসে অনেক মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়া হয়ত তাঁহার দয়ার উদ্রেক করিবে, অতএব কোন কথা না বলাই ভাল, কিন্তু প্রতি হংসাটা সম্পূর্ণ ভাবে নিতে গেলে কিছু না বল্লে হ'বেনা তাও মনে হ'ল। এইরূপে রিভলভার হস্তে যখন তিনি একটী লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের নীরব অভিনয় করিতেছিলেম তখন তাঁর বেয়ারা একখান কার্ড হস্তে ঘরে প্রবেশ করিয়াই এই ব্যাপার দৃষ্টে স্তম্ভিত হইল আর মিত্র সাহেবও বেয়ারাকে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইলেন ও কার্ডখানি হাতে লইয়া নাম পড়িবার পূর্ব্বেই "ওহে যামিনী, আমি আর তোমার ডাকবার অপেক্ষা না করিয়াই ঘরে ঢুকিলাম" এই বলিয়া মিত্রের বাল্য বন্ধু ব্যারিষ্টার বটব্যাল দেখা দিলেন। মিত্র সাহেব ক্ষিপ্রহস্তে রিভলভারটী দেরাজে পুরিলেন। 'বলি, ব্যাপার কি ভায়া, রিভলভার হাতে কি করছিলে?' আরে না, না, ও কিছু না দেখছিলুম Rust (মরচে) পড়েছে কিনা, চল চল drawing room এ যাই, তুমি কবে এলেহে আর ভাই, "কাল মেলে এসেছি,

এসেই তোমার বাসার সন্ধান করতে যা বিলম্ব হয়েছে, কই মিসেস মিত্র কোথায় ?

মিসেস মিত্রের নামেই আবার মিত্র সাহেবের মুখখানি কালিমা মাখা হইল. তিনি বলিলেন যে তাঁর স্ত্রী তার মামাত ভাই সুধীরের সঙ্গে বেড়াতে গিয়াছে। ডয়িংরুমে এ এসে বটব্যাল বল্লেন, 'ওহে তোমায় এমন রোগা দেখাচ্ছে কেন, অথচ শুনলুম এখানে বসেও বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন ক'চ্ছ, বলি ব্যাপার কি ?" "ভাই শরীরটা ভাল নাই সেজন্য মনটাও ভাল নাই" বলে মিত্র সাহেব নিজ স্ফুর্ত্তিশূন্যতার কৈফিয়ত দিলেন।

দুএকটী কথার পরই ঘরে সেই লালরংএর rag (কম্বল) খানা দেখে বটব্যাল সাহেব বলে উঠলেন "ওহে সেই বুড়ো ভুটিয়া ফেরিওয়ালাটি দেখ'ছ তোমাকেও ঠকয়েছে, মিসেস মিত্র বোধ হয় ভুটিয়া কা'রুকরের দুঃখ কাহিনী শুনে তার স্ত্রীর ও প্রণয়ীর রক্তরঞ্জিত কম্বল খানি বেশ একটু উচ্চ মুল্যে, এই ৩০।৪০ টাকায় খরিদ করিয়াছেন ?" মিত্র সাহেব ত একেবারে অবাক, "বল্লেন তুমি কি করে এসব জানলে ?" বটব্যাল সাহেব উত্তরে বল্লেন "আরে ওবেটা দার্জ্জিলিংএ নূতন বাঙ্গালী সাহেব মেম এলেই একখান কম্বল ঐ গল্পের জোরে মেমসাহেবকে উচ্চ মুল্যে বিক্রয় করে যায়, তুমি শুধু ঠক নাই, অনেকেই ঠকেছে, আমার তিনি বুঝি ৩৫৲ টাকায় একখান কিনেছেন, তোমার উনি কত দিয়াছেন ! সাধারণতঃ এ জিনিষের দাম ৭।৮৲ টাকা।" বটব্যালের কথা শুনিয়া মিত্র মনে মনে ভাবিল যে যদি এই প্রহেলিকার মত তাঁর অপর সন্দেহের কারণ গুলি কাটিয়া যায় ত তিনি কত সুখী হইবেন। এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই মিসেস মিত্র ও বোস সাহেব "কেমন মজার জিনিষ এনেছি, বেরিয়ে এসে দেখ, বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন কিন্তু সম্মুখে একজন অপরিচিত লোক দেখে মিসেস মিত্র একটু থমকে দাঁড়ালেন। মিষ্টার মিত্র কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় তাদের পরস্পরকে পরিচিত করে দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখেন যে একটী সুন্দর ভুটিয়া পনি লইয়া একটী পাহাড়ী বালক দাঁড়াইয়া আছে। মিসেস মিত্র স্বামীকে সম্বোধন করে বল্লেন "যে আজ তোমার জন্মদিন তোমায় কি উপহার দেব, আজ ৭৮ দিন ধরে ভেবে শেষ আমি ও ঠাকুরপো গোপনে পরামর্শ আরম্ভ করলুম, ঘোড়াটা বেড়াতে গিয়ে এক দিন দেখে আমার বড় পছন্দ হয়, ঘোড়াটার দাম ঠিক করবার জন্য সেদিন যখন আমি তোমার বন্ধু সরকার

সাহেবকে চিঠি লিখছিলুম তুমি হঠাৎ ঘরে এসে পড়ায় চিঠিটা সাম্‌লাতে হ'ল, তারপর কালরাত্রে আমরা দুজনে ভোরে উঠে ঘোড়াটা আন্‌তে যাব এই পরামর্শ যখন ঠিক করতে যাচ্ছিলুম, তুমি হঠাৎ এসে আমাদের সেই পরামর্শে বাধা দিলে, তাই আমি ঘরে উঠে গিয়ে পত্রে সব বন্দোবস্তের কথা লিখে খাবার সময় ডিনার টেবিলের নীচে ঠাকুরপোর হাতে পত্র খানা দিই, তখন জানলুম না যে তুমি আমাদের ২ জনকে একলা ফেলে ডিনারের পরই শুতে যাবে তা হলে ও কষ্টটা আমায় করতে হ'ত না। তোমায় একেবারে চম্‌কে দেব বলেই গোপনে আমরা এ বিষয়টা ঠিক করছিলুম। এখন বল, ঘোড়াটা তোমার পছন্দ হয়েছে কি না ?"

সকলে সমস্বরে ঘোড়ার প্রশংসা করিলেন ; মিত্র তখন কি সামান্য ব্যাপার লইয়া পত্নীর চরিত্রের উপর সন্দিহান হইয়া ছিলেন ভাবিয়া একেবারে বেজায় অনুশোচনায় মরিয়া গেলেন। বন্ধু বটব্যাল আসিয়া না পড়িলে ও কম্বলের প্রকৃত ইতিহাস না শুনিলে হয়ত পত্নীর মুখে এত কথা শুনিবার পূর্ব্বেই যে কার্য্য করিয়া ফেলিতেন তার জন্য সমস্ত জীবন ব্যাপী অনুতাপ করিলেও কখনও শান্তি পাইতেন না, মনে হওয়ায় শিহরিয়া উঠিলেন ; কিন্তু তাঁর বন্ধু, ভাই, পত্নী সম্মুখে তিনি এ সময় নিরুত্তর থাকিলে বা সময়োপযোগী স্ফূর্ত্তি না দেখাইলে তাঁরা কোনরূপ সন্দেহ করেন ভাবিয়া হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে পত্নীকে কাছে টানিয়া তার এই উপহারের জন্য আবেগ ভরে চুম্বন করিলেন। বোস ও বটব্যাল তাঁর এই অসম সাহসিকতার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, তাই বোস বলিয়া উঠিল, দাদা আমি ও মিষ্টার বটব্যাল এখানে আছি, বোধ হয় আনন্দে তুমি সেটা ভুলে গেছ, তাই একটা সাড়া দিচ্ছিলুম, বলিয়া সুধীর উচ্চহাস্য করিল। ও তাই নাকি, বলিয়া মিত্র সাহেব তাঁর পত্নীর লজ্জারক্তিম ওষ্ঠে ও কপোলে আর দুইটী উষ্ণ চুম্বন দিয়া সে নির্লজ্জতার পরিচয় আর একটু বিশেষ করিয়া দিলেন।

একাল সেকাল

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১০)

যে আশা ও আকাঙ্ক্ষাটুকু লইয়া নির্ম্মল বাড়ী আসিয়া ছিল, এতক্ষণেও বিমলার দেখা না পাইয়া তাহার সব টুকুই যেন উপেক্ষার মুখে তলাইয়া গেল। নির্ম্মলের সবিকার মন থাকিয়া থাকিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। শোভার সাগ্রহ নিমন্ত্রণ, একান্ত কাতর প্রার্থনা, নিজের উপেক্ষা, সংবাদ মাত্র না দিয়া চোরের মত বাড়ীতে আসা, ঘটনাগুলি যেন পরস্পর বিরোধী ভাবের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া তাহার আলোড়িত দেহমন মথিত করিতেছে। শোভার কোমল কচিমুখের সেই কাতর চাহনি যেন হৃদয়ের পরে পরে উঁকি দিতেছিল। তাহারই দুঃখের অভিমানের শঙ্কায় উদ্বেগে নির্ম্মল খোলা দরজার বাহিরের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। চাঁদ উঠিতে উঠিতে প্রায় আকাশের মধ্যস্থানে গিয়া দাঁড়াইল, জানালা গলাইয়া পরিণত জ্যোৎস্নার দীপ্ত কর মুখের উপর গিয়া পড়িতেছিল, নৈশ মন্দ বায়ু মৃদুমন্দ ভাবে নির্ম্মলের কেশগন্ধ বহিয়া লইয়া ঘরময় ছড়াইতে ছিল। দেখিতে দেখিতে সামনের টেবিলের টাইমপিসটায় ১১টা বাজিয়া গেল। বিমলার দেখা নাই, নদীবক্ষ তরঙ্গের উপর তরঙ্গের আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। বুভুক্ষিত নির্ম্মল উপেক্ষায় নিরাশায় ফুলিয়া ফুলিয়া সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর মনোমাতান সৌন্দর্য্যের দিকে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল, তপ্ত বারিবিন্দুও যদি তৃষিত হৃদয়ের জন্য ছুটিত ত জ্বালা হইত না। সহসা মন কেমন উতলা হইয়া উঠিল। শোভা কি সত্যসত্যই ভ্রাতা সতীশের ব্যবহারের দোষ কাটাইবার জন্য নির্ম্মলকে ডাকিতে আসিয়া ছিল। অসম্ভব, এমনই একটা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাহার মনে জাগিবে কেন? সতীশ তাহার ভাই, সে ন্যায় অন্যায় যাহাই করুক, তাহারই জন্যে নাকি শোভা ভগিনী হইয়াও নির্ম্মলের নিকট এমনি ছুটিয়া আসিতে পারে, তবে মৌখিক ভদ্রতামাত্র, সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে নির্ম্মল বলিয়া

উঠিল "কেন তেমন ভদ্রতার ত কোন প্রয়োজন ছিল না!" কি যে তাহা নির্ম্মলও ভাবিয়া পাইল না, অস্ফুটস্বরেই বলিল—"না না, মুখ দেখেত তেমন মনে হয় নি, সে যে কাতর হয়েই এসেছিল, তার চোখমুখইত সে সাক্ষ্য দিয়েছে।" এমনই কত দিন ত শোভা নির্ম্মলের জন্য কত আকুল আগ্রহ দেখাইয়াছে, নির্ম্মলের একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে তাহার মুখ বিবর্ণ কালি হইয়া পড়িয়াছে। নির্ম্মল ভাবিয়া পাইল না, কেন তাহার এ ব্যাকুলতা, একটা খোচা খাইয়া যেন সে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল, তীরের মত তাহার বুকের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ শর গিয়া ফুটিল। শোভা তাহাকে ভাল বাসে। নির্ম্মল উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "সে যে হতেই পারে না, শোভা কেন আমায় ভাল বাস্‌তে যাবে, অবিবাহিতা যুবতী বিবাহিত যুবককে ত ভাল বাস্‌তে পারে না, সে যে বিধিবিরুদ্ধ।"

হায়! নির্ম্মল বুঝিল না, ভালবাসা স্থানাস্থান পাত্রাপাত্র বিচার করিতে জানে না, যুবক যুবতী বৈধ অবৈধ চিন্তা, এত বিধিনিষেধের ধার সে ধারে না, অনাবিল আবিল, বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ যাহাই হউক, স্রোতের বেগে সে চলে, সুস্থান কুস্থান বিবেচনা করে না, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ তাহার দৃষ্টির নিকট হইতে সরিয়া যায়, কাচকাঞ্চন বিচার থাকে না, আত্মার অবাধ গতি মনের অজ্ঞাতে পৃথিবীর আড়ালে রাখিয়া জীবনের সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য ভাসাইয়া দিয়া অবাধ গতিতে গিয়া অন্য হৃদয়ে নীজের স্থান করিয়া লইতে চাহে।

আকাশের কোণে একটা পেচক ডাকিয়া যাইতেছিল। শব্দে নির্ম্মল শিহরিয়া উঠিল। অস্ফুট বেদনার শব্দ করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—"কাজটি আমার মোটেও ভাল হয় নি, এ ভাবে তাকে না বলে আসা।"

প্রকোষ্ঠে মৃদু পদধ্বনি শোনা গেল, সন্তপ্ত নির্ম্মল দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিল, বিমলা দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে! মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া সমস্ত শক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইতেই বিমলা ঢিপ্ করিয়া পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিল। কম্পিত হস্তে নির্ম্মল তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল— "এতক্ষণে আমার কথা মনে পড়ল?

বিমলা জবাব দিতে পারিল না, নির্ম্মলের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের প্রলাপগুলির তীক্ষ্ণ শেল যেন এখনও তাহার বুকের উপর হুল ফুটাইতেছিল। ধীরে ধীরে

নির্ম্মল বসিয়া পড়িয়া বিমলাকে কাছে টানিয়া লইয়া নিজের অজ্ঞাতেই যেন বলিয়া বসিল—"তুমি কি তাদের মত হতে পার না ?"

জোর করিয়া বিমলা স্বামীর হাত ধরিল, আকণ্ঠ শুষ্ক, কোন রকমে জিজ্ঞাসা করিল—"কাদের মত ?"

লজ্জায় কুণ্ঠায় নির্ম্মলের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বিমলা ব্যাকুলকণ্ঠে আবারও বলিয়া উঠিল—"বল কার মত হলে তুমি সুখী হও, আমি তারি মত হব।"

অপ্রতিভ নির্ম্মলের বুকের উপর যেন কে লগুড়ের আঘাত করিতেছিল, ধীরে ধীরে পত্নীর ঘোমটা খুলিয়া সে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ছলছল নেত্র ঘুরাইয়া নির্ম্মলা আর্ত্তকণ্ঠে বলিল—"তুমি যেমনটি হ'তে বল্‌বে, ঠিক তেমনটি হওয়াই যে আমার দরকার, ওতে ত পারা না পারা নেই, কোন বাধাবিঘ্নও আমি মান্‌ব না, দুদিনে না পারি দশদিনেও যে আমায় তেমনটি হ'তেই হবে!"

অবাক হইয়া নির্ম্মল বিমলার মুখের দিকেই তাকাইয়া রহিল, অন্ধকার ও আলো মিশিয়া যেন তাহার চোখের গোড়ায় নাচিতেছে। বিমলা কাতর কণ্ঠেই বলিল—"চেষ্টার আমি ত্রুটি কর্‌ব না, নাই পারিত, তুমি আমায় শিখিয়ে দিও।"

তবু নির্ম্মল কথা বলিতে পারে না, একটা অবরুদ্ধ দৌর্ব্বল্য যেন তাহার স্নায়ুশিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া কথা বলিবার শক্তি হইতে তাহাকে দূরে রাখিতেছিল। বিমলা পাশের চেয়ারে বসিল, মৃদুকণ্ঠেই বলিল—"শুধু ত আমার নয়, তুমি যে বাড়ী শুদ্ধ সবারি প্রাণ, তুমি যাতে খুসী থাক, তা যে কর্‌তেই হবে, নৈলে বাপমা কেউও ত বাচ্‌বে না।"

নির্ম্মল আর পারিল না, ডান হাতে বিমলার হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া জোর করিয়া রুদ্ধ স্বর বাহির করিল। বলিল—"বড় অন্যায় করেছি, না বিমল ?"

"অন্যায়, অন্যায় আমি কি করে বল্‌ব, তবে মা যে বড় কষ্ট পেয়েছেন, সে কথা ঠিক।"

"মা বড় কষ্ট পেয়েছেন, আর তুমি ?"

বিমলা জবাব করিল না, তাহার মুখ যেন আপন হইতে বুজিয়া আসিতেছিল, নির্ম্মল উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কোন কষ্ট হয় নি কেমন ?"

"কষ্ট হয়নি"! বিমলা ভাবিয়া পাইল না, ইহা অপেক্ষা ক্লেশ স্ত্রীজাতির আর কিসে হইতে পারে। ধীরে অস্ফুট স্বরে এবার সে উত্তর করিল— "তুমি ত সুখে ছিলে, তোমার সুখেইত সুখ।"

"তাই কি ?" বলিয়া নির্ম্মল বিমলার হাত আরও জোরে ধরিল, বিমলা দৃঢ় কণ্ঠেই বলিল—"তা নয় ত কি, স্ত্রীলোকের সুখ সৌভাগ্য যে স্বামীর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে, ওর যেন ছাড়াছাড়ি হতেই নেই, কেউ যদি জোর করে ছাড়িয়ে নিতেই যায় ত সে যে মস্ত ভুল হবে। দেহমনের বিচ্ছেদের ন্যায় বিষম স্থানে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে।"

"তা হলে আমি না আস্‌লেও তোমার কোন কষ্ট ছিল না ?"

"কষ্ট ছিল না !" বলিয়া বিমলা থামিল, ক্ষণিক চিন্তার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ম্লান মুখে বলিল—"তুমি যে সেখানে সুখেই ছিলে এমন কথাও আমি বিশ্বাস করি না।"

"ঠিক কথা।" বলিয়া নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইল, বিমলাকে টানিয়া বুকে আনিয়া আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"এইবার ঠিক ধরেছ, আমিও সুখে ছিলাম না, সুখের জন্য ঘুরে ঘুরে পথ না পেয়ে যে শ্রান্ত হয়েই পড়েছি। মরুভূমিতে গিয়ে জলের জন্যে কেবলই ছুটেছি, জলত পাইনি, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে গেছে। আশায় হতাশ হয়ে গ্রীষ্মের তাপে আমার ভেতর বাহির শুকিয়ে গিয়েছে। আরত ছুট্‌তেও পারি না বিমল, বল তুমি আমার এই তৃষাতুর কণ্ঠে একবিন্দু জলও দিতে পারবে।"

"তাদের মত" কথাটা এখনও যেন বিমলার কাণের গোড়ায় একটা দুঃসংবাদ ঘোষণা করিতেছিল। এবার সে মনে মনে বলিল—"কি যে তুমি চাও, তাত আজও আমি ঠাহর কর্ত্তে পারিনি, কিসের লোভে পিছু ধাওয়া করে চলেছ, সে বোঝ্‌বার শক্তিও যদি আমার থকৃত ত প্রাণ ধরেও কি তাই আমি সইতে পার্‌তাম, না পারে কোন স্ত্রী, স্বামীর এমনই ছুটাছুটি সহ্য কর্ত্তে। আমি অবোধ, অত যে বুঝি না, আমার এই বুকভরা প্রীতি, মন পোড়া আকুল বাসনা, একি তোমার কোন কাজে আসবে না।"

টানিয়া বিমলাকে শয্যায় আনিয়া নির্ম্মল ক্ষীণ স্বরে বলিল—"বল বিমল; একবারটি বল, পার্‌বে, আমি বিদেশে যেতে তুমি বড় কাতর হয়েছিল ? আমি মা বাপ জানি না, তোমার চিন্তায়ই যে আমায় সোয়াস্তি দেয় নি।"

বিমলা কথা বলিল না, ধীরে স্বামীর মাথাটি কোলে লইয়া নিঃশব্দে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। সহসা খোলা দরজার দিকে দৃষ্টি পড়ায় তাড়াতাড়ি সে দোর বন্ধ করিতে উঠিয়া গেল। ধপ্ করিয়া নির্ম্মলের মাথাটা শয্যার উপর পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের কোণে একটা কাক কর্কশ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে নির্ম্মলের বুকের একটী তপ্ত শ্বাস নৈশ বায়ুতে মিশাইয়া গেল।

(২১)

পাঁচটা বাজিতে বিমলা উঠিয়া বসিল, ক্ষুদ্র শ্বাস ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের ভার হাল্কা করিয়া লইয়া স্বামীর পায়ে মাথা রাখিল। নির্ম্মল চোখ মেলিয়া চাহিয়া বলিল—"এখুনি যাচ্ছ, ভোর হতে ত অনেক বাকী।"

"বাবা যে চান্ করে এলেন, হয়ত এখুনি আমায় ডাক্‌বেন।" বলিয়া বিমলা চৌকী হইতে নামিল। নির্ম্মল বলিল—"যাবে যাও, আমি কিন্তু একটা বদ অভ্যাস করে ফেলেছি বিমল, সকালে চা না খেয়ে পারি না, ঐ ষ্টোভটা রয়েছে, একটু জল যদি গরম করে দাও?"

কথাটা শুনিতে শুনিতে বিমলা বাহির হইয়া গেল। পরে সে যখন লজ্জাজড়িত শঙ্কিত হৃদয়ে গৃহে প্রবেশ করিল, নির্ম্মল তখনও ঘুমাইতেছিল, মাথার গোড়ার জানালা গলাইয়া রোদ আসিয়া মুখে পড়িয়াছে; তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিতে যাইতেই সে শব্দে নির্ম্মল জাগিয়া উঠিল। চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল—"কে! বিমল?"

অস্ফুট স্বরে "হাঁ" বলিয়া বিমলা এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিল। নির্ম্মল বলিল—"ষ্টোভটা নাবিয়ে নাওত।"

"এমন করে চেচিও না যেন, সবাই যে শুনে ফেল্‌বে।" বলিয়া বিমলা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

"শোনে ত শুন্‌বেই, এখন ষ্টোভটাত নামিয়ে ন্যাও।"

বিমলা বড় বিপদে পড়িল, ষ্টোভ তাহার জীবনে দেখে নাই, নামাইয়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। নির্ম্মল উঠিয়া বসিল, বলিল—"ও কি কচ্ছ, নাওনা সাজিয়ে।"

এখানকার জিনিষ ওখানে ওখানকার জিনিষ সেখানে এমনই ভাবে বিমলা

জিনিষগুলি ওলট পালট করিতেছিল, নির্ম্মলের মনে যেন একটা ধিক্কার জাগিয়া উঠিল, সে অতিষ্ঠ কণ্ঠে বলিল—"এও জান না ?"

"কেমন করে জানব ?" বলিয়া বিমলা এতটুকু হইয়া লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিল। এই অক্ষমতা পাড়াগাঁয়ের প্রকৃতির উপর নির্ম্মলের অশ্রদ্ধাটা পাহাড় প্রমাণ করিয়া দিল। নির্ম্মল বলিল—"এসব জানোয়ার নিয়ে ঘর সংসার চলে !"

বিমলা মাথা নীচু করিয়া নিজের অক্ষমতার অনুতাপে জড়সড় হইয়া উঠিল, একটা গ্লানি যেন বিছার মত তাহার অস্থিমজ্জায় দংশন করিতেছিল, নির্ম্মল চৌকী হইতে লাফাইয়া নীচে নামিল, বলিল—"ঠিক হয়ে বস ত, দেখিয়ে দিচ্ছি, শিখে নাও।"

"এখন থাকুক না, দিনের বেলা, কেউ হয়ত দেখে ফেল্‌বে।" বলিয়া বিমলা একহাত সরিয়া বসিল, নির্ম্মল কর্কশকণ্ঠে বলিল—"রাত্তিরে চা খেয়েও ত আমার চল্‌বে না।"

"আমি নয় রান্না ঘর থেকেই করে দিচ্ছি।" নির্ম্মল বিস্মিত চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিল, বিমলা কাঁপিয়া উঠিল। গাঢ় কণ্ঠে নির্ম্মল বলিল—"বাড়াবড়িও তোমার কম নয় বিমল ! জুজু হয়ে দিন রাত থাক্‌তে হলে একাই থাক্‌তে হবে, এতটা সহ্য করে আর যেই পারুক, আমি পার্‌ব না।"

"তাই শিখিয়ে দাও ?" বলিয়া বিমলা ষ্টোভটা টানিয়া সম্মুখে লইল, নির্ম্মল গা ঘেসিয়া বসিতেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, নির্ম্মল বলিল—"আবার ?"

"জান্‌লাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছি।" বলিয়া সে সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দিতে মুহূর্ত্তে ঘরখানা অন্ধকার হইয়া গেল। নির্ম্মল রুক্ষস্বরে বলিল—"থাক, আর কাজ নেই এতে, যাও বেরিয়ে ?"

নূতন করিয়া কি হইল বুঝিতে না পারিয়া বিমলা বোকার মত চাহিয়া রহিল, নির্ম্মল উত্তেজিত কণ্ঠেই বলিল—"দিনের বেলা আলো জ্বেলে কাজ কর্ত্তে হবে, এত জ্বালাও মানুষে সইতে পারে।"

"নয়ত পাশের জানালাটা খুলে দিচ্ছি।" বলিয়া বিমলা আবার গিয়া জানালা খুলিল, ধীরে ধীরে ষ্টোভটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, নির্ম্মল বলিল—"ঐই ধরিয়ে দিলুম, এইবার জল চড়িয়ে দাও ?"

জলের কেটলী চাপাইয়া বিমলা তাহাতে চা ঢালিয়া দিল। নির্ম্মল

আর পারিল না, কেতলীটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পীড়িত প্রতিকারপরাঙ্মুখ হৃদয়ে বিমলা গৃহ হইতে বাহির হইতেই করুণাময়ী ডাকিয়া বলিলেন—"বৌমা, যাওত নির্ম্মলকে এই জল খাবারের থালাখানা দিয়ে এস।"

বুক ফাটিয়া যে কান্নাটা আসিতেছিল, তাহা আর বাধ মানিল না, এমনই অক্ষম সে যে, স্বামীর পায়ের তলায় স্থান করিয়া লইতে গিয়া একটা তরঙ্গের আঘাতে ছিটকাইয়া এবার যে তাহাকে কত দূরে গিয়া পড়িতে হইয়াছে, তাহা নিজেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। করুণাময়ী বলিলেন—"যাওনা দাঁড়িয়ে রৈলে যে, সকালে কিছু না খেলে যে তার বড্ড কষ্ট হবে।"

কষ্টের ভবিষ্যৎ ছবি একটা কথার আঘাতে বিমলার বুকটাকে দৃঢ় আঘাত করিল, চা'ত হইল না, নির্ব্বুদ্ধিতার তাড়নে প্রাত্যহিক জল খাবার খাইবার আশা হইতেও বঞ্চিত হইতে হইল, সুখ ডাকিতে গিয়া দুঃখকে এমনি ভাবে বাড়াইয়া দিবার অধিকার বিমলার কি আছে? মনে মনে বলিতে লাগিল—"তাড়া করেই যদি যাইত সে কি করে ঘরে থাক্‌বে। দোষত আমার, তাও দোষগুলো চাপা দিয়ে সুখে থাক্‌তে তার চেষ্টার ত্রুটি নেই, আমি যে সবটাতেই অক্ষম। বনের পাখীও শেখালে শিখ্‌তে পারে, আমাতে তেমন বুদ্ধিটুকুও নেই?"

করুণাময়ী আর অপেক্ষা করিতে পারেন না, নিজেই থালা হাতে করিয়া পা বড়াইলেন। বিমলা ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, ক্ষুদ্র হৃদয়ের সর্ব্বস্ব হাল্কা করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল। মৃদু কণ্ঠে বলিল—"কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ মা?"

"কার জন্যে কেন, নির্ম্মল—।"

"ঘরেত নেই।"

"ঘরে নেই, এই সকালেই বেরিয়ে গেছে, কেন বারণ কর্ত্তে পার্লে না।"

বারণ করিবে? সে নিজেই যে তাড়াইয়া আসিয়াছে। বুকের জ্বালা চোখ বাহিয়া গলিয়া পড়িতেছিল, শীঘ্রহস্তে কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া সে অন্যত্র যাইবার জন্য পা বাড়াইতেছিল, করুণাময়ী খিন্ন স্বরে বলিলেন—"অমন

করে উদাসীন হয়ে থাকলে ত তাকে আমি ধরে রাখতেও পারব না, এ তোমারও কম দোষ নয়, কেন লজ্জাই কি পেট ভরিয়ে দেবে নাকি? বাছার কথামত কাজ করবে সে পারবেই না, ক্ষুধা পেলে খেতে দেবে সেটুকুও তোমাদ্বারা হবে না।"

"তাইত!" বলিয়া বিমলা দরবিগলিত নেত্রে ছুটিয়া পলাইল, মনে মনে বলিল—"আমি না থাকি তাতে ক্ষতি ত নেইই—বরং লাভ!"

(২২)

পাঁচ সাত দিন কোন প্রকারে কাটাইয়া নির্ম্মল একেবারে হাঁপাইয়া উঠিল, অভাবঅভিযোগগুলি যেন তাহার পাঁজরে পাঁজরে ঘা মারিতেছিল। বিমলার শুষ্ক চেষ্টাত তাহার তপ্ত হৃদয়ের তৃষা মিটাইতে পারে না, মেঘের বৃথা আড়ম্বর ত তাপদগ্ধ মাঠ আর্দ্র হয় না, সূর্য্যের উত্তাপে দ্বিধাবিভক্ত ভূখণ্ডকে জোড়া দিতে হইলে যে নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণের দরকার, এ যে বিন্দুমাত্র জল শূন্য গর্জ্জন, আশা দিয়া দ্বিগুণ পীড়ন করার চেষ্টা। নির্ম্মল ট্রাঙ্ক সাজাইতে লাগিয়া গেল। সদানন্দ ডাকিয়া বলিলেন—"বিষয় কাজ দেখে আমি আর পেরে উঠিনি নির্ম্মল, সব বুঝে সুঝে নাও, তোমারই এখন থেকে দেখতে হবে।"

"সে কি করে হবে।" বলিয়া নির্ম্মল পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

"যেমন ক'রে হ'ক হতেই যখন হবে, তখন বাদ বিচারে লাভ।" বলিয়া সদানন্দ খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"অভাব যখন প্রশ্রয় পেলেই মাথা তুলে দাঁড়ায়, তখন ত তাকে আস্কারা দেওয়া ঠিক হবে না। আমার বাপের কিছু সম্পত্তি রয়েছে, দেখে শুনে খেতে পাল্লে এতেই একরকম দিন কাটতে পারে। এ ছেড়ে বিদেশে বিভূয়ে পড়ে থেকে'ত কোন লাভ নেই, আর তাতে কিছু শান্তিও হবে না।"

"আমি যে ডিস্‌পেন্‌সারি খুলেছি।"

"সে নয়ত এখন বন্ধই থাক্।"

"অতগুলো টাকা খরচ করেছি।"

"সে কথা বল্লে ত চল্‌ছে না বাছা, গেছে টাকা যাক্, তার জন্যে কিছু

আমি তোমায় এমনি বাড়ী ছেড়ে যেতে দিতে পারি না।" বলিয়া করুণাময়ী আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইলেন,

বিরক্তিতে অধৈর্য্যে লজ্জায় দুঃখে নির্ম্মলের মুখ কালি হইয়া গেল, উত্তেজিত স্বরেই উত্তর করিল "পাড়াগায়ে এমনি হবুজবু হয়ে থাকা কোন কালেই আমি বরদাস্ত কর্ত্তে পারি না, তা ছাড়া এই বিষয়ের কীট হয়ে আমার লেখা পড়া বুদ্ধিবিবেক যে লোপ করব এই কি তোমাদের ইচ্ছে!"

সদানন্দ মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"হট্টগোলের মধ্যে মিশে আদপ-কায়দায় ঘোরে গেলে মানুষের বিবেকবিদ্যার যে কেমন করে উন্নতি হয়, সে বোঝ্‌বার শক্তি আমার নেই, তাদের ভালমন্দ নিয়ে তারাই থাক, তার ভাগও আমি চাইনি, সাজসজ্জায় সুন্দর দেখ্‌তেই যাদের বড় লোভ, তাদের সঙ্গে বনিবনাও হওয়া সেও যে বড় শক্ত কথা, তারা যে অন্ধ, দেখ্‌তেই জানে না। চক্ষু থাকলে আমার এই পাড়াগেঁয়ে প্রকৃতির কোলে যা আছে, তার মাদকতা থেকেত আপনাকে রেহাই দিতে পার্ত্ত না।"

নির্ম্মল লজ্জিত হইল, এই একান্ত অনভিজ্ঞ দর্শনশক্তির লোলুপ আগ্রহ-টাকে মাড়িয়া ফেলিতে গেলে সে যে প্রাণে বাঁচে না। করুণাময়ী বলিয়া উঠিলেন—"অতশত আমি বুঝিনে বাপু, যেতেই হয়ত আমায়ও সঙ্গে করে নাও।"

"তাই চল।" বলিয়া নির্ম্মল স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিল।

সদানন্দ বলিলেন—"লোভকে আস্কারা দিও না নির্ম্মল, ওতে যে ঠক্‌তে হবে, সে আমি গোড়াগুড়িই জানি, তা থেকে যা আছে, এই নিয়েই সন্তুষ্ট থাক্‌তে চেষ্টা কর, ভগবানের দান মাথা পেতে না নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেল না, তাতে ভগবান্‌ও অসন্তুষ্ট হবেন, ফল যা হবে, তাতে কিছু তুমিও সন্তুষ্ট হতে পারবে না।"

কেমন করিয়া এমনই বাদপ্রতিবাদের মধ্য দিয়া নির্ম্মল নিজের পথ করিয়া লইবে, বুঝিয়া পাইতেছিল না, অল্প যাহা আছে, তাহাকে ত্যাগ না করিলে যে বেশীর দেখা পাওয়া যাইবে না, এই কথাটা যেন বিষাণরবে তাহার মনের মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছিল। সে খোলা ট্রাঙ্কটা ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রাত্রিতে বিমলাকে দেখিয়া গুরু গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল—"জোরজুলুম করে আটক কর্ত্তে যেয়ে আমায় যে খাচায় পাখীর মত শ্বাসশূন্য করে তুলেছ, এমন বদ্ধ হয়েত আমি থাক্‌তে পারব না। মুক্তির

আনন্দ যে কি, সে হয়ত তুমি জান না, কিন্তু যে একবার স্বাদ পেয়েছে, তাকে যে তার পিছু ছুটতেই হবে।"

বিমলা শয্যার পার্শ্বে জড়ের মত বসিয়া পড়িয়া হাতের নখে পার আঙ্গুল খুটিতেছিল। সাড়া না দিয়া সে একবার নৈশ প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি করিল। গৃহস্থ ঘরের চিরবদ্ধ বিমলা এই আবিল উচ্ছৃঙ্খলতার হইতে চিরদিনই বহুদূরে বাস করিতেছিল, তাহার স্বাদও সে জানিত না, বদ্ধকে মুক্ত করিয়া লইবার বাসনাও তাহার ছিল না, ডানাযুক্ত পাখীর ন্যায় ওর তার জিনিষে ঠোকর মারাটাকে সে চিরদিনই বিপথ বলিয়া জানিত, কাজেই তাহার ভালমন্দ বিচার সে ত্যাগ করিয়াই বসিয়াছিল, সহসা নির্ম্মলের কথায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বাধ্য হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার একটা ধাপে সে পা বাড়াইয়াছিল, মাত্র, কিন্তু তাহার শঙ্কিত কম্পিত পা তাহাকে বহন করিতে পারিল না, বিমলা পড়িয়া গেল, ধরিতে গিয়া এপাশের ওপাশের কোনটা অবলম্বন করিলে যে, তাহার যথার্থ কার্য্য করা হইবে, এই চিন্তাটুকুতে যে সময় লাগিল, তাহার মধ্যেই বিমলার পতন হইল, কোন দিকটাই সে জোর করিয়া ধরিতে না পারিয়া মাটিতে লুটাপুটি খাইতে ছিল। তাই এবার ক্ষীণ কণ্ঠেই উত্তর করিল—"আটকিয়ে কাকেও রাখি সে সাধ্যিই আমার কৈ? প্রয়োজন যদি কারু থাকেই তবু কিছু শক্তির বাইরে কোন কাজ কর্ত্তে পাচ্ছি না, শিখিয়ে দেবে, এমন ধৈর্য্যটুকুও যদি কারু থাকৃত একটা কথা ছিল।"

"ধৈর্য্য আমার নেই, সে তোমার সত্যি কথা বিমলা, কিন্তু ধরে রাখ্‌তে যখন পার্‌বেই না, তখন পিছু ডেকে অমঙ্গলের পথ কেন প্রশস্ত কর।"

বিমলা জোর করিয়া বুক চাপিয়া ধরিল, অতি কষ্টে বলিল—"আমাদিগের পথ প্রশস্ত কচ্ছি কার, তোমার, না সেকি আমি পারি, দূরই করে দাও, তাড়িয়েই দাও, আর যেই কেন তোমার হ'ক না, তুমি যে আমারই, আমি পারি প্রাণ থাকতে তোমার অমঙ্গল কামনা কর্ত্তে?"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে দুই দুইটা প্রাণীই কাঁপিয়া উঠিল, নির্ম্মল রুদ্ধ স্বর মুক্ত করিয়া ডাকিল—"বিমল?"

"কেন" বলিয়া বিমলা ফিরিয়া পিপাসিত দৃষ্টির করুণা ছড়াইয়া দিয়া স্বামীর মুখের দিকে তাকাইল, নির্ম্মল তাহার হাতখানা জড়াইয়া ধরিয়া কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"এতটা মনের বল তোমার আছে?"

"কেন থাক্‌বে না, গেরস্তর ঘরের বৌ, এতটুকু জোর যদি নাই থাক্‌তে কেউ যে ঘরেই যায়গা দেবে না। বাইরে ঘুরে পরের, দোরে মুষ্টিভিক্ষা করে কিছু দিন চল্‌বে না।"

নির্ম্মলের পিঠের উপর গোটা দুই চাবুকের ঘা পড়িল। এই মুষ্টিভিক্ষার কথাটায় তাহার বিশ্রীরকমের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, সেও ভিক্ষুক, আর সেই ভিক্ষাকে চির জীবনের সম্বল করিয়া লইবার জন্য আজও সে নিরালম্ব ভাবেই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়াছে। বেদনাপূর্ণ স্বরেই বলিল—"তবু তোমার অতটুকু সুখ আছে, আমি যে বড় অভাগা।"

বিমলা কাঁদিয়া ফেলিতেছিল, নির্ম্মল ত অভাগা ছিল না, একদিন তাহার মত ভাগ্যবান্‌ই ক'জন পাওয়া যাইত, বিমলাকে বিবাহ করিয়াই যে নির্ম্মলের এ পরিবর্ত্তনটা ঘটিয়াছে। আশাহীন উদাস কণ্ঠে উত্তর করিল,—"অভাগা ত তুমি ছিলে না, শনিগ্রহ ঘাড়ে চেপেই তোমার এ অবস্থা করেছে। কিন্তু তারও ত ভোগের শেষ আছে, দুদিন নয় কষ্ট করেই থাক, দিন ফুরুলে ভোগ থেকে সে আপনিই তোমায় রেহাই দেবে।"

"কি সে গ্রহ বিমল?"

"এই দেখ্‌ছ না?" বলিয়া বিমলা নুইয়া পড়িয়া স্বামীর পা ধরিল, বলিল—"আমিই দুষ্ট গ্রহ হয়ে তোমার ঘাড়ে চেপে ছিলাম, আমার দিন ফুরিয়েছে, এবার নিজেই তোমায় ত্যাগ করে যাচ্ছি, কেবল দুটা দিন অপেক্ষা কর, বৌদিকে চিঠি লিখেছি নিয়ে যেতে, তাদের লোক পাঠাতে যতটুকু দেরি হয়, আর ত কোন দিন কিছু চাইনি, আজ আমায় হতাশ করনা। এতটুকু কাল তুমি বাড়ী ছেড়ে পালিও না।"

বিমলার মাথা কোলে টানিয়া আনিয়া নির্ম্মল তাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ভুল, সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছ, দোষ তোমার নয়, তা জানি, নিজেত খেয়ালেই মারা যাচ্ছি, তা বলে এ বাড়ীতে আমি তোমায় ছেড়েও টিক্‌তে পার্‌ব না। আমি যে পথহারা পাগল, আমায় বুকে টেনে নাও, কিন্তু রাগ করে লাথি মেরে ভাঙ্গা নৌকা একেবারে ভেঙ্গে দিও না।" বলিতে বলিতে সে জোরে বিমলাকে জড়াইয়া ধরিল। নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া ঘোষেদের ঘড়িটায় ধীরে ধীরে এগারটা বাজিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, সারা প্রকৃতির গায় যেন একটা শ্বেতবাস দুলিতেছিল, নির্ম্মল চাহিয়া দেখিয়া আবেশকম্পিত কণ্ঠে আবার বলিয়া উঠিল—"আমি যে

এদিক্ ওদিক্ দুদিক হারাতে বসেছি, দোষ করেছি বলে পরের মত ত্যাগ কর না, তাতে যে আমি গোল্লায়ই যাব। বরং ঘরে রেখে সুখী যাতে হই, তারি চেষ্টা কর, কেমন পার্‌বে ?"

"পার্‌ব।" বলিয়া বিমলা তড়িৎবেগে উঠিয়া বসিল। আবার ও স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল—"পার্‌ব না, যে দেশের স্ত্রীলোকরা স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে পেরেছে, সে দেশে জন্মে আমি যদি এতটুকুও না পারি ত স্ত্রীজাতির নামে যে কলঙ্ক থেকে যাবে। আমায় জোর করে কল্লেও ওযে পারতেই হবে, ওগো, তুমি আমায় ছেড়ে যেওনা, হয়ত অনেক দোষ হবে, তুমি কষ্টও পাবে। তবু আমায় দুদিনের সময় দাও।"

অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রলয়ের কোলে শুইয়া দুই দুইটি প্রাণী আলোর অপেক্ষা করিতেছিল। দুরু দুরু করিয়া বুক কাঁপিতেছে, একটা অনুকূল ঢেউ পাইলে পাড়ে উঠিতে পারে। কল্লোলে কর্ণ বধির, তবু তাহাদের জীবন-যুদ্ধের শেষ করিয়া লইতে হইবে। সর্ব্বগ্রাসী প্রলয়ের হাত হইতে দয়িতকে রক্ষা করিতে হইবে। তরঙ্গে আত্মবিসর্জ্জন করিলে চলিবে না। একজন আর একজনের আশ্রয়, কেহ কাহাকে ছাড়িবে না, ত্যাগ করিলে যে নিশ্চিত মৃত্যু। ভগ্ন শিথিল বাহুবল্লীর বেষ্টনীতেই যেমন করিয়া হউক আবদ্ধ রাখিতে হইবে। বিমলা সজোরে নির্ম্মলকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার তপ্ত বুক শীতল হইয়া গেল। শুষ্ক মরুতে আষাঢ়ের অবিরত বর্ষণ হইল অতৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"এম্‌নি সুখসৌভাগ্য নাকি কেউ আবার ত্যাগ করে, লজ্জা কোন্ ছার, এমন জিনিষের জন্য তাকে বলি দিতে ত কোনই দুঃখ নেই।"

ধীরে ধীরে নির্ম্মল পাশ ফিরিয়া শুইল, ডান হাতে পত্নীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া ডাকিল—"বিমল ?"

প্লাবন বন্ধ হইয়া গেল, প্রাসাদপরিপূর্ণ ভবনের সম্মুখে সম্মানীত দম্পতী সুখে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। অস্পষ্ট স্ব... বিমলা বলিল—"প্রভো স্বামিন ?"

বিমলা তপ্তশ্বাস ত্যাগ করিল, স্খলিতকণ্ঠে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন পারবে ?"

"হাঁ পার্‌ব।"

নির্ম্মলের অবশ দেহযষ্টি বিদ্যুদ্বেগে দুর্দ্দাম হইয়া উঠিল। বিমলা স্বামীর

গণ্ডে গণ্ড রাখিল, সুখসৌভাগ্যের অন্তর্নিহিত প্রলয়ের গাঢ় অন্ধকার, ভীষণ ঝাত্যা ডুবিয়া গেল। ঝড় গেল, তরঙ্গের ভয় রহিল না। ক্ষুদ্র চুম্বনে বিমলাকে ব্যস্ত করিয়া নির্ম্মল বলিয়া উঠিল—"কে শোভা, তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, দুদিনের দেখা বৈত নয়, তুমি যে আমার চিরদিনের, জীবন-মরণের, শাশ্বত। তোমার এই বুক যে আমার পাপতাপ দূর করে দেবে, তুমি পারবে বিমল।"

বিমলা নীরব শ্বাস ত্যাগ করিল। শোভা যেই হউক, তার সঙ্গে স্বামীর যে সম্বন্ধই থাকুক, আর্য্যরমণীর সে বিচারের কি অধিকার। তবু তাহার বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল—"কে সে শোভা?" কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর বুকে মিসিয়া গেল। আবারও অস্ফুট কণ্ঠেই বলিল—"সে যেই হউক, তুমি আমারি। আমিত তোমায় ছাড়তে পারি না।"

(ক্রমশঃ)

চাষার প্রাণ।

লেখক—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

সন্ধ্যা হইতে খুব বৃষ্টি হইতেছিল। ঘরের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য।

দোকানে খরিদ্দার নাই বলিয়া ঈশান দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। সামান্য তন্দ্রা আসিয়াছে; এমন সময় বাহিরে ক্ষীণ কণ্ঠে কে ডাকিল—ঈশান দা! ঈশান দা?" তন্দ্রালস জড়িত স্বরে ঈশান জিজ্ঞাসা করিল—কে গা তুমি এমন দুর্যোগে?" বাহির হইতে উত্তর হইল—ঈশান-দা! আমি মিনা। ঈশান তাড়াতাড়ি ঝাঁপ খুলিয়া কেরোসিনের ডিবাটী জ্বালিয়া বলিল—মিনা তুই! বাড়ীর খবর কি রকম দিদি?" মিনা বলিল—ঈশান-দা, বুঝি আমার সব যায় ঈশান দা—"সে কাঁদিয়া ফেলিল। স্নেহসিক্ত স্বরে ঈশান জিজ্ঞাসা করিল—পাগলী দিদি! কাঁদিস্ কেন? খবর কেমন,

বল আগে শুনি।” মিনা বলিল—ঈশান-দা! ডাক্তার বলিয়া গিয়াছে. জীবনের আশা নাই। তবে, একবার কোন সাহেব ডাক্তার দেখালে কি হয়, কে জানে! ঈশান-দা—কি হবে তবে?” “কি হবে আবার মিনা! বড় ডাক্তার, তাই দেখান হ'বে। তার জন্য কান্না কেন দিদি?” “তুমি কি বল্‌ছ? তুমি কি জাননা—টাকার অভাবে সতীশ বদ্দিকেই দেখাতে পারলুম না।” “তার জন্য তোর ভাবনা নাই। সব্বার বড় যে সাহেব ডাক্তার তাকেই কাল সকালের মধ্যে এনে হাজির কর্ব্ব।” মিনা একটু রাগত ভাবে কহিল—ঈশান দা! তুমিও আজ, এই দুঃখের সময়ে অভাগিনী মিনাকে পরিহাস কচ্ছ? লোকে কর্ত্তে পারে; কিন্তু, তুমি কি ঈশান দা! তুমি যে একদিন এই মিনার জন্য তোমার প্রাণ অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে গিয়াছিলে; সমস্ত গ্রামময় শত্রুর বিপক্ষে তুমি একা যে মিনার স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে তাকে রক্ষা করেছ, আর আজ তার জীবন-মরণের কথা নিয়ে তাকে ঠাট্টা কচ্ছ? হা ভগবান্!” দৃঢ়স্বরে ঈশান কহিল—তার পূর্ব্বে যেন ঈশান—চাষার জিব খসে পড়ে—তার নাম যেন ধরা হতে লুপ্ত হ'য়ে যায়। মিনা! তোর স্বামীর অসুখ—আর আমি সে কথা নিয়ে ঠাট্টা কর্ব্ব—তুই একথা ভাবতেও পারিস মিনা?” মিনা ঈশানের হাত ধরিয়া বলিল—না ঈশান-দা! আমার মন বড় খারাপ হয়ে রয়েছে। কি বলতে কি বলেছি, আমার দোষ নিও না ভাই।” “না দিদি! যা' তুই ঘর্ যা'। কাল সকালে ডাক্তার আসিবেই।”

বালিকা বাহিরের দিকে অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল—কিন্তু তার 'ভিজিট্'—কোথায় পাব ভাই? আমার যে একটী পয়সাও নাই—আর?” ঈশান বলিল—“আমার আছে। তুই ঘর যা' এখন্।” বালিকা আবার কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—সে যে অনেক টাকা চাই ঈশান-দা?” “চাই—চাই! আমার দোকান আছে।” মিনা ঈশানের মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া রহিল। ঈশান রুক্ষ স্বরে বলিল —মিনা, তুই বড় দুষ্ট! এই, এতক্ষণ শরৎ একলা রয়েছে—আর তুই এখানে পাগলামো কচ্ছিস। যা' শীঘ্র যা'!” তাহার তাড়নায় মিনার চমক ভাঙ্গিল, সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঈশান বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। 'শন্—শন্' বাতাসের সঙ্গে মাঝে

মাঝে বজ্রের বিকট ধ্বনি নিশিথিনীর কোলে পড়িয়া ঘোর আর্ত্তনাদ করিতেছে।

ঈশান চাহিয়া চাহিয়া বলিল—"এত অন্ধকার! কি দুর্যোগ! এ দুর্যোগ আজ বাহিরের নয়—শুধু, আমার ভিতরেও ঠিক এমন দুর্যোগ!" কড় কড় শব্দে একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহার নিকট দিয়া বহিয়া গেল। ঈশানের চক্ষুদ্বয় বন্ধ হইল।

চৌবেলিয়া গ্রামে মিনার পৈতৃক বাসস্থান। শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা মিনা এই চাষা-দোকানী ঈশানেরই স্নেহ-যত্নে ললিতা পালিতা হ'য়ে ছিল। সেই তাহার অভিভাবক। মিনা ব্রাহ্মণ কন্যা। তাহার বিবাহের বয়স হইলে গ্রামের জমিদার-পুত্র নলিনাক্ষ ঈশানের নিকট, তাহাকে বিবাহ কর্ব্বার প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু ঈশান তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। সে নলিনাক্ষকে বলিয়াছিল—তোমার মত মাতাল—অসচ্চরিত্রের সহিত মিনার বিবাহ অসম্ভব।" রোষে—অপমানে নলিনাক্ষ একদিন রাত্রে লোকজন লইয়া বলপূর্ব্বক মিনাকে অপহরণ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু ঈশানের বল-বিক্রমে অকৃত কার্য্য হয়। শুনা যায়, ঈশান, নলিনাক্ষের একটা চক্ষু, খোঁচা মারিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সত্যাসত্য আমরা জানি না, কারণ পর দিন হইতে তাহাকে চৌবেলিয়া গ্রামে কেহই দেখিতে পায় নাই।

যাহা হউক, ঈশান, একটী সচ্চরিত্র দরিদ্র যুবককে আনিয়া মিনার সহিত বিবাহ দেয় ও শরচ্চন্দ্র সেই সময় হইতেই চৌবেলিয়ায় বাস করিতেছেন।

ঈশান মিনাকে, কখনও তাহার পিতা মাতার অভাব বুঝিতে দেয় নাই। তাহার স্নেহ, ভালবাসা মিনাকে পৃথিবীর সকল সুখৈশর্য্যের অধিকারিণী করিয়াছিল। বৃদ্ধ ঈশানচন্দ্রেরও সুখের অবধি ছিল না।

তার পর ক্রমে ক্রমে, তাহার প্রতি মিনার স্নেহবন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছিল। ঈশান লক্ষ্য করিত, মিনা এখন আর ঈশান-দা'র জন্য পথপানে চাহিয়া থাকে না। তাহার কাছে রামায়ণের গল্প শুনিতে ছুটিয়া আসে না। বিশেষ আবশ্যক হইলে দু'একটী ছোট কথা কহিয়া থাকে। ঈশান সব লক্ষ্য করিত। কিন্তু সে ত ভালই। আর শরৎ যে ঈশানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখিতে অনিচ্ছুক। চাষার এতটা প্রতিপত্তি সে কি সহ্য করিতে পারে? ঈশান ভাবিত—এখন মিনা সংসারের সুখ পাইয়াছে, সে সুখের মধ্যে বৃদ্ধ

চাষাকে সে আমল দিতেই চাহিত না। ঈশানের মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হ'ত। সময়ে সময়ে—মিনার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষু অশ্রুপূরিত হইত। আবার সে ভাবিত—"না—না—আমারই ভুল! সে কি চিরদিনই আমার মিনা-দিদি থাকিবে? সে যে এখন মৃণালিনী! শরচ্চন্দ্রের প্রিয়তমা-পত্নী!"

(২)

প্রত্যুষে, একজন সাহেব ডাক্তার আসিয়া শরচ্চন্দ্রের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি বলিলেন—রোগীর শরীরে রক্ত নাই। ইহাই তাঁহার অসুস্থতার মূল কারণ। যদি কোন শরীর হইতে উষ্ণ রক্ত তাহার শরীর মধ্যে চালনা করা যায়—তবে, জীবনের আশা হইতে পারে,নচেৎ আশা খুব কম। মিনা "লজ্জা সংকোচ পরিত্যাগ করিয়া ডাক্তার সাহেবের সম্মুখে আসিয়া বলিল—সাহেব! সাহেব—আমার শরীরের রক্ত লইয়া আমার স্বামীর জীবন রক্ষা করুন: আপনি আমার পিতার তুল্য! আমার স্বামীর প্রাণ দান করুন।" ডাক্তার সাহেব বিচলিত হইলেন।

তিনি সস্নেহে কহিলেন—মা! তোমার শরীরে ত প্রয়োজন মত রক্ত নাই—তোমার ক্ষীণা দুর্ব্বলা শরীরের রক্ত ত বিশেষ কাজে লাগিবে না।"

"সাহেব! আমার দেহে রক্তের ত অভাব নাই। আমার শরীর হইতে রক্ত লউন্।"

"কে তুমি বৃদ্ধ? তুমি কি রোগীর আত্মীয়?"

"না সাহেব! আমি ঈশান চাষা—আত্মীয় নহি।" মিনা একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়াছিল; এক মনে সব শুনিতেছিল; সে বলিল—ঈশান-দা! ঈশান-দা—তুমি রক্ত দিবে?" "কেন দোষ কি দিদি! আমি চাষা বলে' কি আমার রক্তও চাষা?" "না—না, ভাই! আমি বলছিলাম"—বাধা দিয়া ঈশান কহিল—"সে কথা থাক্ এখন। তুই ও ঘরে যা। তুই দেখতে পার্ব্বিনা।—আসুন ডাক্তার সাহেব! আপনার ইচ্ছামত রক্ত লউন।"—

ঈশানের বলিষ্ঠ ও সুগঠিত দেহের রক্ত চালিত হওয়াতে শরতের অবস্থা ক্রমে ভাল হইতে লাগিল। সে এখন কথা কহিতে পারে; মিনার সহিত গল্প করে। মিনার আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু, তার পর দিন হইতে ঈশানকে কেহ আর মিনাদের বাড়ীতে দেখিতে পাইল না। মিনা ভাবিল—হয় ত ঈশান ব্যস্ত আছে—আসিতে পারে নাই।

(৩)

একদিন প্রত্যূষে মিনা, ঈশানের দোকানে আসিয়া দেখিল—ভূমিতলে শয্যায় ঈশান শায়িত। সে প্রথমে চিনিতে পারে নাই। নিকটে আসিয়া লক্ষ্য করিয়া ডাকিল—ঈশান-দা—ঈশান-দা?" অতি কষ্টে চক্ষু উন্মিলীত করিয়া ঈশান কহিল—"কে? মিনা-দিদি?" "হাঁ, ঈশান-দা! আমি মিনা!" "মিনা! শরত কেমন আছেরে, বল্, বল, সে ভাল আছে ত?" "হাঁ, ভাই, সে ভাল আছে। কিন্তু তোমার এ কি চেহারা হ'য়েছে—ঈশান-দা? তোমার বিশাল দীর্ঘ দেহ আজ ক্ষীণ, বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কি হ'য়েছে তোমার?" আস্তে আস্তে ঈশান কহিল—মিনা! দিদি—আমি চলেছি বোন্?" "কোথায়—ঈশান-দা?" "জানি না—বোন্ কোথায়? স্বর্গে কি নরকে!—তবে চলেছি!" মিনা জিজ্ঞাসা করিল—ঈশান-দা; কবে তোমার অসুখ হো'ল?" "অসুখ, নয়, বোন্!—সুখ! অসুখ যা ছিল,—রক্ত দিয়ে সে অসুখ দুর করে দিয়েছি। এখন সুখে মর্ত্তে পার্ব্বো বোন্।" "ঈশান-দা! তোমার বৃদ্ধ শরীরের রক্ত ক্ষয় হওয়ায় তোমার অসুখ হয়েছে—বুঝেছি আমি। তুমি—তুমি!—কেন এমন কাজ কল্লে—ঈশান-দা! আমি পোড়া কপালিই তোমার মৃত্যুর কারণ।" "সুখে মর্ত্তে দে, বোন্! কত সুখ—পরিপূর্ণ সুখ। মিনা! দিদি-আমার! শরতের—জন্য—তোর স্বামীর জন্য আমি যে মর্ত্তেও পেরেছি—এতে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে, মিনা! সবিস্ময়ে মিনা কহিল—"আনন্দ! বৃদ্ধ! আপনাকে মৃত্যুর দ্বারে এগিয়ে দিয়ে আনন্দ?" "কেন বোন—আমায় কষ্ট দিচ্ছিস্? আর—মৃত্যুর কথা বলছিস্—সে আর কত দিন পরে আস্ত মিনা? দু'চার দিন' পরে এসে—সে এই অর্দ্ধশতাব্দীর লোল দেহখানি অধিকার কর্ত্ত না? তার চেয়ে, কত সুখ আমার আজ হ'চ্ছে, মিনা! যাকে আজন্মকাল—বৃদ্ধ আমি—প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছি,—সমুস্ত হৃদয়ের স্নেহ দিয়ে যাকে ঘিরে রেখে দিয়েছিলাম—তাকে সংসারে সুখী কর্ব্বে সুখী- দেখে—যেতে পার্চ্ছি মিনা—কত আনন্দ—কত সুখ—তুই কি বুঝবি পাগলী—আমার।" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইতেছিল। তাহার ঘন-ঘন শ্বাস বহিতেছিল। সে মিনার দিকে চাহিয়া বলিল—"মিনা! শরতকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাস্—আর তুই বোন্—দিদি আমার। তোর ঈশান দা'কে কখন কখন মনে করিস্ মিনা।" আমার যা কিছু রহিল সব তোর। বাক্সের ভিতর উইল আছে :—

"ঈশান-দা! ঈশান-দা—তুমি মানুষ নও—দেবতা! আমায় পা'র ধুলো দাও।"

দুর পাগলী! আমি যে চাষা, দিদি—আমার! চাষার পা'র ধুলো!—আমায় অপরাধি করিস না—বোন্। মিনা! (ক্ষীণ কণ্ঠে ঈশান কহিতেছিল) কাঁদিস না। মিনা-দিদি! শরত তোকে সে দিন যে গানটা শেখাচ্ছিল—গা ত বোন—সেই গানটা একবার! আমার মায়ের পবিত্র নাম শুনে পবিত্র হই।"

বৃদ্ধের যুক্ত হস্তদ্বয় ঈশ্বরের উদ্দেশে উন্নীত হইল। মিনা গাহিতে লাগিল—

"পেয়ে মাণিক, হারালাম মা"

করুণ কণ্ঠস্বর—প্রভাতের পিকতানের ঈর্ষা করিয়া—ইতঃস্তত চৌদিকে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

গীতান্তে মিনা ডাকিল—

ঈশান-দা? ঈশান-দা?"

প্রভাতের তরুণালোক, স্নিগ্ধ মলয়, চাষার অন্তরাত্মাটীকে লইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে। নির্জ্জন কুটীরে—লোকান্তরালে ঈশান-চাষার সমাধি হইল।

৫ম বর্ষ, } ফাল্গুণ, ১৩২৪ { ১১ম সংখ্যা।

গল্পলহরী

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

লেখক—শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১)

নগেন কাণ খাড়া করিবামাত্রই শুনিতে পাইল—একটা পরিচিত পায়ের শব্দ। তাহার পর যখন সে দেখিল, যে সেই মধুর শব্দটা ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে তখন সে আলোটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া হস্তস্থিত বহিখানার প্রতি মনোনিবেশ করিল। শব্দটা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু নগেনের চেয়ারের একটু দূরে আসিয়া তাহা একবারে বন্ধ হইয়া গেল। অমলার ইহার পূর্ব্বে স্বামীর সহিত যে একবারও বাক্যালাপ বা পরিচয় হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু তবু তাহার কেমন একটু লজ্জা করিতেছিল। নগেন পুস্তক হইতে একবার মুখ তুলিয়া সেই দেড় হাত ঘোমটাবৃত মূর্ত্তীটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; পরক্ষণেই হস্ত প্রসারণ করিয়া একটানে মুখ অনাবৃত করিয়া ফেলিল। অমলা তখনও তদ্রুপভাবে মুখ রাঙা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নগেন বলিল—"দাঁড়ায়ে রইলে যে?" অমলা রাঙামুখ আরও রাঙা করিয়া বলিল—"কোথায় বস্‌ব?" "বস্‌বার জন্য ভাবনা!—এস এস, আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ কর—ব্যথিত প্রাণ শীতল—" "যাও" নগেন তাহার পর অমলাকে তাহার কোলের উপর টানিয়া আনিয়া তাহার গালে—মুখে—ঠোঁটে—নাকে—চোখে চুম্বন-বৃষ্টি আরম্ভ করিল। বেচারী অমলা এমন নির্লজ্জ স্বামীর পাল্লায় পড়িয়া যথাস্থানে মুখ লুকাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নগেন দুই হাত দিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"আস্‌তে এত দেরী কল্লে

কেন?" "একটু গল্প কচ্ছিলাম ঠাকুরঝির সঙ্গে" নগেন যেন রুষ্ট হইয়া বলিল—"আহা হা! আমি রইলাম এদিকে ওর জন্যে অপেক্ষা করে বসে—আর উনি কিনা ওদিকে গল্প আরম্ভ করে দিলেন—বাঃ রে—" "যাও, যাও,—আজ দুপুরে কোথা গিছ্‌লে বল দেখি?" 'রিক্রুট' করিবার জন্য রাজপুরে কতকগুলি বাঙ্গালী পল্টন আসিয়াছিল। দুপুরবেলায় একটা মস্ত সভা করিয়া 'লেকচার' দিয়া তাহারা সৈন্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সেই উপলক্ষেই নগেন দুপুরে বাড়ী ছিল না। অমলার প্রশ্নের সে যথাযথ উত্তর দিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া নগেন বলিল—"আমার একটা কথা বিশ্বাস করবে অমলা?" প্রশ্ন শুনিয়া অমলা বিস্মিত হইল। স্বামীর কথা সে কি কখনও অবিশ্বাস করিয়াছে? একদিনকার কথা তাহার মনে পড়িল। সে আজ দু'বৎসরের কথা। নগেন তখন বি-এ পড়িত। রাত্রে সকল ছেলেই আপনাপন পুস্তক পাঠে নিবিষ্ট-চিত্ত ছিল; এমন সময় "মেস"টার পাশের বাড়ী হইতে একটা করুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। ছেলেরা 'মেসে' থাকিত, পড়া-শুনা করিত আর 'কলেজে' যাইত। পাশের বাড়ীতে কে আছে না আছে, কি হয় না হয় তাহা তাহাদের কাহারও কোনদিন জানিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ সেই আর্ত্তনাদের ব্যাপারটা জানিবার জন্য কেতাব কোরাণ ফেলিয়া সকলেই সেই দিকে দৌড়িল। যাইয়া কি দেখিল? কি শুনিল?

বিপিনবাবু 'কপিষ্টে'র কাজ করিতেন, মাসে গোটা চল্লিশেক টাকা পাইতেন। কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু একদিন প্রাতঃকালে বিছানা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই বিপিনবাবু হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে কন্যাটী বিবাহযোগ্যা হইয়া পড়িয়াছে—আর কোনক্রমেই অবিবাহিত রাখা চলে না। সেই দিন হইতেই তিনি অন্ন-জল পরিত্যাগ করিয়া অনেক স্থান ঘুরিয়া ঠিকে-গাড়ীর ঘোড়াটীর মত হইয়া অবশেষে অনেক কষ্টে একটী পাত্র ঠিক্ করিয়াছিলেন। পাত্রটী যে মাতাল, এটা অবশ্য তিনি জানিতেন্ না। আর জানিলেও বোধ হয় মনে করিতেন যে, অমন একটু আধ্‌টু মদ খাওয়ায় কোন দোষ নাই। কিন্তু এই পুরাদস্তর মাতালটী যে বিবাহের দিনেই এমন কাণ্ড করিয়া বসিবে তাহা তাহার মাতা পিতা এমন কি ভাই বন্ধুও কেহ জানিত না। ঐ কলেজের ছেলেদের মধ্যে নগেন্দ্রও ছিল। সে দেখিল, মাতাল-পাত্র অতিরিক্ত মদ্য-পান করায় জ্ঞান-

হীন হইয়া অনবরত বমি করিতেছে আর কোথাও ঠোক্কর লাগায় মাথার একস্থান হইতে ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে। ওদিকে 'ছাদনাতলায়' বিপিনবাবুর কন্যা এবং এই মাতালের ভাবী-বধূ শ্রীমতী অমলা দেবী চেলী মণ্ডিতা হইয়া বিষাদ-পূর্ণ-হৃদয়ে বসিয়া আছে। পুরোহিত ঠাকুর 'লগ্ন পার হইয়া গেল' বলিয়া অভিযোগ করিতেছেন ও শীঘ্র শীঘ্র কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে বলিতেছেন। কিন্তু তখন পাত্রে কি আর পাত্র আছে? ক্রমে পাত্রের গুণাবলীর কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। অমলার পিতা বিপিন-বাবু এই ব্যাপার দেখিয়া বলিদানের পাঁঠাটির মত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অমলার মা এবং অন্যান্য অনেকে বলিতে লাগিলেন—"কি, এই মাতালের সঙ্গে অমলার বিবাহ? না, কখ্‌খনো না, অমলা বরং চির-জীবন কুমারী থাকিবে—সেও শতগুণে শ্রেয়ঃ!" আর অমলার মনের মাঝে তখন কি হইতেছিল!—কে বলিবে কি হইতেছিল!! সে নির্ব্বাক-নিস্পন্দ হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু তাহার পর কি করিয়া কি হইয়া গেল তাহা সে বুঝিতে পারিল না—আবার তখনই সকলের মুখে হাসির ছটা কেন কিরূপে ফুটিয়া উঠিল তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। যখন সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল তখন দেখিল যে, যে একটা ঝড়ো-হাওয়া আসিয়া ক্ষণেকের জন্য সমস্ত ওলট পালট করিয়া দিয়াছিল তাহা এখন নাই, মেঘ কাটিয়া গিয়া আকাশ ফর্‌সা হইয়া গিয়াছে, চাঁদের আলোয় সকল দিক্ যেন হাসিয়া উঠিয়াছে! সে দেখিল, এক দেব-কান্তি যুবক তাহার সম্মুখে—আর দেখিল, তাঁহারই হাতের সঙ্গে তাহার নিজের হাত আবদ্ধ! সে স্পর্শে তাহার হৃদয়ের মধ্য দিয়া যেন একটা তাড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল তাহার সমস্ত শরীরে যেন পুলক খেলিয়া গেল! সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ত অমলা আপ্‌নাকে তাঁহার চরণে মিশাইয়া দিয়াছে। তাঁহার কথায় আজ কি বিশ্বাস?

অমলাকে নীরব থাকিতে দেখিয় নগেন তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"কি গো, বল না" অমলা স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"আজ কেন এমন কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ?" নগেন অমলার কপালে তাহার ঠোঁট দুটো স্পর্শকরাইয়া বলিল—"আমিও যুদ্ধে যাব যে—নাম দিয়ে এসেছি!"

অমলা, স্বামীর মুখে একটা দুষ্ট হাসি দেখিতে পাইবে আশা করিয়া মুখ

তুলিয়া চাহিল, কিন্তু সেখানে হাসির পরিবর্ত্তে দৃঢ় গাম্ভীর্য্য অঙ্কিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে কিন্তু হাসিয়াই বলিল—"বেশ ত, আমিও তোমার সঙ্গে যাব" নগেন কৃত্রিম-গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিল—"ঠাট্টা নয়, সত্যিই আমি নাম দিয়ে এসেছি—কালই আমায় মেসোপটেমিয়া যেতে হবে" এবার অমলার মুখ সত্যসত্যই শুকাইয়া গেল, তাহার চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। সে বলিল—"আমায় ছেড়ে যেতে পার্‌বে?—একটুও কষ্ট হবে না তোমার?" নগেন পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবেই বলিল—"কষ্ট হলেই বা আর কর্‌ব কি?—দেশের চেয়ে ত আর তুমি বড় নও!" অমলার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নগেন মিথ্যা সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল—"ছিঃ, অমলা, কাঁদ কেন?—আমি সেখানে গেলেই কি আর মরে যাচ্চি—যুদ্ধ শেষ হলেই আবার ফিরে আস্‌ব!" অমলার শোকাবেগ দ্বিগুণ উথলিয়া উঠিল। সে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নগেন আবার বলিল—"তোমায় দিন একখানা করে চিঠি দেব!" অমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কিছু দিতে হবে না—যাও না তুমি যুদ্ধে, আমি কি বারণ কচ্চি?—যেদিন তুমি যাবে তার পরদিনই আমি মরে যাব!" নগেনের গাম্ভীর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু তবুও সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল—"'ষাট্' বালাই, মরবে কিসের জন্য?—তুমি ত নিজেই বলচ আমায় যেতে।" অমলা লাল চক্ষুদ্বয় স্বামীর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সরোষে বলিল—'আমি বল্‌চি যেতে?"

নগেন আর থাকিতে পারিল না। পত্নীকে সে বক্ষের মাঝে টানিয়া লইয়া সস্নেহে চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—"না গো না—তোমায় ছেড়ে আমি যুদ্ধে যাব না—কেঁদেই আকুল, নেহাৎ ছেলেমানুষ—যুদ্ধে যাবার জন্য আমি বসে রয়েছি আর কি!" "হাঁ, ছেলেমানুষ বই কি, তুমি বল্লে কেন তবে, যুদ্ধে যাব?" "বল্‌বারও যো নেই একবার?—বল্লিই কি আর হয়ে গেল না কি?" "না, কেন, অমন কথা বল্‌বে? বল, আর কখনো বল্‌বে না" "বলেচি,—অপরাধ হয়েচে—শাস্তি দাও—আর কখনো অমন কথা মুখে আন্‌ব না—তবে—" "আবার 'তবে' কি?" "তবে একবার একবার" "কি একবার একবার?" "এই এক্‌বার এক্‌বার বল্‌ব যদি হুকুম দাও" "না, এক্‌বারও বল্‌তে পাবে না!" "আচ্ছা তাই হবে!" "আমাকে শুধু-শুধু কাঁদালে কেন এতক্ষণ?" "তুমি ত নিজে কাঁদ্‌লে—আমি আর কাঁদালাম

কৈ ?” “বাঃ তুমিই ত কাঁদালে” “ওঃ হাঁ, তা বটে—তা আমার অপরাধ হয়েছে সেত আমি স্বীকার করেচি” “কেন এমন অপরাধ হয় !” “হয়ে গেছে আর ত চারা নেই—আর কখনো হবে না—আর অপরাধের শাস্তিটা না হয় আমিই দিচ্চি” এই বলিয়া নগেন অমলার গণ্ডে একটী চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল। অমলা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বলিল—“বাঃ দোষ কল্লে তুমি আর শাস্তি ভোগ আমার ?” এমন সময় দেওয়ালের ‘ক্লক’টায় ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। নগেন বলিল—“ওঃ রাত্রি অনেক হয়েচে—তোমার ঘুম পায় নি অমলা ?” “পাচ্চে বৈকি—তুমি না কাঁদালে ত আমি এতক্ষণ কোন্ কাল ঘুমিয়ে পড়তুম !” “এঃ, তাইত, তাইত আমি ভারি অন্যায় করেচি ত—চল, ঘুমোইগে” “চল”

(২)

এরূপভাবে বাড়ীর কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া যাওয়াটা ভাল হইতেছে কি না এ চিন্তাটা যখন নগেনের মনের মধ্যে সবে সেই প্রথমবার মাত্র উদয় হইল তখন ট্রেণ ছাড়িয়া দিবার জন্য গার্ড সাহেবের বাঁশী পড়িয়া গিয়াছে। টিকিট কাটিয়া ট্রেণে চাপিবার পূর্ব্বে নগেন একবারও ভাবে নাই যে তাহার এই আকস্মিক পলায়নে বাড়ীতে কি একটা কাণ্ড ঘটিয়া উঠিবে, আর অমলার দশাই বা কি হইবে। নগেনের যে বন্ধুটী “হাপ্‌জান পর্ব্বতে” থাকিত সে নগেনকে মাঝে মাঝে লিখিয়া পাঠাইত “এস, এখানে কিছুদিন থেকে যাও, বায়ুগাটী বেশ, অনেক দেখ্‌বার জিনিষ আছে এখানে। একবার আস্‌বে আমার অনুরোধ রেখ ইত্যাদি”। বাঙ্গালী পল্টনদিগকে বিদায় দিবার জন্য অনেকেই ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াছিল নগেনও তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ যখন তাহার ঐ বন্ধুর চিঠির কথা মনে পড়িয়া গেল আর ‘পকেটে’ হাত দিয়া সে দেখিল যে ‘মনি-বেগ’ টা ঠিকই আছে তখন সে না ভাবিয়া না চিন্তিয়া ‘হাপ্‌জান্ পর্ব্বতের’ টিকিট কাটিয়া ট্রেণে চাপিয়া বসিল। তাহার পর যখন সে জানালাদিয়ে মুখ বাড়াইয়া ভাবিতে লাগিল “তাইত, কি করি, এমন ভাবে চম্পট দেওয়া ভাল হচ্ছে না” তখন শ্রীমান্ রামটহল বাবাজীবন কুলিগিরির উমেদারীতে বিফল মনোরথ হইয়া সেইদিক্ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ নগেন বাবুকে গাড়ীতে দেখিতে পাইয়া কালো কালো দাঁতদু’পাটী বিকশিত করিয়া বলিয়া উঠিল—“এজ্ঞে, বাবু, পেন্নাম হই আপনি কোথায় চল্‌লেন ?” এই মলিন বদন

অনাহূত আগন্তুকটীকে দেখিয়া নগেনের মাথায় একটা উপায় আসিল ; কিন্তু ট্রেন তখন দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। নগেন তাড়াতাড়ি পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া কি একটু লিখিল, তাহার পর তাহাতে চারিটা পয়সা মুড়িয়া জানালা দিয়া রামটহলের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "কাগজটা বাড়ীতে দিবি আর পয়সা চারটে তুই নিবি" বাবুর এই অযাচিত দয়ায় রামটহল আর একবার তাহার দাঁত বাহির করিল কিন্তু ট্রেণ তখন 'দাঁত দেখিবার লোককে' লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেছে ; কাজেই সে কাগজটী নগেন-বাবুর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য মন্থর গতিতে অগ্রসর হইল।

নগেন এতক্ষণ বাড়ীর চিন্তাতেই বিভোর ছিল কিন্তু রামটহলকে কাগজটুকু ছুড়িয়া দিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়া পেছনে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল, একটি বৃদ্ধ পিছনের বেঞ্চিতে বসিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। নগেন একটু অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল কিন্তু বৃদ্ধ নিতান্ত সপ্রতিভের ন্যায়ই বলিল "কিছু না বাবা, এদিকে ঘুরে বোস, একগাড়ীতেই দুজনলোক অথচ চুপ্‌ চাপ্‌ যেতে হবে, সে বড় কষ্টকর ; বাঙ্গালীলোক কিছুতেই তা' পারবে না সাদাচামড়াদের তা'ই নিয়ম বটে কিন্তু দণ্ডবৎ বাবা সে নিয়মকে ; তাঁদের নিয়ম তাঁদের কাছেই থাক্‌ তুমি আমার ছেলের বয়সী, মুখ দেখে বোধ হচ্ছে যেন বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্চ, কেমন ?" বৃদ্ধের কথায় নগেন চমকিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিল। বৃদ্ধ আবার বলিল "ছিঃ বাবা আমার কাছে কোন কথা লুকোতে চেষ্টা কোর না ; ষাট বৎসর বয়স হোল জগতের অনেক দেখেছি শুনেচি, যা একবার বলে দেব তা কি আর মিথ্যে হবার যো' আছে ? ঐ দেখ না, তোমার মুখ দেখে বলে দিলুম, তুমি পালিয়ে যাচ্চ, কতক্ষণেরই বা দেখা তোমার সঙ্গে, টপ্‌ করে বলে দিলুম কেমন ঠিক কি না ?" "কেমন করে জানলেন, আমি বাড়ী থেকে পালাচ্চি ?" নগেনকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে দেখিয়া বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল "মুখ দেখে আর এ-কথাটা বলতে পারব না ? তবে ত আমার নাম অধর চক্কোত্তিই নয় ; তা' বেশ বাবা বেশ, তোমার সরলতায় বড় সন্তুষ্ট হলাম আমার বাড়ী হচ্চে শ্যামনগর, আসছি হরিহর পুর থেকে তা' তোমার নামটী কি ?" "আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়" বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আঃ, ব্রাহ্মণের ছেলে

এখনও নাম বল্‌তে শেখনি, কেন নামের শেষে 'দেব-শর্ম্মা' বল্‌তে পাল্লে না? আর তোমারই বা দোষ কি বল, বাপ্-মা শিখালে তবে ত শিখ্‌বে। দেশটা উচ্ছন্ন গেল আর কিছু রইল না তা' তোমার পিতাঠাকুরের নামটী জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি? সাদাচামড়াদের নিয়ম হচ্ছে তাঁদের 'কাউকেও' বাপের নাম জিজ্ঞাসা করবার জো নাই, তাহ'লে তাঁরা খাপ্পা হয়ে ত উঠ্‌বেনই, তা'ছাড়া দু'এক ঘা বুটের গুতো দিতে ও ভুল্‌বেন না, ওটা নাকি তাদের 'এটিকেটের' বাইরে, তা ছেড়ে দাও ওদের কথা হাঁ, লোকে বলে আমি বড় বাজে কথা বলি, কিন্তু কৈ আমি ত একটীও বাজে কথা বলি না, সব কাজের কথা, কি বাবা নয়? অধর চক্কোত্তির কাছে সব কাজের কথা, তা' তোমার পিতাঠাকুরের নামটী কি বল্লে?" নগেন এবার বলিল "শ্রীরামনাথ দেবশর্ম্মা" "বেশ বাবা বেশ এইত শিখে ফেলেছ, ভারি সন্তুষ্ট হলাম একবার বলে দেবামাত্র ধরে নিয়েছ, তোমাদের দোষ কি বল, না শিখালে শিখ্‌বে কোত্থেকে বল? তা' এখন যাওয়া হচ্ছে কোথায়?" নগেন দেখিল, বেশ একটি সঙ্গী তাহার জুটিয়াছে। অন্য যাহাই হউক না কেন, ট্রেনে সময় কাটাইবার পক্ষে এ লোকটার দাম যে খুব বেশী অন্ততঃ এতটুকু সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বৃদ্ধের কথার ছাঁদে নগেন ক্রমে কৌতুহলী হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিল "হাপ্‌জান পর্ব্বতে আমার একটি বন্ধু থাকেন সেইখানে যাচ্চি" বৃদ্ধ একটু চিন্তা করিয়া বলিল "কি বল্লে, 'হাপ্‌জান পর্ব্বত'? হাঁ, জায়গাটি বেশ, তা যাও, কিন্তু ওখানে "তাজমলহ" টা দেখে আস্‌তে ভুলো না, আর যমুনা নদীটাও দেখে এসো; কোন দেশই আমার বাকিনেই বুঝ্‌লে বাবা? সমস্ত পৃথিবীর খবর এই অধরচক্কোত্তির নখ-দর্পণে, দেখতে এই লোকটীকে একরকম দেখ্‌ছ বটে, মনে মনে অগ্রাহ্যও কচ্চ বোধ হয়; কিন্তু গুণের পরিচয় পেলে একবারে অবাক হয়ে যাবে হাঁ, তা ঐ যে হাপজান না কি বল্লে ওখানে ঐ যে বল্লুম "তাজমহল" এটা অতি অবিশ্যি দেখে আস্‌বে" বৃদ্ধের ভুগোলে দখল দেখিয়া নগেন হাস্য সম্বরণ করিল অনেক কষ্টে। কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে সে বলিল "আপনি কি "হাপজানে"র "তাজমহল" দেখেছেন "হেঃ, এটা আর দেখিনি? ঐ করে করেই এত-বড়টী হয়েছি তা, বাবা, তুমি কি তামাক খাও?" নগেন অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। বৃদ্ধ একটা টিকা ধরাইয়া ছোট্ট হুকাটী মুখের কাছে আনিয়া

বলিল "খাও না? তা একরকম ভালই, তা সিগার খাও? না তাও খাও না, পানও খাও না বোধ হয়?" "পান খাই" "হাঁ, পানটা দরকারী বটে ওটা খাওয়া চাই। ওটা পরিপাক শক্তির সহায়তা করে" এই বলিয়া বৃদ্ধ তামাকের প্রতি মনোযোগ দিল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া নগেন জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি কাজ করেন" "আমার আবার কাজ, মা জগদম্বার নাম করে ঘুরে বেড়াই" এই বলিয়া বৃদ্ধ কতকগুলি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ডিপুটী কমিশনার ইত্যাদি অদ্ভুত জীবের নাম করিলেন এবং নগেনকে জানাইয়া-দিলেন যে ঐ উপরোক্ত জীবগুলি তাঁহার চেলা—হাতধরা তিনি যখন যাহা বলিবেন তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাই করিবে! নগেন আবার জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাচ্চেন?" বৃদ্ধ হুকাদেবীর বদনে দীর্ঘ চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিয়া সুখস্পর্শের আবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন "শ্যামনগর যাব ঐখানেই ত আমার পৈতৃক বাড়ী, তা তুমি ঠাকুর দেবতা মানো? হাঁ, তা মানবে বৈ কি, বুদ্ধিমান ছেলে ভারি সন্তুষ্ট হলাম বাবা তোমার উপর, তা' মা জগদম্বার আশীর্ব্বাদী বিল্বপত্র আছে আমার কাছে, এই দিচ্চি তোমায়, নাও এতে সমস্ত মঙ্গল হবে—" এই বলিয়া বৃদ্ধ তাহার ছোট 'মোট' টী খুলিল এবং গোটাকয়েক শুষ্ক বিল্বপত্র বাহির করিয়া নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় নগেনের মাথায় বুলাইয়া দিল। বলিল, "এই নাও বাবা ধর যত্ন করে রেখে দাও ট্রেণ চলে এল দেখ্‌তে পাচ্চি, আমাকে এর পর নাব্‌তে হবে, তোমায় ছেড়ে যেতে বড্ড কষ্ট হচ্চে তা' আবার দেখা হবে মা জগদম্বার কৃপায়; এখন আসি বাবা— কল্যাণমস্তু, কল্যাণ হোক কল্যাণ হোক্" বলিতে বলিতে ট্রেন আসিয়া শ্যামনগর ষ্টেশনে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ আর বাক্যব্যয় না করিয়া 'মোট'টী লইয়া নামিয়া পড়িল। নগেন্দ্র জানালা দিয়া অনেকক্ষণ বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ যখন অদৃশ্য হইয়া গেল তখন সে মুখ ফিরাইয়া নিজের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লইল। ক্ষুধাও পাইয়াছে অথচ এখনও অনেক দূর তাহাকে যাইতে হইবে। এই ত বেলা দুটো, রাত্রি আট্‌টার সময় ট্রেণ 'হাপজানে' পৌঁছিবে। আলিপুরে ট্রেণ আধঘণ্টা থামে। আর দুটো ষ্টেশনের পরেই আলিপুর। নগেন ঠিক করিল, আলিপুরে নামিয়া সে জঠরদেবের পূজোটা সারিয়া লইবে। মিনিট দুই পরে শ্যামনগর হইতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। খাবার চিন্তা হইতে নগেনের হাতটা আপনা হইতেই পকেটের মধ্যে প্রবেশ করিল কিন্তু পকেটে

হাত দিবা-মাত্রই তাহার মুখ-খানা যেন কেমন হইয়া গেল। পকেট হইতে সে আর হাত বাহির করিয়া আনিতে পারিল না। এ পকেট-ও পকেট অনুসন্ধানের পর একটুক্‌রা কাগজ বাহির হইয়া আসিল। মুখ শুকনো করিয়া নগেন সেটা চোখের কাছে আনিতেই দেখিতে পাইল, বাঁকা বাঁকা অক্ষরে পেন্সিলে লেখা রহিয়াছে—"টাকা কটা আমি নিলাম—তার-জন্যে কিছু মনে কোরো না যেন। টাকার আমার ভারী দরকার হয়েছিল। মেয়েটীর বিয়ে না দিলে জাতি যাবে কিন্তু অত টাকা বরের বাপকে দিতে কোথায় পাব। মেয়ের বাপের দুর্দ্দশা ত আর কেও দেখবে না। বড়জোর কেও হয় ত একটা লেক্‌চার দেবে—'পণ নেওয়া ভারি খারাপ ইত্যাদি'—কিন্তু তারপর যেই কে সেই। অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় আমি এই পকেট মারা বিদ্যাটাই আশ্রয় করেছি। তোমাকে অত বাজে কথা শুনাবার কোন দরকার নেই। এতে তোমার ভালই হোল। তুমি ত বাড়ী থেকে পালাচ্ছিলে?—এখন তোমাকে বাধ্য হয়ে বাপ-মার কাছে ফিরে যেতে হবে। এ বৃদ্ধের উপর যদি তোমার বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা হয়ে থাকে, তবে আমার কথা শুনো। আলিপুরে নেমে ফিরতি ট্রেনে বাড়ী ফিরো—এর অন্যথা কোরো না। ট্রেন ভাড়ার জন্যে ভাবতে হবে না—কেন না, তোমার হাতের আংটীটা ত আমি অনেক চেষ্টা করেও নিতে পারিনি। তোমার দুর্দ্দশা ভেবে আমার যে কষ্ট হচ্ছে না, তা' নয় কিন্তু কি করি বল!! এখন আসি। ইতি

হিতাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীঅধরচন্দ্র দেবশর্ম্মা"

নগেনের হাসিও পাইল, কান্নাও পাইল। কি পরিহাস! ফিরতি ট্রেনে বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া ভিন্ন ত আর উপায় নাই। অমলার হাস্য-দৃপ্ত মূর্ত্তিখানি যেন তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়া বলিতেছিল—'কেমন জব্দ!'

(৩)

"হ্যাঁগা বৌমা, নগু কোথা গেছে বাছা, এতখানি বেলা হোল—এখনও আস্‌চে না কেন?"

"কি জানি মা, কোথায় গেছেন, আমায় ত কিছু বলে যান্ নি"

"তা বাছা, তুমি আর বসে থেক না, খাওগে যাও, কতক্ষণ আর না খেয়ে থাক্‌বে ?—সে যখন আস্‌বে তখন খাবে'খন। যাও, আর দেরী কোরো না" "কিই বা এমন বেলা হয়েছে, তিনি এলেই খাব'খন" "ঐ ত বাছা তোমার দোষ, বল্লে কথা শোন না। তোমার খিদে পেয়েচে, তুমি খাওগে —মুখ শুকিয়ে গেছে—যাওনা"—এই বলিয়া দুর্গাসুন্দরী নিজের শিব পূজায় মনোনিবেশ করিলেন। অমলা ভাবিল, তাইত, কোথায় গেলেন। এমন সময় রামটহল সেখানে উপস্থিত হইল। সাম্‌নে অমলাকে দেখিতে পাইয়া সে কাগজখানা তাহাকেই দিয়া বলিল—"বাবু নির্ব্বিঘ্নে ট্রেনে চাপতে পেরেছেন !" রামটহল মনে করিয়াছিল, এ শুভ সংবাদটা দিয়া সে এখানেও কিছু—না—কিছু পাইবে, কিন্তু কথাটা বলিবামাত্রই অমলার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, দেখিয়া সে তাহার দাঁত বন্ধ রাখিয়াই চলিয়া গেল। কাগজখানা খুলিয়া অমলা দেখিল, তাহাতে এই কয়টী কথা লেখা রহিয়াছে—"আমি যাচ্চি—কোন চিন্তা নেই—শীগ্‌গীর ফিরব" কোথায় যাইতেছে, নগেন সে স্থানটার যদি উল্লেখ করিত, তবে সমস্ত গোলই চুকিয়া যাইত। কিন্তু তাহা ত সে করে নাই ! শুধু লিখিয়াছে—"আমি যাচ্চি !"

সেদিনকার রাত্রির কথা অমলার মনে হইল—চতুর্দ্দিক যেন ঝাপসা হইয়া আসিল—আগা-গোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই যেন তাহার নিকট অর্থহীন বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর যখন সে দুর্গাসুন্দরীকে কাগজের কথা শুনাইয়া জানিতে পারিল যে, স্বামী তাঁহাকেও কিছু বলিয়া যান নাই, তখন সে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িল। দুর্গাসুন্দরী বলিলেন— "ওকি, তোমার মুখ অমন শুকিয়ে গেল কেন? কোথাও গেছে হয় ত কালই আস্‌বে, নগেন ত কতবার বাড়ীতে কিছু না বলে চলে গেছে তা'তে হয়েচে কি, ওমা, আবার চোখে জল কেন ?" এমন ভাবে চোখ হইতে জল বাহির হওয়ায় অমলা একটু লজ্জিত হইল বটে, কিন্তু রাত্রির কথা সে না বলিয়া থাকিতে পারিল না। দুর্গাসুন্দরীর মুখও তখন শুকাইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া পূজো সারিয়া লইলেন। রমা আসিয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "দাদা নিশ্চয়ই "হাপ্‌জান" গেছেন। তোমরাও যেমনি, রমেশ ত দাদাকে প্রায়ই সেখানে যেতে চিঠি লিখ্‌তো, এই দেখ্‌বে সে-সব চিঠি ? "এই বলিয়া রমা কতকগুলো চিঠি বাহির করিয়া আনিয়া তাহার উক্তির যথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু

অমলাকে সে বুঝাইতে পারিল না। অবশেষে 'হাপ্‌জানে' 'তার' করাই স্থির হইল।

(৪)

আলিপুরের ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয় যখন নগেনকে ট্রেনে চাপাইয়া দিলেন তখন নগেন আরও একবার বলিল, "এ-আংটী-টা আপনি রেখে দিন, বাড়ী গিয়ে আমি টাকা পাঠিয়ে দিলে পরে আপনি ওটা পাঠিয়ে দেবেন" ষ্টেসন-মাষ্টার দুই হাত জিব বাহির করিয়া বলিলেন, "সীতারামঃ, ভদ্রলোকের ছেলে বিপদে পড়েছেন তাঁর সাহায্য কল্লুম বলে টাকা নেব? না, না, সে পারব না, আপনি কিন্তু সোজাসুজি বাড়ী যাবেন, বুঝলেন?"

নগেন বলিল "আজ্ঞে হাঁ, বাড়ীই যাব"

আলিপুর ষ্টেশনে নামিয়া নগেন প্রথমে ঐ ষ্টেশন মাষ্টারটীর কাছে সমস্ত ব্যাপার বলিয়াছিল। আংটীটী রাখিয়া গোটা-দশেক-টাকা যদি কেহ দেয় তবে সে পুনরায় হাপ্‌জানের পথেই যাত্রা করিতে পারে, এ-কথাটাও সে তাহাকে জানাইয়াছিল। কিন্তু ভদ্রলোক ষ্টেসন-মাষ্টারটি, নগেন বাড়ী হইতে না বলিয়া আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকে হাপ্‌জান যাইতে দিলেন না। পাছে আবার অন্য কোথাও চলিয়া যায়, এইজন্য ট্রেণে চাপাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন—"আপনি কিন্তু সোজাসুজি বাড়ীই যাবেন।"

* * * * *

রাত্রি বারটা। চোরের মত চুপে চুপে গৃহে প্রবেশ করিতেই নগেন দুর্গাসুন্দরীর চোখে পড়িয়া গেল। মাতা এরূপভাবে হঠাৎ পুত্রকে দেখিতে পাইয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। নানা-কথায়, নানা-কৌশলে, অনেক কষ্টে নগেন যখন দুর্গাসুন্দরীর কৌতূহল কতকটা প্রশমিত করিয়া দিল; তখন দুর্গাসুন্দরী বলিলেন—"বৌমা কিন্তু বাছা ওপরের ঘরে দরজা বন্ধ করে পড়ে আছে; আজ সমস্ত দিন কিছু খায় নি—কত বলেছি—কিছুই শোনে নি—শীগ্‌গীর ওপরে যা, উঠিয়ে নিয়ে আয়—"

কম্পিত পদে নগেন উপরে গেল। দেখিল, অমলা ঘরের দরজা-জানালা সমস্তই বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সে দরজায় বার কয়েক করাঘাত করিল। কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। পায়ের শব্দ পাইয়া অমলা সমস্তই বুঝিয়াছিল কিন্তু সে অভিমানে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। নগেন কম্পিত-

কণ্ঠে ডাকিল—"অমলা, ও অমলা—" কোনই উত্তর নাই। আবার বলিল—ওগো, শুনচ—আর কষ্ট দিও না, খুব হয়েছে সুদ শুদ্ধো আদায় হয়ে গেছে—এখন দরজা খুলে দাও!" ইহাতেও যখন কোন উত্তর আসিল না তখন নগেন মিনতিস্বরে বলিল—"লক্ষ্মীটী আমার, শীগ্‌গীর দোর খোল—নইলে চীৎকার করে লোক জড় কোরব" এই বলিয়া সে ঈষৎ উচ্চস্বরে আরম্ভ করিল—"ওগো তোমরা শোন গো—অমলা দরজা বন্ধ করে চুপ্‌-চাপ্‌ বসে আছে—কথাও কচ্চে না, আর দরজাও খুলচে না!" অমলা মিঠে-কড়া সুরে বলিল—"চীৎকার কর কেন?—কোথায় গিছ্‌লে?" "কোথাও যাইনি—এইত এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি—তোমাকে দরজা খুলতে কত অনুরোধ কচ্চি—তুমি কথাও বলচ না, আর দরজাও খুলচ না" "কোথায় গিছ্‌লে আগে বল, নইলে আজ সারা রাত্রির মধ্যে কপাট খুলব না" নগেন কাতরস্বরে বলিল—"হাপ্‌জান যাচ্ছিলাম,—পথে পকেট মেরে নিলে—আংটী বাঁধা দিয়ে ফিরে আসতে হোল!" "আমায় বলে যাওনি কেন?" "ভুল হয়েছিল—কিন্তু রামটহলের হাতে কাগজ পাওনি?" "কোথায় যাচ্চ তা'তে তা'ত কিছু লিখনি" "বাইরে এতক্ষণ 'দাঁড়' করিয়ে রাখা যে তার দ্বিগুণ দণ্ড হয়ে গেছে—এখন কপাট খোল—নইলে এই আবার চীৎকার আরম্ভ কচ্চি!"

অমলা দরজা উন্মুক্ত করিল। নগেন বলিল—"সারাদিন কিছু খাওনি কেন?—শীগ্‌গীর খাবে চল" "তুমি?"

"আলিপুরের ষ্টেশন-মাষ্টারের কৃপায় আমার সে-সব গলায়-গলায় হয়ে গেছে!"

ভোজনান্তে নগেন যখন অমলার নিকট অধর চক্রবর্ত্তীর গল্প করিল এবং তাহার চিঠি দেখাইল তখন অমলা হাসিয়া বলিল—"বেশ করেছিল—"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!"

নগেন বলিল—"আজ্ঞে হাঁ, ঠিক!"

অমলা স্বামীর কথায় মনোযোগ না দিয়া বলিল—"আচ্ছা, যদি আলিপুরের ষ্টেশন-মাষ্টার এতটা দয়া না দেখাত আর তোমার ও আংটী ও কেও না নিতে চাইত, তাহ'লে কি কর্ত্তে?" নগেন কাতর স্বরে বলিল—"হুঁ, বল দেখি তাহ'লে কি কর্ত্তাম" "যাও, যাও, চালাকী কর্ত্তে হবে না। ঐ কথাটার আর উত্তর দিতে পার্লে না?—দেখ্‌বে, আমি উত্তর দেব?" "হুঁ।

দেখ্‌ব, দাও দিখি" অমলা নিতান্ত বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া বলিল—"ষ্টেশন-মাষ্টারকে দয়া দেখাতেই হ'ত আর তোমাকে আজ রাত্রে এখানে যে-কোন-রকমেই হোক ফিরে আসতেই হোত—এর অন্যথা কোন-ক্রমেই হোত না—বুঝ্‌লে ?" নগেন বলিল—"হুজুর যা বলেচেন তা বুঝেছি কিন্তু হুজুরের অনেক আগে এ-কথাটা অধর চক্কোত্তি আমাকে বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে !"

খুড়োর উইল

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

লেখক—শ্রীঅনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল ।

মিঃ গ্রাঞ্জার ব্রামলে হলে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্লাইটিকে উইলফ্রেডের লেখা, সেই ত্যাগপত্রটুকু দেখাইয়া এই কাগজ সম্বন্ধে অন্যান্য সব তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। উইলের সর্ত্ত অনুসারে ক্লাইটিই যে এখন এই অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক তাহাও বলিতে ভুলিলেন না।

ক্লাইটি ধীর শান্তভাবে সব কথা শুনিলেন। তাঁহার মুখে ও ভাবভঙ্গীতে উত্তেজনা বা উদ্বেগের কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না। মনে মনে তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। হেসকেথ আর কোন প্রকারেই উত্তরাধিকারী সূত্রে এই সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবে না, এবং স্বামী উইলফ্রেডেরও পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার আর কোনও ভয় নাই। স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল শ্রীতে তাঁহার মুখমণ্ডল মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। তিনি নিশ্চিন্তমনে মিঃ গ্রাঞ্জারের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ক্লাইটি দুদিন পরে ভাবিলেন ব্রামলে হলে বাস করা ও উইলফ্রেডের অর্থে নিজের ভরণ পোষণ করা আদৌ যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ উইলফ্রেড একপ্রকার তাঁহাকে ত্যাগই করিয়াছে। কিন্তু মলি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, কাজটা একদম ভাল হইবে না। উইলফ্রেড একদিন ফিরিয়া আসিতে পারে। আসিয়া দেখিবে যে তত্ত্বাবধানের অভাবে তাহার বিষয় সম্পত্তি পাঁচভূতে লুটিয়া নিয়াছে। ইহাই কি স্ত্রীর কর্ত্তব্য ? এখানে থাকিয়া স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা করাই তোমার এক্ষণে একমাত্র কাজ।

পরদিন ক্লাইটি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনিতে দোকানে দোকানে ঘুরিতেছেন, এমন সময় এক জায়গায় অনেক লোকের ভিড় দেখিতে পাইলেন। সংবাদ লইয়া জানিলেন রডন নামধারী কোন ব্যক্তি মূৰ্চ্ছিত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছে তাহার মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। ইহা শুনিয়াই তাঁহার কোমল নারীপ্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি ঘটনাস্থলে অগ্রসর হইয়া গাড়ী করিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। উপস্থিত নরনারী সকলেই উচ্চকণ্ঠে ক্লাইটির দয়ার প্রশংসা করিতে লাগিল। কেবল অদূরে একজন যুবতী দাঁড়াইয়া বিষণ্ণবদনে এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে মুখে কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে ক্লাইটীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ক্লাইটি গাড়ীতে উঠিয়া গৃহ অভিমুখে চলিলেন। স্ত্রীলোকটিও গাড়ীর পিছুপিছু চলিল।

পরদিন ক্লাইটি স্বয়ং হাঁসপাতালে গিয়া রডনের সংবাদ লইলেন। লোকটি একটু সুস্থ আছে এবং দিনকতকের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিবে শুনিয়া তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার ঔষধ ও পথ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন, এমন সময় সেই স্ত্রীলোকটি নিকটে আসিয়া কাতরস্বরে জানাইল যে সে তাঁহার নিকট কাজ করিতে চায়। ক্লাইটি তাহাকে কাজের আশা দিয়া বাড়ীতে দেখা করিতে বলিলেন।

স্ত্রীলোকটি সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী যাইতেই ক্লাইটি তাহাকে দাসীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তাহার নাম জিজ্ঞাসা করায় সে আপনাকে সুসান মার্থা বলিয়া পরিচয় দিল। তাহাকে সাধারণ দাসীর কাজকর্ম্ম করিতে হইত না। সে খুব ভাল সেলাই কার্য্য জানিত। ক্লাইটি তাহাকে সেই কার্য্যেই নিযুক্ত করিলেন। তাহার নম্র ব্যবহার ও সরল স্বভাবের গুণে বাড়ীর সবাই মুগ্ধ হইল।

ভগ্নীদ্বয় ব্রামলে আসিবার পর হেসকেথ দু'তিনবার তাহাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা বাড়ী না থাকায়, দেখা পান নাই, হতাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আজ আবার তিনি সকালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্লাইটি তাঁহাকে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। হেসকেথ এরূপ ভাব দেখাইলেন যেন শতকার্য্য সত্ত্বেও তিনি তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না।

ভোজঘরে চাকরেরা যথাসময়ে টেবিলের উপর পাত্রাদি সাজাইতে আরম্ভ

করিল। হেসকেথ সে ঘরের পাশেই বারান্দায় একটু পায়চারি করিতে ছিলেন। এমন সময় সুসান সেখান দিয়া যাইতেছিল। হেসকেথকে দেখিয়াই সে থামিয়া গেল এবং তাহার মনে একটু সন্দেহও হইল। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার কার্য্যাবলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হেসকেথ এ বিষয়ে কিছুই টের পাইলেন না।

হেসকেথ মৃদুস্বরে গুণ গুণ করিতে করিতে ভোজঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, চাকরবাকর কেহ কোথাও নাই। তৎক্ষণাৎ বুকপকেট হইতে একটি ছোট শিশি বাহির করিয়া ক্লাইটির গ্লাসে ঠেকাইলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে কাজ শেষ করিয়া পুনর্ব্বার গুণ গুণ করিতে করিতে বারান্দার অপর অংশে চলিয়া গেলেন!

সুসান অলক্ষ্যে থাকিয়া সব দেখিল। তাহার মুখ মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায় সাদা হইয়া গেল। সে পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত্ত পরেই যেন নব বলে বলীয়ান হইয়া সে ত্বরিতে ভোজঘরের ভিতর ঢুকিল এবং ক্লাইটির জলের গ্লাসটি সরাইয়া সেখানে তদ্রূপ অন্য একটি গ্লাস রাখিয়া দিল। পরে সেই পাত্রটি লইয়া নিজের ঘরে গিয়া দেরাজের ভিতর চাবি দিয়া রাখিল। হেসকেথ এসবের কিছুই টের পাইলেন না।

সেদিন সন্ধ্যায় সুসান বাড়ীর অপর একজন দাসীর নিকট কথাবার্ত্তায় শুনিল যে, ক্লাইটির এখন মৃত্যু হইলে হেসকেথই এই বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইবে। সে আরও সংবাদ পাইল যে, ক্লাইটিরও শরীর আদৌ সুস্থ নহে। মধ্যে মধ্যে তিনি মূর্চ্ছারোগে আক্রান্ত হন। বুদ্ধিমতী সুসানের ভিতরের কথা সব বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না।

রাত্রে সব কাজ শেষ হইলে, সুসান নিজের ঘরে গিয়া সেই পাত্রটি আলমারি হইতে বাহির করিল। এবং একটি ছোট শিশিতে সেই সাদা তরল পদার্থের কিয়দংশ ঢালিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট অংশে জল মিশাইয়া গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। পরে ক্লাইটির ঘরে গিয়া ক্রুস দিয়া তাঁহার কেশ বিন্যাস করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ক্রুসটি তাহার হাত হইতে হঠাৎ পড়িয়া গেল। ক্লাইটি ফিরিয়া দেখেন যে, সুসানের সমস্ত দেহ টলিতেছে, কোন রকমে পার্শ্বস্থ চেয়ারে ভর দিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া আরাম কেদারার উপর শোয়াইয়া দিলেন। চাকরবাকরদের রাত্রে আর বিরক্ত না করিয়া তিনি মলিকে ডাকিয়া

আনিলেন। মলি সুসানের মুখের ভাব ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়াই বলিল, ক্লাইটিরও মূর্চ্ছিত হইবার সময় ঠিক এইরূপ অবস্থা হয়। দু'চার ঘণ্টা পরেই সুসান প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল কিন্তু আসল কথা কাহাকেও খুলিয়া বলিল না।

পরদিন বিকালে সুসান হাসপাতাল অভিমুখে যাত্রা করিল। সেদিন রডন বেশ সুস্থ ছিল। তাহাকে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে বেড়াইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। সে একটু বেড়াইয়াই সেখানে বসিয়া পড়িল। দূরে সুসানকে আসিতে দেখিয়া কোন পরিচিত স্ত্রী মূর্ত্তি বলিয়া তাহার মনে হইল। নিকটে আসিতেই রডন তাহাকে চিনিতে পারিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া গাঢ়স্বরে ডাকিল, "মেরি!"

সুসান সেখানে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাধ্বনি তাহার ওষ্ঠদ্বয় হইতে নির্গত হইল। অল্পক্ষণ বিলম্ব করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। রডন তখন একটু অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিল ও পুনর্ব্বার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। রমণীকে মেরীর প্রেতাত্মা বলিয়া তাহার সন্দেহ হইতেছিল। সুসান ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "রডন!"

"মেরী, তুমি! তবে শেষে ফিরে এসেছ? এতদিন কোথায় ছিলে?"

"আমাকে ছেড়ে দাও। আমি চলে যাই।"

রডন দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, কখনই না। আমাকে সব কথা খুলে না বল্লে, আজ কিছুতেই ছাড়ছি না। অনেক দিন পরে দেখা হলো এতদিনের পুঞ্জীভূত বেদনারাশির আজ লাঘব হবে। এখানে বসো; আমি বলছি, বসো। এখনও আমার শরীর বড়ই দুর্ব্বল। কিন্তু সব কথা খুলে না বল্লে, তোমাকে ধরে রেখে দেব।"

"পূর্ব্বের চেয়ে তোমাকে অনেকটা ভাল দেখছি। তোমারই সংবাদ লইবার জন্য আমি এখানে এসেছি।"

"তুমি তাহলে জানতে আমি অসুস্থ। তাহলে কিছুদিন এদেশে এসেছ? এতদিন আমাকে লুকিয়ে ছিলে!"

"হাঁ, লুকিয়েই ছিলাম। যে দিন তুমি আহত হও, সে দিন তোমাকে প্রথম দেখি। তোমার সঙ্গে কথা কবার আমি যোগ্য নহি,—"এই বলিতে বলিতে তাহার চোখদুটি জলে ভরিয়া আসিল, "আমাকে ছেড়ে দাও, চলে যাই। আমার কথা মন হতে একেবারে ভুলে যাও।"

"তোমাকে ভুলতে পারবো না, মেরী। পারলে, আমারও ভাল হতো বুঝতে পারছি। কিন্তু তা হবার নয়। যেদিন তুমি চলে গেলে, সেদিন থেকে একবারও তোমার কথা ভুলিনি। কেন আমাকে ছেড়ে গেলে, আজ বল।" তাহার কণ্ঠস্বরে তীব্র যন্ত্রণা ও তিরস্কার মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

"আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছলো; রডন, সে কথা আর তুলো না। মনে কর, আমাদের মধ্যে পূর্ব্বে কখনও আলাপ পরিচয় ছিল না।

"মাথা খারাপ হয়ে গেছলো! তা হতে পারে। তুমি জানতে আমি তোমাকে কত ভালবাসতাম। আমাকে এরূপ ভাবে প্রতারণা করা ও ত্যাগ করা কি তোমার উচিত হয়েছিলো?"

"হাঁ, সে কথা সত্য বটে! কিন্তু সে পাপের আমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে! সে কথা শুনলে ঘৃণায় তোমাকে মুখ ফেরাতে হবে,—"তাহার কণ্ঠস্বর মৃদু হইয়া আসিল,—"আমার শিশুসন্তান অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে!" এই বলিয়া সুসান হাত দিয়া তাহার মুখ ঢাকিল।

রডন শুনিবামাত্র হিংস্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"সেই পিশাচের নাম আমাকে বল। তার নাম তোমাকে বলতেই হবে। আমি আর কিছুই চাই না,—কেবল তার নামটা!"

"না তা হবে না। তার নাম জিজ্ঞাসা করবার তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারছি। সে কাজ করলে তোমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। সে পিশাচ কঠোর শাস্তির সম্পূর্ণ উপযুক্ত হলেও, তার নাম আমি তোমাকে বলবো না। আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছ, আর বেশী কষ্ট তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি না।"

"যে তোমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমার জীবনের সব সুখ নষ্ট করেছে, সে বিনা শাস্তিতে পার পাবে, তা হতেই পারে না, এ অসম্ভব!"

"না, শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। রডন, মাথার উপর ভগবান আছেন। তিনি নিজের ইচ্ছামত যথা সময়ে পাপীকে শাস্তি দেন। তিনি নিজেই বলেছেন,—"প্রতিহিংসার ভার আমার উপর। আমি সেই দিনের অপেক্ষায় বসে আছি। এখন চল্লাম। তুমি সুস্থ হয়েছ দেখে বড়ই সন্তুষ্ট। তোমাকে করজোড়ে প্রার্থনা করছি, আমাকে ভুলে যাও। আমার চিন্তা মন হতে দূর করে দাও, নূতন করে জীবনযাত্রা আরম্ভ কর।"

রডন তীব্রভাবে হাসিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এখন কোথায় আছ?"

"আমি ব্রামলে হলে কাজ করছি, রডন, মিস ক্লাইটি স্বর্গের দূত। তিনিইত সেদিন তোমাকে গাড়ীতে উঠিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যহ তোমার সংবাদ লন। আমি এখন চল্লাম। পরে আমাদের দেখা হলে তুমি এমন ভাব দেখাবে যেন পূর্ব্বে আমাদের কখনও আলাপ ছিল না। ইহাও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ!"

"না, তোমাকে ভুলতে পারবো না। তোমাকে এতশীঘ্র ছেড়ে দিতেও পারি না। মেরী অতীতের ঘটনা স্মৃতিপট হতে মুছে ফেলবো; তুমি আবার আমার হও—"সুসান মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছিল। রডন তাহা লক্ষ্য করিয়া রুমালে তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া বলিতে লাগিল,—"না, কেঁদো না।"

"আমার কথা শোন। আমরা এ স্থান ত্যাগ করে বিদেশে চলে যাবো। সেখানে কেউ আমাদের চিনতে পারবে না। মেরী, এখনও আমি তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণ ভরে ভালবাসি।"

"রডন, আমি তোমার স্ত্রী হবার যোগ্য নই!" সুসান কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল এই উত্তর করিল।

"সে বিবেচনার ভার আমার উপর! কিন্তু এখন বল, আমার কথায় সম্মত কি না। তা না হলে, আমি তোমায় ছাড়বো না। তুমি ছাড়া, আমার জীবন মরুভূমির সমান, আমি ক্রমেই অবনতির পথে অগ্রসর হবো। একমাত্র তুমিই আমাকে ধ্বংসের মুখ হতে উদ্ধার করতে পারবে। বল, তুমি আমার হবে কিনা।"

(২৪)

দুজনে কিছুক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া বসিয়া রহিল। পরস্পরকে বলিবার তাহাদের অনেক কথা আছে। রডন সবল হইয়া উঠিলেই, তাহারা ইংলণ্ড ছাড়িয়া অষ্ট্রেলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিল। সেখানে তাহাদের ভরণ-পোষণোপযোগী কাজ মিলিবারও খুব সম্ভাবনা। দুটি চির ব্যথিত আত্মা আজ আবার মিলনের পথে অগ্রসর হইতে চলিল। সংসারের সকল চিন্তাই আজ তাহাদের মন হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। কেবল নিজেদেরই ভবিষ্যতে জীবনের সুখছবি তাহারা মানসপটে চিত্রিত করিতে লাগিল। রডনের

অগাধ ভালবাসার প্রতিদানস্বরূপ তাহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াও আজ যে সে আবার তাহাকে বক্ষে স্থান দিল, ইহা ভাবিয়া কৃতজ্ঞতায় মেরীর অন্তঃকরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ ক্লাইটির কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল,—তিনি যে শয়তানের বিপদজালে জড়িত! তাঁহাকে এ জাল হইতে মুক্ত করিতেই হইবে। মেরী উঠিয়া দাঁড়াইল,—"আজ তাহলে আসি। হাতে অনেক কাজ আছে, কাল আবার এমনই সময়ে আসব।"

মেরীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার রক্তিম গণ্ডস্থলে চুম্বন করিয়া রডন বলিল,—"মেরী, বোধ হয় কালই আমি এ স্থান ছেড়ে যেতে সমর্থ হব। এ স্থানের প্রতি আমার একটা আন্তরিক ঘৃণা জন্মেছে। আর এক তিল এখানে থাকতে ইচ্ছা যায় না। তুমি মৃত দেহে নবজীবন সঞ্চার করেছ। আমি কালই নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠবো।"

মেরী আর কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে ব্রামলে হলে গিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীতে ঢুকিয়াই দেখিল, হেসকেথ বৈঠক খানা ঘরে ক্লাইটির সাক্ষাৎ লাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সেও অমনি এক কোণে লুকাইয়া হেসকেথের কার্য্যাবলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হেসকেথের মুখের ভাবে সে একটা উদ্বেগের চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষ্য করিল! ক্লাইটি ঘরে ঢুকিতেই হেসকেথ তাঁহার চিরাভ্যস্ত কুশলপ্রশ্ন করিলেন,—"আপনাকে আজ ত বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে!"

তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মেরী বুঝিল হেসকেথ ক্লাইটিকে এক বন-ভোজে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে। মেরী নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ক্লাইটির উত্তর শুনিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে মলি আসিয়া তাহার হাত ধরিল। ধরা পড়িয়া মেরীর মুখ চোরের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। মলি তাহাকে জানালার নিকট হইতে টানিয়া আনিয়া চুপিচুপি বলিল,—"এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো? আমার ঘরের জানালা থেকে তোমাকে চোরের ন্যায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ঘরের ভেতর উঁকি মেরে কি দেখছিলে? এ সবের উদ্দেশ্যই বা কি?"

ভয়ে ও উত্তেজনায় মেরীর সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে জোড়হস্তে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল,—"মিস মলি, ভগবানের দোহাই, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি ওখানে যাই; ঘরের ভিতর মিঃ কার্টন আছেন। তাঁকে

নজরবন্দি করে রাখাই আমার উদ্দেশ্য। চাকরে শীঘ্র চা নয়ে আসবে— আমাকে যেতে দিন। আপনি যদি জানতেন—”

“পাগলের মতন কি বকছো? সব কথা আমি এখনই জানতে চাই।”

“হাঁ, আপনাকে সব বলব। কিন্তু এখন নয়; আপনি আমাকে ধরে ফেলেছেন, আপনার কাছে আর কিছুই লুকিয়ে রাখব না। এখন আর সময় নেই, ছেড়ে দিন। মিস ক্লাইটিকে রক্ষা করবার জন্য আপনার সাহায্যও আমার দরকার।”

“ক্লাইটিকে রক্ষা করবার জন্য! এসব কি বলছো। পাগল হলে নাকি?”

“না, না, আমি পাগল হইনি। আমি সব আপনাকে বলব। এখন যা বলি, দয়া করে শুনুন। আপনি বৈঠকখানা ঘরে যান; ওদের দুজনকে একসঙ্গে ফেলে আসবেন না। হেসকেথের উপর বিশেষ নজর রাখবেন। ওর প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালন লক্ষ্য করবেন। কিন্তু সাবধান, হেসকেথ যেন কিছু টের না পায়। এক মুহুর্ত্তও আর কালবিলম্ব করবেন না।”

মলি আর উত্তর না করিয়া স্পন্দিত বক্ষে ঘরের ভিতর ঢুকিল। তাহার কৌতূহলের মাত্রা কিছুমাত্র না কমিয়া বরং আরও বাড়িয়া গেল। দুচার মিনিট পরেই চাকরে চা দিয়া গেল। ক্লাইটির অনুরোধে হেসকেথ পূর্ব্বে চা পান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু মলিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই হঠাৎ এক জরুরি কাজের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি ক্লাইটির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মলি সংবাদ লইয়া জানিল হেসকেথ ক্লাইটিকে বনভোজে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু মলি আপত্তি করিল, ক্লাইটির কিছুতেই সেখানে যাওয়া হইবে না। ক্লাইটি প্রথম অস্বীকৃত হইলেও, পরে মলির কথাই বজায় রহিল। তাহারই যুক্তি মত ক্লাইটি হেসকেথকে এক পত্র লিখিলেন যে, বিশেষ কোন কার্য্যবশতঃ ক্লাইটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না, তজ্জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত। মলি চাকর দিয়া তৎক্ষণাৎ হেসকেথকে সেই পত্র পাঠাইয়া দিল।

এই কাজ শেষ করিয়াই মলি একেবারে সুসানের ঘরে গিয়া হাজির হইল। দেখিল সুসান ঘরের ভিতর বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন। মলিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সুসান উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মলি তখন তাহাকে ধরিয়া বলিল,—“এবার সব কথা আমাকে বলতে হবে।”

"হাঁ, বলবো, শুনুন। মিঃ হেসকেথ অতি অসৎপ্রকৃতির লোক। আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি।"

"আমাদের এখানে আসবার পূর্ব্বে তুমি তাকে জানতে ?"

"হাঁ; আমি ওর কারখানায় কাজ করতাম। তখন হতেই জানি। নির্ম্মম পুরুষ অবলা বালিকার প্রতি যতদূর অন্যায় করতে পারে, সে আমার সেই সর্ব্বনাশ করেছে। আপনাকে আর বেশী বলা উচিত নয়। এ কথাও বলতাম না, তবে বাধ্য হয়ে বলতে হলো। সুখের লোভ দেখিয়ে নারী-জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠরত্ন তাহা হরণ করে নিষ্ঠুর পিশাচ আমাকে অনায়াসে ত্যাগ করলে। অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘরবাড়ী ছেড়ে পথে পথে ভিখারিনীর ন্যায় ঘুরে বেড়াই। আমার শিশুপুত্র অনাহারে পথে মারা যায়। তবে শুনুন, আপনাকে সব কথাই খুলে বলি।

আমার আসল নাম মেরী সিটন, হেসকেথ কর্ত্তৃক তাড়িত হয়ে আমি এ অঞ্চলে আর পাপ মুখ দেখাব না বলে একেবারে অষ্ট্রেলিয়া যাই। সেখানেই গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত দাসীবৃত্তি করতে নিযুক্ত হই। মনে করেছিলাম, ইংলণ্ডে আর কখনও ফিরব না। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে, একজন সহৃদয় মহাপুরুষের অশেষ উপকারের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদানের আশা হৃদয়ে পোষণ করে, আমি আবার এসেছি। মনে করবেন না, আমি পেটের দায়ে আপনাদের বাড়ীতে কাজ করছি। আমি ইচ্ছা করেই নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এখানে এসে ঢুকেছি।"

"কি উদ্দেশ্য ?"

"যিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, যাঁর ঋণ আমি জীবনে কখনও পরিশোধ করতে পারব না, তাঁরই কার্য্য সাধনের জন্য আমি এখানে এসেছি। কার্টনের বিষয় সব কথা শুনলে, আপনি স্তম্ভিত হয়ে যাবেন! আপনি জানেন, ক্লাইটির এ অবস্থায় মৃত্যুর পর এই বিষয় সম্পত্তির কে অধিকারী হবে ?"

"হাঁ, জানি, মিঃ হেসকেথ কার্টন। তবে কি তুমি বলতে চাও যে— না, তা অসম্ভব, ভাবতেও শরীর শিউরে উঠে।"

"ব্যস্ত হবেন না। প্রমাণ দেখাচ্ছি। আমি এখানে এসে শুনলাম, মিস ক্লাইটির মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হয়। আরও ভিতরের সংবাদ লয়ে জানলাম যে, হেসকেথ যে দিনই দেখা করতে আসে, সেদিন আহারের পরই ক্লাইটির এরূপ

রোগের লক্ষণ দেখা যায়। আমি সেই থেকেই হেসকেথ এ বাড়ীতে আসলেই, তার কার্য্যাবলি নিরীক্ষণ করছি। সে কতদূর অসৎ প্রকৃতির লোক, তা আমার জানতে তো বাকি নাই।"

"অসম্ভব! হেসকেথ কার্টন—একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ক্লাইটিকে বিষ খাইয়ে মারবার মতলব করেছে! এ কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।"

"শুনুন, আরও প্রমাণ আছে, গত রাত্রে আমার মূর্চ্ছার মতন হয়, আপনার মনে আছে বোধ হয়। তা দেখে আপনি বলেছিলেন, ক্লাইটিও ঠিক এরূপ ভাবে মূর্চ্ছাগ্রস্থ হন। আমার অসুখের কারণ কি জানেন? তবে শুনুন। হেসকেথ কাল এখানে আহার করেছিল। ভোজঘরে টেবিলের উপর পাত্রাদি সজ্জিত হলে, চাকরেরা বাহির হয়ে আসে। হেসকেথ কেবল ঘরের ভিতর পায়চারি করছিলো একবার বাইরের বারান্দায় আসছে, একবার ঘরের ভিতর ঢুকছে। দেখে আমার মনে সন্দেহ হল। আমি লুকিয়ে তার উপর নজর রাখলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম সে পকেট থেকে একটি ছোট শিশি বার করে ক্লাইটির পানপাত্রে কি ঢেলে দিল।—"ভয়ে মলির সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সে চুপ করিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল। মেরী বলিতে লাগিল,—

"তারপর বারান্দায় বেরিয়ে এলো। আমি ইতিমধ্যে অলক্ষিতে ঘরের ভিতর ঢুকে সেই পাত্রটির স্থানে অপর একটি সেই রকমের পাত্র রেখে তারই খানিকটা জলের সঙ্গে খেয়ে আমার অসুখ করেছিল। এই দেখুন—"বলিয়া মেরী আলমারি খুলিয়া তাহাকে সে পাত্রটি দেখাইল।

"মেরী, মেরী! তাহলে ক্লাইটিকে বাঁচাইবার এখন উপায় কি?"

"তাঁকে হেসকেথের নিকট থেকে দূরে সরাতে হবে, এই একমাত্র উপায়। আপনারা ত আর হেসকেথের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করবেন না। তাহলে নিশ্চয়ই তার ফাঁসি হয়। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনারা কেলেঙ্কারীর ভয়ে সে পথ অবলম্বন করবেন না। অতএব এখান থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়াই একমাত্র উপায়।"

"কোথায় বা নিয়ে যাব?"

"কেন, তাঁর স্বামীর কাছে?"

মলি চমকিয়া উঠিল। "তাঁর স্বামীর কাছে! তুমি তাহলে দেখছি সব জান?"

"হাঁ, জানি। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এ কথা কাহাকেও বল্‌বো না। কিন্তু তাঁরই মঙ্গলার্থে আজ আমাকে বল্‌তে হলো। তিনি জীবন রক্ষা করেছিলেন, শিশুপুত্রকেও রক্ষা কর্‌বার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন মিঃ ডগলস্—স্যার উইলফ্রেড কার্টন! আমি যখন অষ্ট্রেলিয়ায় অনাহারে মৃতপ্রায়, তিনি আমাকে খাদ্য ও আশ্রয় দানে রক্ষা করেন। এমন সহৃদয় পরোপকারী ব্যক্তি পৃথিবীতে বড়ই বিরল, মিস মলি! আমি প্রথম তাঁকে ছদ্মবেশে দেখেই চিন্‌তে পেরেছিলাম, কিন্তু তা জান্‌তে দিই নি। আমিই পুরাতন সংবাদপত্রে তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ পড়ে কাগজ্‌খানি তাঁকে দিই। তাই পড়ে তিনি ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। তাঁর উপকারের এই কিঞ্চিৎ প্রতিদান দিতে পারায়, মনে বড়ই আনন্দ হয়েছিল, কারণ ভেবেছিলাম, তিনি এবার পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হবেন। কিন্তু একদিন দেখি, হঠাৎ তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় ফিরে এলেন। তাঁহার মুখ বিমর্ষ ও মলিন। কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে অনবধানতা বশতঃ তিনি আমার কাছে প্রাণের কথা সব প্রকাশ করে ফেলেন। তিনি যথার্থই প্রাণভরে ক্লাইটিকে ভালবাসেন এবং তাঁর বিরহে সেই নির্জ্জন প্রদেশে যে মানসিক যন্ত্রণা তিনি ভোগ করছেন, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। তিনি এখন প্রচুর ধনরত্নের মালিক হয়েছেন। তাঁর জমির নীচে স্বর্ণখনি বেরিয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্নও ক্লাইটির তুলনায় তাঁর নিকট কিছুই নহে। কিন্তু সে স্থানে তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিপদ। দুষ্ট প্রকৃতি লোকেরা স্বর্ণের লোভে তাঁকে বিপদগ্রস্ত কর্‌তে কেবল চেষ্টা করছে। একদিন রাত্রে আমি সাবধান করে না দিলে, তাঁর প্রাণ সংশয় হত—"

"তবে, তিনিও বিপদাপন্ন! এ কথা ক্লাইটিকে জানালে, সে নিশ্চয়ই তাঁর কাছে যেতে চাইবে। ক্লাইটিত তাঁর চিন্তায় দিনরাত মগ্ন। স্বামীর প্রাণ বিপদাপন্ন জান্‌তে পারলে, সে নিশ্চয়ই সেখানে যেতে সম্মত হবে। তাহলে আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই। দেরী করলে, দুধারেই বিপদ ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা।"

"কিন্তু একটা কথা। আমি আপনাকে যে সব কথা বল্লাম, মিস ক্লাইটিকে এত খবর জানান হবে না। এসব আমাদের দুজনের মধ্যেই গুপ্ত থাকবে।"

(ক্রমশঃ)

স্বামীর বাক্স

(লেখক—শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার বি. এল)

(১)

স্বামীর আপিসের বাক্স খুলে কাগজপত্র ওলট্ পালট্ ক'রোনা, কোন্‌দিন্ বিপদে পড়বে বলেদিচ্ছি। যদি বেশী অধিকার পেয়ে থাক ত খুব জোর চিঠির কাগজ, খাম, নিতে পার; কিন্তু দেখে নিও সরকারী সাদা ছাপ্ না থাকে, হ্যাণ্ডেল, নিব, পেন্সিল, ফিতে পিন্, কিছু কিছু রেখে বাকীগুলো নিতে পার—দোষ নেই, কিন্তু ভেতরের চোরাখোপ খুলে খবরদার কাগজপত্র উল্‌টো না, খুব সুবিধে হবে না। সেদিন অমুল্য, আমাদের আপিসের এক বন্ধু, বেচারা সাহেবের লেখা চিঠিখানা হারিয়ে ফাঁপরে পড়েছিল, বাড়ী গিয়ে সমস্ত আলমারী, বাক্স, দেরাজ, বিছানারনিচে, সব তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে কিছুতেই পেলে না। স্ত্রী, যুবতী, সুন্দরী, নতুন বিয়ে করা অর্থাৎ এখনও তিন বছর পেরয়নি, এখনও মাথায় ফুলেলার গন্ধ বেরোয়, মাথাঘসা তেলের মশলা ব্যবহারের অবস্থা সম্পূর্ণ হয়নি, শীগ্‌গীর যে হবে না তা বলা যায় না। নাম রমা।

রমা। সব বাক্স দেরাজ ভাল ক'রে খুঁজেছ ত? আপিসের বাক্সটা ভালকরে দেখেছ?

অ। সবই ত খুঁজলাম

র। ভাল করে দেখেছ? জিনিস হারালে চিরকালই ত হুলুস্থুল কর, শেষে ত আমিই বের ক'রে দি। ব্যস্ত হ'য়ে খুজলে কি হারাণ জিনিস পাওয়া যায়?

অ। না, আপিসের বাক্সে নেই আমি ঠিক জানি, হয় ত বা হাতে করে কোথায় রেখে থাক্‌ব—কি বল? ফিরে এসে ভাল করে খুজে দেখ্‌ব এখন ওই ট্রামের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, তবে এখন আসি।

এত তাড়াতাড়ি সত্ত্বেও বিদায়ের আলিঙ্গনটা ভুল হ'ল কই? তা বেশ সেকেণ্ড ত্রিশেক। তারপর সদর দরজায় খুবজোরে একটা আওয়াজ হ'ল রাস্তা দিয়ে জ্যোতিশবাবু বেচারা পান চিবুতে চিবুতে ছাতা হাতে গদাই লস্করী চালে চলেছিল; হাইকোর্টের আপিলেট্ সাইডের ট্রান্সলেটর কিনা,

তত তাড়াতাড়ি নেই, পরের ট্রামখানায় গেলেও চলবে নিশ্চিন্ত। জ্যোতিশের পেটে বিষম ধাক্কা লাগল, ছাতাটা হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলে তার জ্ঞান হল যে মোটরগাড়ী নয়, অমূল্য তার ঘাড়ে পড়েছে। গরজ বুঝে জ্যোতিশবাবু হেঁসে বল্লেন।—তা, আর মাথাচুল্কোবার দরকার নেই আমার লাগেনি। বছর কুড়িক্ আগে আমরাই যে ওরকম করে ছুট্তাম না তা কেমন করে বলি?" বলা বাহুল্য যে জ্যোতিশবাবুর শরীর খানা দেখলে বোধ হয় বনেদি, তবে তিনি যে রসিক নন্ তা কেমন্ করে বলি।

স্বামী আপিসে গেলে রমার কর্ত্তব্যজ্ঞানটা বেড়ে উঠল বই কি? গল্দা চিংড়ির ন্যাজা আর হাঁসের ডিম খেয়ে ঘুমুলে বিকেলে লুচি খেতে সুবিধে হয় না তাই একটু নড়াচড়া দরকার। পাশেই অনাথদের বাড়ী, অনাথের মা ত আস্বেই তার একটু পাড়া বেড়ান অভ্যেস আছে। বয়েস হ'য়েছে কিনা, সে পারে। রমার ত সে যো নেই, তাই স্বামীর কাজ এগিয়ে রাখ্তে চেষ্টা কচ্ছিল। দোষ কি? শেষে ত তাকেই খুজে দিতে হবে তা নয় দুপুর বেলাটা সেই কাজেই কাটাল। আপিস থেকে ফিরে এলে চিঠিখানা হাতে দিয়ে মেহনতের জন্যে কিছু বেশী আব্দার করে চাইতেও হবে না। বইয়ের নিচে কিম্বা ভেতরে পাওয়া গেল না, পেণ্ট্লন, কোট, চাপকান কিম্বা সার্টের পকেটেও ত কোন কাগজ নেই। বালিস তোষকের নিচেও নেই। আলমারী দেরাজের পেছনেও নেই। খাবার ঘরে নেই। বৈঠক-খানায় ত কাগজ থাকেই না। জলখাবার যেখানে তৈরী হয় সেখানে যখন খোজা হ'ল তখন ঝি হেঁসে ফেল্লে।

র। না ঝি হেঁসো না, কখন বা হাতে কোথায় রাখা হয় তার কি কিছু ঠিকানা আছে

ঝি। তা মিথ্যে নয় বৌদিদি—

র। নিশ্চয় আপিসের বাক্সতেই আছে। যখন খোজা হয় তখন চোখ দুটো ত আর বাক্সের দিকে থাকে না। সে যে সুন্দরী তা সে জান্ত আরসি খানা বিয়ের সময় আমি অমূল্যকে উপহার দিয়েছিলাম। দাম ৭৷৷০ টাকা। জর্ম্মন্ নয়, খাটি বিলিতি, তাই মুখগুলো আসলের চেয়েও ভাল দেখাত।

প্রথমে ডালা খুলে, প্রতি খোপ খুব ভাল করে দেখা হ'ল। মরি মরি কি জিনিস রাখবার ছিরি, বল্লেই হয় মাঝে মাঝে রমা গুছিয়ে দেয়, তা

পোড়া বিশ্বেস আছে কি? যদি কাগজপত্র এদিক ওদিক হয়, মেয়েমানুষ ত, হাজারহক্। মিউনিসিপালের রসিদ, বন্ধুদের চিঠি, প্রবাসীর মলাটের ওপর যে সুতো জড়ানো থাকে, সেগুলো আবার খুলে জড়িয়ে রাখা হ'য়েছে মরণ আর কি? কাগুজে পোড়ারমুখোরা বইয়ে সুতো জড়ায় কেন! ধার-গুলো কেটে যায়। বাইসিকেলের এক টুক্‌রো লোহা, চুরুটের টিনের ঢাকনি। থিয়েটারের প্রোগ্রাম আর বাইটেকাপের হ্যাণ্ডবিল, রাখবার আর ঠাঁই পাওনি, পুড়িয়ে ফেল্‌লে হয়। নাঃ কাজ কি, হয়ত তার কোথায় কি ঠিকানা টোকা আছে, আবার ওরি জন্যে হয়ত সমস্ত দিন খুজে মরবে, —থাক্‌গে। তারপর চোরা খোপ্। চাবি বন্ধ। এটা ত এতদিন, রমা দেখেনি, এতে কি আছে? এর কথা ত এতদিন একবার বলেও নি। এ খোপ্ হয়ত তাড়াতাড়িতে খোজাও হয় নি, খুলে দেখতে দোষ কি? দোষ হবে কেন? রমার কাছে আবার লুকোবার কি জিনিস থাক্‌তে পারে। রমা ত আর পর নয়! অপরে না দেখে তাই চাবি বন্ধ আছে বইত নয়? চাবীটাও ছাই এই যে বাক্সের মধ্যেই রয়েছে। যার বাক্স খোলবার অধিকার আছে তার কি আর এ খোপটা খোলবার অধিকার নেই? খোপটা খোল-বার আগে রমা কিন্তু দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এল, কেন? এতে আর কি হয়েছে? হয়ত হাওয়া তখন দক্ষিণে না হয়ে পুবে ছিল, তাই একটু শীত শীত বোধ হচ্ছিল, তাকি হয় না? প্রথমেই দেখা গেল গোটাকয়েক রসিদ, তারপর একটা কার হ্যাণ্ডনোট, তারপর আবার রসিদ তারপর দুখানা দশ টাকার নোট। হয়ত এদুটো রাখা হয়েছে, দরকার পড়লে রমা চাইলেই ত দেওয়া হবে, তার আর কি হয়েছে? মনটা যে অনেক খোলাসা হয়ে গেল তা কি বলা দরকার? ভাল করেই চিঠির খোজ হ'তে লাগল। তারপর একেবারে সব কাগজের নিচে একটা ওকি! হঠাৎ রমার হাতখানা বুকের ওপর গেল কেন? ব্যাথা বোধ হ'ল নাকি? ডানহাতে ওখানি কি? একটা ফটোগ্রাফ, যুবতী সুন্দরী, হাঁসছে বই কি, চুলোয় যায় না? রমার মুখে আওয়াজ নেই, চুপ করে উলটে পালটে দেখলে, কোথাও নাম লেখা নেই, কোন তারিখ পর্য্যন্ত দেওয়া নেই, রমার চোখে জল নেই, এখন পর্য্যন্ত নেই, তবুও কাঁদ্‌লে না। হাটু গেড়ে বাক্সের পাশে বসে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। অমুল্য, অমুল্য, এই কি উচিত হয়েছে?

নির্দ্দয়, নির্দ্দয়, এওকি বিশ্বাস হয়? রমার প্রাণের স্বামী যাকে ত্রিভুবন

ভুলে মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে, সেই, সেই কি এরকম করতে পারে? ঘরের দেওয়াল গুলো রমার চখের সাম্‌নে যেন নাচ্‌তে লাগ্‌ল।

(২)

রমা তখনও সেই রকম ভাবেই বসেছিল, হাতে ফটো চোখে হতাশা, দুঃখ রাগ, অভিমান, ঠাট্টা, আরও কতকি, ঠিক বলা দুষ্কর, এমন সময় অনাথের মা সেই ঘরে এসে পড়লেন। আট ছেলের মা, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত মুখের হাঁসিটুকু বজায় আছে। যার বাড়ী যান সেই যেন একটু আমোদ পায়, তাই পাড়াবেড়ান স্বভাবটা ঘোচেনি; "বলি বড় ব্যস্ত দেখছি যে?"

বিদ্যুতের মত রমার হাতের ফটো অদৃশ্য হয়ে গেল।

"এই আপিসের বাক্সটা একটু গুছিয়ে রাখছি।"

বৌমা? কি হয়েছে? মুখখানি সাদা কেন?"

"কই এমন কিছু নয় তবে শরীরটা ভাল নেই" বলে রমা কাগজপত্র গুলো গোছাতে লাগল। পোড়া ফটোগ্রাফ খানা কিন্তু আঁচলের নিচে। অনাথের মা পাকা গিন্নি, তিনি কি ওকথায় ভোলেন?

"যদি বলতে বাধা থাকে, নাই বল্লে. কিন্তু শরীর খারাপ হলে শুক্‌নো চোখে হঠাৎ জল ভরে আসে কি? তোমার এরকম অবস্থা আর কখনও ত দেখিনি, ভগবান করুন আর যেন কখন দেখতেও না হয়।"

তারপর পাশে বসে মায়ের মত সোহাগ করে গায়ে হাত বুলিয়ে বল্লেন "বৌমা কথা গুম্‌রে রেখে খারাপ বই ভাল হবে না, বলে ফেল্লে হাল্‌কা হ'য়ে যাবে। আর যায় কোথা হুড়হুড় করে চোখের জলগুলো প্রাণপণে ছুটে বেরুল আঁচলটা টেনে চোখে দিতে ফটোখানা অনাথের মা দেখে ফেল্লেন বটে, কিন্তু এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি দেখেন নি। তারপর দুঃখের ঝাজটা একটু কম্‌লে জিজ্ঞাসা করলেন—"বলত! ব্যাপার খানা কি?"

আচলের খুটটা অঙ্গুলি দিয়ে পাকাতে পাকাতে রমা বলতে লাগল—"এই দেখুন না একখানা চিঠি হারিয়েছে তাই আমি খুজে রাখব মনে করে আপিসের বাক্সটা খুলে দেখলাম, সব বাক্সটা খুজলাম পেলাম না, তারপর চাবি দিয়ে চোরা খোপ খুলে দেখি তার মধ্যে এই ফটোগ্রাফটা লুকোনো রয়েছে।"

ভালকরে ফটোগ্রাফখানি দেখে অনাথের মা বল্লেন—"তা কি হয়েছে কি?"

"আমার সঙ্গে লুকোচুরি কেন?" আঁচলের শুক্‌নো যায়গাটা খুঁজে চোখে দিতে হ'ল।

"লুকোচুরি ঠাওরালে কিসে?"

"তা নয়ত কি? চোরাখোপে চাবি বন্ধ ছিল ত।"

"ছেলেবেলাকার খেয়াল হয়ত! "তা এমন আর কি ভাল?"

"আবার আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করা হয় যে কোন কালে ওঁর চোখে ঠেকেনি! হায়রে পুরুষ!"

বেটাছেলেরা অমন অনেক কথা বলে থাকে, সবই কি বিষ্ণুপুরাণ হয়? তা এতে হিংসে করবার কি আছে? কটা চোখ, মাথার চুল দেখনা যেন শোনের দড়ি, আর কাঁচুলি আঁটবার ছিরি দেখনা, কেবল ঠ্যাকার বইত নয়!

র। সুন্দরী বটে কিন্তু এমন কি সুন্দরী যে আমার কাছে লুকোনো হয়েছে? আমি ভেবেছিলাম আমার কাছে কোন কথা লুকোনো হয় না। হয়ত এখন পর্য্যন্ত ভালবাসা হয়; নয়ত চোরাখোপে ফটো লুকিয়ে রাখবে কেন? ব্যবহার মনে করতে গেলে বুক ফেটে যায় উঃ—

অ-মা। কি বোকার মত দুঃখ করছ মিছে, অমূল্য এসে দু মিনিটে সব জল বুঝিয়ে দেবে এখন।

খুব জোরে মাথা নেড়ে রমা বল্‌লে আমি এর বিষয়ে একটা কথাও বল্‌ব না।

অ-মা। অমন কাজ কোরো না, চুপ ক'রে গুম্‌রে মরবে বইত নয়? আমার এই ষোল বছর বিয়ে হয়েছে বেটে আটটি কচিকাচাও হয়েছে। এসব বিষয়ে আমার মত নিয়ে চ'লো, ফটোটা ফেলে রাখ, যখন তার চোখ পড়বে তখন সোজাসুজি তাকে জিজ্ঞাসা করলেই চুকে যাবে।

"সে মনে করুক যে আমার হিংসে হয়েছে!"

"তাকি তোমার হয় নি বৌমা?"

"কক্ষণ না, আমার একটুও হিংসে হয় নি, আমি সেটা বেশকরে বুঝিয়ে দেব।"

"আচ্ছা দেখা যাবে।"

(৩)

"বলি, কোথায় গো।" গায়ের চাদর অমূল্য কখন নিজের হাতে

আলনায় রাখেনা, সার্টের বোতামও নিজে খোলে না, জুতোর ফিতে ত নয়ই। উত্তর নেই—

"কই রমা—"উত্তর নেই। ঝি এগিয়ে এল, অমূল্য দেখলে ঝির মুখে একটু যেন সহানুভূতি আছে, কিন্তু বেশীর ভাগটা যেন বিরক্তি।

"ঝি এঁরা কোথায়?"

ঝি। তাঁর শরীর ভাল নেই—ঘরে শুয়ে আছেন, বলেছেন যেন তাঁর ঘুম কেউ না ভাঙ্গায়।" হাঁ করে অমূল্য চেয়ে রইল, কই, এরকম কখনও হ'য়েছে বলে মনে পড়ে না ত!"

"আমি যখন আপিসে যাই তখন ত বেশ ছিল, এর মধ্যে আবার কি হল?

"আমি ঠিক জানিনে, বোধ হয় বুকের অসুখ—"

"বলিস কি? তার ত কোন অসুখ নেই! না! এর মধ্যে অন্য কোনও কথা আছে, ঝি তুই আমার কাছে ঢাকৃছিস না কি?"

"সে কি দাদাবাবু—না এই কেবল—

"কেবল কি? বল না!"

"আমরা গরীব, দাদাবাবু আমাদের কি ওসব কথায় থাকা উচিত? তবে বৌদিদির শরীর ভালই আছে কেবল মনের অসুখ।"

"মনের অসুখ কিরে? খোকা ভাল আছে ত?

"বালাই, খোকার কেন কিছু হবে? তবে বৌদিদির চোখ দেখে বোধ হল তিনি যেন কাঁদ্‌ছিলেন। তা' দাদাবাবু আমি যে একথা বলোছ তা বলোনা, গরীবের অন্ন যাবে। আপনি না ধম্‌কালে আমি কিছুতেই বলতাম না।"

"আচ্ছা যা—খোকাকে দেখ্‌গে যা—"

অমূল্য হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল, ভাবিতও হ'ল, ধীরে ধীরে দোরের কাছে গিয়ে দোরে ধাক্কা দিতে লাগল। হুড়কো বন্ধ।

"কে?"

"রমা, আমি এসেছি" "ঝি কি তোমাকে খবর দেয় নি?"

"হ্যাঁ, বলেছে।"

"তবে কিনা একটা কথা বড় দরকারী ছিল।"

দু মিনিট চুপ্‌। তারপর হুড়কো খোলার শব্দ।

"রমা, কি হয়েছে রমা, শরীর কি বেশী খারাপ হয়েছে ?

আলিঙ্গন করতে না গেলেই ছিল ভাল সেকথা অমূল্য হাড়ে হাড়ে বুঝে নিলে। "বলি, আমার ওপর রাগ করেছ ?"

"না" সোজাসুজি ভাবে আওয়াজটা হ'ল বটে। কিন্তু অত সোজা রকম না হলেই অমূল্যের পক্ষে সুবিধে ছিল।

"রাগ করেছ বই কি! যাবার সময় ত এরকম ছিলে না, এর মধ্যে কি হয়েছে বল্‌বে না ?" আবার আলিঙ্গনের চেষ্টা কেন সে ত সরে যাবেই—

"কিছুই হয় নি। তুমি এখন যাও আমি একটু ঘুমোব—"

"তাত বটে, কিন্তু এরমধ্যে কি যে হ'ল কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে"

"বুঝতে পাচ্ছ না ?" ওর চেয়ে বেশী ঘৃণার আওয়াজ রমার গলা দিয়ে বেরুন অসম্ভব।

সত্যি বল্‌ছি আমি কিচ্ছু বুঝতে পাচ্ছিনে, তা বেশ বোলো না, তোমার ইচ্ছে, কিন্তু মিছে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ। আমাকে বলা উচিত, নইলে আমি কেমন করে জানব বল ?"

"এখন যাও আমি একটু ঘুমুই—"

এরকম অবস্থায় তোমাকে একলা ছেড়ে যাই কেমন করে বল ?

"বলি, এরমধ্যে তোমার মা এসেছিলেন নাকি ?"

"যাও এসবের মধ্যে আবার মার কথা পাড়া কেন ?"

"তাও নয়, তবে হঠাৎ ফুল্ল নলিনি ঢুলুলো কেন ? বলেই অমূল্য একটু হেঁসেছিল, এমন ভুল, যার একটুও বুদ্ধি আছে সেও কখনই করেনা, ধোয়ান আগুন একেবারে দপ্ করে জ্বলে উঠল।

"তা, হাঁসবে বই কি ? তোমার ত আমোদই বটে! হাঁস, খুব হাঁস, যখন বাড়ীতে একলা থাকবে তখন প্রাণভরে হেঁসো।"

"বাড়ীতে একলা থাকব মানে কি ? তুমি কি স্বপন্ দেখ্‌ছ নাকি ? বদ্যি ডাক্তারকে ডাকতে হ'ল দেখছি।"

"ঠাট্টা করবে বই কি ? বেটাছেলেরা ওই রকমই ঠাট্টা করে, বটে তোমাদের পৌষমাস আর আমাদের সর্ব্বনাশ, আমরাই কেবল পুড়ে মরি বই ত নয়!"

"বাঃ, এত মন্দ নয়, বলি থিয়েটার শুনে এই হ'ল নাকি ? কই, আগেত কখনও এসব কথা তোমার মুখে শুনিনি! বল না কি হয়েছে ?"

"যাও, যাও আর ন্যাকামি করতে হবে না, ন্যাকামি তার কাছে গিয়ে—"
চুপ; আর বেশী বেরুল না দেখে—

অ। কার কাছে বল? চুপ করলে যে?

আপিসের সঙ্গীদের কাছে কি বন্ধু যতীন্দ্রের কাছে—"

"তুমি ঠিক তাই বলছিলে কলে বোধ হ'ল না ত!

"যাও, যাও আমাকে ঘুমুতে দাও—"

"তাহলে কি হয়েছে ভেঙ্গে বলবে না?"

কোনও উত্তর নেই। অমূল্য বেচারা নাচার হ'য়ে বাইরের ঘরে এসে

(৪)

শুয়ে পড়্ল খানিক পরে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে অমূল্য চেয়ারে উঠে বস্‌ল আর ভাবতে লাগল। ব্যাপারখানা কি? আজ সে কার মুখ দেখে উঠেছিল কে জানে! সাহেবের চিঠিখানা আপিসেই রেখে এসেছিল সকাল বেলা কিছুতেই সেটা মনে পড়েনি। সমস্ত সকালটা গরু খোঁজা করে বেরুবার সময় জ্যোতিশের সঙ্গে ধাক্কা, ট্রাম ধরতে খানিকটা দৌড়ে পা দুটো প্রায় অবশ হয়ে গিয়েছিল বেঞ্চে বস্‌বার সময় একজনের ঘাড়ে প'ড়ে তার দুটো কথাও শুন্‌তে হ'ল। তারপর ছাতা নিয়ে যায় নি বলে আসবার সময় একটু বিষ্টিতে ভিজতেও যে হয়নি তাও নয়। আপিসে তামাক খেতে গিয়ে দেখে হুকোটা বড়বাবু দখল করে বসে ছিলেন। তারপর বাড়ী এসে রমার রাগ, এ যে সব চেয়ে বিষম। ঝগড়া বাড়ীতে কার না হয়? দুটো প্রাণীর দুরকম মন ত বটেই। আঙ্গুলের ছাপ দুজনের মেলে না তা মন মিল্‌বে, হুঁঃ, যা নয় তাই। কিন্তু তার ত এর আগে কখনও এরকম ভুগতে হয় নি, তাই বেচারার অনভ্যেসের খোঁটায় কপাল চড়্ চড়্ করছিল। হঠাৎ তার নজর আপিসের বাক্সের ওপর পড়্‌ল, ওই দেখ, তাড়াতাড়িতে বাক্সের গায়েই চাবী লাগিয়ে গিয়েছিল। সেও একটা মস্ত গোলযোগ বই কি! বাক্সটা খুলেই দেখলে যে কাগজ পত্তরের ওপরে একখানি ফটো। বলা বাহুল্য রমা যখন রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তখন ফটোখানা ওপরেই রেখে গিয়েছিল। অমূল্য যে খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধিদার তা আমরা বরাবরই জানি—হাঁ করে খানিকক্ষণ ফটোখানা দেখ্‌লে, কার ফটো? কে রাখলে? তারপর তুলে দেখ্‌লে নিচে ছাপার অক্ষরে লেখা হপ্‌ সিং এণ্ড কোং। তার পরেই মনে পড়ে গেল—"ওঃ তাইত, একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম যে" পকেটে ফটোখানি

রেখে বাক্স বন্ধ করলে। চাবীটা খোলবার সময় আর একটা কথা মনে পড়ল। চাবিরদিকে খানিক চেয়ে রইল, তারপর চাবিটা পকেটে ফেলে হাততালি দিয়ে হোঃ হোঃ করে হেঁসে উঠল। বামূনি রান্নাঘরে ঝিকে বল্‌লে।" বাবু লোক ভাল নয় একটুও মমতা নেই।" ঝি—"কই দাদাবাবু ত কখন মাতাল হন্‌নি!"

চক্ষের নিমেষে রমার ঘরে অমূল্য গিয়ে পড়ল। রমা দেখ্‌লে মুখ গম্ভীর বটে কিন্তু চোখ্ দুটো যেন হাঁস্‌ছে?"

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল আমার বাক্স খুলেছিলে?

"তোমারি কাগজ খুঁজছিলাম।"

"তা বেশ করেছ, কিন্তু মিছে কষ্ট কচ্ছিলে, চিঠিখানা আপিসেই রেখে এসেছিলাম—হাঁ, ভাল কথা, একখানা ফটোগ্রাফ্ দেখেছিলে?"

"হুঁ।" রমার মুখ একেবারে জান্‌লার দিকে ফিরে গেল।" সেটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে—আমি ছিঁড়ে ফেলিনি, খেয়েও ফেলিনি—"

"তা কেন করবে? তোমার তাতে লাভ কি? ওটা যতীন্দ্র দিয়েছিল, তোমাকে দেখাতে যে হপসিং কোম্পানি কেমন সুন্দর ফটো তোলে, যদি তোমার পছন্দ হয় তাহলে তোমারও একখানা ওরা তৈরী করতে পারে"

র।—কী!!

অ।—হ্যাঁ গো, ও যতীনের ছোট শালীর চেহারা—

রমার শ্বাস উপস্থিত হ'ল আর কথা বেরোতে চায় না অতিকষ্টে বল্‌লে "তবে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন? আমাকে এতদিন দেখাওনি কেন?"

"আমার কি ছাই মনে ছিল? সে অনেক করে অনুরোধ করেছিল। চল কালকেই গিয়ে তোমার ফটো তুলিয়ে আনব।"

দুজনেই হাতধরাধরি করে অনেকক্ষণ পরে বাইরে এল, রমার কিন্তু চোখ দুটো তখনও ফুলো ফুলো আর লাল, তবে দুজনে কি বলে আর খুব চেঁচিয়ে হাঁসে তাই দেখে বামূনি ঝিকে কাণে কাণে বল্‌লে যে দুজনেই ক্ষেপে গেছেরে—ঝি—"না গো" ভাঙ্গ খেয়েছে—।

সাথী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীপরেশনাথ সরকার]

(২২)

শ্যামাসুন্দরী সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়া কেবল বারেন্দায় আসিয়াছেন, এমন সময় বাক্স মাথায় নিতাই আসিয়া বলিল—মা, দেখত কি এনেছি !

বাক্স দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী চিনিলেন, বলিলেন—একি রে নিতাই, এসব কি ?

নিতাই বলিল—দাদার পোষাক নাকি এর মধ্যে আছে, দিদি দিয়ে দিয়েছে।

শ্যামাসুন্দরী অবাক হইয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন —যা নিতাই এ ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

নিতাই কি বলিতে যাইতেছিল, শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—আচ্ছা, দে, দে। নিতাই বাক্স শ্যামাসুন্দরীর পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল—তুমি খুলো না কিন্তু মা, আমি এসে খুলে দেখব সব !

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—তুই কোথায় চললি, হারে নিতাই, খোল না বাক্সটা—দেখি।

নিতাই বলিল—তোমার ত তর সয়না মা। আমি ভেবেছিলাম দাদাকে দিয়াই এটা খোলব। তা আচ্ছা খুলচি।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—নিতাই আভা আমায় বড় ভালবাসে, সে আমার কথা কিছু বলেছে ?

নিতাই বলিল—না মা, তাত কিছু বলেনি !

শ্যামাসুন্দরী বলেনি, বলেনি কিরে নিতাই, বলেছে—অবশ্য বলেছে, তুই আমাকে সে কথা বলছিস না।

নিতাই শ্যামাসুন্দরীকে এতটা বিচলিত হইতে কখনো দেখে নাই, অবাক হইয়া বলিল—সেকি কথা মা, আমি কি মিথ্যা কথা বলছি !

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—না, না, নিতাই, তুই মিথ্যা বলবি কেন, সে বলেছে নিশ্চয়, তুই হয়ত শুনতে পাসনি !

"কি জানি" বলিয়া নিতাই বাক্সটি খুলিয়া ফেলিল। শ্যামাসুন্দরী একটি একটি করিয়া জামা তুলিয়া দেখিলেন, এত জামা তখনত ছিলনা, এমন সুন্দর সুন্দর কাপড় এ বাক্সে পূর্ব্বেত দেখেন নাই। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—নিতাই, এগুলি সব নূতন, তোর দাদার জন্য তৈরি করে নিয়ে এসেছে! সেকি জানত যে তার বিয়ের সভায় নগেনকে কেউ বসতে দেবে না, সে ভেবেছে বিয়ের সভায় বসবে, তাই এই সব ভাল ভাল জামা কাপড় নিয়ে এসেছে।

নিতাই সে কথার উত্তরে শুধু বলিল—মা তুমি এসব তুলে রাখ, আমি এখন যাই। সে আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না, শ্যামাসুন্দরী কাপড়গুলি গুছাইয়া আবার বাক্সে পুরিয়া রাখিলেন। এই সময় তাঁহার বাড়ীর রকে জুতার খট খট শব্দ শোনা গেল। তিনি আগ্রহে চাহিয়া দেখিলেন, হরবল্লভবাবু আসিতেছেন!

হরবল্লভ আসিয়া বলিলেন—গিন্নি, তোমার ছেলের বিয়ে।

শ্যামাসুন্দরী কি বলিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, হরবল্লভ বলিলেন—আশ্চর্য্য হচ্ছ গিন্নি? তোমার ছেলের বিয়ে!

বিস্মিতা শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—সেকি?

হরবল্লভ বলিলেন—হাঁ তাই, আমি ঠিক করেচি!

শ্যামাসুন্দরীর চখে জল আসিল; নগেনের বিবাহ হইবে, একমাত্র পুত্রের বধু, তাহার হাস্যময় মুখখানি লইয়া তাঁহার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইবে; তিনি তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিজকে ভুলিয়া যাইবেন; এ সুখের কল্পনা একদিন স্বপ্নেও তাঁহার মনে আসিয়াছে কি না কে জানে। তিনি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিতেছিলেন, কিন্তু হরবল্লভ বলিলেন—শোন গিন্নি এই ৩রা তারিখ নগেনের বিয়ে দেও।

"মেয়ে কোথায়! আমার বোকা ছেলে—"

"ক'নে আমার লীলা!"

"সেকি!"

স্বপ্নের ছবি যদি নিদ্রাভঙ্গে বাস্তব মূর্ত্তিধরিয়া সম্মুখে দাঁড়ায় তথাপি লোকে এত বিস্মিত হয় না, শ্যামাসুন্দরী বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া বলিলেন—লীলা! আমার নগেনের সাথে তার বিয়ে দেবেন?

"কেন তার কি হয়েছে?"

"নগেন যে বোকা ?"

"এমন সুন্দর যার প্রাণ, তার মত বোকা যদি পৃথিবীর সবগুলি লোক হত, তবে সংসার স্বর্গ হয়ে উঠিত !"

এর চেয়ে অধিক কি প্রশংসার দরকার হয়, যাহাতে মাতৃহৃদয়ের নিরুদ্ধ আনন্দস্রোত নয়নকোণে বহাইয়া দিয়া থাকে—শ্যামাসুন্দরীর নয়ন দিয়ে দুটি অশ্রুতটিনী বহিয়া গেল।

হরবল্লভ বলিলেন—এই কথা রহিল, গিন্নি, আমি তবে আসি !

শ্যামাসুন্দরী এরূপ অসম্ভব কথাটা ঠিক তখনো ধরিয়া উঠিতে পারিলেন না, বলিলেন—আমি যে একঘরে ?

হরবল্লভ হাসিয়া বলিলেন—আমিইবা হতে কতক্ষণ।

"আমার জন্য আপনি একঘরে হতে যাবেন কেন ?"

"সে অনেক কথা গিন্নি, সে সব বলে কি হবে। জগৎটাকে যা চিনেছি, তাতে এই বুঝেছি, যে যেখানে স্বার্থ, সেইখানে আত্মীয়তা নেই ! তুমি আজ সমাজে বন্ধ, দোষ, তোমার স্বামি একদিন গ্রামবাসীকে অর্থ দিয়ে উপকার করেছিল ! আমিও দেখতে চাই, গিন্নি, এই সমাজ-হীন তোমার বাড়ীতে কার পাত না পড়ে ! ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব করতে পারে, এমন কে আছে এ গ্রামে ঃ আমিত সব জানি, গিন্নি, আমার আর কিছু জানতে বাকী নেই। তোমার যা আছে, তা এ গ্রামের কার আছে।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—তা থেকেও নেই, যাক্ সেজন্য আমি একটুও ভাবিনা, আমার নগেনকে নিয়ে আমি এই ভাবে দিন কাটায়ে যেতে পারলে ধন্য হয়ে যাব।

হরবল্লভ বলিলেন—আচ্ছা গিন্নি দেখি ভগবানের কি ইচ্ছা।

কথাটা পরের দিনই সমস্ত গ্রামে ছড়াইয়া গেল, যে হরবল্লভ তাহার কন্যা লীলাকে নগেনের হাতে দিতেছেন, গ্রামের অনেকে এর কোনও কারণ খুজিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না, গোপীকিশোর কিন্তু স্পষ্ট দেখিলেন, এবার হরবল্লভ যে চাল দিলেন, তাহাতে তাহার অদৃষ্টলক্ষ্মী যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল। হরবল্লভ যদি শ্যামাসুন্দরীর হইয়া দাড়ান, তবে গ্রামের অনেককেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাহার সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিতে হইবে ! কিন্তু তিনি মরিয়া হইয়া একবার শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবেন ঠিক করিয়া ফেলিলেন। চন্দ্রার কাছে আসিয়া বলিলেন—শ্যামা-

সুন্দরীর কাছে যে তোমরা টাকা ধার, সে খত কি তোমাদের বাড়ীই আছে ?

চন্দ্রার নিজের বাক্সে সে খত ছিল, শ্যামাসুন্দরী চন্দ্রার হাতে খতখানি দিয়াছিলেন।

গোপীকিশোর যখন জানিলের চন্দ্রার কাছ হইতে খত পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা শ্যামাসুন্দরীর নাই, তখন তিনি চন্দ্রাকে বলিলেন—স্পষ্ট অস্বীকার পেলেও এখন শ্যামাসুন্দরী কিছুই করতে পারবে না! কথাটা কিন্তু সত্যচরণের মনোমত হইল না, তিনি ভাবিলেন এতবড় অন্যায় ধর্ম্মে সহিবে না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, আভার বিবাহের পরেই সমস্ত সম্পত্তি নগেনের নামে লিখিয়া দিবেন!

গোপীকিশোরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চন্দ্রা ঠিক করিল সে খত আর সত্যচরণের হাতে পর্য্যন্ত না পড়ে তার বন্দোবস্তও শীঘ্রই করিতে হইবে আগুণ আছে, নদীতেও জল আছে ঢের!

গ্রাম্য ২।১ জন বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হরবল্লভ পাল্লা দিয়েছে বটে! একেবারে এক দিন তারিখ ফেলে বসে আছে!

কেহ কেহ বলিলেন—এইবার ভাবালে। হরবল্লভকে একঘরে করাটা ভায়া তত সহজ হবে না, যে মতলব বাজ লোক!

আবার ২।১ জন বলিলেন—এখন কি আর সে হরবল্লভ আছে, সে দাপট আর নেই। যেদিন সে স্কুল করবে শুনেছি, সেই দিনই বুঝেছি, তার মধ্যে আর নেই কিছু। ওদিকে যার মন যায়, তার মাথায় আর মতলব ভাল খেলে না!

একদিন কথায় কথায় একটু হাসিয়া হরবল্লভ গোপীকিশোরকে শুনাইয়া দিলেন, ওজায়গায় স্কুল তুলতে পারি কি না তা দেখতে পাবে, আর মাস খানেকের ভিতর। সত্যচরণ শ্যামাসুন্দরীর টাকা শোধ করে দেবেত ?

গোপীকিশোর তেমনি একটি কাষ্ঠ হাসি দিয়া প্রতিউত্তর করিলেন —টাকা শোধ করবে টাকা দিয়ে, তার জন্য এত কথা কেন ?

উপেক্ষার ভাবে হরবল্লভ বলিয়া গেলেন—তুমি টাকা দেবে নাকি হে! তার কি এত টাকাই ঘরে জমেছে এর মধ্যে ?

(২৩)

তরুর কোল হইতে খোকাকে লইয়া লীলা বলিল—দিদি, একে আমায় দিয়ে দাও না!

তরু হাসিয়া বলিল—তুই একে দিয়ে কি করবি? আর ক'দিন, এর পরে ত এমন একটি কোলে করে আসবি!

লীলা বলিল—ইস, দিদির যে কথা!

দিদি কথার উত্তরে কি বলিলেন তাহা শুনিবার পূর্ব্বেই লীলা দেখিল ভূপেন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে! লীলা ত্রস্তহরিণীর মত ছুট দিতেছিল, তরু তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—একি ভাই, এমনি করে তুই দাদাকে দেখে পালাবি ত, আমাদের এবাড়ী থাকা হয়ে উঠবেনা। এত পরের মত ব্যাবহার।

লীলা তাহার মুখখানি তরুর পিঠের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল—আমার যে লজ্জা করে দিদি!

তরু চাহিয়া দেখিল—ভূপেন ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে।

তরু বলিল—নে উঠ, কত লজ্জা দেখালি!

লীলা মুখ তুলিয়া দেখিল ভূপেন ঘরে নাই! সে বলিল—না দিদি, তোমার দাদা বড় দুষ্ট! এমন ভাবে ঘরে আসা উচিত হয় নাই!

তরু হাসিয়া বলিল—এখন ত ঘরের বাহির হয়ে গেছে, তুই গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে থাক!

লীলা তরুর কোলের উপর খোকাকে বসাইয়া দিয়া; তরুর পৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র কিল মারিয়া দৌড়াইয়া পালাইল।

খোকা মায়ের কোলে বসিয়া বলিল—মা, মাথি—মাথি—

তরু খোকার মুখে চুমো খাইয়া বলিল—হাঁ বাবা, মাসি!

লীলা একবাটি দুধ লইয়া আসিয়া আবার খোকাকে কোলে করিয়া বসিল—তরু তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—দেখে এলি বুঝি টেবিলের উপর বাতি জ্বলেছে কিনা?

লীলা মুখ ভয়ানকগম্ভীর করিয়া বলিল—যাও দিদি, তুমি যদি এমনি আমার সাথে লাগত আর তোমার সাথে কথা কব না। কি বলিস খোকা!

খোকা দুধের বাটি হইতে মুখ তুলিয়া লীলার দিকে চাহিয়া বলিল—মাথি!

লীলা হাসিয়া ফেলিয়া, বলিল—হাঁ, মাসি!

এই সময় হরবল্লভ ঘরে প্রবেশ করিয়া তরুকে বলিলেন—মা তোমার বোনের ত সম্বন্ধ ঠিক করে এসেছি। পরশু বিয়ে!

তরু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—পরশু বিয়ে!

হরবল্লভ বলিলেন—কেন এর মধ্যে সব জোগাড় করতে পারবে না?

লীলা খোকাকে কোলে লইয়া—এক দৌড়ে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল!

দৌড়ের মাথায় লীলা আসিয়া ভুপেনের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

খোকা ডাকিল—মামা, মামা!

লীলা লজ্জায় লাল হইয়া গেল!

ভুপেন বলিল—মা মা!

লীলা সেই মুহুর্ত্তে খোকাকে লইয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল!

খোকা ছোট হাত দুখানি দিয়া লীলার মুখ-খানি ধরিয়া বলিল—মাথি, মা মা!

খোকার মুখে একটি চুম্বন করিয়া লীলা ঈষৎ হাসিয়া ক্রিত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল—দুষ্টু ছেলে!

দুইজনে একসঙ্গে আহারে বসিয়া তরু লীলাকে বলিল—

"আজ দেবীর অধিবাস, কাল দেবীর বিয়ে,
পরশু দেবীকে নিয়ে যাবে ঢোলের বাদ্য দিয়ে!"

লীলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া ফেলিল। তরু বলিল—একি উঠে গেলি যে, ভাত ত পড়ে রইল!

লীলা হাসিয়া বলিল—তুমি খাও। আমি খাবনা আর; দধিমঙ্গল' ত করব আবার!

তরু বলিল—না ভাই, মাখা ভাত ফেলে উঠে গেলি! একি' কে খাবে!

লীলা বলিল—কেউ খাবেনা দিদি, ও ফেলে দিয়ে আসব। তুমি ত খাচ্ছনা—এক গ্রাসও!

তরু ২।৪ টি ভাত নাড়াচাড়া করিয়া উঠিয়া পড়িল!

ভাত ঘরের পিছনের ডোবায় গেল—কল্য প্রভাতে মাছের খাদ্যে পরিণত হইবে।

এই সময় মনসা খোকাকে কোলে লইয়া ভুপেনের কাছে বসিয়া ছিল। ভুপেন শুইয়া শুইয়া কি একটা বই পড়িতেছিল। কোন এক দেশের এক

রাজপুত্র একটা স্বপ্নের পেছু ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া একটা অজানিত দেশে উপস্থিত হইল। সেই দেশে তাহার স্বপ্ন সুন্দরী মিলিয়া গেল। মাঝখানে কোথা হইতে অকস্মাৎ কে আসিয়া একদিন সুন্দরীর কাছে মালা লইয়া দাঁড়াইল। ঠিক এই পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, এমন সময় মনসা ডাকিলেন—ভূপেন!

ভুপেন বইখানি বুকের উপর রাখিয়া মায়ের দিকে চাহিল।

মনসা কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় লীলা ঘরে আসিয়া বলিল—খোকাকে দাওত মা!

লীলা খোকাকে কোলে লইয়া চলিয়া গেল।

ভুপেন জিজ্ঞাসা করিল—ও তোমায় কি বলল?

মনসা বলিলেন—কে লীলা, কি বলবে?

ভুপেন—আজকার ডাকটা যেন নূতন রকম!

মনসা কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভুপেনের মুখের দিকে চাহিলেন।

ভুপেন বলিল—তোমায় মাসীমা ডাকে ত, আজ ডেকেছে মা!

মনসা বলিলেন—তা ডাকলেই বা, মা নেই ওর! লীলা আমার লক্ষ্মী মেয়েটি!

ভুপেন বলিল—মা, কালই আমরা এ বাড়ী ছেড়ে যাব।

মনসা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—সে কিরে?

ভুপেন হাসিয়া বলিল—নইলে মা, তোমার উপর ওরা ভাগ বসাবে।

মনসা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—এই কথা; আমি ভেবেছিলাম বুঝি তোর চাকুরী গিয়াছে। তা তোর মাকে কেউ ভালবাসলেই সে নিয়ে যাবে। তোর যদি ভাই বোন থাকত, তখন? তারা বুঝি মা ডাকত না!

ভুপেন হাসিতে হাসিতে বলিল—বুঝেছি মা, তুমি এক ডাকেই অনেকটা পর হয়ে গেছ!

মনসা হাসিয়া বলিলেন—দুর বোকা!

(২৪)

বিবাহের দিন প্রভাতেই গোপীকিশোর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া এক রকম বুঝিয়া আসিলেন। গ্রামে কমবেশী দুদল হইয়া পড়িয়াছে, হরবল্লভের পক্ষেও লোক নেহাৎ কম হইল না! তিনি আভাষে ইঙ্গিতে অনেককে বুঝাইলেন যে সত্যচরণ লোক ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, হরবল্লভের কন্যার বিবাহে

বাধা দিবেন ! শ্যামাসুন্দরীর কানে কথাটা উঠিতেই তিনি বলিলেন—একি একটা কথা হতে পারে ! হরবল্লভ হাসিয়া বলিলেন—তা হলে বুঝব গিন্নি, সে পাগল হয়েছে ! লোক কিসে আমার চেয়ে সে বেশী হাত করতে পারবে। বাধা দিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—ও সব বাজে কথা !

গ্রাম ভরিয়া একটা আশঙ্কা জাগিয়া রহিল, একটা যে কিছু হইবে, তা সবাই অনুমান করিয়াছিল, তবে জয়ী হবে কে, সে বিষয়ে বেশ সন্দেহ ছিল। কারণ কোন পক্ষই কম নয়।

কলিকাতার বরপক্ষ আসিল ; হরবল্লভ তাহা দাঁড়াইয়া দেখিলেন, সবাই আশ্চর্য্য হইয়া গেল, যে এতক্ষণ হরবল্লভের লোক আসিয়া তাহাদিগকে চড়াও করিল না। তবে কি হরবল্লভ কোন লোক জোগাড় করে নাই ? কেহ কেহ ভাবিলেন, হরবল্লভ একটা শক্ত কিছু মতলব করিয়া বসিয়াছে ! সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দুবাড়ীতে রীতিমত ধুমধাম বলিতে লাগিল। এপক্ষের লোক ও পক্ষের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করে, এই ভাব। চন্দ্রা উপস্থিত আত্মীয় স্বজনের কাছে এক ঘরেদের কাহিনী বলিয়া বলিয়া হয়রান হইয়া পড়িতেছিলেন। সত্যচরণ উদাস ভাবে এদিক সেদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ! বিধুমুখী যখন তখন আসিয়া আভার কাছে দাঁড়াইতেছেন, আর তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছে। এতদিন পরে কন্যা তাঁহার পরের বাড়ী চলিল। তিনি সকলকে বলিতেছেন—ওকে একটু ভাল করিয়া সাজায়ে দিও, সাজিতে গুজিতে ওর বড় সাধ !

থাকিয়া থাকিয়া তিনি শ্যামাসুন্দরীর অভাবটা বড় অনুভব করিতেছেন। তিনি যদি এখন এখানে থাকিতেন, তবে এমনি করিতেন। একবার অবসর পাইয়া সত্যচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়ের বিয়ের মত লাগে তোমার ? আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না। দিদি আজ কত পর।

সত্যচরণ বলিলেন— অদৃষ্ট !

চক্ষু মুছিয়া বিধুমুখী আসিয়া চন্দ্রাকে বলিলেন—দিদি, মেয়ের গায় হলদি দেবার সময় যদি ও বাড়ীর দিদি আসতেন, আমার কত সুখ হত।

চন্দ্রা হাত মুখ নাড়িয়া বলিলেন—তোমার যে কিসে সুখ হয় না হয়, তা তুমি বোঝ, এত লোক রয়েছে তাতে তোমার মন উঠচে না !

বিধুমুখী আসিয়া আভার কাছে বলিলেন—মা ক্ষিধে পেয়েছে তোর !

আভা শুষ্কমুখে উত্তর দিল—না মা !

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিধুমুখী চলিয়া গেলেন।

এত লোকের চক্ষু লুকাইয়া নিতাই আসিয়া একবারে আভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। আভা বলিল—দাদা, এসেছ ?

নিতাই বলিল—তুই বলেছিলি যে দিদি ।

আভা বলিল—এই হার গাছি নিয়ে লীলাকে দাও !

নিতাই বলিল—এইজন্য আসতে বলেছিলি ?

আভা আর কোন কথা বলিল না, নিতাই হার গাছি লইয়া চলিয়া গেল ! নিতাই যখন হার গাছি আনিয়া লীলাকে দিল, তখন তরু লীলাকে সাজাইয়া দিতে ছিল !

লীলা হার গাছি চাহিয়া দেখিতে লাগিল, তরু চমকিত হইয়া বলিল—এ হার কোথায় পেলে দাদা ?

নিতাই বলিল—আমার দিদি দিয়েছে !

তরু কোন কথা বলিতে পারিল না। হার আভার, আভা আজ বিবাহ করিতে যাইতেছে কাহাকে ?

স্ত্রীলোকের পক্ষে এ সহ্য করা একেবারে অসম্ভব। তরু আর ঠিক থাকিতে পারিল না !

যে আভা তাহার দুঃখের কাহিনীতে নিজের অশ্রু মিশাইয়া দিয়াছে, সে আজ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত হৃদয়ের দাবী করিয়া, তাহার সবগুলি শান্তির কুসুম চরণতলে দলিত করিয়া দিতে।

সে তাড়াতাড়ী উঠিয়া চলিয়া গেল। মনসা আসিয়া বলিলেন—একি মেয়ে সাজিয়ে দিতে দিতে, তরু গেল কোথা ! না হয় খোকাকেই তুই ধর। আমি ওকে সাজিয়ে দেই !

মনসা খোকাকে নামাইয়া দিতেই তরু আসিয়া তাহাকে কোলে লইয়া চলিয়া গেল। মনসা লীলার কাপড়খানি কুচাইয়া দিতে লাগিলেন। বাহিরে হরবল্লভের গলা শোনা গেল—কই সব জোগাড় কর, লগ্নের বেশী বাকী নাই !

এই সময়—ত্রস্তভাবে লীলা আসিয়া বলিল—দিদির বড় অসুখ।

* * * * *

এদিকে বিধুমুখী আভাকে বিবাহের চেলী পরাইয়া কাজল চন্দনে সাজাইয়া দিয়া কোলে লইয়া বসিয়া বলিলেন মা !

আভা মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—কি মা!

"একটা কথা বলবি?"

"কি মা?"

"তুই এমন হয়ে গেলি কেন?"

"কেমন হয়েছি, মা!"

তিনি কি করিয়া বুঝাইবেন, আভা কেমন হইয়া গিয়াছে, এই পর্য্যন্ত তিনি বুঝিতেছেন, আভা, আর আগেকার মতন নাই!

মায়ের সজল নয়ন যুগলের দিকে চাহিয়া আভা বলিল কেমন হয়েছি মা?

বিধুমুখী কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—তোর চোখ দুটি ছল ছল, মুখে হাসি নাই, বিয়ের দিনে লোকের কেমন মুখখানি হাসি ভরা থাকে। এ বিয়ে তোর কি—

আভা মাকে বাধা দিয়া বলিল, সে কথা এখন কেন মা?

কাঁদিয়া বিধুমুখী বলিলেন—সে কথা কেন? বলিস কিরে! বিয়ে দিয়ে যদি তোর হাসি মুখই দেখতে না পারি তবে—

আভা বাধা দিয়া বলিল—তুমি চুপ কর মা!

বিধুমুখী আভার মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আভার সুন্দর মুখখানি মলিন হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন এ কথা আগে বলিসনি কেন?

"কি মা?"

বিধুমুখী কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন এমন সর্ব্বনাশ তুই কেন করলি আভা!

আভা চুপ করিয়া রহিল।

বিধুমুখী আবার বলিলেন কিরণের আগের বউ—

আভা বাধা দিয়া বলিল আমি জানি মা, সে আমার সই তরু!

বিধুমুখী বলিলেন 'তোর সই?

আভা কোন কথা বলিল না!

বিধুমুখী কন্যাকে এমন ভাবে আরও বুকে চাপিয়া ধরিলেন, যেন তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে মিশাইয়া দিতে চাহেন।

আভা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিধুমুখী বলিলেন—জেনে শুনে তুই এমন ভাবে আত্মবলি দিলি, আভা, মা!

আভার নয়ন-জলে কাজল ভাসিয়া যাইতেছিল, সে বলিল মা!

বিধুমুখী বলিলেন—মায়ের সঙ্গে এত তোর অভিমান! এমন সেজেগুজে, নিজেকে বলি দিতে যেতেছিস!

আভা মায়ের বুকে কাঁদিয়া পড়িল; সে দুই হাত দিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল। বিধুমুখী বলিয়া উঠিলেন উঃ!

একাল সেকাল

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(২৩)

সতীশের গলার উচ্চ শব্দে বাহিরে পা বাড়াইয়া শোভা দেখিল, বেলা অনেকখানি হইয়াছে, তাহাদের ছাদ গলাইয়া রোদ প্রকাণ্ড উঠানখানার প্রায় আধখানা ঘেড়িয়া দাঁড়াইয়াছে। সারারাত্রি অনিদ্রার পরে ভোরের বেলায় ঘুমাইয়া জাগিতে এতটা গৌণ হইয়াছে বলিয়া শোভা মনে মনে লজ্জিত হইল, গাটা কেমন ঝমঝম্ করিতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া যেন একটা কিসের অভাব ও ক্ষুদ্র বেদনা অনুভব করিয়া সে সতীশের দিকে দৃষ্টি করিয়াই মুখ নামাইয়া লইল, কল্যকার ঘটনাগুলি যেন জড়ীভূত হইয়া তাহার মুখচোখ আকড়িয়া ধরিল। প্রভাত-রৌদ্রের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক পা সরিয়া দাঁড়াইতেই সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—“তোর শরীরটার কি ভাল নেই রে শোভা?”

শোভা মুখ তুলিয়া চাহিল, গ্লানিজড়িত স্বরে উত্তর করিল—“না ভালই আছি, কাল রাত্রে কেমন ঘুম হয়নি, তাতেই হয়ত এম্নি দেখাচ্ছে।”

“ঘুম হয়নি! কেন বোন্।”

এই কেনর উত্তর শোভা দিয়া উঠিতে পারিল না, মৃদু হাস্যে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা নীচু করিল, এমন একটা খেয়ালের কথা মনে হইতেই তাহার মুখচোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—“ক’দিন এখানে ছিলাম না, তোদের না জানি কতই অসুবিধা হয়েছে।”

"না দাদাবাবু!" বলিয়া শোভা লজ্জিত হইয়া থামিল। অসুবিধা যে হয় নাই, সে কথাটা যতই সত্য হউক, তবু যেন তাহা বলা চলে না। এবার অন্য কথা পাড়িল—"তুমি কতকক্ষণ এয়েছ, এখনও হাত মুখ ধোওনি না? কেন বেয়ারাগুলো কি কচ্ছে, জল দিয়ে যেতে পারে নি, এই রামসিং, বাবুর জুতাজামা খুলে নে, কেন তোদের কি কোন আক্কেল নেই, ঠাকুরকে বলে আয়, শীগ্গীর করে চা-বিস্কুট এনে দেয়।"

রামসিং তাড়াতাড়ি জামা খুলিতে যাইতেই সতীশ বাধা দিয়া বলিল—"থাক. ও আমি নিজে পারব। তুই বরং একবার নির্ম্মলবাবুকে ডেকে আন, দুদিন শরীরটা"—

শোভার বুক কাঁপিতেছিল, তবু সে জোর করিয়া ধরিল, বলিল—"না তিনিত এখানে নেই।"

"এখানে নেই, নির্ম্মলবাবু কি তা হলে বাড়ী গেছেন?"

"হাঁ!" বলিয়া শোভা নীরব হইল, খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—"শরীর ভাল নেই, তবে ত যে হ'ক একজনকে দেখাতেই হচ্ছে—ঐ।"

নির্ম্মল বাবু নেইত থাক এখন, অত তাড়াতাড়ি কর্ত্তে হবে না, তেমন ত কিছু নয়।" বলিয়া সতীশ ধীরে ধীরে পিসীর ঘরে ঢুকিল. শোভা মনে মনে বলিতে লাগিল—"নির্ম্মলবাবু এখানে নেই, এটা কি এমনই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দাদাবাবুও থমকে গেলেন, কেন তাকেত যে এখানে থাক্‌তেই হবে তার মানে।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছাতের রেলিং ধরিয়া শোভা আকাশের পানে তাকাইয়া ছিল। মনটা আজ তাহার কোন রকমেই স্বস্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। নিজে ইচ্ছা করিয়াই বাগানপার্টিতে উপস্থিত না হইয়া সে একটা মহা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে, লজ্জায় কাহাকেও মুখ দেখাইবে সে শক্তি তাহার ছিল না, অথচ এমন একটা ঘটনা যে ঘটিল, তাহার জন্য এমন কোন কারণই যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, যাহা মানুষের নিকট বলা দূরের কথা, মুখেও আনিতে পারে। নিমন্ত্রিত সকলেই আসিয়াছিল, একা নির্ম্মল আসে নাই, তারি জন্যে এতগুলো লোককে উপেক্ষা করিবার শক্তি তাহার কি আছে, অপমানে তাহার এত আয়োজন যে পণ্ড হইয়াছে, সে কথা বুঝিতেও শোভার বাকি ছিল না। নানা চিন্তায় সান্ধ্য রক্তাচ্ছটায় রঞ্জিত নদীগর্ভের মতই তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিতেছিল। দূর হইতে পিসী ডাকিলেন—"শোভা!"

শোভার কাণে সে স্বর পৌঁছিছিল না, সে যেন আকুল প্রাণের সান্ত্বনার জন্য ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিল। পিসী আসিয়া পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন, কোমল স্বরে বলিলেন—"সতীশ যে তোর বের সম্বন্ধ ঠিক করে এসেছে শোভা।"

বিবাহের সম্বন্ধ, শোভা যেন নিজের অজ্ঞাতে আৎকাইয়া উঠিল, তাহার লাল মুখ সাদা হইয়া গেল। পিসী আবার বলিলেন—"সতীশ বল্লে, আস্‌ছে মাসেই বে হবে।"

"আস্‌ছে মাসেই!" বলিয়া শোভা চকিতা হরিণীর মত পিসীর দিকে দৃষ্টি করিল। পিসী বলিলেন—"মস্ত জমিদারের ছেলে।"

জমিদারের ছেলে শুনিয়া শোভার বিকৃত মন যেন দ্বিগুণ বিকৃতিতে ভরিয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল—"আমার মতামত জান্‌বার অবকাশও হ'ল না পিসী।"

"কেন এ যে ঠিক তোর মত মতটিই জুটেছে। টাকাকড়িও কিছু নেবে না।"

"তাই কি তবে মানুষও পৃথিবীতে আছে।" বলিয়া শোভা একটা মুক্তির শ্বাস ত্যাগ করিতে গিয়া মধ্য পথে বাধা পাইল, নিজের গর্ব্বও শিক্ষার অনুকূল পাত্র উপস্থিত জানিয়া যে আনন্দের আভাসটুকু তাহার হৃদয়ের কোণে উঁকি দিতেছিল, নির্ম্মলের প্রসারিত প্রতিপত্তিটুকু যেন তাহাকে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া দাঁড়াইল। শোভা আর উত্তর করিতে পারিল না। পিসী জোর দিয়া আবারও বলিলেন—"ঠিক যেমনটি চেয়ে ছিলি, তেমনটি, কোনখানে খুঁত নেই, স্বভাবও নাকি অতি সুন্দর, সতীশের কাছে যা শুন্‌লুম, তাতে ত ভাগ্য না মেনে নিয়ে উপায় নেই।"

গর্ব্বে আঘাত করিল। শোভা যাহাকে বরমাল্য প্রদান করিবে, পৃথিবীতে সে ব্যক্তিই ভাগ্যবান্ বলিয়া পরিচিত হইবে, তাহার পরিবর্ত্তে, সামান্য একটা হৃদয়ের বিনিময়ে সে আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিতে যাইবে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—"না পিসীমা, ও এখন হবে না, তুমি দাদাবাবুকে বল, সে যেন ভাগ্য মনে করে ভাবনাকে এনে হাজির করে না।" বলিয়া শোভা আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না, গৃহে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর বই খুলিয়া বসিল। ধীরে ধীরে তাহার আত্মা অবশ হইয়া আসিতেছিল। শিথিলীভূত হস্ত হইতে পুস্তকখানা পড়িয়া গেল। নির্ম্মলের লেখা একখানা

চিঠী কাল অক্ষরগুলি লইয়া শোভার সৌন্দর্য্য মণ্ডিত আত্মাকে যেন গ্রাস করিয়া ধরিল। মুহূর্ত্ত জড়ের মত বসিয়া থাকিয়া শোভা চোখ খুলিল, একটা অস্পষ্ট অনুভূতি যেন অভিব্যক্তির ছায়া লইয়া চোখের গোড়ায় দাঁড়াইল। যে চিঠীখানা এক সময়ে সে গ্রাহ্যেও আনে নাই, আজ যেন তাহাই তাহার পরম আদরের আরামপ্রদ হইয়া উঠিল। কমাস আগে এক দিন মাথার বেদনায় অধীর হইয়া নির্ম্মল তাহাকে এই সামান্য চিঠীখানা দিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। শোভার আজ কত কথা মনে পড়িতেছিল। স্বপ্ন, মায়া বা মতিভ্রম চিন্তার মুখে তাহা শোভা স্থির করিতে পারিল না। অনেক দিনের সেই কোমল করুণ স্বর যেন তাহার কাণের কাছে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল বলিয়াছিল—"এখানেত আপনি ছাড়া আমার বল্‌তে আর কেউ নাই।"

শোভা কি উত্তর করিয়াছিল, শত চেষ্টাতেও আজ তাহা সে মনে করিতে পারিল না। কেবল মনে পড়িল, শোভার অনুযোগের উত্তরে নির্ম্মল আবারও বলিয়াছিল—"অনুযোগ আপনি কর্ত্তে পারেন, তার আগে কিন্তু এতটুকুও আপনাকে ভাব্‌তে হবে, ঘরে থাকৃতে পেলে কেউ পথে দাঁড়ায় না, যার মাবাপ রয়েছেন, স্ত্রী রয়েছে, সে যে কোন্ দুঃখে এমনই দুর্ভাগ্য জীবন বরণ করে লয়েছে, তার অবশ্য একটা কারণ আছে।"

ইহার উত্তরে শোভা আর প্রতিবাদ করিতে পারে নাই। আস্তে আস্তে সে নির্ম্মলের কপালে ওডিকোলন দিতেছিল। নির্ম্মল আয়াসের দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সঙ্কুচিত স্বরে বলিয়াছিল—"এমন যত্ন আমার এই প্রথম, উপযুক্ত সঙ্গিনী না পেলে পৃথিবীতে দুঃখ রাখ্‌বার যে যায়গা থাকে না।"

তারপর কি হইয়াছিল, তাহা আর শোভা মনে করিতে পারিল না, পত্রখানা একবার দুইবার তিনবার পড়িয়াও তাহার আশা মিটিল না, সহসা তাহার মনে হইল, সেই নির্ম্মল এমন করিয়া চলিয়া গেল, এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল। নানা এতে তাহার বিন্দুমাত্র অপরাধ থাকিতে পারে না, ঐ শশাঙ্কের কাজ, হয়ত সে জোড় করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—"ঠিক তাই, জোড়করেই ধরে নিয়ে গেল, নৈলে কুসুম-কোমল প্রাণ ত এমন কঠোর হতে পারে না। নিজে ধরা দিতে এসে কে এমন ছুটে পালায়।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে শোভার স্বভাবজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে এবার অতিষ্ঠ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, চঞ্চল চরণে গৃহভিত্তি মুখরিত করিয়া বলিয়া ফেলিল

—"কে ধরা দিতে আস্‌বে, নানা সে কি সম্ভব, কাকে ধরা দিবে সে, আমি যে তার ধরাধরির বাইরে, সে ত অন্যের।"

অন্যের বলিতে শোভার বুকে শূল-বেদনা বাজিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল, অস্ফুট কণ্ঠে বলিল —"হ'ক যার ইচ্ছে, কিন্তু তাকে ভালবাস্‌বার অধিকার আমার আছে। পরের গাছের ফোটা ফুল, তুলে আন্‌তে গেলে নয় চোর বলে ধর্‌বে, কিন্তু দূর থেকে ঘ্রাণ নেব, তাতে মানা কর্‌বার অধিকারত কারুর নেই।"

(২৪)

মুহ্যমান অবস্থায় শোভার কতক্ষণ কাটিত তাহার ঠিকানা ছিল না। সতীশের উচ্চ শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া দেখিল, সতীশ আর একটি ভদ্রলোক লইয়া তাহার অপেক্ষা করিতেছে। শোভা আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিল—"ইহার নাম পুলিন-বিহারী, বাড়ী আগে আমাদের দেশেই ছিল, এখন পশ্চিমের বাড়ীতেই মা, ভগিনী ও ছেলে নিয়ে বাস কর্চ্ছেন। এখনও দেশে এদের যথেষ্ট খ্যাতি, প্রতিপত্তি আছে।"

শোভার আর শুনিতে ইচ্ছা ছিল না, ভ্রাতার লম্বাচওড়া বক্তৃতায় প্রারম্ভেই সে বুঝিয়াছিল, ইহারই কোন নিকট আত্মীয়ের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। মানুষটীর চেহারা দেখিয়া কিন্তু তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া উপায় ছিল না, শোভা আর নয়নে আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পুলিনবিহারী শান্ত সংযত গলায় জিজ্ঞাসা করি-লেন—"এই আপনার ভগিনী, তা একে আর কষ্ট দেবার দরকার কি ছিল, কথাবার্ত্তা যখন পাকাপাকি হয়ে গেছে, তখন হয়ে গেছে বল্‌লেই হয়।"

সতীশও সহজ গলায়ই উত্তর করিল—"সে কথা আপনার ঠিক, তবু কি জানেন, আজ কালের দিনে মেয়ে দেখাটা একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

শোভা ঘাড় হেট করিল, পুলিনবিহারী বলিলেন—"নূতন কিছুই পুরণোকে বাদ দিয়ে চলে না, তাই আমি এতটা পসন্দ করি না, তা ছাড়া মানুষকে বিশ্বাস না করে যখন এক পা বাড়াবার যো নেই, তখন আপনার

কথাকেই আমরা যথেষ্ট মনে করেছি। আর এত দিব্যি মেয়ে, এমন মেয়েকে ঘরের বৌ কর্ত্তে কার না সাধ যায়।"

পুলীনবিহারী একটা কোচের উপর বসিয়াছিলেন, পাশে যে স্থানটুকু ছিল, তাহাই অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া শোভাকে বলিলেন—"দাঁড়িয়ে কেন মা, বস, তোমার নামটি কি ?"

শোভা বসিল বটে, কিন্তু উত্তর করিতে পারিল না, ঘাড় বাকাইয়া আর এক দিকে চাহিয়া রহিল! হৃদয়যুদ্ধে তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই বুড়ো ছেলেকে লজ্জা কি মা, নামটি বল।"

প্রত্যুত্তরে শোভা অতি কষ্টে বলিল—"শোভা।"

ধরা গলার সঙ্ক্ষিপ্ত উত্তর বৃদ্ধের লক্ষ্য এড়াইল না, তিনি মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া মনে মনে কি একটা অনুমান করিয়া লইয়া মৃদু স্বরে বলিলেন—"মা, কিছু ভেব না. ভগবানের প্রার্থনায় তোমরা সুখী হবে, সত্য ও ধর্ম্ম বজায় রেখে চল, কোন দুঃখ থাকবে না।"

শোভা আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, ছমাস পূর্ব্বেও সে এই বিবাহ ব্যাপারটাকে আর কোন কারণে না হউক,এই বৃদ্ধের কথাতেই একেবাক্যে স্বীকার করিতে পারিত, এই স্নেহপরায়ণ বৃদ্ধের পুত্রের করে আত্মসমর্পণ করা শোভার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না, কিন্তু এই কয় মাসে তাহার এমনই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, ইহার পুত্র কেন, এত বড় পৃথিবীর এত কোটি লোকের মধ্যে একটি লোককেও সে যেন ইচ্ছায় বরমাল্য প্রদান করিতে পারে না। অশ্রু দমন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে ঘরে আসিয়া সে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু নিদ্রা তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কাছ দিয়া ঘেষিল না। আজ যে দুর্ভাবনাটা তাহার মনে পুনঃ পুনঃ খোচা দিতেছিল, সে ভাবিয়া পাইল না, তাহাতে সত্য বস্তু কিছু আছে কি না। এই দারুণ সমস্যার সমাধান কোথায় গেলে কে করিয়া দিবে।

তাহার বাপ নাই, মাও নাই, আপনার বলিতে একমাত্র ভ্রাতা সতীশ, সেই বন্ধু, সেই বান্ধব, সেই পিতা মাতার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অথচ সেই সতীশের এত আগ্রহ অবহেলা করিলে তাহাকে যে গুরু আঘাত করা হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কোন্ শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে তাঁহার মন পিসীর বিরুদ্ধে সতীশের বিরুদ্ধে নিজের

কল্যাণের বিরুদ্ধে ধাওয়া করিয়া চলিয়াছে, তাহাও শোভার চোখের উপর জলের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। তবু শোভা আপনাকে বোঝাইতে পারে না, নির্ম্মলকে ত্যাগ করিতেই হইবে, একথাটা তাহার নিকট যতই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, ততই যেন তাহার মন নির্ম্মলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। অথচ যেই নির্ম্মলের কথা মনে হইতে সে ভাবিয়াও পাইল না, এত দিন কি মাধুর্য্যে সে আত্মহারা হইয়া তাহারই চিন্তা করিয়াছে। বরঞ্চ তাহাকে একটা অত্যন্ত পুরণ বাসি জিনিষ মনে করিয়া বিস্বাদ বোধ করাই সঙ্গত ও একান্ত আবশ্যক ছিল. এই চিন্তা মনে উঠিতেই শোভার চুলের গোড়া হইতে পায়ের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। শোভা নিজের মনেই বকিতে লাগিল—"দাদাবাবুর কথাতেই মত দিতে হচ্ছে, হাতের কড়ি দূরে ঠেলে ফেলে নিজের অকল্যাণ ডেকে আন্‌ব, এমন আহাম্মুকই আমি কেন হতে যাই। কিন্তু কে এ বিপ্লবের সৃষ্টি কল্লে, শিক্ষা কি?"

এদিকটা দিয়া তাহার মোটেও সুবিধা হইল না। এক বিন্দু অগ্নি বারুদে পড়িয়া যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে, এ যে তেমনি বিপ্লব, আর তার কারণ নিজে নির্ম্মল, সেই ত নারীহৃদয়ে এই প্রচণ্ড বহ্নির সৃষ্টি করিয়াছে। শোভা আর ভাবিতে পারিল না, "উঃ" করিয়া বুক চাপিয়া ধরিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ছিঃ এমন করে আর আমায় জালিয়ে মের না যেন, ভুল করে যদি তোমার দিকে ঝুঁকেই পরে থাকি, তাতেই কি দোষ করেছি। দুদিনেই তোমায় আপন বলে মনে করেছি, তুমিই নয়ত আমার এই উপকারটুকু কর, আমাকে ভুল হতে ছাড়িয়ে আন।"

(২৪)

অল্প শিক্ষার গুণটুকু বাদ দিয়া সংক্রামতার হাত হইতে উদ্ধার হইতে পারা যত শক্ত বা সহজ হউক, শোভা তাহা পারিয়া উঠিল না, হৃদয়ের স্বাধীন বৃত্তিকে এক কথায় পরাধীন করিবে এতটা ধৈর্য্য তাহার ছিল না, থাকিবার আবশ্যকতা কখনও সে মনেও করিত না। শোভা নির্ম্মলকে চিঠী লিখিল, চিঠীখানা খামে পূরিয়া একটা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিল—"এ যে আমার আকাশ নিয়ে খেলা, শূন্যগর্ভ মাটি নিয়ে নাড়াচাড়ি, কোন দিকেই ত কিছু নেই।" বলিয়া সে বেয়ারাকে ডাকিতেই সতীশ আসিয়া বলিল—"পুলীন-

বাবু যে তোকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছেন, খোকা ? এখনও হাত মুখ ধুইস নি !"

শোভার শ্রান্ত মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তবু ভ্রাতার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া সে অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরেই বলিল—"আশীর্ব্বাদ কর্তে এসেছেন, কাকে, কৈ আমিত তাকে তেমন কোন কথা বলিনি ?"

সতীশের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, শোভার মনোমত পাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়া সে যে এ বিষয়ে দ্বিধাহীন হইয়া কাল রাত্রে শান্তিতে নিদ্রা গিয়াছে। দ্বিধা তাহার ভয়ও ছিল না, ভাবনাও ছিল না, অকস্মাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির মত সে ম্লানমুখে মৌন রহিল, শোভার প্রাণের মধ্যেও ছাৎ করিয়া উঠিল, সতীশকে কষ্ট দিতে গিয়া তাহারও সোয়াস্তি ছিল না, স্বর খাট করিয়া বলিল—"দুদিন নয়ত সবুরই কর, এত তাড়াহুড় কেন ?"

"তিনি যে আর থাকতে পাচ্ছে'ন না ?"

শোভা চাহিয়া রহিল, সতীশ বলিল—"দেশে তাঁর জরুরি কাজ রয়েছে, একমাত্র আমার অনুরোধেই দুদিনের জন্যে—"

অনুরোধ কথাটায় শোভা আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বাধা দিয়া বলিল—"থুথু ফেলে এসে এসব কাজ হয় না দাদাবাবু, আর জানত অনুরোধ উপরোধের ধার আমি কোন দিনই ধারি না।"

সতীশও যেন একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, অপেক্ষাকৃত কর্কশ কণ্ঠেই বলিল—"যেচে এসে পা ধরে কেউ যে কবুবে, এমন আশাও ত আমি রাখি না শোভা !"

শোভা নরম হইল, সহসা সতীশের দৃষ্টি তাহার হাতের খামখানার উপর পড়িতেই সতীশ ঘামাইয়া উঠিল। নির্ম্মলের নাম লেখা খামখানা যেন রহস্যের যবনিকা সরাইয়া লইল, নিরুপায়ে চিন্তায় ক্ষোভে সতীশের মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, কাতর কণ্ঠে বলিল—"শোভা, তুই আমায় লজ্জা দিস্‌নি বোন, যা আমি করেছি, তাতেই মত দে জানিস ত আমি তোর অনিষ্টের জন্য কিছু করি নি !"

শোভা মুহূর্ত্ত ভাবিল, হাতের চিঠীখানা গবাক্ষ পথে ছুড়িয়া ফেলিয়া গাঢ়কণ্ঠে বলিল—"তাই যাও দাদাবাবু, তুমি বাইরে গিয়ে বস, আমি কাপড় ছেড়ে যাচ্ছি !"

মিনিট পনর পরে শোভা যখন বাহিরের হলঘরে পুলিনবিহারীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার চেহারা দেখিয়া সতীশের মন কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধ পুলীনবিহারীও সেই নিশ্চল চিত্রার্পিত রূপপরাকাষ্ঠাগঠিত প্রতিমাখানিতে প্রাণ আছে কি নাই বুঝিতে না পারিয়া চমকিয়া উঠিলেন, ধরা গলায় অতি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ বেতে তোমার কি তেমন মত নেই মা?"

শোভা স্থাণুর মত দাঁড়াইয়াছিল, উত্তর না পাইয়া পুলীনবিহারী আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন—"মত যদি তোমার নাই থাকেত আমায় বলতে লজ্জা কর না মা, বলেছিত, আমি তোমার ছেলে, যাতে তোমার কষ্ট হবে, তেমন কাজত করব না?"

শোভা তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল, তেজ গর্ব্ব অভিমান সরাইয়া দিয়া এই বৃদ্ধের বাৎসল্যপূর্ণ বাক্যগুলি যেন তাহার চিত্তকে পবিত্রতার শান্তির আধার করিয়া তুলিল, শোভার চোখ বাহিয়া জল আসিতেছিল, বড় আদরের মেয়েটির মত পুলীনবিহারী শোভার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন—"এ কিছু কথার কথা নয়, জীবন নিয়ে বিষয়, সতীশ ছেলে মানুষ, না বুঝেই যদি কথা দিয়ে থাকেত, তাতে তুমি ভয় পেয় না, আমি কষাই নই, তার কোন দোষই আমি ধরব না?"

শোভার ইচ্ছা যাইতেছিল, এই বৃদ্ধের পায়ে লোটাইয়া পড়ে, আকুল কণ্ঠে করুণা ভিক্ষা করিয়া লয়, আপনি আমায় পায়ে স্থান দিন, একটা পথ দেখিয়ে দিয়ো আমার বিভিন্নপথগামী মনের গতি পরিবর্ত্তন করে দিন। কিন্তু এতটা তাহার সাহসে কুলাইল না। স্পর্শমণির স্পর্শে তাহার গর্ব্ব রহিল না, তেজস্বিতা লুকাইয়া গেল, এত বড় সে মুহূর্ত্তে এতটুকু হইয়া গেল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিল—"আপনার আশীর্ব্বাদ লাভ কর্ত্তেত কারু অরুচি হতে পারে না।"

সতীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, নির্ম্মলের ও শোভার পরস্পর ঘনিষ্ঠতায় তাহার মনের কোণের যে চিন্তামেঘখানা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল, শোভার বিবাহ হইয়া গেলেই সে যেন সেই গাঢ় মেঘের ঝড়ঝাপটা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, অন্য দিকে এই ভগিনীর একটা গতি করিতে পারিলে সংসারের ভারও বার আনা রকমের হাল্কা হইয়া যায়। পুলীনবিহারীকে লক্ষ্য করিয়া সে সহজ স্বরেই বলিল—"কিছু মনে করবে না পুলীনবাবু, ওকে যে ঐ রকম দেখাচ্ছে, তার হয়ত আর কোন কারণ থাকবে। বেতে

অমত কেন হতে যাবে বলুন ত, অমন পাত্র, আপনার মত শ্বশুর, এ যে অনেক ভাগ্যে জোটে।”

পুলীনবিহারী সে কথায় কাণ দিলেন না, শোভার হাতখানা ধরিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন—“বস মা, বসে বেশ ভাল করে ভেবে দেখ, একে তোমার মন এগোয় কি না, না ভেবে কারু কথাতে বা মন রাখতে গিয়ে কিছু জবাব দিও না যেন।”

পুতুলের মত শোভা পুলীনবিহারীর পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল; চিন্তা যে তাহার কতখানি তাহাত সে আর কাহাকেও বুঝাইতে পারে না, তাহার মন যে থাকিয়া থাকিয়া অস্পৃশ্য দৃষ্টির বাহিরে নির্ম্মলের আহ্বানে আলোড়িত হইয়া উঠিতেছিল। পুলীনবিহারী পূর্ব্ব ভাবেই বলিলেন—“আমি নয়ত আজ ফিরেই যাচ্ছি, এই একটা দিনে তুমি তোমার কর্ত্তব্য ঠিক করে নাও মা, কাল সকালে আবার আস্‌ব, বলিতেছি, তুমি যা বল্‌বে, আমি তাতে অন্যথা করব না।”

সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল. বলিল—“নানা অমন কাজটি আপনি কর্‌বেন না, আজ শুভদিন, আশীর্ব্বাদটা দেরেই যান!”

“আমার মার মত হলেই শুভদিন জুটবে সতীশ, তার জন্যে তুমি ভেব না, তবে আজ আসি মা।” বলিয়া পুলিনবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইতেছিলেন, শোভা অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—“আপনার যে বড় ক্ষতি হবে।”

“ক্ষতি হবে” বলিয়া পুলিনবিহারী হাসিলেন, হাসিয়াই বলিলেন—“ক্ষতিটাকি এতই বেশী মা যে, একদিনের একটু ক্ষতির জন্য দুই দুইটা জীবনের দিকে তাকাব না, আর সে ক্ষতিবৃদ্ধিই কার জন্যে, লোকে ছেলেমেয়ের জন্যইত ক্ষতি বৃদ্ধির চিন্তা করে, তাদের সুখই যে সবার আগে, আমি কি একবিন্দু ক্ষতির জন্য তোমাদের সুখে দুঃখের চিন্তা না করে পারি, না পারে কেউ, তোমার মা বাপ নেই মা, তারা থাকলে আজ কি কর্ত্তেন, সামান্য ক্ষতির কথাই ভাবতেন, না তোমার যাতে মঙ্গল হয় তাই কর্ত্তেন।” বলিয়া তিনি পা বাড়াইতেই শোভা দ্রুতপদে উঠিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিল, অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল। “নানা আপনি ফিরে যাবেন না, ওতেই যে অমঙ্গল হবে, আসুন, আমি আমার মন ঠিক করেছি, আপনি আশীর্ব্বাদ করে যান, আপনার এই আশীর্ব্বাদ যেন আমার মনের কালি পুছে ফেল্‌তে পারি।”

(২৫)

রমার ক্ষুদ্র সংসারটি মেঘপালিত পর্ব্বততটিনীর মত জোয়ার ভাটার টানের বাহিরে থাকিয়া ধীরে ধীরে নিজের মনে চলিয়া যাইতে ছিল, হ্রাস-বৃদ্ধিশূন্য অনাবিলতার হাতমুক্ত এই সংসারে বিমলা ছিল, রমার প্রাণের অধিক। বাল্যকালে সে যখন বধূবেশে এ গৃহে প্রবেশ করিল, তখন তাহার শাশুড়ী বাচিয়া ছিলেন, অনতিকাল পরে কালের করাল গ্রাসে পতিতা মুমূর্ষু বৃদ্ধার সেই কাতরোক্তি রমার এখনও মনে পড়ে, বৃদ্ধা পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি মা সুখে থাকবে, আমার এই অভাগিনী মেয়ে-টীকে দেখ, বিমলার কিন্তু তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই, ওকে সৎপাত্রে দিতে চেষ্টা কর।"

রমা সে বাক্য প্রতিপালনের ত্রুটি করে নাই, ঠিক ছোট বোনটির মত এই বালিকাকে সে প্রতিপালন করিয়া এতখানি বড় করিয়াছিল, তারপর স্বামীকে বলিয়া হাতেপাতে যাহা পাইয়াছে, তাহার সব শেষ করিয়া বড় ঘরে নির্ম্মলের হাতে অর্পণ করিয়া সে যেন একটা মহাদায় হইতে মুক্ত হইয়া-ছিল। কিন্তু এই মুক্তির উপর বিমলা ও নির্ম্মলের মনের অভাব যখন একটা প্রকাণ্ড বিদ্রোহ লইয়া দাঁড়াইল, তখন সে মুষড়িয়া পড়িতেছিল। তাহার সারা বিশ্বের সেরা সাজান সংসার ও মনের উপর যেন সহসা একটা প্রকাণ্ড টান পড়িল। স্রোতের টানে নদী উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, রমার হৃদয় নড়িয়া গেল। তার পর আবার শশাঙ্ক আসিয়া যখন বলিল—"না বৌদি, বিমলার বরাতে যে সুখ আছে, তেমন ত মনে কর্ত্তে পারি না।"

তখন রমার মন দোলায়িত হইয়া উঠিল, শশাঙ্কের মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতে তাহার সাহসে কুলাইল না, শশাঙ্ক বলিল—"কে একটা শোভা, জাতেত তাকে হিন্দু বলবার যো নেই, নির্ম্মলের আড্ডা হয়েছে তারি ঘরে।"

সূচ ফুটিলে মানুষ যেমন উহুঃ করিয়া উঠে, রমাও ঠিক তেমনি উহুঃ করিয়া বসিয়া পড়িল, মনে মনে বলিল—"যা ভাবলুম, তাই হল, বিমলাত এমন আঘাত বুকে করে বাচবে না।"

শশাঙ্ক সেই ছাইসাদা মুখের দিকে তাকাইয়া থমকিয়া গেল, ধীরে ধীরে বলিল—"অনেক করে তবে এনেছি, দেখ যদি ধরে বেধে রাখতে পার, ফের কলকাতা গেলে, আর যে তার পাত্তা পাওয়া যাবে না, সে আমি তোমায় খাটিই বলতে পারি।"

রমা একটি কথাও বলিতে পারিল না, তাহার সমুদ্রের মত শান্ত হৃদয় বর্ষার প্রকাণ্ড বাত্যায় আলোড়িত হইয়া উঠিল।—"ভাল করে ভেবে যা হয় কর বৌদি।" বলিয়া শশাঙ্ক বিদায় হইল. রমা ভাবিতে বসিল, দিন পনর পরে বিমলার চিঠী পাইয়া তাহার যতটুকু আশা ছিল, তাহাও লোপ পাইয়া গেল। গৃহের কোণের তৈলহীন দীপশিখাটা সামান্য বাতাসেই নিবিয়া গেল। নির্ম্মল বাড়ীতে, এ অবস্থায় সামান্য কষ্টে বিমলা কিছু তাহাকে লইয়া আসিতে বলেন নাই। কর্ত্তব্য ঠিক করিতে যে কয় দিন সময় গেল, নির্ম্মলের তত দিনও সহ্য হইল না। সে আসিয়া রমাকে নিষেধ করিয়া বলিল—"না বৌদি, তাকে আর আনতে যেতে হবে না, তার থাক্‌বার সুবিধে করে দিয়ে আমিই যে পালিয়েছি।"

রমা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই সুবিধাকে বরণ করিয়া লইবে. তেমন মেয়েত বিমলা নহে, অনির্দ্দেশ্য ভবিষ্যৎবিভীষিকা রমার বাক্‌রোধ করিয়া দিল। নির্ম্মল বলিল—"বায়গা কারু করে দিতে পারুন না, তা ত জানি তা বলে তাড়িয়ে দেব কোন্ অধিকারে.পুণ্য কর্ত্তে না পারি নেই, পাল্লাম, পাপ কেন সাধ করে ঘাড় পেতে নেব।"

রমার চিন্তানত বদনের কোণ হইতে জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। নির্ম্মল এবার গলা ঝাড়া দিয়া তার স্বরে বলিল—"তুমি কাঁদ্‌ছ বৌদি কাঁদ কেঁদেও যে শান্তি, সে শান্তিটুকু ত বিধাতা বিমলার ভাগ্যে লেখেন নাই।"

"নির্ম্মলবাবু।" বলিয়া রমা থামিল, তাহার ধরাগলার তীব্র আওয়াজ নির্ম্মলের বুকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আঘাত করিল। নির্ম্মল বলিয়া উঠিল—"এখানে এসে হয়ত অন্যায় করেছি, কিন্তু মন যে মান্‌লে না, ভাব্‌লুম বিদেয় হয়েই যাচ্ছিত, এমন প্রলোভনটা আর ছাড়ি কেন, একবার তোমার সঙ্গে শেষ দেখাটা করে যাই, তুমিত আমায় বড্ড ভাল বাস্‌তে।"

নির্ম্মলের চোখের কোণও ভিজিয়া উঠিল, রমা অনেকক্ষণ পরে একটি মৃদু শ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথা তুলিল, ধরাগলাতেই বলিল—"তার বুঝি এই পুরস্কার নির্ম্মলবাবু।"

"শূন্য হাত, খোরপোষ চলে না, বৌদি পুরস্কার আর কোত্থেকে হবে।"

"কিন্তু এম্‌নি শূন্যত তুমি ছিলে না, যদি হয়েই থাকত, তার জন্যে যে আমি দায়ী।"

"তুমি কেন দায়ী হতে যাবে বৌদি, দায়ী আর কেউ নয়, আমি, আমি কিছু আমায় না জানি এমন নয়, আর জেনে শুনে নিজের দোষ ঢাকা দিয়ে পরের ঘাড়ে দোষ চাপান, সে স্বভাবও আমার নয়। তুমি যা দিয়ে ছিলে হয়ত তাকেই আমার ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলে আদর করে নেওয়া উচিতছিল, তাকে ত্যাগ করে আমি সুখও পাবনা, তাতে কিছু আমার ধর্ম্মও থাকবে না, তবু কি জানি কেন এতটা বুঝেও আমি তোমার আদরের দান গ্রহণ কর্ত্তে পারলাম না, হাতের রত্ন ছুড়ে ফেলে পালিয়ে এলাম, সাজান প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলে আমি অশান্ত সাধকের মত নিরাকার ব্রহ্মের দিকে ধেয়ে চলেছি, জানি এতে আমি সিদ্ধ হতে পারব না, সাধনাও আমার সফল হবে না, তবু কি জানি কার টানে আমি মন শান্ত কর্ত্তে পারি নি, এযে রাস ছাড়া ঘোড়ার মত ছুটে চলেছি, একে ধরে রাখে এমন শিক্ষিত সহিস আমার নেই, তার জন্য কি তোমায় আমি দোষ দিতে পারি।" বলিয়া নির্ম্মল স্তব্ধের মত সম্মুখের চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

এতগুলি কথার উত্তরে রমা দুইটি মাত্র কথা বলিল—'একটু যদি ভাবতে, তাকে যদি দুদিনের সময় দিতে।"

"ভাবতে আমি কসুর করিনি।" বলিয়া নির্ম্মল উত্তেজিত হইয়া উঠিল, "সময়ও কম দিয়েছি বলে মনে হয় না, কিন্তু সে যে আমার মতটি হতেই চায় না, হয়ত সে হওয়া তার উচিতও নয়, কিন্তু কি করব, নিরুপায় আমি, যা হলে তোমরা তাকে মন্দ বৈ ভাল বলবে না, আমি যে তাই চাই।"

"আমাদের ভাল মন্দের জন্যেত সে তোমায় মনমত হতে দ্বিধাবোধ কর্ত্ত না, যদি তার সাধ্যে কুলোত ?"

"হয়ত তার শক্তিতেই কুলোচ্ছে না, শক্তির বাইরে যে কেউ কিছু কর্ত্তে পারে না;" তার প্রমাণত খুজে বাড় কর্ত্তে হবে না, আমি নিজেই যে জলন্ত প্রমাণ নিয়ে দাড়িয়ে রয়েছি।" বলিয়া নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমা ব্যস্ত হইয়া বলিল—"ওকি উঠে দাঁড়াচ্ছ যে, স্থির হয়ে বস, এসেছই যদি, না খেয়ে পালিও না যেন।"

"পালান যে আমার স্বভাব, তাইতে তোমার এত ভয়, কিন্তু সে আমি যাব না, এসেছি, যখন, তখন তোমার হাতের রান্না খাওয়ার লোভ কিছু ছাড়তে পারব না।"

স্তব্ধ রমার হৃদয়ে যে ঝড়টা বহিতেছিল, তাহার বেগ এবার আরও বাড়িয়া উঠিল। সে কোন মতে চোখের জল রোধ করিয়া "তাই নির্ম্মলবাবু, বিশ্রাম কর, আর দেখ, পারত মনটাকে একটু শান্ত কর।" বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিল। তাহার দুর্দ্দাম মনের বেগ যেন সন্তান হারা মাতা পিতা ও পতিহারা বিমলার চিত্র মনে করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে হার্ভ হার্ভ করিয়া উঠিতে ছিল, তবু সে নির্ম্মলকে সপরিতোষ ভোজন করাইবে এ আশা ত্যাগ করিতে পারিল না। বুকের বোঝা বুকে রাখিয়া এই মাতা পিতার নিকট হইতে ক্ষোভ ও দুঃখের পসারা লইয়া সত্বর প্রস্থিত নির্ম্মলের জন্য সান্ত্বনা ও শান্তির অন্বেষণে ছুটিয়া চলিল। সকাল বেলার রোদ তখন পাকিয়া উঠিতেছিল, গৃহের কোণে ধুলিশয্যায় একটা বিড়াল ঘুমাইতেছিল, একহাতে তাহাকে তাড়া করিয়া রমা রান্না ঘরে ঢুকিল।

(ক্রমশঃ)

গল্পলহরী

৫ম বর্ষ } চৈত্র, ১৩২৪ { ১২শ সংখ্যা।

কঠিন পরীক্ষা

(লেখক—শ্রীঅমলানন্দ বসু বি, এ,)

(১)

"তুমি যাবে কি না বল ?"

"আর দুদিন পরে যাবো।"

"কেন ?"

"খুকীর বিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে।"

"তবে বল মাঘমাসে যাবে ?"

"তা কেন ? আমি অগ্রহায়ণ মাসের শেষে যাব।"

"আমার কষ্ট তুমি বুঝ্‌বে না ? আমার বৃদ্ধ পিতার কত কষ্ট হচ্চে, আমার মা এখন আর পারেন না—রুগ্ন। এ অবস্থায় তোমার কি এখানে থাকা উচিত ?"

অন্দরের একটি উদ্যানে দাঁড়াইয়া স্বামী স্ত্রীতে কথোপকথন হইতেছিল। স্ত্রী চপলা বড়লোকের মেয়ে, পূজার সময় পিত্রালয় আসিয়াছে। স্বামী মন্মথনাথ চৌধুরী গরীবের ছেলে, পিতা মাতার শুশ্রূষার জন্য স্ত্রীকে লইতে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। মন্মথ গরীব, কুলীন সন্তান, তাই বড়লোকের ঘরে বিবাহ হইয়াছে। মন্মথ বড় আত্মাভিমানী, পাছে গরীব বলিয়া সকলে অশ্রদ্ধা করে, সেই জন্য তিনি শ্বশুরালয় প্রায় আসেন না। অন্য দায়ে পড়িয়া আসিয়াছেন, মা বড় কাতর, পিতাও বৃদ্ধ, এদের পথ্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। পূজা শেষ হইতে না হইতে মন্মথ পরিবার লইতে আসিয়াছেন।

আশ্বিনমাস রাত্রিকালে দুজনে শরতের জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া কথা বার্ত্তা বলিতেছে।

চপলা বলিল—"তুমি আজ সকাল বেলা এসেছ, দুই এক দিন থেকে যাও, অন্ততঃ আজকের রাত্রিটা থেকে যাও। আমি এখন যেতে পার্‌বো না।"

মন্মথ বড় অসন্তুষ্ট হইল, সে স্ত্রীকে বড় ভালবাসিত, জানিত তাহার স্ত্রী তাহার অত্যন্ত বাধ্য, সুতরাং পিতা মাতার নিকট জেদ্ করিয়া স্ত্রীকে লইতে আসিয়াছেন। স্ত্রী স্পষ্ট বলিল এখন যাইতে পারিবে না। আবার অনুরোধ করিতেছে দুই এক দিন থাকিতে। তিনি স্ত্রীচরিত্রে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমি জানিতাম তুমি কর্ত্তব্য পরায়ণা, আমি জানিতাম তুমি আমার উপযুক্ত স্ত্রী, এখন দেখিতেছি তাহা নয়, আমারই ভ্রম হয়েছিল। সংসার যে এমন জিনিষ তা জানতেম না। বড়লোকের মেয়ে গরীবের ঘরে বিয়ে হয়েছে, এ কাজ নিতান্তই অন্যায়। আমার পিতার অন্যায়, আমার অন্যায়, তোমার পিতার অন্যায়। যা হ'ক, একবার শেষ জিজ্ঞাসা করি, এখনই তুমি যাবে কি না!" চপলা বড় বিরক্ত হইল, তথাপি সুমধুর হাসিয়া বলিল—"অত জেদ্ কেন? তোমাদের জেদ্ থাক্‌বে, আমাদের কি জেদ্ থাক্‌বে না। আমি বল্‌ছি অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ের পর যাবো।" মন্মথ আর কোন কথা বলিল না, ধীরে ধীরে উদ্যান হইতে বাহির হইয়া গেল। চপলা মনে মনে বলিল—"এ রাগ থাক্‌বে না, আবার আমাকে দেখ্‌তে আস্‌বে।

(২)

কার্ত্তিক মাস মন্মথের পিতা ও মাতা উভয়েই বড় পীড়িত, মন্মথ অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহাদের সেবা করিতেছে। বৃদ্ধ পিতা বলিলেন—"আর একবার যা বৌমাকে নিয়ে আয়।" মন্মথ কোন কথা বলিল না, তাহার প্রতিজ্ঞা আর স্ত্রীকে আন্‌বে না। দেখিতে দেখিতে এক দিন সন্ধ্যার সময় মন্মথের মা প্রাণত্যাগ করিলেন। মন্মথ অনেক কাঁদিল। বৃদ্ধ পিতা বড় কাতর হইলেন, কিন্তু ছেলেকে নানা রূপ সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

দিন কাহারও বাধ্য নয়, দেখিতে দেখিতে এক পক্ষ হইল। মন্মথ কায়েস্থ, একমাসে শ্রাদ্ধ হইবে। বৃদ্ধ পিতা বলিলেন—"এবার বৌমাকে আনা দরকার। মন্মথ নম্র ভাবে বলিলেন—"তাকে এনে কি হবে? মায়ের

শ্রাদ্ধ গঙ্গাতীরে ক'রে আস্‌বো। আমরা গরীব, গ্রামে ত খরচ কর্‌তে পার্‌বো না।” পিতা আর কিছু বলিলেন না।

ফরিদপুর জেলায় ময়নাহাটি গ্রামে মন্মথের বাটী। ময়নাহাটী গ্রাম খানি মন্দনয়, দশ জন ভদ্রলোকের বাড়ি আছে। গ্রাম খানি পদ্মা হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধানে। মন্মথের বংশ সম্ভ্রান্ত, সময়ে বড়লোক ছিল, মন্মথের পিতা ব্যবসা করিতে গিয়া সব নষ্ট করিয়াছেন। মন্মথ ফরিদপুর হইতে এণ্টান্স পাশ করিয়াছে। আর পড়ার খরচ চলিল না। তৎপর বিবাহ করাতে শ্বশুর পড়ার খরচ চালাইতেছিলেন, মন্মথ কলিকাতা কলেজে এফ্, এ, পড়িত। পিতামাতার অসুখ বৃদ্ধি হওয়াতে পূজার ছুটির পর আর কলিকাতায় যাইতে পারিল না। মাতাঠাকুরাণী স্বর্গলাভ করিলেন, বৃদ্ধ পিতার শুশ্রূষা কেমন করিয়া চলিবে এই ভাবনায় সে অস্থির হইল।

ইহার কয়েক দিন পরেই কলেরা রোগে মন্মথের পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন। আজ মন্মথের চক্ষে জল নাই, সে কাঁদিল না। দুই হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিল—“ভগবান্, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক।” সকলেই আসিয়া সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। সকলেই বলিল এবার বৌমাকে নিয়ে এস। মন্মথ কাহারও কোন কথা শুনিল না। সে কয়েক বিঘা খামারজমি বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা হস্তগত করিল। বৃদ্ধ পুরোহিত আসিয়া বলিলেন—“এ সময় শ্বশুরের সাহায্য চাও।” মন্মথের মুখ রক্তবর্ণ হইল, সে কোন উত্তর করিল না। কোন সংবাদই শ্বশুরালয়ে পাঠাইল না। তারপর শ্রাদ্ধের সময় পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। শ্রাদ্ধান্তে পুরোহিতকে দেশে পাঠাইয়া দিল। ইহার পর মন্মথকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

(৩)

চপলার পিতা শ্যামসুন্দর ঘোষ মদনপুরের জমিদার, বার্ষিক আয় প্রায় দশ হাজার টাকা। গ্রামস্থ সকল লোকেই শ্যামসুন্দর ঘোষকে মান্য ও ভয় করে। শ্যামসুন্দর কতকগুলি লাঠিয়াল প্রতিপালন করেন, তিনি যেন স্বাধীন ভাবে সে দেশে রাজত্ব করেন। শ্যামসুন্দরের দুটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। চপলা পিতার বড় আদরের, এবং আদরে আদরে তাহার আবদার অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে বড় অভিমানিনী, কথায় কথায় রাগ করিত। অগ্রহায়ণ মাসে ছোট ভগ্নীর বিবাহ হইবে, সেই আনন্দেই

সে মত্ত। দিবা রাত্রি সাজসজ্জা করিয়া বেড়াইতেছে। স্বামী রাগ করিয়া গেলেন,আবার তাহার পদতলে আসিতে হইবে,আবার তাহাকে সাধিতে হইবে, এই আত্মাভিমানেই সে ছিল। হঠাৎ একদিন শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের এক জন লোক আসাতে সংবাদ পৌঁছিল যে তাহার শ্বশুর শাশুড়ী উভয়ে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্যামসুন্দর তখনই ব্যস্ত হইয়া সঠিক খবরের জন্য লোক পাঠাইলেন, লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ঘটনা যথার্থ, শ্রাদ্ধের জন্য জামাই-বাবু কলিকাতায় গিয়াছেন। শ্যামসুন্দরবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এই সব ঘটনা হইল অথচ তিনি কিছুই জানেন না। তিনি জানেন মন্মথ গরিব, নিশ্চয়ই সে অর্থ সাহায্য চাহিবে। তিনি গোপনে চপলাকে ডাকিয়া বলিলেন—"সেদিন কি জামাই রাগ ক'রে গিয়াছিল ?" চপলা প্রথমতঃ উত্তর করিল না, তারপর বলিল—"জেদ্ কর্‌তে লাগলো সেই রাত্রেই তার সঙ্গে যেতে হবে, আমারও একটু রাগ হ'ল, আমি উত্তর কর্‌লাম খুকীর বিয়ের পর যাবো।" শ্যামসুন্দরবাবু একটু চিন্তিত হইলেন, তিনি জানিতেন জামাই বড় রাগী, কিসে কি করে বলা যায় না। তিনি কন্যাকে বলিলেন—"কাজটা ভাল হয় নাই মা। তার পিতামার অসুখ, তুমি গেলে না কেন ? আবার বিবাহের সময় তোমাকে আনাতেম।" চপলা কোন উত্তর করিল না, শ্যামসুন্দরবাবু চিন্তাবিষ্ট চিত্তে বাহিরে গেলেন। একজন কর্ম্মচারীকে তখনই অর্থসহ কলিকাতায় রওনা করিলেন, বলিয়া দিলেন। জামাইকে পাইলেই সঙ্গে করিয়া আনে।

চপলার বড় ভাবনা হইল, সে বুঝিল কাজ ভাল হয় নাই, তাহার পিতা ও একথা বলিলেন। তখন সে তাহার নির্জ্জন কক্ষে গিয়া শয্যায় শয়ন করিল এবং অনেক কাঁদিল! চপলাও স্বামীকে বড় ভালবাসিত। তবে তাহার আত্মাভিমান খুব বেশী সেই ফলে এরূপ ঘটিল। যদি আত্মাভিমান না থাকিত, তবে ভ্রমরের এদশা হইত না, গোবিন্দলাল সন্ন্যাসী হইত না। যদি আত্মাভিমান না থাকিত তবে কুন্দনন্দিনী বিষ খাইত না। অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়, লোকে ভ্রমে পতিত হইয়া অনিষ্ট ঘটায়। কর্ম্মচারী কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিল, মন্মথের কোন খবর পায় নাই। চপলার বড় আশা ছিল, এবার নিশ্চয়ই আসিবেন, সে আশা বিনষ্ট হইল।

চপলার তখন জ্ঞান হইল, সে বুঝিল নিজের পায় সে নিজে কুঠার আঘাত করিয়াছে। এখন সে সব আমোদ প্রমোদ ছাড়িয়া দিল, এখন আর কোন

বিলাসে মন নাই, ভাল কাপড় পরে না। তাহার পিতাও বড় চিন্তিত হই- লেন, তিনি নানা স্থানে লোক পাঠাইলেন। কোন ফলই হইল না, মন্মথের অনুসন্ধান কেহই পাইল না, কর্ম্মচারীরা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল! চপলা ক্রমে আহার ত্যাগ করিল। এমন সুন্দর শরীর দিন দিন কৃশ হইতে লাগিল। আর জীবনের প্রতি মমতা রহিল না। সকলেই তাহাকে বুঝাইত, সে উত্তর করিত" আমি না বুঝে অপরাধ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য হ'য়েছে, ক্রমে ইহাতেই আমার মৃত্যু হবে। তবে একবার ইচ্ছা হয় মৃত্যু সময়ে তাঁর চরণ দর্শন পাই। আমার আর পৃথিবীতে কোন সাধ নাই, কোন আশা নাই, কেবল এই সাধ একবার পায়ে ধরে অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিব। তিনি ক্ষমা—করলেই আমার মৃত্যু শান্তি জনক হইবে।"

(৪)

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর অতীত হইল। কন্যা এক দিন পিতাকে বলিল" বাবা, আমার এক ভিক্ষা।" পিতা কন্যার অবস্থা দেখিয়া চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি বলিলেন "কি চাও মা, তোমাকে অদেয় কি আছে?"

চপলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল" বাল্যকালে মা ম'রে গিয়াছেন, আমরা পিতৃ স্নেহে পালিত। এখন আমার একটি শেষ আব্দার আমাকে একবার দুই একটি লোক সঙ্গে দিয়া পশ্চিমে পাঠান, আমি সব তীর্থস্থল দেখ্‌বো।" পিতা কন্যার অভিপ্রায় বুঝিলেন। তখনই বিশ্বস্ত বৃদ্ধ কর্ম্মচারী হরপ্রসাদের সঙ্গে কন্যাকে পশ্চিমে পাঠাইলেন। কন্যা যাওয়ার সময় পিতার পদধূলী ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিল, তারপর বলিল "বাবা, এই শেষ দেখা। যদি তাঁকে পাই তবে ফিরবো, নতুবা আশীর্ব্বাদ করুন তীর্থস্থলে আমর মৃত্যু হয়। "পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন, মেয়ে বিদায় হইল।

চপলা হরপ্রসাদের সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিল। ৺কাশীধামে গিয়া অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের নিকট মাথা কুটিল। তারপর প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার, জ্বালামুখী, প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, সব বেড়াইল। কিন্তু কোন স্থানেই তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না! প্রায় এক বৎসর এই ভাবে দুজনে বেড়া- ইলেন। এক দিন চপলা বলিল "কাকা, আপনাকে চির দিন পিতার ন্যায় ভক্তি করি। আমার একটি কথা রাখ্‌তে হবে।" হরপ্রসাদ বলিলেন "কি মা, কি কর্‌তে হবে? আমি বলি এখন দেশে ফিরে যাই, আর তাকে

পাবে না।” চপলার চক্ষে জল আসিল, “তাঁকে না দেখে মর্‌তে হবে? যদি ভগবান থাকেন, যদি আমার পতিভক্তি থাকে যদি এখনও দেবতা জাগ্রত থাকেন, তবে একবার নিশ্চয়ই তাঁর শ্রীচরণ দেখ্‌তে পাবে”—চপলা মনে মনে এই কথা বলিল। প্রকাশ্যে বলিল” কাকা, আর আপনি কেন বৃথা কষ্ট পাচ্ছেন? আপনি দেশে চ’লে যান, আমি আর দেশে এ মুখ দেখাবো না। বাবাকে বল্‌বেন হতভাগিনী মরেছে।” হরপ্রসাদ চপলার পিতামহের সময়ের কর্ম্মচারী, তিনি এ কথায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন না মা, তা হবে না, আমি অনেক দিন তোমাদের নুন খেয়েছি, তোমাকে ফেলে আমি দেশে যেতে পারবো না।” চপলা আর কিছু বলিল না। চপলা এখন গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছে, তথাপি যেন সে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। এই যুবতী সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছে। চপলা এক দিন হরপ্রসাদকে বলিল” কাকা, যদি নিতান্তই হতভাগিনীর সঙ্গে কষ্ট পাবেন, তবে চলুন ৺পুরীধামে যাই। পশ্চিমের তীর্থত সব দেখা হ’ল। ৺রথযাত্রা সম্মুখে, এ সময়ের দৃশ্য বড় মনোরম।” উভয়ে ৺পুরী অভিমুখে রওনা হইলেন।

(৫)

অদ্য রথযাত্রা, পুরী ধামে লোকারণ্য। ভারতের প্রত্যেক স্থান হইতে লোক আসিয়া জুটিতেছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মভাব এত প্রবল যে তাহারা প্রাণকে তুচ্ছ করে, এত ভিড়ের মধ্যে অনেকে কচি ছেলে বুকে লইয়া জগন্নাথ দর্শনে বাহির হইয়াছে। ভক্তির সীমা নাই, হিন্দুর প্রাণে অশেষ আনন্দ ও উৎসাহ। দলে দলে লোক রথের নিকট যাইতেছে। এই গোলমালে সন্ধ্যা বেলা হরপ্রসাদের সঙ্গ হইতে চপলা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। হরপ্রসাদ কত খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই চপলার দর্শন পাইলেন না। মনে করিলেন চপলা বোধ হয় বাসায় ফিরিয়াছে, বাসায় আসিয়া দেখিলেন চপলা আসে নাই, আবার ব্যস্ত হইয়া তাহার অন্বেষণে বাহির হইলেন।

রজনী দ্বিপ্রহর অতীত—চারিদিকে শুধু নীল সমুদ্রের গভীর শব্দ শুনা যাইতেছে। এক একটি উর্ম্মি আসিয়া সৈকতে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। এত যে দিবসের গোলমাল—সব থামিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে আলুলাইত কেশা একটি যুবতী সন্ন্যাসিনী দাঁড়াইয়া সমুদ্রের শোভা দেখিতেছে। যুবতী উন্মনা, এক এক বার ঢেউ আসিয়া

তাহার পাদদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে। কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তখন সেই —জনশূন্য স্থানে গম্ভীর শব্দে যুবতি বলিল "স্বামীন, প্রভো, দেখা দিলেনা? এক অপরাধ করেছি ব'লে কি এত কষ্ট দিতে হয়? আমি ব'লিকা আমি বুঝিতে পারি নাই, তাতেই কি এত শাস্তি দিতে হয়? একবার এস, হৃদয়েশ্বর, হৃদয়ের দেবতা, এই আসনে এসে দাঁড়াও, তেমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রাণত্যাগ করি। তোমাকে চিনি নাই, তোমাকে বুঝি নাই, তাই আমার এত দুঃখ। হতভাগিনীর কি ক্ষমা নাই? অনেক দেশ ঘুরেছি, অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেছি, কই তোমার চরণ ত দর্শন পেলেম না। আমার মনে হচ্ছে তুমি এখনও জীবিত আছ, তুমি যদি এ পৃথিবীতে না থাকিতে তবে আমায় হৃদয় তা জান্‌তো। এস নাথ, একবার দেখা দাও, একবার দুঃখিনীকে বক্ষে নিয়ে সেইরূপ আদর করে ডাক। বড় জেদ্‌ ছিল যে আমি যদি সতী হই, যদি ভগবান থাকেন, তবে নিশ্চয়ই শেষ সময়ে তোমাকে দেখ্‌তে পাবো, কই সে আশা ত পূর্ণ হ'ল না। আমি কি পাপ করেছি যে ঈশ্বর আমার প্রার্থনাও শুন্‌লেন না। জগন্নাথ, পতিত পাবন, দীনবন্ধো, হরি, কোথায় তুমি, দাসীর অভিলাষপূর্ণ কর, শেষ সময়ে একবার যেন আমার স্বামীর চরণ দর্শন পাই। অদ্য রথ যাত্রা যে যা ভক্তিকরে কামনা করে তাই সে পায়, আমি ত পাই না। আর না, আমার অদৃষ্টে স্বামী দর্শন নাই। আমি অভাগিনী, আমায় ভগবান রাখ্‌বেন কেন? নাথ, আমি চল্লেম, তোমার চরণের দাসী চপলা এইবার যায়, যেন সেই স্থানে গিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হই। এ পৃথিবীতে তোমার দেখা পেলেম না, সেই স্থানে যেন দেখা পাই। জন্মান্তরে যেন তুমি আমার স্বামী হও, আমি স্বামী সোহাগিনী হ'তে পারি।" চপলা আর বিলম্ব করিল না, সমুদ্র গর্ভে ঝম্প দিল। সঙ্গে সঙ্গে "কি কর, চপলে" বলিয়া একটী যুবক সন্ন্যাসী জলে লম্ফ দিয়া পড়িল, এবং চপলাকে ধরিয়া তুলিল। চপলার জ্ঞান নাই। সন্ন্যাসী বালুকাময় ভূমিতে রক্ষিত কমণ্ডলু হইতে চক্ষে জল দিলেন। তারপর কি ঔষধ তাহার মুখে দিলেন, অর্দ্ধঘণ্টা পরে চপলার জ্ঞান হইল। সে যাহা দেখিল—তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল—আবার অচেতন হইল। পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিল সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে তাহার মস্তক রক্ষিত। সন্ন্যাসী ডাকিলেন "চপলে।" চপলার সুখের সীমা নাই, সে মনে করিতেছিল আমারত অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, এখন মৃত্যু হয় না কেন? আবার সন্ন্যাসী ডাকিলেন "প্রিয়ে।" এবার চপলা উঠিল,

সন্ন্যাসীর পদধূলী লইয়া—ধীরে ধীরে বলিল "স্বামীন, এই সামান্য অপরাধে এত কষ্ট দিতে হয়।" মন্মথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল "চপলে, এই পৃথিবী পরীক্ষা এরূপ স্থল, না হ'লে তোমার জ্ঞান হ'ত না। আর আমাদের এখানে থাকা দরকার নাই, চল দুজনে গুরুদেবের আশ্রয়ে যাই।" দুজনে গলাগলি হইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

সাথী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(লেখক—শ্রীপরেশনাথ সরকার)

(২৫)

এক হস্তে চক্ষু মুছিয়া শ্যামাসুন্দরীকেই পুত্র বিবাহের সব কাজ করিতে হইতেছে। তিনি কি করিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। একটা কাজ করিতে করিতে অন্য একটা মনে আসে, সেইদিকে চলিয়া যান, লগ্নের আর বেশী দেরী নাই, নগেনকেও ত একটু কাজল চন্দন পরাণ চাই। নিতাই তাহাকে এক এক বার আসিয়া এক একটা জামা পরাইতে ছিল, আর ছাড়াইতেছিল!

শ্যামাসুন্দরী ভাবিতেছিলেন, নিতাই ও আভার মত তাহার ছেলেকে সাজাইবার মত জামা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা। দূর্ব্বা ধান বরণ ডালায় সাজাইয়া রাখিয়া আসিয়া দেখিলেন—কলার পাতা আনা হয় নাই, কাজল করিতে হইবে। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, কলার পাতা লইয়া আসিলেন। উজ্জলদীপালোকে তিনি পাতা খানি ধরিয়া কাজল করিয়া লই-লেন। চন্দন ঘসিয়া লইয়া তিনি নগেনের কপালে লাগাইয়া ছিলেন! অধীর আবেশে হস্ত কাঁপিয়া গেল, সমস্ত কপালটায় চন্দন লাগিয়া গেল, ঠিক এই সময় আভা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—ইঃ কাকীমা নগেন-দাকে যা সাজিয়েছে!

শ্যামাসুন্দরী পিছু ফিরিয়া আভাকে দেখিয়া, একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া চন্দন কাজল রাখিয়া উঠিয়া গেলেন; যাক এইবার আমি নিশ্চিন্ত হলেম, যার কাজ সেই এসেছে!

আভা আসিয়াই অঞ্চল দিয়া নগেনের কপালের চন্দনগুলি মুছিয়া ফেলিয়া বলিল—একি নগেনদা, তোমার মাথা ধরেছে ?

নগেন আভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—হাঁ।

আভা তাড়াতাড়ি নগেনর হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল—সারাদিন কিছু খাও নি, এস তুমি শুয়ে পড়, আমি তোমার মাথাটা টিপে দেই ?

শ্যামাসুন্দরী আসিয়া দেখিলেন নগেন বিছানায় শুইয়া রহিয়াছে, আভা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে মা ?

আভা বলিল—ওর মাথা ধরেছে !

শ্যামাসুন্দরী নগেনের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—"গা ত গরম নয় !

নগেন বলিল—না মা মাথাটাই ধরেছে !

বাহিরে নিতাইয়ের কণ্ঠ শোনা গেল—"কই দাদা !"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন তার বড় মাথা ধরেছে নিতাই !

নিতাই ব্যাস্ত হইয়া বলিল—সেকি মা, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দেই, এখনি সেরে যাবে !

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া নিতাই চমকিয়া উঠিল। বিবাহের চেলী পরিয়া নগেনের শিয়রে বসিয়া আভা ! নিতাই আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল—তুমি—দিদি ? তুমি এসেছ !

আভা ধীরে ধীরে বলিল—হাঁ দাদা, এসেছি ! তোমার সাথী নাকি আমাদের বাড়ী যাবেনা, তাই নিতে এসেছি !

শ্যামাসুন্দরী হাঁ করিয়া আভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আভা ধীরে ধীরে নগেনের পায়ের কাছে গিয়া বসিল, দুই হস্তে তাহার পা দুখানি ধরিয়া বলিল—আমায় ক্ষমা কর দাদা, চল, আমাদের বাড়ী চল !

নগেন ব্রস্তভাবে উঠিয়া বসিল, আভা তেমনি তাহার পা ধরিয়া বসিয়া রহিল, বিন্দু বিন্দু অশ্রু তাহার পায়ের উপর পড়িল।

নগেন ধীরে ধীরে আভার হাত দুইখানি ধরিয়া তুলিয়া হাসিয়া বলিল—দূর বোকা !

আভা হাসিয়া ফেলিল, বলিল—একটা আশির্ব্বাদও করলে না জ্যাঠাই মা !

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—নূতন করে কি আশীর্ব্বাদ করব মা!

আভা বলিল—তবু যা হয় কিছু একটা কর না এই সময়!

শ্যামাসুন্দরী কাঁপিয়া উঠিলেন বলিলেন—চুপ কর আভা, আমায় ভাবতে দে, কি করলি!

আভা হাসিয়া আসিয়া শ্যামাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া বলিল—এখন তুমি ভাব, মা! আমি চল্লুম।

নিতাই বলিল—দাঁড়া, দিদি, শোন, শোন।

ততক্ষণ আভা ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে।

পরক্ষণেই আভা আবার ঘরে আসিয়া বলিল—সে দলিল খানা?

শ্যামাসুন্দরী একতাড়া চাবি আভার হাতে ফেলিয়া দিয়া একটা বাক্স দেখাইয়া দিয়া, বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। আভা বাক্স খুলিয়া দলিলখানি লইয়া, চাবিটা নিজের আচলে বাঁধিয়া লইয়া নগেনের দিকে চাহিয়া বলিল—চল না আমায় বাড়ী দিয়ে আসবে।

হাঁ করিয়া শ্যামাসুন্দরী আভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

(২৬)

গোপীকিশোর বলিলেন—কই সন্ধ্যাকাল ত হয়ে এল, জোগাড় যন্ত্র সব কর।

চন্দ্রা বলিলেন—মা আর মেয়ে যে সেই বিকালে ঘরে দুয়ার দিয়েছে, আর তা খুলবার নাম ত করে না।

সত্যচরণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়া কি যেন তালাস করিলেন, কাহাকেও না পাইয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময় হাসিতে হাসিতে হরবল্লভ আসিয়া বলিলেন—তা সত্যচরণ, আমার মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণটা করিনি, তাই কত্তে এসেছি!

সত্যচরণ হাতজোড় করিয়া বলিলেন দাদা, এসময় আমার মন এত খারাপ যে পাগল হয়ে যাব। এরপর আর আমায় কষ্ট দিবেন না!

হরবল্লভকে দেখিয়া চন্দ্রা জলিয়া উঠিয়া ছিলেন—বলিলেন—বের হও আমার বাড়ী থেকে। যাদের জাতি নেই তাদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ করছে তার সাথে আমাদের কোন আচার ব্যবহার নাই!

হরবল্লভ সত্যচরণের হাত খানি ধরিয়া বলিলেন—তুমি ওদিকে চল, ভাই, তোমার সাথে কথা আছে!

চন্দ্রা বড় গলায় বলিলেন—ওদের জাত নেই। ওদের সাথে কিসের সমাজ।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আভা নগেনের হাত ধরিয়া আসিয়া জ্যাঠাইমার কাছে দাঁড়াইল। নগেন চন্দ্রার পায়ের উপর পড়িয়া একটি প্রণাম করিল। আভাও তাহাকে প্রণাম করিল।

চন্দ্রা বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তাহাদের দিকে চাহিয়া, চলিয়া গেলেন। গোপীকিশোর রাগান্বিত হইয়া বলিলেন। এদের ও জাতি গিয়াছে!

বিধুমুখী গণ্ডোগোল শুনিয়া দরজা খুলিয়া দেখিলেন—নগেন, আভা হাতধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

তিনি সেইখানে ছুটিয়া আসিলেন। আভা মায়ের পায়ের কাছে নগেন-কে বসাইয়া দিয়া বলিল—মা আমি তাড়িয়ে দিয়ে ছিলাম, আমিই আবার নিয়ে এসেছি! এবার আমায় ক্ষমা কর মা!

বিধুমুখী নগেনকে তুলিয়া, আভাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন! তখন সেই প্রকোষ্ঠে চন্দ্রার উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল—ওরে ঠাকুর পোকে ডেকে আন না, সে একবার এসে দেখে যাক্!

হরবল্লভ ও সত্যচরণ আসিতেই বিধুমুখী ঘরের বাহির হইয়া গেলেন!

আভা সত্যচরণের পায়ের ধুলা লইয়া দাঁড়াইতেই, তিনি আভাকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন—মা, একি করলি!

আভা একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ঠিক ত করেছি বাবা!

সত্যচরণ বলিলেন—তোর বাবা ঋণ বদ্ধ তা জানিস!

অতি মৃদুকণ্ঠে আভা বলিল—কার কাছে বাবা!

সত্যচরণ নগেনকে দেখাইয়া বলিল—ওদের কাছে!

আভা বলিল—তাত জানি বাবা!

সত্যচরণ একটু কাল চুপ করিয়া রহিলেন!

আভা ধীরে ধীরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল—বাবা!

"কি মা।"

"দোষ করে থাকি ক্ষমা কর কিন্তু—"

সত্যচরণ বাধা দিয়া বলিলেন—দাঁড়াও মা, বুঝতে দে, কেন তুই এ কাজটা করে ফেললি। হঠাৎ করেছিস্ বলেত বোধ হয় না।

আভা পিতার বুকে মাথা রাখিয়া বলিল—আমিত ভুল করিনি বাবা!

সত্যচরণ হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন—তা হলে মা, আগে বল্লেই হত, এতটা ভোগালি কেন বল দেখি! বাড়ীতে ভদ্রলোক এসেছে সব, বর যাত্র হয়ে!

হরবল্লভ বলিলেন—তরুর মত বউ যে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়, তাকে অপমানিত করায় কোন দোষ নেই, সত্যচরণ!

সত্যচরণ বলিলেন—তবু ভদ্রলোক, বাড়ীতে এসেছে!

হরবল্লভ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—বেশ করে লুচী সন্দেশ খাইয়ে দেও!

চন্দ্রা বলিলেন—যাক্ ঠাকুর পো, এই ধানদুর্ব্বা লও, জামাইকে আশীর্ব্বাদ কর!

চন্দ্রার কণ্ঠ শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিলেন, একণ্ঠ এত কোমল হইতে পারে, কেউ তা পূর্ব্বে ভাবিতে পারে নাই!

চন্দ্রা আসিয়া নগেনকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—ঠাকুর পো, সত্যই জামাইর মত এমন জিনিষ আর কিছুই নেই, নাও বউ, এখন, তুমি একে একটু কাজল পরিয়ে দাও। আমি যাচ্ছি ওবাড়ী থেকে ওর মাকে নিয়ে আসি, আমি না গেলে তিনি আসবেন না, বলিয়া চন্দ্রা বাহির হইয়া গেল!

সত্যচরণ হাসিয়া বলিলেন—বউদির বেশ পছন্দ সই জামাই হয়েছে, দেখচি!

হরবল্লভ বলিলেন—এই বেলা আমার মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর ভাই।

সত্যচরণ বলিলেন—জামাই যে আমিই ভাগিয়ে নিলেম দাদা!

হরবল্লভ বলিলেন—জামাই আমার ঠিক আছে!

সত্যচরণ—সে কি এখন কোথায় জামাই পাবে? তবে কি কিরণ—

হরবল্লভ বাধা দিয়া বলিলেন—তার চেয়ে আমি নদীতে লীলাকে ভাসিয়ে দিতাম!

সত্যচরণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তবে কে এখন তোমার মেয়ে বিয়ের জন্ত উপোস্ করে রয়েছে দাদা!

হরবল্লভ হাসিয়া বলিলেন—জামাই উপবাসিই আছে। জামাই আমাদের মাষ্টার ভূপেন!!

সত্যচরণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তুমি দেখছি পাকা লোক, দাদা, এত দিক দেখে শুনে কাজ কর!

হরবল্লভ বলিলেন—এস ভাই, এই বেলা দুটি ফুল এক করে দেই গে, আভার বিয়ের লগ্ন রাত ৩টার পরে!

সত্যচরণ বলিলেন—বেশ তবে চল দাদা!

হরবল্লভ বলিলেন—চল, অনেকক্ষণ বাড়ী ছেড়ে এসেছি, তোমাদের বাড়ীর বরযাত্র ভদ্রলোকেরা আমাদের বাড়ীতে রয়েছেন কেউ কেউ! জামাইর বোন তরুর বার দুই তিন ভেদ বমি হয়েছে!

কথাটা আভা শুনিতে পাইয়া বলিল—মা, তরুর ভেদ বমি হয়েছে, একবার দেখতে যাব না!

বিধুমুখী বলিলেন—নিশ্চয় যাব। লীলার বিয়েটাও দেখে আসব।

"আচ্ছা মা, তরু যে এখানে আছে তাত তুই জানতিস?"

আভা মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল—মার যেমন কথা, তা আর জানি না!

বিধুমুখী বলিলেন—দেখত মা তুই কি করে বসছিলি!

আভা মায়ের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—যাও!

(২৭)

আভা যখন ধীরে ধীরে আসিয়া তরুর কাছে দাড়াইল, তখন কিরণ তরুর পাশে বসিয়া ছিল; কিশোরী বাবু মাথার কাছে বসিয়া একদৃষ্টে তরুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সত্যচরণ ও হরবল্লভ তাঁহার কাছে দাড়াইয়া!

আভা আসিতেই হরবল্লভ কিশোরীবাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন—চলুন আমরা বাহিরে যাই, মেয়েরা সব এসেছে!

কিশোরীবাবু উঠিয়া দাড়াইলেন। সত্যচরণের হাত ধরিয়া বলিলেন—আপনারা আমার বধুমাতাকে বাঁচান, আমি যত টাকা লাগে দেব।

হরবল্লভ বলিলেন - ভগবানকে ডাকুন তিনি এ বিপদ হতে রক্ষা করবেন।

হরবল্লভ, সত্যচরণ, কিশোরী মোহন বাহির হইয়া গেলেন।

কিরণ বসিয়া রহিল। আভা আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—সই! তরু দুখানি বাহু বাড়াইয়া দিয়া, আভাকে বাহু পাশে বদ্ধ করিয়া ফেলিল।

কিরণ শিহরিয়া উঠিল।

তরু বলিল—আমায় বিশ্বাস হয়নি, সই।

আভা বলিল—সই, তোমার স্বামী তোমার কাছে বসে আছে।

কিরণের নয়ন যুগল ভিজিয়া উঠিল।

তরু বলিল—কই ?

কিরণ বলিল—তরু।

তরু—এসেছ তুমি ? আমার খোকা ?

আভা—খোকা তার দিদিমার কাছে আছে !

তরু—যাবার সময় একবার তাহাকে দেখাও।

কিরণ—তরু যেওনা, আমায় এমনি ভাবে ফেলে যেওনা। একবার দেখাতে দাও তোমায় আমি ভালবাসি।

তরু বলিল—উঃ জল।

আভা তাহাকে জল দিতে উঠিল, এমন সময় নগেন ও নিতাই আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল।

নগেন আসিয়া তরুর কাছে বসিয়া নিতাইকে বলিল—দাদা, তুমি সে অষুদটা দিয়েছিলে ?

আভা আসিয়া তরুর মুখে জল দিল।

নিতাই বলিল—এই যে ডাক্তারবাবু এসেছেন।

আভা সরিয়া গেল ; ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিয়া গেলেন—বেশ ভাল অবস্থা।

হরবল্লভ আসিয়া বলিলেন, তবে এখন বিয়ের উদ্যোগ করা যাক্।

ডাক্তার বলিলেন—আশ্চর্য্য রকম অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, আর কোন ভয় নাই।

আভা আসিয়া তরুকে বলিল—তোর দাদার বিয়ে সই।

তরু একটি ক্ষীণ হাস্য দিয়া নগেনের দিকে চাহিয়া আভার হাত ধরিয়া বলিল আর এত আমি জানতাম।

কিরণের অন্তর কাঁদিয়া উঠিল—ওগো তুমি যেও না, তরু ফের।

কিরণ তরুর হাত খানি ধরিয়া ডাকিল—তরু।

আভা উঠিয়া দাড়াইল। নগেনও নিতাই চলিয়া গেল।

কিরণ তরুর হাতখানি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ওগো তুমি যেওনা।

(২৮)

গভীর নিশিথে ভূপেন হাসিয়া ডাকিল—লীলা !

নববধূ চুড়ির একটু ঠুন ঠুন শব্দে জানাইয়া দিল, সে ঘুমায় নাই!

ভুপেন আবার ডাকিল—লীলা!

লীলা একটু নড়িয়া চড়িয়া ভাল হইয়া শুইল। আবার ডাকিতেই লীলা মৃদুকণ্ঠে বলিল—কি?

ভুপেন হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা যা হতে চলেছিল, যদি তাই হত!

লীলা কোন কথা বলিল না।

ভুপেন বলিল—বল না!

লীলা চুপ করিয়া রহিল।

ভুপেন বলিল—তুমি যে বোবা হলে দেখছি!

লীলা বলিল—আচ্ছা দিদি এখন ভাল আছেন, কেমন?

ভুপেন বলিল—ঠাকুর ঝি বল!

একটা অতি মধুর হাস্য-ঝঙ্কার ভুপেনের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিল।

ভুপেন আবার বলিল—বলনা: তা হলে কি হত!

লীলা হাসিয়া উত্তর দিল—ইস তা আর হতে হয় না; যে যার সাথী!

দুই খানি ভুজপাশ হইতে বৃথা মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়া লীলা সহজে পরাজয় স্বীকার করিল।

মনসার কোলে এই সময় খোকা বলিতেছিল—দিদি, দিদি, মাসি!

মনসা খোকার মুখে চুমো খাইয়া বলিলেন—মাসি মাসি!

* * * * * * *

এদিকে বিবাহের বাদ্য বাজিয়া উঠিতেই চন্দ্রা বলিলেন—ঠাকুর পো, আমি যে জামাইর দলিল পত্র সব পুড়িয়ে ফেলেছি।

সত্যচরণ হাসিয়া বলিলেন—তাতে কি বউদি, আমি তার নামে সব লিখে দেব।

হরবল্লভ আসিয়া বলিলেন—আরে ভাই গোপীকিশোর ত বড় একঘরে কর্তে এসেছিল, খুব দল পাকাচ্ছিল, যাই বল্লেম কাল নালিস চড়িয়ে দেব, অমনি হাত দুটি জড়িয়ে ধরিয়ে কত ক্ষমা চাইলে।

সত্যচরণ হাসিলেন।

শ্যামাসুন্দরী তখন আভার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন, বিধুমুখী বলিলেন—এইবার আভা তার মার কাছে কত শিখবে !

আভা মায়ের বুকে মুখ রাখিয়া বলিল—শিখবই ত মা, আমি ঠিক বুঝেছি মেয়ে লোকের জেদ্ আর তার বাবুগিরি কোনটাই ভাল নয় ।

বিধুমুখী আভার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—চির আয়ুস্মতি হও মা !

"বাপের ভিটে ।"

(লেখক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ ঘোষ)

জগন্নাথ ও হারাণ দাস জগদ্বল্লভপুরের রায় বাবুদের খিড়কী পুকুরের অপর পার্শ্বস্থ জায়গায় বাস করে এবং তাঁহাদের আশ্রিত প্রজা। বহুকালের ভিটাবাড়ীর ও আশ্রিত প্রজা ব'লে রায় বাবুদের নিকট তাহাদের একটা সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে আজ কাল তাহার বিপরীত ভাবই দেখা যাচ্ছে। জগন্নাথ ওরফে জগাই বড়ই নিরীহ এবং ভাল মানুষ, বরং তাহার ভাই হারাধন ওরফে হারু যৌবন সুলভ একটু গোঁয়ার, কিন্তু সেও তাহার ভাইয়ের বড়ই অনুগত। জগাইয়ের বিনানুমতিতে হারু কোন কাজই করিত না। বর্ষাকালে মাঠের ক্ষেতে ধান নিড়াইবার সময় দুভাই মাঠে জমি নিড়াইতে ছিল। সেই সময় রায় বাবুদের সরদার দরোয়ান নাথুসিং সেখানে উপস্থিত হইয়া অন্যান্য প্রজার নিকট জগাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। জগাই তাহার নাম শুনিয়া ধীরে ধীরে দরোয়ানের কাছে এসে একটা নমস্কার করিল। নাথুসিং আস্তে আস্তে বলিল, "জগু ভাই, তুহাকে বড়াবাবু বোলাইছে।" জগাই ধীরে ধীরে বল্লে, "তাইত, সর্দ্দার দাদা, টাকার যোগাড় যে কিছুতেই কোরতে পারিনি! শুধু হাতে বড়বাবুর কাছে গেলে পিঠের চামড়া তুলে দেবে, তা দাদা, তুমি আজ যাও, না হয় ৮।১০ দিন পরে একবার এসো। দেখ্‌ছো ত দাদা, কিরমক বছর পড়েছে,আজ তিন বছর বারবার হাজা হয়েইত মরে গেছি। তুমি যদি আমার গাইগরুটা নিয়ে গোটা দশেক টাকাও দেও, তবে আমি না হয় গাইটা তোমায় দিয়ে দিই।"

নাথু বলিল, "হামিত বল্‌বে, লেকেন দোস্‌রা দরোয়ান ভেজ্‌নেসে ক্যা করোগে। হাম তোমরা হাল চাল জানতা হ্যায়, লেকেন দোস্‌রা লোক ত ওসব সম্‌ঝবেনা। বিশ বরিস কাম করা হ্যায়, এ্যায়েছা বাবু হাম নাহি দেখা, কর্ত্তা বাবু ক্যা আদমি থা। ছোটবাবুকো ওয়াস্তে হাম নকরি নেই ছোড়্‌নে সেক্‌তা, ওহি বাবু হাম্‌কো নেহি জানে দেতা। তু এক কাজ কর্‌, ছোটবাবুকা পাশ যা, তেরা ভালা হোগা।"

জগাই। আচ্ছা, ছোট বাবুর মত বাবু কি আর আছে! এই দেখনা দাদা! হারুর শালারা তাদের ওখানে নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে কেবল আমিইত বাগড়া দিচ্ছি; আমার এতকালের বাব দাদার ভিটে সহজে ছেড়ে দিয়ে যাব গা? তারা ৩০।৪০ বিঘা জমি দেবে, তা ছাড়া ঘরদোর সব তৈয়ার কোরে দেবে। তবু আমি যেতে পারছিনে কেন জান? বাপপিতামহের ভিটে ছেড়ে যেতে মন সরেনা। শুনেছি জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। তাই কোথাও যেতে পারছিনা। দুর্ব্বলের বল দয়াময় হরি, তিনি যদি পায়ে রাখেন তবেই থাকব, নচেৎ যা ভাগ্যে আছে তাই হবে। তোমরা ত দেখেছ আমার বাপদাদারা কখনও বেগার দেয় নি, আজ দুবছর সকল কাজেই আমাদের আগের ভাগেই বেগার দিতে হয়।"

নাথু। হামি তবে চোল্লো, ছোট বাবুকা পাশ হাম সব বোল্‌বে।

নাথুসিং সবে বাঁশের লাঠিটা কাঁধে করে দাঁড়িয়েছে এমন সময় জগাএর অষ্টম বর্ষীয় পুত্র নবীন হাঁপাইতে হাঁপাইতে তথায় উপস্থিত হইল। জগাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে নোব্‌নে?" নবীন একটু দাঁড়াইল, ছেলে মানুষ প্রায় এক মাইল দৌড়ে এসে বড়ই ক্লান্ত হয়েছে। নবীন ধীরে ধীরে বোল্লে, "কাকা কই? মা শিগ্‌গির ডাকছে। আজ আবার আমাদের বাড়ী বিন্দে নাপতেনি এসেছিল।" জগাই হারুকে ডাক দিয়া নাথুসিংকে বোল্লে, "শুনছো, সরদার দাদা! এই কি জমিদারের কাজ! ভগবান, তুমিই বিচার কোরো।" জগাই ও হারু তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখীন হইল। অন্যান্য কৃষকেরা তাদের পানে চেয়ে রইলো। নাথুসিংও তাহার কাজে চলিয়া গেল। স্বার্থপর জগতে কে কার খোঁজ করে, যে অন্যান্য কৃষকেরা তাদের জাত ভাইদের খোঁজ কোরবে! তারা আপন মনে কাজে মন দিল।

(২)

রায় বাবুদের বড়বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় যেমন কুটিল, হিংসুক নষ্ট চরিত্র এবং প্রজাপীড়ক তেমনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ বিদ্বান, দাতা, দয়ালু ও পরোপকারী। প্রজাগণ বড়বাবুকে যেমন ভয় ও ঘৃণা করে, আবার তেমনি ছোট বাবুকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। বড়বাবু বিবাহিত এবং তাঁর একটী পুত্র সন্তানও হয়েছে, কিন্তু ছোট বাবু আজও অবিবাহিত। বড়বাবু কিছু দিন ছোট ভাইয়ের বিবাহের জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু হঠাৎ কে জানে তারপর সে বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। বড় বাবু প্রজার সর্ব্বনাশ সাধনে সিদ্ধ হস্ত, ছোট বাবু আবার প্রজার দুঃখমোচনে বদ্ধ পরিকর। বড়বাবু সময় সময় ছোট ভাইয়ের এইরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পার্শ্বচরদিগকে বলিতেন, "তা আমি আর কি করবো, যার বিষয় সে যদি উড়িয়ে দেয়, তার আমি কি কোর্ত্তে পারি বল? ওর জন্য আমার ছেলেটী যে পথে বোসবে তা হবে না। তাই জেনে শুনেই ৫।৬ বৎসর গেল জমিদারীর আয় ব্যয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রেখেছি, আমি কাঁচা ছেলে নই। বাপ মা ছোট রেখে মরে গিয়াছিলেন,আমি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি, এখন যদি নিজের স্বার্থ না বোঝেন, ওরই যাবে। আমার কি। কি বল?" পার্শ্বচরেরা অমনি তাহাতে সায় দিল।

(৩)

বড় বাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনে খুব জাঁক জমক হইবে। উপেনের প্রাণে আনন্দ আর ধরে না, গরীব দুঃখীদের পেট ভরিয়ে খাওয়াবার আজ অবসর মিলেছে, বড়বাবুও এ বিষয়ে এবার আর আপত্তি করেন নি, কারণ এতে নাম হবে। কিন্তু ভগবানের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে, একটী পরিবারের সর্ব্বনাশের মূল কারণ হোল এই অন্নপ্রাসন। জগাই চিরদিনই জমিদারের অনুগত, তাই বড়বাবু এবার তার উপর বেগারীদের ভার দিয়েছেন, আরও অন্যান্য প্রজাদেরও তত্ত্বাবধানের ভার জগাইয়ের উপর। জগাই পিতার আমলে জমিদার বাড়ীর তরকারী কুটিয়া দিত, এবারও সে নিয়মের প্রতি-কুলাচরণ করা হইল না। জগাইয়ের ছোট ছেলেটীকে ঠাকুর স্ত্রীর নিকট রেখে জগাইয়ের স্ত্রী নিস্তারিনী ৩।৪ দিন বাবুর বাড়ী কাজ করিতেছে। ভোজের দিন গ্রামস্থ ইতর ভদ্র সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল, জগাইও তাহাতে বাদ পড়িল না; তবে জগাই ও তাদের পাড়ার আর যে কয়জন তাহারা

সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইল। বিকাল বেলায় নিমন্ত্রণ খেয়ে জগাইয়ের স্ত্রী, হারুর স্ত্রী লক্ষ্মী হরিদাসের বাড়ীর ২টী বউ ও জগাইয়ের ছেলে বাড়ী যাইতেছে এমন সময় হঠাৎ বড়বাবু, কি কারণ জানি না সেই দিকে আসিয়াছিলেন। বধূরা খিড়কী ব'লে কেহ মাথায় খুব বেশী ঘোমটা না দিয়েই ধীরে ধীরে চলিতেছিল. কিন্তু হঠাৎ বড়বাবুকে সামনে দেখেই সকলেই সন্ত্রস্তা হইয়া যে যার মাথার কাপড় টানিয়া দিল. কিন্তু লক্ষ্মীর তাহাতে একটু বিঘ্ন ঘটিল। জগায়ের পুত্রটী তাহার মাথার কাপড় উঠাইয়া দিতে লাগিল. শেষে উপায়ন্তর না দেখে লক্ষ্মী হাত দিয়ে ঘোমটা টানিয়া ধরিল। বড়বাবু লক্ষ্মীর ভুবন মোহিনী রূপে, আত্মহারা হইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই জগাইকে ডাকাইলেন। জগাই উপস্থিত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যারে, জগাই! আর কেউ খেতে বাকী আছে? তোদের বাড়ীর ও পাড়ার সব এসেছিল ত? "জগাই জোড়হাতে বলিল, "আজ্ঞে, খেতে আর কেউ বাকী নেই, আমাদের বাড়ীর ও পাড়ার মেয়েরা এই একটু আগেই খেয়ে গেল। "বড়বাবু বোল্লেন; "তা বেশ হয়েছে! আচ্ছা, তোদের বাড়ীর বউমার সঙ্গে আরও তিনটী বউ এসেছিল তারা কে? তাদের মধ্যে একটী বউ খুব সুন্দরী, তার কোলে একটী ছেলে; বউটী যেন জগধাত্রী।" "আজ্ঞে, ছেলেটী আপনাদেরই চাকর আর সে যার কোলে ছিল সে তার খুড়ী; আর দুটী বউ হরিদাসের বাড়ীর "এই বলিয়া জগাই চুপ করিল। বড়বাবু সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "হারুর স্ত্রী! এত বড়টী হয়েছে, ওত শুনেছি বেশ বড় লোকের মেয়ে, না?"

জগাই। আজ্ঞে হা, নিশ্চিন্তপুরের মোড়লদের মেয়ে।

বড়বাবু। তারা যে তোদের সঙ্গে বড় কাজ কোরলে?

জগাই। আজ্ঞে, আপনার চরণ প্রসাদে জগাই বা ছোট কিসে! আজ দু বছর বারবার হাজা হয়েই একটু নাতোয়ান হ'য়ে পোড়েছি। আবার হুজুরের দয়া থাকলে আমার সময় ফিরতে কতক্ষণ। বড়লোকের মেয়ে বটে। কিন্তু মা যেন আমার স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকুরুণ, কোন কাজেই ওজর আপত্য নেই।

বড়বাবু। আচ্ছা, তুই এখন যা; খেয়ে দেয়ে বাড়ী যা, আজ আর তোর এখানে থাকতে হবে না।

জগাই বড়বাবুকে নমস্কার কোরে চলে গেল, বড়বাবু তখন ভাবিতেছেন, "চাষার ঘরে এত রূপ! জগাই! কেন তুই তোর ভ্রাতৃবধূকে আমার সামনে

এনেছিলি! হতভাগ্য! তুই যে স্বপ্নে ও ভাবিসনি যে তোর বড়বাবু তোর উপর নির্দ্দয় হবে! কিন্তু আজ যে আমি তাই হলুম রে। ওঃ! কি অতুলনীয় রূপ! এত রূপ ত কখনও দেখি নাই। ও রূপ কি চাষার ঘরের উপযুক্ত, ও যে রাজা রাজড়ার উপভোগ্যের জিনিষ। কেন তুই মরতে এ বিষ হাতে তুলে খেয়েছিস্। হায়! হায়! আমি কি করব?"

(৪)

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর ছয়মাস অতীত হইয়াছে, ক্রমাগত চেষ্টা ক'রেও বড়বাবু লক্ষ্মীকে লাভ কোরতে পারেন নি; হারু মাঠ থেকে এসেই দেখে নবীনের মাতা ও তাহার স্ত্রী ঘরের দাওয়ায় ব'সে কাঁদছে। হারু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লে, "বউ! কাঁদছো কেন?" নিস্তারিণী রেগে কাঁদিতে কাঁদিতে বোল্লে, "নিজেদের মেয়েছেলেদের মান ইজ্জত যদি রাখতে না পারবে তবে ডান হাতে কোরে এ ছাই খেয়েছিলে কেন? বিয়ে করে যদি তার মান রাখতে না পারলে, তবে এ বিয়ে করার দরকার কি ছিল? তোমাদের জমিদার না ছাই পাঁশ কি সেই আজ আবার বিন্দে নাপতিনীকে ঘটকী পাঠিয়েছিল, ছোটবউ বড়বাবুর বৈঠকখানায় যদি যায় তবে তাকে রাজরাণী ক'রে দেবে, এ গরীবের বাড়ীর খুদ কুঁড়ো খেতে হবে না! ওত ছেলে মানুষ তাই শুনেই কাঁদতে লাগলো, আমি সে মাগীকে বেশ শক্ত দুকথা শুনিয়ে দিয়ে নবীনকে তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছি। ভাই! হয় মান ইজ্জত রাখার ব্যবস্থা কর, আর না হয় এ গাঁ ছেড়ে চল অন্য গাঁয়ে যাই।" হারু রাগে গরগর করিতে লাগিল; এর মধ্যে জগাই হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী পৌঁছিল। হারুর নিকট সমস্ত কথা শুনে জগাই দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লে, "হায়! কেন আমি মরতে জমিদার বাড়ী বউমাকে নেমন্তন্ন খেতে পাঠালু, আজ তার ফল ফলছে।" নিস্তারিণী বোল্লে, "কেন? তাতে কি হয়েছে? সব দেশেই প্রজাদের ঝি বউ জমিদার বাড়ী খেতে যায়, তাবলে এমন সর্ব্বনেশে জমিদারের মত কেউ কোথাও বউ ঝিয়ের উপর নজর দেয় না। সে যাই হোক, খেয়ে দেয়ে যা হয় একটা বুদ্ধি করা যাবে, এখন আজ যে চাল বাড়ন্ত, আমরা না হয় নাই বা খেলুম, কিন্তু এই ছোঁড়াটা আর সেমন্ত বউটা না খেয়ে কি ক'রে বাঁচবে?" জগাই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুজিল। কিছুক্ষণ পরে জগাই বলিল, "দেখ, আমার মতে ছোট বউমা ও তুমি বাপের বাড়ী যাও, আমরা দুভায়ে খেটে খুটে কোন রকমে দিন গুজরাণ

কোরবো।" "নিস্তারিণী বলিল, "না, তা হবে না, আমরা সুখে থাকবো আর তোমরা অত্যাচারে পীড়িত হবে, সে সুখ আমরা চাইনা, বরং এখানে থেকে সবাই চল।" জগাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বোল্লে, "তা পারবো না, বাপ-দাদার ভিঠে ছেড়ে যেতে পারবো না। এখান থেকে যদি মরি তবে স্বর্গ লাভ হবে।" 'লোকে বলবে "বাপের ভিটে বজায় রেখেছে।' আমি কি এমন সোণার ভিটে ছেড়ে যেতে পারি?" এমন সময় বাহির হতে কে ডাকিল, "জগাই, ঘরে আছিস্? জগাই তাড়াতাড়ি বোল্লে, "তোমরা ঘরে যাও। আজ্ঞা হাঁ, ছোট বাবু, আসুন। ছোট বাবু উপেন্দ্রনাথ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। হারুকে ডেকে বোল্লেন, "হারু! যা ত বাজারে, এই পাঁচটা টাকা নিয়ে যা, চাল ডাল কিনে নিয়ে আয়, আমি ততক্ষণ বস্‌ছি।" হারু গামছা কাঁধে ফেলে বাজারে গেল; ছোটবাবু জগাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "হ্যাঁরে জগাই, তোর কত টাকা বাকী?" জগাই বোল্লে, "আজ্ঞে, হাল বকেয়া সবশুদ্ধ বোধ হয় ৮০৲।৯০৲ টাকা হবে।"

ছোটবাবু। এই দুশো টাকা নিয়ে যা, খাজানা ও দেনার টাকা মিটিয়ে দিগে যা। তারপর যা থাকবে ধান কিনে গোলাজাত ক'রে রাখিস। নাথু-সিং কে ব'লে যাব সে তোদের দেখ্‌বে, আমি ৫।৭ দিন মধ্যে বাড়ী হ'তে চলে যাব। তোর যাতে অনিষ্ট না হয় তাই ক'রে যাব।"

(৫)

উপেন্দ্র নাথ সপ্তাহ পরে বাটী হ'তে যাবার সময় জগাইকে ডেকে আরও ২৫৲ টাকা দিয়া গেলেন এবং বোল্লেন, 'ছাখ্, এখন থেকে তুই জন খাট্‌বি আর হারু বাড়ীতে থাক্‌বে, বেগার দিতে হ'লেও তুই যাবি।" এখন হারু সর্ব্বদাই বাড়ীতে থাকে যেন। বড়বাবু ছয়মাস নানারূপ প্রলোভন ও কৌশলে কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখ্‌তে না পেয়ে তাঁর পাপকর্ম্মের সহচর হরিদাসকে বোল্লেন, "তো ব্যাটারা খেতেই পারিস, কোন কাজের নয়। এক ব্যাটা কৈবর্ত্তের বুদ্ধির সঙ্গে তোরা কেউ পারলিনী। সে বারও গোয়ালার বউটা নিয়েও এইরূপ কেলেঙ্কারী, কাজ হাসিল হলোনা, মাঝ থেকে আমার বদনাম হ'লো।" হরিপদ বিনীত ভাবে বোল্লে, "তা কি করবো মশায়। আপনার ভাই-টীইত সবকাজে বাগড়া দেয়, গোয়ালাদের ওখানেও তাঁর জন্য অকৃত-কার্য্য, এখানেও তাই। হারু দাস আজকাল বাটী ছাড়া হয় না, তার সামনে

কে মশাই জান দিতে যাবে ; সে ভারী গোঁয়ার, এক লাঠি ঝাড়লে আর দানা পানি খেতে হবে না। জোর করে যদি আন্‌তে হয়,বলুন, আমি লোক জোগাড় করি, আপনারও এ কার্য্যে জোগাড় দিতে হবে। কেমন খরচ কোত্তে রাজী আছেন ত ? বড়বাবু বোল্লেন, "ছোড়াটার জন্যইত সব কাজ নষ্ট হয়। তুই বাপু জমিদারের ছেলে, সেইরূপ থাক্‌বি, তা নয় চাষাপাড়ার ঘুরে ঘুরে বেড়ান আর কার অসুখ, কার অন্নাভাব, কার পথ্যাভাব, কার বস্ত্র নাই, এই মোচন করে বেড়ান ; তাতে আমার আপত্তি নেই ত ; কিন্তু আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কি তার উচিত ? এবার বাড়ী এলে স্পষ্টই আমি বোল্‌বো, তুমি যা উড়িয়ে দেবে বা দান খয়রাৎ কোরবে সে তোমার হিস্যা থেকে বাদ যাবে, তোমার চেষ্টা তুমি করো ভাই, আমার আর উপায় নাই ; দেখবো তাহলে কত ধানে কত চাল।" হরিপদ তখন বোল্লে, "ঠিক থাকবেন মশাই, লক্ষ্মীকে সপ্তাহ মধ্যে আপনার অঙ্কলক্ষ্মী করে দেবো।" আমি এখন আসি।" হরিপদ চলিয়া গেলে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, "কাজটা কি ভাল হলো ? না, ওরা চারি পুরুষ আমাদের অনুগত প্রজা ; এখন উহাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি সবই গিয়াছে, কেবল ইজ্জতটুকু গেলেই সব গেল। ধর্ম্মে কি সইবে ? নিশ্চয় সইবে। ধর্ম্ম আবার কি ? কথায় আছে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" আমি জমিদার, আমার জমিদারীর মধ্যে যে উৎকৃষ্ট পদার্থ থাকবে তাহা আমারই ভোগ্য।" না, না, কাজ নেই থাকগে, গরীব লোক বড় দাগাটা পাবে। হায়! হায়! তা যে হয় না, তার রূপবহ্নি আমায় অহর্নিশি দগ্ধ করিতেছে। সে রূপ একবার সম্ভোগ করা চাই। যায় যাক যথাসর্ব্বস্ব, চাইনা জমিদারী, কেবল তাকেই চাই। পুলিশে না জান্‌তে পারে এরূপ চেষ্টা কোর্‌তে হবে, নইলে গুরুতর হবে।"

(৬)

সব স্থানেই ভাল-মন্দ লোক আছে, জগাইয়ের পাড়াপ্রতিবেশীরা সকলেই তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত কিন্তু দুর্দ্দান্ত জমিদারের ভয়ে বাহ্যিক সাহায্য কেহই করিতে পারিত না। জগাই ও হারু নিশ্চিন্ত ছিল না, তারাও গুপ্ত সন্ধানে যথা সময়ে হরিদাস ও বড়বাবুর কথা জানিতে পারিল। জগাই ও হারু দিন থাকতে ১০।১৫ দিনের চাল ডাল কিনে এনে ঘরে মজুত করিল। ২।৩ দিন, কোন উৎপাত ঘটিল না, চতুর্থ দিবসে সংবাদ পাইল

খুব সম্ভব অদ্য রাত্রে ডাকাত পড়বে।" জগাইও নাথুসিংকে একটা খবর দিয়া নিজেরাও আশু বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া সকলেই বড় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। নিস্তারিণী ও লক্ষ্মী বটি দুখানা কাছে রাখিল। জুগাই ও হারু বারাণ্ডায় লাঠি গোছাইয়া তামাক খাইতে লাগিল। জগাই একটু তন্দ্রাবিভূত হইয়াছিল, হঠাৎ বাইরের ঠকঠকানি শব্দে জাগরিত হইল। জগাই হারুকে বলিল, "ভাই! আজ আমাদের জীবনের শেষ দিন, তবে মনে যেন থাকে জীবন থাকিতে জাতি কুল ও মান যেন না যায়। মাকে যেন শূকরে স্পর্শ না করে।" এই সময় হঠাৎ সদর দরোজা ঝন ঝন শব্দে ভূমিশায়ী হইল। জগাই ও হারু লাঠি বাগাইয়া স্থির হইয়া রহিল। দস্যুরা, উঠানে যখন আসিল, তখন দেখা গেল তাহারা সংখ্যায় ১২ জন। বিপদ সঙ্গীন বুঝিয়া দুভাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। দস্যুরা ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া দুভাই দাওয়ার দুপাশ হইতে উঠানে নামিল। তাহাদিগকে দেখিয়া দস্যুরা বিকট একটা চীৎকার করিল। জগাই ও হারু প্রস্তুত ছিল তাহারাও নীরবে দস্যুদিগকে আক্রমণ করিল। হারু বেশ জোয়ান ও লাঠিখেলায় খুব পারদর্শী ছিল, তাই প্রথম আক্রমণেই দুইজন দস্যুকে এমন ভাবে আঘাত করিল যে তাহারা তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইল। দস্যুরা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কিরূপে আক্রমণ করিবে তাহাই ভাবিতেছিল, কিন্তু যখন দেখিল যে তাহাদের দুজন ঘাল হইল, তখন তাহারা সকলেই একসঙ্গে পূর্ণ বেগে আক্রমণ করিল কেবল একব্যক্তি লাঠিহাতে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। দস্যুরা আক্রমণ করিয়াই বুঝিতে পারিল শত্রু সহজ নহে, তখন তাহারা ইঙ্গিতে দুদলে বিভক্ত হইয়া দুজনকে আক্রমণ করিল। জগাই বয়সাধিক্য হেতু তেমন ক্ষিপ্রহস্ত ছিল না। দস্যুরা তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রতিবারেই তাহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল। হারু ইতিমধ্যে আরও একজনকে ঘাল করিল। জগাইও প্রাণপণ শক্তিতে নিজে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও একজনকে ঘাল করিল। কিন্তু তাহার হাত অবশ হইয়া আসিতেছে আর পারেনা। নিস্তারিণী ও লক্ষ্মী ঘরের দরোজায় দাঁড়াইয়া এই বীভৎস ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল, জগাইকে বিশেষ বিপদাপন্ন দেখিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটা শড়কি বাহির করিয়া নিস্তারিণী উঠানে নামিল। লক্ষ্মী তখনও বটি হাতে করে দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল। জগাই বড়ই হীনবল

হইয়া পড়িল এমন সময় একজন দস্যু সুযোগ বুঝিয়া তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া একটা লাঠি তুলিল, নিস্তারিণী স্বামীর আসন্ন বিপদ বুঝিয়া তখনই শড়কী দ্বারা তাহার বক্ষে আঘাত করিল সে চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। জগাই আর দাঁড়াইতে পারিল না, ধপাস করিয়া মাটিতে পড়িয়া গোঙাইতে লাগিল এবং হারুকে অস্ফুট স্বরে বলিল, "ভাই! আর বুঝি মাকে রাখতে পারলাম না।" হারু দাদার কাতরোক্তিতে দেহে শতগুণ বল পাইল, পুনর্ব্বার সিংহ বিক্রমে দস্যুদিগকে আক্রমণ করিল। জগাই পড়িতে একজন তাহাকে লাঠি মারিতে উদ্যত হইলে নিস্তারিণী এবারও তাহাকে শড়কীর দ্বারা সজোরে আঘাত করিল, সেও তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইল। হারুও আরও একজনকে ঘাল করিল বটে, সেও মাথায় ও ঘাড়ে সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। অবশিষ্ট দস্যু চারিজন ও পার্শ্বের দণ্ডায়মান একজন তখন গৃহের দিকে অগ্রসর হইল। দণ্ডায়মান ব্যক্তি লাঠিয়াল বা দস্যু নহে তাহা তাহার আচরণে এবং লাঠি ধরায় প্রকাশ পাইল। জগাই ও হারুকে পতিত দেখিয়া সে নিজে রিক্তহস্তে গৃহের দিকে অগ্রসর হইল। যেমন ঘরের দরজায় উপস্থিত হইল, "মা বিপদ বারিণি! রক্ষা কোরো" বলিয়া লক্ষ্মী হস্তস্থিত বটি সজোরে আগন্তুকের ঘাড়ে বসাইয়া দিল, এবং নিজেও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অবশিষ্ট চারিজন দস্যু একটু বিশ্রাম করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের সহগামীর আর্ত্তনাদে চমকিত হইয়া উঠিল এবং ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে গেল এমন সময় বাহির হইতে "মার মার" শব্দে একজন লোক আসিয়াই দস্যুদিগকে পিছন হতে আক্রমণ করিল। দস্যুরা ক্লান্তছিল তাহারা ফিরিয়া আগন্তুককে আক্রমণ করিবার অবসর পাইল না, তখন তাহারা পলায়নপর হইল আগন্তুকও ততক্ষণে পিছনের ডাকাতকে ধরাশায়ী করিয়াছে, দস্যুরা সভয়ে পলায়ন করিল। আগন্তুক আর কেহ নহে, নাথুসিং। নাথুসিং তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে গেল, দেখিল একটী পুরুষ স্কন্ধ কাটা হইয়া পড়িয়া আছে তাহারই অদূরে একটী স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। নাথু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং প্রজ্জ্বলিত ল্যাম্পটি ও এক ঘটী জল লইয়া বাহিরে আসিল। দাওয়ায় বসিয়া লক্ষ্মীর চোখে ২।৪ বার জলের ঝাপটা দিতে না দিতেই তাহার জ্ঞান হইল। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। নাথুসিং তখন উঠানে নামিল, জগাই ও হারুকে ধরিয়া একস্থানে

রাখিল, নিস্তারিণী এতক্ষণে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। নাথুসিং জগাই ও হারুর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল, কিন্তু বহুক্ষণেও চৈতন্য হইল না দেখিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। লক্ষ্মী দাওয়ার উপর হতে এই কান্না শুনে বটিখানা হাতে করে উঠানে নামিল। সে ধীরে ধীরে তাহার স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল এবং নীচু হইয়া হারুর গায়ে হাত দিয়া বুঝিল সে দেহে প্রাণ নাই তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া চকিতে বটিখানা সজোরে নিজের গলায় বসাইয়া দিল। নাথুসিং তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল, কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাই যে এতকাণ্ড হবে। লক্ষ্মী অস্ফুটস্বরে বলিল, "দিদি! তুমি মরোনা, নবীন আছে; আমাদের দুষমন মরিয়াছে; এখন ছোটবাবুই জমিদার হবে, আর পারিনা জল।" মুহূর্ত্তমধ্যেই সব শেষ, নিস্তারিণী কাঁদিতে চেষ্টা করিল,কিন্তু কে যেন তাহার কণ্ঠস্বর বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নাথুসিং আলো লইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দাওয়ায় উঠিল, তথায় দেখিল তাদের গুণধর বড়বাবু মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। নাথুসিং উচ্চৈস্বরে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা, ভগবানের কি মার। দেশ ঠাণ্ডা হোল, এয়েশা পাপী হাম কভি নেহি দেখা। পাড়াপ্রতিবেশীকে ডাকিয়া মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করিল এবং ছোটবাবুকে আনাইবার জন্য একজন লোক কলিকাতায় পাঠাইল।

(৭)

পরদিন সকালে মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা কোরে বাবুর বাড়ীতেও নাথুসিং খবর দিল। বড় বাবুর জ্ঞাতিরাও তাঁহার দেহের সৎকার জন্য লইয়া গেল। এ দিকে নাথুসিং এই সব ব্যবস্থা কোরে দিয়ে নিস্তারিণীর ঘরে তার ছেলের জন্য রাঁধিতেছিল এমন সময় থানার দারোগা ও গ্রামের হরিদাস এবং বড়বাবুর আরও কয়েকজন পার্শ্বচর তথায় উপস্থিত হইল। দারোগা আসিয়া নাথুসিংকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে ব্যাপার কি? এ রকম ডাকাতি ব্যবসা কতদিন শিখেছ?" হরিদাস বলিল, "মহাশয়! ঐ বেটার জন্যই ত বড়বাবু প্রাণে মারা গেলেন, ও বেটার কাছে লাঠি খেলা শিখে-হরিদাস ভারী পাকা খেলোয়াড় হইয়াছিল। ঐ বেটাই ডাকাতের সরদার।" দারোগা তখন কনেষ্টবল ও চৌকিদারের সাহায্যে নাথুসিংকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। নাথুসিং থানায় চালান হইয়া গেল, নিস্তারিণীর শেষ সহায়ও বিপদাপন্ন দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। নাথুসিং দারোগা বাবুকে বলিল, "হুজুর! এই স্ত্রীলোকটী অসহায়া, ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন চৌকিদার

মোতায়েন করুন নচেৎ জাতি মান কিছু থাক্‌বে না, আপনি আমায় বেঁধে নিয়ে যান, জেলে দেন তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু এর একটা ব্যবস্থা করুন।" হরিদাস্ মহা আপত্তি করিতে লাগিল কিন্তু দারোগা বাবু কি জানি কেন একজন চৌকিদার নিস্তারিণীর পাহারায় রাখিয়া গেলেন। বিকাল বেলায় ছোটবাবু বাটী আসিয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তখনই জগাইয়ের বাটীতে গেলেন। জগাইয়ের স্ত্রী ছোট বাবুকে দেখিয়া, "ছোটবাবু, আর কি দেখ্‌তে এসেছে গো।" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। উপেন্দ্রনাথ তাহাকে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা ক'রে বল্লেন, "ভয় কি মা! আমি তোমার সন্তান বিদ্যমান থাক্‌তে আমার ভাইয়ের ভাবনা কি, নবীন আমার ছোট ভায়ের মত থাক্‌বে। যাই দেখিগে নাথুসিংকে ছাড়াবার বন্দোবস্ত করিগে।" উপেন্দ্রনাথ নিস্তারিণীকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া এবং তাঁহার নিজের বিশ্বাসী দুজন দরোয়ান তাঁগার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করিয়া নিজে থানায় চলিয়া গেলেন। নিজে কোন সুদক্ষ উকিলের দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত পেশ করিয়া নাথুসিংএর মুক্তি ও অন্যান্য অপরাধীদের বিধান মত শাস্তি দেওয়ার প্রার্থনা করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং ছদ্মবেশে সমস্ত তদন্ত ক'রে নাথুসিংকে বেকসুর খালাস দিলেন এবং হরিপদ দাস প্রভৃতিকে উপযুক্ত সাজা দিলেন। উপেন্দ্র নাথুসিংএর সহিত বাড়ী পৌঁছলেই তাঁগার ভ্রাতৃবধূ তাঁহাকে বোল্লেন, "আর কি! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে ত? জমিদারী নিয়েছ এখন ছেলেটার গলায় টিপ্ দিয়ে মেরে ফেল, সব চুকে যাক্!" উপেন্দ্রনাথ সহজ স্বরে বলিলেন, "বউদি! আপনার ভুল হয়েছে, আমি জমিদারী নেবো কার জন্য? আমার কি পুত্র সন্তান আছে, না আমার স্ত্রী আছে যে তাদের জন্য বিষয় অধিকার কোরবো; এ বিষয় সম্পত্তি সবই দিজেন্দ্রের থাকিবে, আমি তাহার রক্ষক মাত্র। দাদা নিজের দোষেই সব হারালেন বইত নয়। আপনি যান আপনাকে যে দিন অমান্য কোরবো সেদিন যেন আমার মৃত্যু হয়। আপনি মাতৃ স্থানীয়া এবং চিরদিনই সে সম্মান পাবেন।" এদিকে জগাইয়ের বাড়াটি সম্পূর্ণরূপে মেরামত কোরে নিস্তারিণীকে তথায় পাঠাইলেন। নিজে সর্ব্বদাই তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। নবীনের মামা একবার নবীনকে নিতে এসেছিল, নিস্তারিণী ভাইকে বোল্লে, "না দাদা, যে ভিটে ছাড়্‌তে পারবে না বলে দুভাই জীবন দিলে, অমন সোণার লক্ষ্মী চোখে গেল, সেই ভিটে ছেড়ে নবীন কোথায় যাবে? যে এখানে থাক্‌বে,

তবুও লোকে বোল্‌বে, "বাপ দাদার ভিটে বজায় রেখেছে।" আশীর্ব্বাদ কর, ও যেন বেঁচে থাকে, তাছাড়া এখনত আমরা রাম রাজত্বে আছি।" উপেন্দ্রনাথ জগাই ও হারুর এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার শ্রাদ্ধ অতি সমারোহে সম্পন্ন করিলেন। তারপর তিনি জগাইয়ের বাড়ীর সামনে একটি সুন্দর তুলসী মঞ্চ গাঁথাইয়া তার গাত্রে খোদিত করিলেন, "বাপের ভিটে।" তার নীচে লিখাইলেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

খুড়োর উইল

(লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ বিএল)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(২৫)

দিন, সপ্তাহ, মাস কাটিয়া গেল। জ্যাক এখন প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু অর্থে যে মানসিক সুখ ও শান্তি আনয়ন করিতে পারে না, তাহা সে জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে। ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসাও তাহার পক্ষে এ অবস্থায় অসম্ভব!

জ্যাককে রাতদিন স্বর্ণখনির উপর নজর রাখিতে হইত। দুর্ব্বৃত্তেরা স্বর্ণলোভে আকৃষ্ট হইয়া এখনও মন্দ অভিপ্রায়ে আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুবিধা পাইলেই লুণ্ঠন করিতে উদ্যত হইত কিন্তু জ্যাক ও চোপ দলবলে পুষ্ট হইয়া তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিতে লাগিল।

একদিন স্বর্ণখনি হইতে একগাড়ী স্বর্ণ বোঝাই করিয়া গোপনে পারালুনায় পাঠান হইতেছিল; দস্যুরা সে সংবাদ পাইয়া পথে গাড়ী আক্রমণ করিল। জ্যাক এ কথা শুনিবামাত্র মিঃ চোপ ও জনকতক সশস্ত্র অনুচর লইয়া দস্যুর উদ্দেশে যাত্রা করিল। মধ্যপথে আসিয়া তাহারা দেখিল, একস্থানে একখানি গাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পাশেই একজন লোক অচেতন অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া। দুচার জন লোক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আহত লোকটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াও জ্যাক তাহাকে চিনিতে পারিল না। পরে পার্শ্বস্থ লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, যে, এই লোকটির

সহিত তিনজন ভদ্রমহিলা পারালুনা হইতে সিলভাররিজে যাইতেছিলেন। তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছেন। পথে দস্যুরা তাহাদেরও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

জ্যাক আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া চোপকে সঙ্গে লইয়া রমণীত্রয়ের উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিছুদূর গিয়া দেখিল, চারজন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক ঘোঁড়ায় চাপিয়া চলিয়াছে। জ্যাক বুঝিল, ইহারাই নিশ্চয় সেই পূর্ব্ব কথিত তিনজন ভদ্রমহিলা। জ্যাক ও চোপ তৎক্ষণাৎ দুজন পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। গুলির শব্দে একজন ভয়ে একটি স্ত্রীলোকের ঘোঁড়ার লাগাম ধরিয়া জোরে ছুট দিল। একজন গুলির আঘাতে নিহত হইল। অপর দুইজন অবশিষ্ট স্ত্রীলোক দুটিকে মুক্ত করিয়া দিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। জ্যাক নিকটে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল।

"একি মলি, এখানে ? তুমি—মেরী ? আমি কি স্বপ্ন দেখছি !"

মলি তখনও ভয়ে কাঁপিতে ছিল। জ্যাকের হাত ধরিয়া বলিল,—"জ্যাক, আমরা এসেছি,—তোমার কাছে। কিন্তু ক্লাইটিকে বাঁচাও !" এই বলিয়া যে দিকে ক্লাইটিকে দস্যু লইয়া গিয়াছে, অঙ্গুলি দ্বারা সেই দিক দেখাইয়া দিল।

জ্যাক তাহাদের সে স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে দিকে ঘোঁড়া ছুটাইল। পলাতক লোকটা তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্যাপার সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া ক্লাইটির ঘোঁড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিল। পরে নিজের ঘোঁড়া হইতে নামিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। জ্যাক নদীতীরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে অপর পাড়ে উঠিয়া বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

জ্যাক তখন ক্লাইটির নিকট আসিয়া তাহাকে ঘোঁড়া হইতে নামাইল। ভয়ে, মানসিক উত্তেজনায় ও পরিশ্রমে ক্লাইটি বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর বিশ্রামার্থ বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু মলি ও মেরী নিরাপদ শুনিয়া তিনি অনেকটা শান্ত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে জ্যাক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমাকে এখন বেশী কথা জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করতে ইচ্ছা করি না। তবুও তোমারা এ দূরদেশে হঠাৎ কি উদ্দেশ্যে এসেছ, তা ভাল বুঝতে পারছি না। জানবার জন্য বড় কৌতূহল হচ্ছে।"

ক্লাইটির মুখখানি লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন,—"মেরীর সঙ্গে আমরা এখানে এসেছি। তাহার স্বামী ষ্টিফেন রডনও আমাদের সঙ্গে এসেছে। তোমার এ ঠিকানা তার কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি।"

"মেরী আমার আসল পরিচয় জান তো। সেই দেখছি, এই বিশ্বাস ঘাতকতার কাজ করেছে। তোমরা তাহলে আমারই অন্বেষণে এসেছো।"

ক্লাইটি উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। জ্যাক পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল,—"তোমরা আমাকেই খুঁজতে এসেছ? কি দরকার জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

প্রথমবার উত্তর দিতে ক্লাইটি চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। পরে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—

"মেরীর মুখে শুনলাম, তুমি বিপদাপন্ন।"

জ্যাক উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দেহ তখন কাঁপিতেছিল; মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

"তোমরা শুনেছ যে আমি বিপদজালে জড়িত। তাই এসেছ। কিন্তু আসিবার কি দরকার ছিল?"

ক্লাইটি আর কিছু না বলিয়া তাঁহার অশ্রু ভারাক্রান্ত নেত্রদ্বয় তুলিয়া জ্যাকের মুখের দিকে তাকাইলেন।

"ক্লাইটি! ক্লাইটি! আমার নিষ্ঠুরতা ক্ষমা কর। এই বলিয়া জ্যাক ক্লাইটির পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁহাকে বক্ষে টানিয়া লইল।

(২৬)

ক্লাইটি ও মলি যে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছে, এ কথা লর্ড ষ্ট্যাণ্টন ব্যতীত আর কেহই জানিত না। তাঁহারা বাড়ীতে বলিয়া গিয়াছিলেন যে কিছু-দিনের জন্য বিদেশে বেড়াইতে যাইতেছেন। হেসকেথেরও মনে কিছু সন্দেহ হয় নাই। কারণ ভগ্নীদ্বয়ের বিদেশযাত্রার পূর্ব্বে এমন কিছু ঘটে নাই যাহাতে হেসকেথের মনে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতে পারে।

এদিকে ব্রামলেতে মহা হৈ চৈ লাগিয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলের যিনি পার্লামেন্ট মহাসভার সভ্য, তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে। দেশবাসীরা তখন হেসকেথকেই ঐ পদের জন্য প্রার্থী হইতে ধরিয়া বসিল। হেসকেথের ভদ্র ব্যবহারে সকলেই তুষ্ট। বিশেষতঃ সম্প্রতি নানা দাতব্য-সমিতিতে চাঁদা দিয়া তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। সভায়

তাঁহার দেশ হিতৈষিণী বক্তৃতা শুনিয়া দেশবাসী উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে সভ্য নির্ব্বাচিত করাইবার জন্ত ভোট সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে।

আগামী কল্য প্রত্যেক সভ্যপদপ্রার্থীর ভোট সংখ্যা নিরূপিত হইবার দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আজ সন্ধ্যায় হেসকেথ প্রকাণ্ড সভায় বক্তৃতা দিবেন, এরূপ পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল। প্রাতে হেসকেথ নিজ দলস্থ লোকমুখে সংবাদ পাইলেন যে ক্লাইটি ও মলি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। ভাবিলেন, ক্লাইটিকে সভাস্থলে উপস্থিত করিয়া তাঁহার পক্ষে দুকথা বলাইতে পারিলে অনেকটা সুফল ফলিতে পারে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া ক্লাইটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ব্রামলে হলের বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিতেই মলির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মলি তাঁহাকে জানাইল যে পথ ভ্রমণ জনিত ক্লেসে ক্লাইটি বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, এখন আর নীচে নামিতে পারিবেন না। হেসকেথ তখন মলির নিকটই তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তাহা ক্লাইটির পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া মলি দুঃখ জানাইল। কারণ ক্লাইটির শরীর বড়ই অবসন্ন। সভায় উপস্থিত হওয়া তাঁহার পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে। মলি তখন একটি ছোট বাক্স হেসকেথের হাতে দিয়া বলিল,—"আপনার জন্য বিদেশ হতে কিছু উপহার এনেছি। সামান্য জিনিষ,—কিছু মনে করবেন না। এখানে খুলবেন না। আমি এখন ক্লাইটির কাছে চল্লাম।" এই বলিয়া মলি চলিয়া গেল। হেসকেথও প্রস্থান করিলেন। পরে তাঁহার কারখানায় গিয়া আফিস ঘরে লিখিবার টেবিলের উপর বাক্সটি না খুলিয়াই ফেলিয়া রাখিলেন।

হেসকেথ যথা সময়ে সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই উপস্থিত জনমণ্ডলী আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল। হেসকেথ সকলের সহিত হাসিমুখে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এমন সময় দেখিলেন উই-দিকম্বে যে অসভ্য লোকটার সহিত তাঁহার বচসা হইয়াছিল, সে ভদ্রলোকের বেশ ধরিয়া অদূরেই বসিয়া রহিয়াছে। ইহার অর্থ তিনি সহজে বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন হয়ত তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু গোলযোগ ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই তাহার আসা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে উপস্থিত লোক সাধারণ তাঁহাকে কিরূপ সম্বর্দ্ধনা করিবে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি মনে মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলেন।

সভাপতি মহাশয় সকলকে সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। এমন সময় মিঃ গ্রাঙ্গার সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং সভায় স্যার উইলফ্রেড কার্টনকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ উইলফ্রেডের পাশে গিয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন,—

"কেমন আছেন? আপনাকে দেখে যে কতদূর সন্তুষ্ট হলাম, তা আর মুখে কি বলবো?"

উইলফ্রেড ক্লাইটি ও মলির সহিত একত্র না আসিয়া পরবর্ত্তী ট্রেণে ব্রামলেতে আসিয়াছিলেন। পাছে প্রকাশ্য ভাবে আসিলে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা লইয়া গ্রামে একটা হৈচৈ পড়িয়া যায়, এইজন্যই তিনি একাকী আসিয়া চুপি চুপি সভায় যোগদান করিতেছেন। বিশেষতঃ তিনি স্থির জানিতেন যে মিঃ গ্রাঙ্গার ও অপর দু'চার জন বৃদ্ধ লোক ব্যতীত কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না। আর চিনিতে পারিলেও, এখন সকলেই সভ্যনির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়াই উন্মত্ত, তাঁহার প্রত্যাগমন লইয়া আর একটা বেশী গোলযোগ করিবে না।

উইলফ্রেড উঠিয়া মিঃ গ্রাঙ্গারকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"এখানে আর গোলমাল করবেন না।" এই বলিয়া গ্রাঙ্গারকে পাশে বসাইলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। গ্রাঙ্গারের কথা পার্শ্বস্থ সকলেই শুনিতে পাইল এবং ঝড়ের মুখে শুষ্ক পত্ররাজির ন্যায় সে কথাও মুহূর্ত্তমধ্যে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিল এবং তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য আনন্দে করতালি দিতে লাগিল। সভাপতি মহাশয়ও উঠিয়া গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন এবং হেসকেথকে বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন।

স্যার উইলফ্রেড কার্টনের নাম শুনিয়াই হেসকেথ ভূতের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া লইলেন। তিনি কেনই বা ভীত হইবেন? উইলফ্রেড ত স্বেচ্ছায় কাগজে কলমে ক্লাইটিকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে! তিনি ত নিরাপদেই আছেন। হেসকেথ প্লাটফর্ম্মে বক্তৃতা করিতে উঠিয়াই প্রথম স্যার উইলফ্রেডকে আত্মীয় জ্ঞানে অভ্যর্থনা করিলেন ও তাঁহার প্রত্যাগমনে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। হেসকেথের সুদীর্ঘ উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল এবং কল্য

তাঁহারই যে ভোটসংখ্যা অন্যাপেক্ষা বেশী হইবে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। বক্তৃতা শেষে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ স্যার উইলফ্রেডের ও হেসকেথের প্রশংসাধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

সভাভঙ্গে সভাপতির বাড়ীতে এক বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় যাইবার সময় উইলফ্রেডকেও নিমন্ত্রণ করিয়া সেখানে লইয়া গেলেন। ক্লাইটি মলি ও লর্ড ষ্ট্যান্টন পূর্ব্ব হইতেই ভোজঘরে উপস্থিত ছিলেন। স্যার উইলফ্রেডকে লইয়াই সবাই ব্যস্ত। সকলেরই মুখে তাঁহার কথা। হেসকেথের প্রসঙ্গ তাহার মধ্যে ডুবিয়া গেল। স্বামীর এতাদৃশ সম্বর্দ্ধনায় ক্লাইটি মনে মনে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিলেন।

যথাসময়ে সভাপতি মহাশয় উইলফ্রেডের স্বাস্থ্যপানে করিলেন। তখন লর্ড ষ্ট্যান্টন আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"স্যার উইলফ্রেডের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী লেডী কার্টনেরও স্বাস্থ্যপান আমি সকলকে অনুরোধ করি।"

ভোজঘর নীরব হইল। সকলেই ষ্ট্যান্টনের মুখ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া উইলফ্রেডের দিকে তাকাইল। উইলফ্রেড ইত্যবসরে ক্লাইটির পার্শ্বে গিয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"আপনারা দেখে স্তম্ভিত হচ্ছেন, কিন্তু আমরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ। কবে বা কেমন করে আমাদের মধ্যে বিবাহ হলো, সে সব অনেক কথা। বহু ঘটনা অল্পকালের মধ্যে আমাদের জীবনে ঘটেছে। সে সব বলবার সময় এখন নহে, পরে সময়মত আপনাদের সব জানইব বহুকাল পরে আবার নিজের মাতৃভূমিতে আপনাদের সঙ্গে একত্র বাস করিবার উদ্দেশ্যে ফিরে এসেছি। আজ আপনারা আমাকে যে আদর অভ্যর্থনা করিলেন, আমি জীবনে তা কখনও ভুলতে পারবো না।"

নিমন্ত্রিত স্ত্রী পুরুষ সকলেই উঠিয়া দম্পতীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। সকলের কথার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। এই গোলমালের মধ্যে হেসকেথ চুপি চুপি সকলের অলক্ষিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। সিংহের গ্রাস হইতে কেহ তাহার শিকার লব্ধ প্রাণী ছাড়াইয়া লইলে, তাহার যেমন ক্রোধ, হিংসা ও অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, হেসকেথেরও অবস্থা ঠিক তদ্রূপ হইল।

হেসকেথ কারখানার অভিমুখে চলিলেন। মনে মনে বলিলেন তাহা হইলে উইলফ্রেডেব সহিত ক্লাইটি বিবাহিত! তাহার এত চেষ্টা সবই বিফল হইল।

উইলফ্রেডই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ইহা ভোগ দখল করিবে! আচ্ছা, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কারখানা হইতে তাহারও ত মাসিক আয় বিস্তর। আর্থিক অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল। কল্য আবার পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যও নির্ব্বাচিত হইতে পারেন! সে পদে নির্ব্বাচিত হওয়াও জীবনে কম গৌরবের কথা নহে! এরূপ বিভিন্ন ভাবের সমাবেশে ও ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল।

তিনি আফিস ঘরে ঢুকিয়া একটু মদ্যপান করিলেন; পরে অস্থির চরণে ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিলেন। এমন সময় টেবিলের উপর মলির সেই উপহারের ছোট বাক্সটি তাঁহার নজরে পড়িল। তিনি বাক্সটি তুলিয়া লইয়া দড়ি কাটিয়া খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন তাহার ভিতর ব্রামলে হলের চিহ্নাঙ্কিত একটি মদ্যপাত্র রহিয়াছে। গ্লাসের গায়ে একখণ্ড কাগজ জড়ান রহিয়াছে। কাগজটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন লেখা রহিয়াছে,—"মেরী সিটন কর্ত্তৃক প্রেরিত।"

ইহাই যথেষ্ট। কাগজের সহিত কাঁচের গ্লাসটিও তাঁহার হাত হইতে নীচে পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। তাঁহার বুঝিতে আর কিছুই বাকি রহিল না। এই গ্লাসেই যে তিনি একদিন ক্লাইটির পানের নিমিত্ত তরল বিষ ঢালিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মেরী সিটন ইহা কোথা হইতে পাইল? সেই বা কিরকম করিয়া এ ব্যাপার টের পাইল? তাহা হইলে মিস মলিও নিশ্চয়ই এসব সংবাদ পাইয়াছে। সেইত এই বাক্সটা তাহাকে উপহার দিয়াছে! বিচারে নিশ্চয়ই তাহার শাস্তি হইবে, হয় ফাঁসি নয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। লোক সমাজে মুখ দেখান ভার হইবে। তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি আর দাঁড়াইতে না পারিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

এ অবস্থায় এক চিন্তাই অন্ধকারের মধ্যে আলোর ন্যায় মানুষের মনে উদিত হয়—পলায়ন! ইহাই বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়! তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে গিয়া পোষাক পরিচ্ছদ গুছাইতে লাগিলেন। পরে ভোর হইতে না হইতেই ব্রামলে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। চাকরকে বলিয়া গেলেন যে হঠাৎ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ডাক্তারের উপদেশ মত বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তিনি এখনই বিদেশ যাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছেন!

প্রাতে কারখানার লোকজন কাজে আসিয়া এই আশ্চর্য্য সংবাদ পাইল। গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। হেসকেথের দলস্থ লোকজন হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার অবর্ত্তমানে তাহার প্রতিদ্বন্দীই মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

কেবল একজন এই গোলযোগের মধ্যেও একটু বিচলিত হয় নাই। মলি বাহিরে অপরের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তায় খুব বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু মনে মনে সে বড়ই সুখ ও শান্তি অনুভব করিল। এরূপ সহজ উপায়ে হেসকেথের ন্যায় একজন বদমায়েসকে হতবুদ্ধি ও ব্যর্থমনোরথ করিতে পারায় তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

(২৭)

গ্রামবাসীরাও বন্ধুবান্ধবগণ ক্রমে ক্রমে স্যার উইলফ্রেড ও ক্লাইটির বিবাহ সম্বন্ধিয় ঘটনাবলী অবগত হইল। ব্রামলে হলে পূর্ব্বের ন্যায় আবার বন্ধু বান্ধবের সম্মিলন ও প্রীতি ভোজের আয়োজন চলিতে লাগিল। প্রতিদিন যে প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা নির্জ্জন ও আমোদহীন বলিয়া সকলের চক্ষে প্রতীয়মান হইত, এখন তাহা আনন্দ ও স্নেহের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। উইলফ্রেডও অল্পদিনের মধ্যেই নিজের সদ্‌গুণের দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন ও তাহাদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। ইতি মধ্যে আর একটি শুভকার্য্য বিশেষ জাক-জমকের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। লর্ড ষ্ট্যাণ্টন ও মলি বহুদিন হইতেই পরস্পরের প্রেমমুগ্ধ। তাঁহারাও পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

একদিন মিঃ গ্রাঞ্জার স্যার উইলফ্রেডের সহিত দেখা করিতে আসিয়া জানাইলেন যে, হেসকেথ এখন অষ্ট্রেলিয়ায়, সেখান হইতে তিনি মিঃ গ্রাঞ্জারকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার শারীরিক অবস্থা বড়ই খারাপ, তিনি আর ইংলণ্ডে ফিরিবেন না. অষ্ট্রেলিয়াতেই বসবাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহার কারখানা বিক্রয় করিবার ভার মিঃ গ্রাঞ্জারের উপরই তিনি ন্যস্ত করিয়াছেন। মিঃ গ্রাঞ্জারের আন্তরিক ইচ্ছা যে, উইলফ্রেডই ইহা ক্রয় করিয়া লয়েন। উইলফ্রেডও তাহাতে সম্মত হইয়া বলিলেন,—"তা বেশ, আমিই উহা কিনবো। পৈতৃক কারখানা আর কেউ কিনবে, তা হতেই পারে না। এই কারখানা 'হতেই বাবা নিজের অবস্থা উন্নত করেন। ইহাই আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী।"

উইলফ্রেড বিষয়সংক্রান্ত নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। ইহার উপর আবার কারখানার কাজকর্ম্ম পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তজ্জন্য স্থির করিলেন, ষ্টিফেন রডনকে অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনাইয়া কারখানার কার্য্য পরিচালক নিযুক্ত করিবেন। সকলেই সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। পরদিনই রডনকে অষ্ট্রেলিয়ায় সেই মর্ম্মে টেলিগ্রাম করা হইল।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে সে লোকের হেসকেথ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, সেই রডনই আবার তাঁহার কারখানার পরিচালক ও অংশীদার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। পূর্ব্ব হইতেই এ কার্য্যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তদুপরি তাহার এখন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন তাহার ন্যায় পরিশ্রমশীল, কার্য্যদক্ষ কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক বড়ই বিরল। সে, অল্প দিনের মধ্যেই কারখানার অধীনস্থ লোকজনকে মিষ্ট কথায় ও ভদ্র ব্যাবহারে বশ করিয়া ফেলিল। পরন্তু মিসেস রডনও সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকিয়া কার্য্যে সহায়তা করিত।

* * * * * * *

মধ্যে মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া হইতে হেসকেথের সংবাদ আসিত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে. তাহার ন্যায় পাপী ও অসৎপ্রকৃতির লোকও এই বিদেশে আসিয়া ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সেখানে তাহার অনেক বন্ধুবান্ধবও জুটিয়াছে। প্রতিবেশীরা তাঁহাকে বিশেষ মান্যও করিয়া থাকে। কিন্তু এই ধনসম্পদ ও আর্থিক স্বচ্ছলতা তাহার মনে তিলমাত্র শান্তি দিতে সমর্থ হইল না। তিনি একাকী এক প্রকাণ্ড বাড়ীতে বাস করেন। বিবাহ করেন নাই। বাড়ীটি নানা মূল্যবান আসবাসে পরিপূর্ণ, মানুষকে সুখ ও আরাম দান করিতে পারে, এমন কোনও বিলাস দ্রব্যর অভাব সেখানে নাই। অনেকের দ্বারা বহুবার অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি আর ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন নাই। তাঁহার জীবনযাপনের অদ্ভুত প্রণালী, রোগজীর্ণ দেহ, মুখের বিমর্ষতা ও কঠিনতা দেখিয়া অনেকেরই মনে সন্দেহ হইত যে, এ লোকের অতীত জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার বিষময় কুফল আজ তাঁহাকে এরূপভাবে ভোগ করিতে হইতেছে।

ক্লাইটির দ্বিতীয় পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর, উইলফ্রেড একবার অষ্ট্রেলিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। সেখানকার স্বর্ণখনি হইতে এযাবৎ তিনি বিস্তর লাভ পাইয়াছেন। অথচ একবারও সেখানে না যাওয়া অন্যায়

বিবেচনায় তিনি অষ্ট্রেলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ক্লাইটী মলি ও ষ্ট্যাণ্টন ও তাঁহার সহিত যাইতে স্থির করিলেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া উইলফ্রেড একবার হেসকেথকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ক্লাইটিও সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পাছে তাহাদের সুখময় দাম্পত্য জীবনে দুঃখের ছায়া পড়ে এই ভয়ে মলি তাহাদের হেসকেথের পৈশাচিক অভিসন্ধির বিষয় আদৌ জ্ঞাত করে নাই। মলি ও হেসকেথের সাহত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও আপত্তি করিল না। কারণ, এ ক্ষেত্রে আপত্তি করিতে গেলে, সব কথা খুলিয়া বলিতে হইবে।

তাঁহারা হেসকেথের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ীতে বসিয়াই চাকরকে দিয়া হেসকেথকে তাঁহাদের আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। হেসকেথ বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার দেহ শীর্ণ, চক্ষু কোটরগত। বয়সের অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক বড় দেখাইতেছিল। গাড়ীর ভিতরে আগন্তুকদের দেখিয়াই তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। মৃতব্যক্তির ন্যায় মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ভয়ে তিনি পশ্চাৎ হাটিয়া আসিলেন। তাঁহার চক্ষের ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন কোনও ছায়ামূর্ত্তির দিকে তিনি তাকাইয়া রহিয়াছেন। ভয়ে ও ঘৃণায় হেসকেথের মুখের ভাব এত বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, যেন কে তাঁহার মুখে মৃত্যুকালিমা মাখাইয়া দিয়াছে। পার্শ্বস্থ চাকরের স্কন্ধে হাত রাখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেলেন।

উইলফ্রেড বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এর অর্থ কি? লোকটার চাহনি দেখে মনে হলো যেন ভূত দেখে ভয় পেয়েছে। মলি, তোমার দিকে ওরকম ভাবে তাকিয়ে রইল কেন? যাই, একবার ভিতরে গিয়ে খোঁজটা নিয়ে আসি।"

"না, না, আর যেতে হবে না। এর কারণ আমি বেশ অনুভব করতে পারছি। কিন্তু সে কথা বড় গোপনীয়। কাকেও বলব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। ওর কাছে যাবার আর প্রয়োজন নেই। হেসকেথকে আপনারা যেরূপ মন্দ বলে জানেন, সে তার চেয়ে আরও বেশী খারাপ। চলুন, আমরা চলে যাই।"

পরে ষ্ট্যাণ্টনের হাত ধরিয়া মলি বলিল,—"ষ্ট্যাণ্টন, তোমাকে একদিন এ সব কথা বলবো। কিন্তু আর কাকেও নয়।" মলির দেহ কাঁপিতে

ছিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি ভুল মনে করেছিলাম, বুঝি পাপের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হল না!"

সমাপ্ত

একাল সেকাল

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঠাকুর)

(২৭)

আহারে বসিয়া নির্ম্মলের মুখে হাত উঠিতেছিল না, অকারণ পীড়নের পীড়াটা অজাতশত্রুর প্রতি ক্রূরব্যবহারের মতই বাজিতেছিল, বুঝিতে কিছু বাকী না থাকিলেও অন্তর্লীনপাবক শমীর মত রমা তাহার হৃদয়ের জ্বালাটা হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওকি, হাত যে আপনার মোটেও নড়্ছে না?"

বার দুই থালার ভাতগুলি নাড়াচাড়া করিয়া নির্ম্মল মুখ তুলিয়া জবাব করিল—"হাতের ত এতে কোনই দোষ দিতে পারি না বৌদি, ভেতর থেকে যে তাকে জোর করে আকৃড়ে ধর্‌ছে!"

নির্ম্মলের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, বালিরুদ্ধ ফল্গুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল দেখা দিল, চোখ ভিজিয়া উঠিল, অতিকষ্টে আপনাকে সাম্‌লাইতে চেষ্টা করিয়া বলিল,—"বঞ্চনা করে যে নিজে রেহাই পাব, এমন আশা আমি করিও না, করা উচিতও না, সাম্‌নের ভাত ফেলে রেখে আসন থেকে যখন উঠে এসেছি, তখন কাল থেকে বাড়ীর কারুর মুখে ভাত যায় নি, এতে সন্দেহ কর্‌ব এমন সাহসও আমার নেই, আর অতগুলো মানুষকে উপোষি রেখে নিজে এই উপাদেয় ভোগ মুখে তুল্‌ব, এমনই কি শুভাদৃষ্ট আমি করেছি।"

"মনের খেয়ালে এমনত সবাই করে থাকে?" বলিতে বলিতে রমা থামিয়া গেল। নির্ম্মলের গাঢ় অশ্রু সহসা তরল হইয়া টপ টপ করিয়া ভাতের থালায় পড়িতেছিল, স্বর মোটা করিয়া রমা বলিয়া উঠিল,—"এ কি ছেলেমিই হচ্ছে, এর মধ্যে বঞ্চনাই কোথায়, অত মনগড়া ভাঙ্গাচুড়ার আশঙ্কাই কেন?

বাড়ীঘরত জলে তলিয়ে যায় নি, না খেয়ে যদি কেউ থেকেই থাকে ত, তাদের খাওয়াতেও কিছু অনেক সময় লাগবে না, বরং ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলে, মানুষ হারাণ জিনিষ ফিরে পেলে যত সুখী হয়, এতে যে তা থেকেও বেশী সুখ হবে।"

"ফিরে যাব'।" বলিয়া নির্ম্মল যেন মুহূর্ত্তে তাহার ভিতরটাকে একবার দেখিয়া লইল, শোভার সান্নিধ্যে লাভের লোভ তাহার শিরায় শিরায় জড়াইয়া ছিল, প্রলোভন যেন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার রাশ লইয়া তাহাকে টানাহেচড়া করিতেছে। জোড় দিয়া বলিল—"না বৌদি, ওটি আমাদ্বারা হয়ে উঠবে না, চিরপরিচিত পথে ফিরতে গিয়ে যখন আপনারই লোকের হাতে এমনি কার আঘাত পেয়ে এসেছি, তখন আর ফেরা হতেই পারে না, আমায় ঘর থেকে জোর করে যখন তাড়িয়েছে, তখন সারা জীবন পথে দাঁড়িয়ে থাকিত তবু আমায় দেখে নিতে হবে. এর শেষ কোথায়, আমায় কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।"

"সে হবে, এখন স্থির হয়ে খেতে, আরম্ভ করুন ত।"

বিমলার শুষ্ক মুখখানা মনে পড়িল, ফল্গুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, বালি ছাপাইয়া জল উপরে উঠিল, নির্ম্মল বড় জোরে সামনের থালাটা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—"স্থির হব, সে আর এ জীবনে হতে পারে না বৌদি, পাপ যে আমার কতখানি, সে নয়-ত তোমরা জাননা, কিন্তু লুকিয়ে রেখে আমিই কি শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি পাব, আমি খেতে বসেছি, কিন্তু মা ত আমার কাল থেকে উপোষ করে রয়েছেন।"

রমা দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিল, সান্ত্বনার স্বরে বলিল—"ছিঃ এমনটা নাকি কর্ত্তে আছে, তিনিই না খেয়ে থাকতে যাবেন কেন, ছেলে কি কারুর বিদেশে যায় না, না আপনিই নূতন বাড়ী থেকে বেড়িয়েছেন।"

"মাকে তা হলে তুমি জাননা বৌদি, সে যে পাগল।"

"এতেও যদি পাগল না হয়—"বলিতে বলিতে রমা মধ্যপথেই থামিয়া গেল, ধরা গলার স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল—"এতই ভাবতে পারেন ত কেন অতটুকু পারেন নি, আমি কিন্তু সেও ভেবে পাইনি।"

"যত গোল ঐখানে, আমিও আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পার্চ্ছি না, কোন্ শক্তি আমায় এমন করে টেনে নিচ্ছে, দাবী দাওয়া ছেড়ে আমার এ পরের ঘরের রত্নের লোভ কেন?"

রমা এতটুকু হইয়া গেল, কথাটা পুনঃ পুনঃ রমাকে খোচা দিতে লাগিল। নির্ম্মল বলিল—"দোষ আমায় তোমরা যত দাও, আমি তাতে না করি না, রাগ কর্ত্তে পারি সে অধিকারও আমার নেই, কিন্তু তোমরাও কর্ত্তে কিছু কসুর করনি ?"

ছোট্ট কথায় রমা জিজ্ঞাসা করিল—"তার মানে ?"

"বড় না পতিভক্তি তোমাদের।"

কথাটা না বুঝিয়া রমা বোকার মত চাহিয়া রহিল। নির্ম্মল যেন খোঁচা খাইয়া লাফাইয়া উঠিল। বলিল—"এরই এত বড়াই, স্বামীর সুখের জন্যে কর্ত্তেই হয়ত একটু লজ্জা ত্যাগ করা, এও তোমরা কর্ত্তে পার না, এতটুকুর জন্যে এতবড় জিনিষটাকে পদাঘাতে দূরে ঠেলে ফেল্‌তে পার।"

রমাও যেন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল,—"কখ্‌নও না, এ আপনার মনগড়া কথা।"

"মনগড়া, কিন্তু জান, এবার বাড়ী ছেড়েছি কেন ?

রমা জবাব করিল না, নির্ম্মল বলিল—"এক একটা কাজের জন্যেই একশ বার আমি তাকে অনুরোধ করেছি, কিন্তু পাল্লে তা কর্ত্তে, খেতে বসে পাঁচ সাত বার শান্তিকে দিয়ে ডেকে পাঠালেম, লজ্জা তাকে সে দিক ঘেস্‌তে দিলে না, রাগ করে ভাত ফেলে উঠে গেলাম, তবু সে লজ্জার ভেতর লুকিয়ে আত্ম-রক্ষা কল্লে, ঘুমটার ভেতর চোখের জলে মুখ ভিজিয়ে পতিভক্তি দেখান, যদি কোন কালে সেজেই থাকেত, এখন তা সাজ্‌বে না, একথাটা প্রাণ দিয়েই কি তাকে বোঝাতে পারলাম, এমন একটা কর্ত্তব্য ও তার মনে হলো না, যে, আমার চাই একে, এতে লজ্জা ভয় থাক্‌ বা যাক্‌ সে ত আমি দেখ্‌তে পারি না।"

"কিন্তু এও কি আবার একটা কারণ।" বলিয়া রমা ম্লান বেদনাভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, নির্ম্মল উত্তেজিত কণ্ঠেই উত্তর করিল—"কারণ নয় আমিত এর চেয়ে বড় কারণ আর দেখ্‌তে পাই নি।"

"ছোট দেশে দেখে আপনার দৃষ্টিশক্তি যে বড়য় বোধ হারিয়েছে, নীচুর দিকে দৃষ্টি করে পথ হাটাই যাদের অভ্যেস, তারা যে উপরে কি আছে তা জানতেই পারে না, তাদের তৃষিত চিত্ত যে লতাপাতাপঁচা কর্দ্দমাক্ত জলের দিকেই ছুটে চলে, স্বর্গমন্দাকিনীর ধারা যে দূরে থেকেও ঢাকা থেকেও কত পবিত্র, কত প্রীতিপ্রদ, কত স্বাদু, তাত সে জানতে পারেই না, জান্‌বার ইচ্ছাও তার থাকে না।"

"চাইও নি আমি তোমার দেখাছোঁয়ার বাইরের সেই পবিত্র জিনিষকে, আপনারই আপনাকে লুকিয়ে রেখেছে, তাকে খুঁজে বার করি অত শক্তি ত আমার যদিও নেই, তবু কিছু চেষ্টা কর্ত্তে ত্রুটি করি নি, এখন যে আমি ধৈর্য্যেরও বাহিরে গিয়ে পড়েছি।"

কিন্তু কথাটা বলিতে গিয়াই নির্ম্মলের হৃদয়ে যে খট্‌কাটা ভাসিয়া উঠিতেছিল। এখন তাহাই তাহাকে খোঁচা দিতে লাগিল, কতটুকু ঘটনাকে কতখানি করিয়া তবে সে বাটীর বাহির হইয়াছে, আর এবারকার এই বাড়ী ছাড়াটাও যেমন-তেমন নয়, শক্ত কথায় বিঁধিয়া সে পত্নী ও মাতার মুখের উপরই বলিয়াছিল "আর যে ফিরে আসব এমন ত ইচ্ছে নেই, কি জানি।"

নিজের সেই একটা কথাই বার বার তাহাকে ব্যাকুল করিতেছিল, এবার সে পূর্ব্বাপেক্ষাও শক্ত হইয়া উঠিল "আচ্ছা তুমিই বলত" বলিয়া সে আরম্ভ করিল—"কি যে তোমাদের ধর্ম্ম, কি যে তোমাদের স্নেহমমতা, সে কেবল তোমরাই বল্‌তে পার, আমি ত জানতুম, স্ত্রীলোকের পতির সুখস্বাচ্ছন্দ ছাড়া আর কোন প্রার্থনীয় জিনিষ পৃথিবীতে নেই, তারি জন্যে তোমরাই যদি এতটুকু ক্ষতি স্বীকার কর্ত্তে না পারত সেই বা পারতে যাবে কেন? ত্যাগের জন্যেই না ভারতের মেয়েরা সবার বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এই কি তোমাদের ত্যাগ, একটা জীবনের জন্য এতটুকু ত্যাগ কর্ত্তে জান না।" বলিয়া কঠিন হস্তে ভাতের থালা টানিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সহসা মুখ তুলিয়া রমার কম্পিত মুখ দেখিয়াই বলিল—"নানা, থাক এখন এসব আলোচনা, ঢলাঢলি কর্ত্তে গিয়ে আমার এমন সাধের ভোগটাকে কেন আমি ত্যাগ করি, এ আমি পারবও না, আমার ভবিষৎ আশা নেই।" বলিয়া রমাকে এক কথায় নীরব করিয়া দিয়া ক্ষীপ্রহস্তে ভাত মুখে গুঁজিতে লাগিয়া গেল।

(২৮)

"হাঁ গিন্নি, নির্ম্মল সত্যি চলে গেল?" বলিয়া সদানন্দ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পত্নী করুণাময়ী শক্ত সিমেণ্টের উপর উপুর হইয়া পড়িয়া অসারে অশ্রু মোচন করিতেছেন। সদানন্দ পত্নীর কাছটিতে ঘেঁষিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন যে এমন করে যাতায়াত কর্চ্ছে, আমি যে তাঠাউরে উঠতে পাচ্ছি না।"

করুণাময়ী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"যাতায়াতও সে যে আর বেশী দিন কর্‌বে, এমনত মনে হয় না!"

এত শান্ত, এত ধীর সদানন্দের বুকটাও যেন অজ্ঞাত আশঙ্কায় বার দুই কাঁপিয়া উঠিল। সহজ স্বরেই বলিলেন—"তার মানে?"

"মানে আবার কি, স্পষ্ট করেই ত বলে গিয়েছে, আর আস্‌তেও তার ইচ্ছে নেই।"

"কিন্তু আমার জন্যেত দুদিন সবুরও কর্ত্তে পার্ত্ত, কেন তার এই খেয়াল, সে কথাটাও যে আমায় বুঝ্‌তে দিলে না।"

"কেন?" বলিয়া গৃহিণী উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "আবার কেন, বৌমার আমার যেমন সৃষ্টি ছাড়া কাজ—"

সদানন্দ বাধা দিয়া বলিলেন—"ছিঃ গিন্নি, ও-কথা মুখেও এন না, বৌ যা পেয়েছ, তাতে ত সাতজন্মের তপস্যার ফল বলে স্বীকার না করে পারপাবার যো নেই।"

"তবু কেমন স্বভাব!"

"ঐ ত তোমাদের ভ্রম, মায় আমার স্বভাবে দোষ দিতে শত্রুও পারে না, বরাত, দেবতার কাজে বাধা দেবে এমন শক্তিই কার আছে। একত এত সব হচ্ছে, তার ওপর এমন মাকে দোষ দিয়ে লক্ষ্মী বিরূপ ক'র না।"

বিমলা পাশের কুঠরিতে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিতেছিল। শ্বশুরের "সত্যি চলে গেল।" কথাটা যেন তাহার কাণের গোড়ায় বিয়োগের অনন্ত প্রকৃতি লইয়া উপস্থিত হইতেছে। দুই দিন তাহার পেটে ভাত ছিল না, চোখে ঘুম ছিল না। আগাগোড়া ঘটনাটা যেন ছায়াবাজীর মত চোখের উপর ভাসিয়া উপহাসের তীব্র দৃষ্টিতে বিকল করিয়া তুলিতেছিল; স্বামী যে কেন এমন করিয়া ছুটিয়া পলাইতেছেন, সে না বুঝিতে পারিল তাঁহার কোন সঙ্গত কারণ, না বুঝিতে পারিল নিজের কোন ত্রুটির কথা। তবু কেন এমন করিয়া চলিয়া গেল। আর যাইবার সময় এমন রূঢ় কথাইবা তাঁহার মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল। যদিও পরোক্ষে হউক, প্রত্যক্ষে হউক, তাহাকেই শুনাইবার জন্য নির্ম্মল তীক্ষাগ্র তীরের মত কথাগুলি বলিয়াছিল, তথাপি মাতার মুখের উপর অমন শক্ত কথা বলা কি ভাল হইল, মাতৃহৃদয়ও যে তাহাতে গুরু বেদনা অনুভব করিয়াছে,

তাহাতে সন্দেহ করিবার মত কিছুই ছিল না। যদি সে অপরাধ করিয়া থাকে, তাহার জন্য যে শাস্তি তাহা যে বিমলার একারই প্রাপ্য ছিল, কিন্তু একের দোষে মাতার হৃদয়ে এ শেল হানা কি করিয়া উপযুক্ত পুত্রের পক্ষে সঙ্গত হইল, আজ দুদিন নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা করিয়া সে ঠিক করিতে পারিতে ছিল না। সকল চিন্তার উপর থাকিয়া থাকিয়া তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, তাহারই জন্য এই সোণার সংসারে এমন অশান্তির সৃষ্টি হইল। দাবানলের মত প্রবেশ করিয়া সে যে এই সাজান বাগান ভস্মে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহাতে তাহার এমন কি অধিকার, যে অধিকারের দাবী লইয়া সে আসিয়া এ বাড়ীতে দাঁড়াইয়াছিল, মালিক যে তাহার সে দাবীই অগ্রাহ্য করিয়া দিল, তবে এই শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি, ভাব স্নেহের পরিবর্ত্তে ঘৃণা বহন করিয়া সে কেন ইহাদের উপদ্রব হইয়া থাকিতে যাইবে, পৃথিবীতে আর কোন স্থান না থাকে, তাহার বৌদি কিছু তাহাকে ফেলিতে পারিবে না। বিমলা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। বৌদি শুনিয়া কি জানি তাহার কার্য্যে যদি বিরূপ হইয়া থাকেন, তবে সে দাঁড়ায় কোথায়, আকাশ পাতাল ভেদ করিয়া যেন একটা দুর্দ্দাম নাই নাই শব্দ বিমলার হৃদয়কে কম্পিত করিতেছিল, কিন্তু যতবড় প্রতিবন্ধকই উপস্থিত হউক, এখানে নিরাপদে থাকিবার জন্য এই মাতৃসমা শ্বশ্রু ও পিতৃসম শ্বশুরের যাতনা বর্দ্ধন করিতে সে আর পারিবে না, যে ভাবে যেমন করিয়া হউক, তাহাকে এ বাড়ী ছাড়িতেই হইবে। সহসা তাহার মনে হইল, বাড়ী ছাড়িলেই কি তাহার স্বামী ফিরিয়া আসিবে, না তেমন সম্ভব কি? বিমলার আশার বাতি নিবিয়া গেল। মনে মনে বলিল—"উজ্জ্বল ঘর আঁধার করে দিয়ে আমি যদি ঘর ছেড়েই যাই, তাতে গৃহস্থের কি হল, বরং উপস্থিত থেকে যে পথ দেখিয়ে দেব, সেটুকুও আমাদ্বারা হবে না—" কথাটার মীমাংসা হইতে না হইতেই সদানন্দের স্বর কাণে গেল, পিতার তুল্য শ্বশুরের এই একান্ত বিশ্বস্ত ধারণায় বিমলা আর আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিল না। চোখের জল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িল। সদানন্দ স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আস্‌তে ইচ্ছে নেই, কেন, জিজ্ঞাসা করনি গিন্নী।"

"জিজ্ঞাসা আমি তাকে কোন কথাই কর্ত্তে পারিনি।" বলিয়া করুণাময়ী আবারও কাঁদিয়া উঠিলেন। নিরুপায়ে সদানন্দও যেন একটু বিচলিত হইয়া

উঠিয়াছিলেন, বলিলেন—"সারা দিন কেঁদে চীৎকার করে ঘরের মাটিই ভেজাবে, আরত তাতে কোন ফল হবে না, এসব ছেড়ে দাও, যাতে কাজ হবে তাই কর গিয়ে।"

"কোনটায় কিছু হবে না, বাছা যে আমার বৌমার ও'পর রাগ করেই গিয়েছে, তা আমি খাটিই বলতে পারি।"

"মাগো"বলিয়া বিমলা পাশের কুঠরীতে মাটীর উপর পড়িয়া গেল। সদানন্দ বলিলেন—"দেখ গিন্নী, বুদ্ধি তোমার জীবনেও হল না, যা নয়, সেই কথা নিয়ে কেন তোলপাড় কচ্ছ, একেত মা আমার আধমরা হয়ে রয়েছেন, একথা শুনলেত তাকে বাঁচিয়ে রাখা দায় হবে।"

"বেঁচে আমি চিরকাল থাকব।" বলিয়া বিমলা আসিয়া শ্বশুরের পায়ের গোড়ায় বসিয়া পড়িল। সজলচক্ষে বলিল—"দোষ যে আমার, সেকথা কাউকে বলে দিতে হবে না, আমিই যে বাবা, এ সংসারকে লক্ষ্মী ছাড়া করেছি।"

"ছিঃ মা", বলিয়া সদানন্দ আদর করিয়া পুত্রবধূর হাত ধরিলেন, বলিলেন —"এমন প্রত্যক্ষ লক্ষ্মী যার ঘরে রয়েছেন, সে ঘর ছেড়ে লক্ষ্মীকে যদি বিদায়ই নিতে হয় ত, তাঁকে যে পৃথিবীই ছাড়তে হবে, তুমি দুঃখ কর না মা, আমার খুব ভরসা আছে, সে যেখানেই যাক, আর যে খানেই থাকুন, দুদিন দশদিন নয়, যাড়ে শনি চেপেছে, সেই তাকে ঘোরাচ্ছে, তুমি যদি আমার ঘরে অচলা হয়ে থাক, তবে দুদিনে হ'ক দুবছরে হক, তাকে যে আবার এ ঘরে ফিরে আসতেই হবে।"

বিমলা সদানন্দের পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল—"আশীর্ব্বাদ করুন বাবা, আমার জন্য যেন এ ঘর অন্ধকার হয় না, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি যেন আপনাদের সুখ দেখতে পাই। আর তুমিও আশীর্ব্বাদ কর মা, তোমায় এই মেয়ে যেন তোমার গুণ, আর তুমি যে গুণে এ সংসারকে উজ্জ্বল করে রেখেছে, যতই বিপদে পড়ি, আমি যেন সে গুণ থেকে বঞ্চিত না হই, ঐ একটি গুণ যদি আমার থাকে, তবে আমিও আবার তোমাদের সুখী কর্ত্তে পারব, এ কথা জোর করেই বলতে পারি।" বলিয়া সে শ্বশুরের পা হইতে মাথা উঠাইয়া শাশুড়ীর পায়ে রাখিল।　　　　(ক্রমশঃ)

ঝি

লেখক—শ্রীসত্যকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

যতীন্দ্রনাথ বাহিরের ঘরে গড়গড়ার নল মুখে দিয়া দূর অতিদূর অতীতের সুখদুঃখে বিজড়িত স্মৃতির পাতাগুলি উলটাইয়া যাইতে ছিল। সে যখন অতীত স্মৃতি-সাগরে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া তলাইয়া দিয়াছিল; এমন সময় দরজার পার্শ্বে একটি আন্দাজ ৩০।৩৫ বয়স্কা রমণী ধীর পদ-বিক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "ঝি রাখবেন?" যতীনের কাণে কথাটা পৌঁছিল না। সে তখন অতীতের কথা ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। রমণীর বদনে বসন্তের চিহ্ন। গাত্রের বর্ণ শ্যাম। বসন্তের দাগে তাহাকে অতি বিশ্রী দেখাইতেছিল। সে পুনরায় কাতর কণ্ঠে বলিল "বাবু ঝি রাখবেন?" যতীনের চমক ভাঙ্গিল, সে রমণীর পানে মুখ তুলিয়া তাকাইল। তারপর বলিল "রাখব, কত মাহিনা চাও।" ঝির প্রাণটা একবার হা, হা করিয়া উঠিল। সেতো মাহিয়ানা চায় না, শুধু এ বাড়ীতে থাকিতে চায়। তাই সে বলিল "আমি এমনই সকল কাজ করিয়া দিব। কিছুই লইব না, শুধু খোরাক পোষাক। যতীন্দ্রনাথ ঝির কথা শুনিয়া সুখী হইল। সে ঝিকে ভিতরে স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া পুনরায় ভাবিতে বসিল।

* * *

যতীন্দ্রনাথের ভাবিবার কাঁদিবার অনেক কারণ ছিল। যখন সে প্রথম কমল প্রভাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল, তখন তাহার কোনও কষ্ট বা দুঃখ ছিল না। ছিল কেবল সুখ, শান্তি, আর ছিল কমলের মধুময় ভালবাসা, সে ভালবাসা যতীন্দ্রনাথকে এক এক সময় পাগল করিয়া তুলিত। তখন কমল পূর্ণ যৌবনা—ষোড়শী। সে রূপের মোহে পাগল হইয়া যতীন্দ্রনাথ আপনাকে কোথায় হারাইয়া ফেলিত। সে তাহার কমলকে নিয়তই নিজ চোখের সম্মুখে রাখিয়া কমলের কমল বিনিন্দিত মুখখানি দেখিতে চাহিত। কমলের দু একটি সুধা মাখা কথা শুনিবার জন্য সে অধীর হইয়া উঠিত। যতীন্দ্রনাথ নাকি পূর্ব্বে একটুক্ আধটুকু কাব্য চর্চ্চা করিয়াছিল। তাহার ফলে সে কমলের নিকট যখন তখন কবিতার কলি নিজেঁ রচনা করিয়া বলিয়া যাইত।

একদিন সন্ধ্যার পর যতীন্দ্র বেড়াইয়া আসিয়া সোফার উপর শুইয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া তাহার দিকে হা করিয়া তাকাইয়া বলিয়া বসিল—

"আকাশের মত টানি প্রশান্ত চির অনিমেষ আঁখি
সাধ হয় যুগ যুগান্ত তোমা পানে চেয়ে থাকি।"

কমলা ছোট্ট একটি "যাও" বলিয়া স্বামীর পদতলে বসিয়া পড়িল। যতীন্দ্রনাথ কমলের চিবুক ধরিয়া বলিল "আমাদের এখন কেমন সুখের সংসার বল দেখি কমল? এ রকম ভাবে থাকতে ইচ্ছা কি হয় না তোমার?"

আবার সেই কবিতার উৎস যতীন্দ্র সুর মিলাইয়া বলিল—

"চলিয়া যাইবে শত শত যুগ আবার আসিবে ঘুরে
এইরূপ মোরা রহিব দুজনে কভুনা চাহিব ফিরে।
তুমি আমি ছাড়া আর যেন কেহ নাহি এ বিশ্ব'পরে
প্রেমের আলোক মোদের ঘিরিয়া ছড়ায়ে পড়েছে দূরে।"

কমল নিতান্ত উত্যক্ত হইয়া কৃত্রিম ক্রোধের ভান করিয়া বলিল—"যাও ও রকম কর যদি আমি চলে যাব।" যতীন্দ্রনাথ আবার আরম্ভ করিল।

"তুমি যে আমার আপনার জন নিতান্ত আপনারি
এই পৃথিবীর সকল ছাড়িব, তোমারে ছাড়িতে নারি।"

কমল আর থাকিতে না পারিয়া স্বামীর বাহুবন্ধন ছিন্ন করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পুনরায় যতীন্দ্রনাথ সহাস্যে আরম্ভ করিল—

"তুমি একি বসন্ত, আশা অনন্ত, জাগালে আমার প্রাণে
একি চেতনা, হর্ষ, বেদনা, জাগালে হৃদয় মনে।"

কমলপ্রভা স্বামীর এই সব উৎপীড়নে অধীর হইয়া বলিল "ছেড়ে দাওনা" যতীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণ তখন কি এক অতৃপ্ত নেশায় বিভোর হইয়া গিয়াছিল সে বলিল কেবল একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব, বলবে।" কমল স্বামীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ভাবিয়া বলিল "বল, যদি পারি বলব।" যতীন্দ্রনাথ সহাস্যে বলিল "আচ্ছা বলত কমল—

"কে সে লুকায়ে মোরে দেয়না দেখা
যেথা সেথা দেখি তার চরণ রেখা।
কে সে স্বপন মাঝে মোরে দেখা দেয়
কে সে আমায় ফে'লে মোহন মায়ায়।"

বলিয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কমল এতটুকু হইয়া বলিল "তোমার পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও।" বলিয়া জোর করিয়া বাহুবন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। যতীন্দ্রনাথ হাতের উপর মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিল, কমল কি সুন্দর! এই রকম সুখেই কি তাহার জীবন তরী অন্ধকার গর্ভে ডুবিয়া যাইবে? কে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিবে।

পরদিন যখন ঠিক ঐ সময় যতীন আসিয়া সোফার উপর গা ঢালিয়া দিল, তখন কমল জিজ্ঞাসা করিল "আমাদের বাড়ীর পাশে যে জমিদারটি এসেছে সে লোক ভাল নয়?" যতীন্দ্রনাথ মাথার ঘাম মুছিয়া বলিল, "সম্ভব! কেন বল দেখি।"

"আহা! তার স্ত্রী যেন সতীলক্ষ্মী। তুমি ত তাকে দেখেছ—বেশ দেখতে নয়?" যতীন্দ্রনাথের কবিতার উৎস আর বাধা মানিল না—বলিল—

"আকাশে বাতাসে তার নিশ্বাস ভাসে
ফুলের ভিতর সে যে মধুর হাসে
কুসুম দলের মাঝে সে করে শয়ন
সে যে স্নিগ্ধ দেহ-বাসে মাতায় পবন।"

কমলা মনে করিয়াছিল স্বামীর চক্ষে তাহার অপেক্ষা সুন্দরী আর নাই। অতএব তিনি তাহাকে কুৎসিৎ বলিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যখন সে যতীন্দ্রনাথের মুখ হইতে এই কথা শুনিল, তখন জ্বলিয়া উঠিল। কি জানি কেন স্বামীর উপর তাহার এ অবিশ্বাসের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সকল ভালবাসা যে স্বামীর একটা কপটতা মাত্র, তাহা সে অনুমান করিয়া লইল।

তারপর স্বামীর দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যতীন্দ্র ব্যাপারটা ভাল রকম বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে তখন কমলের মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিতেছিল। সে কমলের কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই সোফার উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রার ক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িল। ভোরের আলো যখন জানালার মধ্য দিয়া গৃহে আসিয়া যতীন্দ্রনাথের মুখের উপর পড়িল, তখন সে সোফার উপর বসিয়া চোখ রগড়াইতে লাগিল।

বাহিরে চাকর চাকরাণীরা গোলমাল করিতে ছিল, সেই কোলাহলের মৃদু শব্দ যতীন্দ্রের কাণে আসিয়া প্রবেশ করিল। যতীন্দ্রনাথ উঠিয়া

যাইতেই একটা চাকর ছুটিয়া আসিয়া বলিল, “বাবু বাইরের দরজা খোলা, মাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিনা। অনেক করে খুঁজেছি।” যতীন্দ্রনাথের প্রাণের ভিতরটা একবার হাঃ হাঃ করিয়া উঠিল। কাহারও কথায় বিশ্বাস না করিয়া সে একবার নিজে সব ঘরগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও কমলের সন্ধান পাইল না। যতীন্দ্রের হৃদয় তখন কমলের হাতখানি ধরিয়া বলিতে চাহিতে ছিল, “কমল আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমার অগাধ স্নেহ ভালবাসা পায়ে ঠেলে পলাইলে।” সে ধারণাই করিতে পারিল না যে কমল তাহার অসচ্চরিত্রা, কমল তাহার অবিশ্বাসী। কিন্তু একথা যে বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। এমন সময় শুনিল পাড়ার জমিদারটি স্ত্রীকে ছাড়িয়া পালাইয়াছে। কাল রাত্রে ইহারই জন্য কমল তাহাকে জমিদার হরেন্দ্রনাথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল, যতীন্দ্র স্থির বুঝিল হরেন্দ্রের সহিত কমল পালাইয়াছে। যতীন্দ্র মরমে মরিয়া গেল।

*　　*　　*　　*　　*

যতীন্দ্র কমলের স্মৃতি ভুলিবার জন্য বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে পুনরায় বিবাহ করিল, কিন্তু কমলের সেই সুমধুর স্মৃতি ভুলিতে পারিল কৈ? সেই অতীতের স্মৃতি এক একটা মনে পড়িয়া তাহাকে সকল সময়েই সূচীবিদ্ধ করিত; সে স্বপ্নেও ভাবে নাই—তাহার কমল এমন। এমন সুখের সংসার আঁধার করিয়া দিয়া সে কোথায় পলাইল। কমল পলাইবার প্রায় ৮ বৎসর পরে একদিন যতীন্দ্র কমলেরই কথা ভাবিতেছিল, এমন সময় একজন রমণী আসিয়া বলিল, “বাবু ঝি রাখবেন,” তারপর কি হইল সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

সেই হইতে ঝি তাহাদের বাসায় রহিয়া গেল। সে সকল কাজকর্ম্ম সারিয়া যতীন্দ্রের স্ত্রী হেমনলিনীর ছোট ছেলেটিকে লইয়া আদর করিত, শত শত চুম্বনে তাহার গণ্ডখানিকে ভরাইয়া দিত। আর যখন যতীন্দ্রনাথ হেমনলিনার সহিত বাক্যালাপ করিত, তখন কেন জানিনা নূতন ঝিটি সেই দিকে তাকাইয়া থাকিত। তাহার অজ্ঞাতসারে দুই এক বিন্দু অশ্রু ক্রোড়াস্থিত খোকার উপর ঝরিয়া পড়িত। তাহার প্রাণের মধ্যে এক মর্ম্মন্তুদ হাহাকার জাগাইয়া তুলিত, আর যদি যতীন্দ্রনাথ ডাকিত, “ঝি ঝি।” সে তাড়াতাড়ি অশ্রু মুছিয়া বাবুর নিকট আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইত, কিন্তু তাহার সেই সিক্ত মুখখানি যতীন্দ্রনাথের চোখ এড়াইতে পারিত না। যতীন্দ্রনাথ

জিজ্ঞাসা করিত, "ঝি কাঁদছিলে ?" ঝি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় উত্তর দিত, "না বাবু" বলিয়া সরিয়া যাইত। যতীন্দ্র ব্যাপারটা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, মনে করিত—বোধ হয় নূতন ঝির বাটীর কথা মনে হওয়ায় এ ক্রন্দনের কারণ। কিন্তু হায়—যতীন্দ্রনাথ কি করিয়া ঝির মর্ম্ম ব্যথা জানিবে? কি করিয়া অপরের প্রাণের কথা নিজ হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে!

* * * * *

শীতের শেষে কলেরা আর বসন্তে সহরখানির উপর বেশ প্রভুত্ব বিস্তার করিল। প্রত্যহ ১০।১২ জন লোক গতাসু হইতে লাগিল।

সেই কলেরায় যতীন্দ্রনাথকেও আক্রমণ করিল, চাকর চাকরাণীরা একে একে পলাইল। রহিল সেই 'নূতন ঝি।' যতীন্দ্রনাথের পীড়ার কথা শুনিয়া সে যেন কেমন এক রকম হইয়া গেল। সদা বিষণ্ণ মুখখানির উপর যেন বিষাদের অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া উঠিল। সে একবার গৃহ দেবতার নিকট মাথা খুঁড়িয়া 'মানত' করিল, তারপর বাবুর রোগশয্যার পাশে ছুটিয়া গেল। শুধু হেমনলিনী তাহার শিয়রে বসিয়া যতীন্দ্রনাথের শুশ্রূষায় রতা। তাহাকে দেখিয়াই হেমনলিনী বলিল, "ঝি তুমি যাওনি! এখনও আছ যে?" সে একবার উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া করুণস্বরে বলিল. "বাবুকে একটু ভাল না দেখে কোথাও যাব না। তুমি উঠে যাও আমাকে একটু সেবা কর্ত্তে দাও?" তারপর শয্যার একপার্শ্ব অধিকার করিয়া প্রাণপণে সেবায় লাগিয়া গেল। আহার নাই, নিদ্রা নাই শুধু যতীন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিত। দিন পনের পরে যে দিন ডাক্তার ঝির সেবাশুশ্রূষা ও কার্য্য-কুশলতাই যতীন্দ্রনাথকে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছে বলিয়া গেলেন, সে দিন আর ঝির আনন্দ ধরে না। সেই দিন রাত্রে যতীন্দ্রনাথের একটু জ্ঞান হইতেই শুনিল যে, তাহার শিয়রে বসিয়া কে যেন রোদন করিতেছে। কাহার যেন তপ্ত অশ্রু তাহার গায়ের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে।

ঝি যে কয়দিন সেবা করিয়াছিল সে কয়দিন সে একবারও হেমনলিনীকে সে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। হেমনলিনীও ঝির হাতে স্বামীকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিল।

* * * * *

যে দিন যতীন্দ্রনাথ পথ্য পাইল তার ৫।৬ দিন পরে ঝিকেও সেই কাল রোগ আসিয়া আক্রমণ করিল। পূর্ব্ব হইতেই স্বামী স্ত্রীর উভয়েরই একটা

ভক্তি আসিয়া ঝির উপর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ যে তাহারই জন্য এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সে ঝির অসুখে বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। যতীন্দ্র ও হেমনলিনী তাহার সেবার ত্রুটি করিল না। তাহারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন সন্ধ্যায় যখন যতীন্দ্র একাকী সেই কক্ষে বসিয়াছিল, সেই সময়ে ঝি তাহার শীর্ণ হাত দুইখানি দিয়া চকিতে যতীন্দ্রের হাত দুইটী ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"স্বামী, দেবতা চিন্তে পেরেছ তোমার কমলকে, তোমার উপর যে অবিশ্বাস করে ঘর হ'তে বের হয়ে গিয়াছিলাম তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে। কি করে তোমায় বিশ্বাস করাব যে আমি এখনও আমার সতীত্ব হারাই নি। স্বামীন! বিশ্বাস কর্ব্বে সে কথা! তোমার কাছে আসবার জন্য, তোমার সেই কবিতা শুনিবার জন্য আমি এই আট বৎসর যে কি অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেছি তা বুঝাইবার শক্তি আমার নাই! তুমি না বিশ্বাস করো কিন্তু আমি এই মরণ-কালে তোমায় ছুয়ে শপথ করে যাচ্ছি, যে এখনও আমার সতীত্ব হারাই নাই। আমার সময় হ'য়ে এসেছে; আমায় ক্ষমা কর। যতীন্দ্রের চক্ষু বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; সে নির্ব্বাক হৃদয়ে তাহার সাধের কমলকে একবার বক্ষে জড়াইয়া ধরিল, এমন সময় কক্ষের দ্বার খুলিয়া হেমনলিনী প্রবেশ করিয়া বলিল, "দিদি আর কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক আমি বিশ্বাস করি—তুমি সতী। দিদি তুমি একবার তোমার ছোট বোনটীর দিকে চেয়ে দেখ। দিদি, দিদি! যতীন্দ্র তখনও কমলের দেহলতাকে আকড়াইয়া ধরিয়াছিল। গৃহের কোণের প্রদীপটা একবার দপ্ করিয়া উঠিল। সেই প্রদীপের আলোকে তাহারা চাহিয়া দেখিল কমলের মুখ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। ওষ্ঠে ক্ষীণ হাস্যরেখা, দেহ তুষার শীতল।

পুরাতন ভৃত্য

লেখক—শ্রীহীরণকুমার বসু

(১)

সেদিন শনিবার—পাটনা সহরের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার সুধীন্দ্রনাথ রায় (ওরফে মিষ্টার রায়) তাঁহার বৈঠকখানা গৃহে বসিয়া কয়েক জন বন্ধুবান্ধব সহ নানাবিধ গল্পে নিযুক্ত ছিলেন! যখন তাঁহাদের হাস্যালাপের উচ্চরোল সেই

গৃহকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে সেই সময়ে একটা কৃষ্ণবর্ণ লোমশ বৃদ্ধ অতি ব্যস্তভাবে ঠিক যেন ঝড়ের মতন উপস্থিত হইয়া সহসা সেই আনন্দ কোলাহল এককালে স্তব্ধ করিয়া দিল! বৃদ্ধ ছুটিয়া আসিয়াই আবেগ ভরে মিঃ রায়ের নিকট আসিয়া সপ্তমে স্বর চড়াইয়া কহিল—"সুধীন—সুধীন, তুমি এই দেশে রয়েছ, তবু আমি এতদিন তোমার খোঁজ পাই নাই!"

কক্ষস্থ সকলেই সেই অসভ্য বৃদ্ধটাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, তারপর মিঃ রায়ের সহিত এরূপভাবে বাক্যালাপে তাহার ততোধিক অসভ্যতা, অসম সাহসে সকলেই বিস্ময়ে মিঃ রায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল। তন্মধ্যে যতীন দত্তের বন্ধুমহলে একটু রসিক বলিয়া খ্যাতি ছিল, সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, হাসিতে হাসিতে বলিল—"কিহে মিঃ রায় এই শিম্পাঞ্জিটির সঙ্গে পরিচয় কতদিন থেকে হল?" কক্ষস্থ সকলেই সেই সাথে সব্যঙ্গে হাসিয়া উঠিল! মিঃ রায় আকস্মিক এই ব্যাপারে বিস্ময়ে অবিভূত হইয়াছিলেন; দত্তের বিদ্রূপে ক্রোধে তাঁহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া-উঠিল! তিনি ক্ষণেকের জন্য বৃদ্ধের পানে সরোষে চাহিলেন, তারপর উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন—"চাপরাশি আবি এই বুড়াকো শির পাকাড়কে বাহারমে নিকাল দেও।" চাপরাশি আসিল, কিন্তু বৃদ্ধকে স্পর্শ করিতেও হইল না! সে শান্ত শিশুটীর মতই অতি ধীর ভাবে চলিয়া গেল।

যাইবার কালে কেবল বলিল—"কাউকে ধর্ত্তে হবে না আমি আপনিই যাচ্ছি। সেই কথা কয়েকটী সে এমনি তেজ দৃপ্ত গম্ভীর অথচ সহজ সবল কণ্ঠে কহিল, যে সকলেই বিস্মিত হইল!

(২)

সন্ধ্যাসমাগম দেখিয়া মিঃ রায়ের বন্ধুগণ একে একে সকলেই বিদায় হইলেন, কিন্তু মিঃ রায় সেদিন ভ্রমণে বাহির হইলেন না! কি একটা অজানিত অশান্তি তাঁকে তীব্র কষাঘাত করিতেছিল, কিসের এক গভীর চিন্তায় তাঁহাকে নিমগ্ন করিয়াছিল! মিঃ রায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী আপন বিশাল ভবনের চতুষ্পার্শ্বে এক কোণে পদচারণা করিতে ছিলেন সহসা অদূরবর্ত্তী একটী নয়ন মুগ্ধ কর প্রাণস্পর্শি দৃশ্যে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

মিঃ রায় বিস্ময় পুলক নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার অট্টালিকার পশ্চাৎস্থিত ক্ষুদ্র পুষ্পউদ্যান মধ্যস্থ শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত চত্তর মাঝে তাঁহার এক মাত্র বংশধর শিশু পুত্র অমিয় সেই অপমানিত বিতাড়িত বৃদ্ধেরই বক্ষের উপর

পরম শান্তিতে নিদ্রার অলস-আবেশে চলিয়া পড়িয়াছে, তখন বসন্ত কাল অস্তগত লোহিত ভানু আপন অঙ্গের কতকটা আবীর অমিয়র শ্বেতপদ্ম তুল্য মুখখানি নিশিক্ত করিয়া সেই বৃদ্ধের পিঙ্গল চুলগুলার উপর ছড়াইয়া দিয়াছিল, মিঃ রায় নিতান্ত অপরাধীর মতই ধীরে ধীরে সেই স্থলে আসিয়া অমিয়কে আপন বক্ষে তুলিয়া লইলেন, তারপর অতি ধীর নম্রস্বরে একটু লজ্জিত ভাবেই বলিলেন—"কিরে রামদীন ভাল তো? বৃদ্ধ রামদীন মিঃ রায়ের সেই দস্তানা আঁটা হাতখানা তাহার পৃষ্টের উপর দেখিয়া, বিস্মিত, ও জড়সড় হইল; তারপর সভয়ে বলিল—"হাঁ সাহেব, তাহাকে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—নারে রামদীন, সাহেব বলার চেয়ে তোর মুখে সেই সুদীন নামটাই আমার বেশী পছন্দ। তারপর গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিতে লাগিলেন—অচ্ছা রামদীন, তুই তো কখনও এমন অসংযত বা অসভ্য ছিলি না! বাবার সঙ্গে তুই তো সর্ব্বদা আদালতে বা যে কোন সাহেব বাড়ীতে সর্ব্বদাই চাপরাশি হয়ে যেতিস্, তবে আজ হঠাৎ এমন হলি কেন?

কেন! বৃদ্ধ রামদীন একবার মিঃ রায়ের মুখ পানে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিল—তবে শোন, মনে পড়ে আজ প্রায় পনের দিন পূর্ব্বে একটা খুনী মকদ্দমায় তুমিপ্রধান ব্যারিষ্টার ছিলে, আর আমি তার প্রধান সাক্ষী ছিলাম! সেই খুনী অপরাধে ধৃত আসামী শ্যামলালই আমার এক মাত্র মাতৃহীন দৌহিত্র! দৌহিত্রকে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম কিন্তু সকলই বিফল হ'ল! যখন তুমি আমায় জেরা কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে, আমি তার কোনও সদুত্তর দিতে পাল্লেম না! বহুদিনের অদর্শনের পর, হৃদয় মধ্যে আঁকা তোমার সেই চির পরিচিত মুখখানা আমার সম্মুখে দেখে আমি নিতান্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেম; আমার নিকট সহস্র প্রমাণ থাকা সত্বেও আমারই সম্মুখে আমার নির্দ্দোষী দৌহিত্রের ফাঁসীর হুকুম হল। তোমার দোষী মক্কেলেরই জয় হয়ে গেল।—

বৃদ্ধ ক্ষণেক নীরব রহিল, তারপর মিঃ রায়ের হাত দুইখান ধরিয়া আগ্রহ আতিশয্যে বলিয়া উঠিল—সুদীন—সুদীন—মনে পড়ে, তখন আমি উন্মাদের মতন চেঁচিয়ে উঠেছিলেম—কিন্তু কেন জান? আমার দৌহিত্রের প্রাণদণ্ড শুনে নয়; তোমার সেই বিজয়গর্ব্ব ভরা হাস্যমাখা মুখখানি আমার সেই বহুদিনের পুরাতন স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিল—শুধু সেই জন্য—।

স্তম্ভিত মিঃ রায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আপন অজ্ঞাতসারে সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ রামদীন বহু কষ্টে রুদ্ধ কণ্ঠটা ঝাড়িয়া বলিতে লাগিল—সুদীন, —তখন আমার অন্তরে তোমার সেই বাল্যের মধুর ছবিখানি ফুটে উঠেছিল; উঃ সে আজি কতদিনের কথা, তখন তোমার বাবা এলাহাবাদে ওকালতী কর্ত্তেন! আমি দেশ ছেড়ে প্রথম সেই নকরী কর্ত্তে গেলুম; তোমার বাবা আমার হাতে হাতে তোমায় দিয়ে বল্লেন, রামদীন এই মাতৃহারা শিশু আজ হ'তে তোমার! তুমি সেই মুহূর্ত্তে ঠিক যেন চিরপরিচিতের মতই মধুর হাস্যে আমার শুষ্ক হৃদয় খানা ভরিয়ে দিয়ে মহা আনন্দে আমার বক্ষে ছুটে এলে, তেমনি সুখেই আমাদের বিশ বছর কেটে গেল! হঠাৎ একদিন আমার বাড়ী থেকে আমার মেয়ে লছমির অসুখের তার এল; তারপর আমার বুকের উপর দিয়ে কত ঝড় তুফান বয়ে গেল! আমার ছেলে মেয়ে স্ত্রী সব মরে গেল শ্যামলালকে নিয়ে এলাহাবাদে ছুটে গেলেম, সেখানে শুনলেম তোমার বাবার মৃত্যুর পর তোমার জ্যেঠা তোমায় নিয়ে বিলাতে চলে গেছেন, হতাশায় ভগ্ন হৃদয় লয়ে বাড়ী ফিরলেম! এমনই দুঃখের মাঝে দশ বৎসর অতীত হয়ে গেল! তারপর সহসা সেদিন তোমায় আদালতে দেখে আমি সব ভুললেম, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দৌহিত্রের মুখপানে না চেয়ে আদালতের ছুটীর পরই তোমার গাড়ীর পিছনে ছুটলেম!

লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার বাড়ীতে ঢুকলেম! তারপর তোমার স্বভাব সুলভ হাস্যমাখা সুন্দর মুখের মিষ্ট কথা শুনে—তোমায় এত নিকটে পেয়ে, আমি আর স্থির থাকতে পাল্লেম না! আপনার অবস্থা ভুললেম তোমার এমন সম্ভ্রম মর্য্যাদা সমস্ত ভুললেম—বহুপূর্ব্বের সেই শিশুটীরই মত আমি তোমায় আকুল আগ্রহে বুকে টেনে নিতে গেলেম। বৃদ্ধের কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল—সেই সাথে সুশিক্ষিত মিঃ রায়ের নয়ন কোণেও অজস্র অশ্রুধারা বহিল। অনুতপ্ত স্বরে মিঃ রায় বাধা দিয়া বলিলেন—রামদীন আমার সমস্ত শিক্ষাই বৃথা—আমি মহামূর্খ—তাই এতদিনেও তোকে চিনি নাই—রামদীন আমি মহা অপরাধী! আমার অপরাধ আজ এই স্বর্গীয় শিশুকে দেখে ক্ষমা কর—আমার অমিয়কে আজ তোকে দিলাম, বল রামদীন তাকে ছেড়ে কোথাও যাবিনা? গভীর আবেগে অমিয়কে বক্ষে জড়াইয়া অশ্রু গদ গদ কণ্ঠে বৃদ্ধ রামদীন বলিতে লাগিল—নারে—সুদীন —না! একদিন তোমারই মায়ায় ঘর বাড়ী ছেড়ে মেয়ে সব ভুলে ছিলেম—আজ হতে আবার তোমার খোকা অমিয়ের স্নেহে শ্যামলালের মায়া মমতা শোক সমস্ত ভাসিয়ে দেব—যতদিন বাঁচব খোকার সেবা মাথায় পেতে নেব! তোমাদের ছেড়ে আর আমি কোথায় যাব! আমি যে তোমাদের—পুরাতন ভৃত্য।